ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৮ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০]   ভারতী কার্য্যালয়,   [বার্ষিক মূল্য ৩৸০

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৮ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

চিত্র সূচী

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৮ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৴০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৸০

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩২৮ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

চিত্র সূচী



দধি-মন্থন

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২৮ [১ম সংখ্যা

আঁধি

(উপন্যাস)

১

প্রকাণ্ড নদী বাঘমতীর তীরে সুনন্দা গ্রাম। নদীর তীরে লোকের বসতি খুব কম। একধারে প্রকাণ্ড নদী সগর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে, নদীর কোলে মেটে পথ,—পথের অন্য ধারে ঘন জঙ্গল,—কোথাও বাঁশ-ঝাড়, কোথাও কালকাসিন্দার ঝোপ, কোথাও-বা ফণী-মনসা, ঘেঁটু ও এমনি-সব আগাছা উঁচু ঢিবির উপর সদলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চৈত্র মাসের শেষ। সেদিন সন্ধ্যার সময় সমস্ত আকাশটাকে ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া প্রবল ঝড় উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। নদী-তীরের মেটে পথ ধরিয়া দশ-এগারো বৎসর বয়সের একটি ছেলে সেই ঝড় মাথায় করিয়া জলে ভিজিয়া একশা হইয়া ছুটিয়া গাঁয়ের দিকে চলিয়াছে। মাথার উপর গাছপালা মট্-মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কড়্কড়্ শব্দে বিদ্যুৎ আকাশটার এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত চিরিয়া আগুনের লাইন টানিয়া ছুটাছুটি করিতেছে,—সমস্ত প্রকৃতি যেন চারিধার কাঁপাইয়া মরণের গোলা লইয়া ছুড়িয়া লোফালুফি করিয়া বিশ্বটাকে দলিয়া পিষিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে! এ-সব দিকে ছেলেটির ভ্রূক্ষেপও নাই। সে ছুটিয়াছে, ছুটিয়াছে, ছুটিয়াছে!

নদীর তীর ছাড়িয়া মোড় বাঁকিতেই সেই ঝড়-বৃষ্টির ঘন অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ একটা আলোক-রশ্মি ছেলেটির চোখে পড়িল। আলোর রেখা দেখিয়া ছেলেটি সেই দিকে ছুটিল।

একখানা গোল-পাতার বাড়ী। মাটীর জীর্ণ দেওয়ালের ফাঁক দিয়া আলোর একটা রশ্মি

তাহার চোখে পড়িয়া ছিল। ছেলেটি আসিয়া ছাঁচের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুতের আলোয় ঘরের দ্বারের নিশানা মিলিলে ছেলেটি সেই দ্বারে করাঘাত করিল। একবার, দুইবার, তিনবার। কাহারো কোন সাড়া নাই,—শুধু জলের ঝম্ ঝম্ আওয়াজ আর বাতাসের সোঁ-সোঁ গর্জ্জন! নিরুপায় হইয়া ছেলেটি দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। প্রচণ্ড হাওয়ায় জলের ছাট্ চাবুকের মত আসিয়া ছেলেটির অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল। ঠাণ্ডায় তাহার হাড় অবধি কাঁপিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। উপায় কি! ছেলেটি তখন আপনার সমস্ত শক্তি লইয়া প্রাণপণে দুই হাতে দ্বারে আবার ঘা দিল। ভিতর হইতে কে বলিল—যাই গো।

ছেলেটি বর্ত্তাইয়া গেল। একটি স্ত্রীলোক,—হাতে প্রদীপ,—হাতের ঘেরে শিখাটীকে কোনমতে বাঁচাইয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বদ্ধ আলোর উজ্জ্বল রশ্মি মুখে পড়িয়া এমন এক স্নিগ্ধ বিভায় স্ত্রীলোকটির মুখখানিকে রঞ্জিত করিয়াছিল যে ছেলেটি সে মুখ দেখিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিল। স্ত্রীলোকটি বলিল,—আহা, কার বাছা বাবা! ভিজে সারা হয়ে গেছ, একেবারে! এসো, এসো, ভিতরে এসো।

ছেলেটি দুই হাতে মাথার মুখের জল ঝাড়িতে-ঝাড়িতে ভিতরে আসিল। স্ত্রীলোকটি দ্বার বন্ধ করিয়া আলো দেখাইয়া ছেলেটিকে দাওয়া পার করিয়া আর-একটা ঘরে আনিল। [illegible] একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, আর সেই প্রদীপের আলোয় তক্-তকে নিকানো মেঝের উপর একটা ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া দুইটী প্রাণী নীরবে বসিয়া ছিল; একজন পুরুষ, অপরটি বালিকা। ছেলেটিকে দেখিয়া পুরুষ বলিল,—একখানা গামছা এনে দাও গো—বড্ড ভিজেছে, দেখ্‌চি!

যে-স্ত্রীলোকটি দ্বার খুলিয়া দিতে গিয়াছিল, সে মুহূর্ত্তে কোথা হইতে একটা শুক্‌নো গামছা লইয়া আসিয়া ছেলেটির মাথা বেশ করিয়া ঘষিয়া মুছাইয়া দিল। পুরুষটি তখন ডাকিল,—সোনা। বালিকার নাম, সোনা। সোনার বয়স সাত কি আট বৎসর হইবে। সে বলিল,—কি বাবা?

বাপ বলিল,—একটা শুক্‌নো কাপড় দে ত রে!

সোনা একখানি বৃন্দাবনী কাপড় আনিয়া বাপের হাতে দিল।

পুরুষটি বলিল,—ও-সব ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলো, বাবা। এই কাপড়টা এখন পর, নাহলে অসুখ করবে।

ছেলেটি তখনো সেই ভিজা পোষাকে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। জিনের হাফ্ প্যাণ্ট, জিনের কোট, পায়ে ফুল মোজা আর ভারী বুট—সমস্ত ভিজিয়া আরো ভারী হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বাঁধনের মত কষিয়া চাপিয়া ছিল। পোষাক খুলিয়া, জুতা-মোজা খুলিয়া শুষ্ক কাপড় পরিয়া ছেলেটি মাদুরের এক কোণে বিনা-দ্বিধায় বসিয়া পড়িল। পুরুষটি তখন বলিল,—ওগো, এক কাজ কর দেখি, এখন এই ভিজে ইজের-জামাগুলোকে বেশ করে নিংড়ে উনুনে সেঁকে দাও—যদি শুকোতে পারো! জামা নেই, তাই ত—ভালো কথা, ওরে সোনা—

—কি বাবা ?

– তোর সেই কাচা দোলাইটা ও-ঘরের দড়িতে তোলা আছে, সেইটে নিয়ে আয়, দেখি। আহা, বড্ড শীত করছে !

সোনা পরম আগ্রহে গিয়া দোলাই লইয়া আসিল। ছেলেটি দোলাই গায়ে দিলে স্ত্রীলোকটি উঠিয়া একবাটি গরম দুধ আনিয়া বলিল—এইটুকু খেয়ে ফেলো ত বাবা। অত ভিজেছ—না হলে জল বসে সর্দ্দি-কাশী হবে, শেষে !

ছেলেটি অবাক হইয়া গেল। বহুকাল পূর্ব্বে সে একটা গল্প শুনিয়াছিল—এক রাজপুত্র বনে পথ হারাইয়া এক ভিখারীর বাড়ী আশ্রয় লইয়াছিল ; সেখানে ভিখারীর যত্নে-দেওয়া বনের ফল খাইয়া রাজপুত্র যে আরাম পাইয়াছিল, রাজবাড়ীর মহার্ঘ্য ভোজ্যেও সে স্বাদ কখনো পায় নাই ! গল্পটাতে রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের আরো বহু আশ্চর্য্য ঘটনা ও বহু পরিবর্ত্তনের কথাও ছিল—কিন্তু এই কাপড়, দোলাই আর দুধের বাটি পাইয়া সেই বনফলের কথাটাই বিশেষ করিয়া এখন মনে পড়িল।

দুগ্ধ পান করিয়া ছেলেটি একটা নিশ্বাস ফেলিল। পুরুষটি বলিল—তোমরা কোথায় থাকো বাবা ? এধারে এসেছিলে কেন—এই ঝড়ে, এমন একলা ?

ছেলেটি বলিল,—রোজই সন্ধ্যার আগে আমি বেড়াতে যাই কিনা—এই নদীর ধারটা আমার খুব ভালো লাগে। আজ বেড়াতে বেড়াতে দেরী হয়ে গেল, আকাশের দিকে চেয়েও দেখিনি—তার পরই ঝড় আর বৃষ্টি এল।

পুরুষটি বলিল,—তাহলেও এমন একলা বেরুতে আছে ? ছেলেমানুষ ! বিশেষ এই কাল-বোশেখীর সময় !

ছেলেটি বলিল,—একলা ত আসি না, সঙ্গে মাষ্টার মশাই রোজ থাকেন। আজ তিনি বললেন, তাঁর কি একটা কাজ আছে—তাই আমি একলাই বেড়াতে বেরিয়ে ছিলুম।

পুরুষটি বলিল,—তোমার নামটী কি বাবা ?

—আমার নাম শ্রীনিখিলশঙ্কর রায়।

—তোমার বাবার নাম ?

—শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াশঙ্কর রায়।

পুরুষটি আপনার মনেই বলিল—অভয়া-শঙ্কর রায় ! তারপর কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ছেলেটিকে বলিল,—তোমরা এইখানেই থাকো ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

—ঐ যে শিবতলা বলে একটা জায়গা আছে না—? সেই যে মস্ত একটা পুকুর আছে, এক কোণে শিবের মন্দির—তারই একটু দূরে যে নতুন একটা বাড়ী হয়েছে—বড় বাড়ী, ফটকওলা, সামনে ফুলের বাগান—সেই বাড়ীতে আমরা থাকি।

পুরুষটি বলিল,—ও, ঐ যে শুনেছিলুম, বিদেশের কে জমিদারবাবু নতুন বাড়ী তৈরি করাচ্ছিলেন—সেই বাড়ীই তাহলে তোমাদের ? তা ও বাড়ী ত অল্পদিন হল, তৈরী হয়েছে।

—হ্যাঁ। আমরা এই মাঘমাসের শেষে এখানে এসেচি।

—এইখানেই বরাবর থাকা হবে ?

—তা জানি না।

—বেশ, বেশ। ওরে সোনা, বুঝেচিস্, তুই যে বলতিস্ অত বড় বাড়ী, ও কি রাজাবাবুর? এ বাবু সেই রাজাবাবুর ছেলে। জানলি!

মুগ্ধ বিস্ময়ে সোনা নিখিলের পানে চাহিয়া পিতার গা ঘেঁষিয়া বসিল। বলিল,—রাজপুত্তুর!

—হ্যাঁ।

—তাহলে রাজপুত্তুর বাবুর তালপত্তরের খাঁড়া আছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে?

—আছে বৈ কি!

—দেখতে যাব, বাবা?

—যাবি বৈ কি, যাস্। রাজপুত্তুর বাবুর সঙ্গে যখন ভাব হল, তখন যাবি নে কেন! তারপর পুরুষটি নিখিলের পানে চাহিয়া বলিল,—এইটি আমার মেয়ে, সোনা। নামটি সোনা হলে কি হয়, এদিকে ভারী দুষ্টু। আমরা গরিব মানুষ, বাবা। আমার একটু ছোট্ট দোকান আছে—ঐ সব চালানী নৌকো আসে, তারাই মাল-পত্তর কেনে, তাতেই আমার চলে। আমার কত বড় ভাগ্যি, যে, তুমি বাবা, আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় পায়ের ধূলো দিয়েছ! তা গরিব হই, আর যা-ই হই, এই গাঁয়ের মধ্যে এ কথা কেউ বলতে পারবে না, বনমালী কারো সঙ্গে জুচ্চুরি করেছে কি কোন ফেরেব-বাজী করেছে! তোমাদের আশীর্ব্বাদে, বাবা, তাই এত দুঃখেও আরামেই আমার দিন কেটে যাচ্ছে। তারপর বনমালী নিজের মনেই আপনার অতীতের সহস্র কাহিনী বলিয়া চলিল। সুন্দরবনের ওদিকে এককালে তাহাদের মস্ত আবাদ ছিল,—জলের গ্রাসে সমস্তই গিয়াছে। সে সব থাকিলে তাহার আর ভাবনা কিসের, ভয়ই বা কি! একটা মেয়ে—সেটাকে সুপাত্রে দিতে পারিলেই তাহার ইহকালের কাজ চুকিল!

নিখিল চুপ করিয়া কথাগুলা শুনিয়া যাইতেছিল,—কতক বুঝিতেছিল, কতক আবার হেঁয়ালির মতই ঠেকিতেছিল—মন কিন্তু তাহার ছিল, ঐ সোনার পানে। সে ঐ আলোর সাম্‌নে কতকগুলা নুড়ি-পাথর লইয়া কি সব ছড়া বলিতেছিল, আর সেগুলাকে নাড়িতেছিল, নাচাইতেছিল, এবং মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিস্ময়ে সম্ভ্রমে নিখিলের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল—ইহার মধ্যে সে যেন কেমন এক রহস্যের স্বাদ পাইল। বাহিরে ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কড়কড় মেঘ ডাকিতেছে, সোঁ সোঁ ঝড় বহিতেছে,—আর ভিতরে এই বনমালীর কাহিনী আর ঐ বালিকা সোনার কোমল স্বরে ছড়া চলিয়াছে,—ফুল, ফুল, একটা তুলে জোড়ার ফুল, দোগ্-ঘোন্ দোগ্-ঘোন্—কখনো বা সে খেলা ফেলিয়া তার কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ নাচাইয়া বাপের ঘাড়ে চড়িতেছে, মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, অত্যন্ত সহজ সলীল ভঙ্গীতে—মুগ্ধ নিখিলের চোখে এই সমস্তগুলা মিলিয়া এক বিচিত্র স্বপ্ন-মাধুরীর সৃষ্টি করিতেছিল! সে তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল।

২

যখন ঝড়-বৃষ্টি থামিল, তখন অনেকখানি রাত্রি হইয়াছে। বনমালী বলিল,—চল বাবা, তোমায় বাড়ী রেখে আসি—সেখানে সকলে কত ভাবছেন!

দুইধারে বাদামী কাগজ লাগানো, আর দুইধারে ময়লা কালি-পড়া কাঁচ-আঁটা একটা

ছোট লণ্ঠন হাতে লইয়া বনমালী নিখিলের সঙ্গে পথে বাহির হইল। নিখিলের পোষাক তখনো শুকায় নাই, কাজেই সেগুলা বনমালী হাতে করিয়া চলিল, আর নিখিলের পরণে রহিল, বনমালীর দেওয়া সেই বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে সোনার দোলাই।

নির্জ্জন স্তব্ধ পথ। আকাশের কোলে খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ তখনো ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। ভিজা গাছের পাতা হইতে জলের বড় বড় ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল—ঝিঁঝির অবিশ্রাম রবে নিশীথের রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, আর ভিজা গাছপালার ঝোপে-ঝাপে রাশ রাশ জোনাকি আলোর চুম্‌কি আঁটিয়া বসিয়াছিল।

খানিকটা পথ চলিয়া আসিবার পর দূরে দুইটা হারিকেন লণ্ঠন দেখা গেল। লণ্ঠন কাছে আসিলে নিখিল দেখিল, মাষ্টার মশায় বাড়ীর দামু চাকরকে লইয়া সেই দিকেই আসিতেছেন—নিশ্চয় নিখিলের সন্ধানেই বাহির হইয়াছেন! মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া নিখিল বনমালীকে বলিল,—ঐ যে মাষ্টার মশাই! তুমি যাও, আর তোমাকে আসতে হবে না।

বনমালী বলিল,—সে কি হয়, বাবা, চল, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

নিখিল বলিল,—না, না, আর আসবার কোন দরকার নেই। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

মাষ্টার মহাশয় ও দামু আরো কাছে আসিতেই মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—এই যে নিখিল। আঃ, বাঁচা গেল! দামু বলিল,—হেই যে দাদাবাবু, কোথাকে ছিলে? বাড়ীতে বাবু আর মাঠাকরুণ ভেবে তুলকালাম বাধিয়ে দেছেক। এই রাত্তিরেতে চারধারে লোক ছুটেচে খোঁজবার লেগে!

বনমালী সগর্ব্বে বলিল,—ভয় কি! আমার বাড়ীতে উনি ছিলেন—এই ঝড়, এই বৃষ্টি—এতে কি করে আসেন!

দামু দাদাবাবুর পরিচ্ছদের পানে চাহিয়া বলিল,—পোষাক কোথাকে গেল?

এই যে—বলিয়া বনমালী নিখিলের পোষাকগুলা দামুর হাতে দিল।

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—এসো, বাড়ী এসো।

নিখিলের মন এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্ন-লোকে বিচরণ করিতেছিল—সেই বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ আওয়াজ, সোনার সেই সুর করিয়া ছুড়ি খেলা—সহসা মাষ্টার মশায় আর দামুর কথা তাহাকে সে স্বপ্ন-লোক হইতে একেবারে কঠিন ভূমি-তলে নামাইয়া আনিল! মাষ্টার মশায়ের গা ঘেঁষিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল - বাবা খুব রাগ করেছেন, মাষ্টার মশায়,—না?

মাষ্টার মশায় আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—না, রাগ করবেন কেন! তবে খুব ভাবচেন। এই রাত্রে ঝড়-বৃষ্টিতে কোথায় গেলে—ভাবনা হবার কথাই ত!

নিখিল কহিল,—আপনি এদিকে এলেন কি করে?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—চারধারে লোক গেছে। তবে আমি জানতুম, তুমি এই ধারটাতেই বেড়াতে আস, তাই আমি দামুকে নিয়ে এই দিকটায় এলুম। আমারো কি ভাবনা কম হয়েছিল—কি ঝড়-বৃষ্টিই হয়ে গেল, বল দেখি!

তার পর চুপ-চাপ্ সকলেই চলিতে

লাগিল। খানিক দূর গিয়া নিখিলের মনে হইল, বনমালীও সঙ্গে আসিতেছে যে! সর্ব্বনাশ! বাপের সহস্র মানা ছিল, কোন ছোট লোকের সঙ্গে কখনো যেন সে মেলা-মেশা না করে—বাড়ীর সকলের উপর কঠিন আদেশ ছিল, নিখিল যেন তাহাদের সংসর্গে না যায়! বনমালী—আহা, বেচারা বনমালী! খোড়ো চালায় তাহার বাস বটে, সে গরিব হইতে পারে, কিন্তু সে ছোটলোক—এ কথা মনে করিতে তাহার মনটা খুঁত খুঁত করিতে লাগিল! এমন যত্ন, এমন আদর যে করিতে পারে, সে কি কখনো ছোটলোক হয়! আর বনমালীর বৌ,—সেই সোনার মা—কেমন সুন্দর তার মুখখানি, কেমন মিষ্ট তার কথাগুলি, কেমন মধুর তার যত্নটুকু—সাগ্রহে কত আদরে সে সেই দুধের বাটি তাহার মুখে ধরিয়াছিল! তার পর সোনা—কেমন লক্ষ্মী মেয়েটি! তবুও পিতার রোষ-রক্ত আঁখি দুইটা তাহার চিত্তে আগুনের হল্‌কার মত ছ্যাঁকা দিতে লাগিল। পাছে বনমালীকে দেখিয়া পিতা তাহাকে দুইটা রূঢ় কথা বলেন! যে-বেচারা তাহাকে এত যত্ন করিয়াছে, এই রাত্রে কত কষ্ট করিয়া তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে,—তাহার সে-যত্নটা না বুঝিয়া পিতা কঠিন কথা বলিলে সে বেচারার প্রাণে তাহা কতখানি বাজিবে, ইহা ভাবিয়া সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে জোর করিয়াই বনমালীকে বলিল,—তুমি বাড়ী যাও। আর আসতে হবে না তোমায়।

বনমালী বলিল—আমার কোন কষ্ট হবে না, বাবা।

—না, না, তুমি যাও—

নিখিলের এই সাগ্রহ অনুরোধের অর্থ বনমালী বুঝিল অন্যরকম। তাহার পিতাকে ত বনমালী চেনে না! কি কড়া মেজাজ! পিতার এই রাগ বা বিরক্তি লইয়াই ছিল নিখিলের ভয়! কিন্তু বনমালী ভাবিল, তাহার কষ্ট ভাবিয়াই নিখিল অতখানি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে! তাহার আবার কিসের কষ্ট! কাজেই বনমালী বাড়ী ফিরিল না, নিখিলের সঙ্গেই চলিল।

নিখিল সারা পথ বুকে একটা দারুণ আশঙ্কা বহিয়াই চলিল। বনমালী ত জানে না বাড়ীতে কি কঠিন শাসনের মধ্যেই তাহাকে দিন কাটাইতে হয়, বাপের কড়া আইন-কানুন মানিয়া—তার এক চুল এদিক-ওদিক করিবার জো নাই। বনমালীর বাড়ীতে সে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার মেয়ে সোনার কি অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি! নিয়মের নিগড় কোথাও এতটুকু চাপিয়া দাবিয়া রাখে নাই—কিন্তু তাহার বাড়ীতে যে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের বন্দোবস্ত! এখানে চলিতে ফিরিতে হাঁচিতে কাশিতে কর্ত্তার মেজাজের পানে লক্ষ্য রাখিতে হয়!

বাড়ী আসিয়া ভিতরে ঢুকিবার সময় নিখিল বনমালীকে বলিল—এই বার আমি এসেচি ত, তুমি বাড়ী যাও! যাও না তুমি বাড়ী চলে!

বনমালী অবাক হইয়া গেল। সে কেমন হতভম্বের মত মাটীর পুতুল বনিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নিখিল ভয়-কম্পিত প্রাণে ফটকের মধ্যে পা দিল।

উপরে উঠিতেই সে দেখে, সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পিতা অভয়াশঙ্কর। পুত্রকে

দেখিয়া পিতা বলিলেন,—কোথায় ছিলে এত রাত্রি অবধি ?

ভয়ে নিখিলের বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। সে কোন কথা বলিল না। পিতা বলিলেন, —এই ঝড়, এই বৃষ্টি—এঁ্যা ? বল।

মাষ্টার মহাশয় তখন সংক্ষেপে বলিয়া দিলেন, ঝড়-বৃষ্টির সময় নিখিল একটি লোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। জামা-কাপড় অবধি ভিজিয়া গিয়াছিল। পুত্রের পরিচ্ছদের পানে তখন পিতার দৃষ্টি পড়িল। পিতা বলিলেন,—এ কার কাপড় পরেছ ? বল।

নিখিল ভয়ে ভয়ে বলিল,—বনমালীদের।

—বনমালী কে ?

নিখিল বলিল,—ওদিকে তাদের বাড়ী—বাড়ীতে বৃষ্টির সময় গিয়ে বসেছিলুম। সব ভিজে গেছল, তাই তারা এই কাপড়টা পরতে দিয়ে ছিল! তার দোকান আছে।

—তাদের ঐ কাপড় পরতে এতটুকু ঘেন্না হল না তোমার! সেই ভিজে পোষাকেই তুমি বাড়ী এলে না কেন ?

এ কথার কোন জবাব নাই! নিখিল কি নিজের ইচ্ছায় পোষাক বদল করিয়াছিল ? জলে ভিজিয়া শীতে কাতর হইয়া সে কাঁপিতেছিল, তাই, কিন্তু—সমস্ত কথাগুলা সাহস করিয়া সে বলিতে পারিল না।

না বলুক, এই বেয়াদবির জন্য পিতার কঠোর দণ্ড উদ্যত ছিল। তখনি তাহার অঙ্গ হইতে কাপড় আর দোলাইটা টানিয়া লইয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া সম্মুখের ঘরে ঠেলিয়া দিলেন, নিখিল আচম্‌কা সে আকর্ষণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া ঘরের ঠিক মাঝখানটায় ছিট্‌কাইয়া গিয়া পড়িল। পিতা তখন সশব্দে দ্বারটা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—সারা রাত এই ঘরে তোমায় বন্ধ থাকতে হবে, আজ! এমনি ভাবিয়ে তুলেছিলে! বাড়ীর কথা মনে থাকে না—যে এখানে সকলে ভাবছে! আজ রাত্রে তোমার খাওয়াও বন্ধ!

হাকিমের রায় বাহির হইয়া গেল। মাষ্টার মশায় ও দামু নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির মতই দাঁড়াইয়া; কাহারো একটা কথা কহিবার সাধ্য নাই! অভয়াশঙ্কর সরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় এক তরুণী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দ্বার চাপিয়া ধরিলেন। দামু ও মাষ্টার মহাশয় ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

নারী বলিল—দাও, ওগো দাওগো,বাছাকে একবার দেখতে দাও। হাকিমের কঠোর আদেশ ধ্বনিত হইল,—না।

—আহা, ওর মুখের খাবার পড়ে আছে গো! একটু কিছু খেতে দাও। কখন্ বাছা সেই বেরিয়েছে গো! এই জল-ঝড়ে কত কষ্ট হয়েছে!

তবুও সেই এক উত্তর—না।

নারী বলিল,—এই অন্ধকার ঘরে সারা রাত থাকবে ও ?

—হ্যাঁ, এই ওর শাস্তি।

—কিন্তু অপরাধ কি—ওর ?

—সে কথা তোমায় বলবার কোন দরকার দেখচি না! নারী স্তম্ভিতের মত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তার পর একটা বুকভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি ওর মা, আমাকে ওর কাছে থাকতে দাও।

—না।

হায়রে অভাগিনী নারী! তোমার

মিনতিতে কোনদিন পাথরও গলিতে পারে, কিন্তু জমিদার অভয়াশঙ্করের মন তাহাতে এতটুকুও টলিবে না।

নারী তখন নিরুপায় চিত্তে দ্বারের প্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল,—সখেদে ডাকিল,—নিখিল, বাবা আমার!

মেঘের টুক্‌রাগুলাকে ভাঙ্গিয়া সরাইয়া ক্ষীণ চাঁদ তখন আকাশের কোণে দেখা দিয়াছে! মৃদু জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ সুধাধারার মতই অভাগিনী নারীর অঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। অভয়াশঙ্কর অচপল দৃষ্টিতে ভূলুণ্ঠিতা পত্নীর পানে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে পথে দাঁড়াইয়া একটা লোক তখন জমিদার বাবুর মুখের একটু কৃতজ্ঞ মধুর বাণীর প্রত্যাশায় প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীটার পানে অধীর সাগ্রহ দৃষ্টি লইয়া চাহিয়াছিল। ভাবের ঝোঁকে বেচারা বুঝিতেও পারিল না, এখানে বাড়ীর মধ্যে কত-বড় মর্ম্মভেদী নাটকের একটা অঙ্কের অভিনয় হইয়া গেল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ফুলের চিঠি

আজ্‌কে আমার মেঘের মত ঘুরতেছিল মন,
মাঠের মাঝে হঠাৎ পেলাম, এ কার নিমন্ত্রণ?
ফুল-ভরা ওই করবীতে
পড়লো আঁখি আচম্বিতে,
একেবারে পথিক-বধূর আঁখির আলাপন।

কুসুম-বধূর প্রীতির লিপি বহে বুকের মাঝ,
পার হয়ে হায় ভূধর-দরী ঘুরছি আমি আজ।
মেঘ পারে না পথ দেখাতে,
কি যে আছে তার লেখাতে,
পড়তে নারি, প্রেমের চিঠি খুলতে লাগে লাজ।

পান্থ আমি, কোথায় যাব, কোথায় আমার ধাম—
না সুধায়েই হস্তে দিলে, মোড়া রঙিন খাম্,
কেবল চাওয়া, কেবল হাসা,
বুঝবে না সে আমার ভাষা
কেমন করে নিই সুধায়ে তাহার প্রিয়ের নাম।

আলতা-রাঙা পাতগা খামের বক্ষ ভেদি হায়
স্বর্ণ আখর সজীব হয়ে বলতে কি যে চায়!
বন-দুলালীর হেম মরালে
কোন্ মানসের তীর স্মরালে
পদ্ম-বুকের বদ্ধ ভ্রমর গুঞ্জনে মাতায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ফকিরদা

(গল্প)

১

ফকিরদা যেদিন আমাদের মেসের সিঁড়ির নীচের সেই স্যাঁত্-সেঁতে অন্ধকার ঘরখানা ভাড়া নিয়ে এসে ঢুক্‌লো, মেসে সেদিন একটা হুলস্থূল পড়ে গেল,—কেননা ওই ঘরখানা আজ দশ বছরের উপর খালি পড়ে আছে, কেউ যে ওটা কোনদিন ভাড়া নিতে পারে, এ কল্পনাও আমরা কখনো করিনি, কারণ আমরা জানতুম যে ওই চোর-কুট্‌রির মত একরত্তি ঘুট্‌-ঘুটে অন্ধকার আওতা ঘরখানা মানুষের বাসের একেবারেই যোগ্য নয়; আর এ ধারণা যে শুধু আমাদেরই একার তা নয়, মেসের অধিকারী যে হরু ঠাকুর—সেও এটা বিশ্বাস করতো; তাই ও ঘরটা সে এতদিন কেবল ঘুঁটে-কয়লা আর যত পুরানো লোহা-লক্কড়, ভাঙা-চোরা কাঠ-কাট্‌রা, ছেঁদা-ফুটো-বাতিল বাল্‌তি, মর্চ্চে-ধরা টীনের কানাস্তারা এই সব হরেক রকমের আবর্জ্জনায় বোঝাই করে রেখেছিল। হঠাৎ একটা ছুটীর দিনে সকাল বেলা দেখা গেল, মেসের ঝী জগ আর স্বয়ং হরুঠাকুর নিজে—এই দু'জনে মিলে ঘরখানাকে তার এতদিনের সঞ্চিত জাল-জঞ্জাল থেকে বঞ্চিত কুর্ব্বার বিধিমতে চেষ্টা করছে! আমরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ঠাকুর—ব্যাপার কি? হঠাৎ ও ঘরখানার উপর আজ এত নেক্‌নজর হল কেন?"

হরুঠাকুর একটু মুচকে হেসে বললে, "আজ্ঞে দাদাবাবু, আর বলেন কেন? আজ ক'দিন ধরে একটা লোক হাঁটাহাঁটি করে পায়ের সুতো ছিঁড়ে ফেললে; বললুম তাঁকে যে, এ ঘরে থাক্‌তে পারবেন না মশাই,—তা সে কি শোনে?—দুটো পা জড়িয়ে ধরে বল্লে—দয়া করে ওটুকু আমায় দিতেই হবে! কি আর করি, বলুন, একমাসের ভাড়া আমায় দিয়ে গেল!"

শুনেই আমরা সকলে মিলে সমস্বরে বলে উঠলুম, "বল কি ঠাকুর—? সত্যি?—"

একজন বল্লে, "ভাড়া নিয়েছে?—ঐ ঘর?—"

আর একজন বল্লে, "পয়সা দিয়ে?"

হরুঠাকুর তার ট্যাঁক থেকে দুটো টাকা বার করে আমাদের দেখিয়ে বললে, "এই যে, দেখুন না,—টাকাদুটো এখনও খরচ হয়নি, ট্যাঁকেই মজুত রয়েছে!"

শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলুম! এমন লোকও আছে - যে ঐ রকম ঘরে বাস করতে পারে?—আবার ভাড়া দিয়ে? এ-হেন ঘরের ভাড়াটে লোকটি না জানি কেমন ভেবে তাকে দেখ্‌বার জন্যে আমরা মেস-শুদ্ধ লোক উৎসুক হয়ে উঠ্‌লুম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের মধ্যে তার একটা সম্ভবপর চেহারা আর বেশ-ভূষারও আন্দাজ চল্‌তে লাগল। অনেক তর্ক-বিতর্ক, চেঁচামেচি গাল-মন্দ এমন কি প্রায় হাতাহাতির উপক্রম

হবার পর শেষে অধিকাংশের মতে সাব্যস্ত হ'ল যে—লোকটা নিশ্চয়ই বুড়ো, জাতে খুবই খাটো, ভারী গরীব আর ছেঁড়া ময়লা কাপড়-চোপড় পরা, অতি নোংরা কদর্য্য চেহারা,—ইত্যাদি! কিন্তু আমাদের উপদেশ-অনুসারে সতর্ক হরুঠাকুর যখন ডাক দিলে, "কোথাগো দাদাবাবুরা, তিনি এসেছেন যে—" আমরা তখন সব যে যার ঘর থেকে বারাণ্ডায় বেরিয়ে পড়ে, রেলিং ধরে সামনে ঝুঁকে দেখলুম, আমাদের কারুর বিচিত্র কল্পনাই এই নতুন ভাড়াটের স্বরূপ আকৃতির অনুমান করতে পারেনি! আমরা পরস্পরে সবিস্ময়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম!

বয়স তার বছর চল্লিশেরও কম। ভদ্র চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়, কিন্তু চোখে-মুখে একটা যেন কিসের দুরভিসন্ধি মাখানো—ডান হাতে একটা ছোট ট্রাঙ্ক ঝুলিয়ে নিয়েছে—বাঁ হাতে একপ্রস্থ সতরঞ্চি মাদুর বালিশ বিছানা, বিছানার ভিতর থেকে আবার একটা বিবর্ণ ছাতিরও খানিকটা দেখা যাচ্ছে, বেশ করে সেগুলো বগল-দাবায় বাগিয়ে চেপে ধরেছে। আঙুলের ডগায় একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন ঝুলছে, সিঁড়ির নীচের ঘরখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে! হরুঠাকুর তখন তার প্রকাণ্ড চাবির থোলো নিয়ে সেই ঘরের কুলুপটা খুলে দিচ্ছিল।

লোকটা একবারও আমাদের কারো দিকে চেয়েও দেখলে না! হরুঠাকুর ঘরখানা খুলে দিতেই সটান গিয়ে সে তার ভিতর ঢুকলো। সমস্ত দিনের মধ্যে একটিবার আর তাকে কেউ বেরুতে দেখেনি। তবে সন্ধ্যার পর সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবার সময় ঘরের ভেজিয়ে-দেওয়া জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আসতে দেখে তার অস্তিত্ব তখনও পর্য্যন্ত টের পাওয়া যাচ্ছিল বটে।

২

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। লোকটি আমাদের কারো সঙ্গে একদিনও আলাপ-পরিচয় করবার চেষ্টা করেনি, আমরাও কেউ ওপর-পড়া হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করিনি। কতকটা ইচ্ছে করেও বটে, আবার কতকটা সুযোগ হয়নি বলেও বটে,—কেননা লোকটি ভোরবেলায় আমাদের ঘুম ভেঙে ওঠবার আগেই রোজ কোথায় বেরিয়ে যেতো, আমরা স্নান-আহার ক'রে যে যার কাজ-কর্ম্মে বেরিয়ে পড়তুম, তখনো সে ফিরতো না। তারপর সন্ধ্যাবেলা এসে শুনতুম, সেই যে বেলা বারোটা নাগাদ সে এসে নেয়ে খেয়ে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি!

সন্ধ্যার পর বাসায় দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব এসে জুটতো, কোন ঘরে তাস, কোন ঘরে দাবার আড্ডা বসতো, কাজেই তার খবর নেবার আর আমাদের ফুরসুৎ হতো না। ছুটির দিনও এই ব্যাপার! মাঝে মাঝে আবার শুনতুম, দিনকতকের জন্যে তিনি নাকি কোথায় উধাও হয়ে থাকেন। কাজেই কিছুদিনের মধ্যে সিঁড়ির নীচের ঘরখানায় যে একজন লোক ভাড়া নিয়ে এসে আছে, এটা আমরা প্রায় একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু হঠাৎ একদিন বর্ষাকালে সন্ধ্যার পর কোথায় একটা কি নিমন্ত্রণ-উপলক্ষে বাসায় অনেকেই অনুপস্থিত

থাকায়,আমাদের তাসের আড্ডাটা লোকাভাবে জম্‌চে না দেখে একজন বল্‌লে—"এক কাজ করনা হে, সিঁড়ির নীচের দুষ্প্রাপ্য ঐ লোকটাকে আজ টেনে নিয়ে এসো না—, আমরা তিন জন আছি, আর একজনকে পেলেই তো বসা যায়!"

এমন বাদলার সন্ধ্যাটা মাঠে মারা যাচ্ছে দেখে অগত্যা আমি একটা ছাতি মাথায় দিয়ে সিঁড়ির নীচে নেমে এলুম, ভাগ্যক্রমে লোকটি সেদিন বর্ষার জন্যে বেরুতে পারেনি, দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল, কপাটে ঘা-দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "মশাই আছেন কি?"

"কে?" বলে লোকটি হারিকেন লণ্ঠনটা হাতে করে এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো, আমি আর কোনরকম ভূমিকা না করেই বললুম, "চিন্‌তে পার্‌বেন না বোধ হয়, কিন্তু আমরা এক গাছেরই পাখী—ঐ উপর-ডালে থাকি। আজ আপনাকেও একবার উপরে উঠ্‌তে হবে, বিশেষ দরকার!"

"তা বেশ তো, চলুন, যাচ্ছি।" বলে লোকটা লণ্ঠনের পল্‌তে কমিয়ে দিয়ে ঘরের এক কোণে সেটাকে রেখে, ছাতিটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলো; তারপর ঘরে একটা কুলুপ লাগিয়ে সাত বার টেনে দেখে আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠল। সিঁড়িতে কেবল একবার জান্‌তে চাইলে যে, তার মত একজন অপদার্থ লোককে আজ আমাদের কি দরকার হতে পারে উপরে!—আমি তখন আসল ব্যাপারটা তার কাছে ভাঙ্‌লুম না। শুধু গম্ভীরভাবে বল্‌লুম, "তিনটী লোক আজ এখানে বড়ই বিপদে পড়েছে—এমন মুস্কিলে তারা আর কখনো ঠেকেনি! আপনি অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করলেই তারা এ যাত্রা উদ্ধার পেতে পারে!"

লোকটী একটুও আশ্চর্য্য হ'ল না, বেশ সহজভাবেই বললে, "বেশ! আমার দ্বারা তাঁদের যতটুকু উপকার হতে পারে, আমি তা কর্‌তে প্রস্তুত।"

ঘরে ঢুকতেই—"এই যে, আসুন, আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্!" ইত্যাদি, এমন একটা সমস্বরে সকল রকমের অভ্যর্থনা হ'ল যে লোকটা একটু ভড়্‌কে গেল! বিনয় তাসের প্যাকেটটা বার-দুই সশব্দে কাটিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "মহাশয়ের নাম?"

ভদ্রলোক ছাতাটি না মুড়ে খোলা অবস্থাতেই বারান্দার এক কোণে রেখে ঘরের ভিতরে এসে বললে, "আজ্ঞে; আমার নাম শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—!"

"ওঃ! ব্রাহ্মণ! প্রণাম হই—" বলে বিনয় তাসের প্যাকেট-শুদ্ধ হাত যোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লে, "বসুন মশাই, আপনার সঙ্গে আলাপ করে আজ বড় খুসি হওয়া গেল।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "বসোনা হে প্রবোধ, ফকির বাবুকে যখন পাওয়া গেছে, তখন আর দেরী করছ কেন? এক হাত আরম্ভ করা যাক্!" তাস জোড়াটা আর দু'চারবার জোরে ভেঁজে নিয়ে পাশের লোকের কাছে এগিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, "কাটাও তো খুড়ো! তোমার হাত কাটে কেমন, দেখা যাক্!"

ফকিরবাবু সবে আসরে নাম্‌ছিলেন, ব্যাপার দেখে হঠাৎ শশব্যস্তে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, "মাপ করবেন মশাই—আমার খেলাধুলো

করবার মোটেই সময় নেই!" বলেই তড়্ তড়্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে কোণ থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে হন্ হন্ করে নীচের নেমে গেলেন! আমরা সব অবাক্ হয়ে হ্যাল হ্যাল করে খানিকক্ষণ যে যার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম!

বিনয় বল্লে, "আচ্ছা লোক তো তোমার এই ফকির বাবুটী!—কি অভদ্র, দেখেছো?"

খুড়ো বললে, "বেজায় বেরসিক!" সেদিন থেকে এই লোকটীর উপর আমাদের অশ্রদ্ধা একেবারে দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

৩

শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রত্যেক বছর আমাদের মেসে চাঁদা তুলে খুব ঘটা করে সরস্বতী পূজা হতো। সে বছরও সরস্বতী পূজোর ক'দিন আগে থাকৃতে মেসের এই বার্ষিক উৎসবের আয়োজন সুরু হ'য়ে গেল। চাঁদার খাতা নিয়ে প্রত্যেকের ঘরে আমরা জনকতক ডাকাতের মতো গিয়ে পড়ে নাম সই করিয়ে নিতে লাগলুম।

সব-শেষে আমরা যখন ফকির বাবুর ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লুম, তিনি তখন হারিকেন লণ্ঠনটা একটা উপুড়-করা খালি বিস্কুটের টিনের উপর বসিয়ে চশমা-চোখে একতাড়া কাগজ নিয়ে কি লিখছিলেন,—আমাদের এই অতর্কিত আক্রমণে আশ্চর্য্য হয়ে চশমাটি কপালের উপর তুলে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি তখন চাঁদার খাতাখানা তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললুম—"নিন্, লক্ষ্মী ছেলের মতন দশটি টাকা সই ক'রে দিন্‌ত।"

ফকিরবাবু বারকতক খাতাখানার দিকে, বারকতক আমাদের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের টাকা?"

তিন-চার জনে বলে উঠলুম, "চাঁদার!"

তারপর কিসের চাঁদা সেটা যখন তিনি স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন, তখন তাঁকে বেশ করে বুঝিয়ে দেওয়ায় তিনি সমস্ত শুনে একটু যেন আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "এত টাকা আপনারা সমস্তই তুলতে পারছেন এই পূজোর নাম করে?—এ কি সেদিন সব খরচ হবে?"

এই প্রশ্ন শুনে আমাদের মধ্যে দু'এক জন একটু চটে গেল। তারা মনে করলে, চাঁদা না দেবার মতলবে ফকির বাবু বোধ হয় তাদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তাই তারা একটু অভদ্রভাবেই জবাব দিলে—"সব খরচ হবে না তো কি কিছু-কিছু আমরা মনি-অর্ডার করে বাড়ী পাঠাবো!"

ফকিরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না—আমি তা বলচিনে—আমি বল্‌ছিলুম পূজোটাতে যে খরচটুকু না করলে নয়—তাতেই সেরে কিছু বাঁচাতে পারা যায় না কি?"

আমরা জানতে চাইলুম, "কেন! তাতে কি হবে?"

"যদি কিছু বাঁচাতে পারা যেতো, তাহ'লে সেটা অন্য কাজে লাগাতে পারতেন!"

"কি রকম শুনি?"

"এই ধরুন—কোন একটা ছোট-খাটো Charitable Dispensary খুলে দেওয়া বা এমনিধারা কিছু—"

"মাপ করবেন মশায়। আমাদের এ দেবতার নামে তোলা টাকা, এর একটি পয়সাও অন্য-কিছুতে খরচ করতে পার্ব্ব না।

এই ধরুননা কেন, শুধু প্রতিমাখানাই নেবে পঁচিশ টাকা—তার পিছনে সিনারী দেওয়া থাকবে কিনা!—নীল সরোবরে বিকশিত শ্বেত পদ্মের পাপড়ির উপর প্রলম্বিত-কুন্তলা দেবী বসে বীণা বাজাচ্ছেন, এ-রকম ঠাকুরের দাম ঢের। তারপর ধরুন পুজোর খরচ আছে। নৈবিদ্যি আছে, দক্ষিণে আছে, তাতেও প্রায় গোটা পঁচিশ টাকা পড়ে যাবে। তা ছাড়া এই মেসশুদ্ধ লোক, বন্ধু-বান্ধব, নিমন্ত্রিত অভ্যাগত, এদের সব খাওয়ার একটা মোটা খরচ আছে—তারপর ঢুলি-বিদেয়—বিসর্জ্জনের খরচ, কুলি-ভাড়া, নৌকো-ভাড়া, ব্যাণ্ড, এসেটিলিন—"

ফকিরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "বুঝেচি। মাপ কর্ব্বেন, আপনাদের অনুরোধ আমি রাখতে পার্ব্বনা। বাজে পয়সা নষ্ট করবার মতো অবস্থা আমার মোটেই নয়। আপনাদের পূজোয় আমি একটি পয়সাও দেব না!"

আমরা সব তখন রাগে-অপমানে গর্‌গর্‌ করতে করতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। ব্যাপার শুনে মেসে একটা সোরগোল পড়ে গেল। ক্রমে জানতে পারা গেল যে লোকটা যে রকম দুরবস্থার ছুতো জানায়, বাস্তবিকই তার অতটা দুরবস্থা নয়—বরং বেশ স্বচ্ছল অবস্থাই বলতে হবে,—কেন না মাস গেলে নানা কাজে সে প্রায় শ' দেড়েক টাকা উপায় করে—সকালে বড়বাজারে এক মাড়োয়ারীর তাগাদায় বেরোয়, দুপুর বেলায় দালালির চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়, বিকেল-নাগাদ কলুটোলায় দিল্লীওয়ালা না কাদের দোকানে বসে, সন্ধ্যার মুখে কতকগুলো মুদী-মহাজনের খাতাপত্র লিখে দিয়ে বাড়ী ফেরে, আবার রাত্রে ঘরে বসে আদালতের মামলা-মকর্দ্দমার কাগজ-পত্র দলীল-দস্তাবেজ সব নকল করে দেয়। দালালি কাজটায় নাকি বেশ থোক-থাক্ মোটা টাকা মারে!--তবু কিনা মশায়,—এই বার্ষিক সরস্বতী পূজোয় একপয়সা চাঁদা দিতে সর্ত্ত পুরলো না—!

শুনে বিনয় বল্‌লে, "ওটা ছোট লোক! কিপ্টের শিরোমণি!—অত টাকা রোজগার করেও যে ও-রকম mean style-এ থাকে, তার কাছ থেকে চাঁদার আশা করাই তোমাদের অন্যায় হয়েছে! প্রবোধ যা মনে করেছিল এখন দেখচি সেইটেই ঠিক্! ও ঘরটায় আজও আবর্জ্জনাই পোরা রয়েছে!"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেসে রটে গেল যে অত বড় কঞ্জুষ কৃপণ চশম-খোর চামার আর দুটি নেই! সেদিন থেকে ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তাও আমরা বন্ধ করে দিলুম। সকলের চেয়ে জোর গলায় আমিই ফকির চাটুজ্যেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলুম যে ওর মুখ দেখলেও মহাপাপ!

৪

সে বছর কলকাতায় বসন্ত রোগটা বেজায় চেগে উঠলো। প্রথমেই আমাদের মেসের ঝী জগ, তারপর দু'একজন বোর্ডার শীতলা মায়ের অযাচিত অসীম অনুগ্রহে একসঙ্গে শয্যা নিলে, আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ঝী-মাগী, আর একজন বোর্ডার যখন ঐ রোগেই মারা পড়লো, তখন হরু ঠাকুরের মেস ছেড়ে বাবুরা সব যে-যার একে একে সরে পড়তে লাগলেন। আমিও পালাবো-পালাবো মনে করছিলুম, জিনিষ-পত্র গুছিয়ে গাছিয়ে বেঁধে ফেলেছি,

সব ঠিক ঠাক্—কাল সকালে উঠেই চম্পট দেবো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যাওয়া আর আমার ঘটে উঠ্‌লো না,—সকালে যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, গলার ভিতরটা বিষফোড়ার মত টাটিয়ে উঠেছে—ভীষণ জ্বরে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে!—চুপটি করে সমস্ত দিন বিছানায় শুয়ে পড়ে রইলুম।

এমনি অসহায় অবস্থায় সমস্ত দিন কেটে গেল; রাত্রি আর কাটে না,—সে কি যন্ত্রণা! সর্ব্বাঙ্গে যেন তপ্ত ছুঁচ বিঁধ্‌চে—হাত বুলিয়ে তখন অনুভব করলুম, বেশ ডুমো ডুমো হয়ে আমার সমস্ত মুখখানা একেবারে ভরে গেছে! প্রাণ যেন উড়ে গেল! বাসার সঙ্গী,যারা আজ এই ক'দিন হ'ল মায়ের অনুগ্রহে অসময়ে মারা গেছে,তারাই যেন আজ চারিদিক থেকে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে আমার দুর্দ্দশা দেখে প্রেতের মত অট্টহাসি হাসতে লাগ্‌ল! তাদের সেই দীর্ঘতর প্রেতমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে গুটির কালো কালো গভীর ক্ষত-চিহ্নগুলো জীবনের ওপারে গিয়ে যেন আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছিল! আমার এটা বেশ মনে আছে যে, আমি ভয়ে আঁৎকে উঠে পরিত্রাহি চীৎকার করতে সুরু করে দিলুম! তারপর আর আমার কিছু মনে পড়ে না।

যেদিন চোখ চাইলুম, দেখি, ফকিরবাবু এক আকুল আগ্রহ-দৃষ্টি নিয়ে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে স্থির হয়ে চেয়ে আছেন। আমাকে চোখ মেল্‌তে দেখে একটা যেন আশাতীত আনন্দ-ভাতি তাঁর সমস্ত মুখ-খানায় সুস্পষ্ট ফুটে উঠ্‌লো,—ওধারে এধারে চোখ ফিরিয়ে দেখি, ঘরের ভিতর একজন সাহেব ডাক্তার, একজন বাঙালী ডাক্তার, আর একজন নার্স! পাশের একখানা টীপয়ে নানারকম্ ওষুধপত্র। শুনলুম, আজ তিন দিন আমি অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছি। বাসায় আর কেউ নেই, সবাই পালিয়েছে। ফকির বাবু একলা কেবল আমাকে আগ্‌লে নিয়ে এই শ্মশান-পুরী সরগরম করে বসে আছেন। তাঁর নির্ভয় হৃদয়ের অপরিসীম সহানুভূতি আর অক্লান্ত সেবা-যত্নে আমি সে যাত্রা বেঁচে গেলুম। আমার জন্যে অকারণ অর্থব্যয় করে তাঁর এই সমারোহ-চিকিৎসার ব্যবস্থা সার্থক হল।

প্রায় মাসখানেক পরে আমি যখন বেশ সেরে উঠলুম,—ফকির বাবুও তখন উপরে ওঠা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। ইতি-মধ্যে দেশে চিঠি লিখে কিছু টাকা আনিয়ে, আমি একদিন ফকির বাবুর কাছে গিয়ে বললুম, "দাদা, প্রাণ দিয়েছ তুমি, সে ঋণ শোধবার নয়, জানি, কিন্তু টাকাটা তোমায় নিতেই হবে!"

ফকিরদা হেসে বললেন, "থাক! পাগলামি করতে হবে না। ও টাকা এখন তোমার কাছেই থাক্, আমার যখন দরকার হবে, নেবো।"

অনেক সাধ্য-সাধনা করেও ফকিরদাকে কোনমতে টাকা নেওয়ায় রাজি করাতে পারলুম না; অগত্যা টাকা আমার কাছেই রইল।

দু'মাস না যেতে যেতে হরুঠাকুর আবার দেশ থেকে ফিরে এল। মেসের খালি ঘর-গুলোও একে একে নতুন লোক এসে অধিকার

করে ফেললে। আমি কিন্তু সিঁড়ির নীচের ঐ সবার-কাছ-থেকে-পালিয়ে-থাকা নিঃসঙ্গ স্বল্পভাষী লোকটীর যে বিশাল হৃদয় আর উদার অন্তরের পরিচয় পেয়েছিলুম, হোক্ সে কৃপণ, হোক্ সে কঞ্জুষ,তবু তার কাছ থেকে কিছুতেই আর নিজেকে দূরে রাখতে পারলুম না। সন্ধ্যার পর কখন ফকিরদা ফিরবে, উদ্‌গ্রীব হয়ে তার অপেক্ষা করতুম। ফকিরদা এলেই তাঁর সঙ্গে তাঁর সেই সিঁড়ির নীচের খোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকতুম। ফকির দাকে কত সাধাসাধি করেও উপরে উঠতে রাজি করাতে পারিনি—কাজেই আমাকেই নীচেয় নামতে হয়েছিল।

একটা কথা কিন্তু আমি কিছুতেই এখনও ভেবে ঠিক করতে পারিনি যে, ফকিরদার মত একজন মিতব্যয়ী সঞ্চয়ী লোক—অর্থাৎ আমরা যাকে স্পষ্ট ভাষায় কৃপণ বলি, তিনি—হঠাৎ আমার মত একজন অনাত্মীয় নিঃসম্পর্কীয় লোকের ব্যারামের চিকিৎসায় একেবারে মুক্তহস্ত হ'য়ে এতগুলো টাকা খরচ করে ফেললেন কেন? আর সে টাকা সমস্তই আমি তাঁকে ফেরৎ দেবার জন্যে এত পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও, তিনি তার একটি পয়সাও ফেরৎ নিলেন না, এরই বা মানে কি! এটা আমার কাছে একটা রহস্যের মতই দুর্জ্ঞেয় হয়ে রইল!

রোজ সন্ধ্যার পর তাড়া তাড়া কাগজ বগলে করে ফকিরদা এসে ঘরের ভিতর ঢুকতেন, আর হারিকেন আলোটী জ্বেলে মুখ টিপে বসে তার নকল করে যেতেন। আমিও চুপটি করে তাঁর কাছে বসে হয় বাংলা কাগজ,নয় একখানা উপন্যাস পড়তুম, মাঝে মাঝে দু'এক ছিলিম তামাক খেতুম, আর—কচিৎ দু'টো-একটা কথা কইতুম। শেষটা কিন্তু রোজই তাঁর সেই সতরঞ্চির উপর পড়ে তোফা নাক ডাকাতে সুরু ক'রে দিতুম, যতক্ষণ না হরু ঠাকুর এসে—খাবার হয়েছে, খাবেন, আসুন—বলে তাড়া দিত! খেয়ে উঠেও ফকিরদার ঘরে বসে পান চিবুতে চিবুতে একছিলিম তামাক খেয়ে তবে আমি উপরে শুতে যেতুম। ব্যারাম থেকে উঠে অবধি এই ছিল আমার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। আর ফকিরদা খেয়ে এসেই আবার হারিকেনে-কমিয়ে-রাখা পল্‌তেটা বাড়িয়ে দিয়ে লিখতে বসে যেতেন!

একদিন জিজ্ঞাসা করলুম—"আচ্ছা ফকিরদা, তুমি এত খাটো কিসের জন্যে? তোমার ঘাড়ের উপর বুঝি একটা বৃহৎ পরিবারের অন্নসংস্থানের ভার?"

ফকিরদা লিখ্‌তে লিখ্‌তে ঘাড় না তুলেই একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, "পরিবারের মধ্যে আমি একা, প্রবোধ!"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "সে কি! তুমি কি তবে বে-থা করনি?"

"করেছিলুম বই কি!"

"তবে?"

"সে সব পাট চুকে গেছে!"

"ছেলে-পুলে ছিল না?"

"খুব ছিল!"

"তারা কোথায়?"

ফকিরদা কলমের ডগাটা দিয়ে কড়ি-কাঠের দিকে ইঙ্গিত করলেন; বুঝ্‌তে পারলুম, তারা সব স্বর্গে! সেদিন আর বেশী কিছু তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। লোকটিকে

যে চরম শোকের নিষ্ঠুর বজ্র বারবার আঘাত করে—একেবারে পিষে দিয়ে গেছে, তা তার মুখের ভাব দেখে সে দুঃসংবাদ যেন তৎক্ষণাৎ আমার বুকের ভিতর একেবারে সেঁধিয়ে গেল!

৫

ফকিরদাকে রোজ অনেক রাত পর্য্যন্ত এই রকম পরিশ্রম করতে দেখে একদিন আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে ফেললুম, "আচ্ছা ফকিরদা, তোমার তো ভাই খাবার লোক কেউই নেই,—তবে তুমি রোজগারের চেষ্টায় সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এমন ক'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শরীরটাকে মাটি করছো কেন, বল তো? আর এত রোজগার করেও এমন দৈন্যদশায় থাকো কেন, তাও বল? সেইজন্যেই তো লোকে তোমাকে কৃপণ বলে!"

ফকির দা হাস্তে লাগলো। এ সেই শোকের করুণ, কাতর, বেদনায় আর্ত্ত মলিন, বিবর্ণ হাসি। হাস্তে হাস্তে তিনি বল্লেন, "আছে রে আছে, অনেক কারণ আছে—তার সঙ্গতি যেটুকু তা খুঁজে দেখবার মোটেই অপেক্ষা রাখি না। সে সব চোখের জলে ভেজা—বুকের রক্তে রাঙানো ইতিকথা। যদি সময় হয় তো আর একদিন শোনাবো, আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখো প্রবোধ, যে, আমার যারা নিকটতম ছিল, তারা এম্নি ঘরেই শুয়ে-বসে, এম্নি খাওয়াই খেয়ে-দেয়ে হাসিমুখে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে! তাদের আমি কখনো এর চেয়ে সুখে রাখ্তে পারি নি!"

৬

আজ ক'দিন থেকে ফকিরদার ঘরে তালা-চাবি লাগানো রয়েছে। ফকিরদা যে কোথায় উধাও হয়েছে, কেউ জানে না। হরু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে সে বিরক্ত হ'য়ে বলে ওঠে, "কি জানি বাবু! তিনি কি আমায় বলে গেছেন? এমন তো প্রায়ই মাঝে মাঝে তিনি ডুব মারেন। এক হপ্তা, দু'হপ্তা, কখন-কখন তিন হপ্তাও কেটে যায়, তাঁর ফিরতে! তা আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এলেই তো জান্‌তে পারবেন।"

এ কথার পর আর হরুঠাকুরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা চললো না। কিন্তু ফকিরদার জন্যে মনটা বড্ডই চঞ্চল হয়ে থাক্‌তো। থেকে-থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় ঝুঁকে পড়ে দেখতুম—দরজায় এখনও সেই প্রকাণ্ড তালাটা লাগানো আছে!

একদিন সন্ধ্যার পর একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে এসে বাসায় ঢুকচি, দেখি, সদর থেকে উঠানে যাবার যে সরু গলি-পথটা—তারই মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে বাঁ হাতের উপর মাথা রেখে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শুয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই ধড় মড় করে উঠে পড়ে বুড়ী জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ বাবা, তোমারই নাম কি ফকির চন্দর?"

বুঝলুম, বুড়ী ফকিরদাকে খুঁজচে। জানতে চাইলুম—"কেন, কি দরকার?"

বুড়ী একেবারে দণ্ডবৎ হয়ে আমায় একটা নমস্কার করে বললে, "তোমার নাম শুনে বাবা ছুটে আস্‌চি, তুমি গরীবের মা-বাপ। শুনলুম, আমাদের কাদী কামারণীর শিবরাত্রির শল্‌তে ঐ ছিদাম ছোঁড়াকে তুমি নাকি যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছো, আমার গুপি-নাথকেও, বাবা, তোমাকে বাঁচাতেই হবে।"

আশ্চর্য্য হয়ে আমি বললুম, "সে কি বুড়ী! আমি তো ডাক্তার নই, আমি তোর গুপীনাথকে বাঁচাবো কি করে?"

বুড়ী আমার হাতখানা দু'হাতে চেপে ধরে বললে, "আমি সব শুনেচি, বাবা! আমায় তুমি ভোলাতে পার্ব্বে না। তোমার পায়ের ধুলো পেলে গুপীনাথের আমার ডাক্তার-কবরেজের দরকার হবে না। একবার দয়া ক'রে আমার কুঁড়েয় পা দেবে চল, লক্ষী বাবা আমার—"

বিদ্যুতের ঝল্‌কানির মতো আমার বুকের ভিতর দিয়ে চিক্‌মিক্ করে চম্‌কে গেলো, আমার সেই রোগ-শয্যার বিচিত্র চিত্রখানা! সংক্রামক মহামারীর ভয়ে পরিত্যক্ত জনমানবশূন্য বাড়ীর একখানা ঘরের ভিতর একলা আমাকে নিয়ে যে লোকটি মরণের সঙ্গে দিবারাত্র অবহেলায় যুদ্ধ করেছে, জলের মতো তার মুখ-দিয়ে-রক্ত-ওঠা পয়সা ব্যয় করে চিকিৎসার চূড়ান্ত করেছে, এ অভাগিনী তার রুগ্ন সন্তানকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যে আজ তারই শরণাপন্ন হতে এসেছে। ফকিরদা থাক্‌লে নিশ্চয়ই ছুটে গিয়ে তাকে আশ্রয়ে টেনে নিতো! আমি আর দ্বিরুক্তি না করে বল্লেম, "চল মা, তোমার ছেলের কি হয়েছে, দেখে আসি।"

গুপীনাথের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। সুযোগ্য চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আর স্নেহময়ী জননীর সেবা-যত্নে গুপীনাথ আরাম হয়ে উঠে যেদিন পথ্য করলে, বুড়ী চোখের জলে আমার পা দুটোকে সেদিন ভিজিয়ে দিয়ে বললে, "বাবা ফকিরনাথ, তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা, তোমার দয়াতেই আমার গুপীনাথকে আমি ফিরে পেলুম!"

বুড়ীকে হাত ধরে তুলে এইবার তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, আমি ফকিরনাথ নই, তাঁর বন্ধু। ফকিরদা আজ তিন হপ্তার উপর হোলো কোথায় চলে গেছেন, কেউ জানে না।

বুড়ী বললে, "আমি যে দিন ফকির বাবার সন্ধানে যাই, কাদী কামারণী আমায় বলেছিল বটে যে, বাবা এখন কলকাতায় নেই, দেশে হাসপাতাল হবে, তাই সেখানে দেখা-শুনো করতে গেছেন, ওদের এক গাঁয়েই বাড়ী কি না!"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, "তারা এখন কোথায় থাকে গুপীর মা?"

গুপীর মা, আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ঐ যে বটগাছটা দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওইখানে ঐ মোড়ের ব্যাঁকের মুখে ওদের বাসা। ও মা, এই যে নাম করতে না করতেই এসে হাজির। কি দিদি, কেমন আছিস্? ছিদাম ভালো আছে তো?"

কাদুর কাঁকালে একটা বাজারের টুকরি ছিল, সেটাকে নামিয়ে রেখে কলে হাত পা ধুতে ধুতে সে বল্‌লে, "আমাদের আর থাকা-থাকি দিদি! অম্‌নি চলে যাচ্ছে এক রকম! তোমার গুপীনাথের খবর কি, বল! ফকির বাবার দেখা পেয়েছিলে?"

বুড়ী গুপীনাথের রোগের, চিকিৎসার আর আরামের সবিস্তার বর্ণনা করে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শতমুখে আমার প্রশংসা ক'রে আমাকে দেখিয়ে বললে, "কপাল-দোষে ফকির বাবার দেখা পাইনি বটে, কিন্তু এই বাবার দয়াতেই এবার আমার গুপীনাথকে আমি ফিরে পেয়েচি।" কাদু একটা বিস্মিত অথচ সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে

চাইতেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কি ফকির বাবুর দেশের লোক ?"

কাহু ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ বাবা, কিন্তু দেশের লোক যদি নাও হতুম, তা হলেও তিনি আমার যে করুনাটা করেছেন তার চেয়ে যে একটুও কম করতেন না, এ আমি বেশ জোর করে বল্‌তে পারি।"

আমি একটু কৃত্রিম বিশ্বাসের হাসি হেসে বল্‌লুম, "পাগল হয়েছো, আজ কাল কি তা কেউ করে থাকে !"

কাহু ঐই কথা শুনে একেবারে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বল্‌তে লাগলো, "আর কেউ করুক আর না করুক, আমাদের ফকির বাবা যেদিন থেকে তাঁর ঘর-আলো-করা লক্ষ্মী-প্রতিমের মতো বউকে আর তাঁর চাঁদপানা ছেলেমেয়েগুলোকে তিন দিনের ওলাউঠোয় শিঙুড়ের শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেচে, সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছে যে, বিনা-চিকিৎসায় আর কাউকে সে মরতে দেবে না !"

ফকিরদার জীবনের এই বেদনাতুর বিষাদের রহস্যাবৃত দিকটা এমন সুস্পষ্ট হয়ে আর কখনো আমার চোখের সাম্‌নে পড়েনি —আজ যেমন ভাবে সেটা ধরা পড়ল ! তবু আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—যদিও আমার গলার স্বর তখন ভেরে এসেছে,—"ফকিরবাবু স্ত্রী-পুত্র বুঝি সব বিনা-চিকিৎসায় মারা গেছে ?"

কাহু এবার হেসেঁ ফেল্‌লে ! আমার অজ্ঞতার পরিমাণ দেখে এ যেন তার কৃপা-মিশ্রিত অবজ্ঞার হাসি !—হাসতে হাসতে সে বললে, "নাও কথা !—সে কি আর এই কলকাতার সহর বাবা,—সেখানে ডাক্তার-কবরেজ মেলেই না ! তিরিশ কোশের ভেতরও একটা হাসপাতাল নেই ! তাইতো আমাদের ফকির বাবা তাঁর যথা-সর্ব্বস্ব দিয়ে দেশে একটা হাসপাতাল বানিয়ে দিচ্ছেন !"

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

ভারত ইতিহাসের ইংরাজ লেখক

ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ যুগের অনেক কাহিনী এখনও ইতিহাসের আলোক-পাতের অপেক্ষা করিতেছে। তার কারণ এই যে এই যুগের যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা যেমন ঐতিহাসিক উপাদান প্রচুর পাইয়াছেন, তেমনই আর-এক বিষয়ে তাঁরা প্রাচীন ঐতিহাসিকদের চেয়ে অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন বিস্তর। যে কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা কিম্বা মন্তব্য পাঠ করিলেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব সহজেই ধরা পড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সকল ইংরাজ লেখক এই যুগের কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁরা প্রায়ই ঐতিহাসিক হিসাবে না লিখিয়া জীবন-চরিত লেখক হিসাবেই তাহা লিখিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে যে অধ্যায়ের আলোচনা করিব, তাহার সম্বন্ধে নামজাদা লেখকের কোন অভাব নাই। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তার ভিত্তি

দৃঢ় করিয়াছিলেন এবং ক্লাইবের রাজত্বের দ্বিত্বশাসনের অর্থাৎ 'dyarchy'র অনেক দোষ সংশোধন করিয়া ভারত-শাসনকে সভ্য সমাজের অনেকটা উপযোগী করিয়াছিলেন। এই সব কারণে তিনি ইংরাজ জীবন-চরিত-লেখকদের নিকট এবং এই হতভাগ্য দেশে সাধারণ স্কুলবুক কমিটির পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা-দিগের নিকট প্রচুর প্রশংসা পাইয়াছেন। ফরেষ্ট তাঁর Administration of Warren Hastings নামক গ্রন্থে এবং কাপ্তেন ট্রটার তাঁর Warren Hastings গ্রন্থে ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল বা বড়লাট হেষ্টিংসের গুণাবলী যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁর স্থান ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেট বা নেপোলিয়নের পার্শ্বেই হওয়া উচিত। ফরেষ্ট তাঁর Selections from the State Papers preserved in the Foreign Department গ্রন্থে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন-কালের মূল দলিল,সনদ ও চিঠি-পত্র ছাপিয়াছেন। তাহাতে আধুনিক কালে ঐতিহাসিক গবেষণার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকায় ফরেষ্ট আপনার যেটুকু অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেক সময় তাঁহার State Papers-এ প্রকাশিত কাগজপত্রের সহিত মিলাইতে গেলে ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাঁর মত বা ঐতি-হাসিক ঘটনার বিবরণ যাহাই হউক, তাঁর এই তিন খণ্ড পুস্তক ঐ যুগের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য্য গ্রন্থ। স্যর ফিট্জেমস্ ষ্টিফেন অনেক দিন ভারতবর্ষে চাকরী করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের অন্নে পরিপুষ্ট হইয়াও ভারত-বাসীর বিপক্ষে তাঁহার মজ্জাগত বিদ্বেষভাব একেবারে প্রশমিত হয় নাই। তিনি যে ভাবে তাঁর Story of Nuncoomar গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, হেষ্টিংস ও ইলাইজা ইম্পিকে একেবারে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক বলা যায় না। এ বিষয়ে ষ্ট্রাচির Rohilla War গ্রন্থ অনেক ভাল। তাঁর মতের সহিত আমাদের মতের মিল না হইতে পারে, তাঁর যুক্তি-তর্ক আমাদের বিচারবুদ্ধি গ্রহণ করিতে না পারুক, কিন্তু ঐতিহাসিকের যাহা প্রধান গুণ তাহা আমরা তাঁর গ্রন্থে দেখিতে পাই। তিনি হেষ্টিংসকে রোহিলাগণের সর্ব্বনাশ-সাধনের দোষ হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন কি রোহিল-খণ্ড যে অযোধ্যার নবাব-উজীর ইংরাজের সহায়তায় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহারও সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি একটী কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁর ন্যায়পরতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিকের মত হেষ্টিংসের সপক্ষে বিপক্ষে যাহা-কিছু ঐতিহাসিক মাল-মসলা আছে, সবই পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। নিজের মন্তব্য হেষ্টিংসের অনুকূলে যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পাঠক তাঁর নিজের মত গঠন করিবার যথেষ্ট উপাদান তাহাতে পায়; প্রতিকূল নজীর গোপন করিবার অভিযোগ লেখককে কেহ দিতে পারে না।

যে যুগের ঘটনা এই প্রবন্ধের বিষয়, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক এখনও দুর্লভ। একদিকে যেমন ফরেষ্ট,ট্রটার, ষ্ট্রাচি ও ষ্টীফেন; অন্যদিকে আবার বার্ক,মিল ও মেকলে। কত চরিতাখ্যায়ক হেষ্টিংসের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করিলেন, কত ঐতিহাসিক তাঁহার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ

করিলেন, কত টেক্‌ষ্ট্‌-বুক-কমিটী রাজভক্ত গ্রন্থকারের পুস্তক অনুমোদন করিল, কিন্তু হেষ্টিংসের কালিমা আর ইতিহাস হইতে কিছুতেই মুছিল না। তার প্রধান কারণ বার্কের তেজস্বিনী বক্তৃতা, মিলের অমর ইতিহাস এবং মেকলের হৃদয়গ্রাহী ভাষা। হেষ্টিংসের চরিতাখ্যায়ক গ্লীগ কত সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইলেন যে রোহিলা যুদ্ধে হেষ্টিংসের কোন শয়তানী মতলব ছিল না। হেষ্টিংস তাঁহার প্রভু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুবিধার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা লইয়া রোহিলখণ্ড জয় করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্য অযোধ্যার নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলাকে ধার দিয়াছিলেন। গ্লীগ খুব কাতরভাবেই বলিয়াছেন, "I really cannot see upon what grounds either of political or moral justce, this proposition deserved to be stigmatized as infamous." অর্থাৎ "রাজনীতি বা ন্যায়বিচার কোন দিক্ দিয়াই আমি বুঝিতে পারি না এই ব্যবস্থাকে কি ভাবে নিন্দনীয় বলা যাইতে পারে।"

মেকলে এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তার উপর মন্তব্য করিলেন—

"If we understand the meaning of words, it is infamous to commit a wicked action for hire, and it is wicked to engage in war withou provocation......The object of the Rohilla war was to deprive a large population who had never done as the least harm, of a good Government and to place them against their will under execrably bad one."

সোজা ভাষায় মেকলের টিপ্পনীর অর্থ এই যে "আমরা যদি কথার মানে বুঝি, তাহা হইলে মজুরী লইয়া একটা গর্হিত কাজ করা নিন্দনীয় এবং বিনা কারণে গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ করা গর্হিত কাজ···রোহিলা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল একটা বড় জাতি—যারা আমাদের কখনও কোন ক্ষতি করে নাই—তাদের সুন্দর শাসন ধ্বংস করিয়া একটা নিতান্ত জঘন্য শাসনের অধীনে তাহাদিগকে স্থাপন করা।"

কয়জন ইংরাজ বা ভারতবাসী—গ্লীগের গ্রন্থ পড়িয়া হেষ্টিংসকে বিচার করেন? মিল ও মেকলের রচনাবলী হেষ্টিংসের ললাটে চিরকলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছে। ইতিহাস-পাঠক মিলের কথাই সহজে গ্রাহ্য করেন। "Money was the motive to the eager passion for the ruin of the Rohillas অর্থাৎ অর্থলোভই রোহিলাদের সর্ব্বনাশ সাধনের তীব্র প্রচেষ্টার কারণ। সেইজন্য ষ্ট্রাচি ক্রোধে ও দুঃখে বিনাইয়া বিনাইয়া ঐতিহাসিকের ভাষায় বলিয়াছেন—

"Mill's account of the cicumstances attending the Treaty of 1772 between the Vizier and the Rohillas is very inaccurate·········· Mill's misrepresentations regarding the campaign of 1773 are more serious···The truth is that in this and in other instances, Mill has entirely misrepresented the facts

which were before him, and has deliberately suppressed the most important part of Sir Robert Barker's evidences. It is not pleasant to use such expressions, but no milder terms would convey the opinion that I hold. অর্থাৎ "উজীর এবং রোহিলাগণের মধ্যে ১৭৭২ সালের সন্ধি-ঘটিত ব্যাপারের মিল যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভ্রমসঙ্কুল। ১৭৭৩ সালের যুদ্ধের সম্বন্ধে মিল গুরুতর মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। এই বিষয়ে এবং অন্যান্য ব্যাপারে সত্য কথা এই যে মিল তাঁর সম্মুখে যে সব সত্য খবর ছিল, তার মিথ্যা বিবরণ দিয়াছেন এবং স্যর্ রবার্ট বার্কারের সাক্ষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া দিয়াছেন। এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা মোটেই সুখপ্রদ নহে, কিন্তু এর চেয়ে নরম ভাষা ব্যবহার করিলে আমার যা মত তাহা ঠিক বুঝানো যাইত না।"

ষ্ট্রাচি ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে মিলকে মিথ্যাবাদী বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, একটু ঘুরাইয়া জুয়াচোরও বলিয়াছেন। এখন ইতিহাস-পাঠকদের মধ্যে কেহ কি ষ্ট্রাচি বা গ্রীগের গ্রন্থ পড়িয়া মিল বা মেকলের সিদ্ধান্তকে সহজে অগ্রাহ্য করিবেন? যতদিন ইংরাজ জাতি বাঁচিবে ও ইংরাজী ভাষা থাকিবে,যুগে যুগে দেশে দেশে নর-নারী মিল-মেকলের গ্রন্থ পড়িয়াই ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসন-কালের বিচার করিবে। সেইটাই একপক্ষে হেষ্টিংসের ও তাঁহার চরিত-আখ্যায়কদের বিশেষ দুর্ভাগ্য।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গরীবের দাবী

দীন সে কেন ধনীর দ্বারে
বল্‌বে কেঁদে—দাও?
কোন্ সাহসে বলবে ধনী—
'বেরোও, ভাগো, যাও!'
এক ধরাতে জন্মেছে সে,
যেম্নি আলো, হাওয়া,
অন্ন এবং অর্থও যে
তেমনি তারি পাওয়া।
ফাঁকি দিয়ে লক্ষ জনে
ধনী জমায় ধন,
দুঃখী কণা চাইতে এলে
করে প্রবঞ্চন!

পরের মুখের অন্ন কেড়ে
ধনীর জারিজুরি,
পরের ঘরে সিঁদ কেটে সে
কর্‌ছে বাহাদুরি!

* * *

ভিক্ষুক যে নয়ত হেয়,
সেও ত খাঁটি প্রাণ,
ঘৃণায় তারে গর্ব্বী ধনী
কর্‌বে অপমান?
ধনী, তোর ঐ অর্থ 'পরে
দুখীর আছে জোর,

লুটিস্ কেবল জমিয়ে রাখিস্
কিসের দাবী তোর ?
দয়া কিসের, দান বা কিসের ?—
পাওনা দিবি যে !—
দুঃখী এল তোর দ্বারেতে,
ভাগ্য মেনে নে !

সে এল না চাইতে কিছু
এল সে তার নিতে ;
তাড়িয়ে দিবি কোন্ সাহসে
হবেই তোরে দিতে !

* * *

ধনীরে, তুই বড় কিসের ?
ছোট বলিস্ কারে ?
দীনের পরাণ নয় মহীয়ান ?—
জিন্‌তে তোরে পারে !
ভিখারী সে দেব্‌তা এল—
আস্‌ছে দ্বারে যে বা,
অন্যায়ে তোর জমানো ধন
কর্ ন্যায়েতে সেবা !
প্রবল ধনী, লুট্‌লি প্রচুর,
কর্‌লি প্রবঞ্চনা ;
চুরির মুখে লজ্জা নাহি ?—
দেখাস্ বীরপনা !

* *

সার্ ধনীকে চুরির মালে
লুট্ করে দে ফেলে,
লক্ষ পেটের অন্ন যাহা
লক্ষে দে তা ঢেলে' ।
নেইক ধনী, সবাই সমান,
ধনীরে কর্ দীন,
বিলিয়ে দিয়ে অর্থ তারি
চুকিয়ে দে সব ঋণ !
দুঃখী যে বা হীন কেন সে ?
দাঁড়াবে সে বলী,
যেথায় রবে গর্ব্বী ধনী
যাবে রে তায় দলি' ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ।

অবতার

১১

এই সকল ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে, অলীক কৌণ্ট প্রকৃত কৌণ্টের নিকট হইতে অক্টেভের শিলমোহরে বন্ধ-করা এক পত্র পাইল।

হতভাগ্য অধিকারচ্যুত ব্যক্তির উহা ছাড়া আর কোন শিল-মোহর ছিল না। ইহার পরিণাম অদ্ভুত হইল। স্বকীয় কুলচিহ্নাঙ্কিত শিল-মোহর ভাঙ্গিয়া কৌণ্ট দেহধারী অক্টেভ পত্রখানা পাঠ করিল। বাধো বাধো হাতের লেখা ; মনে হয় নিজের হাতের লেখা নয়, আর কেহ লিখিয়া দিয়াছে। কেননা, অক্টেভের আঙ্গুল দিয়া লেখা, কৌণ্ট ওলাফের অভ্যাস ছিল না। পত্রে এই কথাগুলি লেখা ছিল :—

"কতকগুলা অভাবনীয় ঘটনার পাকচক্রে বাধ্য হইয়া আমি এমন একটা কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে যখন

হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কেহ কখন করে নাই। আমি নিজেকে নিজেই লিখিতেছি। এবং এই পত্রের ঠিকানার উপর যে নাম দিয়াছি তাহা আমারই নাম,—যে নামটি তুমি আমার ব্যক্তিত্বের সহিত এক সঙ্গে চুরি করিয়াছ। আমি কাহার কূট চক্রান্তের কবলে পড়িয়াছি, কাহার প্রসারিত মায়াজালের ফাঁদে পা দিয়াছি, তাহা আমি জানি না—তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি যদি ভীরু কাপুরুষ না হও, তাহা হইলে আমার পিস্তলের গুলি কিংবা আমার অসির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তোমাকে এই গুপ্ত কথা সম্বন্ধে এমন এক স্থানে জিজ্ঞাসা করিবে, যেখানে কি সৎ কি অসৎ সকল লোকেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। আগামী কল্য আমাদের মধ্যে একজনকে আকাশের আলোক দর্শনে চিরকালের মত বঞ্চিত হইতে হইবে। এখন আমাদের দুজনের পক্ষে এই বিশাল জগৎটা অতীব সংকীর্ণ ঃ—তোমার প্রতারক আত্মা যে শরীরে বাস করিতেছে, আমার সেই শরীরকে আমি বধ করব, অথবা যে শরীরে আমার ক্রুদ্ধ আত্মা আবদ্ধ রয়েছে, তোমার সেই শরীরকে তুমি বধ করবে।—আমাকে পাগল বলিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিও না—আমি ন্যায়সঙ্গত কাজ করিতে ভয় পাইব না ; ভদ্রজনোচিত শিষ্টতার সহিত, রাজদূত-সুলভ কৌশলের সহিত, তোমাকে আমি অপমান করিব! কৌণ্ট ওলাফ-লাবিন্স্কি অক্টেভের চক্ষুশূল হইতে পারে, আর প্রতিদিনই ত অপেরা হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে গমন করা হয় ; আশা করি, আমার এই কথাগুলা অস্পষ্ট হইলেও তোমার নিকট একটুও অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। আর এক কথা,—তোমার সাক্ষীগণের সহিত আমার সাক্ষীগণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাল, স্থান ও নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বোঝাপড়া করিয়া লইবে।"

এই চিঠিখানা অক্টেভকে বিষম মুস্কিলে ফেলিল। অক্টেভ কৌণ্টের এই আহ্বান-পত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, অথচ নিজের সহিত নিজে যুদ্ধ করিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি হইল না,—কারণ, এখনো তাহার আত্মার পুরাতন আবরণটির প্রতি কতকটা মমতা ছিল। একটা ভয়ানক অপমান অত্যাচারের দরুণ বাধ্য হইয়া এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, মনে করিয়া অক্টেভ এই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিল। যদিও ইচ্ছা করিলে অক্টেভ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাগল সাবাস্ত করিয়া, তাহার হাতে হাত-কড়ি লাগাইয়া তাহাকে যুদ্ধে বিরত করিতে পারিত, কিন্তু অক্টেভের কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইল। যদি মনের অদম্য আবেগ বশত সে একটা নিন্দনীয় কাজও করিয়া থাকে—যে রমণী সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের অতীত সেই রমণীর সতীত্বের উপর জয়লাভ করিবার জন্য যদি পতির মুখসে প্রণয়ীকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া থাকে, তথাপি সে আত্মসম্ভ্রমহীন ভীরু কাপুরুষ নহে ; তিন বৎসরকাল যুঝা-যুঝির পর, কষ্টভোগের পর, যখন প্রেমানলে দগ্ধ হইয়া তার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখনই অগত্যা এই অন্তিম উপায় সে অবলম্বন করিয়াছিল। সে কৌণ্টকে চিনিত না, সে কৌণ্টের বন্ধু ছিল না ; সে কৌণ্টের কোন ধার ধারিত না। এবং ডাক্তার বাল-

থাজার তাহাকে যে উপায় বলিয়া দিয়াছিল সেই দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করিয়াই সে সফলতা লাভ করিয়াছে।

এখন সাক্ষীদিগকে কোথায় পাওয়া যায়? অবশ্য, কৌণ্টের বন্ধুবর্গের মধ্য হইতেই সাক্ষী সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু অক্টেভ যে দিন হইতে প্রাসাদে বাস করিতেছিল, তখন হইতে সেই সব বন্ধুদের সহিত তাহার ত মিলন ঘটে নাই।

চিম্‌নীর দুই জায়গা গোলাকার হইয়া দুইটা কৌটায় পরিণত হইয়াছে। একটা কৌটায় কতকগুলা আংটি, কতকগুলা আল্‌পিন, কতকগুলা শিল-মোহর এবং অন্যান্য ছোটখাটো অলঙ্কার, এবং আর একটা কৌটায় ডিউক, মার্কুইস্‌, কৌণ্ট প্রভৃতি অভিজাতবর্গের মুকুট-চিহ্ন-সমন্বিত,—পোলীয় রুশীয় হংগারীয়, জর্ম্মন, স্পেনীয় প্রভৃতি অসংখ্য নাম, ছোট বড় মাঝারি নানা হরফে সাক্ষাৎকারের কার্ডের উপর খোদিত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, কৌণ্ট দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং সকল দেশেই তাঁহার কতকগুলি বন্ধু ছিল।

অক্টেভ উহার মধ্য হইতে দুইখানা কার্ড উঠাইয়া লইল :—একখানা কৌণ্ট জামোজ্‌কির, আর একখানা মার্কুইস্‌ সেপুল্‌ভেদার। তার পর অক্টেভ গাড়ী জুতিতে বলিল, এবং গাড়ী করিয়া উহাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। উভয়েরই সঙ্গে দেখা হইল। কৌণ্ট দেহধারী অক্টেভকে প্রকৃত কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি বলিয়া মনে করায়, অক্টেভের অনুরোধে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন না।

সাধারণ গৃহস্থ ধরণের মনোভাব তাঁহাদের কিছুমাত্র না থাকায়, তাঁহারা একথা একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একটা রফা হইতে পারে কি না, এবং যে কারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হইবে সেই কারণ সম্বন্ধেও সম্ভ্রান্ত জনসুলভ সুরুচি অনুসারে একেবারে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

এদিকে, প্রকৃত কৌণ্ট অথবা অলীক অক্টেভ,—ইনিও এই একই-রকম মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। যাহাদের প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই অ্যাল্‌ফ্রেড ও বাম্বোর নাম তাঁর মনে পড়িল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহাদের বন্ধু অক্টেভ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। কেন না তাঁরা জানিতেন, এক বৎসর হইতে অক্টেভ নিজের কোটর হইতে বাহির হয় নাই; এবং ইহাও জানিতেন, অক্টেভের শান্তিপ্রিয় মেজাজ, লাড়াকা মেজাজ আদপে নয়; কিন্তু যখন তাহা শুনিলেন একটা কোন অপ্রকাশ্য কারণে তুমি-মর কি আমি-মরি ধরণের যুদ্ধ হইবার কথা হইতেছে, তখন তাঁহারা আর কোন আপত্তি না করিয়া লাবিন্‌স্কি প্রাসাদে উপস্থিত হইবেন বলিয়া স্বীকার পাইলেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মও স্থির হইয়া গেল। একটা মুদ্রা উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া স্থির হইল, কোন্‌ অস্ত্র ব্যবহৃত হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা পূর্ব্বেই বলিয়া ছিল, অসিই হউক, পিস্তলই হউক, দুয়েতেই তাহাদের সমান সুবিধা হইবে।

প্রভাতে ৬টার সময় বোয়া-দে-বুলঙের-একটা বীথিকা-পথে একটা বিশেষ কুটীরের

সম্মুখে, যেখানে গাছপালা নাই, আর যেখানে বালুময় একটা পরিসর ভূমি আছে, সেইখানে দুই পক্ষের যাইতে হইবে।

যখন সব ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল, তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। অক্টেভ কৌণ্টেসের মহলের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। গত রাত্রির মতই ঘরে খিল দেওয়া ছিল, এবং কৌণ্টেস দরজার ভিতর হইতে, উপহাসের স্বরে এই-রূপ টিট্‌কারী দিয়া বলিলেন :—

"যখন পোলোনী ভাষা শিখ্‌বে, তখন আবার এখানে এসো। আমি অত্যন্ত দেশভক্ত, কোন বিদেশীকে আমার বাড়ীতে আমি গ্রহণ করি না।"

অক্টেভ পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়ায়, ডাক্তার বাল্‌থাজার-শেরবোনো প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে অস্ত্রচিকিৎসার একটা ব্যাগ আর একটা পটির গাঁঠরী!—উহারা দুজনে একসঙ্গে এক গাড়ীতে উঠিয়াছিল। আর, কৌণ্টের সাক্ষীদ্বয়ও তাদের আপনাদের গাড়ীতে ছিল। ডাক্তার, অক্টেভকে বলিলেন :—

বাপু হে,এ ব্যাপারটা দেখ্‌ছি শেষে একটা ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়াল? তোমার শরীরের মধ্যে কৌণ্টকে আমার পালঙ্কের উপর হপ্তা-খানেক ঘুমতে দিলেই ঠিক্ হত। আমি সম্মোহন-নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সীমাটা অতিক্রম করে ফেলেছি। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সন্ন্যা-সীদের সম্মোহন বিদ্যা যতই অনুশীলন করা যাক না কেন, ওর কিছু না কিছু ভুলে যেতে হয়, খুব ভাল আয়োজন করতে পারলেও কিছু না কিছু ত্রুটি থেকে যায়। কিন্তু সে যাক্, কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভি, এইরূপ ছদ্মবেশে তাঁর স্বরেন্সের প্রেমিককে কিরূপ অভ্যর্থনা করিলেন বল দিকি?

অক্টেভ উত্তর করিল;—আমার মনে হয়, আমার রূপান্তর সত্ত্বেও, আমাকে তিনি চিন্‌তে পেরেছেন, কিম্বা তাঁর রক্ষা-দেবতা আমাকে অবিশ্বাস করতে তাঁর কানে কানে কিছু ফুস্‌লে দিয়ে থাক্‌বেন। আমি তাঁকে এখনো সেই রকম মেরু-তুষারের মত শীতল ও শুদ্ধচিত্ত দেখতে পাই। তাঁর সূক্ষ্মদর্শী আত্মা নিশ্চয়ই জান্‌তে পেরেছে—যে দেহের উপর তাঁর ভালবাসা ছিল সেই দেহের ভিতরে এক অপরিচিত আত্মা এসে বাস করচে। আমি এই কথা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনি আমার জন্য কিছুই করতে পারেন নি। আপনি যখন প্রথম আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন আমার যে দুঃখের অবস্থা ছিল এখন তার চেয়ে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।"

ডাক্তার একটু বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন;—"আত্মার শক্তি-সীমা কে নির্দ্ধারণ করতে পারে? বিশেষতঃ যে আত্মাকে কোন পার্থিব চিন্তা স্পর্শ করে নি, যে আত্মা কোন মানবীয় কর্দ্দমে কলুষিত হয় নি, স্রষ্টার হাত থেকে যেমনটি বেরিয়েছিল তেমনিটিই রয়েছে, আলোর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে ঠিক তেমনি বিচরণ করচে, এইরূপ আত্মার শক্তির কি কোন সীমা আছে?—হাঁ, তুমি ঠিক অনুমান করেছ, তিনি তোমাকে চিনতে পেরেছেন, লালসাময় দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর সতী-সুলভ বিশুদ্ধ লজ্জা শিউরে উঠেছিল, এবং সহজ সংস্কার বশে আপনা হতেই তিনি সতীত্বের রক্ষা-কবচে আপনকে আবৃত করেছেন। অক্টেভ, তোমার

জন্তে আমার বড় দুঃখ হয়! বাস্তবিক, তোমার রোগ অসাধ্য। যদি আমরা মধ্য-যুগের লোক হতাম, তা' হলে তোমাকে বলতাম;—মঠে যাও, কোন মঠে গিয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর।"

অক্টেভ উত্তর করিল;—"আমার অনেক সময় ঐ কথা মনে হয়েছে।"

উহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে।—অলীক অক্টেভের গাড়ীও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছে।

এই প্রভাত কালে বোয়া-দে-বুলং ঠিক ছবির মত দেখিতে হইয়াছে। দিনের বেলা, যখন সৌখীন লোকের আমদানী হয় তখন এ শোভাটি থাকে না। এখন গ্রীষ্ম যতদুর অগ্রসর হইয়াছে, তাতে সূর্য্য এখনো পত্রপুষ্পের হরিৎবর্ণকে ম্লান করিয়া তুলিতে অবসর পায় নাই। নিশির শিশিরে ধৌত হইয়া নীরন্ধ্র নিবিড় তরুপুঞ্জের পুষ্প সকল তাজা ও স্বচ্ছ আভা ধারণ করিয়াছে এবং নবীন উদ্ভিজ রাশি হইতে একটা সুগন্ধ নিসৃত হইতেছে। এই স্থানের বৃক্ষগুলি বিশেষ রূপে আরও সুন্দর। গাছের গুঁড়ি খুব জোরালো, শৈবালে মণ্ডিত সাটিনের মত মসৃণ একপ্রকার রূপালি ছালে বিভূষিত; বৃক্ষকাণ্ড হইতে কিম্ভূতকিমাকার শাখা-স্কন্ধ সকল বহির্গত হইয়াছে,—চিত্রকরের চিত্র করিবার সুন্দর মূল-আদর্শ! যে সকল পাখী দিনের গোলমালে চুপ হইয়া যায়, তাহারা এই সময়ে তরুপল্লবের মধ্য হইতে আনন্দে শিশ্ দিতেছে; চাকার ঘর্ঘর শব্দে ভীত হইয়া একটা খর্গোস তিন লাফে বালুকা-ময় পথের উপর দিয়া ছুটিয়া, ঘাসের মধ্যে লুকাইল।

বেশ বুঝিতেই পারিতেছ দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বন্দ্বীদ্বয়, ও তাহাদের সাক্ষীগণ প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য্যের এই সব কবিত্ব লইয়া বড় একটা ব্যাপৃত ছিলেন না।

ডাক্তার শেরবোনোকে দেখিয়া কৌণ্ট-ওলাফের খারাপ লাগিল। কিন্তু তিনি এই মনের ভাবটা শীঘ্রই সাম্‌লাইয়া লইলেন।

অসি মাপা হইল,যুদ্ধের স্থান নির্দ্দেশ হইল। যোদ্ধাদ্বয় কোর্ত্তা খুলিয়া নীচে রাখিয়া আত্ম-রক্ষার ভঙ্গীতে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল।

সাক্ষীরা বলিয়া উঠিল—"এইবার!"

দ্বন্দ্বযুদ্ধমাত্রেই, এক-একবার গম্ভীর নিশ্চল-তার মুহূর্ত্ত আসে; প্রত্যেক যোদ্ধা নিস্তব্ধভাবে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে, কোন্ সময় শত্রুকে আক্রমণ করিবে, তাহার মৎলব আঁটে এবং শত্রুর আক্রমণ আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। তার পর অসিতে অসিতে ঘসাঘসি ঠেকাঠেকির চেষ্টা হয়। এইরূপ বিরাম কয়েক সেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী হইলেও, উৎকণ্ঠার দরুণ সাক্ষীগণের মনে হয় যেন কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা!

এইস্থলে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মগুলি, সাক্ষীদিগের নিকট সচরাচর ধরণের বলিয়া মনে হইলেও, যোদ্ধৃদ্বয়ের চোখে এরূপ অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল যে, সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে,—তাহা অপেক্ষা বেশীক্ষণ তাহারা আত্মরক্ষায় ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া-ছিল। ফলতঃ প্রত্যেকেই দেখিল, তাহার সম্মুখে তাহার নিজের শরীর বিদ্যমান এবং যে মাংস গত-রাত্রেও তাহারই ছিল, সেই মাংসেরই মধ্যে কিনা আপন অসির তীক্ষ্ণ ফলা বসাইয়া দিতে হইবে!

—এ তো যুদ্ধ নয়—এ যে আত্মহত্যা!

এ কথা ত পূর্ব্বে মনে হয় নাই। যদিও অক্টেভ ও কৌণ্ট দুজনেই সাহসী পুরুষ, তথাপি নিজ দেহের সম্মুখে আপনাদিগকে দেখিয়া এবং নিজের শরীর নিজের অসিতেই বিদ্ধ করিতে হইবে মনে করিয়া, উভয়েরই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

সাক্ষীগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আর একবার বলিতে যাইতেছিল, "মহাশয়রা, আরম্ভ করুন না"—এমন সময় অসির আস্ফালন আরম্ভ হইল।

কয়েক বার উভয়েই উভয়ের আঘাত ঠেকাইল। সামাজিক শিক্ষার ফলে কৌণ্ট সিদ্ধলক্ষ্য ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বড় বড় ওস্তাদের সহিত অসি-যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু অসিযুদ্ধে দক্ষতা অপেক্ষা তাঁর পাণ্ডিত্যই বেশী ছিল। কৌণ্টের দেহ এখন অক্টেভের দেহ, সুতরাং অক্টেভের দুর্ব্বল মুষ্টি কৌণ্টের অসি ধারণ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, অক্টেভ কৌণ্টের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় সে এখন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বল লাভ করিয়াছে, এবং অসিবিদ্যায় পারদর্শী না হইলেও, বুক দিয়া শত্রুর অসি ঠেলিয়া ফেলিতেছে।

ওলাফ শত্রুর শরীরে আঘাত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অক্টেভ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ও দৃঢ়ভাবে শত্রুর আঘাত ঠেকাইতে লাগিল।

ক্রমে কৌণ্টের রাগ চড়িয়া উঠিল, তাঁর অসিচালনায় আকুলতা ও বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি বরং অক্টেভ হইয়াই থাকিবেন কিন্তু যে দেহ কৌণ্টেস প্রাস্কোভিকে ঠকাইতে পারিয়াছে, সেই দেহটাকে তিনি নিশ্চয়ই বধ করিবেন;—এই কথা মনে করিয়া তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

শত্রুর অসিতে বিদ্ধ হইবার ঝুঁকি সত্ত্বেও তাঁর নিজের শরীরের ভিতর দিয়া তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর আত্মাতে—প্রাণের মর্ম্মস্থানে পৌঁছিবার জন্য সিধাভাবে অসি চালনা করিলেন, কিন্তু অক্টেভ তাহার অসি দিয়া শত্রুর অসিতে এমন সজোরে আঘাত করিল যে, শত্রুর হস্তচ্যুত অসি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, কয়েক পদ দূরে ভূমিতে নিপতিত হইল।

এখন ওলাফের প্রাণ অক্টেভের মুষ্টির ভিতর। এখন ইচ্ছা করিলেই অক্টেভ ওলাফের শরীর অসির দ্বারা বিদ্ধ করিয়া এফোড় ওফোড় করিয়া দিতে পারে। কৌণ্টের মুখ কুঞ্চিত হইল—মৃত্যুভয়ে নহে; তিনি ভাবিলেন, তাঁর পত্নীকে তিনি ঐ দেহ-চোরের হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, আর কিছুতেই তাহার মুখস খসাইতে পারিবেন না।

অক্টেভ,এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করা দূরে থাক্, তাহার অসি দূরে নিক্ষেপ করিল, এবং সাক্ষীদিগকে তাহার কাজে—হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিবার ভাবে ইঙ্গিত করিয়া, হতবুদ্ধি কৌণ্টের অভিমুখে অগ্রসর হইল। এবং কৌণ্টের বাহু ধারণ করিয়া নিবিড় বনের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

কৌণ্ট বলিলেন, "তোমার ইচ্ছাটা কি? তুমি ত এখন অনায়াসে আমাকে বধ করতে পার, তবে কেন করচ না? যদি তুমি নিরস্ত্র ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চাও, তা হলে আমায় অস্ত্র দিয়ে, তুমি ত এখনও যুদ্ধ করতে পার। তুমি ত বেশ জান, আমাদের দুজনের ছায়া একসঙ্গে মাটির উপর ফেলা সূর্য্যদেবের

কখনও উচিত নয়—আমাদের মধ্যে একজনকে পৃথিবীর গ্রাস করা চাই।"

অক্টেভ উত্তর করিল;—"আমার কথাটা একটু ধীরভাবে শোনো। তোমার সুখশান্তি এখন আমার হাতে। যে দেহের মধ্যে এখন আমি বাস করচি, আর যে দেহ তোমারই বৈধ সম্পত্তি, সেই দেহ আমি বরাবর রাখতে পারি। আমি খুসী হয়েছি, এখন কোন সাক্ষী আমাদের কাছে নেই, সাক্ষীর মধ্যে পাখীরাই একমাত্র সাক্ষী, তারাই আমাদের কথা শুনতে পারে কিন্তু তারা আর কাউকে বলতে যাবে না। যদি আমরা যুদ্ধ আবার আরম্ভ করি, আমি তোমাকে বধ করব। আমি এখন কৌণ্ট-ওলাফের স্থানীয়;—কৌণ্ট-ওলাক অসি-চালনায় অক্টেভের চেয়ে বেশী দক্ষ; আর তুমি এখন অক্টেভের শরীর ধারণ করে আছ, ঐ শরীরকে আমার এখন বিনাশ করতে হবে।"

কৌণ্ট উক্ত কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন; এই নীরবতায় তাঁহার গূঢ় সম্মতি সূচিত হইল।

অক্টেভ আরও বলিলেন;—"তোমায় নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবার চেষ্টায় তুমি কখনই সফল হবে না। আমি তাতে বাধা দেব। তুমি ত দেখেছ, হবার চেষ্টা ক'রে কি ফল হ'ল। তুমি আরও যদি চেষ্টা কর, তাহলে লোকে তোমাকে পাগল বলে ঠাওরাবে, তোমার কথা কেহই বিশ্বাস করবে না। যদি তুমি বল তুমিই আসল কৌণ্ট ওলাফ, লোকে তোমার মুখের সাম্‌নে হেসে উঠ্‌বে;—তার প্রমাণ বোধ হয় আগেই পেয়েছ। তোমাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে, আর সেখানে তোমার মাথায় ডাক্তাররা যতই ঠাণ্ডা জল ঢাল্‌তে থাক্‌বে—তুমি ততই বল্‌বে "আমি পাগল নই,-আমি বাস্তবিকই কৌণ্টেস প্রাস্কোভির স্বামী"—এমনি করে' তোমার বাকী জীবনটা কেটে যাবে। তোমার কথা শুনে দয়ালু লোকেরা হৃদ্দ এই কথা বল্‌বে "আহা, বেচারা অক্টেভ!"

এই কথাগুলা গণিতের মত এতই সত্য যে কৌণ্ট হতাশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মস্তক বক্ষের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

"আপাতত তুমিই যখন অক্টেভ, তখন অবশ্য তুমি অক্টেভের দেরাজ হাতড়ে' তার কাগজপত্র দেখেছ, তুমি অবশ্য জানতে পেরেছ, অক্টেভ তিন বৎসর ধরে' থেকে কৌণ্টেসের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্চে; কৌণ্টেসের হৃদয় পাবার সব চেষ্টাই তার ব্যর্থ হয়েছে। অক্টেভের সে প্রেমের উৎকট আকাজ্ক্ষা কিছুতেই যাবে না—সে প্রেমের আগুন আমরণ প্রজ্বলিত থাকবে।"

ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া কৌণ্ট বলিলেন;—"হাঁ, আমি তা জানি।"

—"তার পর, আমার মনের বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে একটা ভয়ানক উপায়, একটা উৎকট উপায় অবলম্বন করলাম; ডাক্তার শেরবোনো আমার জন্যে এমন একটা কাণ্ড করলেন, যা কোনও দেশের কোন কালের যাদুকর এপর্য্যন্ত করতে পারে নি। আমাদের দুজনকে গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত করে' চৌম্বক শক্তির প্রক্রিয়ায় আত্মাকে আমাদের দেহ হতে স্থানান্তরিত করলেন। এই অলৌকিক কাণ্ড কোন কাজে এল না। নিষ্ফল হল। আমি তাই তোমার শরীর তোমাকে ফিরিয়ে

দিতে যাচ্ছি। প্রাস্কোভি আমাকে ভালবাসেন না। স্বামীর আকৃতির মধ্যে তিনি প্রেমিকের আত্মাকে চিনতে পেরেছেন। সেই বাগান বাড়ীতে যে দৃষ্টিতে আমাকে দেখেছিলেন, সেই প্রেমশূন্য উদাসীন দৃষ্টি দম্পতীর শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশেও দেখ্‌তে পেলাম।"

অক্টেভের কণ্ঠস্বরে এমন একটা প্রকৃত দুঃখের ভাব ছিল যে, কৌণ্ট তার কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অক্টেভ একটু মৃদু হাসিয়া আরও বলিলেন।—"আমি একজন প্রেমিক, আমি চোর নই। এই পৃথিবীতে যে একমাত্র ধন আমি চেয়ে ছিলাম, তাই যখন আমার হতে পারবে না, তখন তোমার পদবী, তোমার প্রাসাদ, তোমার ভূসম্পত্তি, তোমার-ধন ঐশ্বর্য্য, তোমার ঘোড়া-গাড়ী, তোমার কুলচিহ্ন—এ সবে আমার কি প্রয়োজন?—এসো, আমার হাতে তোমার হাত দেও—আমাদের বিবাদ সব মিটমাট হয়ে গেল—এখন সাক্ষীদের ধন্যবাদ দেওয়া যাক্‌। আমাদের সঙ্গে শের-বোনোকে নেওয়া যাক্‌,—আর তাঁকে নিয়ে যেখান থেকে আমরা রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম সেই সম্মোহন প্রক্রিয়ার পরীক্ষাগারে আবার যাওয়া যাক্‌। ঐ বুড়া ব্রাহ্মণের দ্বারা যা সঙ্ঘটিত হয়েছে তা আবার তাঁর দ্বারাই অঘটিত হতে পারবে।"

অক্টেভ বলিলঃ—"মহাশয়গণ,আরও কয়েক মিনিট কৌণ্ট ওলাফের ভূমিকাই বজায় রেখে আমরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের গোপনীয় কথা প্রকাশ ক'রে পরস্পরের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছি, এখন যুদ্ধ করা অনাবশ্যক। তবে কিনা [illegible] সজ্জনের মধ্যে, একটু অসির ঘসাঘসি না হলেও মন সাফাই হয় না!"

জামইজ্‌কি ও সেদুলভেদা, এবং আলফ্রেড ও রাম্বো তাঁদের নিজের নিজের গাড়ীতে আবার আরোহণ করিলেন। কৌণ্ট ওলাফ, অক্টেভ ও ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো একটা বড় গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তার দিকে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কয়েকটি গান

(গুজরাটি গর্‌বার সুরে গেয়)

(১)

পার্‌বনা এক্‌লাটি আজ ঘরে পার্‌ব না রইতে।
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে।
নিরালার কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা,
যেচে কার খুনসুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জোছনায় মাতোয়ারা—
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।

(২)

শোন্ সখী ! গায় কারা আজ রাতে গুজ্‌রাতী গর্‌বা !
খঞ্জন-নর্ত্তন-হিল্লোল-গর্ব্বা !
প্রিয়া গন্ধর্ব্বের—হিয়া কন্দর্পের—
হার মানে ঠুংরী কাহার্‌বা !
দুনিয়ার আদরের, ফুর্‌তির আতরের—
মনোহারী বেলোয়ারী কার্‌বা !

(৩)

চল্‌লরে দখিনায় হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ !
কোন্ বনে চন্দন কোন্ বনে গন্ধ !
মল্লিকা উল্লাসে স্বপ্নেরি হাসি হাসে
সৌরভে সাঁতারে আনন্দ !
আন্‌কো কী সুখ-ভরে আকুলি বিকলি করে
খুল্‌ছে যে পাপ্‌ড়িটি বন্ধ !

(৪)

খিল্-খোলা ফর্দ্দাতে যাব চল্, সাধ জেগেছে !
রইবে কে ঘরে আজ চাঁদ ডেকেছে !
আলো হোথা চুপি চুপি নিয়ে পাউডার খুপি
ফুল দিয়ে ফুল ঢেকেছে !
দিল্-দরিয়ার জলে উথ্‌লিয়ে ঢেউ চলে
নিস্মৃতির বাঁধ ভেঙেছে !

(৫)

খিল এঁটে ঘরে থাক্, হ'সনে চাঁদের নাটে সঙ্গী !
জান্‌লা ভেজিয়ে দে রে ও চাঁদ কলঙ্কী !
যে জানে লো রীত্ ওর যে জানে চরিত ওর
যাবে না সে মানা মোর লঙ্ঘি;
সাতাশের ঘর করে সাতালি-বাসর-ঘরে
বাতাসে মাতাল করে রঙ্গী !

(৬)

শুন্‌ব না ! কোনো মানা মান্‌ব না ! জ্বলে যায় অঙ্গ !
চাঁদকে চেনেনি শুধু চিনেছে কলঙ্ক !

আঁধার যে ভুলিয়েছে, পাথার যে দুলিয়েছে,
উথ্‌লিয়ে হৃদয়ে তরঙ্গ,
একা হয়ে একূল' যে—শত তারা যারে ভজে—
ধূলির তবু যে চায় সঙ্গ !

(৭)

জাগ্‌লরে নিদ্-ঘরে পাখী আজ নারে নিদ্ সইতে !
আঁখি হ'ল অনিমেষ আলো-থই-থইতে !
শোন্ সখী শোন্ মুহু কুহু কুহু কুহু কুহু
বুক-ভরা সুখ নারে বইতে !
সে সুরের মনোহরে—জোছনার সরোবরে—
শত তারা এলো জল-সইতে !

(৮)

কোন্ বনে নিরজনে কাজ-ভোলা কার বাঁশী বাজ্‌ল !
হিয়ার গহনে ফুল যৌবনে সাজ্‌ল !
হাওয়া ভুর ভুর্ তাই মহুয়া ফুলের হাই !
রূপহীনে রূপটানে মাজ্‌ল !
মউএর ঝাপট দিয়ে উলসিয়ে বিলসিয়ে
মানিনীর মান-মণি যাচ্‌ল !

(৯)

কার পাশে কে ও নাচে কার পানে চেয়ে ও কে হাসে !
উল্লাসে কারা ভাসে অনুভব-রাসে !
যত তারা তত সাধ যত সাধ তত চাঁদ
মণ্ডলে নাচে নীলাকাশে !
যত চাঁদমুখ আছে চাঁদ আছে কাছে কাছে
মনোভব মঞ্জু বিলাসে !

(১০)

আস্‌মানে রাস-লীলা গোপনের যবনিকা টুট্‌ল !
আলোক-লতারে ঘিরে হাসিমুখ ফুট্‌ল !
স্বপনেরি ঝরোকায় তারা উঁকি দিয়ে চায়
কাতারে কাতারে তারা জুট্‌ল,
স্মরণ-সরণি পরে ফুল ফোটে থরে থরে
পুলকে আঁখির ধারা ছুট্‌ল।

(১১)

লজ্জিত আঁখি নত অনুখন সঞ্চরে তারা !
উন্মদ মধুকর গুঞ্জন-হারা !
মৌন মুরতি ধরে মৌনে আরতি করে
স্বপন-রভস মাতুয়ারা !
মনোহর !—হরে মন—অবচন নিবেদন
বরিষণ চন্দন-ধারা !

(১২)

চন্দ্রেরি চিত ভরি কে গো আজ কে গো তুমি, চিত্রা !
চোখে চোখ ! কি পুলক ! পুষ্প-পবিত্রা !
পরিচয় চাউনিতে জোছনার ছাউনীতে
সুন্দরী ! সুদূর-সুমিত্রা !
চহুঁ চির দূরে দূরে আঁখি থির মন ঝুরে,
জাগরণ-সাগর-বহিত্রা !

(১৩)

কী ফুল ফোটায় হায় দুনিয়ায় চোখের চাওয়া !
চোখের চাওয়ায় কত হারানো, পাওয়া !
চোখে চোখে দেয়া নেয়া চোখে পাড়ি চোখে খেয়া
চাহনিতে চৈতী হাওয়া !
চাহনির উড়ো-পাখী মন হরে দিয়ে ফাঁকি !
চোখে-চেয়ে চামেলি-ছাওয়া !

(১৪)

মন হরে অজানার নয়নের-অচেনা চোরে !
কে কারে কখন বাঁধে কিসের ডোরে !
ভ্রমর আঁখির মেলা ! ভালোবাসা-বাসি খেলা
চোখে চোখে আরতি ক'রে !
নয়নে নাগর-দোলা এই ফ্যালা এই তোলা
ঢেউ-খাওয়া জনম ভ'রে !

(১৫)

অম্বরে জাগে চাঁদ তারকার ফুল-শেষে রাত-ভোর !
কি কথা বলিতে চায় ঘুমহারা ঘুম-চোর !

গগনের নিরালায় মন কোথা ভেসে যায়
　　জোছনায় মাখা আঁখি-লোর !
তারকার রূপশিখা মরতের মল্লিকা
　　কারে বেশী চায় মন ওর !

(১৬)

আকাশ-কুসুম চাষ করে চাঁদ তারার ক্ষেতে !
　　পাগল সে, আছে শুনি ওতেই মেতে !
খুঁজে খুঁজে হাসি-মুখ ভ'রে শুধু রাখে বুক
　　আলোকেরি মালিকা গেঁথে !
যুগে যুগে নিশি জাগে রূপের নিছনি মাগে
　　নাহি জানি কি ধন পেতে !

(১৭)

চাঁদমুখে আছে ভ'রে, বলে চাঁদ, হৃদয়ের আয়না !
ভালোবাসা ভালোবাসি আর কিছু চাই না !
আকাশ-কুসুম বনে তাই ফিরি আনমনে
　　কাজের বাটে তো মন ধায়না !
আঁখি দিয়ে পিয়ে সুধা মিটাই হিয়ার ক্ষুধা
　　ধনের মানের নেই বায়না।

(১৮)

চাই কারে জানি নারে আমি শুধু ফিরি স্বপনে !
　　ভালোবাসা ভালোবাসি, মন-গোপনে !
আকাশ কুসুম তুলি কুমুদের ফুলে বুলি,
　　দিক ভুলি, ফিরি ভুবনে !
জোছনার জাল পেতে জোনাকীর হার গেঁথে
　　কার ছবি জপি গো মনে !

(১৯)

নিশি নিশি জাগো চাঁদ ! নিরালায় নিতি নিরখি !
　　হারানো ছবির মালা জপ কর কি ?
কত আঁখি কত যুগে কত দুখে কত সুখে
　　আঁখি ডুবি গেছে পুলকি,
ছাই হ'য়ে গেছে যারা তারা অতীতের তারা
　　একাকী তাদের স্মর কি ?

(২০)

কার কথা কবেকার কার কাণে দিলে আজ পৌছে !
আলুথালু হ'ল চাঁদ ঢুলু ঢুলু মৌজে !
জোনাকী সে জোছনায় মোহ পায় মূরছায়
পারুলী পিয়াল-ফুলী কোচে !
হাওয়া ডোবে বিহ্বলে কিরণের থির জলে
অবগাহি বাদশাহী হৌজে !

(২১)

কার হাসি কার ঠোঁটে কার ভোলা দিঠি কার চক্ষে !
স্বপনের রাসলীলা মরমের কক্ষে !
কার "কথা কও" স্বরে মন কে উদাস করে
ইসারায় বলে কি অলক্ষ্যে !
মন করে চিনি চিনি হৃদয়ের স্বদেশিনী
বসতি বা ছিল এই বক্ষে !

(২২)

কে সে ভরেছিল মন, মনে পড়ে তারে ? সেই ভরণী ?
বিরহিনী যে রোহিনী নিয়েছিল ধরণী ?
কোথা রে চাঁদের রাধা কোথা সেই অনুরাধা ?
শ্রবণা শ্রবণ-মন-হরণী ?
কোথা অতীতের সাথী মুক্তা-হাসিনী স্বাতী ?
স্বপন-গাঙে কি বায় তরণী ?

(২৩)

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্টা সে অশ্বিনী হায় রে ?
আর্দ্র-হৃদয়া হায় আর্দ্রা কোথায় রে ?
ভদ্রা দু'বোন তারা কোন্ মেঘে হ'ল হারা ?
কে বাঁধিল মৃগ-নয়নায় রে ?
ফল্গু প্রেমের সোঁতা ফল্গুনী গেল কোথা ?
বিশাখা কি নীহারিকা-ছায় রে ?

(২৪)

চৈতী এ জোছনায় একি হায় কুয়াশার কান্না !
কান্নার হাহা হাওয়া, গান না রে গান না !

আকাশের পরকোলা কাদের নিশাসে ঘোলা ?
তারালোকে খোলা যত জাল্না !
ভরা নয়নের কোলে মুকুতায় মুখ দোলে
ঠোঁটে চুনি চুলে তার পান্না !

(২৫)

কর্পূরে ফাগ ক'রে জ্যোৎস্নাতে চাঁদ হোলি খেল্ছে !
কর্পূরী কুঙ্কুম ফুলে ফুলে ফেল্ছে !
হিল্লোলি' উল্লাসে মাতি অনুভব-রাসে
মল্লিকা হাসি হেনে হেল্ছে !
উবে-যাওয়া রূপ কত তারা-ফুলে অবিরত
হীরার লাবণি-মণি মেল্ছে !

(২৬)

রং বিনা দোল-খেলা, প্রাণে শ্রেফ্ জোছনারি রঞ্জন !
স্মৃতির মুরতি হারে রাস রমে কোন্ জন !
আজ পরাণের পুটে সরোজ-কুমুদ ফুটে—
একসাথে রস-ভুঞ্জন !
আকাশে ঝরোকা খোলা, তারা আঁকে, পথ-ভোলা—
স্বপনেরি চোখে অঞ্জন !

(২৭)

প্রেম মানে প্রাণ পাওয়া, প্রাণে মরা প্রেম-হারাণো ;
এই ধারা দুনিয়ার মানো না-মানো।
নিশি নিশি অনিবার—মরে বাঁচে বারে বার—
তাই চাঁদ ; জানো না-জানো !
ভালোবাসা-রং-ছুট্ ফুল হয় ধুলো-মুঠ,
প্রেমে ফিরে পায় পরাণ ও !

(২৮)

ম'রে গিয়েছিলে চাঁদ ! বেঁচে ফিরে, ফিরে এয়েছ !
আঁখির আলোতে কার প্রাণ পেয়েছ !
কোন্ পুণ্যের বলে এমন নতুন হ'লে
কোন্ গাঙে তুমি নেয়েছ !
কোন্ সুধা পিয়ে এলে কোন্ আশা নিয়ে এলে !
রূপে ত্রিভুবন ছেয়েছ !

(২৯)

ফুটে ঝ'রে ফোটে ফুল বারেবার আকুল বনে !
কত মরা কত বাঁচা একই জীবনে !
কত না বিরতি-রতি পীরিতির গতায়তি
হাসা-কাঁদা মন-গোপনে !
মলয়া মরুর হাওয়া কত করে আসা-যাওয়া
চাঁদেরও সাধের স্বপনে !

(৩০)

ঝঙ্কারে রিম্ ঝিম্ ঝিঁঝি গায়, আজ না রে আজ না !
তনু ভরি মরি মরি নূপুরেরি বাজনা !
আজ নয় আজ নয় আজ কোনো কাজ নয়
অপরূপ ! ভোর না এ সাঁঝ না !
যে দূরে যে আছে কাছে সবারি হৃদয় যাচে
জোছনায় অলখেরি সাজনা !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

বরিশাল সম্মিলন

ও বিপিন বাবু

বিপিন বাবুর ছুটি—যাক, চুকে গেল ! বিপিন বাবুর ছুটি—মঞ্জুর হয়েছে। আর তাঁকে দরবারের uniform-এর বোঝা বয়ে ভূতের বেগার খেটে বেড়াতে হবে না। সহজ বেশে স্বচ্ছন্দে নিজের কাজে মন দিতে পারবেন অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধির চরকা ছেড়ে নিজের চরকায় তেল দেবার অবসর হবে। ছুটির দরখাস্ত বহুদিন হতেই পেশ হচ্ছিল কিন্তু দরবারের মর্জ্জি হয়নি। নির্ম্মম নিষ্ঠুর ! সে যে শেষ শস্যকণাটুকু থাকতে ছাড়ে না—শেষ কাজটুকু আদায় না দিয়ে অব্যাহতি নাই। মহাকালের অদৃশ্য কুলোর নিয়ত নিঃশব্দ সঞ্চালনে শস্য হতে তুষ নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন হলো। নিষ্ফল তরুর মূলে কুঠার পড়ল। যীশুখ্রীষ্টের সনাতন মহাবাণী এম্নি করেই সফল হলো। অনায়াসে অতর্কিতে—অতি নির্ম্মমভাবে ! Let them grow together until the harvest ; and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares and bind them in bundles to burn them, but

gather the wheat into my burn." "Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire."

ডিমোক্রেটিক ক্রোধ।—পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের অভিনয়েও বিপিন বাবু চরিত্রের উদার মহত্ত্ব ও গভীর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নি; সবশুদ্ধ কেমন একটা বিসদৃশ অসঙ্গত কিম্ভূতকিমাকার রসের সৃষ্টি করেছিলেন। ছুটি মঞ্জুর হয়েছে, ভাল কথা। প্রসন্ন মুখে দরবারকে সেলাম করে কুর্ণিশ করে সহজভাবে বেরিয়ে এসো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই সহজ কথাটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। মনের মত খেলনা না হলে আদুরে খোকা-বাবু যেমন খণ্ড-প্রলয় বাধিয়ে তোলেন—রেগে কেঁদে গালাগালি দিয়ে তিনিও তার রীতিমত সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি এদেশে ডিমোক্রেশীর প্রধান পুরোহিত। আজন্মকাল নাকি ঐ এক দেবতারই সেবা ও সাধনা করে এসেছেন! কিন্তু সেখানেও এ কি বিরাট ব্যর্থতা! তাঁর বিপুল আত্মম্ভরিতাই এতদিন Demos-এর মূর্ত্তি ধরে তাঁকে ছলনা করে এসেছে। আজ যেমনি সত্যিকার দেবতা জাগ্রত হয়ে স্বরূপে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকেই বলি কামনা করলেন, অমনি তিনি অম্লান বদনে তাকে অস্বীকার করে ফেললেন। বলে বসলেন, "কে তুমি দেবতা, কে তুমি জন-সংঘ, কে তুমি লোক-মত, আমি তোমাকে চিনিনা। তুমি মূর্খ অর্ব্বাচীন, লজিক চাওনা ম্যাজিক চাও, লাইব্রেরী মানোনা মানুষ মানো, অকাট্য যুক্তির চেয়ে তোমার সরল ভক্তিকে বড় করে দেখো—আমার মতের কাছে যদি তোমার মত মাথা তুলে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা করে, আমি তোমাকে ঘৃণা করবো, অবজ্ঞা করবো, পদদলিত করার চেষ্টা করবো।" কি মর্ম্মান্তিক tragedy!

বিচার—জগৎ-জোড়া, মহাবিচার-শালার দুয়োর খোলা। অমোঘ বিচার চলছে—অবিরত—অলক্ষ্যে নিঃশব্দে—নানারূপে। যার যেখানে মোহ, যেখানে অমৃত, বিচারের সুরু হয় তার সেইখানেই। শৃঙ্গাভিমানী হরিণের মরণ-বাণ লুকানো ছিল তাঁর সুদৃশ্য দীর্ঘ শৃঙ্গের মধ্যেই। বিপিন বাবুর উত্তুঙ্গ অভিমান আশ্রয় করেছিল তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সূক্ষ্ম বিচার-প্রণালী ও সুচারু বাক্‌পটুতাকে। ইহাই সঙ্গত, প্রায়শ্চিত্তটা আরম্ভ হবে সেই দিক হতেই। হলোও তাই। বাস্তবিক মনস্তত্ত্বের এ একটা অতি অদ্ভুত সমস্যা, বিপিন বাবুর মত সহস্র সভাবিজয়ী অত-বড় পাকা লোক দেশ-কাল-পাত্রসম্বন্ধে অতটা বেতালা হলেন কি করে! কিন্তু এটা যে হওয়া চাইই। যখন সময় আসে, তখন বুদ্ধি অতিবুদ্ধির পথ বেয়ে নির্ব্বুদ্ধিতাতে পৌছায় এবং বাক্‌পটুতা দুষ্ট সরস্বতীর বাহনমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। পাণ্ডিত্যের বোঝা তখন কণ্ঠবদ্ধ জগদ্দল শিলার মতো গভীর হতে গভীরতর সঙ্কটের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। বিপিন বাবুর অভিভাষণ ও তাঁর শেষ বক্তৃতাটির ছত্রে ছত্রে এই সত্য জাজ্বল্যমান।

অভিভাষণ—বিপিনবাবু প্রথিত-যশা পুরুষ। তাঁর প্রতিভার প্রকৃতি সর্ব্বজন-বিদিত। এই অভিভাষণে সেই প্রতিভা আপনাকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলেছে। সুতরাং

তাঁর অন্তর-প্রকৃতির দোষ-গুণ দুইই নিরাবরণ নগ্নতায় জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে। সুতরাং অভিভাষণটী না পড়েও পাঠকগণ সহজে অনুমান করতে পারবেন এতে কি আছে, আর কি নাই। আছে -অগাধ পাণ্ডিত্য, সুসংবদ্ধ বিচারপ্রণালী, সুচারু বাক্য-বিন্যাস, পাটোয়ারী বুদ্ধির তির্য্যক লীলা-ভঙ্গী, প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার আত্মঘাতী অতি-চেষ্টা এবং স্বাধীন চিন্তার ছদ্মবেশী দাস-মনোভাব। আর নাই—সৃজনশীল প্রতিভার অবারিত স্ফূর্ত্তি ও উদার সরলতা, সত্যাগ্রহীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মনের অবাধ বিচরণের অবকাশ এবং উপলব্ধির অনতিক্রমণীয় দুর্নিবার টান; এক কথায় মুক্তির অমৃত রসের আস্বাদন। হাতে সময়ের অতি-প্রাচুর্য্য থাকলে পাঠকগণ মিলিয়ে দেখতে পারেন। নান্-খেতাই খাবারের উপকরণ-সামগ্রীর মতো এতে আর সবই আছে, নাই কেবল জল—রসায়নের ভাষায় যাকে বলে universal solvent এবং রসের ভাষায় যার নাম প্রেম। আর এই এক অভাব যে কেমন অভাব তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে কেবল সে-ই, যার অন্তরের সহজ সামঞ্জস্য কোনও বিশেষ মতবাদের পায়ে দাসখত লিখে দিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেনি। বিপিন বাবুর এই অতি-বিস্তৃত অভিভাষণটীর সমালোচনার প্রয়োজন দেখি না। তাতে না আছে উপকার, না আছে আনন্দ। তিনি লোকের চোখ লক্ষ্য করে যে তর্কের ধুলো উড়িয়ে ছিলেন, তাও তাদের চোখে পড়েনি সুতরাং সেটা ঝেড়ে ফেলার পরিশ্রম স্বীকারেরও কোন প্রয়োজন নাই। তবে তিনি অমৃত বলে যে অন্ন লোকের মুখের সাম্‌নে ধরেছিলেন এবং লোকে যা অদেয়মগ্রাহ্যম্ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে তার একটু পরিচয় দিলে ক্ষতি নাই। উক্ত অপূর্ব্ব সামগ্রীর প্রধান উপাদান দুটী—স্বাধীন ভারতের শাসন-প্রণালীর Scheme বা খসড়া এবং ইংরেজের সঙ্গে রফার (স্বরাজের দফা-রফার) সর্ত্ত। আর তার প্রধান মশলা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধির প্রতি কার্পণ্য ভাব! কার্পণ্য কথাটা ইচ্ছা করে ব্যবহার করেছি—আদিম আসল অর্থে। মহাত্মার প্রতি বিপিন্ বাবুর যে ভাবটী প্রকাশ পেয়েছে তাকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ বলতে পারা যায় না, কারণ ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করতে হলে অন্তরের যে ঋজুতাটুকু থাকা অত্যাবশ্যক এ লেখাটাতে সেটুকুরও সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। স্বরাজের Scheme—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস এক কথায় এই অতি-দীর্ঘ গবেষণা-পূর্ণ Scheme-এর যে টিপ্পনী করেছেন, তা অতুলনীয়। তাঁর নিজের স্বরাজের Scheme কি, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, I am not a Scheming man, Scheme তো একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জাজ্বল্যমান, কিন্তু এর মধ্যে Scheming কোথায় তার একটু বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। গত নাগপুর কংগ্রেসের Creed এর আলোচনা-কালে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বাবু "স্বরাজ" শব্দটীকে 'ডিমোক্রেটিক' বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধির আপত্তি বশতঃ উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। সে সময়ে চিত্তরঞ্জন বাবুর সহিত বিপিন বাবুর সম্বন্ধের বিষয় বিবেচনা করে দেখলে উক্ত বিশেষণটী বিপিন বাবুর লজিক্যাল মাথার সৃষ্টি, এরূপ অনুমান করলে বোধ হয় মারাত্মক ভুল

হবে না। যাই হোক শুভ অবসর উপস্থিত হবামাত্র তিনি এক ঢিলে দুটী নয় অনেক-গুলি পাখী শীকারের ব্যবস্থা করে ফেললেন। সেগুলি এই :—(১) অবাঙালী কংগ্রেসের মাথায় বাঙালী কনফারেন্সের লগুড়াঘাত-দ্বারা বাঙালীর নষ্ট-প্রভুত্ব উদ্ধার। (২) বিশ্ববিজয়ী মহাত্মা গান্ধিকে কৌশলক্রমে পরাভব করার বিমলানন্দ উপভোগ। (৩) ভাবী স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্রের উদ্ভাবয়িতারূপে পুণ্য-শ্লোক হওয়া। (লজিকানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থ লজিকেল মাথার চিন্তা-প্রণালীটা একটু খুলে বলা দরকার। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে উপায় তলিয়ে যায়। স্বরাজই উদ্দেশ্য—নন্-কো-অপারেশন উপায় মাত্র, স্বরাজ লাভ হলে নন্-কো-অপারেশনের স্মৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসবে এবং সেই সঙ্গে গান্ধি যাবেন মিলিয়ে এবং দেদীপ্যমান হয়ে উঠবেন শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু—স্বরাজের Scheme যাঁর সৃষ্টি) শীকারটা খুব জম্‌কালো বটে, একেবারে মারি-তো-গণ্ডার-গোছের! কিন্তু সফলতার সম্ভাবনাটা? লজিক অবশ্য সে কথাও ভেবেছিলেন। এই দেখুন—

১। বাংলার শিক্ষিত Aristocracy ছাতুখোর থাকি-পরিহিত মহাত্মা গান্ধিকে ঠিক মনের সঙ্গে বরণ করতে পারেন নি। প্রমাণ সবুজ পত্র, এমন কি অমৃত বাজার পত্রিকা।

২। ওকালতী ও নেতৃত্ব একসঙ্গে চলবে না - মহাত্মার এই উপদেশে উকীল-বাবুদের প্রচণ্ড বিরাগ।

৩। কলিকাতা কংগ্রেসে বরিশাল-গুরু মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের নন্-কো-অপারেশনের অননুমোদন। একে-একে দুই হয়, সুতরাং সফলতার ষোল আনা সম্ভাবনাই ছিল। লজিকের দোষ দেওয়া যায় না। সে ঠিক হিসাবই করেছিল। কিন্তু গোল বাধালে ঐ ম্যাজিক যা বিপিন বাবু দু' চক্ষে দেখতে পারেন না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বাবুর উপর ম্যাজিক কতটা কাজ করেছে, সে আর কারো জানতে বাকী নাই। কিন্তু লজিকের উঁচু পাড়ির তলে তলে ম্যাজিকের পদ্মার ভাঙন যে এতটা এগিয়ে গিয়েছে, সেটা বোঝা যায়নি। সুতরাং হলো যা হবার অর্থাৎ ম্যাজিকের নিকট লজিকের পরাজয়—যা হয়ে আসছে বরাবর, সেই সেকালের হিরণ্যকশিপুর আমল হ'তে একালের লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের আমল পর্য্যন্ত।

ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি বা রফা—বিপিন বাবু অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে এ-ছাড়া স্বরাজ-লাভের অন্য পন্থা নাস্তি। ইংরেজ ও আমরা দুই পক্ষই সমান পণ্ডিত, কাজেই অর্দ্ধং ত্যজতির সূত্রটা খাটবে ভালো।

সর্ত্তটা হবে এইরূপ (১) নন-কো-অপারেশন যে পূরা স্বরাজের চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পাত্রটী প্রায় আমাদের মুখ-বরাবর এনে ফেলেছে, কো-অপারেসনের দ্বারা সেটী ইংরেজের মুখের দিকে ঠেলে দিতে হবে। কারণ মরা নাড়ীতে অতটা একেবারে সইবে না।

(২) ইংরেজ পার্লামেন্টের পাকা দলিল দ্বারা এগ্রীমেন্ট করবে যে দশ বৎসর পরে ঐ পাত্রটী ঠিক আমাদের ঠোঁটের আগে ধরে দেবে, যেহেতু চোরের রাত্রি-বাসই ভাল।

(৩) সবটা তারা খেয়ে না ফেলতে পারে এবং ১০ বৎসর পরে গর-রাজী না হয় সে জন্য

লজিকের সূত্র পাহারা দেবে। এই দশ বৎসর আমরা কি করবো, বিপিন বাবু খুলে বলেন নি। বোধ হয় মিনিষ্টার হয়ে সুখে ঘরকন্না করতে থাকবেন!

যা হোক এ হতে আমি দুটী তথ্য আবিষ্কার করেছি। (১) সিংহ-গর্জ্জনের পিছনে অধিকাংশ সময়ই সিংহ থাকে না। (২) সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের মধ্যে ব্যবধান একটা অতি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পরদা মাত্র।

বাংলা দেশ নব্য নায়ের জন্মভূমি। নব্যতর স্যায়ের ভাষ্যেরও যে সেইখানেই উদ্ভব হবে এটা খুব স্বাভাবিক। আশা করি গৌড়ীয় সুধী সমাজ এজন্য বিপিন বাবুকে গোতম-উপাধি-দানে কৃপণতা করবেন না। সেটা তাঁর অবশ্য প্রাপ্য।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা ম্যাকসুইনির একটি উক্তি পাঠকদিগকে উপহার দেবার সম্পূর্ণ যোগ্য, মনে করি।

"Compromise is the death of a cause. Procrastination is the worst form of compromise. The present is the time to begin the struggle. On the understanding that we will be heroes to-morrow, we evade being men to-day……we realise not that the call is now, the fight is afoot and we must take the flag from its hidden resting-place."

মহাত্মা গান্ধির প্রতি মনোভাব—এটী যে ঠিক কি, এক কথায় তা' বুঝানো অসম্ভব। এতে শ্রদ্ধা আছে, বিস্ময় আছে, কিছু অবজ্ঞা, একটু বিদ্বেষের ছায়া এবং অনেকটা ঈর্ষা ও ভয় আছে। সবশুদ্ধ যে ভাবটী জেগেছে তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে অসহনীয়তা। মহাত্মা গান্ধিকে বিপিন বাবু ঠিক সইতে পারছেন না। বিপিন বাবুর অভিভাষণে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমন কি যেখানে প্রশংসা করেছেন, সেখানেও। বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধিকে অনেকেই সহ্য করতে পারছেন না—প্রকৃতি ও অবস্থার পার্থক্যানুসারে, নানা কারণে। মহাত্মা গান্ধি অনেকের জীবনকে একটা প্রকাণ্ড ধিক্কারে পরিণত করে তুলেছেন। তাদের অন্তরের মর্ম্মস্থানে তলব পৌচেছে কিন্তু জড়তা ও দুর্ব্বলতাবশতঃ তারা উঠতে পারছে না। ফলে তাদের প্রত্যেক জাগ্রত মুহূর্ত্ত তাদের কেবল চাবুক মারছে। আমার নিতান্ত আত্মীয়দের মধ্যে এরূপ লোক আছেন। আর একদল সহ্য কতে পারছেন না, যাঁরা বেশ দুধে-ভাতে আছেন। কখন্ কোন্ হাঙ্গামা বাধিয়ে দুধের বাটীটির হন্তারক হন, এই ভয়েই তাঁরা মহাত্মাকে জুজু দেখছেন। কিন্তু মহাত্মার সম্বন্ধে বিপিন বাবুর অননুকূল ভাবের এ দুটির কোনটিই কারণ নয়। সেটা আরও গভীর। উভয়ের অন্তর-প্রকৃতির গঠন, লক্ষ্য ও পথের মধ্যে এম্‌নি সাংঘাতিক পার্থক্য যে মিলনের আশা করা বাতুলতা মাত্র। বিপিন বাবু জ্ঞান-মার্গী, মহাত্মা প্রেম-মার্গী। আর প্রেম গভীর ও জীবন্ত হলেই কর্ম্মের ধারায় আপনাকে বাহিয়ে না দিয়ে থাকতে পারেনা, কাজেই কর্ম্ম-মার্গীও বটেন। জ্ঞান ও প্রেম মার্গের বিরোধ চির-প্রসিদ্ধ। সুতরাং বিপিন বাবুর লজিক যে প্রেমের বিশ্ববিজয়ী লজিককে ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দিতে চাইবে, এটা খুব স্বাভাবিক।

প্রকাশানন্দের শিষ্যেরা সভয় বিস্ময়ে মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলেছিল,'ওর কাছে যেয়োনা, ও লোকটা যাদু জানে।" কিন্তু একটা রহস্য বুঝে দেখা দরকার। বিপিন বাবু জ্ঞান-পন্থী হলেও মিথ্যার সঙ্গে রফা করতে প্রস্তুত,—যদি তাতে কার্য্য সিদ্ধ হয়—অর্থাৎ তিনি deplomacyর ভক্ত। আর মহাত্মা জ্ঞানপন্থী না হলেও সত্যা-গ্রহী, অসত্যের স্পর্শ পর্য্যন্ত তাঁর নিকট অসহ্য। বিপিন বাবু জ্ঞানপন্থী অথচ উত্তেজনার সুরা-বিতরণে কল্পতরু, তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতাই ওই ছাঁচের। মহাত্মা প্রেমপন্থী অথচ উত্তেজনা মাত্রেই তাঁর নিকট 'অদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম'।

বিপিন বাবুর ইংরেজ-বিদ্বেষ সর্ব্বজন-বিদিত অথচ ইংরেজী বা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট তাঁর মাথা বেচা।

মহাত্মার ইংরেজ-বিদ্বেষ নাই কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার কাহাপাহাড় বিশেষ। বিপিন বাবু ডিমেক্রেসীর প্রধান পাণ্ডা হলেও জীবন-যাত্রায় যথাসাধ্য ফার্ষ্টক্লাসের গাড়ীতে যাওয়ার দিকেই তাঁর একান্ত ঝোঁক। মহাত্মা কখনও ডিমোক্রেসী কথাটা উচ্চারণ করেছেন কি না সন্দেহ, অথচ থার্ডক্লাশের দিকেই তাঁর প্রাণের টান,—যেখানে দীনতমেরও স্থান হতে পারে। বিপিন বাবুর 'স্বরাজে' 'স্ব' অপেক্ষা 'রাজের' প্রাধান্য বেশী, সেই জন্য তার উপায় Political organisation দ্বারা শক্তি-সঞ্চয়। মহাত্মার নিকট 'স্ব' 'রাজে'র চেয়ে অনেক বড়, সেই জন্যে তাঁর সাধনার পথ আত্মশুদ্ধি—যুগযুগান্তরের সঞ্চিত কলুষ-ক্ষালন। বিপিন বাবু কলি (কলী) যুগের মানুষ, কাজেই কলের উপর শ্রদ্ধা ও নির্ভর তাঁর মজ্জাগত, সে কল কাপড়ের হউক কিম্বা বিদ্যা বিচার বা রাজ-নীতিরই হোক। মহাত্মা সত্য যুগের মানুষ, সে যুগ বোধ হয় কেবল কবির কল্পনাতেই বিরাজ করে, কাজেই তাঁর কাছে মানুষের মর্য্যাদাই লক্ষগুণে বেশী। যেখানে প্রভেদ এমন মূলগত, সেখানে মিলনের আশা বাতুলতা মাত্র—যেমন পাগলামি হতো Phariseeদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের মিলনের আশা করলে।

বিপিন বাবুর আশঙ্কা—

বিপিন বাবুর মতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি অর্থাৎ স্বরাজ-লাভের পক্ষে একটী প্রধান বাধা ও অন্তরায় মহাত্মা গান্ধির অলোক-সাধারণ মহৎ চরিত্র। তাঁহার উক্তি এই—"The other limitation of the present movement is due like its strength to the influence of the mighty personality of Mahatma Gandhi himself......At the same time the inevitable danger of it (among other things) is this namely that if for any reason this personal influence is removed, the structure which kept it together falls to pieces."

তিনি কেবলমাত্র বিপদটা নির্দ্দেশ করেই ক্ষান্ত হন নি, সঙ্গে সঙ্গে নিবারণের উপায়ও বলে দিয়েছেন। জনসাধারণের বিচার-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—তাহলেই তারা কেবল মাত্র চরিত্র-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে গণ্ডায় আণ্ডা মিশাবে না।

বিপিন বাবুর আশঙ্কা অনেকের পক্ষেই প্রলাপ বা প্রহেলিকা বলে বোধ হলেও কথাটা

খুবই সত্য। নানা কারণে বিপিনবাবু কথাটা খুবই খুলে বলতে পারেন নি; among other things ইত্যাদি ইসারায় জানিয়ে দিয়েছেন। একটু খুলে বললে কথাটা পরিষ্কার হবে। কংগ্রেস আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বহু চিন্তা, বহু সাধনের ফল। কংগ্রেসের দ্বারাই আমরা রাজনৈতিক সিদ্ধি-লাভ করবো আমাদের অনেকেরই এই বিশ্বাস, সুতরাং কংগ্রেসের কোনও ক্ষতি দেশের পক্ষে মহা-অমঙ্গল। আর যাঁর দ্বারা অনিষ্ট ঘটবে তিনি যত মহৎই হোন না কেন তাঁকে দেশের আপদ-স্বরূপ যদি কেহ মনে করেন ত তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি যে কংগ্রেসের কিছু ক্ষতি করেছেন কেবলমাত্র তাই নয়—তাঁর অভ্র-ভেদী বিরাট আত্মার এক অংশ দিয়ে গোটা কংগ্রেসটাকেই আত্মসাৎ করেছেন। কংগ্রেসের কাজ এখন মহাত্মা গান্ধির আত্মারই কাজ। ক্রমওয়েল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রুদ্ধ দুয়ারে 'House to let' বলে যে নোটিশ এঁটেছিলেন সেটা কংগ্রেসের ললাটেও ঝুলতে পারে। তবে দুজনের আত্মসাতের প্রণালীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। যাই হোক কোনও আসল ডিমোক্র্যাট কোনও দিকেই ব্যক্তিত্বের অসাধারণ বিকাশ সহ্য করতে পারেন না। মধ্যবিত্ততাই তাঁদের সমাজের আদর্শ। রকফেলারের অগাধ ধন-সঞ্চয় তারা যেমন অন্যায় মনে করে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বা মহাত্মা গান্ধির মহত্ব সম্বন্ধে তাদের মনোভাবও কুতকটা সেইরূপ। ঐ প্রতিভা বা ঐ মহত্ব ভাগ করে ভোগ করতে দিলে যে বহুলক্ষ লেখক তরে যায় ও বহু কোটি অমানুষ মানুষ হয়, এ হিসাবটা সহজেই তাদের মনে ওঠে। বিপিন বাবু দস্তুর-মাফিক ডিমোক্রাট সুতরাং মহাত্মা গান্ধিকে যে ডিমোক্র্যাটিক স্বরাজ লাভের অন্তরায় ভাববেন, এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

কিন্তু তিনি এই বিপদ নিবারণের যে উপায় নির্দেশ করেছেন তা যে নিতান্তই হাস্যজনক, তা তিনি নিজে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রথমতঃ বিচার-বুদ্ধির বিকাশ আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে একদিনে হয় না; বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা ও সাধনার দরকার। সমস্ত দেশের লোকের সে অবস্থালাভের বহুপূর্ব্বেই 'সব লাল হো যায়ে গা'।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বাবু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতির বিচার-বুদ্ধি যে স্বয়ং বিপিনবাবুর চেয়ে বেশী কম, এরূপ ভাবার কারণ নাই। তবুও তাঁদের এ দশা কেন?

আমার কয়েকটী বন্ধু বহু গবেষণা দ্বারা এ রোগের কয়েকটী ওষুধ আবিষ্কার করেছেন—তাতে ফল হওয়া সম্ভব।

১। মহাত্মা গান্ধিকে সকল অবস্থা বুঝিয়ে বলে বানপ্রস্থ-অবলম্বনে রাজী করা। তিনি স্বার্থলেশহীন মহানুভব—আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না।

২। মহাত্মা গান্ধির সম্বন্ধে আভাসে ইঙ্গিতে অস্পষ্ট ভাষায় অনির্দ্দেশ্য গ্লানি-প্রচার। কিছু কাজ করবেই, কারণ 'পরচিত্ত অন্ধকার' এ বাক্য জ্ঞানী-জনানুমোদিত।

৩। নিতান্ত দুকুড়ি সাত গোছের লোক-দিগকে নেতা নির্ব্বাচিত করা। তাদের

সম্বন্ধে লোকের মন সংস্কার-বিহীন, Neutral, সুতরাং বিচারশক্তি-পরিচালনের কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না।

৪। বেছে বেছে খ্যাতনামা চরিত্র-হীন লোকদিগকে নেতা নির্ব্বাচন করা। লোকের বদ্ধমূল অশ্রদ্ধার উপর যে লজিক জয় লাভ করবে, তা যে খুবই পোক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ থাকবে না।

রহস্য যাক্। শ্রীযুক্ত পাল মহাশয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

১। চাণক্যের সনাতন বাক্য 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্' কি মহত্ত্ব-সম্বন্ধেও প্রযুজ্য ?

২। নেতার চরিত্রের অতি-মহত্ত্বে যদি কোনও অনুষ্ঠানের ক্ষতি হয়, সেই অনুষ্ঠানই এই চিরপতিত দেশে মুক্তি আনয়ন করবে—এই বিশ্বাসই কি পোষণ করতে হবে ?

৩। মহৎ চরিত্রের প্রভাবে লোকের চরিত্র উন্নত হয়। সেই প্রভাব নষ্ট করে নৈতিক উন্নতির পথে বাধা দিয়ে স্বরাজ আনতে হবে ? চরিত্র-হীনের স্বরাজ আমাদের কি মোক্ষ দিবে ?

৪। আজ জাতির চিত্ত-প্রসারণের দিন। আজ তাকে নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে পথ দেখে চলতে বলার মানে তার উচ্ছ্বাস থামিয়ে দেওয়া—তাকে আত্মসঙ্কোচ করতে বলা। সেই কি আমাদের সিদ্ধির পথ ?

৫। মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুই মানুষের সবটা নয়; এমন কি শ্রেষ্ঠ অংশটুকুও নয়! মানুষের জানা ও অজানা সবশুদ্ধ গোটা মানুষটাকে তুললেই তবে সে উঠতে পারে। সে কেবল পারে প্রেম। তর্ক নয়—লজিক নয়—ভোট নয়। আজ সেই প্রেমের ডাকে মানুষের সবটা যখন সাড়া দিতে সুরু করেছে, তখন তার পক্ষে কাণে আঙুল দিয়ে জোর করে বধির হওয়ার পরামর্শটাই সব্-চেয়ে পাকা পরামর্শ ?

৬। নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ-কর্ম্ম কারখানা-কারবারই ভোটের দ্বারা চলে ভালো। জাতির মহাসঙ্কটের দিনে মহাপুরুষ চাই। গীতার 'যদা যদাহি' শ্লোক মনে করুন, হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য অবতার হয়েছিল নৃসিংহের। আজ আবার বিশ্বব্যাপী বিপুলকায় নৃসিংহ দৈত্যের বধের জন্য যে, নৃদেব-অবতারের কামনায় মানুষ উর্দ্ধমুখে চেয়ে আছে, কে বলতে পারে তিনিই অবতীর্ণ হন নি এই ভারতবর্ষে ?

৭। কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক কলটা যন্ত্রলীলা সংবরণ করে যদি মহাত্মা গান্ধির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেই থাকে, তা নিয়ে শোক করা মোহমাত্র, জ্ঞানীর লক্ষণ নয়।

বিপিনবাবুর ভবিষ্যৎ—এ সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ অনুমান করছেন। যদিও সাধারণতঃ এটা অনধিকার-চর্চ্চা কিন্তু এ ক্ষেত্রে নয়। কারণ বিপিন বাবু জননায়ক। কেউ বলছেন, যে জালে সার সুরেন ও হরকিশেন লালকে ধরা হয়েছে, সেই কাতলা-ধরা জাল এঁকে ধরার জন্যও ফেলা হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে জাল ফেলা হলেও ইনি ধরা পড়বেন না—জাল ছিঁড়বেন। কেউ বলছেন, তিনি সব দলের দল-ছাড়াদের নিয়ে, নূতন কীর্ত্তনের দল বেঁধে দেশ-ময় মান-ভঞ্জন ও কলঙ্ক-ভঞ্জন পালা গেয়ে বেড়াবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস চেষ্টা করলেও সেটা তিনি

পারবেন না। কারণ, দল কেবল লজিকে গড়ে ওঠে না, একটু ম্যাজিকও চায়। দু' একজন বলছেন, তাঁর Democratic Swaraj-এর Thesisটা পড়ে খুসী হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা (বহুবচনটা কি গৌরবে?) তাঁকে ডাক্তার উপাধি দিয়ে, Politicsএর অধ্যাপক নিযুক্ত করবেন, মনস্থ করেছেন। যাই হোক, এটা হলে ভালো হয় সকল পক্ষেরই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

প্রত্যাবর্ত্তন

(উপন্যাস)

সূচনা

শ্মশানে

শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছিল ধূ-ধূ, ধূ-ধূ—

দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি। পরপারের সীমা-রেখাকে অস্পষ্ট করিয়া যেখানে দুইটি নদী মিলিত হইয়াছে, তাহারই সঙ্গম-স্থলে অনেকখানি বালুর চর নদীগর্ভ হইতে তীরের দিকে খোলা-জমির সৃষ্টি করিয়াছে। সেই বালুচরের উপর শ্মশানঘাট। শ্মশানে তখন একটি মাত্র চিতা জ্বলিতেছিল। সূর্য্য সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। ধূসর বর্ণের মেঘের ভিতর দিয়া অস্ত সূর্য্যের রাঙা আলো আকাশেও যেন চিতার আগুন ধরাইয়া দিয়াছে! তরঙ্গহীন শান্ত নদীর জলে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়ায় জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেন একই ভাবের সমন্বয় চলিতেছিল। কথোপকথন-নিরত সহযাত্রী-দলের সঙ্গ এড়াইয়া চিতার অদূরে বসিয়া যে যুবক,—সে-ই জ্বলন্ত চিতায় এইমাত্র জীবনের সমস্ত সুখ-আশা বিসর্জ্জন দিয়াছে! তাহার বুকের মধ্যেও বুঝি চিতাবহ্নি এমনি লেলিহান রসনা মেলিয়াই জ্বলিতেছিল। যুবকের নাম গৌরীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। চিতায় যে দেহ জ্বলিতেছিল, তাহা তাহারই সহধর্ম্মিণী দুর্গাবতীর।

ক্রমে সূর্য্যাস্তের রাঙা আলোর সহিত চিতার আলো নিভিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। দাহকারীরা নদী হইতে কলসী ভরিয়া জল তুলিয়া আনিয়া চিতা ধুইয়া স্নান করিতে গেল। গ্রাম-সম্পর্কে একজন গৌরীপতির খুড়া হন্,—তিনি কাছে আসিয়া গৌরীপতির কাঁধে হাত রাখিয়া নাড়া দিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া কহিলেন,—"গৌরী, আর কেন বাবা, সব ত শেষ হয়ে গেল, এইবার স্নান করে বাড়ী চল।" গৌরীপতি এতক্ষণের পর যেন সসংজ্ঞ হইয়া আহবান-কারীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "খোকা—?" খুড়া-মহাশয় দূরে বৃক্ষতলে যেখানে কালী চাকর একটি সুন্দর বালককে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া দেখাইয়া কহিলেন, "খোকা ঐ যে কালীর কোলে। তার স্নান হয়ে গেছে—ছেলে একবারও কাঁদল না, গোপাল আমাদের যেন পাথরের গোপাল হয়ে গেছে—আহাহা, কি লক্ষ্মীই আমরা হারালুম।" বলিয়া অকৃত্রিম বেদনার অশ্রুসজল দৃষ্টি সদ্য ধৌত চিতার দিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া গৌরীপতিকে একরকম জোর করিয়াই টানিয়া তিনি স্নান করাইতে লইয়া গেলেন। স্নান

সারিয়া সকলে তীরে উঠিলে কালী অগ্রসর হইয়া ছেলেটিকে গৌরীপতির কোলে দিয়া কহিল, "দাদা খোকাকে নাও—" ছেলেকে কোলে লইয়া দুই হাতে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলে এতক্ষণের পর গৌরীপতির চোখ দিয়া শোকের তীব্র দাহ অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! দেখিয়া খুড়ামহাশয়-প্রমুখ সকলেই আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন, শোক এইবার সহের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

প্রথানুসারে বালক গোপালকে দিয়া সেই যে তাহার মৃতা জননীর মুখাগ্নি করানো হইয়াছিল, তাহার পর দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গোপাল একবারো কাঁদে নাই, একটিও প্রশ্ন করে নাই! শুধু বড় বড় দুটি কালো চোখের অপলক দৃষ্টি নির্ব্বাক বিস্ময়ে ভরিয়া জ্বলন্ত চিতার পানেই চাহিয়াছিল। চিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। শেষকার্য্য শেষ হইল! তবু বালকের দৃষ্টি ও মন সেই একই ভাবে বদ্ধ হইয়া রহিল। বাড়ী ফিরিবার সময় যে প্রথম কথা কহিল, বলিল, "বাবা, মা যে একলা রইলো!" এ প্রশ্নের জবাব গৌরীপতি দিতে পারিল না। অপর একজন কহিল, "না গোপাল, মা ত একলা নেই ভাই, তিনি ঠাকুরের কাছে স্বর্গে চলে গেছেন কি না।" গোপাল দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, কেবল সংশয়িত বিস্ময়-ব্যাকুল চোখে মায়ের চিরানন্দময়ী মূর্ত্তি-দগ্ধকারী নির্ব্বাপিত-বহ্নি চিতাভূমির পানে বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মা স্বর্গে গিয়াছেন এ কথা সে কেমন করিয়া মানিয়া লইবে! স্বর্গ—সে ত ঐ নীল আকাশেরও উর্দ্ধে কোন্ জ্যোতির্ম্ময় আলোকের রাজ্যে! সেখানে দিব্য বেশে দিব্য রথে চড়িয়া যাইতে হয়। দেবদূতেরা পুষ্পমাল্য রক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া লইতে আসে যে! কিন্তু গোপাল নিজের চোখে দেখিয়াছে, তাহার মাকে ইহারা কাঠের ভিতরে চাপা দিয়া আগুনে জ্বালাইয়া দিয়াছে—বাবাও তাহাতে যোগ দিয়াছে—আর গোপাল—? নিজে সে তাঁর ঘুমন্ত মুখে চুমা না খাইয়া, গলা জড়াইয়া তাঁহার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া না থাকিয়া, ঐ লোকগুলা তাহারই হাত ধরিয়া যে আগুনের জলন্ত জ্বলা মার মুখে লাগাইয়া দিয়াছিল, সেই আগুনের খড় নিজের হাতে ছুঁইয়াছে যে,—তবে!

দাহকারীরা বাড়ী ফিরিতেই ক্রন্দনের চাপা আওয়াজ উচ্চ হইয়া উঠিল,—"ওরে বাবা, আমার সোনার প্রতিমা কোথায় বিসর্জ্জন দিয়ে এলি রে! আমার ঘরের লক্ষ্মীকে কার কাছে রেখে এলি রে বাপ—!"

গোপাল মন্দিরের সেবায়েৎ গৌরীপতির ছোট-খাট সংসারখানি অনেকের আদর্শ ও ঈর্ষার স্থল ছিল। স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য এবং বিদ্যা একাধারে এই ত্রিবেণী-সংযোগ গৌরীপতিকে গ্রামের মধ্যে আদর্শ আখ্যা দিয়াছিল! স্নেহময়ী সন্তান-বৎসলা জননী, প্রেমময়ী পত্নী, বালক গোপালের প্রতিকৃতি তাহার বালক পুত্র গোপাল ভগবানের অজস্র করুণারই দান বলিয়া মানিয়া লইয়া নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করিত। অতি-সুখ সহে না,—বিধির এই উক্তির সার্থকতা দেখাইতেই যেন কাল বিসূচিকা রোগে বারো ঘণ্টার মধ্যে গৌরীপতির সাংসারিক জীবনের সুখ-শান্তি অপহরণ করিল! সহধর্ম্মিণী দুর্গাদেবী সজ্ঞানে স্বামী ও শাশুড়ীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাসিমুখে স্বর্গারোহণ করিলেন, মরণের পূর্ব্বে সন্তানের মুখের পানে

চাহিয়া যে দীর্ঘশ্বাস উঠিতে চাহিতেছিল, সাধ্বী সবলে তাহা দমন করিয়া স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—"গোপাল এত ছোটবেলায় মা-হারা হচ্ছে, ওকে তুমি আর একটি মা এনে দিয়ো। আমাদের মারও সেবার ত্রুটী যেন না হয়, দেখো।" এ কথায় গৌরী শিহরিয়া ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিয়া বলিয়াছিল, "না দুর্গা, এ-রকম অনুরোধ তুমি আমায় করে যেয়োনা, গোপালকে দিয়ে তুমি ত আমায় পিতৃঋণে মুক্তি দিয়েচ! গোপাল আমার মার কাছেই সহস্র মায়ের স্নেহ পাবে, আর মার জন্য আমি ত রইলুম। এখানকার বাকী কটা দিন একলাই আমার কেটে যাবে, তারপর সেখানে তোমাকেই যে আবার আমি পাব!" এ কথার পর পরম সুখে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া স্বামীসৌভাগ্যবতী যে নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, মরণ-কালে তাঁহার মুখে যে গভীর নির্ভর ও বিশ্বাসের চিহ্ন ফুটিয়াছিল, সংসারের সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অতি-দ্রুত-অগ্রসর জীবন-সায়াহ্নের প্রান্তে দাঁড়াইয়াও গৌরীপতি সে দৃষ্টি ভুলিতে পারে নাই।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া গৌরীপতি শোকাকুলা মাকে ডাকিয়া কহিল, "মা, তোমার গোপালকে নাও।"

সর্ব্বমঙ্গলা দেবী আঁচলে বারবার চোখ মুছিতে মুছিতে গোপালকে কোলে লইতে গেলে সে দুই হাতে দৃঢ়ভাবে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আপত্তির সুরে কহিল, "না, আমি বাবার কাছে থাকব।"

আকাশে সাড়ম্বরে মেঘ জমিতেছিল দেখিয়া খুড়ামহাশয় চিরপুরাতন সংসারের অনিত্যতার বাঁধা উপদেশ নূতন করিয়া শুনাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনের পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে যাঁহারা তখনো পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে আশ্বাস দিয়া ছেলের মুখ চাহিবার পরামর্শ দিয়া জানাইলেন যে, যে-ভাগ্যিমানি তপিস্যের জোরে গৌরীকে পতি পাইবার বর লাভ করিয়াছে, তাহার অনূঢ়া-কাল উত্তীর্ণ হওয়াতেই এই অল্প-ভোগিণী বধূটিকে এত-শীঘ্র নিজের পদ ছাড়িয়া দিয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে বাহির হইতে হইয়াছে—এ যে বিধাতার বিধি—মানুষের গড়া নয় ত! তবে হ্যাঁ, যেমনটি যায়, তেমন কি আর হয়? না, অসময়ের ফলে সময়ের ফলের স্বাদ পাওয়া যায়! ছেলের আবার বৌ হইবে বটে কিন্তু তাঁহার সুখ আর হইবে না! উদাহরণের মধ্য দিয়া ইহাও তাঁহারা জানাইয়া দিতে ত্রুটি করিলেন না যে, তেমন সুখের বরাতই যদি তাঁহার হইবে, তবে এমন দুর্ঘটনা ঘটিবেই বা কেন! পোড়া অদৃষ্ট যখন নিজেই পুড়িয়াছে, তখন অন্যের কাছে কিসেরই বা প্রার্থনা! আর সে পাওয়াতেই বা কোন্ সার্থকতা! যাই হোক মন বাঁধিয়া অতঃপর ছেলের মুখ চাহিবার উপদেশ দিয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলেন।

রাত্রেও গোপাল বাপের কাছ-ছাড়া হইল না। বাপের কম্বল-শয্যায় তাহাকে দুই হাতে হাতে জড়াইয়া সে শুইয়া রহিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গৌরীপতি জাগিয়া ছিল। কৈশোর-যৌবনের কত অতীত স্মৃতি আজ যেন ছবির মত তাহার মনোদর্পণে একে একে ফুটিয়া উঠিতেছিল, আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল। মনে পড়িতেছিল, কৈশোরের সেই

আনন্দময় অনাবিল, জীবনে কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম, বিদ্যাশিক্ষার কি প্রবল অনুরাগ! আর তাহার শিক্ষক? স্নেহময় উন্নত উদার-হৃদয় পিতা কত স্নেহে, কত কঠোর পরিশ্রমে কি মধুর তাহার সে শিক্ষাদান, তার পর কি আকস্মিক তাঁর অকাল-মৃত্যু, সহায়-হীনা শোক-কাতরা মায়ের সেদিনের সে মুখচ্ছবি তাহাকে কত শীঘ্র জীবন-যুদ্ধে প্রলুব্ধ ক'রয়া শোক সহিতে সক্ষম করিয়া তুলিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে আর একখানি চিত্র ফুটিয়া উঠিল। বিবাহের বর-কনে গৌরী ও দুর্গা একত্রে মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, মায়ের সেদিন-কার যুগপৎ হর্ষ-বিষাদের মিশ্র চিত্র, দুই কোলে দুইজনকে বসাইয়া চোখের জলে ভাসিয়া মা সেদিন বলিয়াছিলেন, "আজ আমার এত দুঃখ সয়ে বেঁচে থাকা সার্থক হলো গৌরী,—ভগবান তোদের দুটিকে যেন কখনো জোড়-ছাড়া না করেন, এই আমার আশীর্ব্বাদ!" বালিকা বধূ -- কেহ শিখাইয়া না দিলেও মার সে আশীর্ব্বাদ কেমন সহজে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া আপনা হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়াছিল। কি হইল আজ দুর্গামণি, সে কামনা আজ অটুট রাখিতে পারিলে কই! হাসি-মুখে দিব্য ত' চলিয়া গেলে! চিরদিনের সঙ্গীটিকে সঙ্গে লইলে কই? এমনি সহস্র চিন্তা ধীরে ধীরে মানস-পটে ফুটিয়া আবার পরক্ষণেই ধীরে ধীরে মনের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে সারাদিনের দুঃখ-ক্লেশ-মথিত শোকাতুর চিত্ত কখন যে বিশ্রাম-দায়িনী ঘুমের মধ্যে শান্তি পাইল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। সহসা বাহিরে প্রচণ্ড বজ্রনাদের সহিত প্রবলধারে বৃষ্টিপাতের শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গৌরীপতি তাড়া-তাড়ি বিছানা হাতড়াইয়া ডাকিতে লাগিল, "গোপাল—গোপাল—" মনে পড়িল, খানিক আগেও ঘুমের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গোপাল তাহারই কণ্ঠালিঙ্গনে তাহাকে দুখানি বাহু-বেষ্টনে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। হয় ত তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া মা গোপালকে তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। তা'ই সম্ভব! আলস্যে ও অবসাদে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না! তবু প্রচণ্ড ঝড়ে বাহিরে দুম্‌দাম্ করিয়া দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দে বাধ্য হইয়া গৌরী বাহিরে আসিল; আসিয়া দেখে, কালীচরণ তাহার পূর্ব্বে উঠিয়া দ্বার জান্‌লা বন্ধ করিয়া উঠানে যেখানে একরাশ শুক্‌নো কাঠ জলে ভিজিতেছিল, তাহারই উদ্ধার-সংকল্পে দাঁড়াইয়া আছে। গৌরীপতির সাড়া পাইয়া সর্ব্বমঙ্গলা দেবী বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "গোপাল ভয় পাবে যে, তাকে একা রেখে এলে গৌরী? চল, ঘরে চল।"

গৌরীপতি কহিল, "গোপাল কোথায় শুয়েচে মা? তাকে কখন তুমি তুলে নিয়ে গেছ আমি ত কিছু জান্‌তেও পারিনি।"

"আমি নিয়ে গেছি! সে কি কথা—" বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা দেবী এক প্রকার ছুটিয়াই ঘরে ঢুকিলেন। জলে, ঝড়ে হারিকেন লণ্ঠনটি কখন নিভিয়া গিয়াছিল। অনুসন্ধান করিয়া দিয়াশলাই বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া মাতা-পুত্রে প্রত্যেক ঘর আতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন। কোথায় গোপাল—? গোপাল ত নাই। শয়নের পূর্ব্বে কালী নিজের হাতে বাহির দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া দিয়া আসিয়াছে,

তবে এ দ্বার খুলিল কে? মুক্ত-বক্ষ কবাট দুইখানা বাতাসের জোরে তাঁহাদের বুকের পাঁজরার উপর হাতুড়ির ঘা দিয়া যেন সশব্দে বুঝাইয়া দিতেছিল, এই পথ দিয়াই সে বাহির হইয়া গিয়াছে রে! সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও গৌরীপতি পাগলের মত ছুটিয়া বাহির আসিলেন। প্রবল ঝড় আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি, চোখে-মুখে তীরের ফলার মত আসিয়া বিঁধিতেছিল—বাহিরে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! পাঁচ বছরের ছেলে,—সে কি এই অন্ধকারে রাত্রে এই ঘন-দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতির কোলে একা বাহির হইতে কখনও সাহস করিতে পারে—না, না, এ অসম্ভব! তবু যদি সত্যই সে তা করিয়া থাকে? সারারাত্রি একবার ঘর—একবার বাহির—তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া পরিচিত-অপরিচিত অনেকের বাড়ী খোঁজ লইয়াও গোপালের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ভোরের দিকে জল-ঝড় কমিয়া সকালে বৃষ্টি থামিয়া গেল! এক রাত্রের প্রবল ধারাপাতে নদীর জল অনেকখানি বাড়িয়া ছোটখাট বালুচর গুলিকে ডুবাইয়া দিয়াছে। গৌরীপতির মনে পড়িল, গোপাল রাত্রে একবার বলিয়াছিল, "মার যদি ভয় করে বাবা—মা যদি ভাল হয়ে উঠে আমাদের খোঁজেন?" তখন সে কথার সে জবাব দেয় নাই অথবা কি-একটা দিয়াছিল, এখন আর তাহা স্মরণ নাই। কি জানি, মাতৃহীন বালক যদি সেই শ্মশান-ঘাটে মাকে খুঁজিতেই গিয়া থাকে! সে পথ ত গোপালের অচেনা নয়, তাহারই সহিত কতদিন ঐ পথ দিয়া বালক যে নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছে। প্রভাতে সূর্য্যোদয় ও সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের অপরূপ সৌন্দর্য্য মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিয়াছে। যুক্ত করে "সুরপতিভাগে, রক্তিমরাগে—" প্রভৃতি স্তোত্র পাঠে পিতার মনে আনন্দ সিঞ্চন করিয়াছে। তবু এই ঘনঘটাময়ী তামসী নিশীথে সে পথে বাহির হওয়া শিশুর পক্ষে কি সম্ভব! কে জানে! যদি সে তাই গিয়া থাকে আর অন্ধকারে অসাবধানে পিছল পথে চলিতে গিয়া নদী-গর্ভেই পড়িয়া গিয়া থাকে! গৌরীপতি শিহরিয়া উঠিল। সেখান হইতে গৌরীপতিকে তাহার অমূল্যনিধির বার্ত্তা কে আনিয়া দিবে! ক্ষুধিতা রাক্ষসী নদী গৌরীপতির প্রাণাধিকার চিতাভস্ম মাখিয়াও বুঝি তৃপ্তি পায় নাই, তাই স্ফীতবক্ষে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে!

পরদিন সন্ধ্যার সময় কালীচরণের সহিত গৌরীপতি যখন শূন্যক্রোড়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, সর্ব্বমঙ্গলা দেবী সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ছাব্বিশ বছরের ছেলের মাথার সব চুলগুলি চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে!

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুড়ান ছেলে

ইন্দ্রনাথ জমিদারের ছেলে। পুরুষানুক্রমেই ইহারা জমিদার। এ বংশে কেহ কখনও পরের চাকরি করে নাই। বাণী-মন্দিরের দ্বারেও কাহারো পদধূলি বড় পড়ে নাই। জমিদারী-রক্ষার জন্য যতটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, গৃহে মুন্সী রাখিয়া পণ্ডিত রাখিয়া ততটুকু শিক্ষা করাই এ গৃহের চিরন্তন নিয়ম। সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণের সহিত একাসনে

বসিয়া সামান্য শিক্ষকের শাসন-তাড়না সহিয়া শিক্ষালাভ করা এ বংশের প্রথাই নয়।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু চিরদিনের নিয়ম উল্টাইয়া ইংরাজী শিক্ষার জেদ ধরিল। সতেরো বৎসর পূর্ব্বে দুই বছরের শিশু পুত্রকে লইয়া কাত্যায়নী দেবী যেদিন এই বৃহৎ সংসারে অনাথা হইয়াছিলেন, সেদিন সেই ক্ষুদ্র-শিশুই তাঁহাকে সংসারের মায়াজালে বদ্ধ করিয়া মৃত্যু-কামনার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহারই মুখ চাহিয়া স্বামী হারাইয়াও আবার তিনি গৃহ-কর্ম্মে মন দিয়াছিলেন। নতুবা কিসের গৃহ, কাহার জন্যই বা সংসার? তারপর কত ঝড়ই না মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে! জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম বুঝিতে অনেক ক্লেশ ও সময় লাগিয়াছিল, তবু সবই তিনি সহিয়াছিলেন সেই বংশধরের মুখ চাহিয়া, তাহারই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। ছেলে যখন জেদ ধরিল, সে ইংরাজী শিখিবে, স্কুলে যাইবে, তখন বিমুখ চিত্ত সহস্রবার পিছনে ফিরাইলেও তাহার ঈপ্সিত পথে তাহাকে যাইতে দিতে মানা করিতে পারিলেন না। এ বংশের চিরদিনের নিয়ম-ভঙ্গে বিদেশী শিক্ষায় পাছে দেশের অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে অনেক দেবদেবীর মানত করিয়া ছেলের মাথায় অপরাধের জরিমানার মূল্য স্পর্শ করাইয়া পূজা তুলিয়া রাখিয়া মনে মনে দেব-দেবীদের উদ্দেশে তিনি বলিয়াছিলেন,—হে মা দুর্গা, হে বাবা শিব, বাছাকে আমার ভালয় ভালয় ঐ দায়ের পড়া সাঙ্গ করাইয়া দাও, আমি ভাল করিয়া তোমাদের পূজা দিব—মন্দির-চূড়া সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিব। মায়ের আশীর্ব্বাদে, দেব-দেবীদের কৃপায় ও নিজের চেষ্টায় ইন্দ্রনাথ তাহার ঈপ্সিত ফল লাভ করিয়া বিদ্বৎ-সমাজে একদিন বরণীয় হইয়া উঠিল। দেশ-বিদেশ হইতে অনেক মূল্যবান পুস্তক আনাইয়া সে গৃহে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিল এবং সময়ের তৃতীয়াংশ কাল পরমানন্দে সেইখানেই কাটাইতে আরম্ভ করিল। মা এইবার বিবাহের জন্য জেদ ধরিয়া বসিলেন। ইন্দ্রনাথ হাসিয়া প্রত্যাখ্যান করিল—এই অধ্যয়নের পরমানন্দেই বাকী জীবনটা সে উৎসর্গ করিবে। সংসারের শোক, রোগ, অভাব-অভিযোগের মধ্যে কোনমতেই সে নিজেকে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম অনেকদিন পর্য্যন্ত অনুনয়, অনুরোধ, মানাভিমান অশ্রুবর্ষণের পর মাও হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এত বড় বনিয়াদি বংশ—সেই বংশ-লোপের ভয়ও যখন উহার নাই, তখন তিনিই বা আর করিবেন কি? মনে করিলেন, এ তাঁহারই কৃতকার্য্যের ফল। সন্তান-স্নেহে অন্ধ হইয়া চিরদিনের নীতি-পথ লঙ্ঘন করিয়া ছেলেকে বিদেশী শিক্ষা দিয়া যে মহাপাপ তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ভোগ তাঁহাকেই যে ভুগিতেই হইবে! ইহার সহিত প্রবল অভিমানও জড়িত ছিল। মনে হইল, এ সংসারে আমি তবে কেহই নই, পেটের ছেলে,—সেও পর হইল, এতটুকু দিয়াও সুখী করিল না! মনে করিলেন, বিবাহ হয়ত আমি বাঁচিয়া থাকিতেই করিল না! ইহার পর সুগভীর অভিমানে একেবারেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। জ্ঞানানন্দে বিভোর-চিত্ত ইন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মুক্তি পাইয়া একবার সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিল, হইল কি? মা যে বড় চুপ্‌চাপ্! তখনই নিজের অনুকূলে ধরিয়া লইল, মা এইবার তবে

নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন। যাক্, বাঁচা গেল!

সে বৎসর—কংগ্রেসের পর ইন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরিতেছিল। ফিরিবার সময় স্থলপথে না ফিরিয়া জল-পথে ফিরিবার সে সংকল্প করিল। ইহাতে ট্রেনের গোলমাল না থাকায় মনের এবং জল-বিহারে শরীরের—এক ঢিলে এই দুই পাখী মারার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। মা খবর পাইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, তীর্থের পথে যদি যাওয়া ঘটে তবে তিনিও সঙ্গী হইবেন। ইন্দ্রনাথের আপাততঃ তীর্থ ভ্রমণের সাধ ছিলনা,—শুধু জল-বিহারে আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই সে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও বাধা পড়িল, জল-পথে শরীরের উপকার না হইয়া অপকারই হইতেছিল। বিরক্ত চিত্তে ইন্দ্রনাথ অবিলম্বে বাড়ী ফিরিবার হুকুম দিল।

পূর্ব্বরাত্রে ভয়ঙ্কর ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া সকাল বেলা আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। নিস্তরঙ্গ নদী-জলেও পূর্ব্ব রাত্রের বিশ্ব-গ্রাসিনী ভীমা মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে ছিলনা। ঝড়ের সময় বজরা তীরে বাঁধিয়া ইন্দ্রনাথ সদলে আশ্রয়ের সন্ধানে তীরে উঠিয়াছিল। কিন্তু নিকটে কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন না দেখিয়া অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া বজরা-বক্ষেই তাহাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অনুপায়ে রাত্রে কাহারও আহার হয় নাই। তাই সকাল বেলা সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ রন্ধনের আয়োজনে ব্যাপৃত, কেহ কাছে কোন বাজার-হাট্ আছে কিনা তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, কেহ-বা নদী-জলে স্নানাদি করিতেছিল। ইন্দ্রনাথ মুখ-হাত ধুইয়া জলযোগান্তে তীরে-তীরে একটু ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাত্রে অন্ধকারে স্থানটিকে ভাল বুঝিতে পারা যায় নাই। এখন দিনের আলোয় জনহীন স্থানটিকে নির্ব্বাসিতের দ্বীপের মত মনে হইতেছিল। নদী-তীরে বড় বড় গাছ—অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, আরও নানা জাতি বৃক্ষ, কোথাও ভগ্ন, কোথাও অর্দ্ধভগ্ন। পুরাতন শিকড় বাহির-করা বড় বড় গাছগুলি কেবল প্রকৃতির বিভীষিকার প্রতি তীব্র উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সমভাবে সতেজে দাঁড়াইয়া আছে। ইন্দ্রনাথ লক্ষ্যহীনভাবে তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কখন শান্ত নদী-বক্ষের পানে চাহিয়া দুর্য্যোগময়ী রজনীর তাণ্ডব নৃত্যের সহিত মানব-চিত্তের ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীলতার তুলনা করিতেছিল। সহসা চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, নদী-তীরে একেবারে জলের ধারে ঝুঁকিয়া পড়া একটা বৃহৎ বটগাছের শিকড়ের ফাঁকের ভিতর ও কি পড়িয়া রহিয়াছে? কাছে গিয়া ভালো করিয়া লক্ষ্য করিতেই ইন্দ্রনাথ বুঝিলেন, তাঁহার অনুমান মিথ্যা নয়—একটি ছোট ছেলে। হয়ত গতরাত্রির ঝড়-জলে নৌকাডুবি বা অমনি কোন কারণে জল-মগ্ন হইয়া বালক স্রোতে ভাসিয়া এখানে আসিয়া বৃক্ষ-কোটরে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ছেলেটি বাঁচিয়া আছে কি না বুঝিতে পারা যায় না। শ্বাস-পতনের চিহ্ন ছিল না। সারারাত্রি জলে ডুবিয়া থাকায় হাত-পা-মুখ সমস্তই কুঞ্চিত বিবর্ণ দেখাইতেছিল, তবে বিকৃত হয় নাই। গাছের ফাঁকে ফাঁকে শাখার আড়াল দিয়া যেটুকু রৌদ্রালোক আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছিল, তাহাতে মর্ম্মর মূর্ত্তির মুখে

যেন জীবনের রক্ত-আভা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ কাছে বসিয়া ছেলেটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, নিশ্বাস নাই—বক্ষস্পন্দনও থামিয়া গিয়াছে। বুকের উপর কান পাতিয়া অনেকক্ষণ পরে মনে হইল, বুঝি শ্বাস আছে, অতি ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট, তবু হয়ত আছে! চেষ্টা করিলে এখনও হয়ত এই মৃত দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার করিতে পারা যায়। পুঁথিগত বিদ্যার ইন্দ্রনাথের অভাব ছিল না। ডাক্তারি শাস্ত্রও সে অনুশীলন করিয়াছিল। জলমগ্নকে বাঁচাইবার জন্য যে-যে প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাহার সমস্তই সমাধা করা হইল। ছেলেটিকে সাবধানে বজরায় তুলিয়া আনা হইল, এবং দূর গ্রাম হইতে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসককেও পাওয়া গেল। সমবেত যত্ন ও চেষ্টার ফলে একটু-একটু করিয়া ছেলেটির মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল। ধীরে ধীরে প্রথম সূর্য্যোদয়ে বিকশিত কমল-কলির মতই সে তাহার পদ্মপলাশ চক্ষুদুটি উন্মীলন করিয়া চারিদিকে বিহ্বলের মত চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সে দৃষ্টিতে জ্ঞানের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া গেল না। সদ্যজাত শিশু-দৃষ্টির ন্যায় তাহা স্বচ্ছ নির্ম্মল ভাবহীন। ইন্দ্রনাথ আশাতীত আনন্দলাভে পুলকিত চিত্তে ছেলেটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার জল-যাত্রা সার্থক হইয়াছে।

এই ছেলেটির জন্যই তাহাদের বাড়ী ফিরিতে আরো কিছু দিন বিলম্ব হইয়া গেল। ছেলেটি অত্যন্ত ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইল। ইন্দ্রনাথ, চিকিৎসক ও অন্য সকলেই বুঝিলেন যে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা পুনরায় আয়ত্ত হইবার আর কোন আশা নাই। নূতন করিয়া তাহাকে ভাষা হইতে সকল বিষয়ই শিক্ষা দিতে হইবে। অতীত জীবনের উপর যে কালো যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা উত্তোলন করা এখন আর চেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। নিজের কথা সে কিছুই জানাইতে পারিল না, নাম, জাতি, গোত্র, দেশ,—এ-সব কথা কে জানাইবে! বালকের দেহে সে যে শিশুর জীবন লাভ করিয়াছে! ইন্দ্রনাথ কাছাকাছির মধ্যে তিন-চারি-খানি গ্রামে খোঁজ লইলেন, কেহ তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিল না। ছেলের ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় কাত্যায়নী দেবী ব্যাকুল হইয়া তাড়া দিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। আর বিলম্ব করা অনুচিত বুঝিয়া ইন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের জন্য অনুসন্ধানের ভার তুলিয়া রাখিয়া আপাততঃ বাড়ী ফিরিবার দিকে মনঃসংযোগ করিল। ইন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে কাত্যায়নী দেবী দেখিলেন যে একটি বছর পাঁচ-ছয়ের ছেলেকে সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। ছেলেটির বিষয়ে ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই তাঁহাকে পত্রে সংবাদ জানাইয়াছিল, তাই বিস্মিত না হইলেও তিনি মুগ্ধ হইলেন। ছেলেটির কাঁচা সোনার বর্ণ, সুন্দর মুখ, বড় বড় কালো চোখে অর্থ-হীন দৃষ্টি—প্রচণ্ড বাত্যাপীড়িত পত্র-পুষ্পহীন শ্রীহীন তরুর মত শীর্ণ দেহ সহজেই মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া নিজের দিকে ফিরায়। ছেলেটিকে মার কোলে দিয়া ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "তুমি ছেলে চেয়েছিলে মা, তাই

ভগবান্ একে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েচেন—এ আমারি ছেলে।" মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছেলেটিকে কাছে টানিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন,"আহা,কার বাছা কোল খালি করে এলো রে! আহা, এ ধন হারিয়ে বাপ্ মা যে বুক ফেটে মরে যাবে ইন্দু, কি করে তারা প্রবোধ দিয়ে জীবন ধারণ করবে, বাবা?" ইন্দ্রনাথ ছেলেটির উদ্বেগহীন শান্ত মুখের পানে চাহিয়া চিন্তিত মুখে কহিল, "তারাই কি বেঁচে আছে মা, তোমায় ত লিখেছিলুম, আগের রাতে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। হয়ত নৌকাডুবি হয়ে তাঁরা মারাই গেছেন। এও কি বাঁচত? তুমি যে বল মা, রাখে কৃষ্ণ মারে কে,—তা খুব সত্যি মা। ভগবান্ নেহাৎ একে বাঁচাবেন বলেই বাঁচিয়েছেন। নৈলে তেমন জায়গায় আমরাই বা বজরা বাঁধতে গেলুম কেন? সহর নয়, গাঁ নয়, কিছু না, একেবারে একটা পতিত জমি। ইচ্ছে করে সেখানে কেউ কখনো নামেনা। নেহাৎ ওর আয়ু আছে বলেই না ডাক্তাররা বল্‌ছেন ক্রমে ক্রমে আবার ওর জ্ঞান-বুদ্ধি ফিরে আস্‌তে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব স্মৃতি হয়ত কখনও ফিরবে না।"

কাত্যায়নী দেবী সনিশ্বাসে বলিলেন, "কি জাতের ছেলে, তাও ত বোঝা গেল না।" ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "বল্লেম ত মা, আমার ছেলে, তবে আর কি জাত হবে! ওর গলায় একটি রক্ষা-কবচ না কি ছিল সেটি খুলিয়ে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে কি শর্ম্মা—এই টুকু পড়তে পারা গেছল। ভূর্জ্জপত্রটুকু অনাবশ্যক ভেবে এমন করে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল যে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে। মাথাতেও ছোট একটি শিখা ছিল—আমার ছেলে যে! বামুন না হয়ে যায় কি!"

উচিত-বোধে ইন্দ্রনাথ কিছু দিন সংবাদ পত্রে ছেলেটির সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিল। দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া ক্রমে বৎসর ঘুরিয়া গেল, কেহই সংবাদ লইতে আসিল না। ক্রমে এ চিন্তা ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নীর মন হইতে একেবারেই দূরে চলিয়া গেল, বরং ইদানীং মনে করিতে ভয় হইত, পাছে কেহ সহসা কোনদিন আসিয়া তাহাকে দাবী করিয়া বসে! অরুণকে ছাড়িয়া তাঁহারা বাস করিবেন কেমন করিয়া। সে যে কাত্যায়নী দেবীর অন্তরের কতখানি অংশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া তিনি সময়-সময় আশঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ভরত রাজার মৃগশাবক-প্রীতির ন্যায় তাঁহারও শেষ-জীবনে এ কি দুশ্ছেদ্য মায়া-জালের বেষ্টন লাগিল! তবু এ জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি পাইতেও ইচ্ছা হয় না। ইহাকে স্নেহ করিয়া ভাল বাসিয়া, ইহার আবদার-বায়না শুনিয়া যে তাঁহার বন্ধন-প্রার্থী হৃদয় তৃপ্ত হইতেছিল। ছেলে সংসারী হইল না, এ দুঃখ অহরহ কণ্টক-ক্ষতের ন্যায় মনের ভিতর জ্বলিতে থাকিলেও মুখে কখন আর সে কথা প্রকাশ করিতেন না। সে যখন ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে দুঃখ দিতে বদ্ধ-পরিকর, সাধ্যসত্ত্বেও সে যে তাঁহার সংসারের কোন সাধ মিটাইতে দিল না, এ দুঃখ কি আর ভুলিবার! মনে পড়িল, একদিন অত্যন্ত জেদাজেদি করায় ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল, সাধ করিয়া কেন কষ্ট ডাকিয়া আনিতে চাও মা,

আমরা মায়ে-ছেলেয় বেশ ত আছি। পরের মেয়ে সে কি তোমায় বুঝিবে, না তোমার উচিত মান্য-শ্রদ্ধা দিতে পারিবে! গভীর অভিমানে সেদিন কাত্যায়নী দেবী নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হইয়াছিল, ছেলে তবে তাঁহাকে এইরূপই বুঝিয়াছে। হায়রে, তিনি কি তাঁর সাতরাজার ধন সাগর-সেঁচা মাণিক ইন্দুর বৌয়ের মান্য-ভক্তিরই কাঙ্গাল! নাই বা করিল সে তাঁহার সম্মান! তবু ত সে তাঁহারই বুকের ধন, ইন্দুর বৌ! তাঁহার পতিকুলের, ভবিষ্যৎ বংশ-রক্ষকের জননী হইবে। অভিমানের অশ্রু অঞ্চলে মুছিয়া কাত্যায়নী দেবী মনে মনে উদ্দেশে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "মার সাধ ইন্দু তুই বিয়ে করে ছেলের বাপ্ হোস্, নৈলে কেমন করে বুঝ্‌বি, ছেলে কি জিনিষ!" সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, হয়ত সে প্রার্থিত দিনও আসিবে, কেবল দুর্ভাগিনী তিনিই তাহা দেখিয়া যাইতে পারিবেন না।

অরুণকে পাইয়া কাত্যায়নী দেবীর মনের ক্ষোভ দুধের অভাবে ঘোলেই অনেকটা মিটিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে অরুণ তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিত। কিন্তু বিনা উপদেশেই সে কাত্যায়নীকে মা বলিতে সুরু করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের কড়া হুকুমে কেহ কখনও তাহার অতীত জীবন সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে পাইত না। জমিদার-পুত্রের মতই তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল; দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই মনে করিল, ইন্দ্রনাথ নিশ্চয় ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র লইবে। অরুণকে পাইয়া কাত্যায়নী দেবী ছেলের দিক হইতে অনেকখানি মন সরাইয়া লওয়ায় ইন্দ্রনাথও খুসী হইয়াছিল। মাও কাজ পাইলেন, তাঁহার সংসার করা, ছেলে মানুষ করার সাধ মিটিবার একটুও যে অবসর মিলিল, এ ভালই হইল। ইন্দ্রনাথও এইবার নিশ্চিন্তভাবে নিজের ইচ্ছা-মত পড়াশোনা লইয়া থাকিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সভ্যতার প্রতি

তোরাই শ্রেষ্ঠ তোরাই সভ্য সৃষ্টি-সেরা তোরাই শুধু
গর্ব্ব ক'রে বেড়াস্ ওরে মানুষ!—
ক্রমোন্নতির শিরোভূষণ মাথার মণি তোরা সবাই
তোদের অসীম দীপ্তি এবং জলুস্!
টুটিয়ে আঁধার মগজ তোদের রংমশালের আল্‌চে মালা,
জগৎ-সভায় চুটিয়ে করিস্ দাবী;
ওরে মানুষ, ব'লে থাকিস্ বার করেচিস নিখিল বিশ্বে
সব রহস্যের কুলুপ-খোলা চাবি;—

সাম্‌নে এনে প্রমাণ ধরিস্ বিজ্ঞানের ঐ যন্ত্র-শালা,—
রাত্রি-দিবা কচ্চে প্রসব যেটা,
সব-মেরিন ও উড়ো-জাহাজ বেতার-বার্ত্তা-বহন যন্ত্র
সংখ্যাতীত এটা ওটা সেটা।
ঘনিষ্ঠতা করবি স্থাপন শুন্‌চি অতি সত্বরেতেই
দূর-আকাশের গ্রহবাসীর সাথে,
পরলোকেও চল্‌বে তোদের কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান
এমন আশাও রাখিস্ মানুষ হাতে।
বুদ্ধদেবের ব্যর্থপ্রয়াস জরা-মৃত্যু ব্যাধির মুক্তি
এতদিনে সফল হোলো বুঝি;
অনুবীক্ষণ লাগিয়ে চোখে বীজাণু সব তাদের নাকি
হাত্‌ড়ে তোরা বার করেচিস্ খুঁজি।
অহংকারে মাটির 'পরে পড়্‌চে না পা তোদের কারো
নীল আকাশের বুক চিরে তাই তোরা,
সভ্যতার ঐ উড়িয়ে নিশান উড়িস্ গোড়ে উড়ো-জাহাজ,—
উর্দ্ধদৃষ্টি স্তব্ধ বসুন্ধরা!
এইবারেতে হয়তো কোনো নতুন-যুগের নতুন কলম্বাসে
অসীম শূন্যে কর্‌বে আবিষ্কার,
আকাশ-সাগর মথন ক'রে নতুন কোন আমেরিকা
পরীরা সব বাসিন্দিয়া যার।
ধন্য তোরা ওরে মানুষ, ধন্য তোদের কীর্ত্তি-কলাপ,
সভ্যতার আর রাখ্‌লিনেকো বাকি;
কিন্তু এ কি দেখ্‌চি চেয়ে এমন সবুজ সোনার বিশ্ব
আগা-গোড়াই রক্তে মাখামাখি।
মস্ত একটা কসাইখানা বিপুল বৃহৎ হত্যাক্ষেত্র
কাক-শকুনের লীলার ভূমি ক'রে,
তুল্লি গ'ড়ে হায় রে মানুষ এই পৃথিবীর সমস্তটা
শতাব্দীর পর শতাব্দীটা ধ'রে।
আদিম যুগের বর্ব্বরতা ঘুচ্‌লোনাক একটু আজো
এখনো সেই হিংস্র পশুর মত,
পরস্পরের টুঁটি টিপে তেম্‌নি করি্‌স্ ছেঁড়াছিঁড়ি
নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এঁকে শত।

বর্ব্বরেরা রাগের মাথায় জ্বলে উঠে আগুন-সম
সটান ছুরি বসিয়ে দিত রুখে ;
রাষ্ট্রনীতির সমাজনীতির ধর্ম্মকথা কয়ে তারা
সয়তানিটা পুষ্‌তোনাক বুকে।
আকাশ থেকে টিপ ক'রে ঠিক মাথার উপর ছুঁড়তে বোমা
কি ক'রে হয় জানতোনাক তারা,
শক্ত ব্যাধির বীজাণু সব মিশিয়ে দিয়ে নদীর জলে
জান্‌তোনাক কায়দা শত্রু-মারা।
ইতিহাসের পাতায় পাতায় রক্তাক্ষরে স্পষ্ট লেখা
হত্যাকাণ্ড যুগ-যুগান্ত ধ'রে,
সভ্যতার এই ক্রমিক বিকাশ হত্যা-ব্যাপারটাকে শুধু
তুল্‌চে গ'ড়ে সূক্ষ্মশিল্প ক'রে!
যন্ত্রপাতি দিচ্চে যোগান বৈজ্ঞানিকের দলেরা সব
জ্ঞানীরা সব তত্ত্বকথা কয়ে,
মানুষ-মারার গাইছে সাফাই নির্লজ্জের মতন বসে
একশো মুখে বক্তৃতায় ও ব'য়ে।

যে সভ্যতার ইস্তনাগাৎ উচ্চৈস্বরে অষ্টপ্রহর
গর্ব্ব ক'রে বেড়াস্ ওরে মানুষ!
সে ত শুধু ছাইএ ভরাট্ নেহাৎ ভুয়ো [illegible]সী-আপেল
সাবান-জলের ঠুন্‌কো ফাঁপা ফানুস।
হাতে মেরেই এক-রকমে নিষ্কৃতিটা দিতিস্ যদি
বাঁচ্‌তো তাতে অনেক চোখের জল,
বিশ্বব্যাপী কান্না এ যে তুল্লি তোরা ভাতে মেরে
ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌চে ভূমণ্ডল!
চর্ব্ব্য চোষ্যে পূর্ণ উদর ঘূর্ণি-বায়ুর মতন তোরা
হাঁকিয়ে মোটর করিস ছুটোছুটি,
নিরীহ প্রাণ অসংখ্য লোক চাকার তলায় প'ড়ে তোদের
দিবারাত্র খাচ্চে লুটোপুটি।
আয়ু যাদের ফুরিয়ে গেছে বল্‌চি তোরা মরবে তারা
মরবে এটায় না হয় আর একটাতে,

পথ চল্‌তে অশিক্ষিত অসাবধানী গ্রাম্য যারা
তাদের উচিত মৃত্যু অপঘাতে,
সে জন্যে শোক মিথ্যে করা—হাঁকা জোরে হাওয়ার গাড়ী
বড় মানুষ, গরীব মানুষ মেরে ;
তোদের বিলাস হাঁড়িকাঠে হয় তো রোজই নরবলি
একরকম না আর একরকম ফেরে।
এই যে নিত্য যাচ্চে মারা অসংখ্য লোক অনাহারে
কাড়ছে মায়ে ছেলের মুখের গ্রাস,
এই যে নিত্য মর্‌চে রোগে একটি ফোঁটা ওষুধ বিনা
অসংখ্য লোক খাচ্চে নাভি-শ্বাস,
এই যে যত মুটে-মজুর দর্জ্জি ধোপা চাষা তাঁতি
কামার কুমোর শ্রমজীবির দল,
আহার-বিহার বিলাস-দ্রব্য জোগায় তোদের ভারে ভারে
বুকের কাঁচা রক্ত ক'রে জল,
নিজেরা হায় পায় না খেতে দুটি বেলা পেটে ভরা ভাত
ভগবানে ডাক্‌চে ত্রাহি ত্রাহি—
সভ্যতার এই শতাব্দীতে এই যে ভীষণ অত্যাচারটা
ইহার জন্য নয় কি তোরা দায়ী ?

ক্রমোন্নতির প্রথম সূত্র দুর্ব্বলেরা হট্‌বে পিছু,
যোগ্যতমের হবে উদ্বর্ত্তন ;—
সব দেশেরই ইতিহাসে এই কথারি দিচ্চে সাক্ষ্য
এই কথারি করছে সমর্থন ;
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার অলীক স্বপন দেখ্‌ছে যত
কাব্যপ্রিয় অন্ধ কাল্পনিক ;
আসমান-জমি রইছে ফারাক কল্পনা ও বাস্তবেতে
কালও যেমন আজো তেম্‌নি ঠিক।
অতএব এ মিথ্যে বিলাপ পৈশাচিকী নৃত্যলীলা
জগৎ জুড়ে হউক অভিনয়,
অত্যাচারে উৎপীড়নে যাক্ এ বিশ্ব ছারে খারে
হউক দুষ্ট সয়তানেরি জয়!

ভণ্ডামি আর বুজ্‌রুকিটা বুকের ভিতর থাকুক্ পোষা
মুখে থাকুক্ লেগে কপট হাসি,
ধার চাইতে একটি পয়সা তোমার গৃহে বন্ধু যদি
দ্বারস্থ হয়—দুহাত পাতে আসি,
ফিরিয়ে দিও দু-চার কথা সদুপদেশ দিয়ে বরং
সেই সুযোগে এম্‌নি সুকৌশলে,
দ্বিতীয়বার আর যেন সে তোমার বাড়ীর ত্রিসীমানা
মাড়ায়নাকো আবার কোন ছলে।
দল বেঁধে আর কোমর বেঁধে উঠে প'ড়ে সবাই লাগো
দেশের কাজে সমাজ-হিতের ব্রতে,
ধর্ম্মে বেজায় গ্লানির মাত্রা উঠ্‌ছে বেড়ে দিনে দিনে,
রহিত কর্‌তে সেইটে কোন মতে—
গলাবাজী কলমবাজী এই দুটো কাজ মিলে মিশে
চালাও কসে আচ্ছা ক'রে জোরে ;
নেপথ্যে ও অন্তরালে যা প্রাণে যায় ক'রে যেও
কে আর দেখ্‌ছে আগল ঠেলে ঘরে !

উন্নতি আর সভ্যতা কি একেই বলে ওরে মানুষ
যুগ-যুগান্তের পরিশ্রমের ফল,
ষোলআনাই ভেজাল মেকি গোয়ালিনীর দুধের মত
সেরেফ খাঁটি শাদা রঙের জল।
সভ্যতার এই খাঁচার ভিতর হাঁপিয়ে ওঠে পরাণ-পাখী
বর্ব্বরতার মুক্ত বায়ুর তরে,
বিষিয়ে ওঠে সমস্ত প্রাণ কলের যত ধুলোয় ধোঁয়ায়
কৃত্রিমতায় জ্যান্ত মানুষ মরে।
দূর ক'রে দে ইলেক্‌ট্রিকের পাখা আলা মোটর ফেটিন
সভ্যতার সব বিলাস বাবুয়ানা।
সময় সময় ইচ্ছেটা যায় পালিয়ে যাই সেই বন্য দেশে
বর্ব্বরতা দিচ্ছে যেথা হানা !
আফ্রিকা কি আমেরিকার আদিম অধিবাসীর সাথে
নগ্ন বেশে বেড়াই বনে বনে,

সভ্যতার এই বিলাস-সজ্জা ধুলোর মত ফেলি ঝেড়ে
মিথ্যে জ্ঞানের কাজল বোলাই মনে।
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এই রাবিস-পোরা মগজটাকে
উপুড় ক'রে উজোড় ক'রে ফেলি,
মিল ডার্‌উইন স্পেনসার আদির ভুলি ঝুটো বুকনিগুলো
কি বায়রণ কি টেনিসন শেলী ;
রং-বেরঙের উল্কি আঁকি নক্সা কাটি গায়ের উপর
বনের পশু বেড়াই শিকার ক'রে,
সাপের সঙ্গে বাঘের সঙ্গে অষ্টপ্রহর নানান্ ব্যথা
ঘুরে বেড়াই বনে বনান্তরে।
মউয়া ফুলের মধুর সুরা পান করে নে' মেহোল্লাসে
পাহাড় পাহাড় বেড়াই নেচে নেচে,
অসুখ হ'লে ভুত ঝাড়াতে ডেকে আনাই রোজা গুণিন্
না হয় ত খাই গাছের পাতা ছেঁচে।
ডাক্তারির সব ফক্কিকারী উড়িয়ে দিয়ে একটি ফুঁয়ে
আবার সুস্থ সবল হয়ে উঠি,
হাত ধ'রে মোর বন্য-প্রিয়ার চাঁদের আলোয় নদীর তীরে
চাঁদের আলো দুহাত দিয়ে লুটি ;
গাছ-পাথর আর নোড়া-মুড়ির করি ফেটিস উপাসনা
আচার-ব্যাভার তাদের গ্রহণ করি,
তাদের রীতি তাদের নীতি তাদের প্রথা কুসংস্কার
বুকের ভিতর আঁকড়ে নিয়ে ধরি!
গির্জ্জে গৃহে মন্দিরেতে সকল আচার অনুষ্ঠানে
সর্ব্বনাশী এই যে কৃত্রিমতা,
ইহার চেয়ে অনেক ভাল সুস্থ-সবল সহজ জীবন
বন্য-জাতির নগ্ন বর্ব্বরতা!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

কাব্যকথা

কল্পনা ও বাস্তব

এই যে ঘরের মধ্যে বসে' আছি—এর এমন জায়গা নেই, এর মধ্যে এমন জিনিষ নেই যার কোন একটি রং না আছে। কিন্তু এম্‌নি অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে,ছবিতে না এঁকে দেখা'লে সেই রং গুলি চোকে পড়ে না; এমনি দেখতে এর কোনোখানটায় রঙ্গীনতা দেখ্‌ছি নে। কোনো পোটো যদি এগুলিকে ঠিক ফোটাতে চায়, তবে তাকে কত করে' কত রকম রঙেরই না সমাবেশ করতে হবে, প্রত্যেক রংটির জন্যে কত পরিশ্রম করতে হবে! তারপর ছবিখানি আঁকা হ'লে তার সব রংগুলি আমাদের চোকে পড়বে। ছবিতে যে জিনিষটা এমন রঙীন, আসলে তার মধ্যে কোনো রঙের পরিচয় আমরা পাই নে।

তুলনাটা যে ঠিক-ঠিক হবে তা নয়, কিন্তু তবু বোঝাবার পক্ষে একটু সুবিধে হবে। বাস্তব মূর্ত্তি ও তার ছবিতে এই যে ধরণের প্রভেদ, বাস্তবে ও কাব্যে ঐ রকম একটা তফাৎ আছে বোধ হয়। ওখানে যে-জিনিষটা রং নিয়ে, এখানে তা রস নিয়ে। চোখের সামনে নিত্য যে সব ব্যাপার ঘটছে,তা দেখে রসোদ্রেক হয় না, কিন্তু যেই সেটাকে কোনো কবি বা ঔপন্যাসিক কাব্যের আকারে ধরে' দেন, অমনি প্রাণটাতে বেশ একটু মাধুরীর আবেশ লাগে, ওই যে রঙের কথা বলেছি, সেই রং—যার যেমনটি,—চোকে পড়ে।

এই জীবনটাই তা হলে কাব্য, অন্ততঃ কাব্যের বিষয় ত? এখন কাব্য হওয়া আর কাব্যের বিষয় হওয়ার মধ্যে বড় বেশী তফাৎ আছে কি? আছে বৈ কি—খুব তফাৎ!

ধর, আমি একটা ব্যাপার কতবার ঘটতে দেখেছি, একটা দৃশ্য কতবার আমার চোকে পড়েছে; কিন্তু যখন একজন কবি বা ভালো চিত্রকরের হাত দিয়ে তার বর্ণনা বা ছবি বেরুল, তখন সেটা যে সেই আমার দেখা জিনিষই, একটুও এদিক্‌-ওদিক নয়, এ জ্ঞানও আছে, অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে বলছি—বা! কি সুন্দর! এমন সুন্দর বলে' বোধ ত আগে হয়নি! এর মানে কি?

এইখানে অনেকে বলে' উঠবেন জানি—'ওর কারণ আর কিছুই নয়, আসল জিনিষটা সত্যিই এত সুন্দর নয়, কবিরা বেশ একটু বাড়িয়ে,তাঁদের বাতিকগ্রস্ত স্বভাবের দরুণ একটি রঙীন মিথ্যার ফ্রেমে সেটিকে সাজিয়ে বসিয়ে দেন, সেইটুকু তাঁদের ভেল্কি—বাজীকরের মত আমাদের চোকে সেটাকে যেমন ইচ্ছে বদলে' তাক লাগিয়ে দেন। প্রাকৃতকে অতিপ্রাকৃত করে' তোলার ক্ষমতাই কবিত্ব—শাদা জলে একটু গুঁড়ো মিশিয়ে আমাদের নেশা করিয়ে দেওয়াটাই তাঁদের বাহাদুরী।'

কথাটা ঠিক বটে। সেই বাহাদুরী যে লেখার মধ্যে নেই, তা কাব্য নয়। কিন্তু ওই সত্যি-মিথ্যা কথাটার মধ্যে একটু গোল আছে। যাঁরা এই জগৎ ব্যাপারের রহস্য একটু বেশী করে' ভেবে দেখতে গিয়েছেন, তাঁরা অনেক সময়েই এটাকে প্রকাণ্ড ধাঁধা বলে' হাল ছেড়ে

দিয়েছেন—কোন্‌টা সত্যি, কোনটা মিথ্যা, এর মীমাংসা এক রকম অসম্ভব মনে হয়েছে। আসল কথাটা আর কিছু নয়, জীবনের যে দিকটা সকলকে সমান ভাবে স্পর্শ করে, অর্থাৎ, জীবন-যাপনের প্রয়োজনের মাপ-কাঠিতে বস্তু সকলের যে আকার,আয়তন ও অর্থ নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে--সেইটা বাস্তব তথ্য এবং তথাকথিত সত্য বলে' আমাদের একটা সর্ব্ববাদিসম্মত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। সেদিকটার রূপ আছে কিন্তু রং নেই, মূর্ত্তি আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই, ব্যথা আছে কিন্তু সুর নেই। কিন্তু, প্রয়োজনের যা কিছু দাবী তা চুকিয়ে দিয়েও যার অন্তরে প্রাণশক্তি উদ্‌বৃত্ত থাকে,সেই একটু মুক্তি পায়; ঐ উদ্‌বৃত্ত প্রাণশক্তি,একটা খেলা—একটা লীলায় নিয়োজিত হ'তে চায়; চোকে তখন রং লাগে, প্রাণে তখন সুর বাজে, মনে তখন সুন্দর-বোধ জাগে। তখন যে-দিকটা তোমার-আমার চোকে পড়ে না, সেই দিকটা তার চোকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যদি বল, সেদিকটা তার মনের মধ্যেই আছে, বাহিরের উপর তাকে বসিয়ে দেওয়া হয় মাত্র—তবে উত্তরে এই বলি,সবই ত মনে-গড়া! ওই বাস্তব তথ্যের দিকটা—ওটাও মনে; তফাৎ এই যে, একটা হচ্ছে সাধারণ সার্ব্বজনিক প্রয়োজন-পীড়িত মনের দিক, আর একটা হচ্ছে, অসাধারণ প্রয়োজনমুক্ত সলীল স্বাধীন মনের দিক। বরং বিচার করে' দেখলে ওই শেষের দিকটা আরও সত্য, কারণ, সেটা মুক্ত মনের দিক—বন্ধন-অবস্থায় কখনো সত্যকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয়, সৌন্দর্য্যের দিকটাই সত্যের দিক—মিথ্যাই অসুন্দর। কোনো বস্তুকে যতক্ষণ অসুন্দর দেখ্‌ছ ততক্ষণ তাকে সত্য করে' দেখ নি। সে রকম দেখার শক্তি চাই—সেই শক্তিকেই মনীষা, প্রতিভা বলে। আশ্চর্য্য, এই বাস্তবই অসুন্দর, বাস্তবই সুন্দর! তা'কে জয় করে' না নিলে সে প্রেয়সী হবে না। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, 'ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড—লয়ে বাম করে।' তার পাণিগ্রহণ করতে হলে ওই বিষভাণ্ডটি চুমুক দিয়ে হজম করতে হবে, তার পর আসল সত্যবস্তু যে ওই সুধাভাণ্ড—তাই দিয়ে চিরসুন্দরের স্বর্গে চিরকালের জন্য সে বরণ করে' নেবে। সুধাভাণ্ডটাই সত্য, তার কারণ, বিষই তার কাছে পরাজিত, সে বিষের কাছে নয়। তেমন শক্তিমান্‌ যিনি, তিনি এই রসের দিক,রঙের দিক যখন ফুটিয়ে তোলেন, তখন নিতান্ত নাস্তিক ছাড়া আর কেউ তাকে মিথ্যা বলে' অস্বীকার করতে পারে না। যে জিনিষ বাস্তবে ধরা দেয় না, সে কাব্যে ধরা দেয়; যেখানে প্রাণের সাড়া ছিল না, সেখানে প্রাণের সাড়া আশ্চর্য্য রকম জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' পড়ার আগে বাংলার পল্লীজীবনের দীন-হীন বাস্তবতার মধ্যে এত সৌন্দর্য্য এত প্রাণের অতলস্পর্শতা ছিল তা কে ভাবতে পেরেছিল? শরৎচন্দ্রের গল্প পড়ার আগে গাঁজাখোর নীলাম্বর অনেকে দেখে থাকবে, কিন্তু সেই গাঁজাখোরের মধ্যে অতবড় ট্রাজেডির নায়ক থাকতে পারে, ওই অত সামান্য মানুষটার মধ্যেই যে লিয়ার-ওথেলোর আকাশস্পর্শী হৃদয়-তরঙ্গ খেলতে পারে তা কে ভেবেছিল? কাব্য বাস্তবকে নিয়েই বটে; বাস্তবে কাব্যে তফাৎ এই যে, বাস্তবের মধ্যে যে সত্যসুন্দর প্রচ্ছন্ন আছে, কাব্যে কবির চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে সেটা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয়। কবির সৃষ্টি ভাগবত

সৃষ্টিকে অতিক্রম করে না, উজ্জ্বলও করে না—অন্ধের নয়নগোচর করে মাত্র। শোনা যায় টার্ণারের ছবিতে লণ্ডনের কুয়াসার রং প্রথমে ফুটে ওঠে; সেই ছবিগুলি দেখে লোকে আবার যখন সেই কুয়াসা দেখতে লাগল, তখন দেখে, সত্যিই ত! এ যে ঠিক সেই সব রঙেরই খেলা!

তা হ'লে হচ্ছে এই যে, জগত ও জীবনই কাব্যের বিষয়। কিন্তু তার প্রতিবিম্ব কবির চিত্তফলকে সত্যসুন্দর রূপে ধরা দেয়। তবেই, কাব্য ও জীবনের এই বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধের মধ্যে যেন একটু রূপান্তরের মত ধারণা রয়ে যায়। বস্তু, ব্যক্তির সম্পর্ক এসে, একটু রূপান্তর হয় বৈকি। এই রূপান্তর হওয়াটাই সত্য রসসৃষ্টি, আবার ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দরুণ রসসৃষ্টির বৈচিত্র্যও অনেক। তা না হ'লে, একই বস্তু এবং একই প্রাণের সঙ্গে তার সম্বন্ধের জন্য যে রস, তা যুগে যুগে কাব্যসাহিত্যকে এমন নিত্য-নূতন ও উপাদেয় করে রাখত না। তবু কথা ওঠে—তবে কি কবির নিজস্ব দৃষ্টি, রসকল্পনাই বাস্তবকে কাব্য করে' তোলে? ফের সেই কথাই ঘুরে আসছে যে, বাস্তবটা উপলক্ষ্য মাত্র, তার সত্য আলাদা, কবির কল্পনাই কাব্যের সত্য। উত্তর—হাঁ, না, দুইই। আগেই বলেছি বস্তুগত সত্য বলতে যা বোঝায়, তা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সত্য, কিন্তু সে-দিকটায় সুন্দর নেই, কাব্যের উপজীব্য তা নয়। বস্তু যখন প্রাণের সম্পর্কে এসে দাঁড়ায় তখনই বৃহত্তর সত্য অর্থাৎ সত্যসুন্দর স্বপ্রকাশ হন। এই রসরূপ-সত্যসুন্দরের জন্ম শুধুই মানুষের মনে নয়, শুধু বস্তুতেও নয়; উভয়ের ঘনিষ্ঠ মিলনে,—বস্তু ও ব্যক্তির—প্রকৃতি ও পুরুষের বিবাহে—তার জন্ম হয় বলে' আমার ধারণা। পুরুষ ও প্রকৃতির অসঙ্গতা একরকম মুক্তির অবস্থা বটে, তার অর্থ শূন্য—সৃষ্টির যা উল্টা। রূপের মধ্যে রসাস্বাদ করে' যে মুক্তি, প্রকৃতি ও পুরুষের অদ্বয়-ভাবের যে আনন্দ, সেইটে পরম সত্য এবং মুক্তি তাকেই বলে।

আগেই বলেছি, জগৎ ও জীবন যখন প্রয়োজনকে ঠেলে দিয়ে প্রাণের মধ্যে লীলার অবসর দেয়, তখন তা অশেষ দ্বন্দ্ব ও বহুরূপ সত্ত্বেও একটি-বোঁটায়-সাজানো শতদলের মতো ফুটে ওঠে। সকল খণ্ডতা যখন অখণ্ডতার রূপ ধরে, তখন তা আনন্দ দেয় এবং সুন্দর হয়ে উঠে। সৃষ্টির এই মর্ম্মের পরিচয়, তার এই গভীর ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারই রসাস্বাদন। এই রসাবস্থায় জ্ঞান-ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে যায়, একটা আস্বাদন মাত্র থাকে—সেই আস্বাদন হচ্ছে চরম করে' পাওয়া। দার্শনিকের জ্ঞান-বৃত্তি এমন পাওয়া পায় না! কিছুকে জানা মানে তাকে পাওয়া—পাওয়া মানে স্বারূপ্য লাভ, একাত্মীভূত হওয়া। তাই কবিকল্পনার একটা প্রধান লক্ষণ, sympathy—একেবারে তন্ময় হওয়া। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তখন আর দুই সত্তা থাকে না, এক হয়ে যায়, তাকেই বলে রসাস্বাদ।

এই বস্তু ও ব্যক্তির কথা নিয়ে, কাব্য ও কবিপ্রকৃতিতে দুইটা বিরোধী ধারা সাহিত্যে স্বীকার করে' নেওয়া হয়েছে; ইংরেজীতে Subjective বা Personal, আর Objective বা Impersonal—এই দুইটী নাম দেওয়া হয়েছে; আমাদের বাংলায় তার তর্জ্জমা হয়ে গেছে, ব্যক্তিতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্র। নাম দুটী বাংলায়

হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ ও অর্থ নির্ণয় এখনো সুবিহিত হয় নি। মানুষের জ্ঞানে যখন সব জায়গাতে একটা করে' দ্বন্দ্ব আছে, তখন এ ব্যাপারটাতেই বা না থাকবে কেন! বস্তুতন্ত্র বা ব্যক্তিতন্ত্র বলে' কোনো ভেদ বাইরের দিক থেকে ধরা গেলেও, কাব্যবস্তু রস যখন এক, তখন এ রকম ভেদ-নির্দ্দেশ তত্ত্বসঙ্গত নয়। কাব্য নিজতন্ত্র, বস্তুতন্ত্রও নয়, ব্যক্তিতন্ত্রও নয়। সত্যের মধ্যে যখন কোনো কারণে গোলোযোগ ঘটে তখনই বিরোধ দেখা দেয়। কবির কল্পনায় যখন সত্যভ্রষ্টতা আসে তখনই একটা বাড়াবাড়ি হয়, এই বাড়াবাড়িরই দুইটা দিক আছে, সত্যের নয়। মানুষের চিন্তার দুইটি বিপরীত প্রান্তে এই দুইটি বিপরীত জ্ঞান ফুটে উঠে। দার্শনিক বিচারে এই ভেদ আছে অস্বীকার করা যায় না। আমরাও সেই রকম বিচারে এই ভেদকে স্বীকার করে না নিলে আলোচনা বা ব্যাখ্যার সুবিধা হয় না। কিন্তু রসিকের মনে এ ভেদজ্ঞান আসে না!

আমাদের কবি এই দুই বিরোধী তত্ত্বের সমন্বয় করে দেখতে পেয়েছেন—'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।' অর্থাৎ সৃষ্টির মর্ম্মগত যে এক সত্য বা পরম সত্ত্বা—তা কখনো ভাবে, কখনো রূপে, বিরাজ করছেন। ভাবে তিনি সেই এক দিব্যসুন্দরকে দেখেন, রূপে যিনি বহুধা বিচিত্র হয়ে প্রকাশ হন। কিন্তু এই ভাব, রূপোদ্ধৃত অখণ্ড রস ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্তরের মধ্যে একাকার দিব্যজ্যোতিঃ রূপে তাকে দর্শন করা যায়, আবার বাইরের দিকে চাইলে তারই বহুবিচিত্র প্রকাশ,—সেই একই রস সাগরে তরঙ্গ চঞ্চল উচ্ছাস-ময় আনন্দপ্রবাহ সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্ব প্রকৃত রসজ্ঞানে নিত্যমিলি—কবি সেই কথাই বলেছেন। তবু কখনো ভাবারূঢ় অবস্থায় জগৎ থেকে পৃথক কল্পনা করে', নিজের মনের মধ্যে সত্যসুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করে' আরতি করেন,—

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন জীবন বিহারী!

এইটি হচ্ছে প্রকৃত subjective বা personal রস। তাই—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী!
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম জীবন গগনে
চারিদিকে চির যামিনী।
কিন্তু— জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিনী!

—এই রকম দু'বার করে' দু'দিকে চাওয়া আছে। ব্যক্তি এবং বস্তুর মধ্যে রসপ্রবাহের এই চলাচল-অবস্থায় দ্বন্দ্ব আছে, আবার সেই দ্বন্দ্বের মিলন-রহস্যও প্রকাশ হচ্ছে।

কবি বলেছেন, 'ভাব থেকে রূপে যাওয়া আসা'র কথা—ভাব থেকে রূপে, না রূপ থেকে ভাবে?—উভয়তঃ। কিন্তু কথাটা হচ্ছে—মানুষের জ্ঞানে রূপ আগে না ভাব আগে? fact আগে না idea আগে? Object এর perception আগে, না Subject এর consciousness আগে? মনোবিজ্ঞান বোধ হয় এ মীমাংসা টুকু অন্ততঃ ঠিকই করে। জগৎটাকে মায়া বলে' ধারণা করতে হলেও আগে তাকে স্বীকার্ করতে হয়।

ব্রহ্ম প্রতিপাদন করতে হ'লে সৃষ্টিকে প্রথমটা স্বীকার করতে হয়, নইলে যে উপায় নেই। এর মানে, যে-কোনো সত্যে পৌঁছতে হ'লে জগৎটাকে ভালো করে' দেখতে হয়। এই 'বহু'ই 'এক' কে প্রচার করছে, 'এক'-এ পৌঁছে 'বহু'কে যাঁরা নস্যাৎ করে' দেন, তাঁরা 'এক' এর সঙ্গে একত্ব লাভ করেন নি, তাঁদের মনে 'বহু'র বিবাদ মেটে নি! তাই 'তর্কে বহুদুর।'

কিন্তু প্রকৃত রসিক যিনি—তিনি রসাবস্থায় এই দ্বন্দ্ব সহজেই পার হয়ে যান। জগতের মধ্যে, প্রকাশের মধ্যে, রূপের মধ্যে—সকল জ্ঞানের আরম্ভ যেখানে—সেইখানে তার চরম পূর্ণতা উপলব্ধি করেন, আনন্দ পান। সেই এক সত্ত্বা, মনে ভাব (Idea), বাহিরে বস্তু (Fact) এবং হৃদয়ে বা আত্মায় রসরূপে অধিষ্ঠান করে। এই তিনের মধ্যে এক রসসূত্রে বিভিন্ন রূপে ঐ এক সত্ত্বা বিদ্যমান। এই তিন দিকেই কাব্য আছে, কাব্যে এই তিন দিক আছে বললে ঠিক হয় না; কারণ, এই তিন দিকের মধ্যে বিরোধ নেই; একই ব্যক্তির মধ্যে এই তিন দিক, তিন mood সম্ভব। জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যকারদের রচনায় এই ত্রিবর্ণ সূত্রেই বেছে দেওয়া যায়। যাঁরা সত্যই মুক্ত, তাঁরা এই তিন ঘরেই অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন। তবে, কে কোন ঘরে থাকতে ভালোবাসেন এবং সেইটি হচ্ছে তাঁর রীতি, এরকম সাহিত্যিক ভেদ নির্দ্দেশ করা যায় বটে। ওই তিন রীতি—একটি হচ্ছে বস্তুপ্রধান (Realistic), একটি ভাব্-প্রধান (Idealistic), আর একটি হচ্ছে ধ্যানপ্রধান (Mystic)। ধ্যান হচ্ছে যোগের অবস্থা, একেবারে পূর্ণ রসাবস্থা বস্তু ও ব্যক্তি সেখানে পৃথক সত্ত্বা নয়, সে অবস্থায় কাব্যে যা' প্রকাশ হয় তা ভাবও নয়, রূপও নয়, একটা কিস্তূত চেতনার আভাস। হৃদয়ের অতলস্পর্শ থেকে তা উঠে আসে, তার আকার সুপরিস্ফুট নয়, অপরের মনে যে সাড়া দেয়, সে যেন—Deep calls unto Deep.

বিশ্বসাহিত্যে কাব্যসৃষ্টির নানা আদর্শ আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভাবরস বা চিৎ-রসের (mysticism) চেয়ে বস্তুরস-প্রধান কাব্যই সব চেয়ে ফুটেছে ভাল। রসের সব চেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ হয় ওই বাইরের রূপের মধ্যে দিয়ে। চিদ্‌ঘন আনন্দ, প্রকাশের একমাত্র উপায় যে বাণী, তাকে অতিক্রম করে' যায়, তাই তাকে ইঙ্গিতে ইসারায় সঙ্কেতে আভাসে আস্বাদন করান' যায়; প্রকাশের mediumটা তার পক্ষে বড় অসম্পূর্ণ বলে' কাব্য সেখানে নিরাকার—শিল্পহিসাবে বর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন। সে অরূপ-রস ধ্যানীর উপভোগ্য; মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রসার সেখানে অল্প, তাই, সে-কাব্য ও তা'র আর্টকে একটু স্বতন্ত্র স্থান দিলে ভালো হয়।

ভাবপ্রধান (Idealistic, Subjective, Personal) কাব্যে কবির অহং তাঁর মনোরথে চড়ে' এমন স্বাতন্ত্র্য সাধনা করে, যে তাতে বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এ রকম কাব্যে 'ব্যক্তি'র 'যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা'র রস প্রবল হয়ে ওঠে। জগতের সত্ত্বাকে নিজের অহংজ্ঞান দিয়ে গ্রাস করে' উড়িয়ে দিয়ে, তার স্থানে যে ভাবজগতের প্রতিষ্ঠা হয়, তার সৌন্দর্য্য অল্প নয়। কিন্তু সেখানে

জগৎ সম্বন্ধে নাস্তিক্যবুদ্ধি আছে। আপন দৃপ্ত মনঃশক্তির যে লীলা সেখানে দেখ্‌তে পাই, তা'তে বাস্তববিমুখ অন্ধমনের কল্পনা-বিলাসের কেমন একটা একরোখা ভাব আছে, যেন সমগ্র-দৃষ্টির অভাব আছে বলে' বোধ হয়। জীবন ও জগৎ আপন মাধুরীতে ভরে' ওঠে না, কবির মন থেকে ধার-করা একটি পোষাক তার গায়ে সুন্দর মানিয়েছে, বোধ হয়। এ কাব্য আমাদের মনের অনেক নিভৃত ঘরের দ্বার খুলে' দেয় বটে, জীবন ও জগতের উপর আমাদের ভাব-প্রভুত্ব স্থাপন করিয়ে, আমাদের willকে মুক্ত করে' দিয়ে আমাদের রাজাসনে বসিয়ে দেয়, কিন্তু পূর্ণ মুক্তি দেয় না। 'অহং'এর বন্ধনই সব-চেয়ে বড় বন্ধন। বস্তুর মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তার বিষকে অমৃতে পরিণত করাতেই আনন্দ, সেইখানেই শক্তির পরিচয়। তাকে অস্বীকার করে' যে-কল্পনা স্বপ্নরচনা করে, সে চক্ষু বুঁজে' আনন্দ চায়, সেটা হচ্ছে মোহের আড়ালে আত্মরক্ষা, ক্রমাগত নেশা করে' আপনাকে মজিয়ে রাখা। সাহিত্যিক আর্টেও এ-কাব্যের একটা অসম্পূর্ণতা আছে। কারণ, জগৎ ও জীবনের মধ্য দিয়েই পরের সঙ্গে আমাদের যোগ—সেই জগৎ ও জীবনকে তুচ্ছ করে' আত্মরতির রস উদ্দীপন করাই এ-কাব্যের ব্রত; কাজেই পরের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে রসসঞ্চার করা যে শ্রেষ্ঠ আর্টের সাধনা—সে আর্ট এখানে ক্ষুণ্ণ হবেই।

এর কারণ, রসিকেরা বলেন, সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে সত্যের অভাব। যে-কাব্য বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অতিমাত্রায় ভাবপ্রধান, তার মধ্যে সৃষ্টিরহস্য প্রকটিত হয় না; জীবন ও জগতের বাস্তবতাকে নিংড়াইয়া সেখানে রসাস্বাদের চেষ্টা নাই। সুন্দর সত্যহীন নয়, সৌন্দর্য্য ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের রং নয়। সে বস্তু—জগতের অন্তরঙ্গ, বাস্তবের আসল বাস্তবতা, তথ্যের সত্য, অনর্থের অর্থ, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার। তাই দু'জন খুব বড় কবির একজন বলেছেন, "Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge; the impassioned expression which is in the countenonce of all science." আর একজন মন্ত্রদ্রষ্টার মত উচ্চারণ করেছেন, "Beauty is Truth, Truth Beauty." এই সত্যকে এই সুন্দরকে পেতে হ'লে, জীবনের মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে, সে-প্রতিমা গড়তে হ'লে এই পৃথিবীর ধুলোমাটি দিয়ে গড়তে হবে। ঘটে, পটে, মাটীতে সেই চিন্ময়ের অধিষ্ঠান, বাস্তবের—factএর ধ্যান করলে সে দিব্যদৃষ্টি লাভ হবে। যাঁর দৃষ্টি বাইরের দিকে রুদ্ধ, যিনি কল্পনার বিলাসকক্ষে মনোমুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেই নিজে বিভোর, তাঁর গানে দিব্য সুর লাগে না—সে ভাবের মধ্যে একটা অভাব থেকে যায়। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রস-পরিচয় থেকেই যে-কাব্যের উৎপত্তি হয়, তা জীবনের মতই বিচিত্র, মানব হৃদয়ের মতই গভীর, এবং সৃষ্টির মতই অনন্ত। যে গভীর অনুভূতি থেকে এই রসরচনা সম্ভব হয়, তা' প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—A poet believes nothing but what he sees. এই বস্তুপ্রীতিই শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদান।

এখানে, যেন কেউ মনে না করেন, আমি বাঙালী সমালোচকের তথাকথিত বস্তুতন্ত্রের ওকালতি করছি। ওই কথাটি আমাদের সময়ে যে-অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে সে অর্থ করলে, কাব্য—ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব,স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, এমন কি অর্থনীতির সঙ্গে—এক হ'য়ে যায়। আমি যে বস্তুর কথা বলছি সে নিছক fact নয়। Pater এর কথায়, শুধুই fact নয়, কবির sense of the factই কাব্যবস্তু—fact as connected with soul, of a specific personality—শুধু জড় fact নয়—soul বা 'চিৎ'এর স্পর্শযুক্ত fact, এক কথায়, fact নয় fact-সংশ্লিষ্ট truth. সেই truthই সুক্ষ্ম ও সুমার্জ্জিত হ'য়ে কাব্যে প্রকাশ হয়; কারণ "all beauty is in the long run only fineness of truth." জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যখন এই সত্যদৃষ্টি আসে, তখন এই bare fact থেকেই মুক্তি লাভ হয়। সেই দিব্য দৃষ্টি আর ভুল করায় না; সে আলোয় কবি যা রচনা করেন তা' বাহিরের সঙ্গে বিরোধ করে না। সেই অবস্থা-তেই কবির প্রতি ঋষির এই উপদেশ সার্থক হয়, যে—

"সেই সত্য যা' রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে! কবি,তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো!"

কবির কাজ হচ্ছে—'To animate fact with Divine life.' Divine life হচ্ছে truth; fineness of truthই হচ্ছে beauty.

এ-রকম 'বস্তুতন্ত্র' কাব্যের কোন্‌খানটা subjective আর কোনখানটা objective —বলা শক্ত; আদর্শ কাব্যই হচ্ছে এই। কাজেই, আমি গোড়াতে এই ভেদ-নির্দ্দেশটা রস-বিচারে অনাবশ্যক বলেছি। তবে কল্পনার বাড়াবাড়ি উভয় দিকেই হ'তে পারে বটে, সেখানে এই সত্যভ্রষ্টতার জন্যে রচনা নির্দ্দোষ হয় না। কবি ও রসজ্ঞেরা এই সত্যকে স্বীকার করেন। গেটের কথা—Art is the highest representation of Life—ম্যাথ্যু আর্ণল্ড স্বীকার করেছেন; তাঁর, সাহিত্যকে criticism of life বলার অর্থ—কাব্যে জগৎ ও জীবনের সত্যসুন্দর রূপ ফুটে উঠ্‌বে, তবে সে কাব্য। Pater, কি গদ্য কি পদ্য—উভয়বিধ সাহিত্যকলায় এই সত্য চান যে, জগৎ-গত তথ্যের যে রূপটি ব্যক্তির হৃদয়ে মুদ্রিত হয়, সেই রূপটি রচনায় একেবারে নিজস্ব আকার নিয়ে ফুটে উঠ্‌বে। প্রকাশই (Expression) আর্ট, এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হুবহু আকারই আর্টের সত্য। এখানে আর্টের সংজ্ঞাকে আরও উদার, আরও বৃহৎ করে' দেওয়া হয়েছে। কাব্যকলার আধুনিকতম বিকাশ লক্ষ্য করে', Pater কাব্যপ্রকৃতির এই যে মূল লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন, আমার মনে হয়, আর্ট সম্বন্ধে এই হচ্ছে শেষ কথা।

গেটে যাকে কাব্য বস্তু বলে' ধরেছেন, সে হচ্ছে UNENDLICHE NATUR—'at whose breast all things in heaven and earth drink of the springs of life.'—কাব্যের ভিত্তিকে তিনি এমনি বিশালতা দিয়েছেন। 'অহং'এর চেয়ে 'ইদং'এর মধ্যেই যে আনন্দ-মুক্তির পরিসর আছে—সেই কথাই তাঁর কাব্যকীর্ত্তিতেও প্রচার হয়েছে;

যে emotion বস্তুপ্রত্যক্ষ নয়, তাকে তিনি বর্জ্জন করেছেন। বাস্তবের অনুসরণ করে' ধীর-স্থির চিত্তে তা'কে যথার্থ করে' ফুটিয়ে তোলায় যে রসসৃষ্টি হয়, তাই হচ্ছে তাঁর মতে সত্যসুন্দর। এই সত্যসুন্দর-রূপ ভগবান বিশ্বজগতের বাইরে, ঊর্দ্ধে বিরাজ করেন না, জগতের প্রতি বস্তুর প্রকৃত সত্বায় বিরাজ করছেন—সেই সত্বা উপলব্ধি করানোই কবির কাজ। ভাবপন্থী মানুষ এই জগৎ ও জীবনের বাইরে,তার থেকে বড় করে' একটা অতিপ্রাকৃত দুর্ল্লভ লোক, দুর্ল্লভ-আদর্শ-স্বরূপ ঈশ্বর, ও দুঃসাধ্য নীতির কল্পনা যা' করে এবং তারি অনুসরণে বাস্তবকে যেমন ভেঙ্গে চুরে গড়তে বা দমন করতে চায়—তা সত্যও নয়, তা আর্টও নয়। বাস্তবের জ্ঞান সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ বলেই এমন মিথ্যাচারকে তারা প্রশ্রয় দেয়। তবেই আমাদের শ্রেষ্ঠ দর্শনতত্ত্ব এখানে এসে পড়ে, যে —পাপ বস্তুর মধ্যে নেই, কোনোখানেই নেই; জ্ঞানের অসম্পুর্ণতাই পাপ-বিভীষিকার কারণ —অবিদ্যাই পাপ। "To know all is to pardon all'—'He who hates vices hates mankind'—এই সকল উক্তি গেটের বড় প্রিয় ছিল। ম্যাথু আর্ণল্ড, সেই জন্য Shelley, Byron প্রভৃতি কবির সম্বন্ধে এই অভিযোগ করেছেন যে, সৃষ্টিশক্তি তাঁদের প্রচুর পরিমাণে থাকলেও, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের বড়ই অভাব ছিল—'they did not know enough'.

বস্তুতন্ত্র বলতে যে কি বোঝায় তা বোধ হয় এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। কাব্য বস্তুতন্ত্র মানে এই নয়,যে, সে-কাব্য মানুষের দুঃখ, দৈন্য বা দুর্নীতি মোচন করবে। জগৎ, বা—the thing as it is in itself—রসসিঞ্চিত হয়ে উঠবে। জীবনই প্রত্যক্ষের মত অনুভব হবে, অথচ তার সঙ্গে অজ্ঞাতে রসাস্বাদ হওয়ার দরুণ সকল বেদনায় আনন্দের সুর বেজে উঠ্‌বে। এই রসসঞ্চার ব্যক্তিগত চিন্তার যে ধারায় হয় হোক্, তা'তে সত্যসুন্দর-বোধ জাগলেই হল। Subjective, Objective—কোনো ধারাই বস্তুকে বাদ দিয়ে কাব্য সৃষ্টি করতে পারে না; কাব্যের যা সত্য, তা ওই দুয়ের মধ্যেই থাকা চাই, নইলে যা সত্যহীন তা ব্যর্থ, তা' সুন্দরও হ'তে পারে না—তা' প্রাণকে স্পর্শ করে না, কাজেই তার মূর্ত্তিও স্পষ্ট হয় না, তার আর্টও প্রবঞ্চনা মাত্র। ভাব বড়ই হোক্ আর ছোটই হোক, যদি সে বস্তুহীন না হয়, তা'তে যদি seiousness ও truth থাকে, এবং যদি তা কবির প্রতিভাগুণে নিখুঁত হ'য়ে প্রকাশ পায়, তবে কাব্যসৃষ্টি সফল হয়েছে বলা যায়। কাব্যের এই গুণকে Pater 'good art' বলেছেন। কিন্তু, এই প্রকাশ-সৌন্দর্য্য ছাড়া কাব্যের বিষয়মহিমা বা কল্পনাগৌরব বলে' আর একটা গুণও তিনি স্বীকার করেন। যে কাব্যে highest criticism of life আছে, অর্থাৎ মানব-ভাগ্যে, শ্রেষ্ঠ আশা ও আনন্দের বাণী, অথবা মানব-প্রাণের গভীরতম বিপ্লব বা হাহাকার যা'তে ফুটে উঠেছে,—সেই দিব্যদর্শনজাত কাব্যকে Pater 'great art' বলেন; উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজী বাইবেল, Divine Comedy ও Les Miserables এর নাম করেছেন।

মোট কথাটা হচ্ছে এই যে, কাব্য জিনিষটা তথ্যগত সত্যের চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান, আমরা যা'কে কবিকল্পনা বলে' উড়িয়ে দি।

সেইটেই হচ্ছে সত্যভেদ করবার অব্যর্থ শরসন্ধান।* মানবীয় কীর্ত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন কাব্য, তার মধ্যেই মানবের আত্মা, দেহ ও মন এই তিনের মিলিত সাধনার চরম ফল পাওয়া যায়। কিন্তু যে-কল্পনা এই সত্যকে প্রকাশ করে, তাই প্রকৃত কবিকল্পনা। যে কাব্যকলা জগৎ ও জীবনের সম্বন্ধে উদাসীন, তা সুন্দর হ'লেও কেবল খেয়াল মাত্র, কল্পনা নয়। বাস্তবের আসল মূর্ত্তি যাদের চোখে পড়ে না, তা'রাই এই কল্পনা ও সত্যের বিরোধী অর্থ করে, তারা কাব্যের সত্যকেও উপেক্ষা করে। বস্তু সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণা ও ক্ষুদ্র সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে, কখনো 'অসম্ভব' বলে, কখনো নীতিসূত্রের দোহাই দিয়ে 'অসুন্দর' বলে। আবার যখন অসম্ভব-কে চোখের উপর ঘটতে দেখে, তখন বলে—Truth is stranger than fiction; কিম্বা সেটা যদি তাদের সংস্কারবিরুদ্ধ হয়, তবে তা'কে সৃষ্টির নিয়মেরও ব্যতিক্রম বলে' তার উপর পাপকল্পনা আরোপ করে। কাব্যের কল্পনা বলে' যেখানে তা'কে মাফ করে, অর্থাৎ বেমালুম হজম করে, সেইখানেই কবির ও কাব্যের জয়। কারণ যেখানে সত্যসুন্দর পূর্ণ প্রকাশ হয়, আর্টবস্তু ও আর্টরীতি যেখানে সত্য থেকে একটুও বিচলিত হয় নি—সেখানে এই রকম গ্রহণ তারা করবেই। এই সত্য, জগৎকে আশ্রয় করেই ফুটে আছে; এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যে রসজ্ঞানের দিব্যদৃষ্টি কবিরা লাভ করেন, সেই দৃষ্টিই কল্পনা—আর কিছুকে এ নাম দেওয়া যায় না। এই দৃষ্টি নিয়ে বস্তুর মধ্যে যে অবাস্তব রমণীয়তা তাঁরা দেখতে পান, তাই প্রকাশ করবার প্রাণান্ত আগ্রহে কাব্য সৃষ্টি হয়। বাস্তব ও কল্পনার এই সম্বন্ধটী আমার এক অখ্যাতনামা কবি-বন্ধু অতি সহজ কথায় একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন—তাঁর নাম না করে', কবিতাটি সবশেষে দিয়ে দিলাম; কারণ, আমার বোধ হয় এতখানি লিখে'ও আমি যে কথাটা হয় ত সুসঙ্গত করে তুলতে পারিনি, তার একটি অংশও এই কয় ছত্রে সুখবোধ্য ও সুখপাঠ্য হবে। যথা—

কবি যারে কাব্যে লেখে পোটো যারে পটে—
কল্পনারি নহে সে যে, জগতেরো বটে।
দুই জনই দেখিয়াছে চোখ দিয়ে তা'রে,
বিস্ময়ে ব্যাকুল তাই, তাই বারে বারে
ছন্দ আর রূপ আর সঙ্গীতকলায়
কতবার কতরূপে ধরিবারে চায়।
সেই সত্য, সেই রূপ এত সীমাহীন,
জীবনের ঊষা হ'তে সন্ধ্যা—সারাদিন,
কত সুরে কত রঙে নারিল ফুটা'তে,
কল্পনাও হার মানি' রহিল লুটা'তে!
সেই সত্য এত বড়—ক্ষুদ্র হয়ে গেল
কবির কল্পনা তুলি, শীর্ণ হয়ে এল।
কবি সে কাঁদিয়া, মরে শিল্পী উনমনা—
মোরা বলি, এও বেশী, এ শুধু কল্পনা!

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

পলাতকা

(মা-মরা খোকার মৃত্যুশয্যায় পিতা গাচ্ছেন) *

(সুর—বৈকালী মেঠো বাউল)

কোন্ সুদূরের চেনা-বাঁশীর ডাক শুনেচিস্ ওরে চখা ?
ওরে আমার পলাতকা !
পড়্‌লো মনে কোন্ হারা ঘর, স্বপন-পারের কোন্ অলকা ?
ওরে আমার পলাতকা !
জল ভরেচে চপল চোখে,
কোন্ হারা মা ডাক্‌লো তোকে রে ?
গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—
উতল পাগল ! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে ?
যেন বুক-ভরা ও' গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, "আয়,
ওরে আয় আয় আয়,
কোলে আয়রে আমার দুষ্টু খোকা !
ওরে আমার পলাতকা !"
দখিণ্ হাওয়ায় বনের কাঁপনে—
দুলাল আমার ! হাত-ইসারায় মা কিরে তোর ডাক দিয়েছে আজ ?
এতদিনে চিন্‌লি কিরে পর ও আপনে ?
নিশিভোরেই তাই কি আমার নাম্‌লো ঘরে সাঁজ ?
ধানের শীষে, শ্যামার শিশে—
যাদুমণি ! বল্‌সে কিসে রে,
শিউরে চেয়ে ছিঁড়্‌লি বাঁধন ?
চোখ-ভরা তোর উছ্‌লে কাঁদন ?
তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে ?
ওই আচম্‌কা কোন্ শশক-শিশু চম্‌কে ডাকে হায়,
"ওরে আয় আয় আয়—
আয়রে খোকন্ আয়,
বনে আয় ফিরে ভাই
বনের সখা !
ওরে চপল পলাতকা !"

কাজী নজরুল ইসলাম ।

মায়ের প্রাণ

(গল্প)

ছেলে রোগ-শয্যায়। মা শিয়রে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। মুখখানি ভাবনায় মলিন, বুকে যেন কে পাথর চাপিয়া ধরিয়াছে! ছেলের মুখ কাগজের মত শাদা, জ্বরের তাপে গা পুড়িয়া যাইতেছে, চোখদুটি মুদ্রিত। বড় কষ্টে ছেলে শ্বাস টানিতেছে—বুকের পাঁজরা-গুলা জোরে নিশ্বাস ফেলার জন্য ঘড় ঘড় করিতেছে! মার চোখের কোলে জলের ফোঁটা,—দৃষ্টি ছেলের মুখের পানে!

দ্বারে কে ঘা দিল। মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এক বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করিল, নিঃশব্দে আসিয়া ছেলের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মা তার মুখের পানে চাহিলেন, চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ আপনার শীর্ণ হাতে ছেলের ললাট স্পর্শ করিল। ছেলে একবার চোখ চাহিল, পরে ছোট দুই মুঠি দিয়া বৃদ্ধের হাতটা চাপিয়া ধরিল। বৃদ্ধ মাকে কহিল,—"তুমি একটু উঠে যাও।"

"কেন গা!"

"আমি একে নিয়ে যাব।"

এই বৃদ্ধ মৃত্যু। বৃদ্ধ কোন কথা না বলিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল। মা বারণ করিতে গেলেন, মুখে কথা ফুটিল না—হাত দিয়া ছেলেকে ধরিতে গেলেন, হাত পাথরের মত ভারী, উঠিল না। মা পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ বসিয়া রহিলেন—নড়িবার বা কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। কি এক মন্ত্র-স্পর্শে মার চোখ বুজিয়া আসিল। মা যখন চোখ চাহিলেন, তখন বিছানা খালি পড়িয়া আছে,—ছেলে নাই, বৃদ্ধ চলিয়া গিয়াছে।

ডুকরিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত ছুটিয়া মা ঘরের বাহিরে আসিলেন। কোথায় গেল, বাছা? কোথায় রে? মা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন।

দীর্ঘ পথ,—স্তব্ধ, জন-মানবের চিহ্নও নাই। রাত্রি কাল। মাথার উপর আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। মা পথে ছুটিয়া চলিলেন,—ছেলের সন্ধানে।

কত দূর—কত দূর চলিয়া এক পাহাড়ের সন্ধান মিলিল, পাহাড়ের কোলে এক বৃদ্ধা বসিয়াছিল। মা উদভ্রান্তের মত প্রশ্ন করিলেন,—"আমার ছেলেকে দেখেছ মা? একটি বুড়ো মানুষের কোলে এই দিকে গেছে—?"

বৃদ্ধা কহিল, "হ্যাঁ মা, এই পথেই গেছে তারা। বুড়ো ঝড়ের মত চলে গেল—অমনিই সে যায়, কত লোককে নিয়ে, কত মা-বাপের কলজে ছিঁড়ে, কত ছেলে, কত মেয়ে, কত দুধের বাছাদের নিয়েই যে রোজ যায়, মা—"

মা আকুল স্বরে বলিলেন, "তবে কি তাদের দেখা আর পাব না?"

"পাবে বৈ কি মা, কেন পাবে না! তবে একটি কাজ করতে পারো—?"

মা বলিলেন, "কি কাজ?"

বৃদ্ধা বলিল, "ছেলেকে যা-যা বলে আদর করতে, যত কথা বল্‌তে, ঘুম-পাড়ানি গান, ছড়া, যা কিছু বলে তাকে ভুলুতে, সেই সব

সুর করে গেয়ে বল দেখি, আমি ঢের শুনেচি, যদিও,—এইখানেই বসে আছি চিরকাল কি না! আমার নাম রাত্রি—সেইগুলি গেয়ে বল্। দেখি, কোন উপায় করতে পারি কি না!"

মা তখন অন্তর ছানিয়া বেদনার সুরে সেই গান গাহিলেন, বুকের ধনটিকে যে-যে কথায় ভুলাইতেন, যত আদর করিতেন—সেই সব কথা চোখের জলে ভিজাইয়া সুরের তার বুনিয়া চলিলেন। আর বৃদ্ধা রাত্রি স্তব্ধ হইয়া সে গান শুনিতে লাগিল। শুনিয়া রাত্রির সারা চিত্ত বেদনাতুর হইয়া উঠিল, রাত্রি কাঁপিতে লাগিল।

রাত্রি বলিল, "ঐ যে সাম্‌নে বন দেখচ মা, ঐ বনের মধ্যে দিয়ে বরাবর দক্ষিণে চলে যাও। তা হলেই তুমি তাদের দেখা পাবে।"

মা বনের মধ্য দিয়া চলিলেন। বড় বড় গাছ—আকাশে মাথা ঠেকিয়াছে, কি ঘন বিজন বন! ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! শুধু একটি মাত্র রাগিণী সমস্ত বনটাকে ত্রস্ত চকিত করিতেছিল, শোঁ শোঁ শব্দে বায়ু বহিয়া গাছের পাতাগুলাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

মা সেই বনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে একটা বাঁকের মুখে দাঁড়াইলেন; সামনে দুইটা পথ দুই দিকে গিয়াছে! কোন পথে গেল গো তারা? মা দাঁড়াইলেন।

একটা গাছ পাতা দুলাইয়া বলিল,—"তুমি কে গা,—এখানে দাঁড়ালে কেন?"

মা কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিলেন, "আমার ছেলে—একটি ছেলে, দুধের বাছা আমার, ওগো, তাকে নিয়ে কোন্ পথে যে গেল—"

গাছ বলিল, "তাকে খুঁজচ! ও,—তা এক কাজ কর, আমি বলচি। শীতে আমার বুক জমে গেছে—তুমি তোমার ঐ বুকের গরম ভাব একটু দাও ত আমায়—আমার সাড় হবে, সব মনে পড়বে, তা হলে।"

মা দুইহাত দিয়া জড়াইয়া সেই গাছের কর্কশ রুক্ষ গা বুকে চাপিয়া ধরিলেন; গাছের গায়ে বড় বড় কাঁটা ছিল, সেই কাঁটায় মার বুক ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, রক্ত ঝুঁজিয়া পড়িল। ওদিকে গাছের সেই কাঁটায়-কাঁটা দেহে মার বুকের স্নেহের তাপে নব পুষ্পমঞ্জরী দেখা দিল, চিকণ পত্র-পল্লবে গাছের শুষ্ক দেহ ভরিয়া উঠিল। পুত্র-হারা মায়ের বুকে স্নেহের তাপ ছিল, এমনি গভীর!

গাছ বলিল, "ঐ ডাহিনের পথ ধরে চলে যাও।"

মা চলিলেন। অনেক দূর গিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড হ্রদ। জলের বুকে কুমুদ-কহ্লার-পদ্মের রাশি! পিপাসায় মার কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছিল,—মা গিয়া জলে পড়িলেন, একটু জুড়াইবার জন্য।

জল বলিল, "ওগো, তুমি কোথায় চলেছ গো, পাগলের মত, আমি তা জানি! আমায় ক'টি মুক্তো দিতে পারো? আমার মুক্তোর মালা ছিঁড়ে গেছে। মুক্তো যদি দাও, তাহলে তোমায় পথের সন্ধান বলে দি।"

আজও তবে পথের খোঁজ পাওয়া গেল না! হায়রে, কোথায় পাইব এখানে মুক্তা-মণি! মা কাঁদিতে লাগিলেন, চোখের জল দুই গাল বহিয়া হ্রদের জলে পড়িয়া বড় বড় মুক্তা ফুটাইয়া দিল।

জল বলিল, "ভারী সুন্দর মুক্তো এ, মা—

এর যে কত দাম, কোন জহুরী কষে তা বলতে পারে না। তুমি এক কাজ কর, সোজা এই পথে গিয়ে একটা পাহাড় দেখবে, সেই পাহাড়ের গুহায় তোমার ছেলের সন্ধান পাবে।"

"বুড়ো মানুষটি এই পথেই গেছে ?"

"না,—সে এখনো এসে পৌছোয় নি। তার কত কাজ—কত লোক নিয়ে আসতে হবে, তোমার ছেলেকে সে আগেই পাঠিয়ে দেছে। সঙ্গে নিয়ে ঘোরবার জো কি তার !"

মা চলিলেন। পাহাড়ের গুহার সম্মুখে আসিয়া দেখেন, আর-একবৃদ্ধা সেখানে দাঁড়াইয়া।

মা বলিলেন, "আমার ছেলে ? ওগো, আমার ছেলে—আমার দুধের বাছা, সে কোথায় ? কোথায় গো ?"

বৃদ্ধা বলিল, "তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত বাছা। এত গাছ, এত ফুল আজ ঝরে পড়েছে—মৃত্যু আবার কোথায় যে তাদের ছড়িয়ে পুঁতে দেছে, তার সন্ধান করা বড় শক্ত।"

মা বলিলেন, "গাছ, ফুল ? এ সব কি বলছ ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হাঁ, তা বুঝি জানোনা ! মানুষকে তোমরা মানুষই দেখ কি না ! মানুষ, ফুল, পাখী, এরা সব এক, সকলের একই রকম প্রাণ, তা মানুষ বলে আলাদা কিছুতো আর এখানে নেই, এখানে সব ফুল আর গাছ। তোমাদের মানুষেরও প্রাণের ফুলগাছ এখানে আছে। কোন্‌টি শুকোচ্ছে, এখান থেকে দেখে—মরণ তাকে আনতে যায়। এই একটু এগিয়ে গেলেই ফুলের বাগান দেখবে—দেখগে দেখি, এ সব ফুলের মধ্যে প্রাণের সাড়া পাবে'খন তুমি খুঁজে দেখোগে, কোন্ ফুলটিতে তোমার ছেলের প্রাণের সাড়া পাও—বুক দিয়ে ছুঁয়ে দেখ'গে, সন্ধান পাবে। কিন্তু এত যে খপর দিচ্ছি, এই খপরের জন্যে আমায় কি দেবে তুমি ?"

মা বলিলেন, "ওগো আমি দুঃখিনী মা, সন্তান-হারা জননী—আমার আর কি আছে—?"

"তোমার ঐ মাথার কালো চুল একগাছি আমায় দাও দেখি, তাতেই আমার হবে।"

মা মাথার একগাছি চুল ছিঁড়িয়া বৃদ্ধার হাতে দিলেন। কালো রেশমের মত নরম চুল !

বৃদ্ধা চুলগাছি হাতে করিল, অমনি মার মাথার সেই নরম কালো কেশের রাশি একেবারে সাদা শোণের নুড়ি হইয়া উঠিল। মার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, মা সেই ফুলের বাগানের সন্ধানে চলিলেন।

ঐ যে—ঐ গো ! লাল নীল সাদা সবুজ জরদা রঙের ফুলে আলো-করা বাগান ! যেন রাঙা রামধনু ফুটিয়াছে !

মা গিয়া ফুলের বাগানে বুক দিয়া পড়িলেন। ফুলের বুকে এত প্রাণের স্পন্দন ! আঃ ! কিন্তু সেটি—সেটি কৈ—মার বড় সাধের, বড় আদরের সেই ছোট্ট ফুলের কুঁড়িটি !

ছোট-বড় অসংখ্য গাছ, ফুলে ভরা। শুধুই কি ফুলের গাছ ? তাল, তমাল, বট, অশ্বথেরও ঘন বন !

"ঐ, ঐ—ঐটি আমার সেই গো"—বলিয়া মা ছোট একটি জুঁইয়ের কুড়ির দিকে হাত বাড়াইলেন।

পিছন হইতে সেই বৃদ্ধা আসিয়া বলিল,—"উহুঁ, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—একটু সরে এসে এইখানে দাঁড়াও। আগে মরণকে আসতে দাও; সে এলে তাকে বলো, তোমার ফুলটি বেছে যেন তোমায় দেয়, না দিলে ভয় দেখিয়ো, বলো, তার সমস্ত ফুল ছিঁড়ে তচ্‌নচ্‌ করে দেবে। তাহলে সে ভয় পাবে'খন। তাকে এই সমস্ত ফুলের, সমস্ত গাছের হিসেব দিতে হয় ভগবানের কাছে কি না! তার ফুল পরে ছিঁড়লে, সে ভারী জবাবদিহিতে পড়বে।"

মা অধীর আকুল প্রাণে দাঁড়াইয়া রহিলেন; সে কখন আসিবে? বৃদ্ধা চলিয়া গেল। একটু পরেই শীতের একটা দম্‌কা হাওয়া বহিয়া আসিল,—থর-থর কম্পিত ফুলের গাছে বরফের ঢেউ ছুটিল। সে এক বিচিত্র ব্যাপার! মৃত্যু আসিল, আসিয়াই মাকে বলিল, "কে তুমি? এখানে কি করে এলে? আমার আগেই বা এলে কি করে?"

"কি করে এলুম? ওগো আমি যে মা—"

মৃত্যু সেই জুইয়ের কুঁড়িটির দিকে হাত বাড়াইল—কিন্তু মা গিয়া কুঁড়িটি হাতে চাপিয়া ধরিলেন—ধরিলেন বটে, কিন্তু ভারী সতর্কে, অতি সন্তর্পণে - পাছে পাপড়িতে ঘা লাগে! মৃত্যু আগাইয়া আসিল। মার হাতে উগ্র মৃত্যুর নিশ্বাসের স্পর্শ লাগিল—শীতে মার হাত অবশ হইয়া গেল।

মৃত্যু বলিল, "তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না—"

"কিন্তু মাথার উপর ভগবান আছেন, তিনি এর শাস্তি দেবেন।"

"শাস্তি! শাস্তি কিসের! আমি ত তাঁরই হুকুম তামিল করে ফিরি—নিজের ইচ্ছায় কিছু করি না ত। আমি এই বিশ্বের সৃষ্টির বাগানের মালী—এখানে দিবারাত্রি এই সমস্ত গাছ বাছাই-তোলাই করে-করে দেখি, যেগুলি সেরা, সেগুলি তাঁর নন্দনে পাঠাই। সেখানে কি হবে, তার খপর আমি অবশ্য রাখি না!"

মা বলিলেন, "ওগো দাও গো, আমার বাছাকে এই মার বুকে ফিরিয়ে দাও—দাও, ওগো, দাও—আমার সেই এক, আমার সেই সর্ব্বস্ব-ধনটিকে দাও—"

মৃত্যু কোন কথা বলিল না; মা বলিলেন, "দেবে না! যদি না দাও তাহলে তোমার এই সমস্ত ফুলের বাগান নষ্ট করে দেব, সব ফুল তুলে ছিঁড়ে একাকার করে দেব।" বলিয়া এক বোঁটায় দুইটি কুঁড়ি চাপিয়া ধরিলেন। মৃত্যু বলিল, "না, না, ছুঁয়ো না এদের। তুমি মা, ছেলের শোকে কাঁদচ, মার ব্যথা ত জানো! এর একটি ফুল ছিঁড়লে এর মাকেও তুমি এমনি ব্যথা দেবে!"

"এর মা!"

"হ্যাঁ—এই নাও, তোমায় দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছি—তুমি এই দৃষ্টি নিয়ে ঐ দীঘির বুকে চেয়ে দেখবে, এস। ঐ যে কুঁড়িটি চেপে ধরেছিলে, সেটি কি, দেখতে পাবে।"

মা তখন দীঘির জলে চাহিয়া দেখিলেন, এক বোঁটায় দুইটি কুঁড়ি—সেই দুইটি।

কিন্তু এ কি—একটি ফুটিয়া উঠিয়া জগতে কতখানি রূপ, কত সুখ, কত শোভা, কত গন্ধ ছড়াইয়া দিয়াছে! আর একটি—?

দারিদ্র্যে দুঃখে একেবারে জীর্ণ মলিন, শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে!

মা মৃত্যুর মুখের পানে চাহিলেন। মৃত্যু বলিল, "এ ভগবানেরই ইচ্ছায়। বুঝলে?"

"এ দুটি কাদের বাছা গা?"

"শুনবে তবে, শোনো। ওরি মধ্যে একটি কুঁড়ি...তোমার সেই হারানো ছেলে! তোমার ছেলের ভাগ্য-ফলে, তুমিই তার সমস্ত ভবিষ্যতের দায়ী। মাই ছেলের ভবিষ্যতের জন্য দায়ী জেনো,—এর বেশী আর কিছু বলব না।"

মা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ওগো, না, না, বল, এর মধ্যে কোন্‌টি আমার? ঐ শুকো ঝরে-পড়চে যে কুঁড়িটি, ঐটিই কি? তা যদি হয়, তবে দাও গো, আমার বাছাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও! এত কষ্ট, এত দুঃখ আমার পেটে জন্মাবার জন্য ওকে পরে সইতে হবে? না, না, আমার এ অন্ধ মায়া আমি ত্যাগ করচি, ওকে ঐ ভবিষ্যতের দুঃখ-বেদনার হাত থেকে উদ্ধার কর গো, উদ্ধার কর—মুক্তি দাও। ওকে ভগবানের নন্দনে নিয়ে যাও তুমি। আমি চাই না, চাই না ওকে—আমার এই দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে এনে ওকে কষ্ট দিতে চাইনে আমি। ও আমার সুখে থাকুক—আমার চোখের জল, আমার এ বেদনা, এ আমি সমস্ত ভুলব। আমি ওকে আর চাই না!"

"তাহলে তোমার ছেলেকে তুমি চাও না?"

"না, না—" মা যুক্ত করে আকাশের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান, তোমার এত করুণা মুহূর্ত্তের শোকের বেদনায় ভুলে ছিলুম, প্রভু! তোমার কাজের বিরুদ্ধে অনুযোগ তুললে আর তুমি শুনো না, প্রভু। মার বুক-ফাটা কান্না দেখেও তুমি ভুল বুঝো না, ভুল করো না। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক! মঙ্গলময়, করুণাময়, তোমার বিশ্বে এত করুণা, এত মঙ্গল, জ্ঞান-হীনা আমি, আমার তা চোখে পড়েনি, তাই এত কান্না তুলেছিলুম! আর না, আর কাঁদবো না আমি!"

মা ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মৃত্যু তখন সেই পুষ্প-কলি দুটীকে বুকে লইয়া কোন্ অজানা দেশে অদৃশ্য হইয়া গেল।*

শ্রীসুলেখা দেবী।

চয়ন

ঔপন্যাসিক ডুমা

আলেকজান্দার ডুমা সম্বন্ধে সংপ্রতি একটি ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তার সার-সংকলন ক'রে দিলুম।

"The Three Musketeers," "The Vicompte de Bragelonns" ও "Twenty Years After" প্রভৃতি উপন্যাস

* ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ লেখক হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডার্সেন রচিত গল্প অবলম্বনে।



ভিক্টর হুগো

তাঁর সাফল্য-লাভের গুপ্তকথা হচ্ছে এই যে, তিনি কলম ধরেছিলেন হিতোপদেশ দিতে নয়, চিত্ত-বিনোদনের জন্যে। ডুমা ইতিহাসের যে ছবি এঁকেছেন, তা স্কুলের সাল-তারিখ-নামের ফর্দ্দ নয়।

ভিক্টর হুগো আর ডুমা পরস্পরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই প্রীতির সম্পর্ক মাঝে মাঝে তিক্ত-রসে বিস্বাদ হয়ে উঠ্‌লেও, সেটা কথনো স্থায়ী হ'তে পারে-নি। ডুমার মৃত্যুর পরে হুগো যে মর্ম্মস্পর্শী প্রবন্ধ লিখেছিলেন, আমরা তার স্থল-বিশেষ উদ্ধার করছি।

'আলেকজান্দার ডুমা কেবল ফ্রান্সের নন, তিনি য়ুরোপের; কেবল য়ুরো-পের নন, তিনি বিশ্বের। তাঁর নাটকগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলি সকল ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তিনি সেই সকল লোকের মধ্যে অন্যতম, যাঁদের সভ্যতার বপনকারী ব'লে ডাকা যায়। এক প্রফুল্ল, সমুজ্জ্বল ও অবর্ণনীয় দীপ্তি দিয়ে, মনের ভিতরটা তিনি কুশলে আর স্বাস্থ্য-সম্পদে পরিপূর্ণ ক'রে তোলেন;—আত্মা, মন ও যুক্তি-শক্তিকে তিনি উর্ব্বর ক'রে

পড়েন নি, এমন লোক কেউ আছেন কি? সুতরং ডুমার বিশেষ কোন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে তাঁর সৃজনক্ষম কল্পনা অবিশ্রাম উপন্যাস, উপাখ্যান ও নাটক প্রসব করেছে। এদিকে তিনি তুলনা-রহিত! তাঁর সেই বিপুল সাহিত্য-সাধনা বর্ত্তমান যুগেও যৌবনের আনন্দ-ভাণ্ডার হয়ে আছে।

তোলেন,—অধ্যয়নের জন্য তিনি চিত্তের ভিতরে একটা ক্ষুধাকে জাগিয়ে তোলেন ; তিনি মনকে জয় করেন এবং ঐশ্বর্য্যে তা ভ'রে দেন। তিনি বপন করেছেন ফ্রান্সের মূলতত্ত্ব বা মনোবৃত্তি। ফরাসী মনোবৃত্তির ভিতরে মানবতার এমন ভাব আছে, যাহা, যেখানেই যায়, সেখানেই উন্নতির কারণ হয়।'

ডুমার শেষ-জীবনের কথা তাঁর সাহিত্য-সমাজে বিখ্যাত পুত্রের বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি স্তব্ধভাবে সেই সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটিয়ে দিতেন,—যার নীলিমার ওপরে ধূসর ও কুয়াসাঢাকা আকাশের সঙ্গে শীতার্ত্ত তপনের অস্পষ্ট কিরণ এসে মিলিত হয়েছে।

একদিন আমার দিকে তিনি তাঁর সেই বড় বড়, মমতায় কোমল দৃষ্টি স্থাপন ক'রে, মায়ের কাছে ছেলে যেমন স্বরে অনুনয় করে, তেমনি স্বরে বল্‌লেন।

"আমাকে এখান থেকে উঠিও না, আমি বেশ আছি।" দেখতে দেখ্‌তে তাঁর মুখখানির উপরে একটা গভীর চিন্তা ও দুঃখের ছায়া এসে পড়্‌ল, তারপর তাঁর চোখদুটি জলে ভ'রে উঠ্‌ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি-জন্যে তিনি এমন বিমর্ষ হয়েছেন।

তিনি আমার একখানি হাত টেনে নিয়ে, আমার চোখের উপরে চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে বল্‌লেন, "যদি তুমি পুত্রের মতন পক্ষপাতিতা না ক'রে, সমালোচকের মতন ক্ষমতা আর সহচরের মতন সরলতার সঙ্গে আমার কথার উত্তর দিতে অঙ্গীকার কর, তাহলে তোমাকে আমি সব কথা বল্‌ব।"

"আমি অঙ্গীকার করছি।"

—"প্রতিজ্ঞা কর।"

—"প্রতিজ্ঞা করছি।"

—"আচ্ছা—" একটু ইতস্তত ক'রে শেষটা তিনি বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমার কাজের কিছু কি স্থায়ী হবে ব'লে তুমি বিশ্বাস কর?" ব'লে আমার দিকে তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

আমি আনন্দের স্বরে বললুম, "এইজন্যেই তোমার যদি এত ভাবনা হয়ে থাকে, তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার। তোমার কাজের অনেক অংশই স্থায়ী হবে।"

—"সত্যি?"

—"সত্যি।"

—"ধর্ম্মত বল্‌ছ?"

—ধর্ম্মত বল্‌ছি।"

আমার মনের আবেগ লুকোবার জন্যে আমি মুখকে আরো বেশী হাসিমাখা ক'রে তুল্‌লুম। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি আর একটিও কথা কইলেন না, যেন আর কিছু জানবার জন্যে তাঁর কোনই আগ্রহ নেই।

ডুমার রসিকতার ঢের গল্প আছে। একটির উল্লেখ করছি।

এক নাট্যকার বন্ধুর নাটক অভিনয়ে একবার ডুমা উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, দর্শকদের মধ্যে একজন নিদ্রিত হয়ে পড়েছে।

ডুমা তাঁর বন্ধুকে সেই দৃশ্য দেখিয়ে বল্‌লেন, "ওহে, দর্শকদের ওপরে তোমার নাটকের প্রভাব কতদূর, একবার চেয়ে দেখ।"......

ঠিক পররাত্রেই রঙ্গালয়ে ডুমার একখানি নাটকের অভিনয়। সেদিনও অভিনয়ের সময়ে দর্শকদের আসনে একজন লোক ঘুমোচ্ছিল। পূর্ব্বকথিত বন্ধুটি প্রতিশোধ নেবার আশায় উৎসাহিত হয়ে, সেইদিকে ডুমার দৃষ্টির আকর্ষণ ক'রে বিজয়গর্ব্বিত স্বরে বললেন, "ভাই ডুমা, দেখ! অতএব বুঝচ তো, কেবলি আমার নাটকের অভিনয়ের সময়েই দর্শকরা ঘুমায় না।"

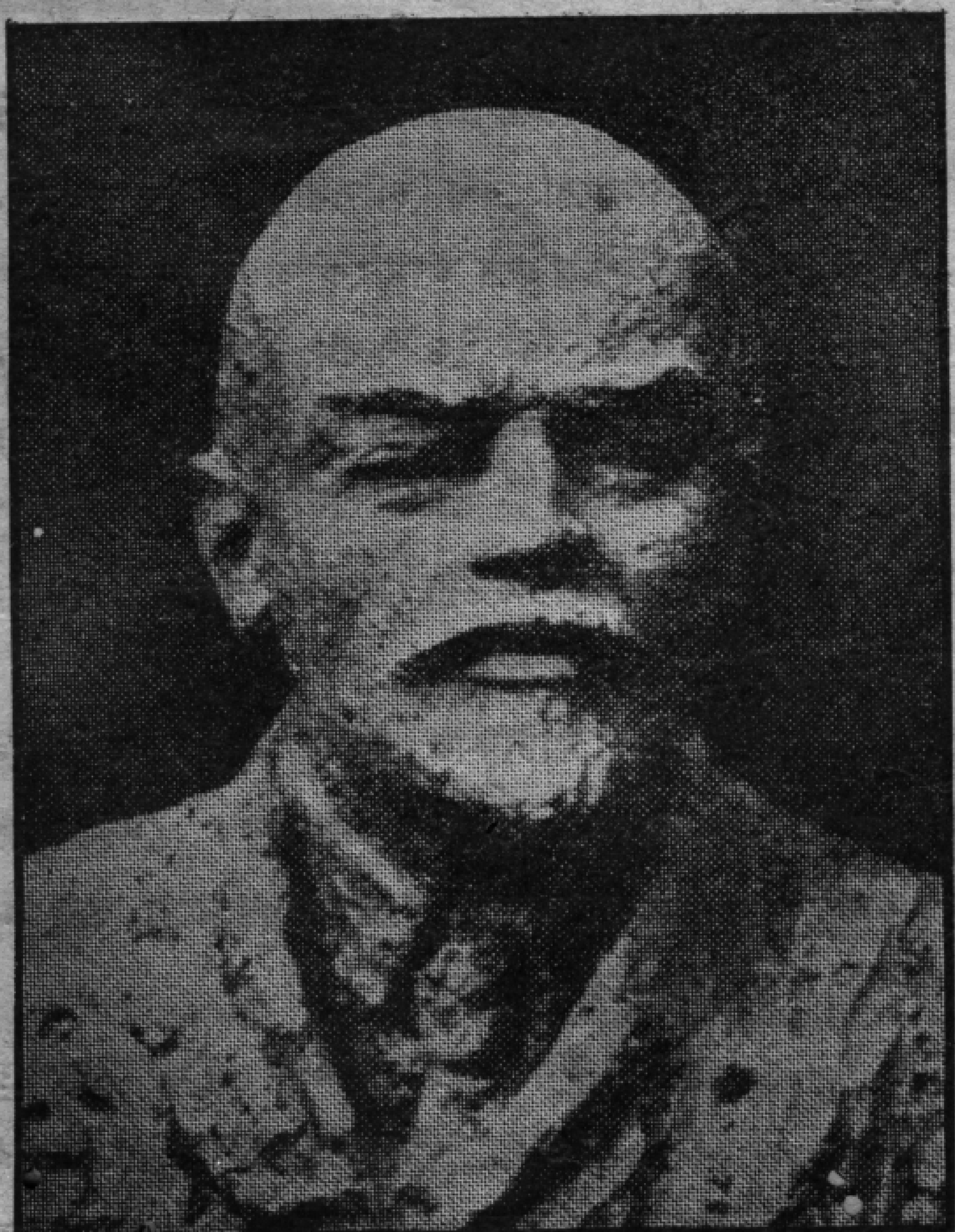
ডুমা, তৎক্ষণাৎ পাল্টা, জবাব দিলেন, "ওহো, বন্ধু! ওটি সেই কাল্‌কেরই ঘুমিয়ে-পড়া ভদ্রলোক—উনি এখনো জেগে ওঠেন নি!"

রুসিয়ার মুকুটহীন সম্রাট

একজন সম্ভ্রান্ত-ঘরের মেয়ের বুকের জোর যে কতটা বেশী হ'তে পারে, মিসেস ক্লেয়ার সেরিডানের রুসিয়া-যাত্রায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

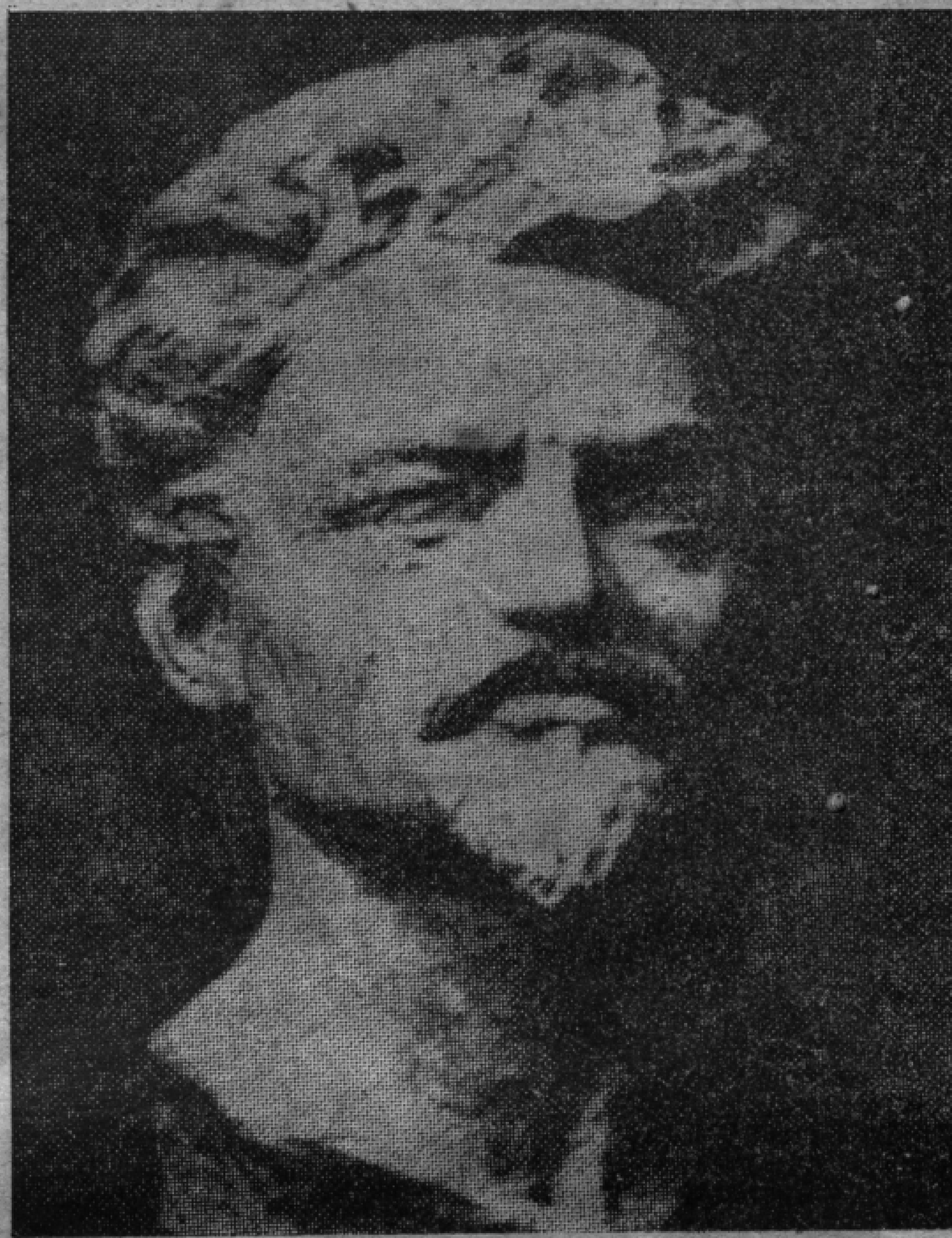
মিসেস সেরিডান বিলাতের নামজাদা রাজনৈতিক উইনষ্টন চার্চ্চহিলের বোন। ভাস্কর্য্যে তিনি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

সকলেই জানেন, রুসিয়ায় এখন বিপ্লবের দামামা বেজে উঠেছে, খুনজখম রক্তারক্তি এ-সব এখন সেখানকার সাধারণ ঘটনা! এমন দুঃসময়ে বিদেশী পুরুষরা পর্য্যন্ত রুসিয়ার গণ্ডীর ভেতরে পা বাড়াতে ভরসা পান না। কিন্তু মিসেস্ সেরিডান বিদ্রোহের মূর্ত্তিমান অবতার এবং বর্ত্তমান রুসিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা ও মুকুট-হীন সম্রাট লেনিন ও ট্রট্‌জ্‌কীর প্রস্তর-মূর্ত্তি গঠন করবার জন্যে, বিনা-দ্বিধায় রুসিয়ায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। খালি তাই নয়,—তিনি আপনার কাজ না হাসিল ক'রে দেশে ফিরে আসেন নি।



লেনিন

মিসেস্ সেরিডান পাথরে ও কলমে—দুইয়েতেই লেনিন ও ট্রট্‌জ্‌কীর যে মূর্ত্তি ফুটিয়েছেন, তাতে এই দুটি দুর্ব্বোধ লোককে বুঝবার অনেকটা সুবিধা হবে। লেনিনের মসী-চিত্র থেকেও আমরা খানিকটা তুলে দিলুম।



ট্রট্‌জ্‌কী

"একজন লোককে কখনো আমি এতরকম মুখের ভাব প্রকাশ করতে দেখি নি। লেনিনের মুখেরওপর দিয়ে হাসির, বিরক্তির, চিন্তার, দুঃখজনক ও হাস্যোদ্দীপক ভাব পরে পরে প্রবাহিত হয়ে গেল। আমার মনে হোলো, তিনি যেন তাঁর মুখের ওপরে বিচিত্র ভাবের পসরা সাজিয়ে রেখেছেন—আমি বেছে নেব ব'লে। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর মুদিত-নেত্র মুখের ভাবটি বেছে নিলুম। আশ্চর্য্য! মুখের এমন ভাব আর কারুরই নেই- এটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। লেনিন আমার হাতের কাজ দেখে খুসি হয়ে স্বীকার করলেন, নর-চরিত্রের যথার্থ বিশেষত্ব ধরবার শক্তি আমার আছে।

আমার অনুরোধে লেনিন যখন ঘূর্ণায়মান আসনের ওপরে গিয়ে উঠলেন, তখন তাঁর মুখ দেখে মনে হোলো, তিনি যেন ভারি আমোদ অনুভব করছেন। তারপর তাঁর মুখের নীচের দিকটা ভালো ক'রে দেখবার জন্যে, আমি যখন তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে বস্‌লুম, তখন তিনি যেন অত্যন্ত বিস্ময় ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লেন। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "রমণীর এ-রকম অবস্থানে আপনি বুঝি অভ্যস্ত নন?"

লেনিন আমার গড়া কতকগুলি মূর্ত্তির ছবি দেখলেন। "বিজয়-লক্ষ্মী"র মূর্ত্তিটি তাঁর পছন্দ হোলো না। তিনি বল্‌লেন, "বিজয়লক্ষ্মী"কে আমি বড় সুন্দরী করে গড়েছি।"

আমি বললুম, "আত্মত্যাগের জন্যেই "বিজয়লক্ষ্মী" সুন্দরী হয়েছে।

কিন্তু এ-কথা না মেনে লেনিন বল্‌লেন, "বাজারে আর্টের দোষই এই। সে সর্ব্বদাই রূপ নিয়ে ব্যস্ত।.........আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমার মূর্ত্তিকেও যেন কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করবেন না।"

আমেরিকার ভাস্কর

আধুনিক সভ্যতায় আমেরিকার ঠাঁই খুব উঁচুতে হ'লেও, সাহিত্যে আমেরিকা বড় বেশী নাম কিন্‌তে পারে নি। সাহিত্যক্ষেত্রে আমেরিকা প্রসব করছে অগুন্তি, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের মূল্য খুব বেশী নয়।



হিরডের রাজসভায় স্যালোমের নাচ

তবে ললিত কলার ক্ষেত্রে মূর্ত্তি-চিত্রকর সর্জে'ন্ট এবং ভাস্কর পল ম্যানসিপ আমেরিকার নাম রক্ষা করেছে। সার্জে'ণ্টের নাম সকলেই জানেন। ম্যানসিপের সঙ্গে এদেশী রসিকদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হ'লেও, য়ুরোপে-আমেরিকায় এখন তাঁর প্রভাব-পতিপত্তি বড় সামান্য নয়।

ম্যানসিপের ভাস্কর্য্যে যে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ বিশেষত্ব না থাক্‌লে তাঁর নাম আজ এতটা সম্মান লাভ কর্‌তে পার্‌ত না।

সে বিশেষত্ব কি, এখানে সে সব কথা গুছিয়ে বলবার জায়গা নেই। আমরা এখানে তাঁর গড়া একটি মূর্ত্তির ছবি দিলুম। এর বিষয়, হিরডের রাজসভায় স্যালোম নাচছে। লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যাবে, ম্যানসিপের হাতের কাজে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গঠন-ভঙ্গি কতটা আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে উঠেছে!

সবল মাতৃত্বের উপাদান

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের দেশে ব্যায়াম, বিরোধী পুরুষ-সমাজের ভেতরেও দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের যতটুকু সুবিধা আছে, নারী-সমাজের মধ্যে ততটুকুও নেই।

ব্যায়ামের যতই অভাব থাক্,বাঙালী পুরুষরা অন্তত কাজের খাতিরেও বাধ্য হয়ে খোলা হাওয়ায় রাজপথে হাঁটা-হাঁটি করে থাকেন। কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরের মেয়েরা এ-সব সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। তাও যদি অন্তপুরে কোনরকম পদ্ধতিতে যৎসামান্য ব্যায়াম করবার প্রথাও প্রচলিত থাক্‌ত, তাহলেও কথা ছিল; কিন্তু মেয়েদের ব্যায়াম করবার নামেই এদেশী পুরুষদের পেটের পিলে বোধ করি বিস্ময়ে বিলক্ষণ চম্‌কে উঠ্‌বে। অন্তপুরে ব্যায়াম কথাটা বড়ই নূতন!

অথচ খোলা হাওয়ার যেখানে প্রবেশ নিষেধ, অবাধ আলো যেখানে অপ্রচুর এবং স্বাধীন অঙ্গ-সঞ্চালন যেখানে ইটের দেওয়ালে বাধা পায়, সেই অন্তপুরেই যে ব্যায়ামের দরকার আর সার্থকতা বেশী, যাঁরা যুক্তি-তর্ক মানবেন,এ সত্য তাঁদের স্বীকার কর্‌তেই হবে।

মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য একেই তো ক্রমাগত সন্তান-প্রসবের ফলে শীঘ্রই ভেঙে পড়ে, তার ওপরে সাধারণ দারিদ্র্য-সমস্যার ফলেও এঁদের দেহ পুষ্টিকর আহার থেকে বঞ্চিত। কেবলমাত্র এই দুটি কারণের জন্যেও বাংলার অন্তপুরে ব্যায়াম বা দেহচর্চ্চার প্রচলন করা উচিত।

বাঙালীর মেয়ে যে কুড়িতেই বুড়ী হয়ে পড়েন, খোলা আলো-বাতাস আর ব্যায়ামের অভাবই হচ্ছে তার মূল কারণ।

কিন্তু পাশ্চাত্য-দেশে নারী-সমাজে এত-বড় দুর্ভাগ্য নেই। সেখানে খোলা আলো বাতাস



ব্যায়ামাগারে জার্ম্মান-নারী



সবল নারীত্ব

আর পদব্রজে যথেচ্ছ ভ্রমণের সুবিধা তো মেয়েদের আছেই, কিন্তু কেবল এইটেই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ব'লে বিবেচনা করা হয় না। গত যুদ্ধে দুর্ব্বল জার্ম্মানী, এখন আবার তার ভবিষ্য জাতীয় শক্তি-সংগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। জার্ম্মানদের মতে, মানুষের জীবনী-শক্তির মূল-ভিত্তি, দেশের নারী-সমাজকে সবল মাতৃত্বের জন্যে প্রস্তুত করা।

জিম্‌নাষ্টিক, ড্রিল, দ্রুতধাবন, উচ্চ লম্ফ, নৌকা-চালনা ও সাঁতার প্রভৃতি ব্যায়ামের দ্বারা জার্ম্মান যুবতীর শরীর এখন বলবান ও স্বাস্থ্যবান ক'রে তোলা হয়।

খালি জার্ম্মানী নয়—অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও এখন নারীকে সবলা ক'রে তুলে তাঁর 'অবলা' দুর্নাম ঘুচাবার চেষ্টা হচ্ছে।



নাচের ভঙ্গীতে ব্যায়াম

চির-যৌবনের সাধক

কিছুদিন আগে ডাক্তার ভোরোনফ আবিষ্কার করেছিলেন যে, যুবক-বানরের গ্রন্থি-বিশেষ বুড়ো মানুষের দেহের ভিতরে চালিয়ে দিতে পারলে, মানুষের নিরুদ্দেশ যৌবন আবার ফিরে এসে দেহের ভাঙা মন্দিরকে নতুন ক'রে তোলে! কিন্তু অধিকাংশ বুড়োই যৌবনের লোভেও এদিকে ঘেঁস্তে বা নিজের দেহের উপরে এ-রকম পরীক্ষা করতে একেবারেই রাজি নন। তাঁদের ভয়, বানরের গ্রন্থির (gland) গুণে যদি তাঁদের মানুষী বুদ্ধিও শেষটা 'বানুরে' হয়ে যায়।

কিন্তু অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত Prof. Eugene Steinach, আজ বারোবৎসর সাধনার পরে, রুচিসঙ্গত উপায়ে মানুষের জরা-কাতর জীবনে চির-যৌবনের প্রতিষ্ঠা প্রায় সম্ভব ক'রে তুলেছেন।

তিন পদ্ধতিতে তিনি কাজ করেন। (১) মানুষের দেহের ভিতরকার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নল (ducts) একত্রে বেঁধে দেওয়া। (২) "এক্সরে"র সাহায্যে। স্ত্রী-দেহেই এই পদ্ধতিতে কাজ করা হয়। (৩) কোন যুবক স্তন্যপায়ী জীবের দেহ-গ্রন্থি-বিশেষ বুড়ো মানুষে দেহের ভিতরে জুড়ে দেওয়া। এর মধ্যে প্রথম পদ্ধতিটিই সবচেয়ে ভালো আর সোজা।

উক্ত প্রফেসর প্রথমে ইঁদুরের দেহ পরীক্ষা ক'রে সফল হন। তারপর তিনি অনেকগুলি মানুষকেও বার্দ্ধক্যের মরুভূমি থেকে যৌবনের উপবনে টেনে আন্তে পেরেছেন। তাঁর আবিষ্কারের ফলে দেখা গেছে, ষাট-সত্তর বৎসরের বুড়োও ফের যুবক হয়ে ওঠে। তার কেশহীন মাথায় নূতন চুল গজায়, কুঁজো বেঁকে-পড়া দেহ আবার সোজা হয়, শরীরের সমস্ত শিথিলতা ঘুচে যায়, বলিরেখা আর থাকেনা, এবং চোখের জ্যোতি, দেহের শক্তি ও কাজের ক্ষমতা আবার ফিরে আসে। চিকিৎসার আগে ও মাস-তিনেক পরের একই লোকের ফোটো দেখ্‌লে কেউ ধরতে পারেনা যে, এ হুখানি ছবি একই মানুষের —পরিবর্ত্তন হয় এতখানি! এই পরীক্ষায়, বুড়ীর গর্ভধারণের লুপ্তশক্তিও আবার জাগ্রৎ হয়।

এজন্যে যে অস্ত্র-চিকিৎসার দরকার, তাও যৎসামান্য। অস্ত্র-প্রয়োগের জন্যে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগেনা—আর এতে যাতনা-কষ্টও কিছু নেই বল্‌লেও চলে। স্থানীয় 'গম্ভীর বেদন' (local anaesthetic) ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। জরাকে গলাধাক্কা দিতে পারলে মানুষের পরমায়ুও খুব-সম্ভব যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে তোলা যাবে। সুতরাং এই আবিষ্কার যে পৃথিবীতে নবযুগ আনবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বায়স্কোপের সূচনা



জাভার ছায়াবাজির পুতুল

সভ্য-অসভ্য সমস্ত দেশেই এখন বায়স্কোপের চলন হয়েছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে কোন্ দেশে জীবন্ত চিত্রের কল্পনা জেগেছে, অনেক আলোচনা করেও এত-দিনে সেটা কেউ ঠিক করতে পারেন নি।

সংপ্রতি শ্যামদেশের রাজা আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যকে কতকগুলি জাভাদেশীয় ছায়া-চিত্র ও পুতুল ভেট দিয়েছেন। এই পুতুলগুলি অত্যন্ত কৌশলে হরিণের চাম্‌ড়া থেকে কাটা। কোন কোন পুতুলের দেহের স্থান-বিশেষে সুতো বাঁধা,—বাঙ্‌লার পুতুল-নাচের পুতুলের দেহে হাত-পা-মাথা নাড়বার জন্যে যেমন দড়ি বাঁধা থাকে।

এই ছায়া-চিত্রগুলিকে জাভায় দর্শকদের সামনে পর্দ্দার উপরে ফেলে, সাম্‌নে ও পিছনে নড়িয়ে জীবন্ত চিত্রের মতন দেখানো হোতো এবং একজন কথক ছবির বিষয় বর্ণনা ক'রে যেত। পুতুলগুলিও পট ও আগুনের মাঝখানে রেখে, জীবন্ত ছায়া-চিত্রের খেলায় ব্যবহৃত হোতো।

এই ছায়া-চিত্রের কোন তারিখ না পাওয়া গেলেও লিখিত ইতিহাসের আগেও যে এর অস্তিত্ব ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাই মিঃ আলফ্রেড মেফিল্ডের মতে, জীবন্ত চিত্রের প্রথম জন্ম, জাভা দেশে।

প্রসাদ রায়।

সঙ্কলন

বাসগৃহ

কি সহরে, কি মফস্বলে, আমাদের দেশে বাসগৃহ নির্ম্মাণের প্রণালী বা ব্যবস্থা স্বাস্থ্য-নীতিসম্মত নহে; সহরে স্থানাভাব বশতঃ না হয় বাড়ীগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট,—সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশের পথ রহিত; কিন্তু পল্লীগ্রামেও গৃহ-নির্ম্মাণে কোনরূপ শৃঙ্খলা বা নিয়মের অনুসরণ করিতে দেখা যায় না; যত্র তত্র যেমন তেমন ভাবে গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, গ্রাম্য প্রবচনে, গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে গৃহ-নির্ম্মাণকালে সে সকল উপদেশের অনুসরণ করা হয় না।

এরূপ অবস্থা হইবার কারণ কতকটা আমাদের সামাজিক রীতিনীতি। প্রাচীন কালের সাহিত্যে 'অসূর্য্যম্পশ্যরূপা' বলিয়া একটী বিশেষণ শব্দ পাওয়া যায়। কথাটি আমাদের সে কালের—এবং এ কালেরও বটে—সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাগণের পক্ষে বিশেষ গৌরবাত্মক। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা এমন ভাবে জীবন যাপন করেন যে, সূর্য্যও তাঁহাদিগকে দেখিতে পান না! এই শব্দটি যতই সম্ভ্রমসূচক হউক না কেন, আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মতে ইহা অতি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। এই সকল অসূর্য্যম্পশ্যরূপা

মহিলারা যে গৃহে বাস করেন, সে বাসগৃহও এমন ভাবে নির্ম্মিত হয় যে তাহাতে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিবার উপায় থাকে না।

আমাদের অবরোধ প্রথাও বাসগৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। মহিলাগণের আব্রু রক্ষার্থ—যাহাতে বাহির হইতে কেহ দেখিতে না পায়, এমন ভাবে অন্তঃপুরের গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বাটীর চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালার আবরণ; তাহাতেও নিস্তার নাই। আব্রু রক্ষার পক্ষে তাহাও যথেষ্ট বিবেচনা না করিয়া, জানালাগুলি মেঝে হইতে অনেক উচ্চে নির্ম্মিত হয়; এবং তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট কম রাখা হয়।

সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্যবস্থা এইরূপ। দরিদ্রের ব্যবস্থা আবার আরও মন্দ। মাটীর ঘরই দরিদ্রের ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের প্রধান সম্বল। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের কোন যত্ন না করিয়া, যেখানে হউক, ঘর তুলিতে আরম্ভ করা হয়; আর সেই ঘরের ঠিক পাশেই গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা হইতে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মাটী সংগ্রহ করা হয়। যে কয়খানি ঘর তৈয়ার করা হইবে—সাধারণতঃ দুই একখানির বেশী নহে—তাহার উপযুক্ত মাটী ঐ গর্ত্ত হইতেই লওয়া হয়। সুতরাং ঘরের সংখ্যা ও আয়তন অনুসারে গর্ত্ত ছোট, বড় বা মাঝারি রকমের হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল, এবং সকল সময়ে গৃহস্থের নর্দ্দামার জল ঐ গর্ত্তে সঞ্চিত হয়। রন্ধন ও পানার্থ জল অন্য বড় পুষ্করিণী হইতে সংগৃহীত হইলেও গৃহস্থের অপর সকল কার্য্য—যথা, বাসন মাজা, স্নান, শৌচ, এমন কি প্রস্রাব ত্যাগ পর্য্যন্ত ঐ জলে হইয়া থাকে। এই গর্ত্ত কেহ বুজাইয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলে গৃহস্থ অপমান বোধ করেন; কারণ উহারই চারিদিকে সামান্য একটু ঘেরিয়া লইয়া গৃহস্থের আব্রু রক্ষা হইয়া থাকে। বাড়ীর পাশেই যদি ভাল পুষ্করিণী থাকে, ঐ ডোবা যদি গৃহস্থের পক্ষে নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা বুজাইয়া ফেলা হয়, বটে, কিন্তু সে বুজাইবার প্রণালীও আবার অতি বিচিত্র। প্রত্যহ গৃহের আবর্জ্জনা, উনুনের ছাই প্রভৃতি ঐ ডোবায় নিক্ষিপ্ত হয়; এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ঐ ডোবায় আবর্জ্জনাদি সঞ্চিত হইতে হইতে ক্রমে উহা ভরাট হইয়া আসে। এই দীর্ঘ কালে ঐ সকল আবর্জ্জনা পচিয়া গৃহস্থের কত যে সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তাহা গৃহস্থ বুঝিতে না পারুন, বিবেচক লোক মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

সে সকল কারণে আমরা দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি, বাসগৃহ নির্ম্মাণের অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থা তাহাদের অন্যতম। ইহার সংশোধন হওয়া অতীব আবশ্যক।

নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমেই উপযুক্ত ভূমি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। সহরে অবশ্য যেরূপ ভূমি জুটে, বাধ্য হইয়া তাহাতেই বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামে ভূমি তত দুর্লভ নয়। ইচ্ছা থাকিলে সেখানে স্বাস্থ্যসঙ্গত ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কঠিন নয়। টিলা (উচ্চ) ভূমি,—যেখানে বর্ষার জল দাঁড়ায় না—এমন ভূমি বাসগৃহের পক্ষে উত্তম। সেই ভূমি আবার একটু ঢালু হইলে আরও ভাল হয়। তাহা হইলে প্রবল বর্ষাতেও সে ভূমিতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইয়া মাটী আর্দ্র রাখিবে না,—বৃষ্টির অল্প সময় পরেই সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইবে, এবং ভূমিও শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া উঠিবে। এঁটেল মাটী অপেক্ষা বেলেমাটীযুক্ত ভূমিই গৃহ নির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ত। নিম্ন ভূমি, জলাভূমি বা যে ভূমি বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় আর্দ্র থাকে, এমন ভূমিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা ত কখনই উচিত নয়—এই সকল ভূমি হইতে বাসগৃহ যত দূরে নির্ম্মিত হয় ততই ভাল। বাসগৃহের কাছে যেন শ্মশান বা গোরস্থান না থাকে। সকল প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও কোন ভূমি যদি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে ভূমি নির্ব্বাচন করাই শ্রেয়।

বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী ভূমি নির্ব্বাচিত হইলে সেখানে যদি গাছপালা, আগাছা বা জঙ্গল থাকে তবে তাহা কাটাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। বাসগৃহের চারিদিকেই যেন কিছু খোলা জমি

থাকে, যাহাতে বাসগৃহে অবোধ রৌদ্র বা বায়ু সঞ্চালনের কোন ব্যাঘাত না হয়। ছোট ছোট খানা বা ডোবা থাকিলে সেগুলি বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। বরং একটী মাঝারি গোছের পুষ্করিণী খনন করাইয়া সেই মাটীর দ্বারা বা বাটীর ভিত্তি খনন করিবার সময় যে মাটী উঠিবে তদ্দ্বারা খানা ডোবা ভরাট করাইয়া ফেলা যাইতে পারে।

আমাদের একটী গ্রাম্য প্রবচনে বাটী নির্ম্মাণের ইঙ্গিত করা হইয়াছে; তদনুসারে বাটী নির্ম্মাণ করিলে বাসগৃহ বেশ স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। প্রবচনটি এই—

দক্ষিণ ছেড়ে উত্তরে বেড়ে
ঘর করগে যা ভেড়ের ভেড়ে।

আর বাসগৃহের

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ

অর্থাৎ, পূর্ব্বদিকে হংস বিচরণের উপযোগী পুষ্করিণী এবং পশ্চিম দিকে বাঁশ ঝাড় থাকিলে ভাল হয়। অপর একটী প্রবচন—

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা;
পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা।
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই;
উত্তরদ্বারীর টেক্স নাই।

অর্থাৎ দক্ষিণদ্বারী ঘর সর্ব্বোৎকৃষ্ট; পূর্ব্বদ্বারী ঘর দক্ষিণদ্বারীর মত অতটা উৎকৃষ্ট না হইলেও নেহাৎ মন্দ নহে। পশ্চিমদ্বারী ঘর নিকৃষ্ট। আর উত্তরদ্বারী ঘর এতই নিকৃষ্ট যে নবাবী আমলে সে ঘরের খাজনা পর্য্যন্ত দিতে হইত না।

মোট কথা, দক্ষিণ দিকে খোলা জমি থাকিলে স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হইয়া বাসগৃহ স্বাস্থ্যকর থাকে। আর উত্তুরে হাওয়া তেমন স্বাস্থকর নহে বলিয়া বাটীর উত্তর দিকে বাগান করিবার প্রথা আছে। বাগানের গাছপালার বাধা পাইয়া উত্তুরে হাওয়া বেশী পরিমাণে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী থাকায় গৃহ বেশী গরম হইতে পারে না। পশ্চিম দিকে বাঁশ ঝাড় রাখার উদ্দেশ্য কতকটা তাই—প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণের উত্তাপ হইতে গৃহগুলিকে ঠাণ্ডা রাখা।

আমাদের বঙ্গদেশে সাধারণতঃ পাকা বাড়ী ও মৃৎকুটীর—এই দুই প্রকারের বাসগৃহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইষ্টক নির্ম্মিত দালানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাসগৃহ। তবে চকমিলান বাড়ী অপেক্ষা এক সারিতে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাস্থ্যকর হয়। তবে উঠান যদি খুব বড় রাখা হয়, যাহাতে অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহা হইলে ততটা অস্বাস্থ্যকর না হইতেও পারে।

কুটীরগুলির দেওয়াল হয় মাটীর, না হয় বাঁশের বা ছিটে বেড়ার, দরমার কিম্বা গরাণের হইয়া থাকে।

বাঁশের বা দরমার কিম্বা গরাণের দেওয়াল হইলে উহার উভয় পার্শ্বে পাতলা করিয়া মাটী লাগাইয়া লওয়া উচিত।

পাকা বাড়ীই হউক, আর কুটীরই হউক—বাসগৃহের দেওয়ালে যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখা অতীব আবশ্যক—যেন সেগুলি প্রয়োজনানুসারে খোলা বা বন্ধ করা যাইতে পারে। সকল বাড়ীরই ঘরের মেঝে ভূমি হইতে অন্ততঃ দুইহাত উঁচু করিয়া নির্ম্মাণ করা উচিত। ইহাতে অনেক সুবিধা আছে। মেঝে উঁচু রাখিলে ঘর ও মেঝে শুষ্ক থাকে; বিশেষতঃ বর্ষাকালে বাঙ্গলার অনেক স্থানের ভূমি কয়েক দিন ধরিয়া ডুবিয়া থাকে। ঘরের পোতা উচু হইলে প্লাবনের সময়েও ঘর তত ভিজা ও স্যাঁতসেঁতে হইতে পারে না; মেঝেয় যে সকল দ্রব্য ও আসবাব রাখা হয় সেগুলিও ভিজিয়া নষ্ট হইতে পারে না।

ঘরের দেওয়ালে কেবল দরজা জানালা রাখাই যথেষ্ট নহে। অনেক সময়ে দরজা বা জানালার ধারে হাঁড়িকুড়ি, বাক্স পেটরা রাখিয়া এমন ভাবে দরজা জানালাগুলিকে বন্ধ রাখা হয় যে সেগুলি থাকা না থাকা সমান কথা। এরূপ করা উচিত নহে। দরজা জানালা দরকার হইলেই যাহাতে খুলিতে পারা যায় এমন ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক।

আসল কথা, ঘরের ভিতর অবাধে রৌদ্র বা বায়ু সঞ্চালনের যে কি উপকার সে জ্ঞানই সাধারণতঃ আমাদের দেশের লোকের নাই। সেই জন্য প্রায় দরজা জানালা খুব কম রাখা হয়; আর রাখিলেও

তাহা প্রায় বন্ধ থাকে। দরজা জানালা রাখার উদ্দেশ্য ঘরের মধ্যে বায়ু, রৌদ্র, আলো আসিতে পারিবে। এই জ্ঞানটি জন্মিলেই লোকে যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখিবে।

কি পাকা দালান, কি মেটে বাড়ী—সকল বাস-গৃহের ঘরের মেঝে পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা উচিত। খোয়া, রাবিশ, কাঁকর, চুনসুরকী প্রভৃতি দিয়া উত্তম রূপে পিটিয়া শক্ত করিয়া মেঝে সিমেণ্ট দিয়া লইলে অন্ততঃ টালি বিছাইয়া লইলে উত্তম হয়।

মেটে ঘরের চাল প্রায় খড়ের, গোলপাতার অথবা খোলার হইয়া থাকে। আজকাল করগেটেড টীন দিয়াও চাল নির্ম্মিত হয়। এই সকল প্রকার চালেরই কতকগুলি করিয়া সুবিধা ও অসুবিধা আছে। খড়ের বা পাতার ছাওয়া চাল দিয়া বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, এবং তাহা বেশী গরম হয় না। খোলার বা টিনের চাল সূর্য্যোত্তাপে গরম হইয়া উঠিতে পারে। এইজন্য চালের নীচে দরমার চন্দ্রাতপ থাকিলে ততটা গরম হয় না।

সকল প্রকার ঘরের দেওয়ালে যে দরজা জানালা থাকিবে, সেগুলি রুজু রুজু করিয়া বসানো কর্ত্তব্য। এরূপ করিলেই তবে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা হয়। মেটে ঘরে দেওয়াল ও চালার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশ থাকায় ঘরের দূষিত উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়। পাকা বাড়ীর দেওয়ালের উপরেই ছাদে নির্ম্মিত হয়। সুতরাং পাকা বাড়ীতে এই সুবিধা নাই। এজন্য ছাদের ঠিক নিম্নে দেওয়ালের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত রাখিয়া তাহা তারের জাল বা জাফরী দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে ঘরের মধ্যস্থ উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যাইবার পথ খোলা থাকে।

বাটী নির্ম্মাণকালে পয়ঃ-প্রণালীর সুব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বৃষ্টির জল, গৃহস্থের ব্যবহৃত ময়লা জল নিকাশের সুব্যবস্থা না করিলে, যতই উত্তম গৃহ হউক না কেন, তাহা অচিরে অস্বাস্থ্য-কর হইয়া উঠে। ঘরের মেঝে সিমেণ্ট দিয়া পাকা করিয়া এবং উঠান কাঁকর দিয়া অথবা টালি বা পাথর বসাইয়া পাকা করিয়া লইবার পর নর্দ্দামাও পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে; এবং সমস্ত জল যাহাতে নর্দ্দমা দিয়া গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী কোন পুষ্করিণী, জলাশয় খাল বা নদীতে গিয়া পড়িতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বাটীর মধ্যে শয়নকক্ষগুলিই সর্ব্বপ্রধান হওয়া উচিত। কিন্তু স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে, রুচির গুণে, শয়ন গৃহ অন্দর মহলে নির্ম্মিত হওয়ায় এবং অন্দর মহলটি প্রধানতঃ বাটীর মহিলাগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকায়, অনেক ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাহিরের বৈঠক-খানা নির্ম্মাণে যেরূপ যত্ন করেন, তাহার সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠববিধানে যেরূপ ব্যয় স্বীকার করেন, শয়ন কক্ষ নির্ম্মাণে তাহার শতাংশেরও একাংশ করেন কি না সন্দেহ। বৈঠকখানা ঘরে বায়ু, রৌদ্র ও আলো প্রবেশের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বড় বড় দরজা জানালা নির্ম্মাণ করা হয়। ছবি, ঘড়ি, আলমারি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি দ্বারা বৈঠকখানা সজ্জিত হইয়া থাকে। ইহাতে অর্থব্যয়ও যথেষ্টই হইয়া থাকে। আর শয়ন কক্ষে দরজা জানালা আকারেও ক্ষুদ্র, সংখ্যাতেও কম। এরূপ ব্যবস্থা কোন ক্রমেই স্বাস্থ্যনীতিসম্মত নহে। শয়ন-কক্ষ সাধারণের চক্ষের অন্তরালে অবস্থিত বলিয়া তাহার সাজসজ্জার তত প্রয়োজন যদিই না থাকে, তথাপি, স্বাস্থ্যনীতির খাতিরে, শয়ন কক্ষে যাহাতে রৌদ্র, আলোক ও বায়ু অবাধে আসিতে পারে সেজন্য যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিয়া, যদি আব্রু রক্ষার্থ নিতান্তই আবশ্যক হয় তবে পাতলা কাপড়ের অর্দ্ধপর্দ্দার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শয়ন গৃহের দক্ষিণ দিকে গোয়াল ঘর, অশ্বশালা বা আস্তাবল কিম্বা পায়খানা যেন না থাকে। জল নিকা-শের প্রণালীও শয়নগৃহের দক্ষিণ দিকে না থাকিলেই ভাল। রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইলে শয়নকক্ষ হইতে যতটা দূরে হয় ততই ভাল, এবং তাহা প্রত্যহ উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত। শয়ন গৃহের-দক্ষিণে গোয়াল, পশুপালা, নর্দ্দামা থাকিলে দক্ষিণা বায়ুর দ্বারা বাহির হইতে যাবতীয় দুর্গন্ধ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিতে পারে।

শয়নকালে এক একটী মানবের জন্য ১০০০ ঘন

ক্বিট স্থান আবশ্যক। এই নিয়মটি মনে রাখিয়া গৃহস্থের লোকসংখ্যা বুঝিয়া শয়ন গৃহের আয়তন স্থির করা উচিত। বরং কিছু অধিক স্থান রাখা ভাল; এবং শয়ন-কক্ষে আসবাব পত্র বেশী রাখিয়া জায়গা কমাইয়া ফেলা উচিত নয়। শয়ন-কক্ষে কেবল খাট এবং রাত্রে আবশ্যক হইতে পারে এমন দুই একটী আসবাব থাকিলেই যথেষ্ট। পাকা ঘরের দ্বিতলের মেঝেয় শয়ন করিতে পারা যায়, তাহাতে ততটা ক্ষতি হয় না। কিন্তু একতল পাকা বাড়ী, বা মেটে বাড়ীর মেঝেয় শয়ন করা উচিত নহে। খাটের সুবিধা না হইলে খাটিয়া, তক্তাপোষ, ক্যাম্পখাট, অন্ততঃ মাচা বাঁধিয়া তদুপরি শয়ন করিতে হইবে এবং কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেরই মশারি ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শয়নকক্ষ হইতে একটু তফাতে রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করা উচিত। রন্ধনশালার ধূম নির্গমনের জন্য, সামর্থ্য থাকিলে, উঁচু চিমনি নির্ম্মান করা উচিত। অন্যথা ছাদের নিম্নে দেওয়ালের গায়ে ঘুলঘুলী রাখা কর্ত্তব্য। অথবা, ছাদের মাঝখানে sky light বা ধোঁয়াঘর রাখিলেও চলিতে পারে। বলা বাহুল্য, খাদ্য দ্রব্যাদি উত্তম অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য রন্ধনশালাতেও যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিয়া আলো ও বায়ু প্রবেশের পথ অব্যাহত রাখা উচিত। অন্ধকার ও রুদ্ধ বায়ু—এই দুইই খাদ্য বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে। শয়ন-কক্ষের ন্যায় রন্ধনশালার নিকটেও যেন পায়খানা বা গো-শালা অথবা নর্দ্দমা না থাকে। কারণ, এই সকল স্থানের দুর্গন্ধে খাদ্য দ্রব্য দূষিত হইয়া থাকে। রন্ধনশালায় যে খাদ্য রক্ষিত হয় তাহা দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু না লাগে এমন ভাবে আবৃত রাখাও উচিত নয়। আবার, ইঁদুর সর্প, ভেক প্রভৃতিও যাহাতে খাবারে মুখ দিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। দুধ আদুড় থাকিলে সাপ আসিয়া সেই দুধ খইয়া যায়, এবং সর্প-মুখ-নিঃসৃত বিষে দুগ্ধ বিষাক্ত হইতে পারে; সেই বিষাক্ত দুগ্ধ পান করিয়া মানুষ মারা গিয়াছে এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়। এজন্য দুগ্ধ প্রভৃতি তারের জালের ঢাকা, অথবা সচ্ছিদ্র লৌহের ঢাকার দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। সাহেবেরা তারের জালের বা বেতের জাফরির আলমারির মধ্যে খাদ্য রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাতে খাদ্যে বায়ু লাগিবার ব্যাঘাত ঘটে না, অথচ তাহা দূষিত হইবার সম্ভাবনা কম। অবস্থাপন্ন লোকেরা এই পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

যে কারণে রন্ধন-শালায় বায়ু সঞ্চালনের পথ খোলা রাখতে হইবে, ঠিক সেই কারণে অর্থাৎ ভাণ্ডারজাত দ্রব্যাদি উত্তম অবস্থায় রাখিবার জন্য ভাণ্ডার গৃহেও দরজা জানালা রাখিতে হইবে—যেন ঘরে রীতিমত বায়ু চলাচল করতে পারে; নচেৎ, ভাণ্ডারের জিনিসপত্রও পচিয়া খারাপ হইয়া যাইবে। ভাণ্ডার গৃহে যাহাতে ইন্দুরের উপদ্রব না হয় সেজন্য মেঝে উত্তম রূপে পিটিয়া বিলাতী মাটী দিয়া পাকা করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইন্দুর অনেক রোগের বিশেষতঃ প্লেগের বাহন। ইন্দুর-দষ্ট খাদ্যাদি বিষাক্ত হইয়া প্লেগবিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকে।

বাড়ীর অপরাপর কক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্বতন্ত্র ভাবে অথচ যাতায়াতের অসুবিধা না হয় এমন স্থানে পাকা করিয়া পায়খানা নির্ম্মাণ করা উচিত। কি পাকা ইমারৎ কি মেটে ঘর—পায়খানা সর্ব্বত্রই পাকা করিয়া নির্ম্মান করিতে হইবে। এবং পায়খানার ভিতর-বাহিরে দেওয়ালের গায়ে যতদূর পর্য্যন্ত জল লাগিবার সম্ভাবনা ততদূর পর্য্যন্ত এবং পায়খানার মেঝে বিলাতী মাটী দিয়া সিমেণ্ট করাইয়া লইতে হইবে। মেথর-খাটা পায়খানা ফ্লোরের উপর নির্ম্মাণ করিতে হইবে; ফ্লোরের নীচে যেখানে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে তাহা হইলে পায়খানা শুষ্ক থাকিবে, এবং দুর্গন্ধও কম হইবে। সেকালের কূয়া পায়খানা এই বৈজ্ঞানিক যুগে একেবারেই অচল। খুব গরীব গৃহস্থের পক্ষে পায়খানা নির্ম্মাণের সামর্থ্য না থাকিলে লোকালয় হইতে দূরে মাঠে অগভীর গর্ত্ত করিয়া পায়খানার কাজ সারা কর্ত্তব্য; এবং গর্ত্ত হইতে যে মাটী উঠিবে তাহা শুকাইয়া চূর্ণঅবস্থায় থাকিবে—প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর সেই শুষ্ক চূর্ণ মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে। গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেলে অন্যত্র আবার ঐরূপ গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মলত্যাগ

করিতে হইবে এবং ঐ ভাবে মাটী চাপা দিতে হইবে মল আবৃত করা এতই আবশ্যক যে ইতর প্রাণীরাও সহজাত সংস্কার বশে তাহা করিয়া থাকে। কুকুর বিড়ালাদি জীবজন্তুর আচার ব্যবহার একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। সেই জন্য বিড়াল কুকুরাদি নরম মাটীতেই মলত্যাগ করিয়া থাকে—তাহাতে মল মাটী চাপা দিবার সুবিধা হয়।

গোয়াল ঘর, আস্তাবল, অশ্বশালা—এসকল বাসগৃহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দূরে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এবং পালিত পশুদিগের স্বাস্থ্যের খাতিরেও বটে, আর গৃহস্থের নিজের স্বাস্থ্যের খাতিরেও বটে—গোশালা অশ্বশালা প্রভৃতি নিত্য নিয়মিতভাবে ধৌত করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিতে হইবে। প্রত্যহ, অন্ততঃ একদিন অন্তর কিম্বা সপ্তাহে দুইদিন ফেনাইল ইত্যাদির দ্বারা গোশালা অশ্বশালা ও নর্দ্দামা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারলে আরও ভাল। পালিত পলিত পশুদিগের মলমূত্রাদি প্রত্যহ স্থানান্তরিত করা উচিত।

বাসগৃহের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ সূতিকা-গৃহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের গৃহস্থ ঘরে সূতিকা গৃহ গৃহস্থের কলঙ্ক স্বরূপ। প্রসূতি ও গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা বিবেচনায় ও কল্যাণ-কামনায় বাটীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষই সূতিকাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে হয় ঠিক ইহার উল্টা; অর্থাৎ বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কক্ষ; পশুদিগের পক্ষেও যাহা অব্যবহার্য্য এমন কক্ষ সূতিকাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং সেই কক্ষে নব প্রসূতি স্বীয় সন্তান সহ বাস করিতে বাধ্য হন। এমন সুযোগ পাইয়াও যদি শিশুকে পেঁচোয় (ধনুষ্টঙ্কার রোগে) না পায়, তবে আর পাইবে কিসে? বাঙ্গালা দেশে জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ সূতিকা গৃহে অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। সেই জন্য, স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে বাসগৃহে নির্ম্মাণ করিতে হইলে বাটির মধ্যে একটি কক্ষ সূতিকা গৃহের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। এই কক্ষটি, অন্যান্য কক্ষ সংলগ্ন না হইলেও হানি নাই, অপরাপর কক্ষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া সূতিকাগার নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কক্ষটি বাসের পক্ষ (তা তাহা মোটে একমাস হইলেও) সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য—এমন কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। রোদ আলো হওয়া এই ঘরে প্রচুর পরিমাণে থাকা চাই। ঘরটি শুকনো ঘটঘটে দুর্গন্ধশূন্য হওয়া উচিত।

বাসগৃহ তথা বাস-গ্রামখানি পর্য্যন্ত যে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য, এ কথা বিশেষ করিয়া কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন হয় না—ইহা সকলেই অবগত আছেন। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং বাসগৃহ পরিষ্কার রাখা শুচিতার অন্যতম লক্ষণ। এবিষয়ে কেহ যে ইচ্ছা করিয়া অবহেলা করিয়া থাকেন, এ কথা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থা-বৈগুণ্যে এ দিকে বিস্তর ত্রুটি ঘটিতেছে। ইহার প্রধান কারণ গ্রামগুলি ক্রমশঃ জন-বিরল হইয়া আসিতেছে। যথেষ্ট লোকের অভাবে গৃহস্থদের বাটীর সকল অংশ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না; এবং এই কারণেই বাসগৃহের সন্নিকটে জঙ্গলের উৎপত্তি হইতেছে। অনেক গ্রামে দেখা যায়—এক সময়ে গ্রামখানি সমৃদ্ধ ছিল—গ্রামের সমৃদ্ধির পরিচায়ক অনেক বড় বড় অট্টালিকাও দেখা যায়। কিন্তু অধুনা তাহাদের ভগ্ন দশা। হয় গৃহস্থের অবস্থা এখন খারাপ হইয়াছে, নচেৎ বহু শরিকে বিভক্ত হওয়ায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; কিম্বা চাকুরী বা বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কর্ত্তৃস্থানীয় লোকেরা প্রবাসী হওয়ায় বাস গৃহের যত্ন লইবার কেহ নাই। হয় ত দুই একটি বৃদ্ধা বিধবা উপায়ান্তরের অভাবে কিম্বা সাত পুরুষের ভিটার মায়া কাটাইতে না পারিয়া তুলসী তলার সন্ধ্যাদীপ দিবার জন্যই বোধ হয় সেখানকার মাটী কামড়াইয়া কোন রকমে পড়িয়া আছেন। প্রকাণ্ড বাড়ী সংস্কারাভাবে জীর্ণ, পরিষ্কার রাখিবার লোকাভাবে জঙ্গল ও আগাছায় পূর্ণ। ব্যষ্টিভাবে এক একটী গৃহের অবস্থা যেমন, সমষ্টি ভাবে সমস্ত গ্রামখানির অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। ইহার প্রতিকারের উপায় যাঁহারা প্রবাসে আছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহারা আবার গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলে গ্রামগুলির

পূর্ব্ব শ্রী-সম্পদ ফিরিয়া আসিতে পারে; জঙ্গল পরিষ্কার হইতে পারে; পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে; গ্রামের বাসগৃহগুলি এবং সমস্ত গ্রামখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

কিন্তু তাই বলিয়া এখন যাঁহারা গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহারা যে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবেন তাহাও নয়। বাসগৃহ পরিষ্কার না রাখিলে তাঁহারাই বা কত দিন সেখানে বাস করিতে পারিবেন? অতএব গৃহের আবর্জ্জনা প্রত্যহ গ্রামের বাহিরে নিক্ষেপ করিতে হইবে; গোয়াল ও অশ্বশালার আবর্জ্জনা প্রত্যহ একটা চৌবাচ্ছায় সংগ্রহ করিয়া তথা হইতে গ্রামের বাহিরে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। পায়খানা মেথর দিয়া প্রত্যহ পরিষ্কার করাইতে হইবে। নর্দ্দামা দিনে দুই তিনবার ধৌত করিতে এবং সুবিধা হইলে প্রত্যহ একবার ফেনাইল প্রভৃতি দ্বারা শোধিত করিতে হইবে। বাড়ীর কাছে এমন কি গ্রামের মধ্যেও গ্রামের বাহিরে কিছু দূর পর্য্যন্ত জঙ্গল ও আগাছা কাটাইয়া জলনিকাশের পথ খোলা রাখিতে হইবে।

স্বাস্থ্য-সমাচার

চৈত্র, ১৩২৭।

সমালোচনা

ধান-দূর্ব্বা। শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। গিরীশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। অনেকগুলি খণ্ড কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাবে-ভাষায় সেগুলি বিচিত্র-সম্পদশালী। ছন্দে সজীল প্রবাহ আছে, প্রাণ আছে। সমস্ত কবিতাগুলি উপভোগ্য, সুন্দর। তবে বাছাই করিতে গেলে বলিব, 'স্বর্ণমৃগ' কবিতাটি আমাদের খুব সুন্দর লাগিয়াছে; ভাবে ভাষায় জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতার পাশে স্থান পাইবার যোগ্য।

"চাঁদের হাসি ডুব্‌ল কবে পাহাড়গুলোর পিঠে?
সুধার নেশা লাগ্‌ছে না আর মিঠে।
বুড়ো হয়েই গেছে সে চাঁদ আমার সাথে-সাথে
নেই সে চুমু শারদ-জোছনাতে,
চুম্বকেরি টানে যখন যুগল এসে মিলৃত হাতে হাতে
টান পড়িত ফুলের সে ছিলাতে।"

এই কয় ছত্রে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলির ভাব-সম্পদের মতই ভাবৈশ্বর্য্যের সন্ধান মিলে। এই কবিতাটিতে কবি ছন্দের যে সহজ লীলা-ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, তাহা ভাবের সঙ্গে সমান তালে নাচিয়া চলিয়াছে; ছত্রের পর ছত্রে বিচিত্র ছবি ফুটিয়াছে। 'কুণাল-কাঞ্চন' গাথা কবিতাটিতে pathosটুকু চমৎকার ফুটিয়াছে। 'নববর্ষ', 'ভুল', 'বসন্ত-বিলাস', 'বাসন্তী', 'গগন', প্রভৃতি কবিতাগুলি lyric এর আনন্দ-বিহ্বলতায় ও স্বপ্নময়তায় ভরপূর। কবির লেখনী নিতান্ত ঘরোয়া সাধারণ জিনিষকে মর্ত্ত্যের ধূলি-জঞ্জাল হইতে টানিয়া তুলিয়া এমন সোনার স্বপ্নে রঙীন করিয়া আঁকিয়াছেন, জ্যোৎস্না-রেণু মাখাইয়া তাহাদের এমনি রঙের ফোয়ারায় স্নান করাইয়াছেন যে তাঁহার শক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, পুলকিত হইয়াছি। 'বাংলা দেশের মেয়ে'য় তাহার পরিচয় পাই। ভাষার উপর কবিতার শক্তি অসাধারণ। ভাষা এই বেশ হালকা ঝরঝরে, আবার প্রয়োজনমত তাহা নিমিষে আবার গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগ্রন্থখানি বাংলার কাব্য সাহিত্যে পরম সম্পদের সামগ্রী হইয়াছে, ব্যক্ত ও অব্যক্তের আভাষে পরম রমণীয়, এই কবিতাগ্রন্থ কাব্যামোদীমাত্রেরই চিত্ত অপূর্ব্ব পুলকে তৃপ্ত করিবে, মুগ্ধ করিবে। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই—অর্থাৎ ভিতর-বাহির, সমস্তই চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ [২য় সংখ্যা

শেষ-শয্যায় নূরজহান্

স্থান—লাহোর [প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে রোগশয্যায় নূরজহান্; পায়ের দিকে খোলা-জানালার ধারে প্রধানা-সহচরী জোহরা বসিয়া আছে। ভিতরের দিকে বড়-বড় খিলানময় জাফ্‌রিদার অতিদীর্ঘ বারান্দা। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একাংশে বিশেষ করিয়া সাইপ্রেস্-(সরো)-গাছ গুলি দেখা যাইতেছে। বাহিরে দূরে জহাঙ্গীরের সমাধি শাহদারা] কাল—দিবাবসান।

জোহরা

সারারাত কাল ঘুমাওনি বুঝি ? সারাদিন আজ জাগিলে না যে !
বেলা পড়ে' এল, শাহী-নহবত্ প্রহর-ঘণ্টা মহলে বাজে।
নট্‌কান্-রাঙা আলোটি পড়েছে মিনার-চূড়ায় শাহদারার,
এমন সময়ে তুমি যে গো রোজ বসে' থাকো থির-আঁখিতারায় !
মুয়াজ্জেন্ ওই মস্‌জিদে ধরে সন্ধ্যা-আজান্ মগ্‌রবের,
পিলু-বারোয়াঁয় বাঁশিটি ফোঁপায় কোথায় বিদায়-উৎসবের !
ফোয়ারায় জল ঢালিছে পাথরে—শোনা যায় যেন আরো সে কাছে,
টুক্‌টুকে-নথ নীলা-কবুতর্ আলিসার 'পরে আর না নাচে !
ঘরের দেয়ালে দূর-বাগানের পাতা-ঝিল্‌মিল্ কাঁপিছে ছায়া,
দুধে-পাথরের খিলানের গা'য় আকাশের লাল মেঘের মায়া !
ওঠো একবার ! নওরাতি আজ—শেষ নওরোজ হয়ত এই,
এদিনের মত স্মরণ-বাসর তোমার নসীবে আর যে নেই !
—পাদিশা-প্রেয়সী নূরজহান্ !

জেগে আছো মাগো—তাইত! দেখি যে চোখের কোণায় জল গড়ায়—
গোস্তাখি মাফ্ কর হজ্‌রত্! প্রাণ যে আমার ভুল করায়!
শুভদিনে আজ চোক চাহিলে না, ওক্ত যে সব বহিয়া যায়!
আজিকার দিনে খোদার দুয়ারে জানাবে না শেষ প্রার্থনায়?
এইখানে তুমি বসিবে, গায়িব হাম্‌দ্-গজ্‌ল্—তোমারি গান,
আজ নওরাতি—জ্বালাবে না বাতি? সাজাবে না তাঁর গোলাবদান?
ওকি হাসিমুখ! চাহনি তোমার হঠাৎ হ'ল যে কেমনতর!
হঠাৎ অচেনা মনে হয় তোমা—আজিকে কেন মা এমন কর'?

নূরজহান্

কেন মিছে ভয় করিস্ জোহরা? তুই যে আমার ছোট বহিন্!
শাহ-বেগমের গরব কোথায়! তোরও চেয়ে আমি অধম হীন।
আজ নওরাতি?—জ্বালাস্‌নে বাতি মরণ-শিয়রে আমার ঘরে,
যত বাতি আছে জ্বালা'তে ব'লে দে শাহান্-শাহার সমাধি 'পরে।
মোর তরে আর নমাজ নাহিরে, পাতিস্‌নে আর মুসল্লায়,
বিশ্বপতির দরবারে মোর সকল আরজ্ আজ ফুরায়!
দেহের-মনের ইদ্‌গাহে মোর মেহেরাবে জ্বলে হাজার বাতি,
আজ থেকে তাই অনন্ত মোর চিরমিলনের সে নওরাতি!
তুই জেগে থাক্ সেহেলি আমার—শেষ সহচরী! মাথার পাশে,
বাদামের জলে আফিম্ মিশায়ে দিস্ বারেবার—যাতনা নাশে।
আজ রাতে আর ঘুমা'ব না আমি, ঘুমেরি মাঝারে রহিব জেগে,
তুই চেয়ে দেখ্—কবরে কখন্ বাতি নিবে যায় বাতাস লেগে।

জোহরা

ঘুমাও ঘুমাও! আর জাগা'ব না, মেজাজ তোমার ভালো যে নাই,
সারাদেহে এ যে আগুনের জ্বালা! উঠিতে আজিকে পার নি তাই।
বক্সীরে আমি খবর করিগে, হাকিম আসেনি এ-বেলা কেন?
মরিয়ম আর সখিনা-বাঁদীরে ব'লে দেই—থাকে হাজির যেন

নূরজহান্

এত ক'রে বলি, বুঝিস্ নে তুই! বোস্, কাছে আয়, হয়নি কিছু,
বুড়া হ'লি তবু বুদ্ধি হ'ল না, মিছে ঘুরে মলি আমার পিছু!

হাম্‌দ্ গজ্‌ল্—ভগবৎ-সঙ্গীত। মুসল্লা—নমাজের আসন।
ইদ্‌গাহ্—উপাসনাগার। মেহেরাব্—বাতি জ্বালাইবার বেদী।

আজ যে আমার সব ঘুচে গেছে, সব শোক-দুখ, সব বালাই !
এ-বিশ বছর যার ধ্যান করি, কাল তার দেখা পেয়েছি ভাই !
মাফ্ পেয়েছি যে—ছুটি আজ থেকে, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার,
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার !
সারা রাত কাল স্বপন পেয়েছি, দিনে তা' জপেছি ঘুমের ভাণে,
মগ্‌রব্-বেলা ডাকিলি যখন, শান্তি নেমেছে সারাটি প্রাণে।
আর বেশীখন নয় রে জোহরা, রাতটা বুঝি বা হয় না ভোর—
মিছে শোক তুই কেন বা করিস্, আজ শেষ—আজ ছুটি যে মোর !
কাঁদিস্‌নে তুই ! এত সুখে তবু কান্না দেখিলে কান্না আসে,
স্নেহমমতার সব শেষ, তবু দুঃখের নেশা ঘুচিল না সে !

জোহরা

কি যে বল তুমি আলি-হজ্‌রত্ ! এত-বড় শোক মানুষে পায় !
কি হ'য়ে, কি বেশে, ধরা হ'তে আজ চুপে-চুপে তুমি নাও বিদায় !
সুখ কোথা রাণি !—মহারাণী মোর ! হিন্দ-রাজের শাহ-বেগম !
চেয়ে দেখ, ওই তাঁহারো শিয়রে আলো যেন আজ জ্বলিছে কম !
অগাধ আকাশে ওই যে হোথায় টুক্‌রা যেন সে জরীন্ ফিতা—
ওরি মত হাসি তুমিও হেসো না, ভুলে গেলে তুমি আছিলে কি তা !
আমি যে দেখেছি ওই চুলরাশ রুমাল খুলিয়া পড়িত খসে',
একাকার হ'ত ঝিনুক-বসানো আব্‌লুসে-গড়া তখ্‌তপোষে !
চোখের পাতার রেশ্‌মী ঝালরে হামামে দাঁড়া'ত জলের ফোঁটা,
সুর্মা আঁকিতে হ'ত না কখনো, হাসিতে ঝরিত মুক্তা গোটা !
ওই হাতে ধরি' হাতিয়ার, ফের আঙুলে বুনেছ ফুলের ছবি !
ওই পায়ে তুমি পায়েলা পরিয়া বীর দলিয়াছ, ভুলেছ সবি ?
মরণ-ডঙ্কা কণ্ঠে বেজেছে, বেজেছে সাহানা—পরীর সুর !
চাহনি তোমার শের-মোগলের শরাবের নেশা করেছে দূর !
সেই-চোখে আজ আঁধার নামিছে, সেই-মুখে আজ স্বপন-হাসি—
এত দুখ তব সুখ হ'ল আজ ! সেইগুলা ছিল দুঃখরাশি ?
কারে ভুলাইছ ? কার কাছে তুমি হাসিয়া রুধিছ চোখের জল ?
কায়-মনে আমি সেবিনু তোমায়, আমারে ভুলা'তে কেন এ ছল ?
ওই হাসি তুমি পোরো না ও মুখে, বাঁধিও না ওই চোখের বাঁধ,
পায়ে মাথা রেখে কেঁদে নিই আজ, মিটাইয়া মোর মনের সাধ।

হামাম্—স্নানাগার।

মরেছে বটে সে ভাইঝি তোমার—আরজমন্দ ভাগ্যবতী,
অমন তখ্ত-তাউসে বসিয়া কাঁদে তার লাগি' দুনিয়াপতি !
ষোলটি-বছরে-জমানো অশ্রু জমাট্-পাথরে হ'তেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছা'তে মাটিতে বেহেশ্ত্ তুলেছে মাথা !
দীন্-দুনিয়ার মালিক যে জন তাঁর নাকি বড় ন্যায়-বিচার !—
মমতাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজহানের কাফুন সার !

নূরজহান্

চুপ চুপ ! ওরে অবোধ ভিখারী ! বলিস্ নে আর অমন কথা !
আমারি মনের শেষ মলাটুকু তোরও প্রাণে দেখি জাগায় ব্যথা !
যা ছিল আমার সব ভালো ছিল—খোদার শ্রেষ্ঠ দো'য়ার দান,
যা ঘটেছে মোর সারাটি জীবনে, গোড়া থেকে শেষ—সব সমান।
একতিল তার দেখি না যে তিত, সবই যে শিরীন্—করিনা শোক,
সব পাপ-তাপ দম্ভ-বিলাস—কামনার পথে অমৃতলোক !
জন্ম যাহার পথের মরুতে, মেটেনি প্রথম স্তনের তৃষা—
তনুটি তাহার অনলের শিখা, মনটি যে তার হারায় দিশা !
আগুনের লোভ করেছে যে-জন আপনি সে-জন ভস্মশেষ,
মন খানি বুঝে মাতাল যে-জন—পরা'য়েছে সেই রাণীর বেশ !
আমার পিপাসা সেই নিয়েছিল—আপন পাত্র গরলে ভরি',
ভুলা'য়ে রাখিল হীরার মুকুটে, নিজে তখ্তের পায়াটি ধরি'।
কোনো জ্ঞান মোর ছিলনা তখনো—কোথায় চলেছি কিসের খোঁজে,
চিনেছিল শুধু একজন সেই, প্রেম যার আছে সেই যে বোঝে !
রংমহলের হুর্-পরী-দলে নামটি দিল সে—নূরমহল।
ষোড়শীর রূপে মজেছিল সে কি ? যৌবন শেষ্—তবু চপল !
আমার মাথায় তাজ দেখেছিলি—দুর্-মর্জান্-মোতি-বাহার ?
তারি শোকে তোর ধারা বয় চোকে ! বেইমান্, দাও দোষ খোদার !
তোর দোষ নেই, আমিও বুঝিনি, দেখিনি তখন এমন করে'—
শাহ-বেগমের নকল খেলায় আসলের নেশা গেছিল ধরে' !
মমতাজ !—আহা, রুহু যেন তার খোশ্হালে রয় আল্লা-তা'লা !
গগন-সমান গম্বুজ গড়ি' খুরম্ সাজায় অশ্রুডালা !

কাফুন—শব আচ্ছাদন করিবার বস্ত্র। রুহু—আত্মা।

মরণের পরে শোকের নিশানা অমর যেজন করিতে চায়—
আপনারে তার দেয় নি বিলা'য়ে—প্রেমেও গর্ব্ব ! হায়রে হায় !
আমারে যেজন ভালোবেসেছিল—নিজের মাথার মুকুট খুলে'
হিন্দুর মত প্রতিমায় তার অর্পিলি সব, আপনা ভুলে'।
মহলের নূর ছিল যেই তার, তাহারে করিল নূরজহান্,
জীবনেই তারে জয়মালা দিল, ফিরায়ে নিল না আর সে দান !
আল্লারে মোর হাজার শোকর্—চলে' গেল আগে আমায় রেখে,
সেইদিন হ'তে বুঝেছি জোহরা, বুঝি নাই যাহা নিকটে থেকে।
যে-বাতাস তোর নাকের নিশাস তার চেয়ে বড় দখিনে-হাওয়া !
মরিয়া যেদিন বুঝাইয়া দিল, ছেড়ে দিনু সব দাবী ও দাওয়া।
রূপের গর্ব্বে ধিক্কার হ'ল—মরিল যেদিন শের আফ্কন্,
'নার্' গেল, 'নূর'—সে ও ঘুচে' গেল, নির্ব্বিষ হ'ল এ দেহ-মন !
তার পর হ'তে এ বিশ বছর, একে একে সব গিয়েছে ধুয়ে,
জীবনের যত সুখ-দুখ-ফুল-ফল হ'য়ে আজ পড়িছে নুয়ে।
বোস্তান্ আর গুলেস্তানের রূপটি ধরেছে সব হায়াত্—
সাপ-শয়তান বুল্বুল্ হ'য়ে গায়িছে সারাটি জ্যোৎস্নারাত !
যত শোভা—সে যে বাসনারি রূপ, রূপের জগৎ কী সুন্দর !
বাসনায় যার বাঁশী বেজে ওঠে, ঘুচে যায় তার ইহ ও পর।
আগুনে যেমন সব বিষ যায়, প্রেমেও তেমনি সকলই শুচি,
কামনার কালি তাহার পরশে জ্বল্জ্বল্ করে—হীরার কুচি !
তবু একটুকু আছিল আমার কলিজার তলে ব্যথার দাগ,
কোনোমতে তারে মুছিতে পারিনি—সেই টুকু ঘোর রক্তরাগ !

জোহরা

আম্মা-বেগম, কহিও না আর—ভয়-ভয় করে এসব শুনে',
এ যেন তোমার জ্বরের খেয়াল, এত জোর পাও কিসের গুণে ?
আরে একি হ'ল ! দেখ, দেখ, যেন আগুন লেগেছে শাহ্দারায় !
এত আলো হোথা কিসে হ'ল আজ ? এত বাতি আজ কারা পোড়ায় ?
আহা, তুমি কেন ?—উঠোনা উঠোনা !—আহা-হা, আবার ঘুরিল মাথা !
কি যে চাও তুমি আমারে বল' না ! কেন এতখন বকিলে যা'-তা' ?

নার—তাপ। নূর—আলোক। বোস্তান্—সৌরভময় স্থান।
গুলেস্তান—পুষ্পোদ্যান। হায়াত—জীবন।

শরবৎ দিব ?—ঘুমের আরক ?—শামাদান তবে শিয়রে দিই ;
ও-দেহে তোমার আছে আর কিবা ! চোকদুটি এই মুছায়ে নিই।

নূরজহান্

আমার কাহিনী তুই বুঝিবি না, বুঝেছে সে কথা আর একজন—
দুনিয়ার মাঝে দরদী যেথায়, করিবে অশ্রু বিসর্জ্জন।
যেদিন চেয়েছি কবরে তাঁহার ব্যথায় গুমরি' গভীর রাতে,
অমনি আলো সে জ্বলেছে দ্বিগুণ—আগুনের মত ঝঞ্ঝাবাতে !
একটু সে দাগ কিছুতে মোছে নি, তখ্‌তে বসিয়া ভুলিনি তবু !
তা'ও মুছে গেছে এপারে থাকিতে – স্বপনে সে আশা করি নি কভু।
জানিস্ জোহরা ! দর্শন দিতে বসেছি যখন দেওয়ানি-খাসে,
ঝরোকার তলে প্রজারা দাঁড়ায়, সেও দেখি আছে দাঁড়ায়ে পাশে !
সেই আলিকুলী শের-আঁফ্‌কন্—দৃপ্ত-সহাস, অমন বীর !
বক্ষকবাট যেমন বিশাল তেমনি ললাট, উচ্চশির !—
ম্লানমুখে সে যে রয়েছে দাঁড়ায়ে, ধূলায়-রক্তে ভরেছে বেশ !
বুক-ফাটা সে কি নীরব চাহনি !--কি যেন আরজ্ করিছে পেশ !
মূর্চ্ছার বশে টলিতে টলিতে ঘরে ফিরে' গেছি পাণ্ডাশ মুখে,
চীৎকার যেন গলায় চাপিয়া লাইলিরে মোর টেনেছি বুকে !
কতকাল হল, আর ত' দেখি নি ! তবু ভুলি নাই, ভোলা কি যায় !
মরণ-ধূসর মূরতি তাহার মনের মাঝারে মূর্চ্ছা পায় !
সব দুখ যবে সুখ হয়ে গেল, সব সুখ হ'ল মুক্তি-সেতু,
মরণে যখন লভিব বিরাম—সেই হ'ল শেষ দুঃখ-হেতু !
তাঁর সাথে মোর মিলনের পথে মরণেও বাদ সাধিল সেই !
এ কি এ বিষম গজব্ তোমার—প্রেমময় ! প্রেমে মাফ্ কি নেই ?
কাল রাতে তার জবাব পেয়েছি, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার,
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার !
চোখ যদি থাকে দেখে নে জোহরা, আজিকার এই সুখের হাসি ;
শিশিরে-ধোয়া সে গুল্‌শন্ নয় ?—নওশার লাগি' ফুলের ফাঁসি ?
আলিকুলী আর আসিবে না ফিরে, আসিলেও আর চিনিবে না সে,
জরা-যৌবন এক যার কাছে—সেই বাঁধি' ল'বে বাহুর পাশে।

গুল্‌শন্—ফুলবীথি। নওশা—বর।

এই শাদা-চুলে সিঁথির সীমায় চুমা দিবে সে যে অশেষ স্নেহে,
চিরযৌবন-রৌশন্ রূপ ফুটিবে আমার জীর্ণ দেহে !
জোহরা ! জোহরা !—

জোহরা

কি বলিবে বল, চুপ কর কেন আম্মাজান্ ?

নূরজহান্

ওই শোন্—ওই !

জোহরা

এশার ওক্ত—মস্‌জিদে ও যে দেয় আজান !

নূরজহান্

না না, ও যে দূর বাঁশীর আওয়াজ ! শোন্ দেখি তুই কাণটি পেতে,
মাঝে মাঝে আমি কেবলই শুনি যে—শুনি ওই সুর দিনে ও রেতে।
জ্যোৎস্নায় যেন জুড়াইয়া দেয়—ক্লান্ত নয়ন মুদিয়া আসে,
কখনো গভীর আঁধার-নিশীথ—দুই চোখে দেখি শিশির ভাসে।
না,না,—কাজ নেই, সেই ভালো— আমি একাই ঘুমাব !—সে যদি কাঁদে ?
কোথায় ! কোথায় ! দূর—বহুদূর ! মাটির বাঁধনে তা'রে কি বাঁধে ?

জোহরা

আর কথা নয়—চোক জলে ভাসে ! কপালে তোমার হাত বুলাই,—
ঘুমাও দেখি মা একটু এখন ! আমি বসে' হেথা পাখা ঢুলাই।

নূরজহান্

তবু, দেহখান—যেখানে সে থাক্—তাঁর দেহ থেকে রবে না দূরে,
দেখিস্ তাঁহার কবরের ছায়া পড়িবে আমার বুকটি জুড়ে'।
ওরা যে বোঝে না, ভাবে—কত পাপ, কত সে পিপাসা প্রেমের নামে !
শা'জহান্ তাই বিচারে বসেছে, দিবে না আমারে শুইতে বামে।
আমি ত' চাহি নি' মর্ম্মর-বাস শাদা ধব্‌ধবে পাথরে-গাঁথা !
ধূলামাটী, সে যে জীবের জননী—আর কার কোলে রাখিব মাথা ?
এই ধরণীর দুলালী-আমি যে, ধূলায়-কাদায় ভরি' আঁচল
ঢেলা ভেঙে আমি বুনেছি ফসল—রাঙা হৃদি-ফুল, অশ্রু-ফল !

রৌশন্—উজ্জ্বল।

শুধু পাশটিতে, একটু সে কাছে,—তা'ও সহিল না শাহজহান্!
মমতাজ বুঝি দিব্য দিয়েছে? তাজের মহিমা হইবে ম্লান?

জোহরা

ওই দেখ দেখি, ব্যথা নাকি নেই? সব মুছে গেছে—সকল জ্বালা?
বুকের ভিতরে সব চাপা আছে, কপালে বিঁধিছে কাঁটার মালা!
আমি যে তোমার মন ভাল জানি, কেঁদেছি কত যে ও-মুখ চেয়ে!
চোক ফেটে জল দেখেছি গড়ায় আপনি তোমার গণ্ড বেয়ে।
শেষ সাধটুকু, তা'ও পূরিবে না? মানুষের বুক এত পাষাণ!—
পাথরের রূপে মজিয়া করেছে কঠিন আপন কলিজাখান!

নূরজহান্

খসে'-পড়া বড় তারার মতন এতটা আকাশ আসিলে বেয়ে—
লাল হ'য়ে গেল পাণ্ডুর রাতি তোমার দেহের আলোক পেয়ে!
চেনাবের তীর, পিপাসা-অথির কেঁদে কেঁদে বয় পাহাড়ে নদী;
তোমার-আমার চেনা সে চেনার—এই গাছ-তলে বস'গো যদি!
বন্-গোলাপেরা চেয়ে আছে দেখ, হাসিমুখে নাই ভাবনাটুক্—
সুন্দরী ওরা, রূপের পসরা!—তবু কোনো দিন পায়নি দুখ!
অশ্রু-শিশিরে আতরের বাস, ঝরা-পাপ্‌ড়িও কেমন চায়!
ফুলের মতন হওয়া কি বারণ?—রূপ র'বে বিনা দুখের দায়!
কি এনেছ ভরি' স্ফটিক-সুরাহি? কওসর হ'তে আবে-হায়াত্?
তুমি আগে পিও, তোমার আননে এখনো ঘোচেনি কালিমাপাত!
স্বর্গের সুরা এই সে তহুরা!—আনিয়াছ ভরি' আমারি তরে?
চুমুকে-চুমুকে সব ব্যথা যাবে! সব স্মৃতি নাকি উদাস করে?
তুমি চাও না সে! কোনো দুখ নেই?—এখনো নয়নে নেশার ঘোর!
কোন্ মদ পিয়ে মাতোয়ারা তুমি—এত অচেতন, হে প্রিয় মোর?
আমি যে পারি না সহিতে সকল, দাও দাও মোর কণ্ঠে ঢালি'—
শুধু দুখ নয়!—সুখ সেও যাবে, সব বুকখান করিয়া খালি!
শুধু যাবে না সে নূরজহানের শাহীদরবার—শের-আফ্‌কন্?
যাবে তারি সাথে কুমারী-মেহের—শাহজাদা—আর সে চুম্বন?
নিঠুর তুমি! টলিছে না হাত! মিশা'লে না ফোঁটা আঁখির জল!
ব্যথা নাই! তবে সুখও নাই বুঝি? তবে কেন এলে—কেন এ ছল?

কওসর—স্বর্গনদী। আবেহায়াত্—সঞ্জীবনী বারি।

'ভালোবাসিয়াছি তোমারে পিয়ারী, তার বেশী মোর চাহি না সুখ,
'কওসর্-বারি তহুরা-শরাব তুমি পান কর, জুড়াও বুক!
'আমার বলিয়া কিছুই নাহি যে—আমার পুণ্য, আমার পাপ—
'যা করেছি ফের করিতে যে পারি, কিসের দুঃখ, কি পরিতাপ?
'তুমি পান কর, ভুলে যাও সব, কাঁদিও না আর সে সব স্মরি'—
'মাগিয়া এনেছি তোমারি লাগিয়া এ-পানি খোদার আরস্ ধরি'।
'দুখ যদি সুখ না হয় সাধনে, প্রেম—সে যে শুধু পিয়াস-জ্বালা!
'কর পান কর, সব ভুলে যাও! নামাইয়া দাও ব্যথার ডালা।'
আর বলিও না! বুঝিয়াছি সব,—ওরে অভাগিনী অবোধ নারী!
আজ শেষ! আজ সকল গর্ব্ব-অভিমান দিনু চরণে ডারি'।
আমারে কুড়া'য়ে ধুলি হ'তে নাও, গেঁথে নাও বুকে মোতির সাথে!
কণ্ঠে দুলিব, ধু'য়ে গেছি আজ তব নয়নের আলোক-পাতে!
মিটিয়াছে ক্ষুধা, চাহি না ও সুধা—ফিরাইয়া দিও দয়ার দান,
আর জাগিবে না, কাঁদিবে না আর জহাঙ্গীরের নূরজহান্!
আজ নওরাতি! জেলে দেরে বাতি, হেনা দিয়ে দিস্ দুখানি হাতে,
সুর্ম্মায় চোক ডাগর ক'রে দে, চুমিবে সে মোর নয়নপাতে!

জোহরা

আম্মাবেগম, বাতি নিবে যায়, জ্বালাইয়া ফের দিব কি তবে?
আকাশে দেখি যে বাদল নেমেছে—বাতাস উঠেছে—ওমা কি হবে!
ঘুমাইলে বুঝি? ঘুমাও ঘুমাও! কাজ নাই মিছা জাগিয়া আর—
ওই-যা! হোথায় আলো নিবে গেল!—কবর আঁধার শাহদারার!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

স্বখাত সলিল

১

স্নানের সময় পুকুরঘাটে তার সঙ্গে আমার দেখা হত। ছোট সহরটির এক টেরে একই পাড়ায় আমাদের বাড়ী, মাঝখানে এই পুকুরটির মাত্র ব্যবধান, সে ব্যবধান ভোরে আর সাঁঝের বেলায় তর্‌তরে ঢেউয়ে তরঙ্গায়িত কলমী কহ্লার ও অন্য নানাজাতি ফুলের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হত। সোনা পোকারা তাদের সোনালি পাখা কাঁপিয়ে ফুল থেকে ফুলে ভিড় করে উড়ে বেড়াত।

আমি দম নিয়ে ডুবে থেকে বল্‌তাম, 'দেখ্‌লে রাণী, কেমন এক ডুবে ওপার থেকে গিয়ে ফিরে এলাম ?'

সে বিপুল আগ্রহে নেচে উঠে বল্‌ত, 'কই, দেখি না আবার !'

আবার ডুব দিয়ে বল্‌তাম, 'দেখ্‌লে ?'

সে তার বড় বড় চোখদুটিকে বিস্ময়ে আরো বড় করে তুলে বল্‌ত, 'হাঁ, সত্যি ত ! তুমি যখন যাচ্ছিলে, উপরে থেকেও আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম ।'

তার বুদ্ধি-সুদ্ধির কিছু কি অভাব ছিল ? তা নয়, আর অতটুকুই ত মেয়ে ! তবে সেই বয়সেই তার সরল হৃদয়ের অকুণ্ঠিত বিশ্বাসকে সে আমার উপর ন্যস্ত করেছিল । আমাকে সে যে কি ঠাউরেছিল তা জানিনে, মাষ্টারের কাছে শেখা বোধোদয়ের ব্যাখ্যা আর ত্রৈরাশিকের নিয়মগুলোকে পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে যাচাই করে না নিলে তার তৃপ্তি হত না !

মনে আছে, পুকুরের এক কোণে তিনটে ডুমুর গাছ তাদের ঝাঁকড়া ডালপালা সুদ্ধ জলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল । সেই-খানটায় ছিল অন্ধকার আর আমাদের শিশু-মনের হাজারো-রকম ভয়-কল্পনার রাজ্য । পারতপক্ষে সেদিকে আমরা যেতাম না । আর ঠিক সেইজন্যেই পাড়ার ছেলেদের সর্দ্দার সনাতন ছোঁড়াটা সকলের কাছে বাহাদুরি নেবার মৎলবে বাঁধা নিয়মে সেইদিক্ দিয়েই রোজ জলে নাম্‌ত ।

একদিন দেখি সেই অভ্যাস অতিক্রম করে, গামছা কাপড় আর তেলের বাটি নিয়ে দিব্যি ভালোমানুষটির মতো সে আমাদের ঘাটটিতে এসে জুটেছে । কোনোরকমে স্নান শেষ করে উঠে পড়্‌লাম, তারপর রাণীকে ডেকে বল্‌লাম, 'তোমার কি আজ আর হবে না রাণী ? সমস্ত দিন জলে পড়ে থেকে জ্বর না এনে বুঝি ছাড়্‌বে না ? যাই, তোমার মাকে বলিগে ।'

ভিজে আঁচলটাকে তাড়াতাড়ি টেনে গায় জড়াতে জড়াতে জল ছেড়ে সে উঠে এল, তার চুলগুলি পর্য্যন্ত ভালো করে ভিজ্‌তে পেল না !

তার পরদিন স্নানের সময় রাণী যখন তার খেলা শেষ করে উঠে পড়্‌তে যাবে আমি বল্‌লাম, 'তুমি জানো না, এই খেলাঘরই ত হচ্ছে মেয়েদের ঘরকন্নার পাঠশালা । বড় হয়ে ঘর-সংসার করে যে তোমায় খেতে হবে সে কথা একবার ভাবো ?.........'

সে তার বড় বড় চোখদুটিতে শ্রদ্ধা ভরে নিয়ে একবার নূতন করে তার আশৈ-শবের খেলাঘরটির দিকে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে । তারপর প্রসন্ন হাস্যে আবার ঝুঁকে বসে খেল্‌তে লেগে গেল ।

কয়েকটা দিন বেশ শান্তিতে নিরুপদ্রবে কাট্‌ল । আমি পুকুরের চারপাড় ঘুরে কল্‌মীর ডগা, তেলাকুচো, কচু প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিয়ে আসি । খড়িমাটি জলে গুলে দুধ আর পাকা পোক্ত শান গুঁড়ো করে মশলা তৈরি করে দি । রাণীর নিপুণ হাতের স্পর্শ পেয়ে সেগুলো নানা বিচিত্র চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে ; বাড়ীর কুকুর-বেরালগুলোকে জোরজুলুম করে টেনে এনে বসিয়ে বাটিতে বাটিতে তাদের সেগুলো

পরিবেষণ করা হয়, তাদের কোন আপত্তি শোনা হয় না।

২

তখন আমার ক্লাশ বদলের এগ্‌জামিন। সমস্ত বছরের বাকী-বকেয়া পড়া দুটি মাসের মধ্যে সুদ শুদ্ধ আদায় কর্‌বার চেষ্টায় আছি, তাই রাণীর ঘরকন্নার তদ্বির কর্‌তে যেতে পারিনে। একদিন কি একটা কারণে সকাল সকাল ইস্কুলের ছুটি হয়ে যাওয়াতে লুকিয়ে তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, জামার আস্তিন গুটিয়ে মালকোচা মেরে মহা উৎসাহে সনাতন তার খেলাঘরের ভাঙা বেড়া সার্‌তে লেগে গেছে!

আমার হাতে ছিল ইংরেজি একটা ইতিহাসের বুই। সেইটেকে চট করে কোঁচার নীচে লুকিয়ে আল্‌গোচে কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে ডাক্‌লাম, 'রাণী, তোমার জন্যে কি এনেছি দেখ'সে।'

সে চম্‌কে ফিরে চাইল, তারপর ঘর মেরামতের তদারক ফেলে ছুটে এসে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, 'কই দেখি!'

আমি প্রচুর আড়ম্বর করে কোচার নীচে থেকে বইটি বার করে তার হাতে দিলাম। সে সেটাকে নেড়ে চেঁড়ে দেখে আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'বই না ছাই! আমি ইংরেজি বুঝি ভারি ভালো জানি যে তুমি এই বই আমায় দিতে এনেছ?'

আমি রাগ-দেখানো হাসি হেসে বল্‌লাম, 'ইংরেজির বিদ্যে নিয়ে কি কেউ জন্মায় বোকা মেয়ে? না পড়্‌লে শিখ্‌বে কেমন করে? চল তোমায় প্রড়াইগে।'

খোলা চুলগুলোতে একটা দোলা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বল্‌লে, 'চল।' এর পর তার আর এক মুহূর্ত্ত ত্বর সয় না!…

সে ছিল সেই স্বভাবের মেয়ে যারা জীবনের কোনো একটি মুহূর্ত্ত কারো উপর একটুখানি নির্ভর করে ছাড়া বাঁচ্‌তে পারে না। তাই বাইরে সনাতনকে তার যতই অগ্রাহ্য থাকুক, প্রয়োজন হতেই তার সঙ্গে জুটে যেতে সে দ্বিধা করেনি। কিন্তু সনাতনকে আশ্রয় করা তার যেমন সহজ, এ আশ্রয় থেকে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে বিচ্যুত করে আনাও তার ঠিক তেমনি সহজ। কোনোদিক দিয়ে ওজনের এতটুকু ফের পাওয়া যায় না যে তাই নিয়ে তাকে কিছু বল্‌ব।

কিন্তু ভাগাভাগির ব্যাপারে আমি নেই, তার চেয়ে না-পাওয়াটা বরং আমার ধাতে সয়। তাই এই ঘটনার পর থেকে রাণীর খেলার জগৎটার একচ্ছত্র আধিপত্য বিনাযুদ্ধে সনাতনকে আমি ছেড়ে দিলাম, আর তাতে আমার একটুও ক্লেশ বোধ হলো না। মনে কর্‌লাম, এইটেই বীরত্ব।

পুকুরপাড়ে রাণীদের বাড়ীর পেছনে আম্‌লকি গাছের সার দিয়ে ঘেরা যে ছোট একটুক্‌রা মাঠ ছিল সেইখানে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে দুজনে পাঠালোচনা আরম্ভ হলো। জীবনে সেই প্রথম অনুভব কর্‌লাম, বইয়ের কাগজের অস্ফুট সুন্দর সৌরভ, কালো হরফগুলির সুশ্রী সুগঠিত শৃঙ্খলা।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই দেখ্‌লাম, রাণীর ইচ্ছে, যতটুকু সময় আমার কাছে থাকে কেবলি পড়া জেনে নেয়। এইখানেই বিরোধের সূত্রপাত হলো।

রাণীকে দিয়ে একদিকে যা তা যেমন করানো যেত, যা তা তাকে বিশ্বাস করানো যেত, অন্যদিকে একটা জায়গায় তার মধ্যে খুব একটা দৃঢ়তাও ছিল। যে জিনিসটাকে তার মন গ্রহণ করতে পারত না সেইটেকে স্বীকার না করা তার সাহসে কুলোত না, তার মনে হত গ্রহণ করাটা তার শক্তির বাইরে, সেইখানে কচুপাতায় ধরা বৃষ্টির ফোঁটাটুকুর মতো সে চঞ্চল। কিন্তু যে ব্যাপারটাতে একবার কোনোরকমে তার মন সায় পেত সেখানে সে ছিল অবিকম্প অবিচল, সেই ছোট্ট বয়স থেকেই।

আমাদের বাড়ী আগেকার মতোই সে আসে, পা টিপে টিপে আমার পড়্‌বার ঘরটিতে এসে ঢোকে; আমি টের পেয়ে বই-টই ছুঁড়ে ফেলে যেই উঠে পড়্‌তে যাই, সে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে, 'না না, তুমি পড়। তোমার কাজের ক্ষতি হবে। আমি চল্‌লাম।'

আমি যত বোঝাতে চেষ্টা করি, পড়া-শোনাটা কিছু নয়, অন্তত এই আসন্ন বসন্তের দিনে, এই যখন ধরারাণীর সৌন্দর্য্যের অনির্ব্বাণ শিখাখানি স্তিমিত হয়ে জ্বল্‌চে, আলো দিচ্চে, জ্বালা দিচ্চে না; এই যখন শীতাবসন্ন পাতা-ঝরা আমের বন কোকিলদের বাচালতার দৌরাত্ম্যে নূতন-কিসলয়-বিকাশে লাল হয়ে উঠ্‌চে;— সে দুহাতে আমায় ঠেলে সরিয়ে দেয়, বলে, 'না, তুমি পড়।'

আমি শক্ত হয়ে বলি, 'আমার পড়্‌তে ভালো লাগে না, আমি পড়্‌ব না। এতক্ষণ ধরে তোমায় বল্‌চি কি তাহলে ছাই?'

সে বলে, 'যা ভালো লাগে তাই বুঝি কেবল কর্‌তে হবে?'

আমি বলি, 'তা জানিনে, কিন্তু আমি পড়্‌ব না, তা তুমি যাও আর থাকো, এ আমি বলে রাখ্‌চি।'

সে বলে, 'বেশ ত পড়্‌ছিলে, আমি এসেই ভুল করেছি; আর আস্‌ব না।...'

এমনি করে আমার জীবনে আরও কয়েকবার বসন্ত এল এবং ব্যর্থ হলো, তারপর এল আমার জীবনের বসন্ত; যে রং ছিল বনের লতাপাতায় ফুলে পল্লবে আকাশে, সে রং আমার চোখে লাগ্‌ল। তখনকার কথাই বল্‌তে বসেছি।

গ

সনাতনের উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে শৈশবের আনন্দ-নিকেতন থেকে নিজেকে নির্ব্বাসিত করে নিয়ে এসে নিজেরই অজ্ঞাতে আমি বেজায় রকমের রাশভারি ভালো-ছেলে বনে উঠ্‌ছিলাম। ক্রমে সেইটে আমার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। যে লোক জীবন ভরে হনুমানের ভূমিকা অভিনয় করে, বানর-জাতির অকারণ কুৎসা শুন্‌লে সম্ভবত সে মনে মনে চটে যায়; আমারও হয়েছিল তেমনি। ক্রমাগত মূর্ত্তি লুকিয়ে চলে চলে আমার মেকি নকল রূপটাকেই একটু একটু করে আমার আসল চেহারা বলে আমার মনে হতে আরম্ভ হয়েছিল। আমি বাস্তবিকই বিশ্বাস কর্‌তে আরম্ভ করেছিলাম, হাসি অফুরন্ত নয়, কথার শেষ আছে। দুটি চোখে তৃষ্ণার কারাবালা বয়ে নিয়ে ছুটে এসে রাণীর দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে যাওয়া, এই ছিল আমার কাজ।

দেখ্‌তাম, রাণীর সঙ্গে কি সুন্দর সহজ সনাতনের মেলা! সে আসে, হাস্‌তে হাস্‌তে আমাকে এড়িয়েই একেবারে রাণীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর হাসিগল্পের বান ডাকৃতে থাকে! একদিন আমার সুমুখেই কি একটা কথার ঝোঁকে রাণীর একটি হাতকে তার হাতদুটোর মধ্যে সে তুলে নিলে। আমার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো একটা দারুণ অস্বস্তিতে আহত কীটের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল! ঐ জমাট জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র হাতখানির এতটুকু একটু স্পর্শ পাবার জন্যে কত ছুতানাতা খুঁজে বেড়িয়েছি, আর আজ সনাতন তার অত্যন্ত সহজ পাওয়া দিয়ে আমার সেই পরম স্পৃহনীয় জিনিসটির কি চেহারাই না করে দিয়ে গেল! আমি এক ঝট্‌কায় মুখটাকে তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে নিলাম।

এমনি করে যেখানে যেখানে সনাতন এল সেইখান থেকেই আমার সমস্ত চিহ্ন মুছে নিয়ে আমি চলে গেলাম। জীবনের রস-বারিধিকে বরফের মতো জমাট করে তুলে ভাব্‌লাম, এর ওপর আর যাই থাকুক, দোলানি থাকৃবে না। লড়াইটাকে ভাব্‌লাম বর্ব্বরতা। পূজা-নিবেদনের মতো অনায়াসে যেটা পাই এবং দিতে পারি সেইটেই সত্যিকারের পাওয়া এবং দেওয়া। কাজেকাজেই তার মধ্যেকার ভাবময়ী দেবীটিকে পাওয়ার গর্ব্বে তার মধ্যে যেটুকু রক্তমাংসের মেয়েমানুষ তার প্রতি কেবলি অবিচার হতে লাগ্‌ল। এমন সময়—

আমি এত অল্প নিয়ে খুসি ছিলাম, যে, সমাজ এ শত্রুতাটুকু না করলেও পার্‌ত। আমার পূজামন্দিরের নিভৃত নির্ব্বাসনের মধ্যে আমার নির্বিরোধ অধিকার ছেড়ে দিলে তার কোনো ক্ষতিই হতো না। আমি এত সতর্ক হয়ে চল্‌তাম, তবু আমাদের সম্বন্ধে কানাকানির গুঞ্জনে হঠাৎ সে একদিন অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। সনাতন হেসে চোখ মট্‌কে বল্‌লে, 'বাবা! তোমার পেটেও যে এত, তা ত জান্‌তাম না!'

আমি তখন থেকেই রাণীর সঙ্গে দেখা করা ছেড়ে দিলাম, কোনো গতিকে দেখা হয়ে গেলে জোর করে মুখ ফিরিয়ে থাকৃতাম। বাইরের ঐ কদর্য্য বর্ব্বর লোকগুলোকে কিছুতেই কি বুঝানো যায়, তারা আমাদের যা মনে করে তার চেয়ে আমরা কত বেশী উঁচুতে? তাই জীবনের সবচেয়ে বড় সুখকে, সম্ভবত তার চেয়েও বড় ধর্ম্মকে পায়ের নীচে পিষে ফেলে সেকথাটা আমি প্রমাণ কর্‌লাম।

দেখ্‌তাম, আমাকে দেখ্‌লেই রাণীর চোখ ছলছল করে ওঠে, কিন্তু আমার মুখ চেয়ে প্রাণপণ করে সে তার কাঁপ্‌তে-থাকা ঠোঁট-দুটিকে শক্ত করে চেপে থাকে।

আমাদের প্রণয়ের ধারাখানি যে বর্ণ-লেশহীন নিরাবিল, তা নিয়ে রাণীরও মনের কোনো-এক জায়গায় একটুখানি একটা গর্ব্ব ছিল। একদিন লুকিয়ে আমার একখানি ছবি চেয়ে পাঠিয়ে সে লিখেছিল, 'সম্ভবত এই জিনিসটির জন্যে পৃথিবী আমায় ঈর্ষ্যা করবে না।'

আমি তখনি জবাবে লিখ্‌লাম, 'পৃথিবী না করুক, আমি কর্‌ব। যে জিনিসে আমার একলার অধিকার, প্রাণ ধরে একটা

ছবিকে তার ত ভাগ দিতে পারব না!' সেইদিনই রাণীর কাছ থেকে আর-এক টুকরা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, 'ঐ সঙ্গে তোমার পায়ের ধূলো একটু যদি পাঠাতে, আমি শিরে ধরে কৃতার্থ হতাম! হে নির্লোভ, এ কত-বড় লোভের থেকে তুমি আমায় বাঁচিয়েছ!'.........

ঘ

শেষ বিদায়ের ক্ষণটি মনে পড়্‌চে। কই, পার্‌লাম না ত! বড় যে দর্প করে বলে এসেছিলাম, 'তোমায় আমি নিলাম না রাণী, কিন্তু তোমার যে জিনিস আমি নিয়ে চলেছি সে যে কি বস্তু তা তোমাকেই আমি বোঝাতে পারব না!' বলে এসেছিলাম, 'চোখে তোমায় দেখ্‌তে চাওয়া, তার মতো ভুল কি আর আছে? অশ্রুর বান ডেকে চোখের দৃষ্টি যখন ঝাপ্‌সা হয়ে যায় তখনই যে তোমাকে সত্যি করে দেখা হয়!' অশ্রুর ত অনটন রইল না, কিন্তু.........

মনটাকে বোঝাতে বোঝাতে সে বুঝ মেনে গেল, জীবনের ধূলিমাটির মলিনতায় তাকে না টেনে এনে আমি ত ভালোই করেছি। সে থাকুক আমার মনে, আমার ভাব-নয়নের অপলক ধ্যানের গোচর হয়ে, আমার প্রতি মুহূর্ত্তের উপলব্ধির সঙ্গে মিশে। সেই পাওয়াই ত পাওয়া!......আমার পরাজয় আত্মত্যাগের মুখোস পরে আমার মনের কাছ থেকে খুব বাহবা নিতে লাগ্‌ল।

কল্‌কাতায় এলাম। চরাচর জোড়া খোলা-মাঠের দেশের মানুষ, এতটুকু একটু জায়গার মধ্যে পৃথিবী কি বৃহৎ তাই দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মানুষ এখানে নগণ্য, অবিচিত্র, তাকে ঘিরে কোথাও এতটুকু রহস্যের কুয়াশা জম্‌বার অবকাশ পায় না; তার চারদিকটাতে তার নিজেরই সৃষ্টি এমন বিস্ময়কর রকমের বড় হয়ে উঠেচে, যে সে নিজে তার তলায় কোথায় চাপা পড়ে গেছে, তার দিকে চোখ পড়াই কঠিন। এমন জায়গায় আর যাই হোক, প্রেম হয় না। আমি নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচ্‌লাম।

রাণীকে চিঠি-পত্র কিছু লিখ্‌ব না ঠিক ছিল। একদিন হঠাৎ মনে হলো লেখ্‌বার দর্‌কার আছে, এবং এই উদ্ভাবনাটা অকা-রণে আমাকে অনেকখানি তৃপ্তি দান কর্‌লে। অনেক রাত জেগে তাকে লিখ্‌লাম:—

'রাণী!

আমাকে ভালোবাসো বলেই আর কারুকে বিয়ে কর্‌তে তোমার কিছু বাধা আছে, তোমার মন থেকে এই কুসংস্কারটাকে আমি তাড়িয়ে দিতে চাই। তুমি ত জানো, যে মানুষের সমাজে সুরু থেকেই বিবাহ ব্যাপার-টার চল্‌তি ছিল না; সেজন্যে অনেকদিন ধরে তার ব্যবসাদারি সুবুদ্ধি অনেকখানি পেকে ওঠা প্রয়োজন হয়েছিল। এর গোড়ায় ছিল শুদ্ধমাত্র প্রয়োজনের তাড়না, সে প্রয়োজন বেশীটুকুই সমাজের, খুব কম-টুকুই নিজের। কিন্তু প্রয়োজনের তাড়না জিনিসটা নিজেরই হোক আর সমাজেরই হোক, প্রাণের তাড়না থেকে স্বতন্ত্র। প্রণয় জিনিসটা কাঁচা, সাতপরত চাদরে তার চোখ বাঁধা। সে অতিবড় নির্ভয়, পুন্নাম নরকের ভয়ও তার নেই।

তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আই-

ডিয়ার একটা অপ্সর-লোক যেমন থাকে, তেমনি আরেকটা দিক থাকে যেটাকে নিয়ে বাস্তব জগতের সঙ্গে তাকে কারবার করতে হয়, সে জায়গায় ব্যবসাদারি বুদ্ধিকে কাজে খাটাতে হয় নিজের লাভ-লোকসান সম্বন্ধে তিলমাত্র অসতর্ক হলে চলে না। তোমার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এবং সাংসারিক সবরকম সুবিধা-অসুবিধা বেশ করে বিবেচনা করে তোমাকে তাই আমি বিয়ে করতে পরামর্শ দিই; যদি তা না করো, বাস্তবতার নির্ম্মম আঁচড় তোমার গায়ে এসে লাগবেই, সেটাকে তুমি হয়ত সইতে পারবে, কিন্তু সওয়াটা তোমার পক্ষে শোভন হবে না।' এইসব।

এগারো দিনের পর চিঠির জবাব পেলাম। সে লিখেছে, 'তোমার কথামতো চলতে চেষ্টা করব। তার আগে একটিবার তোমাকে কি দেখতে পাই না?'

লিখলাম, 'না। ভালোবাসা জিনিসটাকে তুমি চোখের নেশা করে তুলো না, তোমার কাছে আমার এই মিনতি রইল।'

তারপর তার আর খোঁজখবর পাইনি।

৬

কাজে নিয়ে পড়লাম। দালালির কাজে প্রথম দু'একটা বৎসর কিছুই সুবিধা হয়ে উঠল না, তবু একবার একটা ভালোরকম দাঁও মারবার আশায় ধৈর্য্য ধরে রইলাম। মায়ের জীবনবীমার হাজার-চারেক টাকা ছিল, সেইটে ভেঙে ভেঙে চালাতে লাগলাম। তাও যখন ফুরোল তখন কোনোদিকে আর পথ দেখতে পাইনে।

এক-একটা কাজে প্রায় সফলতার কাছাকাছি গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসি, কোন্‌দিক দিয়ে কিসে যে শৈথিল্য ঘটে একটুও যদি বুঝতে পারি! বন্ধুরা গাটেপা-টেপি করে হাসে, বলে, 'তুমি দেশে ফিরে গিয়ে চাষবাসের কাজে মন দাওগে, ঐটেতে তোমার সুবিধে হতে পারে।' আমিও হেসেই জবাব দিই, 'তা করলেও হয়। আর একলাই ত মানুষ; একটা পেটের জন্যে আবার ভাবনা!'

একটা পেটের জন্যে কিছুই যে ভাবনা নেই একথাটা কিছুতেই ভুলতে পারিনে বলে, ভাবনা আমার মনের দুয়ার জুড়ে পড়েই থাকে, অভিমানে যেন নড়তে চায় না। ক্রমে এমন হলো, আয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়কেও নিয়মিত করে আনবার মতো উৎসাহ মনের তলানিতে অবশিষ্ট না থাকাতে যত জায়গায় হাত পাতবার উপায় ছিল, হাত পাতলাম, শেষে ধারও আর কেউ দিতে চায় না! আসবাবপত্র দুটি-একটি করে নিলামে চড়িয়ে কায়ক্লেশে চলতে লাগল। ঘড়িটা আংটিটা বাঁধা দিয়ে কিছু কিছু টাকার জোগাড় হলো। শেষটা একটা পেটের ভাবনাও ভালো করেই ভাবতে সুরু করলাম। তার ফল এই হলো, একটু একটু করে রাণীকে ভুলতে লাগলাম। দেখলাম শুদ্ধ-মাত্র মনের যে সৃষ্টি তার আয়ু পুরো চার বছরও নয়।

প্রিয়া, আমার প্রিয়া! তোমায় ছেড়ে এসে এইরকম করে ত তোমায় আমি পেলাম! যে স্মৃতিটুকুর গর্ব্বে তোমার ছোট বুকটিতে এত বড় দাগা দিয়ে আমি চলে এসেছি, সে স্মৃতির পথ থেকে একচুল ভ্রষ্ট

হবার পাতক যে বড় বেশী করেই আমাকে লাগ্‌বে।

কিন্তু প্রাণপণ করে স্বপ্নকে যত আঁকড়ে ধর্‌তে যাই আমার ব্যগ্রতার চাপে সে আরো বেশী করে ভেঙে গুলিয়ে যায়, তাকে চেনা অবধি দুষ্কর হয়ে ওঠে। ক্রমে এমন হলো রাণীর কণ্ঠস্বরখানি মনে আন্‌তে পারিনে!—আমার রাণীর কণ্ঠস্বর! তার চোখদুটির সেই ধ্যানগম্ভীর বিশেষ একরকমের দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণের বিশেষ একটু কুঞ্চন, মুখের উপরকার বিশেষ ধরণের একটি প্রতিভার আভা, স্মৃতির পটে সবই কেমন ঝাপ্‌সা হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে। মনের মধ্যে তাকিয়ে কাকে পাই? পূজার অর্ঘ্য কাকে দিই? এই পূজার গর্ব্বেই না আমার প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা?

মনে বড় ভয় হলো। আর উপায়ান্তর না দেখে এক বন্ধুকে ধরে পড়ে শিল্পকলার শরণ নিলাম। ছেলেবেলায় কাদা ছেনে উট আর ভালুক গড়া আমার এক খেলা ছিল। এবার প্লাষ্টারে হাত পাকাতে সুরু কর্‌লাম। তরল ভঙ্গুর স্বপ্নকে কঠিনতার বুকে অটুট করে তোল্‌বার কঠিনতর সাধনা দিনের পর দিন রাতের পর রাত অবিশ্রাম চল্‌তে লাগ্‌ল।

এক-একদিন বুকভরা আগ্রহ নিয়ে তাকে ভাব্‌তে বসি। হঠাৎ চম্‌কে আমার ধ্যান ভেঙ্গে যায়। এ আমি কাকে ভাব্‌চি, এ ত সে নয়! মনে হয় তার কাছে আমি অবিশ্বাসী হলাম, মনে হয় আমার পাপের আর মার্জ্জনা নেই! তার কথা আর ভাব্‌তে পারিনে।—আমার রাণীকে আমি ভাব্‌তে পারিনে! নিজ হাতে মনের চোখ বেঁধে দিয়ে অন্ধের মতো কাজের ভিড়ে হাতড়াতে হাতড়াতে পথ চল্‌তে থাকি; তাকেও ভুলি কাজও ভুল করি, কিন্তু সকাল না হতেই দরজায় এসে যারা 'দেহি দেহি' বলে ভিড় করে তারা কড়াক্রান্তির পর্য্যন্ত হিসাব চুকিয়ে নিতে ভুল করে না!

তবু আমার শিল্পসাধনা অব্যাহত ভাবেই চল্‌তে লাগ্‌ল। ঠোঁটের কুঞ্চনকে অনেক দিনের তপস্যায় একটু যেন ধর্‌তে পারি, উৎসাহিত হয়ে আর-একটুখানি সেটাকে ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা সমস্তটাকেই পণ্ড করে দেয়। হয়ত ঠোঁট হয়, চোখ-দুটি কিছুতেই হয়ে ওঠে না; চোখ হয়, চিবুকে ভুল থাকে।

কোনো-কোনোদিন স্বপ্নে তার দেখা পাই, একেবারে হুবহু সে। তাকে বলি, 'তোমাকে নাকি আবার ভুল্‌তে পারি?' ঘুম ভেঙে কিছু মনে আন্‌তে পারিনে!

পথে যেতে ক্বচিৎ কোনো বিদেশিনী মেয়ের মুখে তার মুখলাবণ্যের অতি তুচ্ছ একটুখানি আদল ধরা পড়ে। সেই মেয়েটিকে প্রেতের মতো আমি অনুসরণ করে ফিরি, পথে থেকে পথে, ট্রামে ষ্টীমারে ট্রেনে। তার পর বাড়ী এসে দুহাতে গায়ের জামা-কাপড় যেদিকে খুসি ছুড়ে ফেলে কঠিন পাথরের বুকে সেই অনবদ্য কোমল লাবণ্যকে ফুটিয়ে তুল্‌তে প্রয়াস পাই।

কিন্তু এত পরিশ্রম, এত অধ্যবসায় আমার ব্যর্থ হলো। কত মূর্ত্তিতেই ত তাকে গড়্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম। সেই তার জল ছেড়ে ভিজে আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে উঠে আসা; মুখ ফুলিয়ে বই ফিরিয়ে দিতে দিতে বলা,

'এ আমার চাইনে;' সেই দুহাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যানের মিনতি, 'না, তুমি পড়।' সমস্তই মর্ম্মরের স্বপ্নে অক্ষয় হয়ে ফুটে উঠ্ল, আমার ভাঙা স্বপ্নই কেবল আর জোড়া লাগ্ল না।

কিন্তু কে জান্ত, আমার এই শোচনীয় ব্যর্থতা সার্থক শিল্পসাধনার রূপ নিয়ে পৃথিবীর কাছে আমার মিথ্যা খ্যাতি প্রচার করবে। হঠাৎ একদিন দেখি, ভাস্কর আর চিত্রকর-সমাজে আমার সমাদরের আর শেষ নেই! আমার উদরান্নের ভাবনাও সেই সঙ্গে ঘুচ্ল।

চ

দিন কাট্তে লাগ্ল। দেশের খুব পরিচিত ঘরের একটি ছেলের সঙ্গে রাণীর বিয়ের কথাবার্ত্তা আমিই প্রায় একরকম পাকাপাকি হয়ে যেতে দেখে এসেছিলাম, হঠাৎ একদিন সনাতনের চিঠিতে জান্লাম, রাণীকে পাকা দেখে আশীর্ব্বাদ করতে এসে সে-পক্ষের লোকেরা তার সম্বন্ধে কি-একটুখানি কানাঘুষো শুনে মহা সোর-গোল করে ফিরে গেছে। রাণীর মা পীড়িত ছিলেন, এতবড় অপমানের আঘাত সাম্লাতে পারেননি। পৃথিবীর ক্রোড়-বিচ্যুতা অনাথিনীকে ওরা তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছে; এ অবস্থায় আমার কি মত?

মনে হলো, আমাকে শান্তিতে থাক্তে দেবে না, সমস্ত পৃথিবী-সুদ্ধ লোক যেন তার যুক্তি এঁটেছে। এত-সমস্ত গুরুতর ব্যাপার যে ঘটে গেল এর নীচে কেবল যেন আমাকেই জড়াবার ও জব্দ করবার ফন্দি। সনাতনকে লিখ্লাম, 'বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া সমর্থ লোকমাত্রেরই কর্ত্তব্য, এজন্যে আমার মতামতের কেন যে আবশ্যক হচ্চে সেটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি।'

এর পাল্টা জবাবে সনাতন স্বয়ং সশরীরে এসে উপস্থিত। কাঁধের চাদরটাকে আল্নায় ঝুলিয়ে রেখে একটা কেদারা নিয়ে বসেই তার দরাজ গলার বিষম চেঁচামেচির দাপটে সে আমার নির্ব্বাসনের শান্তিকে বিপর্য্যস্ত করে তুল্লে। বল্লে, 'ভীরু, অপদার্থ কোথাকার! একটা নিরপরাধ অসহায় মেয়ের মাথায় এতবড় ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে পালিয়ে আস্তে লজ্জা করেনি তোমার?

আমি বল্লাম, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, চেঁচিয়ে বল্লেই কথার জোর বাড়ে না। রাণীর যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্যে আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত, কিন্তু সেজন্যে আমাকে কি-বলে তুমি দোষী সাব্যস্ত কর্‌চ?'

'কি বলে কর্‌চি? দেশের লোক জানে তুমি তাকে ভালোবাস্তে।'

'সেইটেই কি আমার অপরাধ?'

'নিশ্চয় অপরাধ। তাকে ভালোবাস্‌বার কোন্ অধিকার ছিল তোমার, তাকে এই-সমস্ত অপমানের আঘাত থেকে যদি আড়াল করে না বাঁচাতে পার?'

আমি একটু হেসে বল্লাম, 'সে অধিকার আমার ছিল কি না তা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কর্‌ব না।'

সে টেবিলটাতে চাপড় মেরে ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে বল্লে, 'তর্ক কর্‌ব না বল্লেই তুমি ছাড়ান পাবে ভেবেছ? আমি তোমাকে বল্‌তে এসেছি, এ মেয়েকে তুমি যদি না

বিয়ে করো, তবে আমার কুস্তির একটা আখড়া ছিল জানো? তার বাছা বাছা চাঁই দুতিনটেকে লাগিয়ে তোমার পা-দুটোকে আমি ভেঙে দিয়ে ছাড়্ব।'

আমি বল্লাম, 'তা যদি দাও, তবে সেটাতে আমার বিপদ আছে স্বীকার কর্‌চি। কিন্তু আসল সমস্যাটার কোনো মীমাংসাই এতে হবে না। তার চেয়ে তুমি নিজে যদি তাকে বিয়ে করো, ত সব দিক বজায় থাকে।'

সে আল্না থেকে চাদরটাকে পেড়ে কাঁধে ফেল্‌তে ফেল্‌তে চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌লে তারপর বল্লে, 'তাই কর্‌ব। সবাই যে তোমার মতন অপদার্থ নয় অন্তত এইটে তোমাকে জান্‌তে দেওয়ার জন্যেও এ অপকর্ম্ম আমায় কর্‌তে হবে।'

সিঁড়ির শেষ ধাপটি পর্য্যন্ত তার পায়ের দুপ দুপ শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। উঠে দরজাটাকে বন্ধ করে দিয়ে এসে একতাল প্লাষ্টার নিয়ে বস্‌লাম।

ছ

একদিন একটু অসময়ে আমার পাঠানো কতগুলি খোদাই কাজের তত্ত্ব নিতে সেবারকার এগ্‌জিবিশনের বাড়ীতে ঢুক্‌তে যাচ্চি, এমন সময় নীচের রাস্তায় ঘরমুখী একদল দর্শকের ভিড়ের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখ্‌লাম।...তেমনি একখানি ঋজু সুডোল গ্রীবা, তার উপর শিথিল চুলের খোঁপাটা তেমনি একখানি স্বপ্নালস অবসরের মতো গা এলিয়ে পড়ে আছে!

অতি কষ্টে গাড়ীর পাদানে পাটিকে তুলে সে ভিতরে উঠে বস্‌ল। তাড়াতাড়ি তার মুখখানি কেমন তা দেখা গেল না, কেবল দেখ্‌লাম, একটি পায়ে সে অল্প একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

একটা ট্যাক্‌সি ডেকে গল্পের গোয়েন্দার মতন আমি তাদের পাছু নিলাম। পথে যেতে অনেক-বার তাদের গাড়ীর পাশ কাটিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম, মাঝে মাঝে পেছনেও পড়্‌তে হলো, কিন্তু খুব চেষ্টা করেও তার মুখটিকে আমি দেখ্‌তে পেলাম না। তার-পর যেখানে এসে তাদের গাড়ী থাম্‌ল সেটা আমারই বাড়ীর সুমুখকার অন্ধকার এঁদোপড়া গলি!

সকলে মিলে কলরব কর্‌তে কর্‌তে গাড়ী থেকে নেমে আমার পাশের বাড়ীটিতে তারা হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকে পড়্‌ল, সকলের শেষে খোঁড়া পাটিকে টেনে টেনে সে গেল, অন্ধকারে তার মুখখানি চোখে পড়্‌ল না।

বাস্তবিক মেয়েদের বিকলাঙ্গ দেখ্‌লে সেটা মনে বড় লাগে। ওরা হাত পা নাক মুখ চোখ এ-সমস্ত নিয়েই এত অসহায় যে তারও ওপর......

তারপর থেকে প্লাষ্টার ছান্‌তে আমার আর উৎসাহ নেই। পাশের বাড়ীর বারান্দায় চিকের আড়ালটির দিকে চেয়ে অলক্ষ্যে দিন কেটে যায়। কেমন অস্পষ্ট করে মনে হয়, ওইখানেই আমার এতদিনকার পথ-চাওয়া ব্যাকুলতার সমাপ্তি ঘটবে, আমার সমস্ত দুঃখ বেদনার চরম মূল্যটিকে আমি পাব। সে যে কি বস্তু তা কোনোদিন তলিয়ে দেখ্‌তে চেষ্টা করিনি, সেইজন্যেই বোধহয় আমার ক্লান্তিবোধও ছিল না।

একদিন রাত্রে ঘুমোবার আগে মাথায় একটা আইডিয়া এল। ভাবলাম, গড়ব, পথের পাশে চিরন্তন পুরুষ ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছিল, চিরন্তনী নারী পঙ্গু পাটিকে নিয়ে পথ চলতে চলতে তার গা ঘেঁসে পড়ে গিয়ে তার সুপ্তি ভেঙে দিয়েছে।

আহার নিদ্রা ছেড়ে মূর্তিটি গড়তে লাগলাম, একদিন দিনশেষের আলো আমার প্রতিবেশিনীদের বাড়ীর ছাত ডিঙিয়ে তার সমাপ্তির উপর এসে পড়ে হেসে উঠল। সেই আলোয় চেয়ে দেখলাম, সেইসঙ্গে রাণীকে ভোলাও আমার সম্পূর্ণ হয়েছে।

এতদিনকার বিনিদ্র সাধনায় গড়া বড় প্রিয় সেই মূর্ত্তিটিকে হাতুড়ির একটিমাত্র আঘাতে গুঁড়ো করে ফেলে কল্‌কাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, কোনও মেয়ের মুখের দিকে মুখ তুলে আর তাকানো নয়। মূর্ত্তি গড়াও এই পর্য্যন্ত, কাজেই খোঁড়া মেয়েটির মুখখানি কেমন সে খবর জানবারই বা আমার দরকার কি!

ভাবলাম যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব; তাই ছেলেবেলার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে প্রথমেই ছোট সহরটির কল্‌মী-ফুলে ছাওয়া-পুকুরপাড়ের সেই নিভৃত পাড়াটিতে ফিরে এলাম।

সনাতন খুব শিষ্টাচারের সঙ্গে আমার অভ্যর্থনা করে নিলে। রাণীদের বাড়ীর দিকে চাইতে সাহস হচ্ছিল না, দিনদুই ইতস্তত করে শেষটা তার কাছেই খোঁজ নিয়ে জানলাম, রাণী কোথায় কি অবস্থায় কেমন আছে, কিছু সে জানে না, সে বেঁচে আছে কি না তাও সে বলতে পারে না!

যেন কোথাও কিছু হয়নি এমনি নির্ব্বিকার ভাবে সে কথাগুলো বললে। কিন্তু সেজন্যে তাকে কিছু বলবার অধিকার ত আমি রাখিনি।·········তাছাড়া সেই বা কেন জবাবদিহি করতে যাবে।—রাণী তার কে ছিল?

তবু সনাতন সব দোষ তার নিজের ঘাড়েই নিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইলে, তারপর বললে, 'তুমি নাকি তাকে বিয়ে করতে পরামর্শ দিয়েছিলে, বলেছিলে, প্রণয় হলেই পরিণয় হতে হবে এটা কুসংস্কার। কুসংস্কার কি না জানিনে ভাই; যাকে ভালো বেসেছিলে তাকে আপনার করে না পেয়েও তোমার দিন হয়ত একরকম কেটে যাচ্ছে, কিন্তু যাকে ভালোবাসো না তাকে সারা জীবনের জন্যে গলায় ঝুলিয়ে নেওয়ার যে কি আরাম সে অভিজ্ঞতা জন্মাবার সুবিধা ভগবান যদি তোমায় করে দিতেন ত সুখী হতাম। রাণী তোমার উপদেশ-মত চলতে পারেনি; তবে তোমার সান্ত্বনার জন্যে বলছি, বিয়েতে তার অসাধ ছিল না। তার মনকে সে খুবই প্রস্তুত করেছিল; কিন্তু পৃথিবীতে কেউ যদি না তাকে ভালোবাসে, তাকে না নিতে রাজি হয় ত সে আর কি করবে বল ত?'

৬

কল্‌কাতার বাসায় ফিরে এসে দেখি ওপরে আমার ঘরে ঢোকবার পথেই পাঁচ-ছ' বছরের রোগাপানা একটি ছেলে মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে শিকলে-বাঁধা আমার

হাউণ্ডটার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করচে। আমার সাম্‌নে পড়ে যেতেই অপরাধীর মতো মুখটি করে আমার দিকে তাকাল, যেন ঐ করে সে আমার মনের মধ্যেটাকে পরিমাপ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। তাকে এড়িয়ে আস্তে-আস্তে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তাকে কোথাও দেখিনি, তবু কেমন মনে হতে লাগ্‌ল, সে আমার অনেক-কালের চেনা। যেন স্বপ্নে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

এরপর সে কখন আসে সেই খোঁজে আমি থাকি, সে এলে তার পেছনটিতে গিয়ে দাঁড়াই। মুঠোভরা খাবার কুকুরটাকে খাইয়ে তার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়্‌তেই ভয়ে মুখটিকে কালো করে একপাশে সে সরে দাঁড়ায়। আমি বল্‌বার মতো কোনো কথা খুঁজে পাইনে।

মাঝে-মাঝে একটা রবারের বল্ নিয়ে সে আমার ঘরের নীচেকার পথটিতে খেল্‌তে নেমে আসে, তখন তাকে দেখি।

একদিন এক অঘটন ঘট্‌ল। তার রবারের বল্‌টা কেমন করে আর জায়গা না পেয়ে দোতলায় আমার দরজার গোড়ায় এসে পড়ে রইল। আমি ঘরে বসে লিখ্‌ছিলাম, দেখ্‌লাম বল্‌টা পড়েই আছে। অনেকক্ষণ কেটে গেলেও কেউ যখন এল না তখন কৌতূহলী হয়ে জান্‌লার কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম নীচে রাস্তার ওপারে দুটি হাতকে পেছনের দিকে জোড় করে দুটি বড় বড় চোখে জলভরা অসহায় লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে বল্‌টির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। সেই কখন থেকে এইভাবেই হয়ত দাঁড়িয়ে আছে!...একটুখানি আমাকে ডেকে বল্‌লেই ত হত! আমার যে হৃদয় নেই, এতটুকু ছেলে সে খবর জান্‌লে কেমন করে?

দুহাত দিয়ে জড়িয়ে বুকের সঙ্গে বেঁধে তাকে ওপরে নিয়ে এলাম, সেখান থেকে ছাতে; ছাতে বসে আমাদের কথা যে হলো তার আর লেখা-জোখা নেই।

আমাদের দুটো বাড়ীর ছাত ছিল এক-টাই। সেই ছাতে উঠ্‌বার সিঁড়িও ছিল একটি, কেবল সেই সিঁড়িটিতে ছিল আমার একলার অধিকার, তার মধ্যে আর কেউ সরিক ছিল না। ছেলেটিকে নিয়ে এরপর প্রায়ই ছাতে যাওয়া চল্‌তে লাগ্‌ল। ছাতে উঠেই তাদের বাড়ীর ওদিক্‌টায় আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছিল তার কাজ। আমি তাকে শক্ত করে ধরে থাক্‌তাম, সে ঝুঁকে পড়ে কর্ণিশের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডেকে উঠ্‌ত 'দিদিমণি!'

দোতলার বারান্দার উপরে টালির ছাতে একদিকে যে একটুখানি ফাঁক ছিল, অমনি সেই ফাঁক ভরিয়ে চোখে পড়্‌ত—একখানি কাঁকণ-জড়ানো শুভ্র নিটোল হাতের কী সে ব্যাকুল অসহায় মৌন ইঙ্গিত, 'সরে যা লক্ষ্মীছাড়া সরে যা, পড়্‌লে একেবারে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবে যে!' আমার চোখে অলক্ষ্যে অশ্রু ভরে আস্‌ত, তবু আমার স্নেহবঞ্চিত ক্ষুধিত মন তরুণীর এই স্নেহশঙ্কাকে সবটুকু অনুভূতি দিয়ে উপভোগ কর্‌ত।

খোকাকে একদিন জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'তোমার ঐ দিদিমণি ছাড়া আর কেউ নেই নাকি?'

সে বল্‌লে, 'বা রে, তা কেন হতে যাবে!

মাসীমা, মেসো-মশায়, ছোট্টু, জিমি, নিস্তারিণী হরকিষেণ…'

বুঝ্‌লাম, সংসারে ঐ এক দিদি ছাড়া তার আপনার বল্‌তে আর কেউ নেই। এখানে পরের আশ্রয়ে খোরপোষের সঙ্গে সঙ্গে কত যে গালি-তিরস্কার লাঞ্ছনা-নির্য্যাতন বাঁধা বরাদ্দে তাদের জোটে, তবু এতবড় এই বিরূপ সংসারে তারা দুটিতেই পরস্পর পরস্পরের কতবড় মস্ত সান্ত্বনা।

কেন জানি না তাকে বুকে টেনে নিলাম, কেন জানি না অন্তরের সবখানি শুভেচ্ছা দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছে হলো। আমার আয়ুর বদলে তার আয়ুকে কোনো-রকমে যদি বাড়িয়ে দেওয়া যেত, কোনো যাদুমন্ত্রের বলে!

খোকাকে কোনো জন্মে দেখিনি, তবু আমার মন বল্‌চে আমি তাকে দেখেচি। আচ্ছা, তার দিদিমণিকেও কি এমনি চেনা বোধ হবে? প্রথম দেখাতেই কি —

ওগো! আমার সমস্ত শৈশব আজ উদ্‌গ্রীব হয়ে ফিরে এসেছে তার বুকভরা সকৌতুক জিজ্ঞাসা নিয়ে; আমার কৈশোর দুয়ার জুড়ে এসে বসেছে তার সোনালি স্বপ্নখানির সঙ্গে তোমায় মিলিয়ে দেখ্‌তে; আর আমার যৌবন ত বসে আছেই।

আর ঐ পাখানি, খোঁড়া পাখানি! শাড়ীর লাল পাড় স্নেহাবেষ্টনে ঐ পাটিকে যেন জড়িয়ে ধরে রেখেচে, তার শুভ্র পেলব-তাকে ঘিরে নিজেকে অনুরাগের একখানি শোণিমারেখার মতো এঁকে দিয়ে। অক্ষম, মনোরম ঐ পাখানি তার!

ঝ

রোজকার মতে খোকাকে নিয়ে সেদিনও ছাতে গিয়েছি। অজস্র ঘুড়ি উড়্‌ছে। দুজনাতে গল্প ভুলে নিবিষ্ট হয়ে একটা লাল আর একটা বেগুনি ঘুড়ির প্যাঁচ লড়া দেখ্‌চি। বেগুনিটা কেটে গেল। খোকাকে বল্‌লাম, 'ওটি তোমার চাই?'

সে নেচে উঠে বল্‌লে, 'হাঁ, হাঁ, লালটাও।'

ঘুড়ির সুতাটা হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে আস্‌ছিল। সেটার পেছন পেছন ছুটে তাদের বাড়ীর দিককার ছাতে চলে গেলাম। কর্ণিশের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে অতি কষ্টে সুতো-গাছটার নাগাল পেয়েছি, হঠাৎ দেখি, খোকাও দুখানি ছোট ছোট ব্যগ্রবাহু প্রসারিত করে একেবারে কর্ণিশের ওপর আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুড়ি ছেড়ে তাকে ধর্‌তে গেলাম, তাকে পেলাম না।

* * * *

সমস্তটা দিন দুবাড়ীর মাঝখানকার দেয়ালে কান পেতে বসে রইলাম, একটি চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দও শোনা গেল না! কত ত্রস্ত পদশব্দ কানে এল, কত সমবেদনার ভাষা, যা সেই স্তব্ধতার সঙ্গে তুলনায় মনে হলো চাপাহাসির উপহাসের মতো। কতজন তিনসার সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে অনাবশ্যক চেঁচিয়ে আমায় অভিসম্পাত করে গেলেন। খোকার দিদিমণির সাড়াই কেবল পেলাম না।

আজ খোকা নেই। তবু খোকার দিদি দিনমান ধরে তার কর্ত্তব্য-কাজগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কর্‌লে, তারপর সন্ধ্যার দিকে বাইরে চিকের আড়ালটিতে নিত্যকার মতো চুপচাপ এসে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার মনে হতে লাগ্‌ল, আমি পাগল

হয়ে যাব। যেন আকাশ জুড়ে নিবিড় মেঘাড়ম্বর, মিনিটে মিনিটে, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, কিন্তু কোথাও এতটুকু শব্দ কিম্বা সাড় নেই। একটা আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত লাক্ষাস্রোত আকাশময় ছড়িয়ে গিয়ে যেন থেমে আছে, পড় পড় হয়েও পুড়ে যাচ্ছে না। ইচ্ছে করতে লাগ্‌ল, চিকের আড়াল দুহাতে ছিঁড়ে সরিয়ে তার সাম্‌নে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তার খুব কাছে, একেবারে তার মনের মধ্যখানে! কেমন তার মুখখানি? কি আছে তার মনে? এই চিকের আড়াল যে সইতে পারিনে, এই স্তব্ধতার আড়াল যে সইতে পারিনে!

রাত কাট্‌ল। ভোরের আলো যেন খোকার খোঁজে এসে আমার দরজার গোড়ায় ব্যথিত হয়ে পড়ে রইল।

একটু পরে খোকার দিদিমণির ডাক এল। লোকে কাল আমার প্রতি অবিচার করেছে, আমার যে কোনো দোষই নেই একথাটা আমায় জানিয়ে দিয়ে সে তার কর্ত্তব্য করতে চায়।

খোলা জান্‌লায় বাইরের দিকে চেয়ে সে বসে ছিল। বাতাসে তার একটি-দুটি স্রস্ত চুল আর নীল শাড়ীর আঁচল-প্রান্তটুকু মাত্র কাঁপ্‌ছিল। কতক্ষণ এভাবে কাট্‌ল জানিনে, মনে হলো অনেকক্ষণ। তারপর সে যখন ফিরে চাইল, দেখ্‌লাম—

দেখ্‌লাম রাণী! তার দৃষ্টি আমার দেহকে যেন স্পর্শ কর্‌ল না। যেন ব্রাহ্মণের শূদ্রকে আশীর্ব্বাদ, মস্তক আঘ্রাণ কর্‌তে এসেও সতর্ক হয়ে ছোঁয়া বাঁচায়।

বল্‌লাম, 'আমার জীবন দিয়ে তোমায় সমস্ত আঘাত অপমান থেকে আবৃত করে আমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে দাও। দেহটাকে সুখের আলোয় যখন দেখ্‌লাম তখন তার কদর্য্যতাটাই কেবল চোখে পড়্‌ল। আজ দুঃখের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখ্‌চি, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখ্‌চি বলে দেখ্‌চি তার জ্যোতির্ম্ময় রূপ। তুমি আমায় ক্ষমা কর রাণী।'

তার গলা কাঁপ্‌ল না, জিহ্বায় এতটুকু জড়তা দেখা গেল না; এ যেন ভাষা নয়, আরেকটা কিছু, এমনি ভাবে সে বল্‌লে, 'তোমার এ অধঃপতন কেমন করে হলো? কোথায় পড়ে ছিলাম আর তুমি কত উঁচুতে আমায় টেনে তুলে রেখে গিয়েছিলে তা কি ভুলে গেছ? তোমার মন্ত্র ত ব্যর্থ হয়নি গুরু! তার অনাকুল শিখাখানিই যে খোকাকে আমার চোখের দৃষ্টি থেকে অপসারিত করেও আমার মনের দৃষ্টিতে তাকে জ্যোতির্ম্ময় করে তুলেছে! আজ এমন দিনে তোমার মুখে এ কি কথা শুন্‌চি?'

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

অপরাধ ভঞ্জন

গৌরদাসের আখ্‌ড়া ছোট
আয়টা নহে কমি।
বাগান পুকুর তাহার উপর
বাহান্ন বিঘে জমি।
মহান্ত তাঁর প্রচুর টাকা
গেছেন তারে দিয়ে,
ভাবতো লোকে, সেই ভাবেনা
করবে কি তা নিয়ে।

'নন্দকিশোর' চতুর যুবক
খায় সে গাঁজা ভাঙ,
ভক্ত সাজে, গৌর বলে,
নয়কো সোণা—রাঙ।
গৌরদাসের সঙ্গে কে রে
সংকীর্ত্তনে নাচে,
সন্ধ্যা সকাল যখন দেখ
ফিরছে তাহার পাছে।
গ্রামের লোকে সবাই জানে
তাহার পরিচয়,
সকল জিনিষ সাম্‌লে রাখে
তাকেই বেশী ভয়।
'নান্নুর' থেকে গৌরদাস আজ
ফিরলে যখন ভোরে,
দেখ্‌লে ঘরে সিঁদ দিয়েছে
বাহির থেকে চোরে।
ব্যস্ততা তার কিছুই নাহি
করলে না হাঁক-ডাক,
কুকুর বিড়াল আসবে পাছে
বুজিয়ে দিলে ফাঁক।

নন্দকে আর পায়না খুঁজে
সুখেই ছিল বেশ,
দুদিন থেকে নিইয়ে দেখা
হঠাৎ নিরুদ্দেশ!
সপ্তাহ পর হাত বেঁধে তার
লালা জমাদার,
করলে হাজির আখড়াতে আজ
রক্ষা নাহি আর।
কাঁধের ঝোলায় দেখতে পেলে,
পয়সা টাকা ঢের,
তাহার সাথে সোণার ছাতা
মুকুট গোপালের।
নদীর ধারে যাচ্ছিল সে
সতর্কতার সাথ,
হঠাৎ পুলিশ সন্দেহেতে
ধরলে তাহার হাত।
করলে কবুল এ যা তারি
আখড়া থেকে আনা
সত্য যা তা গৌরদাসের
কাছেই যাবে জানা।

গৌরদাস ত হেসেই আকুল
বল্লে "সাঙাৎ মোর,
এ ঝোলাটা আমার যে ভাই
ফেলে গেছিস্ তোর"।
বাহির ক'রে আন্‌লে কাছে
করলে হাজির ত্বরা,
একই রকম আর এক ঝোলা
মোহর টাকা ভরা।

পুলিশ ত হায় ব্যাপার দেখে
রেগেই বলে 'ছাই'
শুনেছিলাম দেখছি এরা
মাস্‌তুতো সব ভাই।
গৌর তখন তামাক সেজে
বন্ধুকে তার ডেকে,
বল্লে কোথায় পালিয়ে ছিলে
একলা আখ্‌ড়া থেকে।
কঠিন পাপী লুটায় কাঁদি
সাধুর পাদমূলে,
বল্‌লে প্রভু আবার নিলে
নরক থেকে তুলে।
নিতাই করেন নিত্য লীলা
দেখতে পেলাম আজ,
জগাই মাধাই ত্রাণ করা যে
তাঁহার প্রিয় কাজ!
নন্দ এখন 'কীর্ত্তনীয়া'
নয়কো ডাকাত খুনে,
রত্নাকর হায় বাল্মীকি আজ
হরিনামের গুণে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

নৃতত্ত্ব *

সম্প্রতি বাংলাদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নৃতত্ত্বের আলোচনা হইতেছে। মার্কিণ প্রভৃতি দেশে পূর্ব্ব হইতেই ইহার যথেষ্ট গবেষণা হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমাদের শাস্ত্রগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে নৃতত্ত্বের বিষয় আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ একেবারে চিন্তা করেন নাই একথা বলা যায় না। মনুষ্য সৃষ্টির বিষয় অনেক শাস্ত্রে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের পঞ্জিকায় যে চারিযুগ পরিমাণ দেওয়া আছে, তাহা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। অল্পদিন হইল বিখ্যাত মার্কিণ পণ্ডিত হেন্‌রি ফেয়ার্‌ফিল্ড্‌ অস্‌বোর্ণ—আমেরিকান্‌ মিউজিয়ম্‌ অফ্‌ ন্যাচার্যাল হিষ্ট্রী সভায় যে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে বিশলক্ষ বা তদধিক বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে। অস্‌বোর্ণ সাহেব কেবল আন্দাজী কোন কথা লিখেন নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার বক্তব্য সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমাদের শাস্ত্র হইতে নৃতত্ত্বের যাহাকিছু পাওয়া যায় তাহা অদ্য আমার বক্তব্য বিষয় নহে। অদ্যকার বিষয় এই যে নৃতত্ত্ব বলিলে বর্ত্তমান জগতে কি বুঝা যায় তাহাই আমি বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের শাস্ত্রে নৃতত্ত্বের কিরূপ বিবরণ ছিল তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

---

* মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মেদিনীপুর শাখার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে ইহা পঠিত হইয়াছে।

নৃতত্ত্ব বলিলে মানুষ-সংক্রান্ত যাহা-কিছু সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহা সমস্তই বুঝিতে হয়। এই যাহা-কিছুর ভিতর মানবের আদি-জন্মভূমি কোথায় তাহা একটী প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এসিয়ায় মানবের আদি-জন্মভূমি স্থির করিয়াছেন; কিন্তু এশিয়া মহাদেশের কোন্ প্রদেশ হইতে এই মানব-পরিবারের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল তাহা স্থির করেন নাই। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার "মানবের আদি জন্মভূমি" নামক গ্রন্থে মঙ্গলিয়ার মধ্যগত আলটাই (ইলাম্বারী) বা মেরুপর্ব্বতের সানুদেশকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, ইলাব্রতবর্ষ মঙ্গলিয়ার অপর তিনটী নাম স্বঃ, স্বো এবং যজ্ঞ। আদি স্বর্গ এবং যজ্ঞশব্দ আদিস্বর্গ অর্থে বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।

ঋগ্বেদ ১।৩৫।১৬৪।

এই যজ্ঞ জনপদ সকল প্রাণীর উৎপত্তি-স্থান। বিদ্যারত্ন মহাশয় বৈদিক আলোচনা দ্বারা তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, স্বর্গে দেবাসুরে যুদ্ধ হয়। দেবাসুর যুদ্ধের ফলে অসুরগণ জয়লাভ করেন। দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসেন। এই দেবগণই আর্য্য জাতির পূর্ব্ব-পুরুষ। তাঁহারা আবার তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, আরব, চীন, জাপান, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহার প্রমাণের বিষয় সমস্ত প্রকাশ করিতে হইলে একটী বৃহৎ পুঁথি হইয়া পড়ে। সুতরাং পুঁথি বাড়াইতে না গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মঙ্গলিয়া সম্বন্ধে মতামত কি, তাহা বলিয়া মানবের আদি জন্মভূমির বিষয় সমাপ্ত করিব।

অস্‌বোর্ণ্ সাহেব এসিয়ার কোন্ প্রদেশ হইতে প্রথম মানবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। নিউইয়র্ক হেরাল্ড নামক একখানি মার্কিণ পত্রিকায় "ইন্ সার্চ্চ্ অফ্ দি প্রিমিটিভ্ ম্যান্" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মিষ্টার্ আর, সি, অ্যাণ্ড্রুজ্ এবং মিষ্টার জন্ হেন্‌রি নিউম্যান্ উভয়েই একবাক্যে মঙ্গলিয়াকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বহুদিন অবধি চীৎকার করিয়া আসিলেও তাঁহার কথায় আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহই কর্ণপাত করেন নাই। "গেঁয়ো যুগী ভিক্ পায় না।" এক্ষণে মার্কিণ দেশের পণ্ডিত-যুগল যখন মঙ্গলিয়াতে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন আমাদের আর বিদ্যারত্ন-মহাশয়কে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

মানবের আদি জন্মভূমি একরূপ স্থির হইল। তাহার পর মানবের কত দিন সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা নৃতত্ত্বের আর একটী বিষয় হইতেছে। এ বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ভূতত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, বহুলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। যদি পৃথিবীর সৃষ্টির

সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্য সৃষ্টি না হইয়া থাকে তাহা হইলেও অন্ততঃ বিশ লক্ষ বা তদধিক বৎসর পূর্ব্বে যে মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

সৃষ্টির কাল-নির্ণয়ও হইল। এক্ষণে মানবের উৎপত্তির বিবরণ আর একটী নৃতত্ত্বের বিষয়। তাহা বলিয়াই অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব। মানুষ স্তন্যদায়ী প্রাণী-বিশেষ। স্তন্যদায়ী যে সমস্ত বৃহৎ জন্তু ছিল তাহারা প্রায় পাঁচলক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ক্ষয় পাইতে বসিয়াছে। তুষারময় যুগে মনুষ্য-জীবনের প্রথম উন্নতির সহিত ঐ সমস্ত বৃহৎ স্তন্যদায়ী জন্তু ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর প্রাণ-হরণকারী অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারের সহিত ঐ সকল জন্তু আরও অধিক পরিমাণে লোপ পাইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, যে, বর্ত্তমান খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্য সময়ে মনুষ্য ব্যতীত যাবতীয় স্তন্যদায়ী জন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে এবং মনুষ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার চরম সংখ্যায় উপনীত হইবে; তাহার পর জগতের মনুষ্য জাতির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইবে। মনুষ্যজাতির সংখ্যা চরম সীমায় পৌছিলে তাহাদের প্রলয় আরম্ভ হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কয়েকটী বলেন যে, খ্রীষ্টীয় বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষে মনুষ্য সমাজ প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। আমরা অবশ্য তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। কলিযুগের মাত্র পাঁচ হাজার বৎসর গত হইয়াছে। এক্ষণে বহু বহু শতাব্দী বাকী, তাহার পর কলিযুগের শেষ। এবং কলিযুগ অন্তে মহা প্রলয় হইবে। তবে লোকসংখ্যা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গত সেন্‌সসের পূর্ব্ব সেন্‌সসে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ঊনত্রিশ কোটি ছিল। গত সেন্‌সসে লোক-সংখ্যা প্রায় একত্রিশ কোটি হইয়াছিল। এবার সেন্‌সসে লোকসংখ্যা আরও কয়েক-লক্ষ বেশী হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত লোক-বৃদ্ধি পাইয়া মনুষ্যগণের যে দুঃখ-দারিদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নৃতত্ত্বের কর্ম্মকাণ্ডের বিষয়ীভূত। এই বিষয়ে ইয়ুরোপে ম্যাল্‌থস্‌ সাহেব যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছিলেন। ম্যাল্‌থস্‌ সাহেবের মতামত সাধারণের বড় হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। এক্ষণে স্বদেশ-বিদেশের অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িতেছে তাহাতে আমাদের লোক-বৃদ্ধি সম্বন্ধে এবং তাহার জন্য যে সমস্ত দুঃখ-দারিদ্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কিসে নিবারণ করা যায়, ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, মহাশয় নৃতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, তার আভাস দিয়াছেন। সুতরাং সে বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মনুষ্যসৃষ্টির কালস্থির করিতে হইলে ভূগর্ভ হইতে উৎখাতিত শিলীভূত মনুষ্য-কঙ্কাল সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহাদের মাথার খুলি, করোটী ও চিবুক দর্শন এবং মাপ করতঃ কিরূপে বনমানুষ হইতে বর্ত্তমান মনুষ্য জাতি ক্রমোন্নতি সহকারে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার পর পর স্তর ঠিক করিতে হইবে। হইতে পারে আমাদের এক একটী যুগ এক একটি স্তর অথবা হয়ত কতকগুলি স্তরে এক-একটি

যুগ হইয়াছে। মনুষ্যজাতি বৃক্ষবাসী না হইলেও প্রথমে কতক কতক বৃক্ষে বাস করিত। বৃক্ষবাসীদের কঙ্কাল খুঁড়িয়া পাওয়া দুষ্কর। বৃক্ষবাসীদের যুগের পর মনুষ্য মাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করে। মনুষ্যজাতি মাটীতে বাস করিয়াই, প্রথম তাহাদের শব-সমূহ কবর দিত না। কবর দিবার পর হইতে সে সমস্ত মনুষ্যের মাথার খুলি, চিবুক ও দন্ত মাটী হইতে খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে নৃতত্ত্বের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। কবরে না দিলেও নদীর স্রোতে স্থানান্তরিত করা স্তূপীকৃত মৃত্তিকা হইতে এবং কঙ্কর হইতে প্রাপ্ত অনেক মনুষ্য শরীরের ভগ্নাবশেষ নৃতত্ত্বের অনেক তথ্য স্থির করিয়া দিয়াছে। নরসৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বন-মানুষের সৃষ্টি হয়। বনমানুষের পূর্ব্বে বানরের সৃষ্টি হয়।

বোধ হয় ত্রেতাযুগে মনুষ্যজাতির পূর্ব্ব-পুরুষ বানরগণ নরোচিত কার্য্য করিয়া আমাদের রামায়ণের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছে। মানুষ ক্রমশঃ বানর হইতে ক্রম-বিধি অনুসারে উদ্ভুত হইলেও, বর্ত্তমানে যে সমস্ত বানর এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় কিম্বা শিলীভূতাবস্থায় ভূগর্ভ হইতে যে সমস্ত বানরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগের হইতেই যে ক্রমশঃ মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বলা বড় সুকঠিন। তবে মানবাকৃতি জীব (Anthropoid), বনমানুষ, আফ্রিকা-দেশীয় বড় বানর (Gorilla), মানুষের মত দেখিতে আফ্রিকা-দেশীয় বানর (Chimpanzee) ও উল্লুক (Gibbon) হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার তুলিতে রং ফলাইয়া ইহাদিগের হইতেই মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। আমেরিকান্ মিউজিয়মের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডব্‌লু কে গ্রেগরি মহাশয় এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। মানুষে এবং বানরে বিশেষ পার্থক্য এই যে, বানর সাধারণতঃ বৃক্ষবাসী, কিন্তু মানুষ তাহা নহে। কিন্তু বর্ত্তমান মনুষ্যজাতির ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে যে জীবরূপী পূর্ব্বপুরুষ ছিল, তাহারা বৃক্ষে বাস করে নাই এবং তাহারা সোজা-ভাবে দাঁড়াইতে পারিত। ত্রেতাযুগের বানর লইয়া গবেষণা করিলে অনেক বানর-বিষয়ক এবং মনুষ্যজাতির পূর্ব্ব-পুরুষ-বিষয়ক যে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারা যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপের অর্দ্ধনর অর্দ্ধবানরের (The Trinil apeman, the Pithecanthropus) করোটী দেখিলে বুঝা যায় যে, সেই বানরগণের করোটী মনুষ্যগণের করোটীর অনেকটা অনুরূপ। সুতরাং এই অর্দ্ধনর অর্দ্ধবানর যে মনুষ্যজাতির পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে পারে, তাহা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। এই বিষয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, হাওয়ার্ড্ ম্যাক্‌গ্রেগর সাহেব বিশেষ চিন্তা করিতেছেন।

ইয়ুরোপে ও মার্কিন দেশে নৃতত্ত্ব-বিষয়ক বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু এদেশে নৃতত্ত্বের অনেক মালমসলা থাকিলেও, আমরা এ-বিষয়ে মস্তিস্ক আলোড়ন করি নাই। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, মহাশয়ের উপদেশ লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে, বিশেষ ফললাভ করা যাইবে আশা করা যায়।

একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। নৃতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, বিশেষতঃ জীবতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান থাকা এবং সেইসঙ্গে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বে সমধিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাহার পর ধীরে ধীরে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে নৃতত্ত্ব লইয়া নৃত্য করিলে চলিবে না।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অবতার

১২

যাত্রাকালে, অক্টেভ ডাক্তারকে বলিল :—

"দেখুন,ডাক্তার মশায়, আমি আর একবার আপনার বৈজ্ঞানিক শক্তির পরীক্ষা করতে চাই; আমাদের দুজনের আত্মা আবার আমাদের নিজের নিজের শরীরে আপনাকে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এ কাজটা করা আপনার পক্ষে শক্ত হবে না; আশা করি, কৌণ্ট লাবিন্স্কি তাঁর প্রাসাদের বদলে এই দীনের কুটীরে থাকতে চাবেন না; আর, তাঁর বহুগুণালঙ্কৃত আত্মা আমার এই সামান্য দেহের মধ্যে বাস করতেও রাজি হবে না। তা ছাড়া আপনার যেরূপ শক্তি তাতে আপনার কোন প্রকার প্রতিশোধের ভয় নেই।"

এই কথায় সায় দিবার ভাবে একটা ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এইবার প্রক্রিয়াটা গতবারের চেয়ে আরো সহজ হবে। যে সব অদৃশ্য সূত্রে আত্মা শরীরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে সেগুলি তোমার মধ্যে ছিন্ন হয়ে গেছে; আবার যুড়ে যেতে এখনো সময় পায়নি। আর, সম্মোহনের পাত্র সম্মোহনকারীর চেষ্টাকে স্বতই যেরূপ প্রতিরোধ করে, তোমার ইচ্ছাশক্তি সেরূপ বাধা দিতে পারবে না। আমার মত বুড়ো বৈজ্ঞানিক যে এইরূপ পরীক্ষার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে নি তজ্জন্য কৌণ্ট মহাশয় আমাকে মার্জ্জনা করবেন—কারণ এইরূপ পরীক্ষার পাত্র খুব কমই জোটে. তাছাড়া এইরূপ পরীক্ষা করতে করতে মনের এমন একটা সূক্ষ্ম অবস্থা হয় যে তখন সেই পরীক্ষাকারী ভবিষ্যৎ ঘটনা বল্‌তে পারে; যেখানে আর সবাই হার মানে, সে সেখানে জয়লাভ করে। আপনি এই ক্ষণিক রূপান্তরের ব্যাপারকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন বলে ভাবতে পারেন; আর কিছুকাল পরে, এই অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতি আপনার হয়েছিল বলে আপনি বোধ হয় দুঃখিত হবেন না; কেন না, দুই শরীরে বাস করবার অনুভূতি খুব কম লোকেরই হয়েছে। দেহান্তরগ্রহণ একটা নূতন মতবাদ নয়। কিন্তু দেহান্তর গ্রহণের পূর্ব্বে আত্মাদের বিস্মৃতি-মোহ-মদিরা পান করতে হয়। তবে, ট্রয়ের যুদ্ধে ছিলেন বলে পিথাগোরসের স্মরণ ছিল,—কিন্তু সেরূপ জাতিস্মর সবাই হতে পারে না।"

কৌণ্ট ভদ্রভাবে উত্তর করিলেন, "আমার

ব্যক্তিত্ব আবার ফিরে পেলে আমার যে লাভ হবে, তাতে অধিকারচ্যুত হওয়া প্রভৃতি সমস্ত অসুবিধারই ক্ষতিপূরণ হবে। অক্টেভ মহাশয় কিছু যেন মনে না করেন, আমি কোন কুমৎলবে এ কথাটা বল্‌চি নে। আমিই ত এখন অক্টেভ,—একটু পরে আর আমি অক্টেভ থাক্‌ব না।"

এই কথায়, কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির ওষ্ঠাধরে অক্টেভের হাসির রেখা দেখা দিল; কেননা এই বাক্যটা এক ভিন্ন দেহরূপ আবরণের মধ্য দিয়া, অক্টেভের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। এখন এই তিনজনের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অসাধারণ অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চলা কঠিন হইয়া উঠিল।

বেচারা অক্টেভের সমস্ত আশা অন্তর্হিত হইয়াছে সুতরাং তার মন যে গোলাপ ফুলটির মত উৎফুল্ল নয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যাখ্যাত সমস্ত প্রেমিকের ন্যায়, সে মনে মনে এখনো ভাবিতেছিল, কৌণ্টেসের ভালবাসা সে কেন পাইল না—যেন ভালবাসার কোন "কেন" আছে! যাই হোক, সে বুঝিল সে পরাভূত হইয়াছে। ডাক্তার শেরবোনো ক্ষণেকের জন্য তার জীবনের কল-কাঠিটা ঠিক্‌ঠাক করিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ভূতলে নিক্ষিপ্ত হাত-ঘড়ির ন্যায় আবার তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। আত্মহত্যা করিয়া তার মার মনে কষ্ট দিতে তার ইচ্ছা ছিল না; সে মনে করিয়াছিল, কোন একটা বিজন স্থানে গিয়া নিস্তব্ধভাবে তার দুঃখানল নির্ব্বাপিত করিবে এবং এই অজ্ঞাত দুঃখের একটা বৈজ্ঞানিক নাম দিয়া লোকের নিকট একটা রোগ বলিয়া প্রচার করিবে। অক্টেভ যদি চিত্রকর হইত, কবি হইত কিংবা সঙ্গীত-গুণী হইত, তাহা হইলে তার দুঃখকষ্ট তার একটা উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে জমাট করিয়া রাখিতে পারিত; তাহা হইলে প্রাস্কোভি ধবল বাসে সজ্জিত ও তারকা-মুকুটে ভূষিত হইয়া, দান্তের বেয়াত্রিচের ন্যায়, ভাস্বর-দেহ এঞ্জেলের মত তাহার কবিত্ব-উচ্ছ্বাসের উপর উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা এই ইতিহাসের গোড়াতেই বলিয়াছি, সুশিক্ষিত ও বিশিষ্ট লোক হইলেও অক্টেভ সেই সব শ্রেষ্ঠ বাছা-লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যাঁহারা ধরাতলে তাঁহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া যান। অক্টেভের একনিষ্ঠ দীন আত্মা ভালবাসা ছাড়া ও ভালবেসে মরা ছাড়া আর কিছুই জানিত না!

গাড়ী ডাক্তারের গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করিল। পাথরে-বাঁধা অঙ্গনে সবুজ ঘাস বসানো; সাক্ষাৎকারপ্রার্থী লোকদিগের অবিরাম পদবিক্ষেপে সেই ঘাসের উপর দিয়া একটা রাস্তা হইয়া গিয়াছে এবং অঙ্গনের ধূসরবর্ণ উচ্চ প্রাচীরের বিপুল ছায়ায় ভূতল পরিপ্লাবিত হইয়াছে। পণ্ডিতের ধ্যান-প্রবাহে বাধা না হয় এইজন্য অদৃশ্য প্রস্তর-মূর্তির ন্যায় নিস্তব্ধতা ও নিশ্চলতা প্রহরীরূপে দ্বারদেশ আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে।

অক্টেভ ও কৌণ্ট গাড়ী হইতে নামিলেন; ডাক্তার টপ্‌ করিয়া পা-দানির উপর পা দিয়া সহিসের হস্তাবলম্বন না করিয়াই নামিয়া পড়িলেন—এরূপ ক্ষিপ্রতা তাঁহার বয়সে কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

তাঁরা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার রুদ্ধ হইল। ওলাফ ও অক্টেভের অনুভব হইল যেন হঠাৎ একটা গরম বাতাসের আবরণে তাঁরা আবৃত হইয়াছেন। এই গরম বাতাসে ডাক্তারের ভারতবর্ষ মনে পড়িল; এবং তিনি বেশ সহজে ও আরামে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের ন্যায় কৌণ্ট ও অক্টেভ ত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে অভ্যস্ত হন নাই, সুতরাং তাঁদের প্রায় শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। বিষ্ণুর অবতারেরা স্বীয় ফ্রেমের মধ্যে দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছেন, নীলকণ্ঠ শিব তাঁর পাদ-বেদিকার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া অট্টহাস্য করিতেছেন। কালী তাঁর শোণিতাক্ত রসনা বাহির করিয়া আছেন। নৃমুণ্ডমালার আন্দোলনে যেন ঠকাঠক্ শব্দ শুনা যাইতেছে। ডাক্তারের এই আবাস-গৃহ একটা রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রথম রূপান্তর-প্রক্রিয়া যে ঘরে হইয়াছিল, ডাক্তার শেরবোনো সেই ঘরে সম্মোহন-পাত্রদ্বয়কে লইয়া গেলেন। তিনি তাড়িৎ-যন্ত্রের কাচের চাকৃতিটা ঘুরাইলেন, সম্মোহন-বালতির লোহার হাতল নাড়িলেন; গরম বাতাসের মুখ খুলিয়া দিলেন, তাহাতে ঘরের উত্তাপ শীঘ্রই বাড়িয়া গেল। ভূর্জ্জপত্রে লেখা দুই তিনটা মন্ত্র পাঠ করিলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে, কৌণ্ট ও অক্টেভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

"এখন আমি তোমাদের কাজের জন্য প্রস্তুত। কি বল, আরম্ভ করব কি?" ডাক্তার যখন এই কথা বলিতেছিলেন, কৌণ্ট উৎকণ্ঠিত হইয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন:—

"আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ব, এই বুড়া যাদুকর না জানি আমার আত্মাকে নিয়ে কি করবে। বানর-মুখো এই ডাক্তারটা সাক্ষাৎ শয়তান হতে পারে না কি? আমার আত্মাকে আমার শরীরে ফিরিয়ে দেবে,—না, ওর সঙ্গে আমাকে নরকে নিয়ে যাবে? আমার ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দেওয়া—এটাও একটা নূতন ফাঁদ নয় ত? কি ওর উদ্দেশ্য জানি না, কিন্তু কোন বুজরুগি করবার জন্য এই-সব শয়তানি আয়োজন হচ্চে না ত? যাই হোক, আমার এখন যে অবস্থা তার চেয়ে আর কি-খারাপ হতে পারে? অক্টেভ আমার শরীর অধিকার করে আছে; আর সে আজ সকাল বেলায় ঠিক্ কথাই ত বলেছিল যে, আমার বর্ত্তমান শরীরে থেকে যদি আমি আমার কৌণ্ট নামের দাবি করি, তাহলে লোকে আমাকে পাগল ঠাওরাবে। যদি আমাকে একেবারে সরিয়ে ফেলবার তার ইচ্ছা থাকৃত, তা হলে আমার বুকে তার অসি বিঁধিয়ে দিলেই ত হ'ত। আমি নিরস্ত্র ছিলাম, আমার মরণ বাঁচন তারই হাতে ছিল। কোন রকম অন্যায় আচরণও হয় নি! দ্বন্দ্বযুদ্ধের পদ্ধতি ঠিক রক্ষিত হয়েছিল, সবই দস্তুর মত হয়েছিল। যাক্! এখন প্রাস্কোভির কথাই ভাবা যাক্, ছেলে-মানুষের মত মিছে কেন ভয় করৃচি? তার ভালবাসা ফিরে পাবার এই একমাত্র উপায়; এই উপায়টা একবার পরোখ করে দেখ্‌তে হবে।"

ডাক্তার শেরবোনো এখন সেই লোহার হাতলটা দুইজনকে ধরিতে বলিলেন, কৌণ্ট ও অক্টেভ দুজনেই হাতলটা ধরিল। চৌম্বক-

তরল-পদার্থে ঐ হাতলটা পূর্ণমাত্রায় ভরা ছিল,—ধরিবামাত্র দুজনেই অচেতন হইয়া পড়িল—দেখিলে মনে হয় যেন উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার হাতের ঝাড়া দিতে লাগিলেন, নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেন, প্রথমবারের মত মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন; উচ্চারণ করিয়াই তাঁর সেই পিট্‌পিটে জ্বল্‌জ্বলে চোখের দৃষ্টি দুইজনের উপর নিক্ষেপ করিলেন; তারপর ডাক্তার, কৌণ্ট ওলাফের আত্মাকে আবার তার নিজ আবাস-দেহে লইয়া গেলেন; এই সময় ওলাফ, সম্মোহনকারীর অঙ্গভঙ্গীগুলা খুব আগ্রহের সহিত আড়চোখে দেখিতেছিলেন।

এদিকে, অক্টেভের আত্মা আস্তে আস্তে ওলাফের শরীর হইতে দুরে চলিয়া গেল; এবং নিজের শরীরে ফিরিয়া না গিয়া, মুক্তির আনন্দে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; মনে হইল যেন তার আত্মা শরীর-পিঞ্জরে আর বদ্ধ হইতে চাহে না। এই আত্মা-পাখীটি ডানা নাড়িতেছে আর ভাবিতেছে—আবার তাহার পুরাতন দুঃখের আবাসে ফিরিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় কি না—এইরূপ ইতস্তত করিতে করিতে ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। শেরবোনো এই স্থলে কিংকর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া, সেই সর্ব্ববিজয়ী দুর্নিবার মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক একটা বৈদ্যুতিক 'ঝাড়া' দিলেন; আত্মারূপ সেই কম্পমান ক্ষুদ্র আলোকটি ইতিপূর্ব্বেই আকর্ষণ-মণ্ডলের বাহিরে গিয়া, জানলা-শার্শির স্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল।

ডাক্তার, বাহুল্য মনে করিয়া অন্য চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন এবং কৌণ্টকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিলেন। কৌণ্ট একটা আয়নায় নিজের পূর্ব্বমুখশ্রী দেখিতে পাইয়া একটা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহার পর ডাক্তারের হস্তমর্দ্দন করিয়া, অক্টেভের দেহাবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন কি না—এই বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার জন্য কৌণ্ট অক্টেভের নিশ্চল দেহের উপর একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎ মুহূর্ত্ত পরে, খিলান-মণ্ডলের নীচে গাড়ীর একটা চাপা ঘর্ঘর শব্দ শুনা গেল; এখন ডাক্তার শেরবোনো একাকী অক্টেভের মৃতদেহের সম্মুখে। কৌণ্ট প্রস্থান করিলে, এলিফ্যাণ্টা-ব্রাহ্মণের শিষ্য শেরবোনো বলিয়া উঠিলেন, "রাম বল! এ যে এক মুস্কিলের ব্যাপার; আমি খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছি, পাখী উড়ে গেছে; এর মধ্যেই পৃথিবীর আকর্ষণ-মণ্ডলের বাহিরে এত দুরে চলে গেছে যে এখন সন্ন্যাসী ব্রহ্মালোগমও তাকে ধরতে পারবে না। আমি একটা মৃত শরীর কোলে নিয়ে বসে আছি। আমি খুব একটা কড়া দ্রাবক-রসে ডুবিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দিতে পারি কিংবা ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে প্রাচীন মিসরের মমির মত আরকে জারিয়ে রাখ্‌তে পারি; কিন্তু তাহলে খোঁজ হবে, খানাতল্লাসি হবে, আমার বাক্‌স সিন্দুক খোলা হবে, আর কত-কি বিরক্তিকর প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে।" এইখানে ডাক্তারের মাথায় বেশ একটা মৎলব আসিয়া জুটিল; অমনি তিনি একটা কলম লইয়া তাড়াতাড়ি এক-তক্তা কাগজের উপর কয়েক ছত্র লিখিয়া ফেলিলেন। তাতে এই কথাগুলি ছিল ঃ—

"আমার কোন আত্মীয় না থাকায়, কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি সাবিলের অক্টেভকে দিয়া যাইতেছি; আমি তাকে বিশেষরূপে স্নেহ করি। নিম্নলিখিত টাকা শোধ করিয়া যাহা থাকিবে সমস্তই তাহার প্রাপ্য:— ১ লক্ষ টাকা সিংহলের ব্রাহ্মণ-হাসপাতালে, শ্রান্ত বা পীড়িত বৃদ্ধ জীবজন্তুদের আতুরাশ্রমে দিলাম। আমার ভারতীয় ভৃত্যকে ও আমার ইংরেজ ভৃত্যকে বারো হাজার টাকা দিলাম। আর এক কথা, মনুর মানব-ধর্ম্মের পুঁথিটা মাজারীণ পুস্তকালয়ে যেন ফেরৎ দেওয়া হয়।"

একজন জীবিত ব্যক্তি মৃতব্যক্তিকে উইল-সূত্রে দানপত্র লিখিয়া দিতেছে,. আমাদের এই বিস্ময়জনক অথচ বাস্তব ইতিহাসের মধ্যে ইহাও একটা কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য এখনি উদ্ভাসিত হইবে।

অক্টেভের পরিত্যক্ত দেহে প্রাণের উত্তাপ এখনো ছিল। ডাক্তার অক্টেভের এই দেহ স্পর্শ করিলেন স্পর্শ করিয়া অতীব ঘৃণার সহিত আয়নায় আপনার মুখ দেখিলেন; দেখিলেন, মুখ বলি-রেখায় আচ্ছন্ন, এবং কষ লাগানো হাঙ্গর-চামড়ার মত শুষ্ক ও কর্কশ। দর্জি নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দিলে পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগের সময় মনের যে ভাব হয় সেই ভাবে ডাক্তার আপন মুখ দেখিয়া একটা মুখভঙ্গী করিলেন। তাহার পর, সন্ন্যাসী ব্রহ্মলোগমের মন্ত্রটা আওড়াইলেন।

অমনি, ডাক্তার বালথাজার শেরবোনোর শরীর বজ্রাহতের ন্যায় কার্পেটের উপর গড়াইয়া পড়িল; আর অক্টেভের শরীর সবল হইয়া, সজাগ হইয়া, জীবন্ত হইয়া আবার খাড়া হইয়া উঠিল।

অক্টেভদেহধারী-শেরবোনো তাঁহার নিজের শীর্ণ, অস্থিময় ও নীলাভ পরিত্যক্ত নির্ম্মোকের সম্মুখে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার এই পরিত্যক্ত দেহের মধ্যে শক্তিশালী আত্মা না থাকায়, সেই দেহে প্রায় তখনই জরার লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং অচিরাৎ ঐ দেহ শব-আকার ধারণ করিল।

"বিদায়! ওরে অপদার্থ মাংসখণ্ড; বিদায়, ওরে আমার শতছিদ্র চীরবস্ত্রখানি; এই ৭০ বৎসর তোকে টেনে-টেনে পৃথিবীময় নিয়ে বেড়িয়েছি! তুই আমার অনেক সেবা করেছিস্, তাই তোকে ছেড়ে যেতে আমার একটু দুঃখ হচ্চে। কত দিন থেকে একসঙ্গে থাকা অভ্যাস আমাদের! কিন্তু এই যুবার দেহাবরণ ধারণ করে আমি এখন বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে পারব, শাস্ত্রানুশীলন করতে পারব, যথোচিত পরিশ্রম করতে পারব, সেই বৃহৎ-পুঁথির আরও কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে পারব; যে জায়গাটা খুব ভাল লাগবে সেই জায়গাটা পড়বার সময় মৃত্যু এসে সহসা বলতে পারবে না—"আর না, যথেষ্ট হয়েছে, পড়া বন্ধ কর্।"

আপনার কাছে আপনি এই অন্ত্যেষ্টি বক্তৃতা করিয়া, শেরবোনো তাঁহার নূতন অস্তিত্ব অধিকার করিবার জন্য ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন।

এদিকে কৌণ্ট ওলাফ তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, কৌণ্টেশের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না।



মাছিক ছাইত্য

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

ওলাফ দেখিলেন,—কোণ্টেশ উদ্ভিদ-গৃহে শৈবাল বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। শৈবাল-গৃহের পার্শ্বদেশের স্ফটিকের চৌকা শার্শিগুলা একটু উপরে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া কবোষ্ণ জ্যোতির্ময় বায়ু প্রবেশ করিতেছে—শৈবাল-গৃহের মধ্যস্থল বিদেশী ও গৃগ্মমণ্ডলের উদ্ভিজ্জে আচ্ছন্ন হইয়া যেন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কোন্‌টেশ, নোভালিসের গ্রন্থ পাঠ করিতে ছিলেন। যে সকল জর্ম্মান গ্রন্থকার প্রেতাত্ম-বাদ সম্বন্ধে অতীব সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে নোভালিস একজন। যে সকল গ্রন্থে খুব গাঢ় রং ঢালিয়া বাস্তব জীবন চিত্রিত হইয়াছে কোণ্টেশ সেই সব গ্রন্থ পড়িতে ভাল বাসিতেন না। সৌখীনতা প্রেম ও কবিতার জগতে চিরদিন বাস করিয়া আসায় জীবনটা তাঁর একটু স্থূল বলিয়া মনে হইত।

তিনি পুস্তকটা ফেলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে চোখ্‌ তুলিয়া কোণ্টের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন। কোণ্টেশ ভয় পাইতে ছিলেন পাছে এখনো তাঁহার স্বামীর কালো চোখের তারার মধ্যে সেই আগ্রহপূর্ণ, গুহ্যভাবে-ভরা, ঝোড়ো-রকমের দৃষ্টি দেখিতে পান, যাহা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে তাঁর খুবই কষ্ট হইয়াছিল—এমন কি যা দেখিয়া (এটা মনে করা নিতান্ত আজ্‌গুবি যদিও) আর একজনের দৃষ্টি বলিয়া মনে হইয়াছিল!

ওলাফের নেত্র হইতে একটা প্রশান্ত আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, এবং সেই চোখে একটা বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। যে অপরিচিত আত্মা তাঁর মুখের ভাব বদলাইয়া দিয়াছিল, সেই আত্মা এখন চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে; প্রাস্কোভি এখন তাঁর হৃদয়ের আরাধ্য প্রিয়তমকে চিনিতে পারিলেন এবং তখনি তাঁহার স্বচ্ছ কপোলে একটা সুখের লালিমা ফুটিয়া উঠিল; যদিও ডাক্তার শেরবোনো-কৃত রূপান্তরের ব্যাপারটা তিনি জানিতেন না তথাপি একপ্রকার অন্তর্গূঢ় সূক্ষ্ম অনুভূতি হইতে এই সকল পরিবর্ত্তন তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন—যদিও তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন নাই। ওলাফ নীল মলাটের পুস্তকখানি শৈবাল-ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন :—

"তুমি কি বই পড়ছিলে প্রাস্কোভি?—আ! এ যে দেখ্‌ছি হেন্‌রি অফ্‌টর ডিঞ্জেনের ইতিহাস—এযে সেই বইখানা যা তুমি একদিন দেখে কিন্‌তে ইচ্ছে প্রকাশ করিয়াছিলে। সেই দিনই ঘোড়া ছুটিয়ে একজনের বাড়ীর টেবিলের উপর দুপুর রাত্রে ঐ বই তোমার ল্যাম্পের পাশে এনে হাজির করে দিয়ে-ছিলাম। ঘোড়াটার দম বেরিয়ে যাবার যোত্র হয়েছিল।"

"তাই ত তোমাকে বলেছিলাম আর কখনও আমার মনের কোন সাধ বা খেয়াল তোমার কাছে প্রকাশ করব না। তোমার চরিত্রটা কি-রকম জান?—স্পেনদেশের সেই বড় লোকের মত, যে তার প্রেয়সীকে বলেছিল,—"আকাশের তারার দিকে তাকিও না—কেননা তোমাকে তা এনে দিতে পারব না।"

কোণ্ট উত্তর করিলেন :—

"তুমি যদি কোন তারার দিকে তাকাও প্রাস্কোভি, তা হলে আমি আকাশে উঠ্‌বার

চেষ্টা করব, আর ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তারাটা চেয়ে নেব।"

যখন প্রাস্কোভি স্বামীর এই কথাগুলি শুনিতেছিলেন সেইসময় তাঁর কেশ বন্ধনের একটা ফিতা বিদ্রোহী হওয়ায়, সেই ফিতাটি ঠিক করিবার জন্য হাত উঠাইলেন,—তাঁহার জামার আস্তিনটা একটু সরিয়া গেল; আর অমনি তাঁর সুন্দর নগ্ন বাহু বাহির হইয়া পড়িল। তাঁর হস্ত-প্রকোষ্ঠে নীলা পাথর-বসানো একটা গির্গিটি কুণ্ডলী পাকাইয়া ছিল। "কাসিনে"তে তাঁহাকে দেখিয়া যেদিন অক্টেভের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল সেই দিন তিনি এই অলঙ্কারটি হাতে পরিয়াছিলেন। কৌণ্ট বলিলেন :—

"তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তুমি যেদিন প্রথমবার বাগানে নেমেছিলে, তখন একটা ছোট গির্গিটি দেখে তোমার কি ভয়ই হয়েছিল; গির্গিটাকে আমার ছড়ির এক ঘায়ে মেরে ফেল্লাম; তারপর, তার থেকে সোনার ছাঁচ তুলে কতকগুলি রত্ন দিয়ে সেই সোনার ছাঁচটাকে ভূষিত করলাম। কিন্তু গির্গিটা অলঙ্কারে পরিণত হলেও, তুমি দেখে ভয় পেতে; কিছু কাল পরে, যখন তোমার ভয় ভেঙ্গে গেল, তখন তুমি অলঙ্কারটা পরতে রাজি হলে।"

—"ওঃ! এখন আমার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে; সকল গহনার চেয়ে এই গহনাটাই আমি এখন পছন্দ করি; কারণ এর সঙ্গে আমার একটা সুখের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে।"

কৌণ্ট বলিলেন :—"সেই দিনই আমরা ঠিক করেছিলাম, তুমি তোমার খুড়ীর কাছে আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে রীতিমত প্রস্তাব করবে।"

কৌণ্টেশ প্রকৃত ওলাফের পূর্ব্বেকার দৃষ্টি আবার দেখিতে পাইয়া, তাঁহার কণ্ঠস্বর আবার শুনিতে পাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া, তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া উদ্ভিজ্জ-গৃহে দুই চার বার ঘোর-পাক দিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে,—যে হাতটি মুক্ত ছিল সেই হাত দিয়া একটি ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া তার পাপড়ি-গুলা দাঁত দিয়া কাটিতে লাগিলেন। মুক্তা-দন্তে যে ফুলটি কাটিতেছিলেন সেই ফুলটি ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন :—

"আজ তোমার স্মরণশক্তির যেরকম পরিচয় পাচ্চি তাতে বোধ হয় তোমার মাতৃ-ভাষাও তোমার আবার মনে পড়েছে, মাতৃভাষায় তুমি বোধ হয় এখন আবার কথা কইতে পার—কাল ত তোমার মাতৃ-ভাষা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে।"

কৌণ্ট পোলীয় ভাষায় উত্তর করিলেন :—"ওঃ! যদি প্রেতাত্মারা স্বর্গের জন্য কোন এক মানব-ভাষা স্থির করে থাকেন, তাহলে আমি সেখানে গিয়ে পোলীয় ভাষাতেই তোমাকে বল্‌ব—"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

প্রাস্কোভি চলিতে চলিতে, ওলাফের কাঁধের উপর আস্তে আস্তে তাঁহার মাথা নোয়াইলেন। এবং গুণ গুণ স্বরে বলিলেন :—

"প্রাণেশ্বর; এইত সেই তুমি—যাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। কাল আমাকে বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে; অপরিচিত লোক ভেবে তোমার কাছ থেকে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম।"

তার পরদিন, অক্টেভের দেহে বুড়া ডাক্তারের আত্মা প্রবেশ করায় অক্টেভ সজীব হইয়া উঠিল। এবং একটু পরে কালো রেখার ঘের-দেওয়া একখানি পত্র পাইল। উহাতে বালথাজার-শেরবোনো মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবার জন্য অক্টেভকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ডাক্তার তাঁহার নূতন দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত পুরাতন দেহের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-ভূমিতে গমন করিলেন; ঐ দেহ কবরস্থ হইল; গোর দিবার সময় যে বক্তৃতা হইল তাহা তিনি শোকগ্রস্তের ন্যায় দুঃখের ভাব ধারণ করিয়া মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হইল সে ক্ষতিপূরণ হওয়া অসম্ভব ইত্যাদি সেই বক্তৃতায় অনেক কথা ছিল।

ঐ দিনই সায়াহ্ন-সংবাদ পত্রের "বিবিধ সংবাদের" কোঠায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইল :—

"ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো—যিনি দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিবার জন্য, শব্দ-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য, রোগ আরোগ্য করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত, গতকল্য নিজ কর্ম্ম-কক্ষে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত দেহ তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে, কোন আততায়ীকৃত সাজ্ঘাতিক অপরাধ অনুমান করিবার কোনও হেতু নাই। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে কিংবা কোন অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে গিয়াই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। শুনা যায়, ডাক্তারের দফ্তরখানায় তাঁর অন্তিম-দানপত্রখানি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি তাঁহার বহুমূল্য পুঁথিগুলি মাদারীণ-পুস্তকালয়ে দান করিয়াছেন এবং সেবিলের অক্টেভ মহাশয়কে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন।" * †

সমাপ্ত

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* এই গল্পের লেখক Theophile Gautier (১৮১১—৭২) একজন কবি এবং উনবিংশতি শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে যে সকল গদ্য-লেখক আবির্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। সাহিত্যিক মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার যেরূপ ছন্দের "কাণ" ও জ্বলন্ত স্বপ্নময়ী কল্পনা ছিল, তাহা অতুলনীয়। অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ভব্য সাহিত্য এবং অবাধ কল্পনাপ্রসূত নব্য সাহিত্য এই উভয়ের যুদ্ধে তিনি নব্য সাহিত্যেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য গ্রন্থ Mademoiselle de Maupin আমাদের দেশেও অনেকে পড়িয়াছেন, কেননা ইহার ইংরাজী তর্জ্জমা আছে। লিখিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প-রচনা আছে তন্মধ্যে Avatar (অবতার) একটি। ইংরাজীতে বোধহয় ইহার অনুবাদ হয় নাই।

† ভ্রম-সংশোধন :—পূর্ব্ব সংখ্যার "অবতারে"—৩১ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তিতে "আরো কএক মিনিট কৌণ্ট ওলাকের ভূমিকাই বজায় রেখে"—এই অংশটি "মহাশয়গণ" এর পরে না বসিয়া পূর্ব্বে বসিবে।

অকারণের কান্না

মনে ছিল আশা
আমার এ ভালোবাসা
সারা হবে শুধু হাসি দিয়া,
আমি সেথা রব আর রবে মোর প্রিয়া।
যত কাছে যাই তার, হাসি ছিল যত
অগোচরে হয়ে ওঠে বেদনার মত
মিলায় নয়ন-জলে শেষে ;
ভালো জ্বালা হলো ভালোবেসে !

প্রিয়ার কুটীর-দ্বারে, তার দুটি নয়নের ছায়
বিশ্বের আকুতি যত হেরি যে ঘনায়
ক্ষুধাতুর আকুল ক্রন্দনে।
শোণিত-চন্দনে
ঊষা তার দেহ লিপ্ত করে।
দ্বিপ্রহরে
দুরন্ত বাতাস আনে বুক-ভাঙা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
সন্ধ্যা আনে অন্ধ-করা অন্ধকারে গড়া নাগপাশ
মনে হয় যুগে যুগে দেশে দেশে
যাহারা মরেচে ভালোবেসে,
আজিও মরিছে যারা,
সবাকার আঁখি-ধারা
প্রিয়ারে দিয়াছে রূপ। বধির আতুর
অন্ধ খঞ্জ উপবাসী বিরহ-বিধুর
হতভাগা সকলের তপশ্চর্য্যা মিলে
তাহারে গড়েছে তিলে তিলে।
তাহারে আনিতে গৃহে, আনি তার সহ
এ বিশ্বের সকল বিরহ।
—অব্যক্ত ব্যথায় মোর অন্তর বিকল,
হাসি ফুটাইতে গিয়া শুধুশুধু চোখে আসে জল !
যত ভাবি, পলে পলে দিন শুধু কাটে,
বুকে টেনে নিতে তারে বুক মোর ফাটে !

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

আদর্শ-বিপর্য্যয়

'আদর্শের বিড়ম্বনার' (ভারতী, ফাল্গুন) লেখক মহাশয় যুধিষ্ঠিরের চরিত্র নূতন করিয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে বিচারার্থ টানিয়া আনিয়া যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একটু প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হিন্দুর মজ্জার ভিতর ধর্ম্মরাজ-মূর্ত্তির একটা পূত উজ্জল রেখাপাত করিয়া ইহা নীরবে বহুদিন শয়ান ছিল, তাঁহাকে যে বিংশশতাব্দীর নীতিধর্ম্ম-দীক্ষিত তাঁহার বংশধরদিগের সম্মুখে আসিয়া সমালোচনার কঠিন পরীক্ষাতে পাশ করিয়া ফার্ষ্ট ক্লাস সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে, এটা যদি তিনি কোন দেবদূত সাহায্যে জানিতে পারিতেন, তবে অতটা নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গে যাইতে পারিতেন না। যাহা হউক, যিনি যুধিষ্ঠির-চরিত্রে পরীক্ষার আঘাত করিয়া এতগুলি হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিবার দায়ীত্ব লইতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে

নমস্কার করিয়া আমার বক্তব্যটুকু বলিব, লেখক মহাশয় তাঁহার বিচারকের নীরস-গম্ভীর ভ্রুকুটীটা অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু সহানুভূতির হাস্য-রেখায় পরিণত করিলে মনে সাহস পাই।

মহাভারতটা যে আমাদের জাতীয় মহাকাব্য, এটা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এটা ইতিহাস কিনা, সে প্রশ্ন না উঠানই ভাল। কারণ ভাবপ্রবণ হিন্দু ইতিহাসকে ভাবের রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া সুখ-দুঃখময় জীবনকে তাহার সম্পূর্ণ সুন্দর ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখিতেন। অধ্যাত্মবাদীর হাতে কাব্য-ইতিহাসের প্রয়াগ-সঙ্গম ঘটিয়াছে। এই যুধিষ্ঠির চরিত্রকে আমরা কাব্যসৌন্দর্য্যের দিক দিয়া দেখিব। ইহা সুন্দর, মোহন হইয়াছে কিনা দেখিব;—ওকালতি করিবার ঔদ্ধত্য নাই।

হিন্দুর শিল্পকলার (art) মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই তাহার একটা বিরাটতার ভাব আমাদের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মহাভারতের এই সকল চরিত্রও বিরাট, গড়িবার উপকরণও বিস্তর—বিরাটেরই অনুরূপ, ব্যাপ্তিতে যেরূপ প্রকাণ্ড, উচ্চতাতেও সেইরূপ অভ্রভেদী। ঋষিগণ বুঝি বিন্ধ্য-হিমাচলের মত পর্ব্বত কাটিয়া ইহাদের মূর্ত্তি গড়িতেন। ইউরোপীয় আদর্শের ছাঁচে ফেলিয়া রোমীয় ভাস্কর্য্যের পুতুল মূর্ত্তির মত এই সকল চরিত্র ব্যবহারিক জ্যামিতির রেখাসূত্রানুসারে গড়িয়া উঠে নাই। যেখানে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি একীভূত হইয়া সাগর-সঙ্গমে মিশিয়াছে, এই চরিত্রগুলি সেই স্থান হইতে প্রেরণা লইয়া মানুষিক জগতের সহিত অতিমানুষিক জগতের সামঞ্জস্য ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাই পাণ্ডবদিগের জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিও রহস্যময়। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুর জন্মকথাও অনেক নৈতিক শুচি-বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির নাসিকা-সঙ্কোচের কারণ হইতে পারে।

এই কাব্যের মানুষগুলি দৈববিভূতি লইয়া জন্মিয়াছে,—প্রকৃত বা স্থূল জগতের পশ্চাতে সূক্ষ্ম জগতের ছায়াময় দৃশ্য। ইহাদের প্রতাপে বিশ্ব প্রকম্পিত হয়, তথাপি ইহারা আমাদের মতই মানুষ। আমাদের মাথার উপর গৌরব-লোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আমাদের নিতান্ত আত্মীয়; তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হাসি কাঁদি। আত্মার অমোঘ শক্তির সাধনায় তাঁহারা আপনাদিগকে বহু উর্দ্ধলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সংসারের মানুষ, অতিমানুষ নহেন। হিন্দুরা অতিমানুষ চরিত্রও অনেক গড়িয়াছেন! মহাদেব অতিমানুষ। তাহা যেন শুদ্ধসত্ত্বের জমাটভাব লইয়া রজত-গিরিনিভ রত্নকল্লোজ্জ্বলাঙ্গ হইয়া ধ্যানস্থ হিন্দুর মানসক্ষেত্রে শোভা পায়। তাঁহাদের কার্য্যকলাপগুলা মোটের উপর আমাদের সংসারের রুটিন-বহির্ভূত। এই অতিমানুষ জগতের রহস্যময় দৃশ্যের সম্মুখে সাংসারিক জগতের দৃশ্য ফেলিয়া হিন্দুরা আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এখন এই মানুষ-চরিত্রে তাঁহারা কি কি ভাবের অভিব্যক্তি দিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক। মহাভারতের কৃষ্ণের মধ্যে তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধির চরম সম্পত্তির অধিকারী লীলা-

রহস্যময় মহা-প্রতাপশালী বিরাট পুরুষের মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। ইহা ভগবানের জগতে প্রকাশ হওয়ারই সম্ভবময় চিত্র। তিনিই যেন ধর্ম্মচক্রের নিয়ন্তা; ইঁহার উপর যুধিষ্ঠিরের অটল বিশ্বাস। এই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ—অবশ্য মানুষ ধর্ম্মরাজ এবং শুধুই মানুষ নহেন, জাতিতে ক্ষত্রিয়—এই ধর্ম্মচক্রে বিচরণ করিতেছেন। এখন এই মানুষ ধর্ম্মরাজ মূর্ত্তি ঋষিদের হস্তে কি ভাব-সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়াছে। ব্যাপকভাবে আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে।

তাঁহারা ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝিতেন অনেক সময় আমরা সে কথাটা বিশেষ না ভাবিয়া দেখায়, বিলাতি নীতিশাস্ত্রের রিলিজিয়নের গর্ত্তে পড়িয়া যাই। তাঁহারা ধর্ম্ম বলিতে যে জাতিগত, ব্যক্তিগত, পার্থিব এবং পরমার্থিক ক্রিয়া-কলাপের একটা সুশৃঙ্খল নিয়মের ধারাকে মনে করিতেন, ইহা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে,—ভগিনী নিবেদিতা যাহা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, "It applies to the whole system of moral and complex action and interaction on planes moral, intellectual, economic, industrial, political and domestic which we know as India or the national habit." যে নিয়মচক্রে সৃষ্টি বিধৃত, এক কথায় তাহাই ধর্ম্মচক্র; তাই জীবনের মতই ইহার ব্যাপ্তি, মানুষের সমস্ত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম ভাবে ইহার গতি। ঘাতপ্রতিঘাতের ভীষণ সংঘর্ষে এই চক্র ঘুরিতেছে। এই সকল ঘাত-প্রতিঘাতকে অর্থাৎ এই জীবটাকে তাঁহারা কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে দেখিতেন সেটা দেখা আবশ্যক।

সমগ্র সৃষ্টিকে এবং সৃষ্টির প্রধান জীব (সম্ভবতঃ) মানুষকে তাঁহারা স্বত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যথাক্রমে আধিক্য অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আদি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন। এই সত্ত্বের সহিত রজস্তমের দ্বন্দ্বের সংঘাতে জীবন-চক্র ঘুরিতেছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাহার স্বভাব এই সত্ত্বে অবস্থান, নতুবা শান্তি নাই। রাম-রাবণের ও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে এই দ্বন্দ প্রতিফলিত। এই সত্ত্বস্থ মানুষ তাহার শুভ্রত্ব ও শান্তভাবের জন্য রাজসের উন্মাদ নাময় নেশার চোখে অশোভন ঠেকে। রামচিত্র কবি মধুসূদনের হস্তে হীনপ্রভ হইয়াছে। যুধিষ্ঠির চরিত্রও অনেকের কাছে ভীরু বোধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। এই সত্ত্বস্থ মানুষের লক্ষণ, স্বমানিত পূজাযমনিয়মাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষুতা, শমদমাদি দৈবি সম্পত্তি, অসদাবরণ হইতে নিবৃত্তি—এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল তত্ত্বকথা এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে—কোন কাব্যেরই হওয়া উচিত নয়। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল চিরন্তন সত্যগুলি ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিতে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সে বিষয়ে তর্ক স্থগিত রাখিয়া, আমাদের মনে রাখিতে হইবে, এই সকল সত্যজ্ঞানই তাঁহাদের ধ্যানধারণাকে আকার প্রদান করিয়াছে। এই সত্ত্বস্থ স্বধর্ম্মান্বিত চরিত্রগুলি হিন্দুদের কাব্যে শান্তরসের সৌন্দর্য্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি,

ত্যাগ, স্নেহ, দয়া, তিতিক্ষার শুভ্রমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; রজস্তমোর অবিরাম সংঘর্ষ ইহাকে প্রকটিত করিতেছে।

আমরা বিশ্বকেন্দ্রে এই দ্বন্দের সংঘাত দেখিয়া আসিতেছি—একদিকে দম্ভ, অভিমান, লোভ, বাসনা, অসূয়া—অন্যদিকে বিনয়-নিরভিমানিতা, ত্যাগ, ধৈর্য্য, ক্ষমা—একদিকে প্রবল অত্যাচারী, পরপীড়ক, স্বার্থান্বেষী, দুরাকাঙ্ক্ষা,—আর অন্যদিকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ, অটল ধৈর্য্যে অবস্থিত উৎপীড়িত ধর্ম্ম;—একদিকে অন্যায়কারী রাবণ, অন্যদিকে অন্যায়ের প্রতিবিধানকারী রাম,—একদিকে দুষ্ট যুদ্ধকারী দুর্য্যোধন—অন্যদিকে যুধিষ্ঠির, যুদ্ধে ধীর স্থির, সময়ে সময়ে যেন একটু অভিভূত, কিন্তু প্রবল ঝটিকান্তে পৃথিবীর ন্যায় নির্দ্দিষ্ট কক্ষে অবস্থিত। এইরূপ কল্পনাই যুধিষ্ঠিরের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক তাঁহার জীবনব্যাপী কার্য্যকলাপে কিরূপ ভাবে এই ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে।

তপঃপ্রভাবসম্পন্ন—কুন্তীদেবীর ইনি জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রভঞ্জনতুল্য বলশালী ভীম, বিদ্যুৎগর্ভ-মেঘের ন্যায় শান্তভীষণ অর্জ্জুন, তাঁহার নিতান্ত অনুগত দুই বাহুস্বরূপ। তাঁহার স্বীয় বীর্য্যের অত্যধিক শান্তভাবের জন্যই সম্ভবতঃ আমরা সেটা উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত। কৃষ্ণের মতে তিনি ব্যতীত পাণ্ডবদের মধ্যে অন্য কেহই শল্যের তুল্য বলশালী ছিলেন না। তিনিই শল্যের একমাত্র প্রতিযোদ্ধা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে তাঁহার হস্তে পরাজিত বিধ্বস্ত দেখিতে পাই (কর্ণপর্ব্ব)। ফুৎকারে কৌরবনাশ করিবার ক্ষমতা রাখিয়াও তিনি দুর্য্যোধনের হস্তে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপমানিত। জতুগৃহের বিপত্তি, পাশাক্রীড়ায় অপমান, বনবাসের নির্য্যাতন তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাঁহার মনে বিদ্রোহ জাগাইতে পারে নাই। ধর্ম্মে উন্মাদনা নাই; তাহার অগাধ শক্তি সংহত সুনিয়ন্ত্রিত। তিনি ক্ষত্রিয়, আঘাত হইতে রক্ষা করা তাঁহার ধর্ম্ম, আঘাত করা ধর্ম্ম নহে। বনবাস-গমনকালে তিনি চক্ষু আবৃত করিয়া ক্ষুব্ধ ধর্ম্মের কোপ হইতে শত্রুকেও রক্ষা করিতেছেন। যে ধর্ম্ম সংসার-যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কাতব কান্তা বলিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করে, অথবা টাইমন অফ্ এথেন্সের মত সংসার-বিদ্বেষী হইয়া যায়, এ সে ধর্ম্ম নহে। এ ধর্ম্মরাজ বীর, তিনি নিজে জীবন-যুদ্ধে অটল তাহাই নয়, অনুগতদের আশ্রয়স্থল। তিনি শত্রুকেও বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের বিপদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখান। ন্যায়ের মানদণ্ডের কাছে তিনি সসঙ্কোচ প্রণত। কঠোর ভবিতব্যতা তাঁহার ভীম বক্ষের উপর দিয়া ঝঞ্জার পদক্ষেপে পঞ্জর বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া যাইতেছে অথচ তাঁহাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিতেছেনা। তিনি বিজয়াকাঙ্ক্ষী। এই অদ্ভুত বিক্রমশালী ব্যক্তির উদার ক্ষমা ও নীরব সহিষ্ণুতার মধ্যে কি একটা মহিমময় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না? এটা কি বড় সুন্দর নয়? 'নিরুপদ্র অসহযোগিতা'মন্ত্রের প্রচারক কি এই বীরত্বেরই অনুকরণাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে হয় না?

আমরা যদি বাহির হইতে এই যুধিষ্ঠির-চরিত্র কতকগুলি কর্ম্ম-সমবায়ের একটা

কৃত্রিম ঠাট মনে করিয়া দেখিতে যাই, তবে বড় ভুল করিব। ইহা প্রকৃতি দেবীর জীবন্ত বস্তুরই মত অন্তরাত্মার মধ্য হইতে ঐশ প্রেরণা লইয়া প্রকৃতির নিয়মানুসারে কর্ম্মের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ব্যবহার-জগতের ভাষায় বলিব, এই কর্ম্মগুলি একটা নিগূঢ় কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা অনুস্যূত এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের শিখায় প্রদীপ্ত, আস্তিক্যের দৃঢ় স্থিরদণ্ডকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জীবনের পরিধি পর্য্যন্ত ভ্রাম্যমান। অনুগত জনের প্রতি অটুট স্নেহ ইহাকে রসধারসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। দেবদ্বিজ ও গুরুজনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ইহাকে মধুময় করিয়া দিয়াছে, স্বার্থবিদ্বেষের কলুষ ইহার অকলঙ্ক শুভ্রতাকে মলিন করে নাই। দমনিয়মাদি সঙ্গীতের তানলয়ের মত ইহাকে বাঁধিয়া সরল করিয়া দিয়াছে। যুধিষ্ঠির জীবন-রঙ্গমঞ্চে এই ধর্ম্মমার্গে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করার মত অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে বিচরণ করিতেছেন। দুর্য্যোধন তাঁহার বিদ্বেষ-বিরহিত হৃদয়ের কাছে সুযোধন। ধর্ম্মের নিকট তিনি মাতৃহীন সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবন ভিক্ষা করিয়া অনুজ-স্নেহ ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লাঞ্ছনা-অপমান পাইয়া তাহা ফিরাইয়া দিবার প্রবৃত্তি রাখেন না, ন্যায়ের উপর শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। "অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তি-স্বরূপিণী" পঞ্চভ্রাতার পত্নী দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া তিনি বিবাহের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন, তিনি ভোগপ্রয়াসী নহেন—অন্য বিবাহ নিষ্প্রয়োজন। তিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পাশা খেলিয়াছিলেন। অধর্ম্মের আশঙ্কায় শকুনিকে কত অনুযোগ করিতেছেন কিন্তু যুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবেন না। নিজেকে পণে হারিবার পর তিনি অবশেষে দ্রৌপদীতে মমত্বাভিমান থাকায় কর্ত্তব্যবোধে তাঁহাকেও পণ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জীবন-যুদ্ধে যাহা কিছু সাংসারিক অধিকার-বৈভব সমস্ত পণ রাখিয়া যেন ধর্ম্মের নিজস্বরূপে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন মাত্র। নিজেকে হারিবার পর দ্রৌপদীকে পণ রাখার অধিকার লইয়া প্রাজ্ঞেরা তর্ক তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহাতে যোগদান করেন নাই, কর্ত্তব্যের ফল হইতে অব্যাহতির আশায় ধর্ম্ম তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করে না। তাঁহার রাজ্য পণ রাখিবার অধিকার ছিল কি না এ লইয়া আমরা তর্ক করিতে পারি, কিন্তু যে কালে রাজারা রাজ্য দান করিত, সে কালের লোক ইহা লইয়া তর্ক করা বোধ হয় অধর্ম্ম মনে করিত। এ প্রশ্ন তখন উঠে নাই। যুদ্ধও তাঁহার কর্ত্তব্য, তিনি ভারতযুদ্ধকালে কই অর্জ্জুনের মত দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করেন নাই। বিপক্ষ গুরুজনের অনুমতি লইয়া তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জীবনের যাহা কিছু প্রিয়, সব বিসর্জ্জন দিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিলেন। সংসারযুদ্ধে তিনি বিজয়াকাঙ্ক্ষী, কিন্তু দুর্য্যোধনের মত "ঈর্ষাসিন্ধু মন্থনসঞ্জাত জয়রস" পান করিয়া মত্ত হইবার জন্য বিজয়াকাঙ্ক্ষী নহেন। যুদ্ধে জিতিলেন, কিন্তু হৃদয়ের পঞ্জর যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সিংহাসনে বসিয়া প্রজা পালন করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন—রাজকর্ত্তব্য পালন করিলেন। কর্ত্তব্য সমাপনান্তে স্বর্গপথের পথিক হইলেন। ধর্ম্মের জয় বড় ট্রাজিক।

আমাদের মনে হয়, পাছে এত বড় ধর্ম্ম-মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে একেবারে অতিমানুষ ঠেকে, তাই কবি তাঁহাকে দিয়া ভারত-যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করাইয়াছেন। তিনি আপদ্ধর্ম্ম মানেন; উদ্যোগপর্ব্বে সঞ্জয়ের সহিত এই আপদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। বিপদকালে যখন এই আপদ্ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তব্য মনে করেন, তখন তিনি মহাজ্ঞানী কৃষ্ণের উপর নির্ভর করেন। এই কৃষ্ণের কথাতেই তিনি দ্রোণ-বধে একবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌশলাবলম্বন যে তাঁহার পক্ষে কতদূর অস্বাভাবিক তাহা তাঁহার 'হতগজপ্রকারের বিপন্ন অবস্থা হইতে সুস্পষ্ট হয়। এইস্থানে কবি, তাঁহার ঊর্দ্ধলোক-বিহারী রথচক্রকে পাপখিন্ন ধরিত্রীর সংস্পর্শে আনিয়া—তাঁহাকে মানবতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নির্ম্মল জ্যোতির উদগ্র শুভ্রতাকে একটু ধূলিমলিন করিয়া দিয়া তাঁহাকে আমাদের চক্ষে পরিচিতের মত করিয়া দিয়াছেন—তাঁহাকে "faultily faultess, icily regular, splendidly null বা এককথায় dead perfection, dead perfection হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই সূত্র ধরিয়া কবি তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে উঠাইবার সময় একবার নরক দর্শন করাইয়া মর্ত্ত্যের গ্লানিনির্ম্মোক হইতে মুক্ত ও শুভ্রস্বরূপ প্রদান করিয়া বিশিষ্ট কবিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

জীবনের নিম্নতল হইতে অন্ধকার স্তর ভেদ করিয়া দীপ্ত ধধূপের মত ঊর্দ্ধলোকে প্রয়াণ,—এরূপ চিত্রও না দেখিয়াছি, এমন নয়; কিন্তু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নিয়মের চক্রে পরিভ্রমণ—যুধিষ্ঠির চিত্র যেন এইরূপ—। তিনি স্বভাব-ধর্ম্মশীল—তাই জলের শৈত্যগুণের মত তাঁহার নিশ্চেষ্ট ধর্ম্মশীলতা অধঃপতিত আমাদের চক্ষে দৃঢ় না ঠেকিতে পারে। এখন যদি আমরা আমাদের মনের উপর সমষ্টিগতভাবে যুধিষ্ঠির-চরিত্রের প্রভাব লক্ষ্য করি তাহা হইলে এই স্তব্ধ সমুদ্রের মত প্রশান্ত, হিমাচলের মত অটল, সূর্য্যের মত তেজঃসম্পন্ন, মেঘের মত শ্যামস্নিগ্ধ, ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু, পূতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, এই কল্যাণ-কঠোরতাময় নির্ভীক ধর্ম্মভীরু সসঙ্কোচ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ মূর্ত্তিটী বড়ই সুন্দর ঠেকে না কি? ইহা বুঝি আর্য্য ভারতবর্ষের আত্মা ছানিয়া গঠিত করা হইয়াছে। ইহা কি আমাদের জাতীয় আদর্শ হইবার অযোগ্য? যখন কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

"কহ মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব-চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—"

তখন কি তাঁহার সম্মুখে আমরা যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি ধরিতে সঙ্কোচ বোধ করি? এ আদর্শ আমরা না চিনিতে পারিলে কি বলিব? জাতীয় অধঃপতন? না রুচিসাঙ্কর্য্য?

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাগ্য-পরিবর্ত্তন

মানুষের ইচ্ছা ও তাহার নিয়তি কখনো সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে না।

কিছুদিন হইতে ইন্দ্রনাথের অল্প-অল্প জ্বর হইতেছিল। বিকালের দিকে চোখ জালা করে, মাথা টিপ টিপ করে, আবার সন্ধ্যার পর বা রাত্রে সে ভাবটা কাটিয়া যায়। স্বভাব-শিথিল ইন্দ্রনাথ বুঝিতেছিল, এ ভাবটা ভাল নয়! অল্প-একটু কাশিও সময়-সময় দেখা যায়—তবু ঔদাসীন্যবশতঃ এ-সব সে গ্রাহ্য করিল না। মা তাহার এই অক্ষুধা, কার্য্যে আলস্য ও শারীরিক শীর্ণতা স্পষ্ট বুঝিতেছিলেন। বলিলে ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিত, "মার কেবল ভয়! তুমি যে কেবল ছায়ার পিছনে ছুটতে চাও।" বলিয়া মাকে সে থামাইয়া দিত। সে নিয়মিত স্নানাহার করিত; সারাদিন প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা চলিত, পড়া আর লেখা, লেখা আর পড়া—ইহারই কেবল সময়াভাব ছিল না—আলস্যও ছিল না—বরং শরীর যত খারাপ হইতেছিল, গ্রন্থ-রচনার উৎসাহ সেই পরিমাণে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কাত্যায়নী জোর করিয়া ডাক্তার আনাইলেন—ডাক্তার বিধিমত পরীক্ষান্তে যে রিপোর্ট দিলেন, তাহা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের চেয়েও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। ডাক্তার বলিলেন,—রোগ থাইসিস্। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর দূত একেবারে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহা গ্যালপিং টাইপের।

কাত্যায়নী বা ইন্দ্রনাথ কাহাকেও ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানানো হইল না; যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সহজ করিয়া বলা হইল। তবু ডাক্তারিতে অভিজ্ঞ ইন্দ্রনাথ চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ঔষধাদি দেখিয়া অনেকখানি অনুমান করিয়া লইয়া নায়েবকে ডাকিয়া উইল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। খবর শুনিয়া কাত্যায়নী মাথা কুটিয়া মাথা ফুলাইয়া ফেলিলেন। দেব-মন্দিরে নিত্য-পূজার বরাদ্দ বাড়াইয়া দিলেন, নায়েবকে ডাকাইয়া জানাইলেন, উইল-টুইল করা হইবে না। যাহাদের বয়সের গাছ-পাথর থাকে না, গঙ্গা-পানে পা বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারাই শুধু উইল করে—তাঁহার সোনার চাঁদ অন্ধের যষ্টি ইন্দুর কি এখন উইল করিবার বয়স! এই সব অনাচার ঘটিতে দিলে তাঁহার সাগর-সেঁচা মাণিকের অকল্যাণ ঘটিবে। দেওয়ান ইতস্তত করিতে লাগিলেন—দুদিন না হয় দেরীই হইবে,—করা যাইবে কি—! গৃহ-কর্ত্রীর আদেশ ত অমান্য করা যায় না—তাড়াতাড়িই বা কি এমন!

কিন্তু তাড়াতাড়ি তাঁহাদের না থাকিলেও অন্যত্র যে ছিল, তাহা শীঘ্রই স্পষ্ট বুঝা গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে ইন্দ্রনাথ কহিল, "মা, আমি তোমার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ সন্তান,—কেবল তোমায় দুঃখ দিয়েই গেলুম, সুখী করতে পারলুম না।"

কাত্যায়নী উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া অর্দ্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "ইন্দু, বাবা আমার, তোমায় পেয়ে আমি যে কি



সুপ্রভাত

অমূল্য নিধিই পেয়েছিলুম, সে কেবল আমিই জানি, বাবা। তুই যে আমার নারায়ণেরো উপরে রে—তাঁকেও যে আমি প্রাণ ভরে কখনো ডাকুতে পারিনা। তোর ভাবনাই আমার সবার উপর।”

ছেলের রোগশীর্ণ হাতখানি কাত্যায়নী বুকে চাপিয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথের মুদিত চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, “বড় ভুল করে ছিলো, মা, কাচের পুতুল পেয়ে বুকের ঠাকুরকে মাটীতে বসিয়ে ছিলে, তাই ঠাকুর আমার ভালর জন্যেই সে ভুল সুধ্‌রে দিলেন—আবার শীঘ্রই আমরা একত্র হব, মা,—কিন্তু ঐ অনাথ—”কাত্যায়নী দাঁত দিয়া জোর করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া কষ্টে কান্না চাপিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, “তুই ভাল হয়ে ওঠ্ ইন্দু, আমি কাশী গিয়েই থাক্‌ব। বিশ্বনাথের চরণে আমার সব লোভ সঁপে দেব বাবা, —সংসারের মায়া আর কোনদিনও করব না।”

“না, না, কাশী যাওয়া তোমার আর হবে না, তুমি বল, আমি চলে গেলেও—ওকে, ঐ অভাগা ছেলেটাকে তুমি ফেল্‌বে না,—ওকে তুমি মানুষ করে তুল্‌বে,—বল। ওর জন্যে যা ভেবে রেখেছিলুম, তার কিছুই করে যেতে পারলুম না। তবু তাঁর জন্যে আমার সব—”

বাকী কথা আর বলা হইল না। একটা আকস্মিক বেদনায় কিছুক্ষণের জন্য সে অভিভূত বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়া গেল। তারপর কতক-জ্ঞানে কতক-অজ্ঞানে আরও দুইটা দিন ও একটা রাত্রি কাটিয়া গিয়া দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় পরম শান্ত-মুখে শান্তভাবে ইন্দ্রনাথের আত্মা অনন্ত শান্তিতে মিলাইয়া গেল। ইন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত মনের ইচ্ছা—অরুণের ভাগ্য-নির্ণয় অমীমাংসিতই রহিয়া গেল। এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা স্মরণ করাইয়া দিল না, ইন্দ্রনাথেরও স্মরণ হইল না।

ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দেশের লোক হায়-হায় করিয়া অনেকে বলিল, এমন জমিদার আর হইবে না। পরের জন্য ভাবিতে, দীন-দুঃখীকে দয়া করিতে, সুখে দুঃখে, সহানুভূতিতে সকলের সহিত সম-চিত্ততায় দেশের জন্য দশের জন্য ভাবিবার লোক এমনটি আর জন্মাইবে না। প্রজারা তাঁর সত্য সত্যই সন্তান ছিল, আজ তাহারা পিতৃ-হীন হইল। সংসারে এইটুকুই বিচিত্র—যে দশের জন্য ভাবিত, সে কেবল নিজের জন্য ভাবে নাই।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিয়া গেলে বিস্ময়ের সহিত লোকে শুনিল, জমিদার দানপত্র বা উইল কিছুই করিয়া যান নাই। তাঁহার চরম ইচ্ছা মনে মনে সকলে জানিলেও মুখের কথা কিছুই কেহ পায় নাই। ইন্দ্রনাথের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা আলোকনাথ তাহার শ্রাদ্ধাধিকারী। উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই এখন বিষয়ের মালিক। পুত্রের ঐকান্তিক ইচ্ছা কাত্যায়নীর জানা ছিল, তবু আলোকনাথের দলের কাছে ও তাহার আনীত উকিলের সাক্ষাতেও তাঁহাকে অন্যের অনুরোধে একথা স্বীকার করিতে হইল যে সমস্ত বিষয় অরুণকে দিতে হইবে এমন কোন আদেশ মুখে বলিবার অবসর ইন্দ্রনাথ পায় নাই। শ্বশুর-কুলের বংশকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া অজ্ঞাত-কুলশীল একটা পথের ছেলেকে সমস্ত সম্পত্তির মালিক করা কাত্যায়নীর ধর্ম্মজ্ঞানেও বাধিতে ছিল। তবু ইন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছা

তিনি ভাল রকমই বুঝিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন যে-কথার লিখিত মূল্য নাই, সাক্ষী-সাবুদ নাই, সে কথা কেই বা কানে তুলিবে? আর তুলিবেই বা কেন? যে বংশের তিলক, যাহার হাতে জল-পিণ্ড মিলিল এবং ভবিষ্যতে মিলিবার আশাও রহিল, তাহাকে বাদ দিয়া অচেনা অজানা পথে-কুড়ানো—কে জানে হয়ত যাহার জন্ম রহস্য অনাবিষ্কৃত থাকাই তাহার পক্ষে মঙ্গলের হেতু,—তাহা-কেই কি না করিতে হইবে এত-বড় সম্পত্তির মালিক! এ যেন ঘুঁটে-কুড়ানীর পুত্রকে রাজহস্তীতে শুঁড়ে তুলিয়া রাজপাটে বসাইয়া দেওয়ার মতই! ইংরাজী-শিক্ষিত সাহেবী চালপ্রাপ্ত বংশগৌরব-বিস্মৃত ইন্দ্রনাথ যাহা করিতে পারিত—ন্যায়-বিচারক ভগবান ত তাহা পারেন নাই, তাই মরণকালে জমিদারের মাথায় শুভ বুদ্ধি দিয়া তিনি মহা পাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, আলোক-নাথকেও বাঁচাইয়া দিয়াছেন! নহিলে নিরপরাধ সে বেচারা ত একেবারেই ডুবিয়া ছিল। ফলে এত-বড় রাজসংসারে অরুণের মাথা গুঁজিবার মত এতটুকুও স্থান রহিল না। জমিদারের পালক পুত্র একদিন যে পোষ্যপুত্র রূপে বিষয়াধিকারী হইবে বলিয়া শত্রু-মিত্র কাহারো মনে সংশয় ছিল না,—আজ তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থার এই অভাব দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে মনে করিল, "এ হইল কি?" কেহ আন্তরিক কেহ বা মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া অরুণকে জানাইলেন যে তাহার এই অপূর্ব্ব ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাহারা সকলেই দুঃখিত। ইহার পর তাহাকে ভাগ্য-পরীক্ষার চরম অবসর দিয়া ইন্দ্রনাথের মৃত্যুর দ্বাদশ দিবসে কাত্যা-য়নী দেবীরও সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়া অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কাত্যায়নী দেবীর বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এক দিন অৰ্দ্ধ-অচৈতন্যের ন্যায় অভিভূতভাবেই তিনি পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে কে কি বলিতেছে, কে কি করিতেছে, কোন কথাই তাঁহার কাণে প্রবেশ করিতেছিল না। দেওয়ান অনেক বার তাঁহাকে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি তাহা শুনিয়াছেন মাত্র, চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। কেবল মধ্যে মধ্যে জলরাশি-স্ফীত চক্ষে ম্লান মুখে অরুণ আসিয়া নীরবে তাঁহার গা ঘেঁষিয়া কাছে বসিতেছিল, তখনই তাঁহার মনে পড়িতেছিল, সংসারের সহিত সব সম্বন্ধ এখনও তাঁহার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই, কিছু বাকী আছে। ইন্দ্রনাথের নয়ন-মণি এই অনাথটার জন্য আবার একবার তাঁহাকে এত বড় আঘাতের পরও খাড়া হইয়া উঠিতে হইবে। আবার বিষয়-সম্পত্তির কথা শুনিতে হইবে, বলিতে হইবে। হয়ত আদালত পর্য্যন্ত মামলা লড়িতেও হইবে। আর একদিন এমনি এক দারুণ শোকের ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াও তাঁহাকে গা ঝাড়িয়া উঠিতে হইয়াছিল। তবু সে দিন বয়সের অল্পতায় ভবিষ্যতের আশায় অবসাদ-গ্রস্ত চিত্তেও নব বলের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এখন এ জরাগ্রস্ত বাহুতে সে বল তো আর নাই! ইন্দু যে সেখানাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া গিয়াছে! এ সব চিন্তার সমাধান ত আর তাঁহাকে করিতে হইল না। ভগবান সকল চিন্তার অবসান করিয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা

উপকথায় শুনা যায়, যাদুকরের মায়া-যষ্টি-স্পর্শে রাজপ্রাসাদ অকস্মাৎ এক বিশাল অরণ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছিল! অরুণের ভাগ্যেও তেমনি অপূর্ব্ব উদাহরণ দেখাইল। ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নীর মৃত্যুতে যে শোকের ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহা শুধু তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিল না, সে ঝড় তাহাকে উড়াইয়া ধূলি-মলিন অনাবৃত পথের প্রান্তে ফেলিয়া দিয়া গেল। গভীর নিশীথে স্বজন-বেষ্টিত নিশ্চিন্ত সুখ-শয্যায় নিদ্রিত লোক যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখে, অগ্নিতপ্ত বালুকাময় মরু প্রদেশে কেবল একা সে পড়িয়া আছে, তখন নিজের অবস্থা প্রথমটা তাহার স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হয়। অরুণের মনে হইল, সে বুঝি চোখ চাহিয়া তেমনি স্বপ্ন দেখিতেছে! সে শুনিল, শুধু ঐশ্বর্য্য নয়, ইন্দ্রনাথের মরণে সে পিতৃহীন হয় নাই—শুধু আশ্রিত আশ্রয়-দাতাকে হারাইল মাত্র, সে তাহা নয়, তাঁহার সন্তান নয়, রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয় নয়,—সে অজ্ঞাত-পরিচয় অনাথ। আলোকনাথের দলের কাছে সে জানিল, ইন্দ্রনাথ তাহাকে স্বগোত্রে উন্নীত করিয়া লইলেও লোকে তাহা স্বীকার করিয়া লইবে না। দেশের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক হইয়া তিনিই যদি সমাজের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার চালাইতে চান, তবে অপরেই বা সুবিধা-স্থলে দৃষ্টান্ত না লইবে কেন? বিচারকের আসনে বসিয়া দেশের জমিদার যদি অবিচার করেন, ধর্ম্ম ও সমাজ রাখিবে কে! ঝড় সহিবার শক্তি আছে বলিয়াই না ভগবান বড় গাছের আশ্রয় সৃষ্টি করিয়াছেন। স্নেহের অনুরোধে এত-বড় অন্যায়কে ত প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। কোথাকার কুড়ানো ছেলে,—যাহার জাতি পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই, তাহারই সহিত একত্র পান-ভোজন শোয়া-বসা কেমন করিয়াই বা চলিতে পারে! না পারিলেও ছেলেটা আবার অভ্যাস-দোষে দুঃখ পাইবে। অতএব উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য উহাকে দূরে রাখিয়া দেওয়াই তাহার সদ্‌-যুক্তি মনে হইল। অবশ্য উহার জন্য ব্যয় যাহা হইবে, আলোকনাথই তাহা বহন করিবে। সত্যই ত আর অনাথকে ফেলিতে পারেন না। এখন ইচ্ছা করিলে দিন কিনিয়া লওয়া না লওয়া তাহার হাত! ছুতারের কাজ শিখিতে পারে—কাঁশা-পিতল ঢালা-ইয়ের কাজ শিখিতে পারে—আরো কত কি কাজ আছে। কাজের জন্য আবার ভাবনা! বাবুর বদান্যতায় মোসাহেব পদ-প্রার্থীর দল ধন্য ধন্য করিয়া কেহ বলিল,—বাবু আমাদের দয়াময়, নহিলে শত্রুকেও এত দয়া। শত্রু নহেত কি আর—একটু হইলেই ত সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া বসিতেছিল। কেহ বলিল, বাবু আমাদের স্বয়ং বৃহস্পতি,—কেমন বুদ্ধি বাহির করিলেন, দেখ না—জাতি বাঁচিল—উহার মনে দুঃখও দিতে হইল না। সাপ মরিল, লাঠিও ভাঙ্গিল না—এই আর কি!

নিরপেক্ষ দলের কেহ কিন্তু বাহবা দিল না। তাহারা যে জানিত কি আশায় ইন্দ্রনাথ এই ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিল! অরুণের প্রতি স্নেহ-শীল লোকের যে অভাব নাই, বুদ্ধিমান আলোকনাথ তাহা বুঝিয়াছিল। সেই জন্যই তাহাকে সে দূরে রাখিতে

চাহিতে ছিল। এ সংসারে স্বার্থপর কুটিলমতি কুপরামর্শ-দাতার ত অভাব নাই। কে কখন কুপরামর্শ দিয়া বিপদ বাধায় বলা ত যায় না কিছুই। বিশেষ ছেলেটাও আবার ইংরাজী-নবীশ। এ-সব লোককে কিছু বিশ্বাস নাই! ইহারা সবই করিতে পারে। সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্যই সে অরুণের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিল। নহিলে উহার জন্য এক পয়সা খরচ করিতেও তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। পুত্রশোকে হতবুদ্ধি কাত্যায়নী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু না ঘটিলে কে জানে, স্রোতের গতি এতক্ষণ কোন পথে বহিত!

এ-সব কথা অরুণের কানেও আসিয়া পৌছিত। সে ইহার উত্তর দিত না, ইহাতে ব্যথাও অনুভব করিত না। যে অসীম দুঃখে তাহার তরুণ হৃদয় পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেখানে সংসারের এ-সব তুচ্ছ লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখিবার জায়গাই ছিল না। সে যে ইন্দ্রনাথের পুত্র নয়, এ দুঃখের কাছে সব দুঃখই তাহার খাটো হইয়া গিয়াছিল। যে যজ্ঞ-সূত্র অমল শুভ্র সুগন্ধি পুষ্প-মাল্যের ন্যায় এখনও তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া দুলিতেছে, এখনও দুইবেলা সে যে গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করে, ইহাতে যথার্থ অধিকার আছে কিনা এমন সংশয়ও উঠিয়াছে! তাহার সম্মান লইয়াও কেহ কেহ কানাকানি করিতেছে! সে এ-সংসারের কেহ নয়! জমিদার ইন্দ্রনাথের পুত্র নয়, ময়ূর-পুচ্ছধারী কাকের মত এতদিন কেবল পরের ঐশ্বর্য্যের তলে নিজেকে সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এইবার তাহার বাহিরের খোলসখানা খুলিয়া গিয়া সত্যকার রূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে! সে একটা অনাথ ছেলে—পথের ভিখারী! কে জানে, কোথায় কোন্ পর্ণকুটীরে তাহার অজানিত পিতা হয়ত এখনও তাহাকে স্মরণ করিয়া দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিতেছেন! তাঁহাদের মনের মধ্যে আজও সে বাঁচিয়া আছে। অথবা অসীম জলরাশির তলে তাঁহাদের অনন্ত শয্যা সেই কাল রজনীতেই বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে! হায়, কে তাহাকে জানাইয়া দিবে—সে কে—কোথা হইতে ঝড়ে উড়িয়া আসিয়া এই স্নেহের খাঁচায় বন্দী ছিল! ভাগ্য-বিপর্য্যয় অনেকের হয়—সুখ-দুঃখ-ভোগও জীব-মাত্রের কর্ম্মাধীন। অরুণও এ-সব তত্ত্ব-কথা বুঝিত না, কেবল বুঝিত, এমন করিয়া তাহার ন্যায় জাতি-গোত্র হারাইয়া কেহ সর্ব্ব-হারা হয় কি না!

তাহার প্রতি স্নেহ-শীল কর্ম্মচারীর দল অনেকে তাহাকে পরামর্শ দিল, "খোকা-বাবু মকর্দ্দমা করুন—বিষয় ফিরে পাবেন। এ রাজার রাজ্যিপাট ছেড়ে কেন মিথ্যে রামচন্দ্রের মত বনে যাবেন! বাবুর ইচ্ছে ত আমরা সব জান্‌তুম। আমরা সাক্ষী দেব—সময় পেলেন না বৈ ত নয়—নইলে মাঠাকুরুণকে যা বলেছিলেন, তা আমরা স্বকর্ণে শুনেচি। বলে, যার ধন তার ধন নয়—এ যে দেখি তাই হচ্ছে—অনুমতি দিন, আমরা ত আছি।"

দাঁতে জিভ কাটিয়া অরুণ অসম্মতি জানাইল। "ছিঃ, মকর্দ্দমা কার সঙ্গে করতে বলেন! ওঁর যে ন্যায্য পাওনা! ধর্ম্মতঃ যদি আমার কোন দাবী থাকত, তাহলে বাবাও তা করতেন—মাও সময় পেতেন।

যেখানে জজকোর্ট হাইকোর্ট প্রিভিকাউন্সিলে ধাপে-ধাপে বিচার, সেখানকার আদালতে বিচার-বিভ্রাট অনেক হয়, কিন্তু যেখানে এক-ছাড়া উপায় নেই, সেখানকার বিচারক ভুল করেন না।"

যুক্তি বলিত, ঠিক হইয়াছে। মনকে ধমক দিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া সে বলিতে চায়, মিথ্যার আবরণ ফেলিয়া সত্যকার মানুষ হইয়া তুমি যে দাঁড়াইবার অবসর পাইলে, এ তোমার পক্ষে ভালই হইল। তবু ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাটলে জন্মিয়া যে-সব আগাছা ভিত্তি-মূল পর্য্যন্ত শিকড় গজাইয়া তোলে, তাহাদেরই মত মনের অতি-নিভৃত অংশে গোপনে বসিয়া নৈরাশ্য বলিত, বুঝি, এতটা না হইলেও চলিতে পারিত। ঐশ্বর্য্য! ছাই ঐশ্বর্য্য—সে আজ অর্থের জন্য তো কাতর নয়! তাহার কাতরতা জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত যাহাক সে অস্থি-মজ্জায় মিশাইয়া পিতা বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, যাঁহার অভেদ্য স্নেহ-দুর্গের অভ্যন্তরে বসিয়া এত-বড় বিপ্লবের সংবাদও তাহার কর্ণগোচর হয় নাই! যে সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী স্নেহময়ীর মাতৃস্নেহের অক্ষয় বর্ম্মে আবৃত হইয়া তাহার শৈশব-জীবন অতিবাহিত হইল, তাঁহারা তাহার কেহই নহেন! আর একমাস পূর্ব্বে সে যাহার নামও শোনে নাই, সেই আলোকনাথই তাঁহাদের আত্মীয়তম। এই গৃহ, এই গৃহের প্রত্যেক ইট-কাঠখানি পর্য্যন্ত—যাহারা তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সহস্র সুখ-দুঃখের সহিত জড়িত স্মৃতিচিহ্ন—সেই এই-গৃহের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই! সুসজ্জিত গ্রন্থশালায় ঝকঝকে বাঁধানো বইগুলির মধ্যে বেশী বইয়ে তাহারই নাম স্বর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত। ঘরে-বাহিরে তাহারই নানা বয়সের নানা বেশের সজ্জিত আলোক-চিত্র ও তৈল-চিত্রের সমাবেশ। পাঠাগারে তাহারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য মূল্যবান কক্ষ-সজ্জা। এ গৃহের প্রত্যেক জিনিষটি এত দিন সে সম্পূর্ণরূপে নিজের বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছে। কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে এ-সব দুদিনের খেলা। অভিনেতা সাজিয়া সে যেন এতদিন অভিনয় করিতেছিল, সাজ-সজ্জা খুলিয়া রং-রাংতা মুছিয়া ভাল মানুষটির মত এইবার তাহার বাড়ী ফিরিবার পালা। কেবল জ্ঞান ও অজ্ঞানের ব্যবধান। তাহার চিরদিনের সুখ-দুঃখ আশা-স্মৃতি-মণ্ডিত স্নেহ-ভবন,—আজ আর তোমার কোলে অরুণের এতটুকু স্থান নাই। কোথাকার নগণ্য বিদেশী বালক—আজ আর এ গৃহের, এ সংসারের এখানকার সমাজের কেহ নয় সে! বিদায়, হে আমার চির-প্রিয়তম স্নেহময় আশ্রয়-নীড়, আমার করুণাময় আশ্রয়-দাতার স্বর্ণ-মন্দির, তোমার কাছে অনাথ বালক আজ চির-বিদায় মাগিতেছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী

নোলক

কে তুমি আমারে কহ,
রে ক্ষুদ্র নোলক!
কে তুমি মানস-চোরা,
ঝলকিছ নয়ন-পলক?

নহ এক রতি—
রহস্য প্রচুর তব
রে উজ্জল মোতি!

কে তুমি ?—তুমি কি কোন
বালিকা-বধূর
ফুল-শয্যার সেই
প্রণয়ের পরশে মধুর
ঠোঁট দুইখানি,
বেষ্টিত—জড়িত সুপ্ত
মৌন মধু বাণী।

কে তুমি ? তুমি কি কোন
রাজ-প্রেয়সীর—
ক্রন্দনে মুকুতা-ঝরা
নির্ব্বাসিতা সতীনের ঝির,
অশ্রু একফোঁটা—
উছসিত উথলিত
ব্যথাখানি গোটা !

অশ্রু নহ, অশ্রু নহ,—
তুমি যে পুলক,
সুরসিকা অপ্সরার
অন্তরের সুখের দোলক,
তরঙ্গ নাচের
কোন্ পারিজাত-বনে
মধু উৎসবের !

অথবা প্রেমের জ্যোতি
রতির চোখের,
মুরছিয়া আছ তুমি
যখন সে ভোলা মহেশের
কোপে বর-তনু
ছাই হ'ল—ভস্ম-শেষ
হ'ল ফুল-ধনু !

কিম্বা বঙ্গ-বধূটির
শুভ্র লাজখানি,
রাঙা হ'য়ে উঠিতেছ
ওষ্ঠ-পুটে বুঝি অনুমানি'
দয়িতের পাণি
সহসা ঘেরিছে সেই
বক্ষে নিতে টানি !

আঁখি-সিন্ধু বিমথিত
লো ধবল মোতি,
ছেলেখেলা খেলে গেছে
কিছুক্ষণ বুঝি লক্ষ্মী-সতী
নধর অধরে—
প্রবালের দ্বীপে বসি'
প্রফুল্ল অন্তরে !

সাতটি কড়ায়ে তব
পুরিত অমৃত,
দৃষ্টি-ভোগে মিষ্টি তুমি,
আজ আমি বড় যে তৃষিত,
আঁখের পলক
ফিরাতে—ফিরাতে নারি
আমি রে নোলক !

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

Non-violent non-co-operation.

সুখ।

একেবারে গোড়ার কথা থেকে সুরু করা যাক্—যে কথা সকলেই বুঝবে। মানুষ কি চায়? নানা মুনির নানা মতের তর্ক-বিতর্ক এক পাশে সরিয়ে রেখে মোটের উপর এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে সে সুখ চায়। কিন্তু সুখ যে কাকে বলে? তার লক্ষণ ও পথ কি? এ সম্বন্ধেও মানুষের বুদ্ধি নানা মতের জটিল অরণ্য রচনা করে বসেছে। যাহোক এই জঙ্গলের মধ্যে বৃদ্ধ মনু যে কথাটা দেখিয়ে দিচ্ছেন সেটা ধরে গেলে গন্তব্য স্থানে ঠিক-মত পৌছতে পারা যাবে, আমার এই বিশ্বাস। তিনি বলেন,—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥"

অধীনতা ও স্বাধীনতার মাত্রার ওজনে সুখ-দুঃখের বিচার করতে হবে। সে হিসাবে আমাদের মতো দুঃখী আর নাই। কারণ, পরবশতা হিসাবে আমরা পৃথিবীর সকলেরই উপরে অর্থাৎ নীচে।

সংসারে মানুষ হয়ে জন্মালেই কতকটা পরবশতা অপরিহার্য্য। কেবল অপরিহার্য্য নয়—আত্মার বিকাশ ও লীলার পক্ষে অত্যাবশ্যক। (১) জড়শক্তির অধীনতা; (২) কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তির অধীনতা; (৩) সমাজের অধীনতা; (৪) রাষ্ট্রতন্ত্রের অধীনতা। এই সব রকমের অধীনতার যেটুকু মানুষ আপন আত্মার বিকাশের অনুকূল জেনে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়, সেটুকু তার আত্মারই সামিল হয়ে ওঠে। সুতরাং তার পরবশতা লক্ষণ ঘুচে গিয়ে সেটা স্বাধীনতা হয়েই দাঁড়ায়। তার বেশী যে অধীনতা তাই আত্মার পক্ষে পীড়াদায়ক। তার ফল দুর্ব্বলতা, অবসাদ ও পরিণামে মৃত্যু।

ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির অধীনতার কথা আলোচনা করার দরকার নাই। সে সম্বন্ধে আলোচনার কোনও দেশেই অভাব নাই—ফল যাই হোক্‌না কেন। চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্যের অভাব যে সব রকম মুক্তির পথের অন্তরায় সে-কথা সকলেই বোঝে। ওটা ছেড়ে দিলে আমাদের স্বাধীনতা, স্বরাজ বা মুক্তি লাভের পথে প্রধান বাধা তিনটী। (১) একটী বিপুল প্রাচীন সভ্যতার প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান রীতিনীতির বিষম বোঝা; (২) আর একটী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি বস্তু-প্রধান, আয়োজন-বহুল, স্বার্থমগ্ন, বিলাস-জর্জ্জর, দ্বন্দ্বপরায়ণ সভ্যতার সাংঘাতিক বিষস্পর্শ; (৩) বিদেশী রাষ্ট্রতন্ত্রের বিপুল-কায় হৃদয়হীন শাসন-যন্ত্রটার অসংখ্য চাকার দারুণ নিষ্পীড়ন। এই তিন রকম অধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল—ভয়, লোভ, মোহ, মিথ্যা, দ্বেষ-হিংসা, দারিদ্র্য, সংকীর্ণতা ও নৈরাশ্য। এক কথায় দুর্ব্বলতা ও অবসাদ। আত্মবশে সুখ। আত্মা বলহীনের লভ্য নয়। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সুখ অসম্ভব। সুখ লাভ করতে হলে আমাদের স্বরাজ চাইই।

সার্থকতা।

সুখই কি মানুষের জীবনের শেষ কথা? তার অসীম আকাঙ্ক্ষা কি সুখের মধ্যেই সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারে? তাহলে এ-সব কেন? এই আকাশের চেয়ে উদার প্রাণের বিস্তার—সমুদ্রের চেয়ে অতল প্রেমের গভীরতা—এই প্রতিমুহূর্ত্তের পুঞ্জপুঞ্জ মৃত্যুর উপর জয়ী অমৃতের পিপাসা? আমাদের বহু প্রাচীন পিতামহদের তপোবনের পবিত্র হোমাগ্নির যে শেষ শিখাটী বহু ঝঞ্ঝা-বিপ্লবের মধ্যে রক্ষা পেয়ে এসেছে, জগতের মহাশান্তি-যজ্ঞে হিংসা বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব অশান্তির শেষ আহুতি হওয়ার পূর্ব্বেই কি হঠাৎ সে শিখা নিবে যাবে? মানুষের বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত ব্যথাক্লিষ্ট তৃষাদীর্ণ প্রাণ কিছু না জেনেও নিগূঢ় সংস্কারবশেই চেয়ে আছে—এই ভারতবর্ষের দিকে শান্তিবারির জন্য। তাদের সে আকাঙ্ক্ষা কি ব্যর্থ হবে? আমাদের পরম সার্থকতা লাভ করতেই হবে। ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে। আমাদের জীবন-দেবতার অদৃশ্য অঙ্গুলির তাই ইঙ্গিত। কিন্তু এই জগদ্দল পাষাণের তলে নিত্য নিষ্পেষিত ক্ষীণ-প্রাণ, দীন আশা, ভয়-বিমূঢ় ক্লিষ্ট জাতির পক্ষে সে আলো জ্বালিয়ে রাখা অসম্ভব যাতে সমস্ত জগৎ পথ দেখতে পাবে—সে অমৃতের ধারা বহিয়ে দেওয়া স্বপ্নমাত্র যাতে সমস্ত বিশ্বাসী প্রাণ পাবে। সুতরাং আমাদের স্বরাজ চাইই।

স্বরাজঃ—সিংহাসনের সম্রাট থেকে পথের মুটে-মজুর পর্য্যন্ত সকলের মুখেই আজ স্বরাজের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সকলের এ সম্বন্ধে ধারণা একও নয় পরিষ্কারও নয়। আমরা যে জিনিষ পাওয়ার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হচ্ছি, সে জিনিষটা আসলে কি এবং আমাদের অত-বড় ত্যাগের যোগ্য কি না—সেটা ভাল করে গোড়াতেই বুঝে দেখা দরকার।

১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বরাজ বা ইম্পিরিয়াল স্বরাজ;—আমাদের বিদেশী প্রভুরা হিছুদিন থেকে ক্রমাগত বোঝাচ্ছেন "তোমরা ভাল ছেলের মত বিধিসঙ্গত ভাবে (অর্থাৎ তুড়ুম ঠোকার যত আইন ও বে-আইন এখন আছে ও ভবিষ্যতে হবে সে দিকে নজর রেখে) যদি তোমাদের ন্যায্য দাবী জানাও ও আমাদের দেওয়া রিফরমকে সাতরাজার ধন মাণিক ভেবে সন্তর্পণে রক্ষা কর, তাহলে কালক্রমে ঔপনিবেশিক স্বরাজ (colonial self-government) তোমাদের ঠোঁটের গোড়ায় ধরে দেওয়া যাবে।" আমাদের অনেক হোমরা-চোমরা মহারথীও সেই শুভ দিনের স্বপ্ন দেখছেন। কর্ত্তারা সত্যসত্যই ও জিনিষ আমাদের দেবেন কিনা, দিতে পারেন কিনা এবং দিলেও আমরা পাবো কিনা সে বিচার পরে কোরবো। আপাততঃ দেখা যাক, ও জিনিষটার প্রকৃতি কিরূপ এবং ওর মূল্যই বা কত? উক্ত স্বরাজ যদি সত্যই পাই তাহলে আমাদের ঘরকন্নার কাজ-কর্ম্ম অবশ্য আমরা নিজেদের বিবেচনা বা মর্জ্জিমত চালাতে পারবো। আমাদের পাঁটা আমরা ঘাড়ের দিকে বা ল্যাজের দিকে যে দিকেই কাটিনা কেন, কেউ আটক করতে আসবেনা। তবে সাম্রাজ্যের বড় বড় চুরি ও ডাকাতির কাজে আমাদের

ধন-জন দিয়ে সাহায্য করতে হবে। অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল বাণিজ্য-নীতি ও যুদ্ধ-নীতিতে আমাদের যোগ দিতে হবে। যুদ্ধ ও বাণিজ্য নীতির এরূপ নাম্-করণ অশিষ্টতা নিশ্চয়ই কিন্তু অসত্য কদাচ নয়। যাই হোক ইম্পিরিয়াল নীতি বৃদ্ধ বয়সে যদি তপস্যায় ব্রতী না হয়ে থাকে—আয়রলণ্ড, মিসর ও ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে দেখলে সেরূপ লক্ষণ তো কিছু নজরে পড়েনা—তাহলে তার সংশ্রবে থাকা কোনও চরিত্রবান ভদ্র-সন্তানের পক্ষে গৌরবজনক হতে পারে না।

২। সাধারণ স্বরাজ—অনেক লোক আছেন যাঁরা মনে মনে স্বরাজের কামনা করেন কিন্তু তাঁদের ঈপ্সিত স্বরাজের কোনো নির্দ্দিষ্ট চেহারা নাই। পরের তাঁবেদারী হতে রক্ষা পাওয়া ও পাঁচটা সুসভ্য স্বাধীন দেশের মতো ব্যবসা-বাণিজ্য, কারবার-কারখানা সন্ধি-বিগ্রহাদি চালাতে পারাটাই তাঁরা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করেন। ইংলণ্ড আমেরিকা জাপানাদি দেশের—সালোক্য-লাভ তাঁদের রাজনৈতিক সাধনার চরম মোক্ষ। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার চেয়ে এ অবস্থা যে শতগুণে শ্রেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুকে-হাঁটা জীবেরা জীব-জগতের সব চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর—তাদের মধ্যে যারা রুদ্ধ মনের আক্রোশে বিষ সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছে, তারাও। যারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে চলে তারা নিশ্চয়ই অনেক উঁচু। গরিলা শিম্পাঞ্জি বাঘ ভালুক এমন কি শৃগাল পর্য্যন্ত। তবুও এ কথা না বলে থাকা যায়না যে ঝোড়ো হাওয়াতে বড় বড় সভ্য স্বাধীন জাতের পেশাদারী থিয়েটারী পোষাকটা সরে গিয়ে যখন তাদের আসল নগ্ন চেহারার কিয়দংশও চোখে পড়ে, তখন সেটাকে এমন মনোরম জিনিষ বলে মনে হয় না যে তার অভাবটাকে জীবনের পরম দুর্ভাগ্য ভেবে বুক ফেটে মরতে পারা যায়। সর্ব্বস্ব পণ করবো কিসের আশায়? সুখ শান্তি, আরাম স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করবো কোন্ লোভে? জগতের হানাহানি রেষা-রেষি রক্তারক্তির পরিমাণ আর একটু বাড়াবার জন্য? আমি তো এ চিন্তায় কোনও উৎসাহ পাইনে।

এই দলের কারো কারো আকাঙ্ক্ষার দৌড় আবার আর-একটু বেশী। তাঁরা আপনাদিগকে কেবলমাত্র ইংরাজের সমকক্ষ মনে করেই যথেষ্ট তৃপ্তি পান না। ইংরাজের সম্পূর্ণ নাজেহাল অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করতে না পারলে তাঁদের স্বরাজ ছবিখানি নিখুঁত হয় না। এ মনোভাবটা মনুষ্য সভ্যতার উত্থান অবস্থায় অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। মাংস শব্দটার আভিধানিক অর্থ যে আমায় এখন খাচ্ছে তাকে আমি পরে খাবো। শীকারের পক্ষে শীকারীকে শীকার-রূপে কল্পনা করার একটা দুর্দ্দমনীয় লোভ আছে। তবুও এ কথা ভুললে চলবে না যে শীকার হওয়ার চেয়ে শীকারী হওয়ার গৌরবটা যে খুব বেশী এমন মনে করার বিশেষ কারণ নাই। হিংসা কাণ্ডের ও দুটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ পিট আর ও পিট।

৩। কংগ্রেসী বা পার্লামেণ্টারী স্বরাজ—সহযোগিতা-বর্জ্জনের পথ দিয়ে এক বৎসরের মধ্যে যে স্বরাজ লাভ করার জন্য কংগ্রেস

সমস্ত দেশকে আহ্বান করছেন তার আকার-প্রকার চাল-চলন সম্বন্ধে তিনি কোনও বিস্তৃত বা পরিষ্কার আলোচনা করেন নি। ইচ্ছা করেই সে বিষয়ে নীরব থেকে গেছেন। কারণ এখন সেটা মুখ্য লক্ষ্য নয়। অবান্তর বিষয়ের আলোচনা-সূত্রে নানা মতের ধূলো উড়িয়ে আসল লক্ষ্যটাকে আড়াল করে ফেলা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় নয়—কাজ পণ্ড করারই পন্থা।

আমাদের সমস্ত দুর্দ্দশার ও অপমানের কারণ আমাদের একান্ত অসহায় ভাব ও পরের উপর নির্ভর করে থাকা। এই সাংঘাতিক পরবশতাটাকে সম্পূর্ণ দূর করে জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন তার পথ। এই পথে আমরা যত অগ্রসর হ'তে থাকবো, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও তার ব্রত এবং লক্ষ্যের চেহারাটা ক্রমশঃ ততই পরিষ্কার হয়ে আসবে। এখন ঘরে বসে সে সম্বন্ধে নানা থিওরী খাড়া করা কেবলমাত্র কাজ না করা নয়, দস্তুরমত অকাজ করা। তবে ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে কংগ্রেস এইটুকু ইঙ্গিত করেছেন যে, সেটা দেশ-কালানুযায়ী কোনও একরকমের গণতন্ত্র হবে। ইংরাজের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ দাঁড়াবে, সেটাও কংগ্রেস ভবিষ্যতের উপর ফেলে রেখেছেন। তবে তাঁবেদারী যে বিন্দু-মাত্র থাক্‌বে না, সে কথা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। কাজেই সম্বন্ধটা নির্ভর করবে ইংরাজের সুবুদ্ধির উপর। ইংরাজ যদি প্রভুত্বের তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তে নেমে এসে সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের ও দশের সেবায় লেগে যেতে পারেন, ভাল কথা। না পারলে তাঁকে অগত্যা অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। একা একা তো আর প্রভুত্ব চলে না।

কংগ্রেস যদিও ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য, ব্রত ও কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, তাঁর মনোগত অভিপ্রায় গোপন থাকে নি। এটা অবশ্য কংগ্রেস নিশ্চয়ই আশা করেন স্বাধীন ভারত পৃথি-বীর দুর্ব্বলদিগকে স্বাধীনতা দান করতে যদি নাও পারে, স্বাধীনতা-হরণটাকেই স্বাধীনতার চরম গৌরব বলে মনে করতে পারবে না। দুর্দ্দমনীয় শক্তি-দম্ভ ও বিশ্বন্তর লোলুপতা নিয়ে পৃথিবীর বুকে একটা উৎপাতের মতো বিরাজ করবে না। কংগ্রেস স্বরাজ-লাভের যে পথ নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন তা' থেকেই এর সূচনা পাওয়া যাচ্ছে। এ পথ ত্যাগের পথ, সংযমের পথ, বিনম্র ধৈর্য্যের পথ। উত্তেজনা, অধৈর্য্য বা উপদ্রবের কোনও স্থানই এতে নাই। এর যা-কিছু উৎপীড়ন, সে কেবল নিজের বিলাস, আরাম, আলস্য ও জবরদস্তি ভাবের উপর। অপরের প্রতি নয়। মহাত্মা গান্ধী বার বার এ পথকে জাতীয় শুদ্ধি বা National Purification নামে অভিহিত করেছেন। এই শুদ্ধির প্রক্রিয়া যত অগ্রসর হবে আমাদের শক্তির পরিমাণ ততই বাড়বে, ব্যুরোক্রেসীর বন্ধন ততই আল্গা হবে। এ পথে যদি স্বরাজ লাভ হয়, তাহলে তার পূর্ব্বেই জাতির চরিত্র, ত্যাগে, সংযমে, ধৈর্য্যে, সহিষ্ণুতায়, ক্ষমায় এমনভাবে গড়ে উঠবে

যে তার পক্ষে অপরের প্রতি উৎপীড়ন একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

৪। মহাত্মা গান্ধীর উদ্দিষ্ট স্বরাজ—মহাত্মা গান্ধী আপনার অন্তরের অন্তরে যে স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, যে স্বরাজের সাধনা তাঁর জীবনের একনিষ্ঠ মহাব্রত সে স্বরাজের আদর্শ উল্লিখিত আদর্শগুলির চেয়ে অনেক উঁচু। এত উঁচু যে আপাততঃ অসম্ভব বলেই বোধ হয়। তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' নামে গ্রন্থে এই স্বরাজের আদর্শ ও সাধনার পথ নির্দেশ করেছেন। Indian Home Rule নামে তার অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। বইখানি সকলকেই পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। মতের মিল সম্পূর্ণ না হলেও একটা বিপুল মুক্ত বিশ্বচেতন মানবাত্মার সংস্পর্শ মনের উপর উষার আলো ও সমুদ্রের উদার হাওয়ার মতো কাজ করবে। এ স্বরাজ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক স্বরাজ নয়। ইহা সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক। আত্মজ্ঞান, আত্মজয় ও আত্মশুদ্ধি এর সাধনার পথ। মোক্ষ বা জীবন্মুক্তি এর লক্ষ্য। চিত্তের এ অবস্থা লাভ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ অতি তুচ্ছ। একদিনেই তা সম্পন্ন হতে পারে—এক বৎসর লাগে না। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই সনাতন কষ্টিপাথর—যেনাহং নামৃতা-স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্—অকুণ্ঠিতচিত্তে বর্ত্তমান সভ্যতার বিপুল আয়োজন স্তূপের মূল্য নিরূপণে প্রয়োগ করেছেন এবং তার অনেকগুলিকেই বর্জ্জন করেছেন। কাজেই সাধারণ লোকের পক্ষে এ আদর্শ গ্রহণ করা কঠিন। মহাত্মা গান্ধী নিজেও সে কথা বোঝেন। সে জন্য উহা গ্রহণের জন্য তিনি এখনও দেশকে আহ্বান করেন নি। তাঁর নিজের মানসী আদর্শ রূপেই উহা এখন বিরাজ করছে। তবে তিনি এই আশা পোষণ করছেন যে রাজনৈতিক স্বরাজ লাভের দ্বারা দেশ যেদিন চিন্তার ও জীবনের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে সেদিন এ আদর্শ গ্রহণের সময় আসবে। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি এই :—' Now though I do not want to withdraw a single word of it, I would say to you on this occasion that I do not ask India to follow out today the methods prescribed in my booklet. If they could do that they would have Home Rule not in a year but in a day···But it must remain a day—dream more or less for the time being".

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

একখানি চপ

'একখানা চপ্ দিন না—' বোলে ইস্কুল-ফেরত একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে একটা চেয়ারের উপর বোসে পড়লো।

চেয়ারের এক দিক্‌কার হাতাকে ভাত ফোটাবার জন্যে সদ্‌ব্যবহার করা হচ্ছে। যে হাতাটা আছে, সেটাও ঘাম আর তেল

লেগে বেশ মোলায়েম আর কালো হয়ে এসেছে। পায়ায় দুটো টিনের তাপ্পি। চেয়ারের নীচে সিমেণ্ট কোথাও আছে, কোথাও পায়ের কাদায় খোয়া ভরাট হয়ে গিয়ে সিমেণ্টের লেভেলে এসে পৌঁছেচে, কোথাও বা ছাড়িয়ে উঠেচে! সামনের তেপায়া টেবিল এখন দু'পায়ে দাঁড়িয়েছে। মার্টিন কোম্পানির শেওলা-ধরা একখানা আধলা ইট টেবিলের আর-একটা পায়ার স্থান অধিকার কোরে কোনো গতিকে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। হোটেল-ওয়ালা গুণ-চটের পর্দ্দায় হাত মুছ্‌তে মুছ্‌তে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি চাই? একখানা চপ্?'

সামনের আর-একটা টেবিলে দুজনে খাচ্ছিল, ছেলেটি তাই দেখছিল। তারা অনবরত চপ্ আর কাটলেট মুখের মধ্যে পুরে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে একেবারে আধখানা চপ ভেঙ্গে ফেলচে, কিছুমাত্র দ্বিধা কর্‌চে না। ছেলেটি, একেবারে আধখানা চপ্ যে কি রকম কোরে ভাঙ্গা যেতে পারে, তাই ভাবছিল। এমন সময় হোটেল-ওয়ালা কানা-ভাঙ্গা একটা পিরিচে একখানা চপ দিয়ে বোল্লে, 'এই নাও তোমার চপ্।'

দুদিনের খাবারের পয়সা জমিয়ে সে আজ এই চপ্ খেতে এসেছে। আজ চপ খাওয়া হলে কাল আর সে খেতে পাবে না। আবার সেই পরশু, সে কি দু এক ঘণ্টার কথা? সবে সে চপের একটি কোণ ভেঙ্গে মুখে পুরেছে, এমন সময়ে পিছন থেকে তার ক্লাসের এক বন্ধু ডেকে উঠ্‌ল, 'কিরে অমিয়, কি খাচ্ছিস্! আমায় খাওয়াবি না কি?' বন্ধুর ডাকে সে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। কোনো গতিকে তার সবে-কেনা একখানি চপকে ঢেকে ফেলে চোখ পিট্ পিট্ কর্‌তে কর্‌তে সে তার বন্ধুর দিকে তাকালে।

'কি খাচ্ছিস্, বল্ না!'

'কিছু না ভাই। সত্যি! মা কালির দিব্বি! আমি কিছুই খাইনি, শুধু এক পেয়ালা চা।'

"ওঃ, চা তুই খেগে যা। আমি চা খাই না। আমি বাড়ী চল্লুম।'

বন্ধুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে চপের আর এক-টুকরো ভেঙ্গে মুখে দিয়েছে, এমন সময়ে হোটেল-ওয়ালা চেঁচিয়ে উঠলো, "শিগ্‌গির কোরে খেয়ে নাও না ছোকরা! দেখচো না, খদ্দের বসে রয়েছে।"

ছেলেটি ছল্ ছল্ কোরে চপের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। তখনো আধখানা চপ্ তার খাওয়া হয় নি। তার প্রাণটা প্রায় ফেটে যাচ্ছিল—ঐ আধখানা চপ্ একেবারে খেতে। আধখানা চপ্ খেয়ে ফেলার চেয়ে হোটেল-ওয়ালার বকুনি খাওয়া ঢের ভালো!

একটুকরো ভাঙ্গতে যাচ্ছে, এমন সময় খোলার চালের উপর থেকে খানিকটা ঝুল এসে সেই আধ-খাওয়া চপের উপর পড়লো।

অমিয়র আঙুল-কটা কেঁপে উঠ্‌লো। মুখ তার মলিন হয়ে গেল। টেবিলের উপর থেকে শূন্য হাত ফিরে এল; চপের একটা টুকরোও তার সঙ্গে এল না।

দুদিনের জমানো ভোরের বেলার চিন্তা তার একখানি চপ—তাও শেষ করা হ'ল না!

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

চয়ন

রঞ্জন-রশ্মি

রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কারক প্রফেসার C. W. Rontgen অল্পদিন হ'ল অবসর গ্রহণ করেছেন। ১৮৯৬ সালে তিনি এই অদ্ভুত রশ্মির অস্বচ্ছ জিনিসের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা দেখিয়ে পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। যখন বাতাস-শূন্য একটা কাঁচের টীউবের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রীক প্রবাহ চল্‌তে থাকে, তখন এই অদৃশ্য কিরণ উৎপন্ন হয়। এ কিরণ চোখে দেখা যায় না। কারণ এ প্রায় সকল জিনিসের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে যায়, এর আলো প্রতিফলিত হতে পারে না। কিন্তু actinic rayর মত ফটোগ্রাফের প্লেটের ওপর রঞ্জন-রশ্মির ক্রিয়া বোঝা যায়।

রঞ্জন-রশ্মি দিয়ে ছবি নেবার সময় প্লেট আর Z' Ray bulb-এর মাঝখানে ছবি তোলবার জিনিস রাখা হয়। তারপর bulb-এর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক্‌ প্রবাহ চলতে থাকে। প্লেটের উপরে যে ছায়া পড়ে সেই ছায়াই রঞ্জন-রশ্মির ছবি।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রঞ্জন-রশ্মির অনেক উন্নতি হয়েছে। কয়েক বৎসর আগেও মানুষের শরীরের হাঁটু, মাথা ইত্যাদি জায়গার ছবি নিতে হ'লে অনেকক্ষণের জন্য exposure দিতে হ'ত। কিন্তু এখন যে-কোন জায়গার ছবি instant exposure-এই খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমেরিকার ডাঃ কুলিজ এই রশ্মির অনেক উন্নতি সাধন করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত Bulb-এর রশ্মি পূর্ব্বেকার চেয়ে অনেক-বেশী তীব্র আর অনেক-বেশী কার্য্যকর। এই নতুন Bulb-এর সাহায্যে ১/১০ থেকে ১/১০০ সেকেণ্ডের মধ্যে ছবি নেওয়া যায়। রঞ্জন-রশ্মির সামনে শরীরের কোন অংশ বেশীক্ষণ রাখা ক্ষতিকর। আজকাল এই নতুন Bulb দীর্ঘ exposure-এর প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে। এখন এই Bulb-এর সাহায্যে রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি ক'রে সকল জিনিসের ছবি নেওয়াই সম্ভব হয়েছে।

এই উন্নত অবস্থার রঞ্জন-রশ্মি ডাক্তারদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে এবং এর জন্যে রোগীদের যন্ত্রণাও অনেক লাঘব হয়েছে। এখন কোনো ভাঙ্গা হাড়ের জন্যে অস্ত্র-চিকিৎসা করবার আগে ডাক্তারেরা ছবি নিয়ে শুধু কোন্‌ জায়গার হাড় ভেঙ্গেচে, সে খোঁজ নেন না—কেমন ক'রে হাড় ভেঙ্গে রয়েছে, সে সমস্ত খুব ভাল এবং স্পষ্ট ক'রে বুঝে তবে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। মাথার মধ্যের যে কোনো জায়গার আব (tumour) এখন অতি সহজেই ধরা যায়। খাবারের সঙ্গে Bismuth আর Barium মিশিয়ে পাকস্থলী ও খাদ্যনালী প্রভৃতির ছবি তুলে অনেকরকম অসুখ এখন অতি-সহজেই চেনা যায়। মূত্রাশয়, পিত্তকোষ ইত্যাদির মধ্যে পাথর হ'লে এখন রঞ্জন-রশ্মি দিয়ে ছবি নিয়ে সেই পাথরের আকার, অবস্থান ইত্যাদির খোঁজ পাওয়া যায়।

ছবি নিয়ে দাঁতের চিকিৎসা এখন খুব প্রচলিত হয়ে পড়েছে।

অনেক কঠিন রোগের চিকিৎসাতেও রঞ্জন-রশ্মি আশ্চর্য্য ফল দেখিয়েছে। নালী-ঘায়ের চিকিৎসাতে রঞ্জনরশ্মি সফলভাবে খুব বেশী ব্যবহার হচ্ছে। ক্যান্‌সার সারাতে না পারলেও রঞ্জন-রশ্মি ক্যান্‌সারের প্রথম অবস্থায় বেশ সুফল দিচ্ছে।

বহুপ্রকারের চর্ম্মরোগে রঞ্জন-রশ্মি খুব ভাল ফল দেখিয়েছে। রঞ্জন-রশ্মি এখন দাদ সারাবার একটা ভাল উপায় বলে ব্যবহার হচ্ছে।

চিকিৎসা ছাড়া রঞ্জন-রশ্মির কাজ শিল্প-কার্য্যেও বিস্তারিত হ'য়ে পড়ছে। অনেকে ষ্টিল লোহা প্রভৃতি অস্বচ্ছ জিনিষের ভিতরের অবস্থা পরীক্ষা কর্ত্তে রঞ্জন-রশ্মি ব্যবহার কচ্ছেন।

এই রকম অনেক রকমে এবং অনেক কাজে রঞ্জন-রশ্মির ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু এর সব-চেয়ে নতুন রকমে ব্যবহার করেছেন আমষ্টার্ডামের ডাক্তার হেল্‌ব্রন। অনেকে সন্দেহ করেন যে, খৃষ্টিয় ষোল শতাব্দীর কতকগুলো ছবি পরবর্ত্তী যুগের চিত্রকরেরা কিছু কিছু বদ্‌লে ফেলেছেন। এম্‌নি একখানা ছবি ডাঃ হেল্‌ব্রন রঞ্জনরশ্মি দিয়ে পরীক্ষা করেন। সেখানা Cornelis En ellrochs n-এর Crucifix নামক ছবি। তিনি দেখতে পান ছবির সাম্‌নে ডানদিকে একজন মহিলার ছবির নীচে একজন যাজকের ছবি রয়েছে। তিনি তখন সে ছবিখানা আমষ্টার্ডামের রিজিক্স মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেন। সেখানে মহিলার ছবির রঙ্‌ উঠিয়ে ফেলা হলে যাজকের ছবি স্পষ্ট বেরিয়ে পড়্‌ল।

এভারেষ্ট শৃঙ্গ

অনেকেই শুনে ভারী খুসী হবেন যে, মাউন্ট এভারেষ্টে ওঠ্‌বার জন্যে একটা সুশৃঙ্খল চেষ্টা চলেছে। এর বিরুদ্ধে যে সব বাধা ছিল, রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি আর আলপাইন ক্লাবের চেষ্টায় সে সব দূরীভূত হয়েছে।

যুদ্ধ আমাদের অনেকখানি শক্তিবান ক'রে তোলে বটে, কিন্তু মাউন্ট এভারেষ্ট চড়বার চেষ্টায় আমাদের শক্তির, আমাদের সাহসের, আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ কর্ব্বার এবং সংযম-শক্তির বড় কঠিন পরীক্ষা হয়। এ বড় আশার কথা যে, এই মহাযুদ্ধের পরে বিশ্রাম না নিয়েই মানুষ আবার এত-বড় একটা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্ছে।

এ আশ্চর্য্য মনে হ'তে পারে যে, গত পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষ শুধু দুটো মেরুর কথা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এক-আধজন ছাড়া কেউ এই শৃঙ্গে ওঠবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু এর জন্য আমরা আমাদের শৈলারোহিদের দোষ দিতে পারি না। তাঁদের পথে অনেক বাধা অনেক বিপত্তি ছিল যা সম্প্রতি দূর হয়েছে।

সুশৃঙ্খল একটা ধারাবাহিক চেষ্টা না হলেও, এর মাঝে সাধারণের চোখের অন্তরালে অনেক আবিষ্কারক, অনেক বৈজ্ঞানিক ধীরে ধীরে হিমালয়ের বুকে প্রবেশ করে অনেক দূরে এগিয়ে অনেকদূরের মানচিত্র ও অন্যান্য খবর সংগ্রহ করেছেন। নিঃস্বার্থভাবে তাঁরা যে কাজ করেছেন, তাতে এই নতুন দলের

সাহায্য হবে। এঁদের মধ্যে আমরা Brigadier General the Hon. C. G Brace-এর নাম উল্লেখ না ক'রে পারিনা। পর্ব্বত সম্বন্ধে ও সেখানকার লোক সম্বন্ধে তাঁর অতুলনীয় অভিজ্ঞতা সকল পর্য্যটকদের উপকারে এসেছে ও আসবে। সকল বাধা-বিঘ্নের কথা চিন্তা করলে আমরা বেশ বুঝতে পারি যে এই সমস্ত পর্য্যটকদের অভিজ্ঞতার সাহায্য না পেলে মাউণ্ট এভারেষ্টে ও৯ বার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতো নিশ্চয়।

পাহাড়ীদের পরিচালন করা থেকে বাতাসের চাপের হ্রাস—এই রকম কত নতুন নতুন বাধা-বিপত্তি বার হয়েছে, এবং সে সবের জন্মে উপযুক্ত বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়েছে, এমন করে গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে কতই আয়োজন হয়েছে। এখন এই সব আয়োজন নিয়ে এক পর্য্যটকের দল সাজানো হবে। এদের গরম ও শীতের জন্মে প্রস্তুত হয়ে,নদী,বাতাস ও বরফের বিপদ-আপদকে তুচ্ছ ক'রে, অনাহার অনিদ্রার ক্লেশকে ভয় না ক'রে পৃথিবীর সভ্যতার সীমান্তে যেতে মনঃস্থির কর্ত্তে হবে।

বিপত্তির সঙ্গে প্রথম সংগ্রাম আরম্ভ হবে সেইখানে, যেখানে মানুষের বসতির সঙ্গে মানুষের জানা দেশ শেষ হয়ে যাবে। হিমালয়ের প্রকৃতি এখনও শিশু, সেখানে পাহাড়-পর্ব্বত-উপত্যকা সব ভীষণ ও প্রকাণ্ড। কল্পনা সে বৃহত্ত্বের সঙ্গে চলতে পারে না। যুগান্তের বিপুল তুষারের স্তূপ, বিশাল ভূপাত, ক্ষণস্থায়ী জলোচ্ছ্বাস, ধ্বংসোন্মত্ত ঝটিকা, এরা সব নিজেদের ইচ্ছামত পৃথিবী আর পাহাড়ের মাঝে বরফ আর তুষারের সঙ্গে প্রাকৃতিক খেলায় উন্মত্ত।

পর্ব্বত-শিখরের একমাত্র প্রবেশ-পথ সেখানকার ভীম হিমানী-স্তূপ, এবং এসব জায়গায় এরা এত জটিল যে এভারেষ্টের দিকে এগুতে খুব অল্প পথ অতিক্রম করতেও একাধিক ঋতু কেটে যায়। এমনি একটা পর্ব্বত-শিখর পার হতে অনেক সপ্তাহ লেগে যায়; কারণ এই রকম ভীষণ জায়গায় পর্যটকেরা অনেক পরিশ্রমের পর, অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েও দিনে একমাইলের বেশী কিছুতেই এগুতে পারে না।

শিখরের পাদদেশে আবার একটা নতুন সংগ্রাম আরম্ভ হয়। আমরা শুনেছি এ জায়গা উত্তর দিকে। এখানে যেতে হলে তিব্বতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ পথ এখনও আনুমানিক। কারণ কেহই এখনও এভারেষ্ট শিখরের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে পৌছতে পারেন নি। পর্ব্বতারোহীদের এখান থেকে বরফ এবং তুষারের সরলোন্নত দেওয়াল পর্য্যন্ত একটা সহজগম্য পথ বার কর্ত্তে হবে। এখানে একটু ভুল-যাত্রা কল্লে একটা বছর একেবারে বৃথা হয়ে যাবে।

এই আরোহণ 'লাফ দিয়ে' হবে না। কত বছরের অসফলতার অভিজ্ঞতা সফলতা-লাভের জন্ম আক্রমণের একমাত্র পথ বার করেছে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে পথের মাঝে পর্য্যটকদের তাঁবুর আস্তানা রেখে অগ্রসর হতে হবে। প্রত্যেক তাঁবুতে জনকয়েক লোক রেখে যেতে হবে, যারা তাদের নিজেদের এবং যারা এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্ম সেখানে শীত সহ্য কর্বে।

সব-শেষ তাঁবু বোধ হয় শিখরের অল্প কয়েক সহস্র ফিট নীচে স্থাপিত হবে। তারপর শেষ বাছা-বাছা কয়েক জন, হয় ত জন-

চায়েক শেষ যাত্রা কর্ব্বে। এই ভয়ানক উঁচু স্থানে এক দমে মানুষ কয়েকদিনের বেশী থাকতে পারে না। বাইরের বিপদের কথা ছেড়ে দিলে ত এখানে মানুষের ক্ষমতা, জীবনী-শক্তি এবং ধৈর্য্য বড় তাড়াতাড়ি ক্ষয় পেয়ে আসে। সেই জন্যে যারা শেষ যাত্রার যাত্রী হবে, তাদের চাই চরম শীতেও ক্লেশহীন ক্লান্তিশূন্য, অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। এ সময়ে একটু ভুলে, একটু অসহিষ্ণুতায় সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এম্‌নি সব স্থিরপ্রতিজ্ঞ শক্তিমান অবিচল লোকেরা মাউণ্ট এভারেষ্টে ওঠবার প্রথম সম্মান লাভ কর্ব্বে। এই যে পর্ব্বতারোহণ—এ মনুষ্যত্বের একটা বড় কঠিন ও বড় ভীষণ পরীক্ষা।

কিন্তু এই শেষ আস্তানাতে এসেও অনেক বাধা মিলতে পারে। রাস্তা, আবহাওয়া,—সবই ভাল থাকৃতে পারে; যারা শেষ যাত্রা কর্ব্বে তারাও ঠিক থাকৃতে পারে। কিন্তু এমন হতে পারে যে শিখর থাকৃবে বরফে ঢাকা—সে এত উঁচুতে যে সেখানে শুধু পা ওঠানোই ভয়ানক ব্যাপ্যার—বরফ কেটে সিঁড়ি কর্ব্বার কল্পনাও সেখানে করা যায় না! আবার এমন হতে পারে যে সে জায়গা এমন ভাবে তুলোর মত তুষার দিয়ে ঢাকা যে মানুষের সকল শক্তি সেখানে তলিয়ে যায়।

যদি এ যাত্রা সফল হয়, তবে তা হবে অসীম শক্তি, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা আর আদর্শ-সৌভাগ্যের মিলনে।

জন্তুদের বিচার

মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা যেমন অনেক ভয়াবহ ঘটনা দেখতে পাই, তেম্‌নি অনেক হাস্যোদ্দীপক কাহিনীও আমাদের সে যুগের বুদ্ধির বহর দেখিয়ে অবাক করে দ্যায়। এখানে ইউরোপের মধ্যযুগের যে একটা প্রথার কথা বল্‌ছি, স্থির-মস্তিষ্ক লোকেরা যে কি ক'রে সে প্রথার অনুমোদন কর্ত্তেন তা আমরা বুঝতে পারি না।

গরু, ইঁদুর, পাখী, জোঁক—এদের অপরাধের জন্য সাধারণ বিচারালয়ের বিচার আমাদের কাছে হাস্যোদ্দীপক মনে হ'লেও, মধ্যযুগে ইউরোপে এদের বিচার করা ও শাস্তি দেওয়া বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই নির্ব্বাহ হ'ত। এক ফ্রান্সেই ১১২০ থেকে ১৭৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই রকম বিরানব্বইটা মাম্‌লার সন্ধান পাওয়া যায়।

এ-সব মাম্‌লা শুধু মানুষের ওপরে পশুদের গুরুতর অত্যাচারের বিরুদ্ধেই রুজু হ'ত না। একটা ষাঁড়ে একজন মানুষকে গুঁতিয়েছে, একটা ছেলেকে একটা কুকুর মেরে ফেলেছে—এ সব ত ছিলই। তারপরে ছোট-খাট অপরাধের জন্যেও তারা নিস্তার পেত না। এ-সমস্ত মাম্‌লা রীতিমত বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে চালান হ'ত। যদি কোন দেশে ইঁদুর কিম্বা মাছি কিম্বা কোন পশু কি জোঁক উৎপাত আরম্ভ কর্ত্ত, সাধারণতঃ তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু ক'রে তাদের

পক্ষে একজন উকীল নিযুক্ত করা হ'ত। আর তাদের আদালতে হাজির হ'বার জন্যে তিনবার পরওয়ানা বেরুত। যদি তিনবারের পরেও তারা হাজির না হ'ত, তবে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার আরম্ভ হ'ত। তখন তাদের উকীল যদি ভাল কারণ না দেখাতে পার্ত্তেন, তবে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে তাদের সে দেশ ছেড়ে যাবার হুকুম হ'ত। আর হুকুম মান্য না কর্লে ওঝা ডেকে মন্তর পড়ে শাস্তি দেওয়া হ'ত। যদি মন্তর পড়ার পরেও তাদের অত্যাচার বেড়েই চল্ত, তবে লোকে সে দোষ শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিত।

১৪৫১ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের Lausanne সহরে একবার কতকগুলো জোঁকের বিচার হয়। তাদের অপরাধ, সেই দেশে ছড়িয়ে পড়ে মানুষেদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। তাদের কতকগুলোকে ধরে আদালতে হাজির করা হয়। তারপর বিচার করে তাদের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়! রেকর্ড আছে যে, তারা সেই নির্ব্বাসনের হুকুম অমান্য করায় ওঝা ডেকে মন্তর পড়ে তাদের বংশ লোপ ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে Autu এ ইঁদুরদের বিরুদ্ধে এক মামলা হয়। মঁসিয়ে স্যাসানসি ইঁদুরদের উকীল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি প্রথমে ইঁদুরদের অনুপস্থিতির কারণ দেখান যে, সকলকে আস্তে বলা হয়েছে; কিন্তু কেউ কেউ অত্যন্ত ছোট, কেউ কেউ বৃদ্ধ এবং অসমর্থ। তাদের সকলের আস্বার জন্যে বন্দোবস্ত কর্ব্বার সময় চাই ত! আদালত সময় দিলেন। কিন্তু এতেও তারা হাজির হোল না। তাতে উকীল-মশায় কারণ দেখালেন যে, ইঁদুরদের যখন মহামান্য আদালত থেকে আস্তে বলা হয়েছে, তখন আদালত তাঁদের রক্ষার জন্যে দায়ী। কিন্তু পথে-ঘাটে বিড়াল, কুকুর আছে,তারা ইঁদুরদের যম। সেগুলোকে সরানো না হ'লে তারা কি ক'রে আসে? সেগুলো সর্লেই ইঁদুররা উপস্থিত হ'বে। আদালত থেকে বিড়াল কুকুর সরাবার হুকুম হ'ল। কিন্তু এ পর্য্যন্তও তারা সরেনি বলে মাম্লা মুলতুবী আছে।

কলারের ইতিহাস

আগে আলাদা কলারের ব্যবহার ছিল না —এবং সেই জন্যই কেউ তা ব্যবহার কর্ত্তে পেত না। আলাদা কলার তৈরীর বেশ একটু মজার ইতিহাস আছে। আমেরিকার ট্রয় সহরে এক কামারের স্ত্রী এই আলাদা কলার আবিষ্কার করে। তার নাম হানা লর্ড মণ্টেগু। ১৮২৫ সালে একদিন সে তার স্বামীর সার্ট ধুত্তে-ধুতে লক্ষ্য করলে যে সার্টের গা ও কফের চেয়ে গলার কাছটাই বেশী ময়লা হয়। তার মনে হ'ল কলার আলাদা করে ফেল্লে সার্টও বেশী ধুতে হয় না। সে তখন আলাদা কলার তৈরী কর্ত্তে লাগ্ল। ক্রমে পাড়া-পড়্সীরা তার কাছ থেকে কলার কিন্তে লাগল। শেষে কলারের বিক্রী এত বেড়ে গেল যে, তারা একটা মস্ত ফ্যাক্টরী খুলে ফেল্লে।

তারপর এখন অবশ্য নানা দেশে নানা কোম্পানী কলারের কারবার খুলেছে।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

প্রিয়ার উদ্দেশে

ট্রেণ ছাড়বার বেশী দেরী ছিল না, কিন্তু তোমায় কিছু ফুল পাঠিয়ে দেবার মত সময়ের অভাব হয়নি। সেগুলো গোলাপ—গাঢ় লাল। আমাদের অপেরায় তুমি যে রঙের গোলাপ পোরে ছিলে, সেইরকম। আমি কিনেছিলুম অনেক, যেমন মনে লাগলো, তেমনি কিনলুম, শেষ মুহূর্ত্তে আমার নামের কার্ডখানা গুঁজে দিতে ভুলে গেলুম—কে যে তোমায় ফুল পাঠালে, তা তুমি বুঝতে পারলে না—অবশ্য আন্দাজ করতে পেরেছ, বোধ হয়! মনে আছে কি, আগে তোমায় একবার ফুল পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি প্রাপ্তি-স্বীকার করনি? তোমার মনোভাব পাছে প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে, বুঝি? যতদিন না ফুল গুলো শুকিয়ে যায় ততদিন তারা তোমায় আমার কথা মনে করিয়ে দেবে!

এখন আমি যেখানে আছি, ফুলের কথাটা সেখানে কিন্তু ভারি অদ্ভুত, ভারি অবান্তর!

নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম, কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছি। আর ভেবে অবাক হচ্ছি যে আমিই সেই লোক যে,তোমার পাশে-পাশে সেদিন বেড়িয়েছে! আমাদের আড্ডা হয়েছে একটা dug-out-এ, সেখানে বাইরের trench-এর যত জল একেবারে বৃষ্টির মত পড়ছে। ব্যাপার খুব চমৎকার! রসিক হুনরা ভালো কোরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁরা আছেন! আমাদের পদাতিক সৈন্যদল খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কারণ শীঘ্রই একটা তীব্র আক্রমণের আশঙ্কা আছে! চারিদিকে যথেষ্ট পরিমাণে গোলা-গুলি-বর্ষণ চলেছে,এবং গ্যাসের গন্ধও অল্প অল্প পাওয়া যাচ্ছে। সংবাদ-বাহকেরা সংবাদ নিয়ে কেবলি যাওয়া-আসা করছে—সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় কোরে নামছে আর বাইরের কাদা এনে ঘরের মধ্যে পুরছে। আমার কনুইয়ের কাছে একটা বাতি গোলে গোলে পড়ছে। একটা পেট্রোলের বাক্সের উপর গদীর বদলে দু-পাট করা চট পেতে আমি বসে আছি। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, সারা রাত জেগেই কাটাতে হবে।

আজ তুমি কত দূরে— যা-কিছু আমি ভালবাসি সবই কত দূরে! বোধ করি, তুমি তোমার কর্ত্তব্য তুমি করছ। মানস-চক্ষে তোমায় যেন দেখছি—তোমার সেই অসহায় শিশুর দল কেমন দিব্য আরামে বিছানায় শুয়ে আছে। তুমি ত বলেছ যে হুনেরা তোমাদের উপরও সময় সময় গোলা চালায়, গ্যাস ছাড়ে। নিতান্ত স্বার্থপরের মত আমি ভাবছিলুম—না, তুমি যে পুরুষদের সঙ্গে এই খেলায় যোগ দিয়েছ, এতে আমি খুব খুসী। মনে হচ্ছে, তোমার সুন্দর বেশ-ভূষা সব দূরে সরিয়েছ, প্যারিসে বোধ হয় সব পড়ে আছে—এখন তোমার ধাত্রীর বেশ! তুমি ত ক্যাপ্টেন, তাই না? তা হলে তুমি আমার উপরে, কারণ আমি মাত্র sub-altern, তোমার সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছি, তুমি তার চেয়েও উপরে,—বিলাসিতার সমস্ত আরাম ছেড়ে বিপদের

সামনে পরের ছেলের ভার নেওয়া কম সাহসের কাজ নয়। তোমার মধ্যে এই বীরত্বের সম্ভাবনা কোনো দিন আমার মনে জাগেনি। প্যারিসে যতদিন ছিলুম, তোমাকে সবার-সেরা সুন্দরী বলেই শুধু জেনেছি,—তার চেয়ে আর বেশী কিছু নয়! যত মেয়ে দেখেছি, তাদের সবার চেয়ে ভদ্র, শান্ত আর মমতাময়ী। যখনই তোমার ধাত্রী-হিসাবে দেখি, তখনই ধর্ম্মের একটা জ্যোতি যেন তোমায় ঘিরে থাকে! আন্তরিক সেবার মধ্যে এমন একটা পবিত্রতা আছে যা সৌন্দর্য্যকে ছাপিয়ে ওঠে!

আমার শেষ লাইনের শেষে যে কালি ছড়িয়ে গেছে, সেটা সব দোষে নয়। আমাদের dug-out এর দরজায় একটা শেল্ এসে পড়লে একজন মারা পড়লো, দুজন জখম হলো আর বাতিটা নিবে গেল। দুটো লোকের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এই শেষ করলুম। মরা লোকটা পথের উপরে পড়ে আছে—একটা কম্বল তার উপরে চাপানো। বেচারা নেহাৎ ছোকরা! এই সে দিন সে আমাদের দলে যোগ দিয়েছিল। এ-রকম দুর্ঘটনা আমাদেরই দোষে হয়—আমাদের উপর শুধু এগিয়ে যাবার ভার, সবাই অন্তত তাই আশা করে, কাজেই যে সব trench আমরা জয় করে দখল করি, সেগুলোর সম্বন্ধে মনোযোগ দেবার আমাদের সময় থাকে না, শত্রু যখন ছিল, তখন এর মুখগুলো ঠিক দিকেই ছিল, কিন্তু আমাদের বেলা শত্রুর গোলার অব্যর্থ সন্ধানের জন্যেই শুধু সেগুলো আছে—এই ত যুদ্ধ!

যুদ্ধে যোগ দিতে আমার বেশী দেরী হয়নি—কত দেরী? William Tell অভিনয় শোনা আর সেই বিচিত্র বিদায় নেবার চার রাত পরেই। যাত্রাশেষে গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছে ঘোড়া কি সহিস কারুরই খোঁজ পেলুম না। আমার division-এ টেলিফোন করলুম—কতক্ষণ অপেক্ষা করবার পর প্রায় মাঝ-রাতে ঘোড়া নিয়ে লোক এল। মালগাড়ীর সার ধরে যেতে পথে ভয়ানক ঠাণ্ডা পেলুম। পথের মাঝে ডোবা আর খালের জল জমে বরফ হয়ে কাচের পাতের মত দেখাচ্ছিল। বেশীর ভাগ পথ ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হলো—তারা বিড়ালের মত পা পিছলে চলো। আকাশের চাঁদ যেন বাটালি দিয়ে খোদা শক্ত পাথর! বিপর্য্যস্ত গ্রামগুলো যেন প্রেতপুরীর মত ভয়ানক ও গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সবে সেই দিন আমাদের দল সেখানে উঠে এসেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলার এক-শেষ!

রসদ-গাড়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় তিনটে—ঘোড়াগুলো দীর্ঘ ভ্রমণে প্রায় কাবু হয়ে পড়েছিল। জায়গাটা একটা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ—একটা গোলা-বাড়ীতে সৈন্যেরা জড়ো হয়েছে। বেশীর ভাগ বাড়ীতে দেওয়ালগুলোই কেবল দাঁড়িয়ে আছে, আর সব ভেঙ্গে পড়েছে। আমরা অনেক চেষ্টার পর quarter masterকে জাগালুম। তিনি আবার ঠিক জানেন না, আমার থাকবার জায়গা কোথায়! এত রাত্রে খোঁজাখুঁজি করেই বা কে? বিছানাটা পেতে জুতো খুলে দিব্যি শুয়ে পড়লুম—হোটেলের বিলাসিতা, গরম স্নানাগারে ধবধবে সাদা চাদরের বিছানার আরাম থেকে এ অবস্থায় আসা মস্ত একটা পরিবর্ত্তন নয় কি? এখন বোধ হয় বুঝেছ তোমায় এত দূরে মনে হচ্ছে কেন?

এর চেয়ে অনেক আকস্মিক পরিবর্ত্তন

আমার ভাগ্যে ছিল। পরদিন প্রাতে ছ'টার পরেই আর্দ্দালী এসে আমায় জাগিয়ে দিলে —শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণকারী দলের সঙ্গে আমায় যেতে হবে—সাজগোজ করতে বেশী দেরী হল না—পোষাক পোরে শোবার এই একটা মস্ত সুবিধা। বেচারা ক্লান্ত ঘোড়াটির পিঠে আবার জিন কসা হল—তারপর পিছলে, পা ঘোসে ঘোসে সেই কাচের মত পথে আমরা যাত্রা করলুম। এত তাড়ার কারণ আর্দ্দালীর কাছে শুনলুম, মেজরের লোকের অভাব, তাই আমায় চাই।

গিয়ে দেখি, আমাদের Battery একটা সরু উপত্যকার মধ্যে জমা হয়েছে—এ উপত্যকার নাম তুমি জানো, কিন্তু নাম আমি বলবো না। বছর খানেক আগে ফরাসিরা এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ কোরে একে বিখ্যাত করেছে! সে হাতে হাতে যুদ্ধ—এত কাছাকাছি যে সঙ্গীন দূরের কথা, সৈনিকেরা ছোরা মুখে কোরে হাত দিয়ে বেয়ে বেয়ে উপরে উঠছিল। তলায় ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অনেক মৃত দেহ এখনও পড়ে আছে—তাদের ওপর দুমুঠো মাটী ছড়িয়ে দেবারও কেউ নেই। এখন বরফে তারা চাপা পড়েছে বটে কিন্তু পায়ের তলায় তাদের হাড়গুলো ফুটছে, বেশ বুঝতে পারা যায়। খানিক দূরে ছোট একটা গাছের ঝোপের মধ্যে আমাদের কামান লুকানো আছে—এরোপ্লেন থেকে যাতে দেখতে না পাওয়া যায় তার উপায়ও করা হয়েছে। ঘোড়া রেখে পথটা হেঁটে গেলুম, নতুন পথ তৈরী কোরে লাভ কি? তা ছাড়া বরফের উপর পায়ের চিহ্ন খুব স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

মাটির নীচে একটা গর্ত্তের মধ্যে আমরা মেজরকে পেলুম—"তুমি এসেছ, বেশ, খুব খুসি হলুম! এই কাজে তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিলুম কিন্তু না দিয়েই বা কি করি, বল? খবর যা কিছু সংগ্রহ করেছি, তোমায় দিচ্ছি, কিন্তু কোয়ার্টার খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়া চাই।"

তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিলুম। Telephonistদের সংগ্রহ কোরে নিয়ে অগ্রসর হলুম; এখানে আজ নিয়ে তিন দিন আছি—সৈন্য-দলে যোগ দিলে ভাববার বা দুঃখ করবার সময় থাকে না—সেটা কম লাভ নয়! আমার অবস্থা প্রায় সাধারণ সৈনিকের মত হয়ে পড়েছে—আমার না আছে কম্বল, না আছে বালিশ, না কিছু—তাড়াতাড়িতে সব জিনিষ-পত্র ফেলে চলে এসেছি। রাত্রে trench-coatটা মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকি। কম্বল নেই বোলে বিশেষ যে অসুবিধে হচ্ছে তা নয়, কারণ সারা রাত ত জেগে এদিক ওদিক কোরে বেড়াতে হয়। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার সময় পাওয়া যায় সকালে ছ'টা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত—থামতে হলো—কি একটা হচ্ছে…।

* * * *

না, ব্যাপার কিছু নয়, কে একজন ভয় পেয়ে বিপদে সাহায্যের জন্যে যে হাউই ছোড়ে তাই ছেড়েছে—হুনদের লাইন লক্ষ্য কোরে কিছুক্ষণ গোলা বর্ষণ করলুম—যদি তারা কিছু ভেবেও থাকে, তবে সে মতলব ত্যাগ করেছে—চারিদিক প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, শুধু দূরে আমাদের বাঁ দিকে, মাঝে মাঝে আনাড়ি-হাতে টেপা type-writerএর

মত machine-gunএর পট্ পট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। শত্রুদের আড্ডায় সেই অজানার দেশ থেকে মাঝে মাঝে হাউই আকাশের দিকে উঠছে—সেগুলো যেন অন্ধকারের বুক চিরে মোটর গাড়ীর মত ছুটচে। যদি ভালবাসায় পড় আর প্রচুর কল্পনা থাকে তবে এমনি রাতে অনেক পরীর গল্প রচনা করতে পার। সেই সব শাদা আলোগুলো আকাশে উঠছে. ছুটচে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে একটা অবাস্তব পরীরাজ্যের সৃষ্টি করছে, আর আমায় Parisএর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

তোমার স্মৃতি অকস্মাৎ মনে আসে—তোমার অঙ্গভঙ্গী, চলাফেরা, কথাবার্তা—যা তখন লক্ষ্য করিনি। Hotel pavillon এ যে রাত্রে দুজনে গিয়েছিলুম, সে রাত্রির কথা তোমার মনে আছে? আমেরিকান পুরুষরা সেখানে জড়ো হয় আর মেয়েরা সব জিনিষ-পত্র বিক্রী করে। সে রাত্রে তুমি সিগারেট বিক্রী করছিলে– বোসে বোসে তোমায় দেখছিলুম—কত লোক কিনবে বোলে ভিতরে এল—প্রথমে তোমায় কেউ লক্ষ্যই করেনি—যখন তোমায় দেখতে পেলে তাদের চোখের আর পলক পড়লো না, এক-দৃষ্টে তোমার মুখের পানে চেয়ে রইলো। তোমার সঙ্গে এলোমেলো আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে, ভদ্রতার খাতিরে তারা বেশীক্ষণ থাকতে পারলে না, কিন্তু একবার একটা কিছু কেনা শেষ হয়ে গেলে আবার কিছু কেনবার ছল কোরে ফিরে এল। তোমায় আর একবার দেখাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কথা কইবার সময় তুমি হাত দিয়ে মুখ ঢাকছিলে। নিজেকে তুমি সাধারণ দোকানি-মেয়ে বোলে চালাবার চেষ্টায় ছিলে এবং নিজের অজ্ঞাত-সারে সবাইকে মুগ্ধ করছিলে। মাথায় তোমার ছোট একটা টুপি ছিল মখমলের, কপালের উপর বাঁকাভাবে সেটা বসানো ছিল তাতে তোমার ভ্রূর সূক্ষ্মতা আরও সুন্দর ফুটে উঠেছিল। আমেরিকায় আমাদের সেই ক্ষণিক মিলনের দিনে তুমি এই টুপিটিই পরেছিলে।

কে তুমি? কি তুমি? আমার কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছ—এর মধ্যেই অবাস্তব হয়ে উঠেছ। এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দেশের সঙ্গে তোমার চিন্তাকে আমি কোন মতেই খাপ খাওয়াতে পারছি না।—প্রাণ চাঞ্চল্যের তুমি যে প্রবল স্ফূর্ত্তির মত—জীবনের তুমি যে প্রতিমূর্ত্তি! আমার জন্যে তুমি কি একটুও ভেবেছ—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও? যে জীবনে আমি ফিরে আসছিলুম তার ছবি কি কোন দিন চোখের সামনে এঁকেছ? আমি কি শুধুই একটা ঘটনা—বেশ এক হাসি-খুসি-ভরা মজার লোক, ক্ষণিকের তরে এসে চলে গেল—! সামনে বা পিছনে কি আছে, আমাদের মধ্যে সে কথার আলোচনা কোনদিন হয় নি—যে ক'ঘণ্টা হাতে পেয়েছি আমরা তা উপভোগ কোরে নিয়েছি। কিন্তু আমার সেই সমস্ত সুখের মধ্যে একটা বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল—আমাদের বিচ্ছেদের চিন্তা আমার মনে সব সময়েই জেগে থাকতো। কে যেন ভিতর থেকে সাবধান করতো—"এই শেষ—এই শেষ—শেষ!" তোমায় যদি আগে পেতুম—যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে, তা হলে সগর্ব্বে তোমায় প্রেম জানাতুম, কিন্তু এখন আর তা

পারবো না। মুখ ফিরিয়ে সেই পথটার দিকে দেখছি—আমি তার বুট দেখতে পাচ্ছি -কম্বলের নীচে তার দেহের আভাষ পাচ্ছি—Stretcher টা দেখতে পাচ্ছি। একদিন সেও মানুষ ছিল—এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সব শেষ হয়ে গেল—যা এখানে পড়ে আছে তাই তার অবশেষ! হয়ত সেও কোনো মেয়েকে ভালোবাসতো! সে কথা বোধ হয় সে মেয়েটিকে জানিয়েওছে। না জানিয়ে চুপ কোরে থাকলেই ভাল হতো। কিন্তু সেই যে তোমার বন্ধু বলেছেন —"তাকে বিয়ে করলে ভালই করতুম!" এ একটা সমস্যা। আমার নিজে দিক থেকে দেখলে তোমায় বল্লেই বেশ হতো, চুপ কোরে থাকার চেয়ে অনেক বেশী ন্যায় করতুম নিজের উপরে; তা হলে সেটা সবটুকু তোমার উপর নির্ভর করতো। কিন্তু সে পথ স্বার্থপরের পথ বলে তার উপর আমার কিছু মাত্র শ্রদ্ধা নাই।

এই আর একটা চিঠি লিখলুম, যা কোন দিন তোমার চোখে পড়বে না। যে চিঠি তুমি পাবে তা একেবারে অন্য রকমের! তোমার উপাধি ধোরে তোমার সম্বোধন করবো—গোটাকত কথা জানাব যে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছি, আর জানতে চাইব তোমার কেমন চলছে। ভাবছি—তুমি আমায় চিঠি লিখবে কি? তোমায় যখন সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তুমি সলজ্জভাবে মাথা দুলিয়েছিলে, সেটা কি ভদ্রভাবে অস্বীকার করার ইঙ্গিত? তুমি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে যাচ্ছ আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি—তুমি ফিরে চাইলে না। যদি আর মিনিট-খানেক তুমি আমার কাছে থাকতে, তা হলে হয়ত সেই সব কথা তোমায় বলে ফেলতুম—যা না বলে আমি ভালই করেছি। ভাবছি—তুমি বোধ হয় সব জানতে!

প্রায় সকাল হয়ে এল! কিছু আর ঘটবার নেই—এবার একটু বিশ্রামের আয়োজন করা যাক্।

৩

এইমাত্র ডাক এল। গোলা-গুলি যে গাড়ীতে আসে তাইতে ডাকও আসে। ডাক এসেছে—কথা দুটো কাণে বাজলো আর সঙ্গে লোকদের দৌড়-ধাপের শব্দ শুনতে পেলুম। ভাবতে ভারী আশ্চর্য্য লাগে চিঠিগুলো কত দূরে আসে যায়—কেমন নিরাপদে এসে পৌছয়—অবিরাম গোলা-বর্ষণের মধ্যে—গ্যাসের ভিতর দিয়ে, ডাক-হরকরার থলিতে, রসদ-বাহী জানোয়ারের পিঠে আর গোলাগুলির গাড়ীতে। কামান গুলো যেখানে আছে দিনের বেলা সেখানে নড়া-চড়া সম্ভব নয় বলে রাত্রেই আসে। চিঠি বিলি হবার আগে গোলা-বারুদ সব নামিয়ে নিতে হবে, কারণ কামানের লাইনের কাছে জানোয়ারগুলোকে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। লোকগুলো কি তাড়াতাড়ি কাজ করছে! তারা লম্বা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে—হাতাহাতি কোরে shell গুলো মাটীর নীচে বারুদ রাখবার গর্ত্তের মধ্যে জমা করছে। যতক্ষণ না সব জিনিষ নির্ব্বিঘ্নে জমা করা হবে ততক্ষণ তাদের মায়ের স্ত্রীর প্রণয়িণীর চিঠি থলির মধ্যেই বন্ধ পড়ে থাকবে।

যেই শেষ shellটা রাখা হয়ে গেল তারা সার্জেণ্ট মেজরের dug-out এর দিকে ভিড় কোরে ছুটলো। তিনি থলির উপর ঝুঁকে মোমবাতির আলোতে যত চিঠির খামের উপরে লেখা নাম চীৎকার কোরে পড়তে লাগলেন। থলি ক্রমে খালি হয়ে গেল—শূন্য থলিটা তিনি একবার উল্টো কোরে ঝেড়ে দেখলেন। এর পর সারা দিন-রাত বাড়ী থেকে আর কোন খবরই পাওয়া যাবে না। ভিড় ছড়িয়ে পড়ছে—সেই অন্ধকার আবার নির্জ্জন হয়ে উঠলো।

আমার মত যারা সেনা-নায়ক তাদের বোসে বোসে অপেক্ষা করতে হবে, কারণ আর্দ্দালিতে তাদের চিঠি এনে দেয়। আমাদের ধৈর্য্যের এও এক বিষম পরীক্ষা। উচ্চপদের কিছু দান এম্‌নি করেই দিতে হয়। আজ রাতে মনে করলুম, তোমার চিঠি পাবই—যেই দেখলুম ডাক এসেছে আমার পদ-মর্য্যাদা ভুলে বেরিয়ে পড়লুম, যেন জন্তুগুলো লাইনের বাইরে রাখা হয়েছে কিনা দেখাই আমার উদ্দেশ্য! কি রাত্রি! তারা আর তুষার যেন আবলুষের উপর রূপার মিনা করা—shell রাখবার গর্ত্ত থেকে আগুনের আলো আসছিল—লোকেরা এরই মধ্যে তার চারদিকে নীরবে বোসে গেছে, কম্পিত চঞ্চল অগ্নিশিখার আলোতে তারা চিঠি পড়ছে। পায়ের তলায় বরফ চুর হয়ে গেল। মনে হ'ল, যেন ক্ষণেকের জন্যে যুদ্ধের সব হাঙ্গাম থেমে গেছে—সবাই যেন ক্ষণকালের জন্যে স্মৃতি, শান্তি ও স্নেহের কোলে ফিরে গেছে।

পথে আমার চাকরের সঙ্গে দেখা হল—সে এক-তাড়া চিঠি নিয়ে আসছে। "নায়কদের চিঠি আপনি নেবেন।" মাটির নীচে গর্ত্তের ভিতর আমাদের মেসে ফিরে গেলুম। টেবিলের উপর সেগুলোকে জমা করলুম—এক চাহনিতেই দেখে নিলুম, তোমার কাছ থেকে কোন চিঠিই আসে নি। আমার নামে তিনখানা চিঠিই চেনা হাতের লেখা—কথাটা শুনতে ভারি অদ্ভুত লাগছে না কি? জগতে আমার বলতে যা আছে, সবার চেয়ে তোমার দাম আমার কাছে বেশী—সবার চেয়ে তুমি আমার কত আপন, অথচ তোমার হাতের লেখা আমি কখনও দেখিনি! এ থেকে স্পষ্টই বুঝচি, পরস্পরের কাছে আমরা কতখানি অপরিচিত!

আমাদের মেসের সবাই আজ কিছু না কিছু পেয়েছে এবং সব-চেয়ে বেশী পেয়েছে Jackho; তার স্ত্রীর কাছে থেকে চিঠি এসেছে চারখানা। বছর-দুই আগে তাড়াতাড়ি সে বিয়ে করেছে—মোটে এক সপ্তাহের আলাপ, এই ত শুনলুম—বিয়ের পর চার দিন honey-moon, তার পরেই সে ফ্রান্সে চোলে এসেছে—সমস্ত জীবনে যদি সে ত্রিশদিন স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে থাকে, তবে সেটা তার পক্ষে যথেষ্ট! এমন কোরে কোন লোককে প্রেমে পড়তে দেখিনি। আমি কিনা তার সব-চেয়ে বেশী বন্ধু, তাই তার কোন কথাই আমার কাছে গোপন থাকে না! আমাদের মেজর পেয়েছেন মাত্র একখানি চিঠি। তাঁর প্রণয়িনী তোমারই মত ফরাসী হাসপাতালে কাজ করেন। আমার ধারণা সে মেয়েটি এঁকে মাঝে মাঝে বেশ একটু নাকাল করে। আমাদের দলপতির সঙ্গে কেউ যে চালাকি করতে পারে তা কিন্তু বিশ্বাস কর

দায়—এঁকে খুব খুসী দেখছি না—গম্ভীর ভাবে বসে ভ্রূ কুঞ্চন করছেন। তার পর Bill Lane, এ ভদ্রলোকের অবস্থা মন্দ নয়—একটু চঞ্চল বটে কিন্তু কাজে বেশ চটপটে। তাঁর প্রণয়িনী আছেন ইংলণ্ডে—আগামী ছুটিতে তাঁকে বিয়ে করবার মত্‌লব চল্‌ছে—সে সারাদিন ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে বিয়ের আগেই কোনদিন গোলার আঘাতে তার সব চুকে যায়। তা বোলে তাকে কম সাহসী বলা যায় না—বিপদের মুখে আমাদের সবায়ের মতই সে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যায়। চিঠির পাতা ওল্টাচ্ছে আর হাসছে—শুধু এই সময়টির জন্যে বেচারী যা একটু বিশ্রাম পায়।—সে সুখী—ভুলে যাচ্ছিলুম—আমাদের Stephen-এর কথা তোমায় বলি—সে চমৎকার নক্সা আঁকে। তাকে কেউ কখনও চিঠি-পত্র লেখে না। সে দেখতে যেমন ভাল, তার ব্যবহারও তেমনি চমৎকার—চিঠিগুলো যখন বিলি হয় তখন সে একটুও চঞ্চল হয় না, কারণ সে কখনও কারও কাছে কিছুরই প্রত্যাশা করে না। আমরা যখন চিঠি পড়ি, সে তখন টেবিলের আলোকিত অংশে মাথা নীচু কোরে ম্যাপের লাইন কাটতে ব্যস্ত থাকে।

তুমি আমায় লেখ না কেন? আমি দিন গুনছি—যত দিন দেরী হওয়া সম্ভব তা হাতে রেখেও দেখছি যে, কাল তোমার একখানি চিঠি আসা উচিত ছিল--আজ নিশ্চয়ই আসবে মনে করেছিলুম। আদি কাল থেকে প্রেমিকরা মনের হতাশা দূর করবার জন্যে যত-রকম মিথ্যা ওজর মনে মনে রচনা করে, আমিও তাই করছিলুম। তুমি ব্যস্ত—তুমি লিখেছ---ডাকে ছাড়তে ভুলে গেছ—ডাকে দিয়েছ পথে হয়ত দেরী হচ্ছে! মনের কোণে আবার অন্যরকম ভাবনা জোমে উঠছে—তুমি আমার কথা ভাবোনা— আমি যে তোমায় ভালবাসি এ সংবাদে তুমি হয়ত বিস্মিত হয়ে যাবে। আমি তোমায় ভালবাসি এ-কথা জান বলেই হয়ত লেখ না—চোখ বুজে আমি স্মৃতির ধ্যান করি—তোমার মুখখানি মনের চোখে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এমন কোরে যখন তোমায় মনে করি,তোমার করুণার কথাই বেশী কোরে অনুভব করি। আমায় তুমি হয়ত দরদ কর না, কিন্তু তা বোলে তোমার প্রাণে দরদের ত অভাব নেই—যদি মনে করতুম তা হলে তুমি আমায় দরদ করতে কিনা নিজেই দেখতে—তোমায় যে অমন কোরে জানবো এই ছিল আমার আশার অতীত—আমার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী। যুদ্ধের মধ্যে প্রেমের আসন পড়বে এ যে একেবারে অভাবনীয়— সারা-জীবন ধরে আমি এর জন্যে অপেক্ষা করেছি—তার পর স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে যুদ্ধের মধ্যে ছুটে এলুম তোমাকে পেলুম। এ যে ভগবানের দান। এ কথা হয়ত তুমি কোনদিনই জানবে না, আমি কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট।

এই অদ্ভুত রাজ্যে,যেখানে সাহস কর্ত্তব্যের ছদ্মবেশে ঘুরছে, আমরা সব আশা পিছনে রেখে তবে এসেছি। খুব বেশী কোরে আশা করা মানে কাপুরুষতাকে ডেকে আনা—সাহসী হ'তে হ'লে প্রতিদিনের জন্যেই যেন বাঁচতে হবে। আগে কি স্বার্থপরই ছিলুম! সুখের নানা কল্পনায় ও মত্‌লবে একে-

বারে বিভোর! বলিষ্ঠ জীবন যাপন করবো—এই হবো—এত করবো—হাতের মুঠোয় জগৎকে ধরবো!

ভবিষ্যতে চল্লিশ বছরের মত নানা রকমের মতলব ঠিক কোরে ফেলেছিলুম—মনে হয়েছিল যে অনেক পুরুষ-পরম্পরা মানুষের ভাগ্য আমার কাজের উপর নির্ভর করছে। তার পরই এই যুদ্ধের আবির্ভাব। কোন কালে যে যুদ্ধ করতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কোন লোককে আমি হত্যা করতে পারি, এ যে চিন্তার অতীত ছিল—শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আমি একটা বিভীষিকা দেখতুম। উচ্চাশা ও ব্যক্তিত্ব ডুবিয়ে—যা শিক্ষা পেয়েছি তা দূরে ফেলে এমন পথ নিতে হবে যা নিজের কাছেও ভারি বিশ্রী। এমন অবস্থায় নিজেকে আনতে হবে, যাতে নিজের শক্তি পঙ্গু হয়ে যায় এবং অচিরে মরবার জন্যে সব সময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে!

তোমার সম্বন্ধে কোন আশাই আমি বুকের মধ্যে পুষবো না। তাহলে খুব দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আমার জীবনে তোমার ক্ষণেকের আবির্ভাবই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর একবার যদি চিরকালের মত তোমাকে দেখতে পেতুম—মনে মনে আমার গোপন মনোবেদনা জানাতে পারতুম—আমার সাহস আরও বেড়ে যেতো! তোমায় আর কিছু লিখব না মনে করছি। নির্জ্জনতার মধ্যে বসে এই সব চিঠি লিখে লিখে জমিয়ে রাখা আমার একটা কেমন সখ হয়ে উঠছে, যার পরিণাম আদৌ শুভ নয়। এতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দাম অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে। আমি আজ বুঝতে পারছি, কত মধুর কত গৌরবান্বিত করা যায় এই জীবনকে। যদি আজই এই জীবনকে বিদায়-সম্ভাষণ দিতে হয়, তা হলে আমার মনে শান্তি আসে। বিদায়ের ক্ষণে তুমি মাথা না ফিরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গিয়েছিলে, ঐ-রকম কোরে জীবন থেকে বিদায় নিতে আমার ভারী সাধ হচ্ছে।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

দুখের কবি

দুখের মাঝে আঁধার রাতে প্রাণ
গুপ্ত সুখে হর্ষে তোলে তান।
বর্ষা যথা ধরার বুকে সুখ
দুঃখ আসে তেমি ভরে' বুক।
দুঃখ যেন কূল-ছাপানো বান—
তার আবেগে কাব্য রচি গান।

দুঃখে যবে কেবল হানে বাজ
হৃষ্ট হিয়া ক্ষিপ্র নহে কাজ;
নিবিড় ব্যথা সরস হয়ে যায়—
বক্ষ টুটে' কাব্য-সুধা ধায়।
কাব্য মোরি দুঃখ-সেঁচা ধন,
দুঃখ সাথে তৃপ্তি ঢালে মন।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ভারতের বাহিরে ভারতীয় শিল্পকলা

ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ, লায়োস প্রভৃতি ভারতের পূর্ব্ব প্রদেশ-সমূহে এবং বিশেষভাবে যবদ্বীপে যে উচ্চ অঙ্গের শিল্পকলা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ক্রমশঃ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার উৎপত্তি-স্থান এই ভারতবর্ষ। উক্ত উপভারতীয় কলার অধিকাংশই বৌদ্ধ যুগের শিল্প এবং তন্মধ্যে যবদ্বীপের কলা-প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রধান। খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথম যুগে ব্রাহ্মণানুশাসিত হিন্দুর দ্বারাই যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপিত হয়, কিন্তু অল্পদিন পরেই তথায় অধিকাংশস্থলেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান বিজয়কাল পর্য্যন্ত তথায় পরস্পরের প্রতিবেশী-রূপে বিদ্যমান ছিল।

বড়বুদ্ধের স্তূপই যবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম বৌদ্ধ শিল্প-কীর্ত্তি। এই মন্দিরের প্রদক্ষিণ-মঞ্চ প্রায় দুই সহস্র ভিত্তি-গাত্রোৎকীর্ণ চিত্রে পরিশোভিত। চিত্রগুলি সমস্তই ধারাবাহিক—এবং ললিত-বিস্তর, দিব্যাবদান ও জাতকোল্লিখিত বুদ্ধের জীবনী ও চরিত্র-বিষয়ক বিবিধ কাহিনী সম্বলিত। প্রত্যেক প্রাচীরোৎকীর্ণ চিত্র এত বৃহৎ যে, সবগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে প্রায় দুই মাইলের উপর বিস্তৃত হইতে পারে।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে পশ্চিমাঞ্চল হইতে চীনে একটি সুবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি আনীত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিটিও সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের। পার্থিয়া হইতে একদল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকও ঐ শতাব্দীতেই চীনে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু



রাজপুত্র বুদ্ধদেবকে ঐরাবত উপহার দিতেছেন। মিরান (চীন-তুর্কীস্থান) হইতে প্রাপ্ত।



গান্ধার হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধ-মূর্ত্তি।

বৌদ্ধ প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়া স্বভাবতই চীন-বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রথম অবস্থাটায় কিছু কিছু গান্ধারের গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পের সংশ্রব পরিদৃষ্ট হয়,—কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বের কোনও কলা-চিহ্ন এখন আর বর্ত্তমান নাই, এবং সে সময়ে শিল্পের গ্রীক-রোমক প্রকৃতিটুকুও প্রায় বিরল হইয়া আসিয়াছিল। যদি বা কোথাও যৎকিঞ্চিৎ দেখা যাইত, তবে সে হয়ত শিল্প-সংক্রান্ত কোন গঠন-পদ্ধতি বা সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যের মধ্যে।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম-ভাগে উত্তর উয়েই (wei) বংশের শাসন-কালে চীন-দেশে শিল্প-চর্চ্চার একটা প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। তালঙের পর্ব্বত ও গিরি-গুহাগুলিতে অতি ক্ষুদ্রতম হইতে বিরাটকায় পর্য্যন্ত নানা আকারের

বৌদ্ধধর্ম্ম উহার অব্যবহিত কালেই তথায়—সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালের ন্যায় চীনেরা তখনও কতক কন্‌ফিউশিয়াসের অনুবর্ত্তী, কতক তায়ও মতাবলম্বী এবং কতক বৌদ্ধ সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল। পশ্চিম এসিয়া হইতে চীনে প্রথম

অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল; উহাই চীন-বৌদ্ধ শিল্পের আদিম নিদর্শন-স্বরূপ। কোরিয়াতে ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও বিস্তার ঘটিয়াছিল। চীনদেশের ন্যায় সেখানেও অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত এবং লোক-লোচনের



বোধিসত্ত্বকে নর্ত্তকীদ্বয় মালা পরাইতেছেন। মিরান হইতে প্রাপ্ত।

অন্তরালে অবস্থিত, অবিকৃত স্বভাব-সম্পন্ন শৈলরাজি হইতে ঐ সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

ভারতে যেরূপ অজন্তা গুহা, সেইরূপ পূর্ব্বাঞ্চলে আরও অন্যান্য বৌদ্ধ শিল্প এমনই স্বভাবশোভাময় মন-মুগ্ধকর দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিরাজিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ এবং সুদূর পবিত্র স্থানে তীর্থের প্রতিষ্ঠান না থাকিলে পরবর্ত্তী কালের জাপানী নিসর্গ-চিত্র,—যাহা শিল্প-জগতে অপূর্ব্ব মহিমা বিকীর্ণ করিয়াছে, তাহার মূল উৎস কোথায় তাহা অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করা দুরূহ হইয়া উঠিত।

কোরিয়া হইতেই বৌদ্ধ দর্শন ও শিক্ষা পরে জাপানে প্রসারিত হইয়াছিল। প্রথিত-যশা নৃপতি উয়িমায়াদ উহার প্রবর্ত্তক। ইনিই জাপানী অনুশাসনের সুপ্রসিদ্ধ সপ্তদশ বিধি রচনা করিয়াছিলেন এবং নাগার্জ্জুনের উপদেশ-সম্বলিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সূত্রের সুবিখ্যাত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শিল্প কলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া ইনি অদ্যাপি শিল্পী ও কারিকরগণের পূজা পাইয়া থাকেন। জাপানী-বৌদ্ধ শিল্পকলার মধ্যে আমরা যে বিশুদ্ধ গভীর অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, কেবলমাত্র প্রবলতম ধর্ম্মপ্রাণতা হইতেই তাহার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। ভারতের ন্যায় চীন ও জাপানেও শিল্পের ভিতর দিয়া চিন্তা ও কল্পনার ধারা ঈষৎ ভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আদিম যুগের সেই সাঙ্কেতিক চিত্রের জড় সংগঠন ক্রমশ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া জীবনের ক্ষুদ্রতম তত্ত্বের বিশুদ্ধ পরিচয় পর্য্যন্ত প্রতিফলিত করিয়াছে। মিঃ বিনিয়ন তাঁহার একটি সুলিখিত প্রবন্ধের একস্থানে দেখাইয়াছেন যে, ভারতীর চিন্তার ধারার প্রভাব চীন ও জাপানের ললিতকলার আদর্শকে কি-ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। তিনি বলেন—"চীন ও জাপানের শিল্প বৌদ্ধ আদর্শে অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধ মতে এ জগৎ অনিত্য ও পাপ-তাপে পরিপূর্ণ; এ শরীর কু-বাসনার বোঝামাত্র; স্বার্থজ্ঞান শৃঙ্খল-স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত সকল দেশের প্রচীন শিল্প-কলার মধ্যে এই ভাবটুকু যদিও জীবনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মানবোচিত সদ্ব্যবহার প্রভৃতি কর্ত্তব্যের ভিতরই পর্য্যবসিত,—এবং মানবজাতির ভিতরের সেই সনাতন পুরুষ যদিও মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দুঃসাহসিক বীরত্বের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তথাপি





টুন-হুয়াং (চীন-তুর্কীস্থান) হইতে প্রাপ্ত বহু পুরাতন বৌদ্ধ-পতাকা ;
মধ্যে বোধিসত্ত্বদিগের মূর্ত্তি

ভারতীর আদর্শের ভক্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—কর্ম্মের কোলাহলের অপেক্ষা ধ্যানের সৌন্দর্য্য সকলের চিরন্তনের মনোনীত মূল প্রসঙ্গ।”*

চীন-তুর্কীস্থান ও চীনের কান্‌সু প্রদেশের সীমান্ত-সংলগ্ন ভূমিতে যে বৌদ্ধ শিল্পের অস্তিত্ব রহিয়াছে তৎপ্রতি ফরাসী, জর্ম্মানী, ইংলণ্ড ও সুইডেন প্রভৃতি প্রদেশের য়ুরোপীয়

যাত্রীরা সম্প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ঐ দেশের দক্ষিণেও প্রথমে গান্ধার-শিল্প ও পরে ভারতীর মধ্যযুগের ললিতকলা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে। অর্থাৎ মূর্ত্তিগুলি প্রাষাণে উৎকীর্ণ না হইয়া মৃৎপিণ্ডের সাহায্যে গঠিত হইয়াছিল; কারণ সেখানে ভাস্কর্য্য-শিল্পের উপযোগী পাষাণ-ফলকের অভাবে শিল্পীরা মৃত্তিকা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। খোটান হইতে আরম্ভ করিয়া আবও উত্তর-পশ্চিমে কাশগড়ের মরুদ্বীপ উত্তীর্ণ হইয়া মরালবাসির উত্তর-পূর্ব্বে তামচুক্ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ শিল্প প্রসারিত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে বিশুদ্ধ ভারতীর ভাস্কর্য্য-শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল চিত্রের বিষয় ও অঙ্কন-পদ্ধতিও ভারতীয়, সামান্য মাত্র চীন ও ইরাণী প্রভাব সংমিশ্রিত আছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পর্য্যটক সার্ অরেল্ ষ্টীন্ কুচার পূর্ব্বাঞ্চলে লবণোর হ্রদের জলাপ্রদেশে আরও অনেক প্রাচীর-চিত্রের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল চিত্রে অসাধারণ কলা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় এবং উহার শিল্পভঙ্গীটি গ্রীক-কলা-পদ্ধতির অতি নিকট-সম্পর্কীয় বলিয়া মনে হয়। পরিশেষে তুর্কিস্থানের বহিঃ-সীমান্ত-সন্নিকটস্থ তুণ্ডহুঙের সহস্র বুদ্ধের কন্দরে ষষ্ঠশতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত বৌদ্ধ-শিল্পের একাধিক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে ভারতীয়, চীন, পারস্থ ও তিব্বতীয় কলা-পদ্ধতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঢেউ

আঁধার আলোয় ঐ যে চলে, ঐ যে ভাঙা ঢেউ
ধরতে পারে কেউ?
ঐ যে তাদের একটুখানি
ব্যাকুলতায় কাণাকানি
চুপি চুপি শুনতে পাওয়া যায়,
কে আছে রে ঐ তাহাদের ফিরিয়ে নিতে চায়?

আলো-কালোর স্রোতের টানা টানছে,—এবার তবে
ওমনি করেই চলতে মোদের হবে।
ঐ যে টানা অবিরত টেনেই শুধু চলে
তীর বিনে সেই অগাধ কালো জলে,
কখন্ কোথায় পাবে নূতন ঠাঁই
যেথায় ঢেউয়ের কান্না, হাসি, চলা,—কিছুই নাই।
ব্যাকুল হয়ে ধরতে পারে কেউ
ঐ জীবনের ঢেউ?

শ্রীঅরুণকান্তি বাগচী।

৩

রাত্রের সেই অত জল-ঝড়ের ব্যাপার-টাকে দুঃস্বপ্নের মত উড়াইয়া দিয়া প্রভাতের প্রথম আলো যখন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল, তখন ভিতর হইতে দ্বার-নাড়ার শব্দে বাহিরে সুষমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভিতর হইতে নিখিল অতি মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "মা—" পিঞ্জরা-বদ্ধ শাবককে দেখিয়া পক্ষী-মাতা যেমন বাহিরে পিঞ্জরের গায়ে নিষ্ফল আবেগে শুধু চঞ্চু আঘাত করিয়া আরো-নিরাশায় জর্জ্জরিত হয়, সুষমার মনটাও এই একান্ত অসহায় নিরুপায়তার মধ্যে তেমনি দ্বার-প্রান্তে মিথ্যা মাথা কুটিয়া মরিতে লাগিল। স্বামীকে সে ভালো করিয়াই জানে—দয়া করিয়া নিখিলের মুখে 'মা'-ডাকটুকু শুনিবার অধিকারই শুধু দিয়াছেন—নহিলে কোন্ মা ছেলের উপর এমন সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারে! অভয়াশঙ্করের কড়া আইন কোনমতেই এতটুকু টলিবার নয়—কাজেই এই নেহাৎ-অল্প পাইয়াই নিখিল ও সুষমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। সে শাসন-যন্ত্রের কাছে ক্ষুদ্র একটা নালিশ বা মিনতি তুলিবার সামর্থ্য তাহাদের কাহারো ছিল না।

তবু আজ এই অসহ্য নির্য্যাতনে সুষমার ভীরু প্রাণ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। যা হইবার হইবে, আর না—ভাবিয়া ভবিষ্যতের পানে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হইয়াই ছুটিয়া সে স্বামীর কাছে চলিল—ভাবিল, তাঁহার পায়ে পড়িয়া ভিক্ষা চাহিবে,—ওগো, সারা রাত্রিটা কাটিয়া গেল ত—যথেষ্ট হইয়াছে—এবার বাছাকে মুক্তি দাও।

ভিতরে দ্বারের ফাটলে চোখ রাখিয়া নিখিল আবার তেমনি মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, —মা—

—এই যে বাবা, সারা রাত আমি এখানে এই তোমারই কাছে ত রয়েছি ধন। যাই, ওঁকে ডেকে এনে দরজা খুলিয়ে দি। তুমি আর একটু চুপ করে থাকো, বাবা।

সুষমা উঠিয়া স্বামীর কাছে গেল। ঘরের দ্বার খোলা ছিল। খাটের মশারি তোলা। অভয়াশঙ্কর খাটে বসিয়া সাম্‌নের খোলা জানালা দিয়া বাহিরে কোথায় কোন্ সীমাহীন সুদূর আকাশের পানে আপনার উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন। সুষমা যতখানি সাহস লইয়া আসিয়াছিল, ঘরের মধ্যে পা দিতে তাহার অনেকখানি যে কোথায় উবিয়া গেল, সে তাহা জানিতেও পরিল না। সুষমা আসিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর শয্যা-প্রান্তে বসিল। স্বামীর পায়ের নখের উপর অতি সন্তর্পণে আপনার হাতটি রাখিয়া নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। অভয়াশঙ্কর হঠাৎ চোখ তুলিয়া বলিলেন,—এ কি, তুমি যে হঠাৎ এখানে, এমন সময়? রাত্রে ঐ ঘরের দোরেই পড়ে ছিলে, বুঝি?

—হাঁ। অতি মৃদুস্বরে কম্পিতভাবে সুষমা শুধু বলিল—হাঁ।

অভয়াশঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন,

পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—এত বড় বেয়াদবি ওর কাছে আমি মোটেই প্রত্যাশা করি নি। ঠিক শাস্তিই দিয়েচি।

সুষমার অন্তরের মধ্যে যে নারীত্ব, যে মাতৃত্ব অপূর্ব্ব দীপ্ত মহিমায় আসন পাতিয়া বসিয়াছিল, মুহূর্ত্তে সে জাগিয়া উঠিল—জাগিয়া নির্ভয় মুক্ত কণ্ঠে বলিল—কিন্তু ছেলেটা যে মরুতে বসেছে! যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে গো, সারা রাত একলাটি বন্ধ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা—এবার ওকে খুলে দাও।

—ও কিছু বলেছে?

—কি আর বলবে! যতক্ষণ জেগেছিল, কেবলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। দোরের এ-পাশ থেকে শুধু তার কান্নাই শুনেছি! তার সে চাপা কান্নায় আমার প্রাণ একেবারে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে। অথচ, কিছু করবার উপায় নেই, অধিকারও নেই আমার। জানিনা, কি দিয়ে ভগবান তোমার প্রাণটাকে গড়েছিলেন! এতও তুমি পারো! তবু ও তোমার নিজের ছেলে,—আর আমি ওকে পেটে ধরিনি!

—সুষমা—অভয়াশঙ্করের স্বরে একটা তীব্র সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

সুষমা বলিল,—তোমার কাছে বলেই বলচি। দেখতে পাচ্ছ কি, ছেলেটা দিন-দিন কি-রকম শুকিয়ে যাচ্ছে! রাত-দিন ও কি-সব ভাবে, বোধ হয়! ও যখন আমায় মা বলেই জানে, তখন আমার বুক থেকে অমন নিষ্ঠুরভাবে ওকে ছিনিয়ে নিয়ো না। তোমার ছেলে, ও তোমারই থাকবে—তবু যদি আমায় মা বলে ডাকে, একটু স্নেহের কাঙাল হয়ে যদি দুটো আব্দার জানাতে আসে ত আমায় সে স্নেহটুকু দিতে দিয়ো গো—সে আব্দারটুকু ওর যেন আমি রাখতে পারি—এইটুকু শুধু দয়া করো, এইটুকু ভিক্ষে দিয়ো। এটুকুর জন্যে তোমার সংসারে যদি সকলের নীচেও আমাকে থাকতে হয়, আমায় সবার অবজ্ঞা সইতে হয়, তাও আমি হাসি-মুখে সইতে পারব।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার মনে আছে, সুষমা—তোমার সঙ্গে আমার কি কথা ছিল?

—মনে আছে। ছেলে শুধু মা বলে আমায় ডাকবে, আর আমি তার মা না হয়েও মা সেজে তাকে ভুলিয়ে রাখব। বুঝবে যে, না, সে মাতৃহীন হয় নি। এ-ছাড়া ছেলের উপর আমার কোন অধিকার থাকবে না! তুমি ত জানো, এই পাঁচ বছর আমি নিখিলকে বুকে পেয়েচি, কখনো তোমার টানা গণ্ডীর বাহিরে যেতে দেখেচ তুমি আমাকে? সে অধিকারের সীমা আমি কোনদিন কি লঙ্ঘন করেচি? না। বুক আমার মমতার তৃষ্ণায় শুকিয়ে হা-হা করেচে, প্রাণ স্নেহের তাড়নায় খাঁ-খাঁ করেচে, তবু আমি জোর করে সে তৃষ্ণা মেটাতে যাইনি! আজ বড় অসহ্য বোধ হয়েচে, তাই বলচি—তাই এই মিনতি জানাতে এসেচি। দেখ, আমি নারী হলেও আমার মনটাকে একেবারে ছেঁটে ফেলতে পারিনি—এ মনে স্নেহ-ভালবাসা এখনো অগাধ অজস্র হয়ে ফুটে রয়েছে,—সেটার পানে চেয়ে একটু অধিকার আমায় দাও, শুধু ছেলেকে ছেলে বলে বুকে নেবার অধিকারটুকু!

—হুঁ—বলিয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তুমি চাও, নিখিলকে এখন ছুটি দেব? কেমন—?

—হাঁ।

—বেশ। চল, যাচ্ছি।

অভয়াশঙ্কর শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। সুষমা তাঁহার পায়ে হাত দিয়া বলিল,—ওগো, ঘরের চাবিটা আমার হাতে দাও,—আমি মা, আমি তাকে কোলে করে তুলে এখানে তোমার কাছে নিয়ে আসি।

মুখটা একটু বিকৃত করিয়া অভয়াশঙ্কর বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া সুষমার পায়ের কাছে মেঝের উপর ফেলিয়া দিলেন। সুষমা চাবি লইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বার খুলিতে নিখিলের যে-মূর্ত্তি সুষমার চোখে পড়িল, তাহাতে সে চমকিয়া উঠিল! গালদুটি শীর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে! অমন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ,কে যেন দুই হাতে ঘন করিয়া তাহাতে কালি মাখাইয়া দিয়াছে! আহা, বাছারে!

—মা—বলিয়া নিখিল সুষমার বুকে মুখ ঢাকিল—সারা রাত্রির একটা ক্ষুব্ধ অভিমান কান্নার শতধারে মুহূর্ত্তে অমনি ফাটিয়া পড়িল। সুষমাও চোখের জল সামলাইতে পারিল না। তার পর আঁচলে নিখিলের দুই চোখ মুছাইয়া গাঢ় স্বরে সুষমা বলিল,—ছি, বাবা আমার, সোনা আমার, লক্ষ্মীধনটি, আর কেঁদো না। চল, ওঁর কাছে চল। ওঁকে বলবে চল, আর কখনো অমন দুর্য্যোগে বাড়ীর বাহিরে থেকে ওঁকে ভাবাবে না! উনি বড্ড ভাবছিলেন কি না—বাবা, ঐ জলে-ঝড়ে সোনার ছেলে কোথায় পড়ে রইল—কত বিপদ হতে পারে—তাই উনি রাগ করেছিলেন।

করুণ স্বরে অভিমানের তীব্র বেদনা মিশাইয়া নিখিল বলিল,—কিন্তু আমি ত ইচ্ছে করে ছিলুম না মা। সেই জলে-ঝড়ে অন্ধকার পথে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, ভিজে কাঁপছিলুম,—চলতে পারছিলুম না আমি, তাই একটু ওদের বাড়ী দাঁড়িয়ে ছিলুম। তার পর একটু থামিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া আবার সে বলিল,—আমারও সারাক্ষণ কি ভয় হচ্ছিল না? কেবলি ভাবছিলুম, কখন বৃষ্টি থামবে, কখন বাড়ী যাব। মা-কালীকে কেবলি ডাকছিলুম—তারপর যেই বৃষ্টি থামল, অমনি তাদের সেই বনমালীকে নিয়ে চলে এসেচি।

নিখিলের দুই চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। পরম স্নেহে তাহার অশ্রু-ভরা চোখদুইটি আবার মুছাইয়া দিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া সুষমা বলিল,—ওঁরও মন খুব খারাপ হয়ে আছে—চোখ ফুলে রয়েছে—সারা-রাত উনিও ঘুমুতে পারেন নি। কেঁদেছেনও কত! ও ঘরে বসে আছেন, তোমাকে ডাকচেন, এসো বাবা—

চলি-চলি করিয়া নিখিলের পা যেন কিছুতেই আর চলিতে চাহিতেছিল না। স্নেহ-হীন কঠিন পিতার সম্মুখে আবার এই সকালে না জানি আরো কত ভৎর্সনা মিলিবে!

সুষমা তাহাকে বাহুর আশ্রয়ে লইয়া এক-রকম বুকে করিয়াই স্বামীর ঘরে আনিল। অভয়াশঙ্কর তখন খোলা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভিজা গাছের ডালে দুইটা কাক তখনো কেমন নিঝুমভাবে বসিয়া আছে। চারিধারে প্রভাতের স্নিগ্ধ সোনালি আলো ছিটাইয়া পড়িয়াছে, তবুও কালিকার

সেই দুর্য্যোগের অত-বড় নিরানন্দ ভাবটা সে-আলোয় যেন একেবারে কাটিয়া যায় নাই!

সুষমা নিখিলকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া বলিল,—এই নিখিল এসেছে। তুমি ওকে একটু আদর করে মুখ ধুয়ে নিতে বল ত গা। আমি ওর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।

অভয়াশঙ্কর ফিরিয়া পুত্রকে ডাকিলেন—নিখিল—

নিখিল মুখ তুলিয়া চাহিল। অভয়াশঙ্কর কোনরূপ ভূমিকা না ফাঁদিয়াই বলিলেন,—কাল তুমি খুব অন্যায় করেছিলে। আর কখনো যেন অমন না হয়। সাবধান! যাও, মুখ ধুয়ে খাবার খাও গে! খেয়ে পড়তে বসবে।

নিখিল যেন আরাম পাইয়া বাঁচিল। পিতার কাছে আর ভর্ৎসনা মিলিল না,—অন্ততঃ একটু কঠিন সুরও—এ যে সে একেবারে কল্পনাও করিতে পারে নাই। মার উপর কৃতজ্ঞতায় মন তাহার ভরিয়া উঠিল।

পিতার কাছ হইতে সরিয়া বাহিরে নীচে নামিয়া সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল এবং মার বুকে মুখ রাখিয়া বারবার উচ্ছ্বসিত মৃদু কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—মা, মা, মাগো আমার।

৪

সাত বৎসর পূর্ব্বে অভয়াশঙ্করের যখন পত্নী-বিয়োগ ঘটে, তখন নিখিলের বয়স সাড়ে তিন বৎসর। অভয়াশঙ্করের রিপু কয়টার প্রতাপ চিরদিনই দুর্জ্জয় রকমের—শুধু এই পত্নী লীলাই তাঁহার সেই দুর্জ্জয় রিপু কয়টাকে কোনমতে স্ববশে রাখিয়া ছিল। পত্নী লীলার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ এবং স্বভাবটুকুও অত্যন্ত কোমল—লীলার হাতে অভয়াশঙ্কর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন এবং নির্ভর করিয়া কোনদিনই তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। এই জন্যই ক্রমে লীলার হাতে অভয়াশঙ্কর আপনার অস্তিত্বটুকুকে বিসর্জ্জন দিয়া এমন হইয়া বসিয়া ছিলেন যে সর্ব্ব-কর্ম্মে লীলার হাত লীলার পরামর্শ না হইলে তাঁহার সমস্ত কাজই অকাজ হইয়া দাঁড়াইত।

এই পত্নীকে অকস্মাৎ হারাইয়া তাঁহার জীবনটা চক্রহীন রথের ন্যায় একেবারে মন্থর অচল হইয়া পড়িল। অথচ এরূপ জড়-পদার্থের মত পড়িয়া থাকিলেও চলে না! ঐ যে শিশুটি মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত হইয়া সংসারের কঠিন ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে সেই কঠিন ভূমিশয্যা হইতে তুলিয়া ধরিতে হইবে—তাহাকে মানুষ করিয়া তোলায় একটা গুরু রকমের দায়িত্ব আছে—নহিলে অভয়াশঙ্করের পুত্র যে কালে বওয়াটে বখা হইয়া সমাজে বিচরণ করিয়া তাঁহার নাম ডুবাইয়া দিবে, এই আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশি কাঁটার ন্যায় খচ্‌খচ্‌ করিতে লাগিল। অথচ সংসারে কোন আকর্ষণ বা স্পৃহা নাই—আঁটিয়া বাঁধিবার মত শক্তিও হারাইয়া বসিয়াছেন। অনুগত আত্মীয়-জনের প্রাণহীন সেবা-পরিচর্য্যায় প্রাণটাকে কোনমতে বাঁচাইয়া রাখা গেলেও সে ঐ খাইয়া পরিয়া পঙ্গুর মতই পড়িয়া থাকে মাত্র। তাহার স্প্রীংগুলা যে বিকল হইয়া গিয়াছে, আপনা হইতে নড়িবার বল সে পায় না—হাত দিলে চলে, নহিলে অচল অক্ষম হইয়া যায়—তাঁহারও জীবনটা ঠিক এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিখিলও

বাড়ীর চাকর-বাকর ও অনুগত জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীদের হাতে-হাতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে মাত্র—সম্পূর্ণ কেন্দ্রহীন লক্ষ্যহীন হইয়াই তাহার ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে—সে ভবিষ্যৎ দাসী-চাকরের কচ্‌কচি ও সনাতন উপদেশ-বাক্যের একটা জড়স্তূপ মাত্র—বর্ত্তমানের সহিত বা প্রাণের সহিত তাহার কোন যোগ নাই—এ যেন নিতান্তই খাপছাড়া এলোমেলো ধরণের একটা রূঢ় ভবিষ্যৎ! কোনদিন ইহাদের মনোযোগের মাত্রা বেশী হইল ত দিনে অমন সাতবার সাতজনে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া খাওয়াইয়া দিল, যত্ন করিল, আবার যেদিন একজনের মনোযোগ একটু শিথিল হইল ত সেদিন সকলেই সে শিথিলতায় গা ঢালিয়া দিল। নিখিলের ভাগ্যে সেদিন আর কিছুই মিলিল না—কাঁদিয়া-কাটিয়া বিপর্য্যয় রকমের গণ্ডগোল তুলিয়া সে বাড়ী-শুদ্ধ সকলকে বিব্রত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

এমনই গতিক দেখিয়া একদিন রাগের ঝোঁকে ছেলেকে তাহার দিদিমার কোলে ফেলিয়া দিয়া অভয়াশঙ্কর পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রথমেই গেলেন, কাশী। সাধু-সন্ন্যাসী-দের দিকে কোনদিনই তাঁহার ঝোঁক ছিল না, তাই কাশীতে সে ধারটায় তিনি মোটেই ঘেঁস দিলেন না। দুই-চারিজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আসিয়া সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া বৃথা শোকে কাতর হইতে নিষেধ করিল। কেহ পরামর্শ দিল—একটা মস্ত বন্ধন যখন কাটিয়াছে, তখন ছেলের প্রতি যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বাকী সময়টুকু ধর্ম্মে উৎসর্গ করিয়া দাও—অর্থাৎ সাধুদের জন্য আশ্রম খুলিয়া মঠ তুলিয়া আর্ত্তের সেবার ভার লইলে পরকালে চরম শান্তি-সুখ-ভোগের অধিকারী হইবে। এমনি নানা উপদেশের মধ্যে তিনি যখন তাঁহার জমিদারী ও অর্থরাশিকে নিজেদের কাজে খাটাইয়া লইবার পক্ষে ঐ-স বন্ধুদের অদম্য রকমের উৎসাহ দেখিতে পাইলেন, তখন কাশী ছাড়িয়া একেবারে আসিলেন, লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া বড় বড় পথ-ঘাট, ধূলি ও লোকের জঞ্জাল এবং মসজিদ মিনার প্রভৃতির ভিড়ে ভারী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, লক্ষ্ণৌ আর ভালো লাগিল না—অমনি ছুটিলেন, প্রয়াগে। এমনি করিয়া একবৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া মন যখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন শ্বশুরবাড়ী হইতে এক টেলিগ্রাম গিয়া উপস্থিত, খোকার খুব অসুখ।

হায়রে, এত ঘুরিয়াও সংসারের মায়া, কৈ, ঘুচিল না ত! ঘুচাইতে চায় কে? এমন সুন্দর পৃথিবী—ঐ চাঁদ, এই স্নিগ্ধ বাতাস, ঐ স্বচ্ছ নীল আকাশ, এই লোক-জন—ইহাদের ছাড়িয়া কোমরে গেরুয়া জড়াইয়া কোথায় কোন্ অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মটাকে খোয়াইয়া একেবারে জড়স্তূপে পরিণত করিয়া তুলিবেন! তা-ছাড়া নিখিল? সে বেচারা একেই ত মাকে হারাইয়াছে, আপনার বলিয়া কাহার মুখের পানে সে চাহিবে? যখন বড় হইয়া সে দেখিবে, তাহার খেলার সঙ্গীরা বেদনা পাইয়া, দুঃখ পাইয়া, কলহ করিয়া মায়ের কোলে চলিয়াছে—জুড়াইবার জন্য,—তখন সে তার করুণ চোখদুটি মেলিয়া কাহার কোল খুঁজিবে? বাপ! সেই বাপ এত দূরে! না,—অসম্ভব!

তল্পী গুটাইয়া অভয়াশঙ্কর দেশে ফিরিলেন।

নিখিল সারিলে শাশুড়ী বলিলেন,—খোকাকে আমার কাছেই রাখো, বাবা। তবু ওকে দেখলে আমার বুক একটু জুড়োয়।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—ওকে ছেড়ে আমি একলা থাকব কি করে?

শাশুড়ী বলিলেন—আমার কাছেই তুমি যদি থাকো, বাবা—

—না।

সে কি হয়! অভয়াশঙ্করের কত বড় নাম—বংশের ইজ্জৎ কতখানি! ছেলে মামার বাড়ী থাকিয়া তাহাদের প্রথা মানিয়া বড় হইবে, মামার বাড়ীর চাল-চলনেই অভ্যস্ত হইবে, আর পিতৃ-বংশের কথা কিছুই সে জানিবে না—এত বড় আশঙ্কা যেখানে, সেখানে কি ছেলেকে রাখিয়া মানুষ করা চলে? না।

নিজেরও কিন্তু চারিদিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া চালাইবার মত শক্তি নাই! এইটুকু ছেলের প্রত্যেক খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিয়া পুরুষের পক্ষে চলা—সেও যে এক অসম্ভব ব্যাপার! সে ধৈর্য্যই বা কৈ! তাঁহাকেও ত কিছু একটা কাজ লইয়া থাকিতে হইবে! অভয়াশঙ্কর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু শুধু বসিয়া চিন্তা করিলেও চলিবে না ত! তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া নিখিলকে লইয়া নিজের গৃহে ফিরিলেন।

সেই পরিচিত ঘর,—প্রেমের অজস্র স্মৃতি-ভরা সেই সহস্র সুখের লীলা-কুঞ্জ! এতদিনের অনুপস্থিতিতে এই ঘরের প্রত্যক ইটখানা অবধি যেন সেই স্মৃতির সৌরভে ভরপূর হইয়া রহিয়াছে। দাসী-চাকর অনুগত আত্মীয়-স্বজন আবার বুক পাতিয়া নিখিলকে বুকে তুলিয়া লইল। তাহার পরিচর্য্যার আবার তেমনি ঘটা পড়িয়া গেল। অভয়াশঙ্কর দেখিলেন,—মস্ত একটা সোর-গোল চলিতেছে! তিনি কি-ভাবে ছেলেকে মানুষ করিতে চান,—তাঁহার ছেলের মনের গতি তাঁহারই অনুরূপ হইবে—তাঁহার রুচি-অরুচি, তাঁহার প্রকৃতি ছেলেতে যদি না বর্ত্তাইল, তাহা হইলে যে বংশ-ধারার মস্ত একটা শৃঙ্খলই কাটা থাকিয়া যাইবে! কিন্তু এ শৃঙ্খল কি করিয়া অটুট রাখা যায়! এই চিন্তাই অভয়াশঙ্করকে নেশার মত পাইয়া বসিল। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, একটি মাত্র উপায় আছে। পিতা ও পুত্রের মধ্যে এই শৃঙ্খলের কাজ করে,—স্ত্রী! আজ যদি লীলা থাকিত, তাহা হইলে কি আর নিখিলকে লইয়া এত ভাবনা ভাবিতে হয়! নিখিলের চলা-ফেরায়, সকল কাজে লীলা তখনি তাহাকে সতর্ক করিয়া দিত—ছি বাবা, উনি এটা ভালো বাসেন না, করো না।—এইটি ওঁর খুব ভালো লাগবে, তুমি করলে।—এই দ্যাখো, ওঁর ছেলে-বেলার ছবি—কেমন দেখ্‌চ?—এমনি করিয়া বাপের প্রকৃতি-গত প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি ছেলের চোখের সামনে ধরিয়া দিলেই না ছেলে বাপের প্রতিবিম্ব হইয়া দাঁড়াইতে পারে! বাপ কি বইখানি পড়িতে ভালোবাসেন, বাড়ী ফিরিয়া নিখিলের কাছ হইতে কোন্ আচরণ, কিরূপ অভ্যর্থনাটুকু পাইলে আনন্দ পাইবেন, বাপের সঙ্গে সে কি কথা বলিবে, কোন্ ছড়াটি নূতন শিখিয়া শুনাইবে, এ-সব কথা তেমন করিয়া ছেলেকে কে বুঝাইবে! ছেলের বাপের প্রতি একটা দুশ্চেদ্য

আকর্ষণ জন্মিবে,বাপকে সে কায়-মনে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে কি করিয়া? বাপকে ছেলে ভালবাসিতে শিখিবে, ছোট-খাট সেবায় বাপের প্রাণের মধ্যে মণিদীপ জ্বালিয়া দিবে! কাজ-কর্ম্মের সকল শ্রান্তি তবেই না বাপ ছেলের মুখ দেখিয়া ভুলিতে পারিবেন! এমনি করিয়াই ছেলে বংশের মর্য্যাদা শিক্ষা করে, এমনি করিয়াই বংশের চিরন্তন জীবন-তরঙ্গটুকুতে সে নিজের জীবন-তরঙ্গ মিশাইতে পারে।

অভয়াশঙ্কর ভাবিলেন—যদি দেখিয়া শুনিয়া একটি বুদ্ধিমতী তরুণীকে বিবাহ করিয়া তাহারই হাতে ছেলের এই প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা যায়—! বিবাহ করিলেই কি আর সে লীলার আসন অমনি কাড়িয়া লইতে পারে? অসম্ভব! লীলা—সে যে অন্তরের ধন, অন্তর-ময়ী হইয়া অন্তরেই সে মিশাইয়া রহিয়াছে—সে ত আলাদা স্বতন্ত্র জীব নয়, সে যে এই অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া কায়ে মনে এক হইয়া গিয়াছে—তাহার সহিত যে মিলন, মৃত্যুর কঠিন কুঠারেও তাহা ছিন্ন হইবার নয়—বাহিরের খোলসটা সে ছিঁড়িতে পারে, ভিতরটা তেমনি পরিপূর্ণ আছে, অটুট আছে, এবং চিরদিন তেমনি থাকিবে!

৫

সন্ধান করিয়া পাত্রী মিলিল, সুষমা।

সুষমা লীলারই দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়-কন্যা। সুষমার পিতার অবস্থা ভালো না হইলেও কল্‌চারের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল বিলক্ষণ। মেয়েটিকেও তাই সর্ব্ব-গুণসমন্বিতা করিয়া তুলিয়া ছিলেন। লেখাপড়ায় সুষমার যেমন মন ছিল, রান্না-বান্না,সেবা-শুশ্রূষা, সংসারের এমনি সহস্র কাজে-কর্ম্মেও তেমনি তাহার অনুরাগ ছিল। রূপে লক্ষ্মী আর গুণে গুণময়ী মেয়ে। সুষমার পিতার মনে এ আশা বিলক্ষণ ছিল, তাঁহার অর্থ নাই বটে, তবে যদি কোন শিক্ষিত ধনীর চোখ থাকে, তবে সে অর্থ ফেলিয়া তাঁহার মেয়েকে শুধু চোখে দেখিয়াই বধূ করিয়া বুকে তুলিয়া লইবে,—এবং হইলে তাহাকে এতটুকু ঠকিতে হইবে না।

সুষমার বয়স যখন তেরো বৎসর—বিবাহের সন্ধান চলিতেছে,—তখন তাহার স্নেহময় পিতা অনেক টাকা দেনা, রুগ্না স্ত্রী ও এই অরক্ষণীয়া মেয়েটীকে রাখিয়া ইহলোকের সহিত সব সম্পর্ক কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। অভয়াশঙ্করের শাশুড়ী সংবাদ পাইয়া সুষমা ও তাহার মাকে আপনার বাড়ীতে আনাইলেন। সুষমার রুগ্না মাতা রুগ্ন দেহে স্বামীর শোক সহিতে পারিলেন না; এবং স্বামীর মৃত্যুর ঠিক চারমাস পরে তিনিও স্বামীর অনুগমন করিলেন। সুষমা অনাথ হইল।

এই সময় শাশুড়ীর অসুখ হইলে অভয়াশঙ্কর তাঁহার অনুরোধে নিখিলকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, এবং শাশুড়ীর কথায় নিখিলকে আনিয়াই লইয়া যাইতে পারিলেন না। নিখিল দিদিমার কাছে রহিল—তাহার দেখা-শুনার ভার লইল সুষমা। মাসি—বলিয়া ডাকিতে শিখাইলেও সে সুষমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া থামিয়া গেল, বাকীটুকু কিছুতেই বলিল না। সুষমা লজ্জায় রাঙা হইয়া নিখিলকে বুকে টানিয়া তাহার মুখে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিল। নিখিল সুষমার একান্ত বশীভূত হইয়া উঠিল।

শাশুড়ী আরোগ্য হইলে অভয়াশঙ্কর নিখিলকে লইতে আসিলেন। নিখিল বাপের কোলের কাছে আসিয়া ডাকিল,—মা। বাবা মাকে তুমি দেখচ?

অভয়াশঙ্কর চাহিয়া দেখেন, ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চাঁদের মত কান্তি লইয়া এক যৌবনোন্মুখী বালিকা। এই সুষমা! অভয়াশঙ্কর সস্মিত দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া বলিলেন,—শুনছিলুম, এ না কি তোমার ভারী বশ হয়েছে!

সলজ্জ মৃদু হাসির কণা ঠোঁটে ফুটাইয়া সুষমা বলিল—আমায় খুব ভালবাসে, নিখিল।

—নিখিলকে যদি নিয়ে যাই, তাহলে ওকে ছেড়ে তুমি থাকবে কি করে?

সুষমার মুখখানি নিখিলের অসন্ন বিরহের আশঙ্কায় মলিন হইল। সে কোন কথা বলিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তাহলে তোমার খুব মন কেমন করবে, না?

সুষমা শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—হাঁ।

এমন সময় শাশুড়ী সেইখানে আসিয়া বলিলেন—সুষু, যাও ত মা, অভয়ের জন্যে পাণ সেজে আনো ত। আর ঐ আমার ঘরে টেবিলের উপর জলখাবার রেখে এসেচি—এদের বাপ-বেটার জন্যে, তাও অমনি নিয়ে এসো, মা।

সুষমা চলিয়া গেলে শাশুড়ী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নিখিল তখন মামার কুকুরের নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশলের কাহিনী বলিতেছিল—অভয়াশঙ্কর অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে ছেলের মুখে মধুর সুরের সে কাহিনী শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নিখিল বলিল, দেখবে বাবা,—ঐ কুকুরের গলার জন্যে ঘুঙুর-বাঁধা কেমন ফিতে মা তৈরি করে দেছে! মা কেমন ভালো! আমি যা বলি, মা তাই শোনে, বাবা। বাবা, আমার সঙ্গে মাকেও কিন্তু বাড়ী নিয়ে যেতে হবে, নাহলে আমায় সেখানে খাইয়ে দেবে কে? নাইয়ে দেবে কে? আমি বামুনদির হাতে আর খাব না, যে হলুদের গন্ধ! ভর্ত্তুর কাছেও নাইব না আর, হুঁ—বলিয়া সে কুকুরের গলার ঘুঙুরবাঁধা ফিতা আনিতে ছুটিয়া গেল।

নিখিল বাহিরে গেলে শাশুড়ী বলিলেন—বাবা, তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে।

অভয়াশঙ্করের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—বুঝি, তাঁহারই অন্তরের কথা চোখের দৃষ্টি দিয়া বেফাঁস্ হইয়া গিয়াছে! তিনি বলিলেন,—কি, বলুন?

—বলতে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে বাবা, তবু আমি না বললেই বা কে বলে! তুমি আর একটি বিয়ে কর বাবা—কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই শাশুড়ীর চোখে জল আসিল।

অভয়াশঙ্কর মাথা নীচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—তোমার এই বয়স,—তা ছাড়া এই ছেলেটাকেই বা কে দেখে-শোনে, বল? ঝী-চাকরের হাতে কি ছেলে মানুষ হয়, কখনো? ছোটলোকের হাতে রাখলে ছেলে-পিলের প্রবৃত্তিও ছোট হয়ে যায়! ঐ ছেলের মুখ চেয়েই তোমায় আবার বিয়ে করতে হবে। আমার বরাত—না হলে এ কথাও আমায় মুখ দিয়ে বার করতে হল!

শাশুড়ী চোখের জল মুছিলেন—জল মুছিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন—আমি ত তোমায় জামাই বলে দেখিনে, কোনদিন—তুমি আমার পেটের ছেলেই। আমার বলাই যে, তুমিও সে—তা দেখো বাবা, এই যে মেয়েটিকে দেখলে, সুষু—ওর নাম সুষমা—যেমন বুদ্ধি, তেমনি গুণ—আমার লীলারই ছায়া যেন! মনে হয়, আমার সে-ই আবার আমার কাছে সুষমা হয়ে ফিরে এসেচে। মা-বাপ নেই,—সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই—ওর মুখের দিকে চাইতে কেউ নেই, আহা! এই মেয়েটির সব ভার এখন আমারই উপর। আমি যদি আজ চোখ বুজি, তা হলে ওকে পথে দাঁড়াতে হবে। তাই বাবা বলছিলুম,—তাছাড়া তোমার নিখিলের উপর ওর কি মায়া—আর ছেলেটাও তেমনি, ওকে মা বলতে অজ্ঞান! যত বলি, মাসি বলবি—তা বলবে না—কেবলি ঐ নাম বলে ডাকবে! উঃ—শাশুড়ী চুপ করিলেন; তাঁহার দুই চোখ বহিয়া অজস্রধারে জল নামিল। অভয়াশঙ্করের চোখও সজল হইয়া উঠিল। মনে পড়িল, এই ঘরেই একদিন ডিপায় ক'টা পাণ পড়িয়াছিল বলিয়া লীলা সকৌতুক অভিমান করিয়া বলিয়াছিল,—আমার হাতের পাণ মুখে আর রোচে না বুঝি! বেশ, নতুন দেখে একটি আনো—এনে নতুন হাতের পাণ খেয়ো—! তখন তিনিও জবাব দিয়াছিলেন—নতুন হাতে চুন বেশী হবে। শেষে নতুন হাতের পাণ খেয়ে গাল পুড়িয়ে ফেলব কি!

আর আজ এ সেই ঘর—আর এই এক দিন! আর এই-সব কথাবার্ত্তা—নতুন হাত,—সে-ও পাণ সাজিয়া আনিতে গিয়াছে, তাঁহারই জন্য! অদৃষ্টের কি কঠিন পরিহাস!

শাশুড়ী চোখ মুছিয়া বলিলেন,—বল বাবা—সুষুকে নেবে ত? আমার মা-হারা নিখিল ওকে মা বলে ডেকেছে যখন, ওকেই তখন ও মা বলে জানুক, সুষুই নিখিলের মা।

অভয়াশঙ্কর কিছু বলিতে পারিলেন না—পাশে একটা শোফা ছিল—সেই শোফায় বসিয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিলেন। তাঁহার সমস্ত মনটা গলাইয়া ভাসাইয়া চোখে অশ্রুর সাগর উছলিয়া উঠিল।

এমন সময় সুষমা জল-খাবারের রেকাবি লইয়া ঘরে ঢুকিল—পিছনে অমনি নিখিল আসিয়া—মা, বাবাকে দেখাচ্ছি, তোমার তৈরী ঘুঙুর-বাঁধা ফিতেটা—এসো না মা, বাবার কাছে। দিদিমা ভাখো না, তুমি। ভুবুর মা কেমন ভুবুর সঙ্গে আর তার বাবার সঙ্গে বসে গল্প করে—আমি মাকে বলছিলুম, তা মা বলেছিল, বাবা এলে অমনি-ধারা মাও বাবাকে নিয়ে আমাকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে গল্প করবে। আজ বাবা এয়েচে, তবু মা শুনচে না!

শাশুড়ী বলিলেন—শোনো বাবা অভয়, ছেলে সব গড়ে রেখেচে—ওর এ সুখটুকু ভেঙ্গে দিয়ে ওকে এ জিনিষ থেকে আর বঞ্চিত করো না, বাবা।

নিখিল তখন দিদিমার কাছে গিয়া বলিল—ভাখো না দিদিমা, মা বাবার সঙ্গে কথাও কইবে না,—বাবার কাছে আসবেও না! হুঁ, আমি জানি গো, সব জানি—মার খুব অসুখ করেছিল বলে মা হাওয়া খেতে গেছল, তাই বাবার কাছে আমি একলাই ছিলুম।

আমি জানি, আমি তখন ছোট ছিলুম ত, তবু আমি কাঁদিনি, সত্যি। মার জন্তে আমি কেঁদেচি কি, বাবা? বুজু কাঁদে। তার মা সেদিন তাকে রেখে বুজুর মামার বাড়ী নেমন্তন্ন গেছল, আর বুজুর কি কান্না! বুজু বোকা মেয়ে। মা কোথাও গেলে কাঁদে বুঝি? মা ত আবার আসবে! না দিদিমা?

দিদিমা, অভয়াশঙ্কর, সুষমা,—তিনজনেই নিঃশব্দে নিস্পন্দ বসিয়া। কাহারও মুখে কথা নাই! দেখিয়া নিখিল বলিল—বাবে, তোমরা গল্প করবে না? আমি যাই তবে বুজুদের ঘরে। বুজু কি করচে, দেখিগে। তাকে ডেকে আনি, বলিগে,আয় ভাই খেলি। আবার বাবার সঙ্গে চলে গেলে খেলা হবে না ত! বলিয়া সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

শাশুড়ী ডাকিলেন,—সুষু, কাছে আয় ত মা। সুষমা কাছে আসিলে তিনি তার ডান হাতটি ধরিয়া জামাতার কাছে আসিলেন, এবং একান্ত স্নেহে তাঁহার হাতটা তুলিয়া সুষমার হাত সেই হাতে রাখিয়া বলিলেন,—একে নাও বাবা—আমার লীলার বদলে লীলার জায়গায় আজ থেকে একেই বসাও তুমি। সব দিকে তোমার ভালো হবে। আমি মা—প্রাণ খুলে আজ এ আশীর্ব্বাদ করচি। সুষু, নিখিল সত্যিই তোর ছেলে। ওর সব ভার তোর হাতে দিয়ে আমিও এখন নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব। তোরা দু'জনে আমার এ শেষ সাধটুকু পূর্ণ করিস্—এটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করিস্ নে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

যজ্ঞ-কথা।—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। কলিকাতা, ১৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা দুই আনা। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক যজ্ঞ-সমূহের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছিলেন,—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোম, ইষ্টিযোগ ও পশুযোগ সোম-যাগ, পুরুষ যজ্ঞ—সেইগুলি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে স্বর্গীয় আচার্য্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় সর্ব্বত্র পাই; প্রবন্ধগুলি জ্ঞান-গম্ভীর হইলেও এগুলির ভাষা এমন সরল, রচনার ভঙ্গী এমন সহজ যে নিতান্ত অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এ প্রবন্ধপাঠে চমৎকৃত হইবেন, বিষয়গুলি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিচিত্র জগৎ।—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। কলিকাতা, এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে বিজ্ঞান-বিদ্যার বাহ্যজগৎ, বাণইরিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, বাস্তব জগৎ, জড়জগৎ, বৈজ্ঞানিকের আকাশ, প্রাণময় জগৎ, প্রাণের কাহিনী, প্রজ্ঞার জয়, চঞ্চল জগৎ,—এই কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। অনন্য-সাধারণ সরল ভাষায় ও সহজ ভঙ্গীতে বিজ্ঞানের এত বড় বড় কথার আলোচনা পাঠ করিয়া আচার্য্য-প্রবরের চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্য, এবং বুঝাইবার শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



জন্মাষ্টমী

কান্তিক প্রেস•

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৮ [৩য় সংখ্যা

ব্রিটিশ-শাসনের এক যুগ

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসন-কালে চারিটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। তাহাদের মধ্যে একটী বঙ্গের প্রসিদ্ধ রাজা নন্দকুমারের সম্বন্ধে; অপর তিনটি বঙ্গের বাহিরের ঘটনা। একটী রোহিলা যুদ্ধ, দ্বিতীয় বারাণসী-রাজ চৈৎসিংহের রাজ্যচ্যুতি এবং তৃতীয় অযোধ্যার বেগমদিগের ধন-সম্পত্তি-অপহরণ।

ভারতে ইংরজে-শাসনের ভিত্তি যাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্থান সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু হেষ্টিংসের সময়ে নানা যুদ্ধ-বিগ্রহসত্বেও কোন নূতন দেশ, সুবা বা পরগণা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত হয় নাই। এই প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদয় হয় যে, কিরূপে হেষ্টিংস ইংরেজ-রাজত্বের সীমা স্থির রাখিয়া Empire-builder বা সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা আখ্যা লাভ করিলেন? তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্লাইব বঙ্গদেশ জয় করিয়া ও মোগল-বাদশাহের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ করিয়া, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ণওয়ালিস টিপু সুলতানকে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অর্দ্ধেক রাজত্ব অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মারহাট্টাগণকে আর নিজামকে তাহাদের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য কিছু ভাগ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-রাজ্য তৃতীয় মহীশূর-যুদ্ধের পর বেশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। হেষ্টিংসের শাসন-কালে যুদ্ধ-বিগ্রহ ত কম হয় নাই—রোহিলাযুদ্ধে ১৭৭৪ সালে হেষ্টিংস রোহিলখণ্ড জয় করিয়াছিলেন, মারহাট্টা-যুদ্ধে রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষে নানা ফাড়ন্‌বিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় মহীশূর-যুদ্ধে হায়দার আলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রাজ্য তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত করেন নাই। রোহিলখণ্ড অযোধ্যার নবাব

পাইলেন, হেষ্টিংস কেবল ৪০ লক্ষ টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে হায়দার আলির মৃত্যুর পরে টিপুর সহিত মাঙ্গালোরে যে সন্ধি হয় তাহাতে দুই পক্ষই নিজেদের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন। কেবল মারহাট্টা-যুদ্ধে ইংরাজ সালসেট ও এলিফেণ্টা এবং দুটী ক্ষুদ্র দ্বীপ পান। হেষ্টিংসের ১৭৭২ সাল হইতে ১৭৮৫ সাল অবধি ১৩ বৎসর-ব্যাপী সুদীর্ঘ ভারত-শাসনকালে এই তিনটী স্থান ইংরেজ রাজত্বের আয়ত্তে আসে। হেষ্টিংস ব্রিটিস সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা আখ্যা যে লাভ করিয়াছেন, তাহা বিস্তৃত ভূখণ্ড জয় করিয়া নহে, তাহা অন্য উপায়ে। কাশীরাজ চৈৎসিংহের তিনি অনেক লাঞ্ছনা করেন, তাহাতে কাশীর অধিবাসীগণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ হেষ্টিংস প্রশমিত করিলেন, কিন্তু বারাণসী তিনি কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত করিলেন না, চৈৎসিংহের বংশের এক বালককে কাশীর সিংহাসনে বসাইলেন। তিনি কলে-কৌশলে প্রত্যন্ত-নৃপতিগণের গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব করিয়া এবং রোহিলখণ্ড ও বারাণসী স্বপক্ষীয় রাজন্যবর্গের অধীনে আনিয়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিস্তৃতির পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের সুপ্রসিদ্ধ চারিটী ঘটনার মধ্যে একটী এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বারাণসী রাজবংশের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিশেষ সদ্ভাব ছিল। ইহার বিশেষ কারণও ছিল। উপকারে না আসিলে ইংরেজের সহিত সদ্ভাব থাকে না। আর এ-যুগে যাহাকে আমরা Co-operation বা সহযোগ বলি, কাশী-রাজ ইংরেজদিগের সহিত সেইরূপ Co-operation খুব বেশী-রকম করিয়াছিলেন, এমন কি নিজেদের প্রভুর বিরুদ্ধেও। বলবন্ত সিংহ তখন কাশীর রাজা। ১৭৬৪ সালে ইংরেজের সহিত অযোধ্যার সুবেদারের মনোমালিন্য হইল। কাশীরাজের বিশেষ বিপদ, তিনি কি করেন? তাঁহার অবস্থাও সুবিধার নয়। তিনি তখনও নামে সামন্ত-রাজ, তাঁহার প্রভু অযোধ্যার সুবেদার। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বাধীন নৃপতির সব অধিকার ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সহিত সুবেদারের যুদ্ধ বাধিলে তিনি কি করেন? নূতন শক্তি যে বাঙ্গলাদেশ জয় করিয়া ভারত-ভূমি ক্রমে ক্রমে করতল-গত করিতেছে, তাহার সহিত যোগদান করিয়া পুরাতন প্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন, কি সামন্ত-রাজের যাহা কর্ত্তব্য—মীরকাসেম ও সুবেদারের জন্য নিজের শক্তি, অর্থ, প্রাণ, সব পণ করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবেন? এই সঙ্কট-কালে ধূর্ত্ত বিবেচক বলবন্ত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা করেন তাহাই করিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে সুবেদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করিলেন না বা ইংরেজের পক্ষে যোগও দিলেন না। বাহিরে এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন তিনি কোন পক্ষেই নাই, একেবারে নিরপেক্ষ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ইংরেজের যথাসাধ্য সহায়তা করিলেন। ইংরেজ তাঁহার উপর বিশেষ প্রসন্ন হইলেন, বিলাতে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া ডেস্‌পাচ্ পাঠানো হইল। তাহার উত্তরে ডাইরেক্টরগণ ১৭৬৮ খৃঃ অঃ ২৬শে মে তারিখে যে চিঠি বঙ্গদেশের গবর্মেণ্টকে পাঠাইয়াছিলেন, মিদের

ইতিহাসে (পঞ্চম খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়) তাহার উল্লেখ আছে। রাজা বলবন্ত ভাবিলেন যে, তাঁহার উপকার ইংরেজ সহজে ভুলিবেন না—ডিরেক্টরগণ তাঁহার সহায়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন! কিন্তু উপকারের কি প্রত্যুপকার তাঁহার বংশধর ইংরেজের নিকট পাইবেন, তিনি তখন তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

ইংরেজের সহিত সুবেদারের যুদ্ধ যখন শেষ হইল, বলবন্ত তখন আরও বিপদে পড়িলেন। সুবেদার তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বলবন্ত যদি বিশ্বাসঘাতকার জন্য কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, তাহাতে ইংরেজের বিপদ। সেইজন্য ইংরেজ তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন; এবং এলাহাবাদে যে সন্ধি হইল তাহাতে বলবন্তের স্বপক্ষে এক সর্ত্ত রহিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহার জামিন স্বরূপ রহিলেন।

১৭৭০ সালে রাজা বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়। অযোধ্যার নবাব-উজীর তখন আবার বারাণসী নিজ-করতলগত করিতে চেষ্টা করিলেন। যাহাতে বলবন্তের পরিবারভুক্ত কেহ কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় না হন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। এবারও ইংরেজের সহায়তায় বলবন্তের পুত্র চৈৎসিংহ পিতার সিংহাসন লাভ করিলেন। এই সুযোগে অযোধ্যার নবাব কাশীর বার্ষিক রাজস্ব কিছু বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। ১৭৭৩ সালে এই সব সর্ত্ত পুনরায় হয়। হেষ্টিংস স্বয়ং সেই সময় কাশীতে যাইয়া নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং চৈৎসিংহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া বন্দোবস্ত বজায় রাখেন। তাঁহার সম্মুখেই দলীলে সহি হয় এবং তিনিও তাহাতে সাক্ষীস্বরূপ সহি করিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত আমরা হেষ্টিংসের ১৭৭৩ সালের রিপোর্টে পাই। তাহা ফরেষ্ট সাহেবের State papers গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ৫৬ পৃষ্ঠায় ছাপা আছে।

১৭৭৫ সালে নবাব সুজাউদ্দৌলা কাল-গ্রাসে পতিত হন। আসফউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব-উজীর হইলেন। এই সুযোগে ইংরেজ বারাণসীর উপর নবাব-উজীরের যে অধিকার তাহা এক সন্ধির দ্বারা পাইলেন। রাজা চৈৎসিংহ পূর্ব্বের মত কাশীর অধিপতি রহিলেন। নিয়ম-মত এক নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর দেওয়া ব্যতীত স্বাধীন নৃপতির অন্য সকল অধিকার তাঁহার বজায় রহিল। এই সন্ধির বলে তিনি অযোধ্যার নবাব-উজীরের সামন্ত-রাজ না থাকিয়া ইংরেজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসিলেন। এই বন্দোবস্তের কি বিষময় ফল চৈৎসিংহের অদৃষ্টে ছিল, ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

রাজা চৈৎসিংহ তাঁহার বার্ষিক কর নিয়মমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিতেন। মিল বলিয়াছেন যে, চৈৎসিংহের মত হিন্দুস্থানের কোন রাজা এরূপ নিয়ম-মত রাজস্ব পাঠাইতেন না। বোধ হয় ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ। ১৭৭৮ সালে গবর্ণর জেনেরাল হেষ্টিংস টাকার অভাবে বিপদে পড়িলেন। হেষ্টিংস আদেশ করিলেন, যেন চৈৎসিংহ সে বৎসর বার্ষিক কর এবং ৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর দেন। চৈৎসিংহ সেরূপ অতিরিক্ত কর দিতে কোন

রূপে বাধ্য ছিলেন না। ইংরেজ ঐতিহাসিক অনেকে ফরেষ্ট, ট্রটার, উইলসন প্রভৃতি বলেন যে, চৈৎসিংহের নিকট এরূপ অতিরিক্ত কর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দাবী করিতে পারিতেন। মিল, মেকলে, বার্ক,—ইঁহাদের অন্য মত। এই বিষয়ের স্থির-মীমাংসা সহজসাধ্য নহে। পরে আমরা ইহার আলোচনা করিব। তবে ইহা নিশ্চয় যে ১৭৭০ সালে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পরে বারাণসী যখন ইংরেজের অধিকার-ভুক্ত হয়, তখন চৈৎসিংহের বার্ষিক কর ভিন্ন আর কোন অতিরিক্ত কর দানের কোন সর্ত্ত স্থির হয় নাই। যাহা হউক চৈৎসিংহ হেষ্টিংসের আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকা ইংরেজ-সরকারে প্রেরণ করিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাহাড়ে

চলন্ত রেল গাড়ীর মধ্যে বসে নব-বিবাহিত দম্পতী হিরণ ও সুধা অনিমেষ নয়নে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখছিল। দার্জ্জিলিং মেল তখন ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে-খেতে শ্রান্ত অজগরের মত পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে চলেছে। ছোট ছোট ঝর্ণার পাশে কত রকম ফুল, লতা,—দেখতে দেখতে সুধার ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল, কিন্তু চোখ আর সে ফিরিয়ে নিতে পারছিল না,—পাহাড়ে ওঠা তার জীবনে এই প্রথম।

কল্‌কাতার একটি কুণো গলির মধ্যে পুরোনো শেওলা-ধরা বাড়ীগুলির ছাদে টবের নকল বাগানে ধরা-বাঁধা বসন্ত যখন তার রঙীন পতাকাখানি একটু একটু করে মেলে ধরছিল, সেই সময়ে হিরণ সুধাকে বিয়ে করে আনে।

সে বড় লোকের ছেলে, নিজেও কিছু উপার্জ্জন করে। তার কলকাতার বাড়ীতে অনেক লোকের আর অনেক কাজের গোলমাল নিত্যই লেগে আছে। এই নূতন-পাওয়া মিলনটীকে নিবিড়তর করে তোলবার কোনো সুবিধে সে-বাড়ীতে না হওয়ায় হিরণ সুধাকে নিয়ে দিনকতক সাহেবদের মত হনি-মুন্ করতে বেরিয়ে পড়েছিল; কেন না এতে বাধা দেবার মত আত্মীয়-স্বজন হিরণের কেউ ছিল না।

তখন সীজন্ চলেছে; বন্ধু-বান্ধবেরা দার্জ্জিলিং যেতেই পরামর্শ দিলেন। শুনে সুধা বল্‌লে, "সেই বেশ হবে, আমি কখনো পাহাড় দেখিনি, আমার পাহাড় দেখা হবে।"

এর পর আর তখন হিরণের অন্যমত হতে পারে না; কাজেই তারা দার্জ্জিলিং-এর যাত্রী হল। হিরণ খুব উৎসাহ করে সুধাকে এটা-সেটা দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলেছিল।

সুধা কচি মেয়েটি নয়। নতুন জায়গায় এসে কান্নাকাটি করা তার আর তখন মানায় না! তবু ছেলেবেলাকার আশ্রয়, মা-বাপ, ভাই-বোনদের স্নেহের ডোর থেকে বেরিয়ে এসে বিচ্ছেদের একটা তীক্ষ্ণ তীর তার বুকে বিঁধেই ছিল, আর তার এই

ব্যথাটাই হিরণ বিশেষ করে অপছন্দ করতো!

স্বামী যে এতে খুসী নয়, সুধা তা টের পেতো, তাই সে এ বেদনা চেপেই থাকতো, তবু জীবনের দ্বিতীয় অঙ্কের এই সবে আরম্ভ হতে-হতেই প্রথম অঙ্কটা তার ঝাপসা হয়ে যেতে পারেনি।

ট্রেন যখন দার্জ্জিলিং পৌছে গেল, তখন সেখানকার আকাশও বেশ পরিষ্কার ছিল। রিক্সয় উঠে বসে মুগ্ধ চোখে চারিদিকে চেয়ে সুধা বল্লে, "বাঃ, চমৎকার!"

হিরণ তার পাশেই বসে ছিল, সে বল্লে, "চমৎকার! আজ আকাশও এমন পরিষ্কার হয়ে আছে যে সব সুন্দর দেখাচ্ছে,— তুমি এসেছ কি না!"

সুধা হাসিমুখে বল্লে, "হ্যাঁ, এখানকার দেবতাও আমার জন্তে সন্ত্রস্ত, কেমন!"

ঠিক এমনি সময়ে আরো জনকতক লোক সেইখানে রয়েচে দেখে সুধা তার অভ্যাস-মত মাথায় কাপড়টা টেনে দিতে গেল, হিরণ বাধা দিয়ে বল্লে, "ও কি, অমন করে এক হাত ঘোমটা দিয়ো না, ভারী অসভ্য দেখাবে যে তা হলে!"

"মাথায় কাপড় দিলে অসভ্য দেখাবে?"

"নাগো—ঘোমটা দিলেই বিশ্রী দেখায়। মাথার কাপড় তো খুলতে বল্‌চিনে।"

বাসা আগেই ঠিক-করা ছিল। ছোট্ট লাল রংয়ের বাড়ীখানি উঁচু রাস্তা থেকে খানিকটা নীচে নেমে যেতে হয়, গেট্‌টা ঠিক পথের ধারেই। রিক্স-ওয়ালাদের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হিরণ মালপত্র বুঝে নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুধা আগেই এসে ঘরের ভিতরকার একটা কৌচে বসে পড়েছিল. হিরণের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে সে জানালে যে বাড়ীখানি তার বেশ পছন্দই হয়েছে।

চাকর এসে জিজ্ঞাসা করলে, চিমনি এখন জ্বালবার দরকার আছে কি না? সুধা আপত্তি করে বল্লে, "না, না, ঘরের মধ্যে এখন অগ্নিকুণ্ড জ্বালতে হবে না।"

চাকর চলে গেল। সুধা এ-ঘর ও-ঘর বেড়িয়ে তার সংসার গুছিয়ে নিতে লেগে গেল। কতটুকুই বা তোলা সংসার! দুদিনেই সব ঠিক করে নেওয়া হলে তাদের নিত্য কর্ম্ম হয়ে উঠলো, ঘুরে বেড়ানো।

অলস দুপুরটাতে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া হিরণের অনিবার্য্য অভ্যাস ছিল, কিন্তু তা বলে সুধা যে সেই ফাঁকে সার্শির কাছে বসে বসে বাপের বাড়ীর ভাবনায় মন খারাপ করবে, এটাও তার ভালো লাগতো না, তাই যেমন ভাত খাওয়া হল, অমনি সুধাকে নিয়ে সে পাহাড়ের ছায়া-স্নিগ্ধ পথে বা কোনো মরা ঝর্ণার পাশে বসে গল্প করে দিন কাটিয়ে দেওয়া সুরু করলে।

সে দিনটা মেঘলা হয়েছিল, তার উপর প্রচুর কুয়াশায় পাহাড়ের গা এমন ঢেকে গিয়েছিল যে ঘরের একটু পাশেই চাকরদের থাকবার লম্বা টিনের ঘরখানা অবধি দেখা যায় না!

ঘরের মধ্যে বসে থেকেও সুধার মনে হচ্ছিল, সে যেন ষ্টীমারে বসে আছে, আর বাইরের উঁচু-নীচু ঘর-বাড়ী গাছ-পালা সব শীতকালের নদীর মত একাকার হয়ে গিয়েছে!

বেলা বারোটা বেজে গেল, তবু একটু আলোর দেখা নেই। ঘরে বসে বসে বিরক্ত হয়ে হিরণ বলে উঠ্‌লো, "দূর ছাই, আর পারা যায় না চুপ করে বসে থাক্‌তে। চল, একটু ঘুরে আসি।"

সুধা তখন বেশ একটা ঘোরালো-প্লটের নভেল নিয়ে বসেছিল; সে বল্‌লে, "তা যেতে হয়, তুমি যাও, আমি যাবো না।"

হিরণ তাড়া দিয়ে বল্‌লে, "নাও ওঠো, চল, বার্চ্চহিলের ওদিকটায় যাই।"

"ও মা, সেকি গো,—যদি বৃষ্টি নামে, তখন ভিজ্‌তে হবে যে!"

হিরণ একবার আকাশ-পানে চেয়ে দেখে বল্‌লে, "নাঃ, বৃষ্টি আর হবে না,—নাও, ওঠো!"

সুধা তবু একটু-আধটু আপত্তি করে তারপর অগত্যা উঠে পড়লো, নইলে আবার হিরণ গরম হয়ে ওঠে! সেও তার কাছে বড় সুবিধের ব্যাপার নয়! আর তার যে বৃষ্টির জন্যেই বেরোতে অমত ছিল, তা ত নয়, নভেলটা ছেড়ে উঠ্‌তে তার মন সরছিল না, সেইটেই ছিল আসল কথা।

পথে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তারা যখন বার্চ্চহিলের কাছাকাছি গোরস্থানের ফটকের কাছে এসে পৌঁছেচে, সেই সময় বৃষ্টি এমনি ঝেঁপে এলো যে ছাতিতে আর তা আটকানো যায় না!

তারা তো হুড়-মুড় করে একটা শেডে গিয়ে আশ্রয় নিলে। সুধা বল্‌লে, "কেমন! আমি তখনি বলেছিলুম তো যে বৃষ্টি আস্‌বে। এখন হল তো?"

হিরণ শেডের বেঞ্চখানা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে, "তাই তো!"

সুধা পা ঝুলিয়ে বেঞ্চে বসেছিল, হঠাৎ একটা ভারী নিশ্বাসের শব্দ পেয়ে পা তুলে নিয়ে বল্‌লে, "এই বেঞ্চিটার নীচে কুকুর-টুকুর আছে বোধ হয়—"

"কুকুর? আচ্ছা, দাঁড়াও দেখ্‌চি—"বলে হিরণ হেঁট হয়ে দেখে বল্‌লে, "বাবা, এ আবার কি?"

"কি গো?" বলেই সুধা বেঞ্চ থেকে তড়াক্ করে নেমে দাঁড়ালো, তার পর নিজেও ঝুঁকে পড়ে দেখলে যে, একটী বছর এগারো-বারো বয়সের নেপালী ছেলে শীতে কুকুর-কুণ্ডলী হয়েই ঘুমোচ্ছে! নোংরা ছেঁড়া জামা গায়ে পা-জামাটা এককালে হয় তো বেশ ভাল কাপড়েরই ছিল, কিন্তু এখন তার এমন দশা যে রং চেনবার জো নেই!

যে-শীতের তাড়ায় সুধা এক-রাশ গরম জামা গায়ে দিয়েও কাঁপছিল, সেই শীতে সেই অস্থি-চর্ম্মসার ছেলেটির হাত, পা, কাণ, সব নীল হয়ে গিয়েছিল, কেবল বুকের শ্বাসটার জন্যেই তাকে জ্যান্ত বলে চেনা যাচ্ছিল। তার মাথার কাছে একটা খালি বার্লির টিন পড়েছিল, সম্ভবতঃ সেটি তার ভিক্ষাপাত্র! সুধা ব্যথিত স্বরে বল্‌লে, "আহা!"

হিরণ গোরস্থানের ফটকের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল, আপাততঃ বৃষ্টি ছাড়বার লক্ষণ কিছু আছে কি না! সে ঘাড় ফিরিয়ে বল্‌লে, "এখনো তুমি ওই দেখছো? ও থাক্, ঘুমুক। ওর শান্তিভঙ্গ না করে, চল আমরা বাসায় ফিরি।"

"ভিজ্‌তে-ভিজ্‌তেই ?"

"তা ছাড়া উপায় নেই তো! এ বৃষ্টি সারা দিন থমকে ছিল, এখন কি আর ছাড়বে ?"

"বেশ, তবে চল।" শেড্‌ ছেড়ে তারা আবার বাসার দিকে চল্‌। তখনো বৃষ্টির বেগ একটুও কমেনি, কাজেই তাদের ভিজতে হল। বাড়ীতে এসে ভিজে কাপড় ছেড়ে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে দুজনে যখন দু'ঘণ্টা ধরে চিমনির আগুনের তাতে শরীরটাকে গরম করে নিয়েছে, সেই সময় চাকরদের ঘরের দিকে একটা গোল শোনা গেল।

হিরণ ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে দাঁড়াল। বাদল রাতের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে উঠেছে! খোলা দুয়ারের ফাঁক দিয়ে যে বিদ্যুতের আলো ঘর থেকে বাইরে পড়েছিল, তারি ছটায় দেখা গেল, সেই নেপালী ছেলেটাই শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে বার্লির কৌটোটি পেতে দাঁড়িয়েছে, তার কিছু খাবার চাই। তার গা মাথা থেকে বরফের মত ঠাণ্ডা বৃষ্টির জল ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছিল,—চাকরেরা তাকে খেদিয়ে দেবার যোগাড়েই ছিল; কিন্তু সশরীরে মনিবকে দেখে তখন তাদেরও সবার শরীরে দয়ার জোয়ার বয়ে এল।

হিরণ ও সুধা দুজনকার তদারকে রাত-টুকু কাট্‌তে না কাট্‌তেই ছেলেটির চেহারা ফিরে গেল। তবে হিরণের ফুটবল খেলবার পুরোনো হাফ-প্যাণ্টটা, আর আধ-পুরোনো গরম সোয়েটারটী যে সেই ছেলেটার দেহে কেমন মানিয়েছিল, সে একটা দেখবার জিনিষ বটে! দু-চার দিন না যেতেই এই বিদেশী ছেলেটি তাদের নিতান্ত আপনার জন হয়ে উঠল।

২

খুব ভোরে সূর্য্যের লাল আলোয় কাঞ্চন-জঙ্ঘার বরফের দিক চাইলে সোনার পাহাড়ের মত দেখায়। সেদিন হিরণ তার বসবার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন-জঙ্ঘা দেখ্‌ছিল, সুধাও একটা জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

হিরণের বন্ধু সতীশ এসে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "কি হে, একেবারে তন্ময় যে!"

হিরণ মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, "এক রকম তাই বটে। কিন্তু সকালেই যে সাজ-গোজ করে বেরিয়েছ, দেখ্‌চি,—যাচ্ছো কোথায় ?"

সতীশের সঙ্গে তার ক্যামেরা ছিল ফটো তোলবার,—সে বল্‌লে, "এমন ওয়েদার বড় একটা পাওয়া যায় না, আজ আমি এই ফাঁকে খানকতক ফটো তুলে নেব, ঠিক করেচি।"

হিরণ একটু হেসে বল্‌লে, "আমাদের না কি ?"

"কেন, তাতে আপত্তি আছে কি কিছু ?"

"কিছু মাত্র না,—বরং লাভ আছে।"

"তবে আর কি!"

হিরণ বল্‌লে, "তা হলে কিন্তু এখন তোমায় একটু অপেক্ষা করতে হবে। কেন না, আমি এখনো চা-টা খাই নি।"

সতীশ হিরণের সঙ্গে তার বসবার ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে

বল্‌লে, "তবে নাও, তোমার চা-ইত্যাদি প্রাতঃকৃত্য সব সেরে নাও।"

হিরণ বল্‌লে, "তুমি?"

"না, আমি খেয়ে বেরিয়েচি, দু'বার চা আমি খাইনে।"

হিরণের চা পান শেষ হলে সতীশ তাদের নিয়ে অল্প-দূরেই একটা ঝর্ণার মাঝখানে নেমে দাঁড়াল, এইখানেই সে একটা ফটো তুল্‌বে ঠিক করেছিল।

এ ঝরণাটী বর্ষাকালে খুব পুষ্ট থাকে, তাই তার মাঝখানটায় সাঁকো-বাঁধা, নীচেটা অনেকখানি চওড়া, ছোট-বড় নানা রকম টুকরো পাথরে বোঝাই, নির্ব্বিষ সাপের মত এখন তার শীর্ণ জলের রেখা পাথরের গায়ে আলপনা এঁকে বয়ে যাচ্ছিল। হিরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সরু জলের রেখাটিকেই ছাতির বাঁট দিয়ে নাড়ছিল।

সতীশ অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে তার ক্যামেরা ঠিক করে নিচ্ছিল আর সেই নেপালী ছেলেটা সুধার পায়ের কাছে বসে অবাক হয়ে যেন তাই দেখছিল। সুধা তাকে জিজ্ঞেসা করলে, "ওটা কি, বল্ তো?"

সে বল্‌লে, "কি জানি?"

"জানিস্ নে! আচ্ছা, ওটাতে কি হয়, তা জানিস?"

সে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, না তাও সে জানে না। সুধা বল্‌লে, "ওতে মানুষের ছবি—এই মানুষের চেহারা ওঠে—"

"চেহারা,—ফটোগ্রাফ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো জানিস তো, দেখ্‌চি।"

ছেলেটির মুখের চেহারা এক মিনিটেই বদ্‌লে গেল। সে বিষণ্ণভাবে বল্‌লে, "ওঃ,—ও আমি জানি, আমার কাছেও একটা ফটো আছে।"

"আছে নাকি? কৈ, দেখি, কার ফটো?"

ছেলেটী তার বুক-পকেট থেকে ময়লা কাগজে মোড়া একখানি ফটো বের করে সুধার হাতে দিলে।

ফটোট কোনো একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার। তাঁর মুখখানি করুণায় ভরা, তবু সে মুখে মাতৃ-মহিমার চেয়ে কুন্দেন্দু-তুষার-ধবলা বীণাপাণির সঙ্গে মিলই বেশী।

সুধা বল্‌লে, "এ কার ফটো, তা জানিস তুই?"

জল-ভরা চোখে সে বল্‌লে, "জানি, আমি যাঁর ছেলে, তাঁর।"

"তবে তো খুব জানিস্ দেখ্‌চি, বোকা কোথাকার!"

"হ্যাঁ জী, তাঁরই,—কিন্তু তিনি আর নেই,—ভগবানের কাছে চলে গিয়েছেন।"

এতক্ষণে সতীশ তার ক্যামেরার দিক থেকে চোখ তুলে এই ছেলেটীর দিকে চাইলে, বল্‌লে, "আরে, চার্লি না? এ যে সেই লেডি ডাক্তারের পুষ্যিপুত্তুর, এ এসে জুটলো কেমন করে?"

হিরণ আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "তুমি চেনো না কি ওকে?"

"বিলক্ষণ চিনি। ও হতভাগাটাকে এখানে বোধ হয় সবাই চেনে। ওর কাহিনীও বেশ একটা নভেল গোছের। প্রথমে তো আধ-মরা মা ওর ওকে আঁতুড়ে রেখেই মরে গিয়েছিলেন, তার পর ওই লেডি ডাক্তারটি নিজে খরচের ভার নিয়ে আর এক-জনকে দিয়ে ওকে মানুষ করছিলেন। ও

যখন বছর-তিনেকের ছেলে, তখন সেও মরে গেল, লেডি ডাক্তার তখন ওকে নিজের কাছেই এনে রাখলেন, ওকে সন্তানের মতই ভালবাসতেন। তিনি নিজে কুমারী ছিলেন, ভেবেছিলেন, তাঁর সঞ্চিত টাকা দিয়েই তিনি ওটাকে একজন মানুষ করে তুলবেন। কিন্তু কি যে ওই ছোঁড়াটার কপাল, গেল-বছর একদিন রাত দুপুরে হঠাৎ হার্ট ফেল্ করে তিনিও মারা গেলেন। ওর কিছুই করে যেতে পারলেন না, কেন না, তিনি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন নি যে মরণটা তাঁর এত এগিয়ে এসেছে।"

"তার পর?"

"তারপর তাঁর ভাই-পোরা এসে সব দখল করে নিয়ে ওকে পথে খেদিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে ও এনেছে কেবল ঐ বালির কৌটোটা, যা এখন ওর ভিক্ষে নেবার পাত্র!"

চার্লি পাহাড়ের গায়ে ফুল তুলছিল। এতক্ষণ পরে সকলে চেয়ে দেখ্‌লে, সে কোন্ সময়ে সেখান থেকে সরে পড়েছে!

৩

একটা বড় চেয়ারে শুয়ে শুয়ে হিরণ খবরের কাগজ পড়্‌ছিল, ঘরের আর এক দিকে বসে সুধা বাড়ীতে তার বোন্‌কে চিঠি লিখছিল, এ দেশের কোথায় কি দেখেছে, কোন্‌টা কেমন, এই সব বর্ণনা করে লিখ্‌ছিল বলে চিঠিখানা শেষ না হতেই বার পাঁচ-ছয় হিরণের হাত থেকে ঘুরে এসেছিল,—এতক্ষণে সেখানাকে ইতি করে সুধা খামে মুড়্‌ছিল; হঠাৎ আবার হিরণের চোখ পড়ায় সে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লো, "ও কি মুড়চো নাকি? দাঁড়াও, দেখি।"

"কতবার দেখ্‌বে?"

"শেষটা যে দেখিনি! কি লিখ্‌লে?"

"কি আর লিখ্‌বো, আমরা তিন-চার দিনের মধ্যেই ফিরবো, তাই লিখে দিলুম।"

চিঠি পড়ে সুধার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হিরণ বল্‌লে, "আঃ, আবার সেই বাড়ীর কাজ আর কাজ,—বেশ ছিলুম ক'দিন!"

সুধা একটু হাস্‌লে, হেসে বল্‌লে, "আমার বাড়ীই বেশ লাগে।"

"হুঁ,—টের পাবে মজাটি বাড়ী গিয়ে, সেখানে কি এমনি করে আমরা দু'জনে মিল্‌তে পাবো, ভাবচো?"

"কেন, বাড়ী ছেড়ে তো আর কোথাও যাবে না তুমি! ভালো কথা, আমরা তো যাচ্চি, চার্লির কি হবে? তাকে তুমি নিয়ে যাবে না?"

"তা যেতে পারি। তবে তাকে বলে-কয়ে ঠিক করে নাও সে যাবে কি না?"

চার্লি তখন একটা হেলে-পড়া লতাকে নানা কায়দায় ঠিক করে রাখ্‌ছিল, সুধার ডাক শুনে ছুটে এসে সামনে দাড়াল। সুধা তাকে বললে, "আমাদের সঙ্গে যাবি চার্লি, আমাদের দেশে?"

চার্লি প্রথমে খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে রইল, তারপর বল্‌লে, "কোথায়?"

"কলকাতায়। আমরা সেইখানেই থাকি। যাবি আমাদের সঙ্গে?"

চার্লি সোজাসুজি ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না।"

আশ্চর্য্য হয়ে সুধা বল্‌লে, "কেন্ রে?"

"সেখানে যে আমার কেউ নেই—"

"কি জ্বালা! এখানে তোর কে আছে, শুনি?"

"সবাই আছে। মাটীর নীচেয় তো আছে।"

অনেকক্ষণ ধরে অনেক রকম কথা বলেও সুধা সে অবোধ ছেলেটাকে বোঝাতে পারলে না যে, মাটীর নীচে যিনি আছেন, তিনি এখন সকল সম্পর্কের অতীত, তিনি আর এখন তার কেউ নন, তাঁকে আঁকড়ে পড়ে থাকায় কোনো লাভ নেই। চার্লি এ সব কথা একটুও বুঝলে না, বুঝতে চাইলেও না, অবশেষে বিরক্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে সুধা হাল ছেড়ে দিয়ে বস্‌লো!

বাড়ী যাবার সময় কাছাকাছি এসে পড়লো বলে সুধা তার বেড়াবার জায়গা-গুলি বেশী করে করে দেখে রাখ্‌ছিল। সেদিন তারা আবার সেই গোরের ফটকের কাছে নীচে এসে পড়লো, যেখানে শেডের বেঞ্চির চার্লিকে ঘুমন্ত অবস্থায় প্রথম দেখা গিয়েছিল।

অনেক ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষ ফুটন্ত ফুল হাতে করে পাহাড়ের গায়ের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলেছে দেখে সুধাও হিরণের সঙ্গে নাম্‌তে লাগ্‌লো। থাকে-থাকে কত শত লোকের অনন্ত বিশ্রাম-শয্যা পাতা; পাশ দিয়ে একটা পরিপুষ্ট নির্ঝর গলানো রূপোর মত ঝর ঝর করে গোরের হাওয়ার উদাস গানে তাল দিয়ে চলেছে!

অনেকটা হেঁটে এসে সুধা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই চড়াই-সিঁড়ি ওঠ্‌বার আগে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছিল, হিরণ এদিক ওদিক ঘুরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে, "ঐটে বোধ হয় সেই চার্লির পালয়িত্রী মেমের কবর, দ্যাখো।"

সুধা বল্‌লে, "কৈ?"

"ওই যে ওদিকে।"

একটু এগিয়ে গিয়ে সুধা দেখ্‌লে যে একটী মার্ব্বেল-বাঁধানো কবরের উপর কতক-গুলি ফুল রেখে দিয়ে চার্লি উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে! হিরণ বললে, "ডাকবো ওকে?"

"আহা, না, না, কোনখানে কেউ নেই দেখে মন হাল্‌কা করে কাঁদচে, কেন আর ওকে ডাক্‌বে,—আমাদের সঙ্গে তো আর ও আসেনি।"

"তবে কাঁদুক, এখন তাহলে ফেরো, আমার আবার একটা নেমন্তন্ন আছে; দেরী হয়ে যাবে নইলে।"

সুধা উঠ্‌লো, দু-চার ধাপ সিঁড়ি উঠ্‌তেই শোনা গেল চার্লি "মা" "মা" করে কেঁদে উঠেচে! সে স্বর এমন করুণ, এমন আর্ত্ত যে শুনেই সুধার চোখে জল এসেছিল, স্বামীর দিকে চেয়ে লজ্জা পেয়ে সে চোখ মুছে ফেল্‌লে!

৪

"এখনো ভেবে দ্যাখ্‌ চার্লি, চল্‌ আমা-দের সঙ্গে,—এখানে থাক্‌লে তুই মরে যাবি।"

সুধার কথার উত্তরে চার্লি মাথা হেঁট করে বললে, "জী, না, সে দেশে গেলেই আমি মরে যাবো।"

"তা কেন রে? সেখানে তুই এখানকার মত এমনিই থাক্‌বি, মরবি কেন? আমি তো রয়েচি।"

চার্লি সুধার মুখ-পানে চেয়ে কি-একটু ভাবলে, কোনো উত্তর দিলে না;—তার ঘা-খাওয়া প্রাণে হয়তো সে ভেবেছিল যে, তুমিও যদি মরে যাও?

সুধা তখন ষ্টেশনে চলেছিল, তাই শেষবার চালিকে বোঝাতে বসেছিল। হিরণ রেগে গিয়ে বললে, "কেন তুমি একশোবার করে ওই হতভাগাটাকে খোসামোদ করছো—? ও না যায়, না যাবে, তাতে আর কি হয়েছে ?"

চার্লি জল-ভরা চোখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুধা বল্‌লে, "এমন বোকা ছেলে আমি জন্মে কখনো দেখিনি।"

ট্রেণে ওঠ্‌বার সময় সুধা ভেবেছিল যে সে-সময় চার্লি নিশ্চয়ই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই বিদায় নেবে! কিন্তু সে পাহাড়ী ছেলে,—বেশ সহজভাবেই মোট্‌মাট সব গুছিয়ে তুলে দিয়ে তার পর মাথা নীচু করে সেলাম জানালে!

তার রক্ত-হীন সাদা গালদুটীতে সুধারই স্নেহে-যত্নে তার জাতি-গত লাল রং ফুটে উঠেছিল, আবার সবই নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে ক্ষুণ্ণ মনে সুধা চুপ করে ছিল।

ট্রেণ ছেড়ে দিলে সুধা জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, চলন্ত ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে বনের পাশ দিয়ে চার্লি হেঁটে চলেছে,—অনেকদিন পরে তার হাতে আবার সেই খালি বার্লির টিনের কৌটোটা দেখা গেল!

উঁচু-উঁচু মেঘ-চুম্বী পাহাড়ের আর বন-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে রক্তিম অস্তালোকচ্ছটা তার বেদনা-ভরা মুখে রং ফলিয়ে দিয়েছিল!

সুধা চেঁচিয়ে বললে, "এ যে বন, চার্লি, এদিকে তুই কোথায় চলেছিস্‌?"

উত্তরে একটু থম্‌কে ঘাড় নেড়ে সে যে কি বল্‌লে, তা বোঝাই গেল না; কিন্তু চার্লির হাঁটাও থামলো না। বনের মাঝে তখন বর্ষার সন্ধ্যা বেশ ঘটা করেই ঘনিয়ে আস্‌ছিল। হঠাৎ গলা ছেড়ে চীৎকার করে চার্লি কেঁদে উঠ্‌লো—"কোথায় আছ মাগো? নিয়ে যাও আমায়, আর যে আমি পারিনে!"

কিন্তু কোথায় তার মায়ের করুণা-ভরা স্নেহাঞ্চল! ঘন বনের মাঝে তখন সন্ধ্যার অকরুণ কালো পরদাখানি ধীরে ধীরে বিছিয়ে পড়্‌ছিল!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

বাদল রাতে

ভাদর নিশির বাদর ধারার
গোপন আদর বুঝবে কে?
(প্রিয়া বই আর বুঝবে কে)
সে যে শুনতো জলের কলধ্বনি
বুকের কাছে বুক রেখে।
যুঁই মালতীর দূর পরিমল,
আন্‌তো অধীর সমীর সজল,
ফির্‌তো অতীত প্রীতির গীতি—
স্মৃতির সুখ ও দুখ মেখে।

কি এক নিবিড় আলস লালস
ছড়িয়ে দিত অঙ্গেতে,
বাদল বায়ে ঝুল্‌তো ঝুলন
তুল্‌তো প্রাণ একসঙ্গেতে।
বাতায়নে মুখ ঝুঁকি হায়
মারতো উঁকি ক্ষণপ্রভায়
উঠতো হঠাৎ চম্‌কে প্রিয়া
চকিত সলাজ মুখ ঢেকে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন

পথের কথা

স্বরাজের ধারণার রকম-ফেরের কথা আলোচনা করেছি। এবার পথের ধারণাটা কার কিরূপ দেখা যাক্! সত্য কথা বলতে গেলে লক্ষ্যটাও যেমন অধিকাংশ লোকের কাছে অনির্দ্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে পথটাও তেমনি বা ততোধিক। সেটা হবারই কথা। কারণ, টাকা রোজগার করতে হবে, বা সংসার-ধর্ম্ম করতে হবে, এর যেমন একটা গরজ প্রায় সকলেই অনুভব ক'রে থাকে, স্বরাজ লাভ সম্বন্ধে তেমন ঐকান্তিক গরজ প্রায় কারুরই দেখা যায় না! আমাদের অধিকাংশেরই স্বরাজের আকাজ্ঞা বিদেশী হাওয়ায় উড়ে আসা পর-গাছার বীজের মতো মনের চামড়াটার উপরে অঙ্কুরিত হয়েছে। অন্তরের গভীরতার মধ্যে তার মূল নাই। ও আকাজ্ঞা আমাদের সমস্ত অস্তিত্বের বুক-ফাটা কাঁদন নয়। স্বরাজের খোলা হাওয়াটা যে আমাদের বেঁচে থাকার মতো বেঁচে থাকার পক্ষে প্রাণ-বায়ু, এ তথ্যটা আমাদের কাছে রাষ্ট্রনৈতিক হাইজিনের পুঁথির বাঁধা গৎ মাত্র। ওটা লাভ করার জন্য আমাদের কোনরূপ সত্যিকার তাগিদ নাই। কাজেই পথের আলোচনা যা হয়ে থাকে, তা কলেজের ডিবেটীং ক্লাবের সীমানা ছাড়িয়ে বড় বেশী দুর এগোয় না। যাই হোক একবার সব রাস্তাগুলো ঘুরে আসা যাক্—কোন্‌টা কোথায় পৌছিয়ে দেয়।

১। সরকারী সড়ক, রাজপথ বা Royal Road—প্রথমেই অবশ্য সরকারী সড়কটা চোখে পড়ে। খাসা তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড চওড়া ম্যাকাডেমাইস্‌ড্ রাস্তা। তেল ঢেলে ধুলো মেরে রাখা হয়েছে যাতে বর বর-যাত্রীদের—শ্রীবিষ্ণু—স্বরাজ-যাত্রীদের সৌখীন পোষাকে তিলমাত্র ময়লা না লাগে। কাঁটা কাঁকর চোর ডাকাত বাঘ ভালুক প্রভৃতি পথের সাধারণ উপদ্রব সমস্তই সযত্নে তফাৎ করা হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। খালখন্দ সব চমৎকার পুলবন্দী ক'রে ফেলা হয়েছে। আম-কাঁঠালের অর্থাৎ চাকুরি ব্যবসা বাণিজ্য ওকালতী প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল-বান গাছের বাগান, কেবল ছায়ায় ছায়ায় যেতে নয় পেট ভরে খেতেও বটে, রাস্তার দুধারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজভক্তির টিকিট কিনে ডায়ার্কি তার সংশোধিত শাসন-প্রণালীর মোটর-বাসে উঠে পড়। তার পরে নভেলের পাতা উল্টাতেই থাকো বা চোখ বুজে আয়েসই করো কিছু যাবে আসবেনা। দশ বৎসরের মধ্যে একেবারে স্বরাজের গোলক-ধামের সিং-দরজায় উৎরে দেবে।

যদিও দেশের মান্য-গণ্য শিক্ষিত সম্রান্ত বিস্তর লোক এই পথে স্বরাজ-লাভের স্বপ্নে উৎফুল্ল হয়ে আছেন এবং তাঁদের জেগে দেখা স্বপন ভাঙানো মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় তা জানি, তবুও কাজটার নিষ্ঠুরতা

স্বীকার ক'রে নিয়েও একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত মনে হয়। স্বপন জিনিষটা যখন সনাতন নয় তখন ভাঙ্গবে একদিন নিশ্চয়ই। সময়-মতো ভাঙ্গলে হয়তো একটু আধটু সুবিধা হ'লেও হতে পারে।

প্রথমেই আমার এই জিনিষটা আশ্চর্য্য ঠেকে যে, স্বরাজ লাভটা ভীমনাগের দোকানের সন্দেশ-খাওয়ার মতো এমন আরামের সঙ্গে চলতে পারে, এতগুলি বুদ্ধিমান জীব এ কথাটা বিশ্বাস করছে কি করে? যীশুখ্রীষ্ট যে বলেছিলেন, Enter ye in at the strait gate; for strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life and few there be that find it. Wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in there at. সে কথাটা কেবল তাঁরই কথা নয়, সমস্ত মানবজাতির অভিজ্ঞতার ঐ এক সাক্ষ্য। উপনিষদও কল্যাণের পথ সম্বন্ধে ঐ এক কথাই বলেন। দুর্গমং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। যাই হোক, এতগুলি বড় বড় লোক যখন ঐ আরামের পথটাকেই স্বরাজের পথ বলে বিশ্বাস করছেন, তখন তার কারণটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। আমার তো মনে হয় বড় বড় ইংরেজ প্রফেসরের নোটের সাহায্যে দেশ-বিদেশের দুস্তর পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে উক্ত নোটের অধমতারিণী শক্তি সম্বন্ধে আমাদের সুদৃঢ় সংস্কার জন্মে গেছে। আমরা স্বরাজ লাভকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের সামিল ধরে নিয়েছি।

রিপন সাহেব আমাদিগকে স্বরাজ-স্কুলের লাষ্টক্লাসে বহু সুপারিশ করে ভর্ত্তি করে দেন। তারপর ক্রমশঃ প্রমোশন পেয়ে মর্লি-মশায়ের আমলে স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে উঠি। তার পরে সম্প্রতি মণ্টেগু সাহেব দয়া ক'রে ডবল প্রমোশন দিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে তুলে দিয়েছেন। দশবৎসর এই পড়া পড়ে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড-কৃত "Swaraj made Easy" মুখস্থ ক'রে জলপানি সমেত পরীক্ষা পাশ হতে পারবো, এ ভরসা বিলক্ষণ আছে। তারপরে যথাসময়ে কলেজের ডিগ্রী নিয়ে বেরোনো কিছুমাত্র কঠিন হবে না। আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মতো তা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের কোনও বর্গসাধনের কাজে কাণা-কড়া না লাগলেও আমাদের অহঙ্কার পরিতৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট হবে। আমরা যে এত সহজে স্বরাজ লাভ করবো, কাজটাকে পরীক্ষা পাশের মতো করে দেখাই বোধ হয় তার প্রথম কারণ। তোতাপাখীও বোধ হয় সহজে হরিনাম আওড়াতে শেখে বলে নিজেকে পরম হরিভক্ত মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ অনুভব ক'রে থাকে।

আমরা সরকারী পথে অতি সহজে স্বরাজ লাভ করবো, এ বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় জ্যোতিষিক। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যখন শুভদৃষ্টি হয় তখন লগ্নটা বোধ হয় একেবারে নিখুঁৎ ছিল। আসল সুতহিবুক যোগ। কি সোণার চোখেই ইংরেজকে আমরা দেখেছিলেম বলা যায় না। আঘাত বার বার লাগছে তবুও আমাদের ভক্তি টলেও টলছে না। রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম

আমলে জাল-জুয়াচুরি ফেরেব-বাজী লুঠ-তরাজ প্রভৃতি সনাতনপ্রথা-সম্মত অধর্ম্মের কোনটাই বাকী রাখেন নি। তার উপর অবশ্য ফাউ ছিল হালফ্যাসানের নানারূপ শুভ্রবেশী অধর্ম্ম। এখনও সাম্রাজ্য রক্ষার অছিলায় ঐ সব জিনিষের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করতে কিছু মাত্র ত্রুটি করছেন না। আমরা যে কেবল স্বচক্ষে ঐ সব দেখছি, কেবলমাত্র তাই নয়, স্বহস্তে ঐ সব কাজের সাহায্যও করছি। সুতরাং না জানার দোহাই দেওয়ার উপায় নাই। তা সত্ত্বেও আমরা মনের মধ্যে ঠিক দিয়ে বসে আছি যে, দুর্গতির মরুতট হতে শ্রীবৃদ্ধির শ্যামল কূলে আমাদের দেশটাকে নিয়ে যাওয়ার কাণ্ডারী ক'রে ভগবান ওঁদেরই পাঠিয়েছেন।

এটাও খুব সম্ভব, আমরা আসলে ওটা বিশ্বাস করিনে, মনের উপরিভাগে ভাসা ভাসা একটা ভক্তি-বিশ্বাস জাগিয়ে রাখি মাত্র। তা নইলে আমাদের চাকুরী, ওকালতী ও কারবার-কারখানায় অন্ন ও আরাম ঠিক মতো হজম করা সম্বন্ধে একটু গোল বাধে; কারণ ইংরেজ আমাদিগকে যেটুকু বিদ্যা তার কাজ চালাবার সুবিধার জন্য দিতে চেয়েছিল, দৈবগতিকে তার চেয়ে একটু বেশী শিখে ফেলেছি। হোক না মুখস্থ বিদ্যা, তবু মনের মধ্যে একটা নাড়া দিয়েছে। সেই নাড়াতে অন্তর্যামী এক-আধটা পাশমোড়া দিচ্ছেন ও দু-একবার চোখ মেলেও তাকাচ্ছেন। ঠিক যে জেগে উঠেছেন সে কথা অবশ্য বলা যায় না।

তবুও তিনি চোখ চাইলেই একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রে পুনরায় ঘুম পাড়াতে না পারলে মাছের মুড়ো ও বন্দুকের হুড়ো দুই জিনিষই হজম করা কঠিন হয়ে উঠে। আমাদের বিশ্বাসটা অন্তর্যামীর নিকট মনের সেই কৈফিয়ৎ। আর ইংরেজও এই বিশ্বাসটাকে কায়েমী করার জন্য ইস্তক-নাগাইত বিবিধ-মত চেষ্টা করছে। তাদের লেখকদের লিপি-চাতুর্য্য ও রাজনীতিজ্ঞদের বচন-বৈদগ্ধীতে আমাদের চোখে ও কাণে এমন ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে যে, যেখানে দেখা উচিত ছিল সরষেফুল, সেখানে দেখছি আমরা পারিজাত প্রসূন; শোনা উচিত ছিল মৃত্যুনিশীথের ঝিল্লীরব, শুনছি সেখানে বিদ্যাধরীর ভূষণ-শিঞ্জন! আমরা চিরকাল পড়ে আসছি ও শুনে আসছি যে, ব্রিটনের খোলা হাওয়ার মায়াস্পর্শে দাসের পায়ের লোহার শিকল আপনি খসে পড়ে। আমরা আমাদের আবেদন ও নিবেদন পত্রে তাক-মাফিক ঐ কথাটা লাগিয়ে বুকের মধ্যে স্ফীতি অনুভব ক'রে থাকি। কিন্তু খতিয়ানের সময় হিসাব মেলেনা, গোঁজা-মিলটা বেরিয়ে পড়ে। পৃথিবীর কার পায়ের শিকল ব্রিটনের স্পর্শে কবে খসে পড়ল তাতো দেখতে পাইনে। বরঞ্চ পৃথিবীর অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকের পায়ের দিকে নজর পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় সেখানে মোটা-সরু-মাঝারি যতরকমের শিকল আপনাদের অটল অয়স মহিমায় বিরাজ করছে, তার সবগুলিতেই ব্রিটনের শিকলের কারখানার হেড্ আফিস, ব্র্যাঞ্চ আফিস বা এজেন্সি আফিসের ছাপ মারা। ব্রিটনের নিতান্ত ঘরের দুয়ারের প্রতিবেশী আয়ারলণ্ডের পায়ের শিকল ওদের সংস্পর্শে পাঁচশত বৎসর

ধরে কেমন ক'রে খসে পড়ছে, তার ঝঙ্কারটা ইতিহাসের গ্রামোফোন রেকর্ডে কাণ পাতলে কতকটা শুনতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি আবার ঐ শৃঙ্খল মোচনের মহাসঙ্গীতের মাধুর্য্যটা এতদূর বেড়ে উঠেছে যে,পৃথিবী-শুদ্ধ শ্রোতাদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়েছে।

যাই-হোক আমাদের দুটো কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখা উচিত। (১) ইংরেজের পক্ষে আমাদিগকে সত্যিকার স্বরাজ্য দেওয়া সম্ভব কিনা? (২) দৈবগতিকে তারা যদি দিয়েই ফেলে, আমরা পাবো কি না?

১। ইংরেজের পক্ষে আমাদিগকে প্রকৃত স্বরাজ্য দেওয়া সম্ভব কি না?

পূর্ব্বে যা লেখা হয়েছে তা থেকেই প্রশ্ন-টার উত্তর যে কি হবে সকলই অনুমান করতে পারবেন। তবুও আর একটু খোলসা আলোচনা ক'রে দেখা যাক্‌। প্রথমে নজীর অনুসন্ধান ক'রে দেখা যাক্‌। ইংরেজ যদি আর কাউকে কখনও স্বাধীনতা বা স্বরাজ্য দিয়ে থাকে তবে আমাদিগকেও না দিতে পারে এমন নয়।

কিন্তু নজীরের বইএর উপসংহারের শেষ অক্ষর হতে আরম্ভ ক'রে উপক্রমণিকার প্রথম অক্ষর পর্য্যন্ত তো উজান পাড়ি দেওয়া গেল, অনুকূল নজীর তো একটাও দেখলাম না। প্রতিকূল নজীরের অবশ্য কোনই অসদ্ভাব নাই। দু-রকমের দুটো দেখলেই বেশ জলের মতো জিনিষটা বোঝা যাবে। প্রথম আয়ারল্যাণ্ড—পায়ে ধরা ছেড়ে সে এখন ঘাড়ে ধরেছে। ব্রিটিশ বুনো ওলের উপযুক্ত সিনফিনিস্‌মের বাঘা তেঁতুল ব্যবস্থা করেছে। দ্বিতীয় আমেরিকা। বহুদিন হলো সে আপনাকে ব্রিটনের কবল হ'তে মুক্ত করেছে বটে, কিন্তু সেটা কেবল কবলের যথেষ্ট বলের অভাব-বশতঃ। ওর মধ্যে দানের কোনই স্থান নাই অর্থাৎ দান শব্দ-টার সোজাসুজি চলিত অর্থে। কিন্তু শব্দটার আভিধানিক ত্যাগ অর্থ গ্রহণ করলে, একটা দান-ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়ে ছিল বটে, কিন্তু তার কর্ত্তা ব্রিটন নয়, আমেরিকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নজীর বড় সুবিধার নয়। যে ব্যবহার আয়ারলণ্ড বা আমেরিকা পায়নি আমরা তার প্রত্যাশা করবো কিসের জোরে? "দৃষ্ট" কোনও কিছুর জোর তো দেখতে পাইনে! "অদৃষ্টের" জোর যদি থাকে সে কথা আমি বল্‌তে পারবোনা। ভৃগুসংহিতা ও হনুমান-চরিত্র এ দুয়ের কোনটাতেই আমার কিছুমাত্র দখল নাই।

নজীরের মধ্যে এক দক্ষিণ আমেরিকার বোয়ারদিগের নজীর দেখতে পাওয়া যায়, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু সেতো "উড়ো খই গোবিন্দায় নমো।" উক্ত খইএর উপহার যে গোবিন্দ-ভক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কোনও ভক্তি-শাস্ত্রই এ কথা অনুমোদন করবেনা। ভারতবর্ষ যদি কোনও দিন ইংরেজের পক্ষে উড়ো খইএর সামিল হয়ে উঠতে পারে—মহাত্মা গান্ধীর কল্যাণে সেরূপ হওয়া কিছুমাত্রই বিচিত্র নয়—তাহলে গোবিন্দায় নমো বলে ভক্তি জাহির করা তাদের পক্ষে অনিবার্য্য স্বীকার করি।

আর একটা ভাবার কথা আছে। ইংরেজ যে পথ দিয়ে জাতীয় সার্থকতা লাভ করেছে, সে পথের প্রতি ধূলিকণা আপনার বুকের

রক্তে রাঙিয়ে তবে তাকে এগোতে হয়েছে। এখনো হচ্ছে। সে যে অমন কষ্টলব্ধ জিনিষ-টাকে পথের ধারের কুলগাছের ফলের সামিল ক'রে দেবে, পথচল্‌তি লোক যার খুসী দু-চারটে পেড়ে খেয়ে যাবে, এমন তো কিছুতেই মনে হয় না। প্রতিপক্ষ বলবেন, এমন কি দেখা যায়না যে লোক ছেলেবেলায় অন্নের জন্য হা হা ক'রে বেড়িয়েছে, অবস্থা ভাল হলেই নিজের কষ্টের কথা স্মরণ ক'রে সে অপরের জন্য অন্নসত্র খুলে দিয়েছে। এ কথা অবশ্যই মানতেই হবে। কিন্তু ইংরেজের রাজছত্র যে আমাদের জন্য স্বরাজ-ছত্রে পরিণত হবে, এ লক্ষণ তো বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। আর যদিই বা হয়, দূরে হতে ইংরেজের বদান্যতার বাহবা দিয়ে আবার দৈনিক পাথর ভাঙার কাজে লেগে যাবো। ছত্রের অন্নে পেট ভরে বটে কিন্তু দান দিতে হয় আপনার মনুষ্যত্ব গৌরব। আমি সেজন্য একেবারেই প্রস্তুত নই। Man liv th not by bread alone।

আর এক দিক দিয়ে বিষয়টাকে দেখলে ঐ পথে স্বরাজ-লাভের আশা যে নিতান্তই প্রকাণ্ড প্রত্যাশা, সে কথা বুঝতে কারুরই বাকী থাকবে না। 'স্বরাজ' কথাটা কাগজে-কলমে তিনটি অক্ষর মাত্র, সুতরাং কাগজে-কলমে যদৃচ্ছাক্রমে ও-জিনিষটার দান-খয়রাৎ আদান-প্রদান হতে কিছুমাত্র বাধা নাই। ষ্টাম্পের মাশুলও লাগেনা। তবে কথাটা ব্যবহার সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা ছিল। খোদ ভারত-সম্রাটের শীল-মোহরের কল্যাণে সম্প্রতি সেটাও দূর হয়েছে। কিন্তু কথাটার মানে খতিয়ে দেখতে গেলেই ঐরূপ যদৃচ্ছা আদান-প্রদান ব্যাপার যে কিরূপ হাস্যকরভাবে অসম্ভব, তা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। একবার কথাটার মানে খতিয়ে বুঝে দেখার চেষ্টা করা যাক্‌।

আমরা সত্যিকার স্বরাজ লাভ করলে সব-আগে নিশ্চয়ই শাসন-যন্ত্র-সংস্কার ও তার ব্যয়-ভার লাঘবের কাজে লেগে যাবো। এখন শাসনের কাজেই দেশের আয়ের প্রায় সবটা খরচ হয়ে যায়, পালনের খরচা বড় বেশী বাকী থাকেনা। নানা রকমের লাগাম ও ডোর কিনতেই তহবিলটা তলায় ঠেকে, কাজেই ঘোড়াটার দানার বরাদ্দ কমাতে হয়। এক সমর-বিভাগই অর্দ্ধেক প্রায় গ্রাস ক'রে ফেলে। তার উপর পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রক্ত-বীজের ঝাড় আছেন। দেশটা গরীব, কাজেই স্বরাজ পেলে শাসন-প্রণালীটাও গরীবানা চালেই চালাতে হবে। কাজেই শ্বেতহস্তীর যতই বাহার থাকুকনা কেন, ও সখটা আমাদের ছাড়তেই হবে। সুতরাং ঐ সব বেকার শ্বেতহস্তীর ভরণ-পোষণের ভার নিতে হবে ইংলণ্ডকেই। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থায় অতগুলি জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রতিপালন যে কিরূপ কাণ্ড ঘটাবে তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ পরের ধনে পোদ্দারী ও পরের ঘরে সর্দ্দারী ক'রে ঐ সব জ্ঞাতি-কুটুম্বের পেটের বহর ও মেজাজের উগ্রতা দুইই বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক রূপে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হবে নিশ্চয়ই দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করা। এই কাজের তিনটী অঙ্গ। প্রথম দেশে অধিক ধন উৎপন্ন করা। দ্বিতীয়, দেশের যে ধন অন্যায়ভাবে বিদেশে বেরিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিরোধ। তৃতীয়, বিদেশের ধন প্রচুর পরিমাণে আমদানী

করা। তৃতীয়টার বিষয়ে যাই হোকনা কেন, প্রথম ছুটী কাজের সোজা বাংলা মানে ইংরেজকে হাতে না মেরে ভাতে মারা। ইংরেজ যে উপায়ে আমাদের দেশের বস্ত্র-শিল্প ও অন্যান্য অনেক শিল্পের দফা রফা করেছেন সে কথা মনে ক'রে কেউ যদি সে সময়ে একটু শোধ তোলার ইচ্ছা করেন, তা হলে রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে নিতান্তই যে অন্যায় হবে সে কথা বলা যায় না। কিন্তু সে কথা ভুলতে সক্ষম হ'লেই ক্ষমার পরিচয় দেওয়া হবে নিঃসন্দেহ। যাই হোক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে এই—যে দেশে যে জিনিষ উৎপাদনের স্বাভাবিক সুবিধা আছে, সে দেশ তাই উৎপন্ন করবে, যে জিনিষ উৎপাদনের সুবিধা নাই তা অপরের নিকট হতে কিনবে। কিন্তু মানুষ যেমন প্রায় সকল বিষয়েই যথাসাধ্য প্রকৃতির নিয়ম ওলট পালট ক'রে দিয়েছে, দুর্দ্দমনীয় লোভের বশে এ-ক্ষেত্রেও তার কিছু ক্রটি করেনি। বাণিজ্য-তরীকে এখন দেশ-বিদেশে টেনে নিয়ে চল্‌ছে রণতরী। তার পক্ষে সেরূপ না ক'রে যে উপায়ান্তর নাই। যন্ত্রবিজ্ঞানের যে দানবকে সে মাল উৎপাদনের কাজে লাগিয়েছে, সে উৎপন্ন করছে অজস্র। কিন্তু তার সঙ্গে সর্ত্ত এই যে, সে একদণ্ডও চুপ ক'রে থাকবেনা। তার কল-কারখানা বন্ধ হলেই সে ঘাড় মটকাবে। কাজেই এই অজস্র উৎপাদিত মালের জন্য চাই অসংখ্য খদ্দের। সুতরাং ছলে বলে কলে কৌশলে পৃথিবীর অনেকগুলি দেশকে মাল-উৎপাদন কাজে একান্ত অক্ষম ক'রে রাখা আত্মরক্ষার পক্ষেই একান্ত আবশ্যক। সকলেই জানেন, জার্ম্মানি গত যুদ্ধের কৈফিয়ৎ খাড়া করেছিল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য। সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে আত্মরক্ষাটা সাধারণ আত্মরক্ষা নয়, পূর্ব্বোক্ত দানবের হাত হতে আত্মরক্ষা। ইংলণ্ডের জোর কপাল। ঠিক মাহেন্দ্র ক্ষণেই ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড হাটটা তার হস্তগত হয়েছিল। এখানকার তিরিশ কোটী লোক তার পূর্ব্বে সকলেই কিছু নগ্ন বর্ব্বর বা নাগা সন্ন্যাসী ছিল না। প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি নিজেরাই উৎপন্ন করতো। কিন্তু ইংরেজের আগমনের কিছুদিনের মধ্যে তাঁতী ও অন্যান্য শিল্পকার-গণের মধ্যে দারুণ স্মৃতি-বিভ্রম রোগের এপিডেমিক আক্রমণ হলো। সকলেই নিজের নিজের ব্যবসায় ভুলে যেতে লাগল। কাজেই ইংলণ্ডকেই আমাদের ঐ সব জিনিষ সরবরাহের ভার নিতে হলো। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যে ইংলণ্ড ইয়োরোপীয় শক্তি-সমূহের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর উপরদিকে বা জোর দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচের দিকে ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সে উঠল প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম স্থানে। ইংলণ্ডের প্রাধান্য নির্ভর করছে টাকা ও জাহাজের উপর। এই দুয়েরই জন্ম হয়েছে তার বিপুল বাণিজ্যের কল্যাণে। কিন্তু স্বরাজ পেলে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক নিয়মটাই মানবো। কোনও-রূপ জোর-জবরদস্তী চালাকির ধার ধারবোনা। কাজেই সর্ব্বপ্রথম বন্ধ হবে ম্যানচেষ্টারের বড় বড় কাপড়ের কল, তার পরে শেফিল্ড বার্ম্মিং-হামের লোহা-লক্কড়ের কারখানা। তারপর ক্রমে ক্রমে আরো অনেকে ঐপথ অনুসরণ করবে। যা বাকী থাকবে তার আয় হতে ইংলণ্ডের নেকটাইএর কড়িও জুটবে কিনা সন্দেহ।

এ সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা করার দরকার নাই। যেটুকু লেখা গেল, তার থেকেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন, স্বেচ্ছায় ইংরেজ আমাদের হাতে স্বরাজ তুলে দিবে, এ আশা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত। তাই ব'লে আশা করতে আমি কাউকে অবশ্য বারণ করছিনে। কারণ বারণ করলেও কেউ শুনবেনা। বিশেষতঃ আশা ধরে থাকার আরাম আছে যথেষ্ট এবং সেজন্য টেক্‌সও লাগেনা এক পয়সা।

২। ইংরেজ বদান্যতাবশতঃ স্বরাজ দিলেও আমরা পাবো কি না?

মনে কর যদি কোনও শুভ মুহূর্ত্তে ইংরেজের এমন শুভবুদ্ধির উদয় হয় যে, আমাদের হাতে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা—ওঁ বিষ্ণু—স্বরাজ সমর্পণ ক'রে জেরুজেলাম-বাসী হয়, তাহলেও ও-পদার্থ আমরা পাবো কিনা এবং আমাদের ভোগে লাগবে কিনা। যাঁরা স্বরাজ জিনিষটার স্বরূপ বিন্দুমাত্র বুঝেন তাঁদের নিকট এ প্রশ্নটা, সোণার পাথরবাটি হ'তে পারে কিনা,এই প্রশ্নের মতোই হাস্যকর। ইংরেজ আমাদিগকে সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্য—ভারত সাম্রাজ্য—কেন তাদের সূর্য্যাস্তবিহীন নিখিল সাম্রাজ্য খয়রাৎ করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ কিছুতেই দিতে পারে না। দেওয়ার যো নাই। স্বরাজের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের জমিতে নয়—আমাদের মনে প্রাণে চরিত্রে, আমাদের সাধনায় আশায় আকাঙ্ক্ষায় আমাদের আদর্শে—এমনকি আমাদের স্বপ্নে। 'রাজ' তো পড়েই আছে কিন্তু যত দৈন্য-দুর্ব্বলতা আমাদের 'স্ব'য়ে। এ দৈন্য-দুর্ব্বলতা আমাদের যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত কলুষ কলঙ্ক পাপের ফলে। একান্ত নিষ্ঠাভরে পরম ধৈর্য্যে একাগ্র সাধনায় পলে পলে ঐ কলঙ্কের কালি বিন্দু বিন্দু ক'রে ক্ষালন করতে হবে; পাপ ও অবসাদের নাগপাশ বন্ধন একটী একটী ক'রে মোচন করতে হবে। মহান দুঃখ, পরম ত্যাগকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়ে আপনার আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন, ইংরেজ আমাদের পাপের বহির্বিকাশ মাত্র। কি হবে ইংরেজকে তাড়িয়ে বা ইংরেজ স্বেচ্ছায় চলে গেলে যদি আমাদের সেই পাপের ভারা পূর্ণই থাকে! সেই পাপ জাপান, আফগান, জার্ম্মানি, বল্‌শেভিক বা অন্তর্বিপ্লবের মূর্ত্তি ধরে আমাদের উপর প্রভুত্ব করবেই। ক্ষুদ্র স্বার্থভরে, তুচ্ছ আরামে, একান্ত আলস্যে চোখ বুজে সে পাপের পথ বেয়ে এই দুর্দ্দশার মাঝখানে এসে পৌছেছি, সেই পথকে পুণ্যের পথে পরিণত করতে করতে আমাদিগকে ফিরতে হবে তার প্রত্যেক ধূলিকণাটীকে মাড়িয়ে; মহাদুঃখের পরিচয় নিয়ে নিয়ে, একে একে স্বার্থ বলি দিতে দিতে আপনার সবখানিকে জাগ্রত রেখে। সেই তো আমাদের প্রায়শ্চিত্ত।

তারপর আর একটা কথা আছে। আমরা যে পরাধীন হয়েছি এবং পরাধীনতার পাশ কিছুতেই মোচন করতে পারছিনে, তার কারণ আমাদের বাহুবল বা বুদ্ধিবলের অভাব নয়। আমাদের জাতীয় আত্মা তেমন প্রবুদ্ধ হয়নি ব'লে, দেশাত্মবোধ তেমন পরিস্ফুট ছিল না ব'লেই আমাদিগকে এই চরম দুর্গতির মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হচ্ছে। যে জাতির প্রবল দেশাত্মবোধ থাকে সে বার বার যুদ্ধে পরাভূত হতে পারে, কিন্তু কখনই বহুদিন

পরাধীনতা সহ্য করেনা। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ কোনও দিন দেশাত্মবোধের অনুশীলন করে নি—ও জিনিষটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেনি। মুসলমানেরও দেশাত্মবোধ তেমন পরিস্ফুট ছিল না বটে, কিন্তু বিজয়ী ধর্ম্মের প্রবল উৎসাহ তার সে অভাব ভালরকমেই পূরণ করেছিল। ইংরেজের দেশাত্মবোধের তুলনা নাই! যেদিন ইংরেজ ডাক্তার বৌটন বাদসাহ ফেরোকশিয়রের কন্যার চিকিৎসা ক'রে পুরস্কার-স্বরূপ ধন-সম্পত্তি না নিয়ে ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রার্থনা করল, সেইদিনই বুঝা গেল এই জাতই ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যের অধিকারী হবে। ইংরেজের একচ্ছত্র আধিপত্যের ছায়ায় বাস ক'রে এবং এক পাদুকার পীড়ন সহ্য ক'রে আমাদের একরকমের দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেটা আসল জিনিষ নয়—একটা জোড়াতাড়া দেওয়া কৃত্রিম ভাব মাত্র। ওর উপর কোনও ভরসা নাই। যেদিন উপরের চাপ সরে যাবে, কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো ঠিক নাই—আমাদের মিথ্যা দেশাত্মবোধ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে। ঐ মিথ্যাকে আমাদের সত্য ক'রে তুলতে হবে। আমরা আমাদের শাসন-সংরক্ষণ, বিচার-শিক্ষা, স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে, নানা প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে নানারূপ ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে সফলতার দিকে যতই এগোতে থাকবো, ততই আমাদের প্রকৃত দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হতে থাকবে। একব্রত, একলক্ষ্য, এক ব্যর্থতা, এক সার্থকতা, দেশাত্মবোধের বিকাশের পক্ষে এগুলি যে কেবমাত্র অত্যাবশ্যক তা নয়, একেবারে অপরিহার্য্য। পঞ্চায়তের বিচারে ন্যায়ের তুলাদণ্ড একটু আধটু হেলতে পারে, জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার পাণে চুণের প্রয়োগের মাত্রা যথাযথ নাও হতে পারে, চরকার সুতোর কাপড়ে সভ্যতার কোমল অঙ্গে আঘাত লাগতেও পারে, কিন্তু তবুও ঐগুলিকে আমাদের অবলম্বন করতেই হবে। নতুবা আমাদের আত্ম-কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস ও দেশাত্ম-বোধ কোনও দিনই উদ্বুদ্ধ হবে না।

দেশের কাজের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই দেশাত্মবোধ স্থায়ীভাবে জেগে উঠে। অন্য পথ নাই। গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা হবে না—উত্তেজনা-পূর্ণ কবিতা দ্বারা হবে না—'বঙ্গ আমার জননী আমার' পথে পথে গেয়ে বেড়ালেও হবে না।

ইংরেজ যে আমাদের প্রকৃত স্বরাজ দিতে পারে না, কেবলমাত্র তাই নয়—আমাদের দেশাত্মবোধ যতদিন না পূর্ণ-পরিণতি লাভ করে, ততদিন ইংরেজের এখানে থাকা এবং কতকটা প্রতিকূলভাবে থাকাই আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইংরেজ যদি আমাদিগের উপর কোনওরূপ শোধ তুলতে চায়—যদি আমাদিগকে চিরদিনের মতো স্বরাজ লাভ হ'তে বঞ্চিত করতে চায়—তাহলে তার একমাত্র উপায়, এই সময়ে পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দেওয়া। এতে তাদের যে বিশেষ বেশী ক্ষতি হবে তা মনে হয়না, কারণ তাদের আধিপত্যের মায়া একদিন কাটাতেই হবে। কেবল দু-একদিনের আগু-পিছু মাত্র। কিন্তু আমাদের স্বরাজ লাভের আশা চিরদিনের

মতো না হোক্, অন্ততঃ বহুদিনের মতো অন্তর্হিত হবে।

আসল কথা, দেবার মতো জিনিষ কেউ কোনও দিন কাউকে দিতে পারে নি—দিতে পারেও না।

অপরে দয়া-পরবশ হয়ে খুব ভাল চশমা দিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিটা আপনাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়—পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারে, কিন্তু হজমটা আপনাকেই ক'রে নিতে হয়—খুব দামী দামী ওষুধ দিতে পারে কিন্তু স্বাস্থ্যটা আপনাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়—সুখের আয়োজন আসবাবে ঘর ভ'রে দিতে পারে, কিন্তু সুখটা আপনার প্রাণ হ'তেই সৃষ্টি করতে হয়। ইংরেজ বড়-জোর আমাদের স্বরাজ লাভ বিষয়ে কতকটা সাহায্য করতে পারে—তার বেশী কিছু পারে না—আশা করাও পাগলামি।

Evolution ও Revolution। আর একটা কথা বলেই এই প্রবন্ধটা শেষ করবো। এই সব পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাত্মা সর্ব্বদাই বলে থাকেন তাঁরা Evolution (অভিব্যক্তি) এর পথ দিয়ে স্বরাজ লাভ করতে চান—Revolution (বিপ্লব) এর পথ দিয়ে নয়। ইংরেজের সহকারিতা, মণ্টেগু-প্রদত্ত রিফরম্‌কে সফল ক'রে তোলা তাঁদের মতে এভোলিউসনের পথ। সহ-যোগিতা বর্জ্জন ক'রে বরখাস্ত করার চেষ্টা রেভোলিউসন। কথাটা শুনতে বেশ। ডারউইন, স্পেনশার প্রভৃতির কল্যাণে Evolution কথাটার চারধারে এমন একটা শ্রদ্ধা ও সম্মানের আকাশ রচিত হয়ে গেছে যে, ঐ কথার দোহাই দিয়ে অনেক মিথ্যা, অর্দ্ধ-সত্য পার হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যে জিনিষটাকে তাঁরা এভোলিউসন বলে চালাতে চান তার সম্বন্ধে এভোলিউ-সনের নিয়মগুলি খাটে কি না তলিয়ে বুঝে দেখা দরকার। এভোলিউসনের নিয়ম কাজ করে প্রাণের তত্ত্বের উপর। মূলে জীবনের বীজ থাকা চাই। অনুকূল ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতে সেই বীজ নানা বৈচিত্র্যে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু গোড়াতেই যদি প্রাণের তত্ত্ব না থাকে, জীবনের বীজ না থাকে, অভিব্যক্ত হবে কে? বিকাশ লাভ করবে কি? মণ্ট-ফোর্ড রিফরম্ পাঁচ মিস্ত্রীর হাতে গড়া পাঁচমিশালি রকমের রঙিন পুত্তলিকা মাত্র। তাকে নানারূপ দামী পোষাকে সাজিয়ে বুড়ো খোকাদের ছেলেখেলা চলতে পারে—কিন্তু সে যে জীবন্ত মানুষের মতো কাজে লাগবে এরূপ আশা করা পাগলামি মাত্র। তার সম্বন্ধে যা খাটে তা এভোলিউসনের নিয়ম নয়, বোধোদয়ের উক্তি। "পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না" ইত্যাদি। Revolution বা বিপ্লব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার এ স্থান নয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, সংসারের আদুরে খোকাবাবুরাই ও-জিনিষটাকে জুজুর মত ভয় করে, মানুষের মতো মানুষে করে না। Revolution সুপ্ত প্রাণ-শক্তিকে জাগিয়ে তোলার অমোঘ উপায়। সে যখন একবার জেগে ওঠে, তখন তার বিকাশ ও গঠনের কাজ আরম্ভ হয়—Evolution-এর অলঙ্ঘ্য নিয়মানুসারে।

Conscience of the British people

—এঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমরা স্বরাজ পাবে এ ভরসার ভিত্তি কি? এবং উপায়টাই বা কি? এঁরা অম্লান বদনে উত্তর দিয়ে থাকেন, উপায় appeal to the conscience of the British people ইংলণ্ড-বাসীর ধর্ম্মবোধের উদ্বোধন। জগতের লোকের ধর্ম্ম-জ্ঞানকে জাগিয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করতে হবে,—অন্য উপায় নাই—মহাত্মা গান্ধীর কৃপায় এ-কথা বুঝতে আজ কারো বাকী নাই। কিন্তু বৃটিশ নেশনের ধর্ম্মবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার পথটা কি! সে কি তোমাদের ডিপ্লো-মেটিক মিথ্যা দরখাস্তের সেতু-বন্ধন? জয় রাধে দুটো ভিক্ষে পাই মা? না God save the Kingএর কোরাসে কপট উচ্ছ্বাস-ভরে যোগ দেওয়া? এ পথও যে প্রশস্ত পথ তা স্বীকার করি, কিন্তু সেটা লাটগিরি বা লর্ড উপাধি লাভ করার পক্ষে। এ পথের পথিকরাও ফল লাভ ক'রে থাকে সন্দেহ নাই এবং সেটা হাতে হাতে। Verily I say unto you they have their reward. কিন্তু ধর্ম্মের দ্বারাই ধর্ম্মবোধ জাগে, সত্যই সত্যকে প্রবুদ্ধ ক'রে থাকে,আলো হ'তেই আলো জ্বলে—অন্ধকার হ'তে নয়। আমরা দেশ-শুদ্ধ লোক দেশের জন্য যদি একটা প্রকাণ্ড ত্যাগের পরিচয় দিতে পারি, পরম দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিতে পারি, ওদের চেয়ে বড় হয়ে ওদের বিস্ময়াকুল শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে তুলতে পারি, তবেই ওদের ধর্ম্মবোধকে জাগাতে সমর্থ হবো, unless "your righteousness shall exceed the Righteousness of the Pharisees ye shall not enter the kingdom of Heaven."

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

প্রত্যাবর্ত্তন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে ছোট একখানি পল্লী! দৃশ্য-হিসাবে পল্লীখানির কোন মনোহারিতা ছিল না। সেইখানে আলোক-নাথের ইচ্ছানুসারে তাহারই আত্মীয়-সম্পর্কীয়া এক প্রৌঢ়ের গৃহে অরুণের থাকিবার স্থান হইল। তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হয়—কিন্তু উপায় কি! একগুঁয়ে অবাধ্য অরুণ যখন নিজের মঙ্গল বুঝিবে না, তখন জোর করিয়া সদুপদেশ গিলাইয়া আলোক-নাথ কেমন করিয়াই বা তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মী-জীবন গঠনের উপায় করিয়া দিবেন? ইংরাজী বিদ্যার শোকে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। ছেঁড়া কাঁথায় বসিয়াও অনেকে রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন দেখে যে! পাশ করিলে জজিয়তীই বা মিলিয়া যায়! ওরে অবোধ, যদি তাই হইবে, তবে বঁড়শীর বিদ্ধ মৎস্য অগাধ জলে পলাইবে কেন? একটা চলিত কথা আছে, জিস্‌কো না দেয় খোদাতালা, উস্‌কো দেনে

না শকে আসফউদ্দৌলা। খোদাতালা না দিলে দানবীর আসফউদ্দৌলাও কাহাকেও কিছু দিতে পারেন না।

ভগবান্ না দিলে মানুষের সাধ্য কি, কেহ কাহাকে কিছু দিতে পারে! এই যে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণই ত এই আলোকনাথ! মানুষে ঠকাইতে চাহিলে হইবে কি? দেনেওয়ালা যা তাহার ভাগ্য-ফলকে পাওয়ার তালিকাই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এই অমত ও বিরুদ্ধ ব্যবহার-সত্ত্বেও আলোকনাথকে আমরা দোষ দিতে পারি না। সে মানুষ। মানুষের লোভ, মোহ, ভয় অবিশ্বাস—সবই তাহার চিত্তে বিদ্যমান। নিজের স্বার্থ কে না চায়? আর স্বার্থের পথের প্রধান অন্তরায়কে কে-ই বা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে পারে? আমরা সত্য কথা বলিব। অরুণের চোখের জলে সত্যই তাহার মন ভিজিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে সে যে তাহার স্বার্থের পথে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, নিজের ও হিতৈষিবর্গের এ ধারণা সত্ত্বেও সে তাহাতে কোন বাধা দিল না। কাছে রাখিতে সাহস না করিলেও গ্রামান্তরে তাহারই জানিত লোকের আশ্রয়ে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষা-লাভের সুযোগ করিয়া দিল—ইহার অধিক চিরশত্রু প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য কে আর বেশী কি করিতে পারে? অপরিচিত দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদের সংশ্রবে অজ্ঞাত জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহে প্রথম প্রথম অরুণের খুবই কষ্ট হইয়াছিল। অপরিমিত ভোগ-সুখ-পালিতের পক্ষে দরিদ্র গৃহের সহস্র অভাব ও অসুবিধা প্রতি পদক্ষেপে বাধা জন্মাইতে ছিল। সহিষ্ণু শান্তচিত্ত বালক তাহার এতটুকু আভাষ বাহিরে প্রকাশ করিত না। অদৃশ্য অদৃষ্টকে সে যখন মানিয়াই লইয়াছে, তখন ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট পথে কণ্টক-গুল্ম, খানা-ডোবা দেখিয়া মুখ ফিরাইলে চলিবেই বা কেন? পথের শেষে যদি পৌঁছিতেই হয় ত বীরের ন্যায় উঁচু মাথায় সরল গতিতে পৌঁছানো চাই! পায়ে-পায়ে বাধিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে হুঁচট খাওয়ায় যাত্রার সার্থকতা কোথায়?

তবু এই নূতন আশ্রয়ে তাহার একান্ত অভাব অনুভূত হইত, সঙ্গী-হীনতায়। সংসারের অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ যতই থাকুক, উপস্থিত মনের অবস্থায় সে সকলের দুঃখ সে তখন তেমন করিয়া আর অনুভব করিতে পারিতেছিল না। কেবল সময় সময় নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হইত।

বাড়ীর কর্ত্রী মুক্তা ঠাকুরাণী অত্যন্ত রাশ-ভারি মানুষ। কাজের কথা ছাড়া তিনি কখনো বাজে কথা একটিও কহিতে ভাল বাসিতেন না। তা-ছাড়া ইঁহার সহিত কি কথাই বা সে কহিবে? তাহার মনের অভাব মিটাইবার শক্তি কি ইঁহার আছে? বাড়ীতে একটি ঠিকা ঝী দুইবেলা বাসন মাজিয়া উঠানে-দালানে গোবর-মাটী লেপিয়া বাজার করিয়া দিয়া যাইত এবং রাত্রে মুক্তা ঠাকুরাণীর কাছে আসিয়া সে শয়ন করিত। বাড়ীতে তাহার ছেলে আছে। বৌটি ছেলেমানুষ—ঘর-কর্ণা দেখিতে হয়, তাই বাকী সময়টুকু সে নিজের বাড়ীতেই থাকিত। অরুণ আসিলে তাহার রাতের চৌকি দেওয়ার কাজে ছুটী মিলিল। অল্প-বয়সী হউক, তবু

পুরুষ মানুষ একজন বাড়ীতে রহিল ত, আর কি-ই বা এমন সোনা-দানা, শাল-দোশালা তাঁহার আছে,—যাহার জন্য এত ভয়!

মুক্তা ঠাকুরাণীকে গ্রামের লোকে সম্মান করিত। তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখে এমন একটি তেজস্বিতার ভাব ছিল, যাহাতে ছেলে-বুড়া সকলকে তিনি অনায়াসে বাধ্য করিতে পারিতেন। মনে যত বড় অনিচ্ছাই থাক্, মুখ ফুটিয়া তাঁহার কাজে বা কথায় কেহ কখনো প্রতিবাদ করিতে পারিত না। পাড়ার বধূ-কন্যারা দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিলে সসঙ্কোচে বেচাল সংশোধন করিয়া লইত। সম্বোধনসূচক পদবী-যোগে কেহ জেঠাইমা, কেহ খুড়ী, কেহ মাসি, কেহ দিদি প্রভৃতি পাতানো সম্পর্ক ধরিয়া "ঐ লো ঐ—আস্‌চেন" বলিয়া চোখে চোখে সতর্কতার টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বিশেষ ভাবে সকলে নিজ নিজ কার্য্যে সতর্ক,মনোযোগী হইত। না জানি, মুক্তা ঠাকুরাণী এখনি আবার কাহার কি ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া দুই কথা শুনাইয়া দিয়া যাইবেন! কিছুই ত বলা যায় না। লেখা-পড়া হিসাব-বোধ বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসায় পাড়ার মধ্যে মুক্ত বামনির নাম বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শোনা যায়, মামলা-মুকর্দ্দমা-সংক্রান্ত ব্যাপারেও পাড়ার প্রাচীনেরা নাকি তাঁহার পরামর্শ লইয়া থাকেন। পাড়ার দলাদলি ব্যাপারেও তাঁহাকে না বলিয়া কাহারো কোনরূপ রফা করিবার সামর্থ্য ছিল না।

মুক্তা ঠাকুরাণী এই গ্রামেরই মেয়ে। অন্য সন্তান-সন্ততি কিছু না থাকায় বাপ গৃহ-জামাতা করিয়া তাঁহার স্বামীকে ঘরেই রাখিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, এই উপায়ে ছেলে-মেয়ের সব সাধই মিটাইয়া লইবেন,—বাল-কণ্ঠের কল-কাকলীতে তাঁহার গৃহপূর্ণ হইবে। কিন্তু মানুষের আশা প্রায়ই পূর্ণ হয় না। যৌবনাগমের পূর্ব্বেই মুক্তা ঠাকুরাণী বিধবা হইয়া মা-বাপের সকল সাধের শেষ করিয়া দিলেন; এবং পতি-গৃহের সহিত সেইদিন হইতে সম্বন্ধ চুকিয়া গেল। পল্লীগ্রামে ঝিউড়ী মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ আঁটা-আঁটি নাই। মুক্তা ঠাকুরাণী অসঙ্কোচে সকলের সহিত কথা কহিতেন, সবার সম্মুখে বাহির হইতেন। তবু সেই তেজস্বিনী বাল-বিধবার সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও কেহ কখনো নিজের কোন কথা বলিতে পারিত না। বাপের কাছে তিনি লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন। দুপুর-বেলা রামায়ণ, মহাভারত, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পড়িয়া পাড়ার মেয়েদের শুনাইতেন। তাঁহার গৃহে দ্বিপ্রহরিক বৈঠকের সভাটি বড় ছোট-খাট হইত না। সামান্য জমি-জমা যাহা-কিছু ছিল, তাহাই বিলি করিয়া প্রজা বসাইয়া কোন রকমে সংসার চালাইতেছিলেন, খাজনা-আদায় প্রভৃতিও তিনি নিজে করিতেন। দূর হইতে উন্নত-নাসা শুভ্রবসনা শ্যাম-কান্তি বিধবাকে আসিতে দেখিলে দেনাদার তটস্থ হইয়া পড়িত; মুক্তা ঠাকুরাণীর পাওনা যেমন করিয়াই হউক এখনই ফেলিয়া দিতে হইবে। 'দিচ্চি' 'দিব' এ-সব ওজর-আপত্তির কর্ম্ম নয়। কি জানি, ঠাকুরাণী যদি রাগ করিয়া বসেন—তবেই যে মুস্কিল! শুধু জবরদস্ত বলিয়াই যে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নয়, অন্তরের ঐশ্বর্য্য নিজ হইতেই লোক-চিত্তে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিল। লোকে

তাঁহাকে যেমন ভয় করিত, তেমনি ভক্তিও করিত। দেশের লোকের আপদে-বিপদে রোগে-শোকে আগে গিয়া তিনি বুক দিয়া পড়িতেন। পীড়িতের সেবায়, রাত্রি-জাগরণে, শোকার্ত্ত পরিবারের উপস্থিত প্রয়োজনে, যজ্ঞ-বাড়ীর যজ্ঞ-রক্ষণে সর্ব্বত্রই তাঁহার কুশল হস্তের সহৃদয়তা ও দক্ষতা দেখা যাইত।

কোথায় কোন্ গরীব গৃহস্থ মানের দায়ে ভিক্ষায় বাহির না হইয়া দুইদিন উপবাসী রহিয়াছে, কাহার অভিমানিনী বধূ-শাশুড়ীর গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া আত্ম-নাশের উপায়-সন্ধানে চেষ্টা করিতেয়ছ, কোন্ তরুণ যুবা বুড়া মা-বাপের মুখ না চাহিয়া বধূ লইয়া উন্মত্ত, বা কোন্ ক্ষুদ্রচিত্তা বধূ শাশুড়ীর সম্মান না রাখিয়া যথোচ্ছাচারে প্রবৃত্তা,—এ সকল সংবাদ মুক্তা ঠাকুরাণীর এজলাসে আগে আসিয়া পৌঁছাইত এবং তাহার যথাসম্ভব প্রতিবিধানও বাদ পড়িত না। একবার জানাইতে পারিলেই অভিযোক্তা দায়ে খালাস। তার পর কেমন করিয়া কি করিতে হইবে, সে ভাবনা বিচারকের।

সংসার শক্তির বশ। যে বৃহৎ গ্রহের শক্তি অধিক, সে নিজের কেন্দ্রে স্থির থাকিয়াও ক্ষুদ্র গ্রহ-উপগ্রহগুলাকে অনায়াসে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ইচ্ছামত ঘুরাইয়া লইতে পারে। শুধু শারীরিক বলেই সকল স্থলে কার্য্যোদ্ধার হয় না, মানসিক শক্তিই মানবের জড়ত্ব-নাশের প্রধান সহায়। এই জন্য গৃহস্থালীতে কর্ত্তা-গৃহিণী, রণ-ক্ষেত্রে সেনাপতি, সমবেত কার্য্যে নেতার প্রয়োজন। যেখানে নেতার শক্তির অভাব, সেইখানেই নেতৃত্ব বিশৃঙ্খল। সৃষ্টি-রক্ষার্থে মহাশক্তি তাই সদা-জাগ্রত।

শক্তিশালিনী মুক্তা ঠাকুরাণী লোকের অভাব-নিবারণে যেমন সক্ষম, তাহাদের দোষ-ক্রটি পাইলে রসনার তীক্ষ্ণ ব্যবহারেও আবার তেমনি নির্ভীক। তাঁহার নিকট দোষীর কাঠগড়ায় যে একবার দাঁড়াইবে, সহজে তাহার আর নিষ্কৃতি ঘটিবে না। এটুকু সবাই জানে, যে নাকের জলে চোখের জলে মিলাইয়া "ঘাট মানা" তাহার ভাগ্যে অনিবার্য্য। "আপনার" বলিতে তাঁহার বড় বিশেষ কেহ ছিল না! তাই বসুধৈব কুটুম্বকম্—সকলকেই তিনি আপনার করিয়া লইয়া ছিলেন। আপনার বলিতে কেবলমাত্র তাঁহার এক ভাগিনেয়ী ছিল। সে বিদেশে স্বামীর কাছে থাকিত। বিবাহের পূর্ব্বে সময়-সময় সে মাতুলানীর পিতৃ-গৃহে আসিয়া বাস করিত; এবং বিধবার শূন্য অন্তঃকরণের অনেকখানি অংশ ভরাইয়া রাখিত। এখন সেও পর হইয়া গিয়াছে। তবু সে তাঁহার একমাত্র নিকটতম আত্মীয়। সম্প্রতি তিনি তাহারো বৈধব্যের সংবাদ পাইয়াছেন। আর সেই জন্য তাঁহার গম্ভীর মুখ আরও বেশী গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। স্বল্প ভাষা আরও স্বল্প হইয়া গিয়াছে। এমন সময় অরুণ আসিয়া তাঁহার নিরানন্দ গৃহে আপনার নিরানন্দ জীবনের নূতন পর্ব্ব আরম্ভ করিল। জমিদার দয়া করিয়া তাহার জন্য মাসিক পনেরো টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিল। পল্লীগ্রামের খাওয়া-পরা ইহাতে অনায়াসে চলিতে পারে। কিন্তু বই কিনিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক, তাহা সংকুলান হয় না। অরুণ খাওয়ার খরচ দশ টাকা করিয়া তাঁহাকে দিতে চাহিলে মুক্তা ঠাকুরাণীর গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হইয়া

গেল, কিন্তু তিনি একটুও অসম্মতি জানাইলেন না। মনে করিলেন, টাকা কয়টি মাস-মাস উহারই কোন ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য তুলিয়া রাখিবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে দুই বেলা দুইমুঠা শাক-ভাত খাইবে, তাহার কি আবার মূল্য লইতে হইবে! এ কি সহরের হোটেলখানা! গলায় দড়ি! গৃহস্থ-বাড়ীতে অতিথি যে গুরু! মুখে কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিলেন না। অরুণ টাকা দিলে তিনি বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। সংসারে সব হারাইলেও অরুণ দুইটী অনন্য-সাধারণ বস্তু হারায় নাই। এক,—দৈহিক সৌন্দর্য্য, দ্বিতীয় সচ্চরিত্র। মানুষ মাত্রেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হয় কে? সুন্দর ফুল, বিচিত্র প্রজাপতি হইতে বৃহৎ চন্দ্র-সূর্য্য পর্য্যন্ত তাই আমাদের মুগ্ধ নেত্রে অসীম আনন্দ প্রদান করে। অরুণের সুন্দর মুখ, প্রসন্ন স্নিগ্ধ দৃষ্টি, বিনীত শান্ত ভাব, সুকুমার কান্তি—ছেলেটিকে কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায়? তাহার তরুণ ললাটে বিষাদের যে নিবিড় ছায়া এই বয়সেই আসন বিছাইয়া ছিল, লোক-চক্ষে তাহাতেও সহানুভূতির সৃষ্টি করিত। সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। পাড়ার প্রবীণেরা তাহাকে স্নেহ জানাইতেন, পাঠে উৎসাহ দিতেন। নবীনেরা বন্ধুত্ব করিতে চাহিত। ইহার অধিক সে দরিদ্র পল্লী বেশী আর কি দিতে পারে! নিখিল মিষ্টভাষে সকলের সহিত কথা কহিত, মিশিবার চেষ্টাও করিত। কিন্তু চিরদিনের অনভ্যাসের ব্যবধানে বাধিতে থাকিত। তাহার ভিতর-বাহিরের অসহ্য শূন্যতা তাহাকে অনেক দূরে ঠেলিয়া রাখিত। প্রাণ খুলিয়া সে কাহারো সহিত মিশিতে পারিত না। নিজের অন্তরের দীনতা সে কাহারো কাছে প্রকাশ পাইতে দিত না। পাছে গরীব বলিয়া কেহ তাহার প্রতি দয়া করিতে চায়, এই ভয়ে অভাবের কথা কাহারও কাণে সে তুলিত না। এত দিন জমিদার-পুত্ররূপে যে শত শত দীন-দরিদ্রের অভাব মোচন করিয়াছে, আজ সে দয়া চাহিয়া কাহার কাছে মাথা নামাইবে? বরং এই যে তাহার অন্ন-বস্ত্রের মূল্য—আলোকনাথের কৃপার দান বলিয়া যেটাকে মনে হয়, ইহার ভার নামাইতে পারিলে সে বুঝি লঘু নিশ্বাস লইয়া আবার সুস্থ হইতে পারে! দানের সুখ যে পাইয়াছে, যাচকের দুঃখ যে তাহার পক্ষে মরণাধিক দুঃখকর!

মুক্তা ঠাকুরাণীর স্বল্লায়তন বাড়ীর বাহিরের একমাত্র ঘরখানি দখল করিয়া অরুণ তাহার অল্প-স্বল্প জিনিষ বই-খাতা প্রভৃতি গুছাইয়া লইল। ঘরে টেবিল-চেয়ার আলমারি কিছুই ছিল না; বহুকালের একখানি ঘুণ-ধরা তক্তাপোষ—তাহার চারিটি পদ চারিখানা অর্দ্ধভগ্ন ইষ্টক-খণ্ডে স্থাপিত করিয়া একমাত্র গৃহসজ্জারূপে অবস্থিতি করিতেছিল। প্রয়োজনানুসারে এইখানিই টেবিল ও খাটের অভাব পূর্ণ করিত। অনিচ্ছাতেও তাহার পূর্ব্বের সুসজ্জিত পাঠাগার বহুমূল্য মেহগ্নি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ডেক্সটি আর ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নী দেবীর চিরস্নেহময় হাসি-ভরা মুখ বার বার তাহার মানস-নেত্রে ফুটিয়া অশ্রুবাষ্পের কুয়াশায় মিলাইয়া যাইতেছিল। মানুষ যে সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ, অরুণ তাহা নিজেকে

দিয়াই অনুভব করিতেছিল। এই যে যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন, ইহাও ত সে বেশ সহিয়া লইল। আর একবার এমনি আঘাত,—যাহা সে শত-চেষ্টাতেও স্মরণ করিতে পারে না, তাহাও ত সহিয়াছিল। হস্তচ্যুত সুদূর অতীত, অরুণের জীবনের সব আশা-আনন্দই যে তোমার আনন্দময় আলোকোজ্জ্বল অঙ্কে বিলীয়মান। ভবিষ্যৎ—বৈচিত্র্যহীন দুঃখ-ময় তিমিরাবৃত ভবিষ্যৎ, না জানি, তোমার দুর্ভেদ্য রহস্য-ময় গর্ভে আবার কি ইঙ্গিত তাহার জন্য গোপনে সঞ্চিত রাখিয়াছ!

সংসারের সব-কিছু হইতে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিয়া সে এখন যোগীর ন্যায় একমনে পাঠাভ্যাসেই নিজেকে নিযুক্ত রাখিল; কোন বাধা, কোন অসুবিধাই তাহার গ্রাহে আসিল না। পূর্ব্ব-স্মৃতি ভুলিয়া থাকিবার, বর্ত্তমানকে কাটাইয়া তুলিবার একমাত্র উপায়,—সে এই শিক্ষা-লাভের আনন্দেই পাইয়াছিল।

দুই বেলা অনেক পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হয়। অল্প বয়সের ক্ষুধা—অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে দয়া করিত না। তাই সে যখন বৈকালে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিয়া যথাসাধ্য ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়া বাড়ী ফিরিত, তখন তাহার মুখখানি শুষ্ক দেখাইত। মুক্তা ঠাকুরাণী কিছুদিন হইতেই ইহা লক্ষ্য করিতে ছিলেন। তাহার সুন্দর মুখ ও নিষ্পাপ মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক দৃষ্টি ধীরে ধীরে এই সন্তান-বঞ্চিতা নারীর হৃদয়ে সন্তান-স্নেহ জন্মাইয়া তুলিতেছিল। অরুণের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাহাকে দুপুরবেলা কিছু কিনিয়া খাইবার জন্য চারিটি করিয়া টাকা দিতে চাহিলে, অগত্যা অরুণকে তাহা লইতে হইল। বাক্-বিতণ্ডা করিতে সে দক্ষ নয়, তা ছাড়া স্নেহের কাঙাল স্নেহের দান ফিরাইতেও ব্যথা বোধ করিল। আশ্রয়-দাত্রীর সম-বেদনায় তাহার চোখে কৃতজ্ঞতার সহিত যে জলের আভাষ ফুটিয়া ছিল, তাহা গোপন করিবার জন্য সে তখন ব্যস্ত থাকিলেও দাতার চক্ষে সেটুকু ধরা পড়িতে বিলম্ব ঘটিল না।

আড়ম্বর-হীন দরিদ্র জীবন ধীরে ধীরে তাহার মনে শান্তি আনিতেছিল। পূতা-চারী ঋষি-বালকের ন্যায় নিজেকে সে ধর্ম্মে ও জ্ঞানে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। দুই বেলা স্নান করিয়া নিয়মিত সে সন্ধ্যা-বন্দনা করিত। আলোকনাথ যাহাই বলুক, সে তাহার নবজীবন-দাতা মহানুভব পালক পিতার অবশিষ্ট দান এই যজ্ঞোপবীতটুকু কাহারও কোন কথায় ত্যাগ করিবে না। স্কুল হইতে ফিরিয়া সে গৃহ-কর্ত্রীর সখের বাগানের প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া দিত। বাগানটীতে লাউ-কুমড়া সিম্ ও পালমশাক ছাড়া অন্য কিছু বড় জন্মিত না। দুই-চারিটা গাঁদা দোপাটি অপরাজিতা প্রভৃতি ফুলের গাছও ছিল। একপাশে একটুখানি কবিরাজী গাছ-গাছড়ার ক্ষেত করা হইয়াছিল। তুলসী, আদা, ব্রাহ্মীশাক, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মুক্তা ঠাকুরাণীর চিকিৎসা-বিদ্যার সাক্ষ্যস্বরূপ প্রতিবেশীদের সাহয্যার্থ সযত্নে রক্ষিত হইত। অরুণের চেষ্টায় এইখানেই একটু উন্নতি দেখা যাইতেছিল। বাগানের কাজ নিজ হাতে না করিলেও ইন্দ্রনাথের শিক্ষা দিবার পদ্ধতিতে এ বিষয়ে অনেকখানি

অভিজ্ঞতা তাহার জন্মিয়াছিল। সেখানে সকালে উষা-ভ্রমণ-কালে ইন্দ্রনাথ তাহাকে শুধু গল্পচ্ছলে যে কত শিক্ষা দিত, তাহা তখন না বুঝিলেও এখন সে বুঝিতে পারে। শারদ সন্ধ্যায় যখন সে তাহার সহিত ছাদে বা বাগানে বসিয়া থাকিত, তখন আকাশের ঐ সব নক্ষত্রাবলীর পরিচয় সে তাহার কাছে কত সহজ ও সরল উপায়ে লাভ করিয়াছিল। সে তখন বুঝিতেও পারিত না যে পিতা তাহাকে কোন কঠিন বিষয়ে শিক্ষা দিতেছে! এমনি সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে সে তাহাদের নাম শিখাইত। কোন্‌টি কোন্ গ্রহ, সে অনায়াসে বলিয়া দিতে পারিত। কোন্‌টি শনি, কোন্‌টি শুক্র,—এ সব সে জানিত; গুণাবলীর পরিচয়ও দিতে পারিত। যে গ্রহের অবস্থান যেখানে থাকুক, অবলীলায় নিত্য-পরিচিত পুরাতন বন্ধুর মত তাহাদের সে চিনিয়া লইতে পারিত। পক্ষী-তত্ত্বেও সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের পক্ষী-পালনের সখ থাকায় পাখীদের জন্য জাল ঘেরিয়া বৃহৎ বাস-ভবন নির্ম্মাণ করানো হইয়াছিল; সেখানে নানা-জাতীয় পক্ষী ছিল। এমন কি যে সব পক্ষী বাস করিত, উড়াইয়া দিলেও তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাঁধে বা হাতের উপর বসিত। তাহাদের কোমল পালকের স্পর্শ বুলাইয়া মানুষের মতই তাহারা নিজেদের আদর জানাইত। কেনেরী পাখীর খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিলেও সে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিত না, বরং গান গাহিয়া তাহাদেরই মুগ্ধ করিত। দূরে আকাশের গায়ে কৃষ্ণকায় ছোট পাখিটি উড়িয়া গেলেও সে অনায়াসে বলিতে পারিত, সেটী কোন্ জাতীয় পাখী? ঝিলে ডিঙ্গি চড়িয়া কতদিন সে এ-পার ও-পার করিয়াছে; নিজের হাতে দাঁড় টানিতে শিখিয়াছে, সাঁতার কাটিতে শিখিয়াছে। পুস্তকের শিক্ষা অপেক্ষা ইন্দ্রনাথ তাহাকে এই সকল শিক্ষাই অধিক শিখাইয়াছিল। তাহার শরীর ও মন এমনি করিয়া সে গঠিত করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই হয়ত সে সাধারণের চেয়ে সাহসী, সত্যবাদী, কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরার্থপর হইবার অবসর পাইয়াছিল। যে বয়সে যে-শিক্ষাটির প্রয়োজন সেই বয়সে তাহা যথাযোগ্য হইলে তাহার ফল ভালই হয়। শিশু বংশ-দণ্ডকে অনায়াসে নোয়াইতে ও ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারিলেও বংশকে নষ্ট করা যায় না। শিশু অবস্থায় মানব-প্রকৃতি যখন কমনীয় ও নমনীয় থাকে, তখনই তাহাকে বশীভূত করিয়া সুগঠিত করিবার শুভ সুযোগ। স্বেচ্ছাচারিতা, জেদ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি আগাছা গুল্ম একবার জন্মিবার অবসর পাইলে আগাছার মতই তাহার শিকড় বহুদূর-বিস্তৃত হইয়া যায়, তখন তাহাকে আর ইচ্ছামত ফিরানো যায় না।

এখানে পাঠ ছাড়া অরুণের কিছুই শিখিবার বা করিবার ছিল না। তাই সে তাহার সমস্ত মনটুকুকে পাঠে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টির বাধা না জন্মিত, ততক্ষণ সে একমনে পাঠাভ্যাস করিত। কলিকাতার ন্যায় এখানে গ্যাসের আলো নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বৃক্ষচ্ছায়াময় পল্লীগৃহে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, তৈল পুড়াইবার অর্থাভাব—তাই সন্ধ্যার পর

প্রায় তাহার সে পাঠ বন্ধ রাখিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা করিত। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে তাহার বর্ত্তমান জীবন অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছিল। মানুষ অবস্থার দাস। যখন যেমন, তখন তেমন চলিতে সে বাধ্য, তাই সক্ষমও সে। ক্লাস-পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেদিন বাড়ী ফিরিয়া অরুণের চোখের জল আর বন্ধ থাকিতে চাহিতেছিল না। আজ যদি ইন্দ্রনাথ থাকিত! এ অশ্রু কে বারণ করিবে? কে আর তেমন করিয়া তাহার সহিত আনন্দের অংশ সমানভাবে ভাগ করিয়া লইবে? এখানেও তাহাকে অনেকে স্নেহ করে, তাহার সাফল্যে বাহবা দেয়। কিন্তু সুখের সুখী, ব্যথার ব্যথী, অন্তরের মধ্যে সে কাহাকেও খুঁজিয়া পায় না। তাই অতীতকে ভুলিতে চাহিলেও সে তাহাকে থাকিতে ভুলিয়া দেয় না!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

লিঙ্গরাজ মন্দির

শ্রীযুক্ত ই, বি, হেভেল তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে (A Hand-book of Indian Art) লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরের শিল্প-গৌরব, সুরুচিসঙ্গত বহিঃসৌষ্ঠব (purity of outline) ও অনাড়ম্বর কারুকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত অন্যান্য মন্দিরগুলি কতকটা বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত থাকায় মূল মন্দিরের বিশেষ সৌন্দর্য্য-হানি ঘটিয়াছে (১)। তিনি 'মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল' এই জনপ্রবাদ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে বহুমন্দির-সমাকীর্ণ দেব ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে ভুবনেশ্বরের অবস্থান হইতে ইহাই যে প্রাচীনতম দেউল এ অনুমান সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। খৃঃ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় যে রাজবংশ রাজত্ব করিতেন সার্ এডোয়ার্ড গেইট মহোদয় তাহাদিগকে 'কর'বংশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)। তাম্রপট্টে ও শিলালিপিতে ইহাদিগের নাম পাওয়া গিয়াছে। উদয়-গিরি ও খণ্ডগিরি গুহার লিপিসমূহের অনুশীলন-কালে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্ষোদিত এক-খানি লিপিতে প্রাপ্ত, শান্তিকর নামক উৎকলরাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৩)। 'কর' শব্দান্ত নাম-বিশিষ্ট অপর কয়েকটি নরপতির উল্লেখ কটকের কোনও জমিদারের গৃহে সংরক্ষিত একখানি তাম্র লিপিতে

---

(১) A Handbook of Indian Art. p. 55. etsqq.

(২) J. B. O. R.S, Vol, VI. pt. IV. 1920. p. 463

(৩) Ep. Indic. Vol XIII, no. 13. p. 167.

পাওয়া গিয়াছে। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যার নরপতি যে বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী ছিলেন, তাহা চীনদেশীয়দিগের লিখিত বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে বুনিয়া নাঞ্জিয়োর পুস্তক তালিকাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ (৪)। রাজা শুভকর কেশরী স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী না হইলে চীন সম্রাটের নিকট খৃঃ ৭৯৫ অব্দে 'বুদ্ধাবতংসক সূত্র' নামক মহাযান ধর্মগ্রন্থ প্রেরণ করিতেন না (৫)। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বোক্ত তাম্রলিপির যে পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষেমঙ্কর দেব, শিবকর দেব, শুভকর দেব (৬) এই তিনটি রাজার নাম উল্লিখিত আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই নেউলপুর তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। 'কর' শব্দান্ত রাজগণ যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহাও উক্ত লিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। শুভকর দেব ও কেশরী অভিন্ন কি না তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু উভয়েই যে বৌদ্ধ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইঁহারা উভয়েই খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বৌদ্ধ রাজা এরূপ বিশাল হিন্দুমন্দির অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নির্মাণ করিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং মন্দির-নির্মাণ সম্বন্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের সমর্থিত জনপ্রবাদ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করার যথেষ্ট অন্তরায় আছে। 'কর' নামধেয় বৌদ্ধরাজাদিগের পূর্ববর্তী কোন হিন্দু নরপতির অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলে, ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয় যে, হয় মন্দির-নির্মাণের ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয় নাই, নতুবা ইহা বৌদ্ধদিগেরই উপাসনার জন্য নির্মিত হইয়াছিল, পরে হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত হইয়াছে। শেষোক্ত অনুমান গ্রহণীয় নহে, কারণ অদ্যাপি কোনও বৌদ্ধমূর্তি বা বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত ভাস্কর্য-নিদর্শন লিঙ্গরাজ মন্দিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই মন্দিরের গঠন-বৈশিষ্ট্য ও স্থাপত্য-রীতি যে শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক, তাহা অত প্রাচীনযুগে সম্ভবে না। বস্তুতঃ নির্মাণ-প্রণালী হইতেই ভাস্করেশ্বর প্রভৃতি মন্দির লিঙ্গরাজ মন্দির অপেক্ষা প্রাচীনতর, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। শ্রীযুক্ত হেভেল বলিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী সুপ্রাচীন দেবায়তন আচ্ছাদন করিয়া তাহারই উপরে পরবর্তী কালে বর্তমান লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরাংশ বিনির্মিত হওয়া অসম্ভব নহে। মন্দিরে যাঁহাদিগের প্রবেশাধিকার আছে এবং যাঁহারা গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া দেবদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথার সমর্থন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। শিখর অপেক্ষা অন্য কোন প্রাচীনতর দেবগৃহ যে লিঙ্গরাজ মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থিত নাই এ কথা আমরা বলিতেছি না। একটী সুপ্রাচীন শিবমন্দিরের গৃহকুট্টিম মন্দির প্রাঙ্গণের নিম্নে অবস্থিত এবং তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত

(৪) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৪২।

(৫) J. B. O. R. S. 199. p. 325.

(৬) Ep. Indic Vol XV pp. I. 1, 2, 5.

শিবলিঙ্গটী যে প্রাঙ্গণ হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট্ নীচে বিদ্যমান, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (৭)। সুতরাং শ্রীযুক্ত হেভেলের অনুমানের এইটুকু মাত্র মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেও এই স্থানের সান্নিধ্যে প্রাচীনতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রীযুক্ত হেভেল অন্য একস্থলে বলিয়াছেন যে, মন্দির নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সভাস্থলীরূপে ব্যবহৃত হইত এবং তথায় পৌর ও জানপদসমস্যা বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক মীমাংসিত হইত। আবার প্রয়োজনমত নৃপতিগণ উহার কোন অংশ দরবার-গৃহরূপেও ব্যবহার করিতেন। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে রাষ্ট্রনৈতিক অনুশাসন-লিপি ক্ষোদিত হইত, ইহা অস্বীকার করা যায় না (৮)। আজিকালিকার দিনে যেরূপ সরকারী কার্য্যালয়ের বিজ্ঞাপন-পটে বহুবিধ রাজাদেশ-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী সাধারণ্যে প্রচারার্থ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, এই লেখাগুলিও ঐ প্রকার উদ্দেশ্যেই মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করা হইত। ইহা হইতে মন্দির-মধ্যেই যে রাজসভার অধিবেশন হইত, এ অনুমান সমর্থিত হইতে পারে না। লিঙ্গরাজ মন্দির-গাত্রস্থ রাজা কপিলেশ্বর দেবের লিপিতে দেখা যায় যে, রাজা 'পূজাবকাশে' রাজগুরু ও জনৈক মহাপাত্রের সম্মুখে যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই উৎকীর্ণ করা হইয়াছে, কেহই অস্বীকার করিবেন না।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

মীমাংসা

(গল্প)

গ্রামের একপ্রান্তে মাঠের মাঝে একটা ছোট প্ল্যাটফরম-ওয়ালা ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণটা থামিয়া গেল। একসঙ্গে কুলী ও যাত্রীর দল চীৎকার করিয়া স্থানটাকে মুখরিত করিয়া তুলিল। আমি এই কোলাহলের চির-আনন্দময় সুরটুকু উপভোগ করিতেছি, এমন সময় ট্রেণ-চলার ধাক্কায় আমার মাথাটা ঠুকিয়া গেল। আমার চমক ভাঙ্গিল।

আহত স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ সাম্নের গাড়ীখানার দিকে নজর পড়িল। পড়িতেই দেখি, দুইজন আরোহী মুখোমুখি বসিয়া রহিয়াছে। একজন একটা ছোট লোমশ কুকুর কোলে লইয়া আদর করিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতেছেন, অন্যজন পকেট হইতে সিগারেটের মশলা বাহির করিয়া কাগজে রাখিয়া সিগারেট পাকাইতেছেন। সিগারেট

---

(৭) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৬৭।

(৮) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৮৬, পুরীর কথা পৃঃ ১৫০-১৫১।

তৈরি হইবামাত্র ভদ্রলোকটি যেমন তাহার মুখাগ্নির জন্য দেশলাই জ্বালিয়াছেন, অমনই প্রথম ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—এ হতে পারে না, মশায়। সিগারেটটা আপনাকে নিবিয়ে ফেলতে হবে, কারণ ওর ধোঁয়ায় আমার মাথা ধরে। সুতরাং রেল-কোম্পানির নিয়ম-অনুসারে আপনাকে সিগারেট টানা বন্ধ কর্ত্তে হবে, বুঝলেন মশায়। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটির কিন্তু বুঝিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি চক্ষু বুজিয়া এক লম্বা টান দিয়া অনেকটা ধোঁয়া মুখ হইতে বাহির করিলেন।

প্রথম ভদ্রলোকটি, দেখি, টপ্ করিয়া উঠিয়া খপ্ করিয়া সঙ্গীর মুখ হইতে সিগারেটটা ছোঁ মারিয়া টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি, দেখি, আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া কুকুরটাকে মেঝে হইতে তুলিয়া লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন।...

চক্ষের নিমেষে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

কুকুর-স্বামী জামার হাতা গুটাইয়া ঘুসি পাকাইতেই, সিগারেট-সেবীও হাতটাকে মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

এতক্ষণ আমি স্থির হইয়া দেখিতেছিলাম, কিন্তু এখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। কারণ হাতাহাতি কাণ্ড,—পাছে রক্তারক্তি ব্যাপারে পরিণত হয়, এই ভয়ে উঠিয়া গাড়ীর শিকল টানিয়া দিলাম।

মাঠের মধ্যে ট্রেণও অমনি থামিয়া পড়িল

হঠাৎ ট্রেণ থামিতে দেখি, দুই যোদ্ধৃ-প্রবরের আর যুদ্ধ করা হইল না। তাঁহাদের হাতের ঘুসি হাতেই রহিয়া গেল, দুইজনেই রণং দেহি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইত্যবসরে গার্ড সাহেব আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত।

আমি তাহাকে সবিস্তার ঘটনা বলিলাম। তারপর দুইজনেই গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

তখনও তাঁহারা রণোন্মত্তভাবে দাঁড়াইয়া—বিবাদটাকে থামাইবার জন্য গার্ড গিয়া দুইজনের মধ্যে দাঁড়াইলেন।

"Mind your own business sir" বলিয়া দুইজনে একটু সরিয়া গিয়া আবার ঘুসা-ঘুসির উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়, দেখি, সেই কুকুরটা সিগারেট মুখে লইয়া, জানালার মধ্য দিয়া লাফাইয়া সেই কম্পার্টমেণ্টে আসিয়া ঢুকিল।

কুকুর-স্বামী ঘুসি খুলিয়া কুকুরটাকে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সিগারেট-সেবী সিগারেটটা তুলিয়া লইয়া বসিলেন।

গার্ড হাসিতে হাসিতে বিদায় লইল।

আমি প্রশংসা-বিস্ফারিত নেত্রে কুকুরটার দিকে চাহিয়া রহিলাম—ভাবিলাম, দুইজন মানুষের বিবাদ—কুকুরের মত একটা প্রাণী তাহার কেমন সুন্দর সমাধান করিয়া দিল!

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

ভারি নিষ্ঠুর!

চাঁদপানা মুখখানা ঢেকে মেঘলায়,
কার পথ চেয়ে সখি বসে জান্‌লায়?
সারারাত জেগে চোখ করে কর্ কর্,
সইচে না গায়ে তিল বাতাসের ভর,
ফিকে হয়ে গেল গালে গোলাপের রং,
কি জানি কি ভাব্‌নায় বুক ছম্ ছম্,
জমা-করা বাসি ফুল দাও ক'রে দূর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর!

এত ক'রে ধরে ধরে বাঁধ্‌লি যে চুল!
পাতা কেটে টিপ এঁকে কাণে দিলি দুল।
জাম-রঙ সাড়িখানি জরি-দেওয়া পাড়,
আর কেন পরে' সখি মিছিমিছি?—ছাড়্;
সরু ক'রে টেনে দেওয়া সুরমার দাগ
জলে ভিজে মুছে গেল; উঠে যায় যাক্,
কাঁদ-কাঁদ মুখখানি বেদনা-বিধুর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর।

ঢং ঢং ঘড়ি বাজে বেড়ে যায় রাত,
গাড়ি যায় রাস্তায়, বুক করে ছাঁত,
একবার খাটে আর মেঝে একবার,
থেকে থেকে মুখখানি মনে পড়ে তার,
ঠেলে ওঠে চোখে জল সাম্‌লানো দায়—
কখনো বা অভিমানে কভু শঙ্কায়;
ম্লান হয়ে এলো আলো শরদিন্দুর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর।

কত সুখ ছিল সখি, মনে মনে কাল!
লাল হাসি ফেটে পড়ে রাঙা দুটি গাল!
কি কথা সে কয়েছিল গেয়েছিল গান,
তোলপাড় বুকময় সারা দিন্ মান!
খণে খণে আর্‌সিতে দেখ্‌ছিলে মুখ
যদি কোনোখানে কোনো থাকে ভুলচুক,
জল্ জল্ জলে সরু সিঁথিতে সিঁদুর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর!

আজই ডাকে এক্ষুনি চিঠি লিখে দাও—
—এসে দুটি পায়ে ধর যদি ভালো চাও—
না, না, সখি গুম্ হয়ে ক'রে থাকো মান,
দেখই না আছে কিনা আছে তার টান!
ফাঁদে ধরা দিয়ে পাখী যাবে কোথা আর?
সাত দিন গেলেই ত ফিরে শনিবার,
এই কটা দিন কি লো সবেনা সবুর?
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর!

* * *

ওঠো সখি, মুখ ধোও, মোছ আঁখি-নীর,
মনে মনে ঠাওরাও একটা ফিকির—
অবাধ্য বঁধু যাতে স্যায়েস্তা হয়,
আশ্‌কারা অতখানি দেওয়া ভালো নয়;
কখনো বা ন্যোল্ দিলি, কখনো বা রাশ্
রাখিস্ লো কসে টেনে যদি ভালো চাস্;
পিরীতির এই রীতি এই দস্তুর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

চতুষ্পাঠী

(চিত্র)

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। সেই সময় বিজনপুর গ্রামে যুগলকিশোর বসু নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন; তিনি অপুত্রক অথচ প্রভূত-সম্পত্তিশালী, এজন্য ধর্ম্মে-কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-গুলিতে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন, এবং গ্রামের পার্শ্বে মাঠে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই চতুষ্পাঠীতে পনেরো-ষোলটি ছাত্র এবং একজন অধ্যাপক থাকেন। অধ্যাপকের নাম শিবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন। অধ্যাপক মহাশয় কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা-কার্য্য খুবই চলে, তবে কখনও কোন ছাত্র কোথাও পরীক্ষা দিয়াছে বা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এরূপ কোন প্রবাদ শোনা যায় যায় না। চতুষ্পাঠীর অপর ছাত্র অপেক্ষা চারটি ছাত্রের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম ছাত্র অবিনাশ, দ্বিতীয় শেখরেশ্বর, তৃতীয় বিধুভূষণ, চতুর্থ রাম-গোপাল। অবিনাশ ও শেখরেশ্বর স্মৃতির ছাত্র, বিধুভূষণ কাব্যের; এবং রামগোপাল ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে এই চতুষ্পাঠীতে আসিয়াছিল। সে বহু কালের কথা, এখনও ইহাকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতে দেখা যায়। রামগোপাল ছাত্রটি নিরীহ ভদ্রলোক, আহারে বিলক্ষণ দক্ষতা, সামান্য একটু তেঁতুল ও লবণ-সংযোগে চারিটি জোয়ান লোকের অন্ন অকুণ্ঠিত ভাবে উদরসাৎ করিতে পারে। শরীরে বলও বিলক্ষণ। বাবুদের দ্বারবানদের সহিত রামগোপালের প্রায়ই হাতাহাতি হয়, তাহাতে রামগোপালের পরাজয়ের সংবাদ কখনও কেহ শোনে নাই। টোলের অপরাপর ছাত্রেরা বলিত, যদি এক পয়সার মুসুরির ডাল দুই বেলায় চব্বিশ জনকে না খাইতে হইত, তাহা হইলে রামগোপাল একজন পালোয়ান বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিত। রামগোপালের দুইটি নাম ছিল—গ্রামের সাধারণ লোক তাহাকে খুড়ো বলিয়া ডাকিত, আর অধ্যাপক মহাশয় তাহার নাম রাখিয়াছিলেন বৈয়াকরণ খম্বাচী—এই নামের সহিত রামগোপালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, কারণ তাহাকে কোন পদ বা সন্ধি জিজ্ঞাসা করিলেই অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া সে নীরব হইয়া থাকিত। রামগোপাল অত্যন্ত পরোপকারী। শব-দাহ করিতে, বরযাত্র যাইতে, ভোজবাড়ী অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে তাহার অসীম উৎসাহ। অন্য সময়ে রামগোপালের বিলক্ষণ বাক্‌চাতুর্য্য দেখা যাইত, কিন্তু পড়া ধরিলেই কর্ণের যুদ্ধ-বিদ্যার মত এককালে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সে মৌনাবলম্বন করিত। অবিনাশ ছাত্রটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ছাত্রেরা অবিনাশকে চাঁইদাদা বলিয়া ডাকিত।

শেখরেশ্বর পরকে হাসাইতে খুব মজবুত,

সেই জন্য তাহার নাম হইয়াছিল—বিদূষক। শেখর যেদিন হাসাইতে আরম্ভ করিত,—সেদিন খাওয়া-দাওয়ার বড়ই বিভ্রাট ঘটিত। হয় ভাত ধরিত, নয় তরকারিতে লবণাধিক্য হইত, এমন কি অধ্যাপক মহাশয়েরও সন্ধ্যা-আহ্নিক স্থগিত থাকিত। শেখর লেখাপড়ায় তেমন ভাল ছিল না। একখানি বাঁধাই তিথি-তত্ত্ব অনবরত পাঁচ-ছয় বৎসর শেখরের হাতে বিচরণ করিয়া তাহার সুদৃঢ় মলাট দুই খানি ত হারাইয়াই ছিল, অধিকন্তু "বিজয়া-বটিকার" বিজ্ঞাপন কয়খানিকেও হারাইতে বসিয়াছিল। তথাপি বেশ সুবিধামত একটি পংক্তিও তাহার উদরস্থ হয় নাই। বিধু "বড় বিদ্যায়" বিশেষ অভিজ্ঞ, পরের গাছে চুরি করিয়া নারিকেল, আম, বাতাবি লেবু, আনারস, এই সব সংগ্রহ করিতে সে বিশেষ দক্ষ। এমন কি গাছের তলায় লোক থাকিলেও সে বেমালুম ফল পাড়িত।

২

যুগল বাবুর টোলের উপর আর ততটা আস্থা নাই, কারণ তিনি প্রথমে মনে করিয়া-ছিলেন, স্কুলের মত খুবই পড়াশুনা চলিবে, কিন্তু এখন দেখিতেছেন, সারাদিনই প্রায় ঘুম এবং তামাক খাওয়া, ও অবসর-মত একটু আধটু পড়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুই হইল না। এই জন্য যুগল বাবু অধ্যাপক মহাশয়কে বলিয়াছেন, ভাল কিছুই হয় নাই। অধ্যাপক মহাশয় উত্তর দিয়াছেন, "মহাশয়, আপনি অনর্থক চেষ্টা করেন, টোল কখনও স্কুল হয় না। টোল টোলের নিয়মেই চলিবে, তাহাতে আপনার ইচ্ছা না হয় উঠাইয়া দিবেন।" যুগল বাবু চতুষ্পাঠী উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু চতুষ্পাঠী হইতে তিনি যে সাহায্য পান, সে-জন্য চতুষ্পাঠীর সমস্ত ত্রুটি তিনি অবাধে সহ্য করিতেন। তাঁহার বাড়ী কাজ-কর্ম্ম-উপলক্ষে টোলের ছেলেরা প্রাণপণে পরি-শ্রম করিত এবং তিনি বেশ জানিতেন, টোল তাঁহার সহায় থাকিতে শত্রু-পক্ষ তাঁহার কিছু করিতে পারিবে না। এই সব কারণে তিনি চতুষ্পাঠীর কার্য্য-কলাপের উপর ততটা লক্ষ্য রাখিতেন না। অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ী ছিল টোলের অনতিদূরেই। তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক, পৈত্রিক পুঁথিগুলির যত্ন, ব্রাহ্মণীর রক্ষণাবেক্ষণ ও দশকর্ম্ম,—ইহা লইয়া বড়ই ব্যস্ত থাকিতেন, চতুষ্পাঠীর কার্য্য একরূপ অবিনাশই চালাইত।

আজ একাদশী। কেহ আর ভাত খাইবে না, সকলে রুটী খাইবে। প্রত্যেকে পাকি আধসের হিসাবে ময়দা আসিয়াছে, সেই গুলির রুটী প্রস্তুত হইবে, আর গুড় আসিয়াছে এবং তরকারী সামান্যই আছে। রামগোপাল দোকান হইতে জিনিষগুলি আনিয়া অবিনাশকে হিসাব বুঝাইয়া দিতে দিতে কহিল, "চাঁইদাদা, দোকানী বলছিল, আপনারা এত ময়দা নিলেন, ঘী নিলেন না?" "তুমি কি বল্লে?" "আমি বল্লাম, আমরা ভঁয়সা ঘী খাই না। ঘরে গাওয়া ঘী আছে।" অবিনাশ একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তা বলেছ মন্দ নয়, তবে আর কোন দিন আনতে গেলে মুস্কিল হবে।" বিদূষক কহিল, "তার আর মুস্কিল কি চাঁইদাদা? আমরা ত এক পয়সার বেশী প্রায় কিনব না, সেদিন বলব, ফোড়ায় দিতে হবে।" এই প্রকার কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া কাজ-

কর্ম্ম হইতেছে, বিধুভূষণ গম্ভীরভাবে কহিল, "আপনারা অপেক্ষাকৃত ত্বরাবান্ হোন, ৬া৭ সের গোধূম -তাকে পিষ্টকাকারে পরিণত করতে হবে। তাতে বিলক্ষণ সময়-বাহুল্যের সম্ভাবনা।" এই প্রকার হাস্য-পরিহাসের মধ্যে রুটী প্রস্তুত হইতে লাগিল। বিদূষক কহিল, "আচ্ছা ভায়া, বল দেখি,—ক' দিস্তায় এক রীম হয়?" এমন সময় বিধুভূষণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "রামগোপাল দাদার মুখ নড়চে কেন?" রামগোপাল বড়ই বিপদে পড়িল, সে বেশ সুবিধা করিয়া একেবারে দুইখানি রুটি বদনে পুরিয়াছে, ইত্যবসরে এই বিভ্রাট! শেখর একবার রোষকষায়িত নেত্রে অবিনাশের দিকে চাহিয়া কহিল, "দাদা, ভাগের সময় আমায় করতে দিয়ো ত।" ব্যাকরণের ছোট ছোট ছেলেগুলি অনবরত তামাক সাজিয়া সাজিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ ভয়ে কিছুই বলিতে পারে না। ইত্যবসরে বিধুভূষণ ভয়ে ভয়ে বলিয়া উঠিল, "চাঁইদাদা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রুটীগুলি ভাতের হাঁড়িতে ঠেকে গেছে,—এখন উপায়?" সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় আজ বাড়ীতে অসুখ বলিয়া টোলে খাইতে চাহিলেন, আর তুমি এই কর্ম্ম করিলে! অবিনাশ রুক্ষ স্বরে কহিল, "ওরে বিধে, গর্দ্দভ, তুই হাট্ কর! যা বলি তাই শোন, গঙ্গা গঙ্গা বল্ আর রেখে দে।"

বিধুভূষণ বিষন্ন মুখে কহিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যে—।" অবিনাশ আবার রুক্ষস্বরে কহিল, "ওরে, তা আমি জানি, যদি রুটীতে একাদশীর প্রয়োজকতা থাকে, তবে যে কোন উপায়ে রুটী পেটে পৌছুলেই হবে, তা সে রুটী ভাতে-ঠেকাই হোক্ আর না হোক্।" শেখর কহিল, "যদি এমন কথাই বলি—ভাত সংযোগের অভাববান্ রুটি—" রামগোপালের ক্ষুধা তখন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে বড়ই বিরক্ত হইতেছিল, এইবার সুযোগ পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ও শেখর দাদা, তোমার ভুল হয়েছে। অভাববতী রুটী হবে।" "আর কাজ নেই, মরে গেলুম ক্ষিদেয়, শীঘ্র দাও।" অবিনাশ এতক্ষণ রুটী ভাগ করিতেছিল, বলিল, "প্রত্যেকের ভাগে ২৪খানা করে "একাদশী" পড়েছে।" রামগোপাল কহিল, "যে যাহা খাইতে না পারিবে, ওই ধারের পাতাখানায় রাখিয়া দাও।"

৩

আজ গ্রামে একজনদের বাড়ী বিবাহ। টোলের ছাত্রেরা আশা করিয়া আছে, নিশ্চয়ই তাহাদের নিমন্ত্রণ হইবে। সেই আশায় রান্নার আয়োজন আর কিছুই করে নাই; নানারূপ গল্প-গুজব ও তামাক খাওয়া ইত্যাদি চলিয়াছে! এইরূপে রাত্রি ১১৷১২টা বাজিল। তথাপি নিমন্ত্রণ হইল না এবং ডাকও পড়িল না, তখন অগত্যা "মিত্ররা" যে অত্যন্ত কৃপণ এবং বদলোক, ইহা স্থির করিয়া এবং "ভঁয়সা ঘীয়ের" অজস্র নিন্দা করিতে করিতে সকলে রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল। রামগোপাল আপন-মনে বলিতে লাগিল, "পরান্নং প্রাপ্য দুর্ব্বুদ্ধে মা শরীরে দয়াং কুরু। পরান্নং দুর্লভং তত্র, শরীরং জন্ম-জন্মনি।" বিধুভূষণ কহিল, "রামগোপাল দাদার বড়ই মর্ম্মান্তিক হয়েছে।"

অন্ন প্রায় প্রস্তুত এমন সময় সকলের মনে হইল, তরকারীর কোন যোগাড় নাই — সকলে অবিনাশের শরণাপন্ন হইল। অবিনাশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে বিধুভূষণকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহির হইল। যেখানে অবিনাশের বুদ্ধি এবং বিধুর যোগ হইয়াছে সেখানে একাকার হইবে। শেখর কহিল, "আচ্ছা রামগোপাল দা ভবিষ্যতে তুমি কি করবে ? তোমার মতলব কি ?" রাম গোপাল কহিল, "আমি ছোট বেলায় যখন পাটীগণিত বিক্রী করে পায়রা কিনি, তখনই আমার বাবা বলেছেন, তোর কিছু হবেনা ! তাঁর কথা যে মিথ্যে হবার নয়, তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবু টোলে পড়ে আছি, তার মানে বিদ্যে যত হোক্ আর না হোক, দশ টাকা বেতনের ঠাকুর হবার জোগাড় ত হচ্ছে।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় অবিনাশ ও বিধু প্রবেশ করিল, বিধুর মাথায় একটা হাঁড়ি। সে খুব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা এ কার সর্ব্বনাশ করেছ ?" অবিনাশ কহিল, "যে কাল বলবে, টক খেয়েছে না···খেয়েছে, বুঝবে তারই।" তারপর ভোজন আরম্ভ হইল। সকলের এই গোলযোগে, কখন কাহার পা ঠেকিয়া ল্যাম্পটি উল্টাইয়া গিয়াছে, সে দিকে হুঁস নাই। অন্ততঃ আধ-পেটা খাওয়ার পর বিধুভূষণ বলিল, "দাদা কাজটা ভাল হল না, মাগীর যে কদর্য্য মুখ, কাল আর ও বাকী রাখ্‌বেনা।" অবিনাশ কহিল, "সে ভার আমার। ওর আরো দু'দিন চুরি গেছে, আজও গেল,—তাতে ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, ওর ঘরে ভূত আছে। ও আমাদের ততটা সন্দেহ করবে না, বরং দেখ, ওর বাড়ী আবার ফুস্‌লে ফাস্‌লে পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করে ফেলি—" সকলে বলিয়া উঠিল, "ওই জন্যেই ত মহামূল্য চাঁই উপাধিটি তোমার জন্যে ব্যবস্থা করেছি।"

৪

ভবসুন্দরীর গৃহে খাদ্য-সামগ্রী মধ্যে মধ্যে এমন প্রায়ই অন্তর্হিত হয়। তাহার অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। সে টোলে ব্যবস্থা জানিতে আসিল, আসিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলে তিনি কহিলেন, "ও সম্বন্ধে আমি কি বল্‌ব ? যারা ও-সব ভূতের ব্যাপার জানে, এমন কোন রোজা এনে দেখাও!" ভবসুন্দরী প্রস্থান করিল, ছাত্রেরা অধ্যাপকের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তিনি একটা স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা না দিয়া একেবারে হাত-ছাড়া করিয়া দিলেন!

অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার একমাত্র কন্যা তুলসীর বিবাহের জন্য বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার মনোমত পাত্র কোথাও মিলিতেছে না। একটা বাসনা তাঁহার মনে মধ্যে মধ্যে উদিত হয়। অনেক বিবেচনা করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, অবিনাশ ছাত্রটি সব রকমেই ভাল,—কিন্তু সে ছাত্র—তিনি অধ্যাপক হইয়া অশাস্ত্রীয় কাজ কি বলিয়া করিবেন! কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজেই গোপনে গোপনে পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক মহাশয় কহিলেন, "আমি আজ গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ-পত্রের বিদায়ে চলিলাম— তোমরা কেহ কোথাও যাইও না। পড়াশুনা

দেখ" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এমন সময় ব্যাকরণের একটি ছোট ছেলে আসিয়া সংবাদ দিল, আজ রাত্রে ভবসুন্দরীর বাড়ী ভূত ধরা হইবে, রোজা আনিতে লোক গিয়াছে।

ছাত্রেরা যুক্তি করিতে আরম্ভ করিল ব্যাপার কি দেখিতে হইবে। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় ভবসুন্দরীর ভগ্ন গৃহের প্রাঙ্গনে বহুলোক-সমাবেশ হইয়াছে, রোজা বলিয়াছে - ক্ষীর, সন্দেশ, কলা, দধি, প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য সেই গৃহের মধ্যে রাখিতে হইবে। তাহাই হইয়াছে, আয়োজন সব ঠিক, ইতপূর্ব্বেই ক্ষীরের হাঁড়ি এবং সন্দেশের থালা রামগোপালকে বিলক্ষণ প্রলুব্ধ করিয়াছে।

সেই গৃহের পশ্চাৎদিকের দেওয়াল কতকটা ভাঙ্গা ছিল। রামগোপাল শেখরকে সেই ভগ্ন স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বন্ধু দিয়া স্বয়ং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, রোজার আদেশ-মত গৃহের পশ্চাদ্ভাগে কোন লোক ছিল না, সুতরাং রামগোপাল নির্ব্বিবাদে ক্ষীরের হাঁড়ি ও সন্দেশের থালা দেওয়ালের ভগ্ন অংশ দিয়া গলাইয়া শেখরের হাতে দিল, এবং স্বয়ং বাহির হইয়া পড়িল; পরে সেগুলিকে যথাস্থানে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আবার ভদ্রলোক সাজিয়া ভূত ধরা দেখিতে চলিল। ভূত ধরা পড়িল না অথচ আহারীয়গুলি অদৃশ্য হওয়ায় সিদ্ধান্ত হইল, "খুব চালাক ভূত!" সে রাত্রে টোলের ছাত্রদের হাসির ধূমে পাড়ার লোক অস্থির হইয়াছিল। এই ব্যাপার কেবল টোলের ছাত্রেরাই জানিল, আর কেহ জানিল না। শুনিয়াছি, যতদিন না ভবসুন্দরী স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন, ততদিন ভূতের উপদ্রব সমানভাবেই ছিল। স্বস্ত্যয়ন করিলে তবে বন্ধ হয়।

৫

গ্রামের লোক সামান্য কাজে-কর্ম্মে টোলে নিমন্ত্রণ করিত না, কারণ টোলের ছাত্রেরা প্রত্যেকেই বিলক্ষণ ভোক্তা। আজ গ্রামে এক জায়গায় ছাত্রদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, নিমন্ত্রণের আমোদে ব্যাকরণের ছাত্রগুলির তামাক সাজিয়া সাজিয়া হাতে ফোস্কা পড়িবার যোগাড়। অবিনাশ কহিল, "রামগোপাল, আমার জন্যে দু'পয়সার মুড়কি কিনে আনো ত।" রামগোপাল কহিল, "তা যাচ্ছি, কিন্তু পেসাদ দিতে হবে।" অবিনাশ কহিল, "দুপয়সার মুড়কির আবার যদি পেসাদ দিতে হয় ত আমার আর দরকার কি?" রামগোপাল কহিল, "আচ্ছা, না দেন্ ত আমি রাস্তাতেই পেসাদ পেয়ে আসব এখন।"

রামগোপালের একজোড়া অতি-পুরাতন চটী জুতা ছিল; সেইটিকে টোলের ছাত্রেরা বলিত, "রামগোপালের মুখোষ।" রামগোপাল সেই জোড়াটিকে লইয়া দোকান-অভিমুখে প্রস্থান করিল। বিদূষক কহিল, "আজিকার নিমন্ত্রণ বাড়ীতে সর্ব্বতোভাবে—পারিব না—এ কথাটি বলোনা। আর তার পর যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে—তবে গিয়ে উদ্‌-যোগিনং পুরুষসিংহং" ইত্যাদি মহাবাক্যগুলি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা চাই।" বিধু কহিল, "বাঢ়ম্"। শেখর কহিল, "তোমরা নিমন্ত্রণে মাস-কাবারের গল্প জানো?" সকলে বলিল, "না"। শেখর বলিতে আরম্ভ করিল "ধর, যেদিন নিমন্ত্রণের তারিখ, তার দুদিন পূর্ব্ব

হতে নানারকম গল্পগুজবে আমোদে আহ্লাদে কেটে যাবে, তার পর নিমন্ত্রণের দিন যে একটা কি হয়ে গেল, তা বুঝ্‌তেই পারা যাবে না, তার পরদিন ঠিক হবে, নিমন্ত্রণ খেয়েছিলুম। তারপর দিন চোঁয়া ঢেকুর, তার পরদিন চিকিৎসা, তার পরদিন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, তার পরদিন আশা, তার পরদিন পথ্য—এই রকম নিমন্ত্রণ যদি মাসে ৩।৪টি জোটে, তবে মাস-কাবার না হবে কেন?"

বিধু কহিল, "ও-রকম নিমন্ত্রণে মাস-কাবার হয় ঠিক্‌, সময় সময় বোধ হয় ভোক্তাও কাবার হয়।" শেখর কহিল, "আহা, সেটা বরাত, না খেয়েও লোকে মরে!" তারপর সকলে নিমন্ত্রণ-গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল, একটি ব্যাকরণের ছাত্রের নিকট একখানি গামছা দিয়া একটি পুঁটুলী প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। কারণ তাহার মধ্যে ছাঁদা বাঁধিয়া লওয়া হইবে। তার পর অধ্যাপক মহাশয়কে অগ্রে করিয়া সকলে প্রস্থান করিল।

৬

অধ্যাপক মহাশয়ের আজ ভয়ানক বিপদ। তাঁহার প্রাণের প্রাণ সংসারের শ্রেষ্ঠ বস্তু একমাত্র কন্যা তুলসীর কলেরা হইয়াছে, ডাক্তারেরা তাহার জীবন-সম্বন্ধে হতাশ হইয়া জবাব দিয়াছেন।

এই রোগে গ্রামের লোক কেহ কিছু সাহায্য করিল না, তাঁহার একমাত্র সহায়, টোল! টোলের ছাত্রেরা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যাহার দ্বারা যাহা হয় করিতেছে। তাহাদের আহার-নিদ্রা নাই, মুখ বিষণ্ণ। অধ্যাপকই টোলের ছাত্রদের সর্ব্বস্ব—অবিনাশ তুলসীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া অনবরত শুশ্রূষা করিতেছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই। অবিনাশ ভাবিতেছে, বিধাতা আমার জীবন লইয়া তুলসীকে ফিরাইয়া দেন ত আমি ধন্য হই। অবিনাশ তুলসীকে আন্তরিক ভাল বাসে, ছোট বেলায় কত কোলে-পিঠে করিয়াছে, দুষ্টামি করিলে প্রহার করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে ভাল বাসার গতি কোন্‌দিকে, তাহা সে বেশ বোঝে, তাই অতি-গোপনে হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। বেশ বুঝিয়াছে, তার আশা মিটিবার নয়, শাস্ত্র সমাজ সব তার অন্তরায়। যদি তুলসীর কাজে জীবন লাগাইয়া দিতে পারা যায়,—তাই প্রাণ-পণে সে তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। অধ্যাপক মহাশয় অন্তরাল হইতে অবিনাশের বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, "অবিনাশ, বাবা, যদি আমার তুলসী বাঁচে ত সে তোমারই যত্নে—আমি বুঝেচি, আমারি চেয়েও তুলসী তোমারই বেশী যত্নের।" তিনি আর বলিতে পারিলেন না, চক্ষু জল-ভারাকুল হইল, যদি অবিনাশের মত জামাতা পাইয়া আমায় সমাজে এবং পণ্ডিত-মধ্যে অবজ্ঞেয় হইয়া থাকিতে হয় সেও ভাল, তবু এমন রত্নকে অগ্রাহ্য করিব না।

একান্তভাবে ভগবানকে যে ডাকে, ঈশ্বর তাহার কথা শোনেন, হইলও তাই! তুলসীর একটু-একটু করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তুলসীর কথঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ হইল, তখন অবিনাশ উঠিয়া

উপস্থিত হইয়া দেখেন, ছাত্রেরা এক বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছে। এই বিজনপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কোন এক বৈষ্ণব বহুরূপী সাজিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, তাহার দুর্ব্বুদ্ধি, সে একদিন গোয়ালিনী সাজিয়া টোলে আসিয়া বলে, "তোমরা দুধ খাইয়াছ, দাম দাও।" শেখর প্রভৃতি ছাত্রেরা বলে, "এক রাত্রি এখানে না থাকিলে দাম দিব না। আজ রাত্রে এখানে থাক, কাল দাম লইয়া যাইও"—এই ভাবে তাহার সহিত বকাবকি করিয়া তাহার পরচুলা নোলক চুড়ি প্রভৃতি সব কাড়িয়া লইয়াছে। অবিনাশ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত হইল—বলিল, "তোমাদের কি কোনও আক্কেল নাই? অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ী এই বিপদ, আর তোমরা এমনি আমোদে মত্ত!"

অবিনাশের কথায় সকলে তাহার আভরণ ও কিঞ্চিৎ পয়সা দিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

৭

প্রদেশস্থ অধ্যাপকগণ একবাক্যে বলিলেন, ছাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইতে পারে না। অবশ্য জনকতক অধ্যাপক একটু রকম-ফের করিয়া বলিলেন, হইতে পারে, তবে যুক্তি-বিরুদ্ধ। গ্রামের দুই-এক জন বলিল, যদি উনি এই অশাস্ত্রীয় কাজ করেন, আমরা উঁহাকে সমাজে রহিত করিব। এই সব ব্যাপারে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া অধ্যাপক মহাশয় আজ চতুষ্পাঠীতে আসেন নাই।

সন্ধ্যা হইতেই বাদলা আরম্ভ হইয়াছে, টিপি-টিপি জল পড়িতেছে। সকলেই আহারে এক প্রকার অনিচ্ছা জানাইয়া যে যার বিছানায় শুইয়াছে। ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। এমন সময় রামগোপাল কহিল, "শেখর দাদা, সত্যই কিছু খাবে না?" শেখর বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে, খেলেও হয়।" বিধু বলিল, "দাদা, আমার ভয়ানক ক্ষিদে—মরে গেলুম।"

তখন সকলে রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিল। ঘরে চাল ছাড়া অন্য কোন জিনিষই নাই। বিধু বলিল, "আমি পদা ময়রার গাছ থেকে আম পেড়ে আনি, তোমরা ভাত চড়াও।" বিধু টোল-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ময়রা-বাড়ী উপস্থিত হইল, এদিক ওদিক একটু চাহিয়া নিঃশব্দে আমগাছে উঠিল। এমন সময় ময়রাদের একটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইয়া "গাছে কে রে? গাছে কে রে?" এই শব্দে ডাকিতে লাগিল। বি শুনিয়া খুব ধীরভাবে উত্তর করিল, "আমি"। স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কে? গাছে কি হচ্ছে?" বিধু উত্তর করিল, "ফুলগুটি পাড়ছি।" স্ত্রীলোকটি অবাক্ হইয়া কহিল, "আমগাছে ফুলগুটি কি-রকম?" বিধু বেশ শান্তভাবে কহিল, "তা নেই নেই, নেমে যাচ্ছি,—তার আবার কি?" এই বলিয়া ধীর ভাবে গাছ হইতে নামিয়া প্রস্থান করিল। স্ত্রীলোকটি অন্ধকারে মানুষ চিনিতে পারিল না, কহিল, "মিন্সে ক্ষ্যাপা, বোধ হয়।" টোলে আসিয়া বিধু কোঁচড় হইতে আমগুলি বাহির করিয়া দিল এবং "ফুলগুটি" পাড়ার বৃত্তান্ত বলিলে সকলে হাসিয়া অস্থির হইল।

৮

সম্প্রতি যুগল বাবুর মৃত্যু হইয়াছে,—খুব ধূমধামে শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, তাহারই

জের আজ অবধি চলিতেছে। নানা দেশের নানা অধ্যাপক আসিয়া ছিলেন,—সভায় শাস্ত্রীয় তর্কও খুব হইয়াছিল। "ঘটের অভাব কোথায় থাকে?"—ইহার জন্য অধ্যাপক মহাশয়েরা বিস্তর মাথা ঘামাইয়া ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত কতক গোলযোগ যাইতেছে,—কয়দিন ভোজ খাইয়া ছাত্রদের খুবই আমোদ হইয়াছে, কিন্তু একটি কারণে তাহারা বড়ই দুঃখিত, টোল উঠিয়া যাইবে। কারণ যুগল বাবুর মৃত্যুর পর আর কে টোলের খরচ চালাইবে? তাদের যে পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে,এই তাহাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ। তাই তাহারা ভাবী বিরহের আশঙ্কায় বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। তাহারা আজও যায় নাই, তাহার কারণ আর তিন-চার দিন পরে তুলসীর বিবাহ। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন, তোমরা এই কাজ সারিয়া স্থানান্তরে যাইও,—নতুবা একলা আমি বড়ই বিপন্ন হইব। এ বিবাহে অবিনাশের কোন সুখ নাই। তাহার চির-সঞ্চিত আশা সমূলে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সে যে অনেক আশা করিয়াছিল! তুলসীর কলেরার দিন সে যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দিবা-রাত্রি শুশ্রূষা করিয়াছিল! অবিনাশ স্থানান্তরে যাইতে বিপুল চেষ্টা করিয়াছিল, কেবল অধ্যাপক মহাশয়ের অনুরোধে যাইতে পারে নাই। কিন্তু তাহার যে কি মর্ম্ম-বেদনা হইয়াছে, তাহা সে-ই জানে। এই দারুণ মর্ম্মপীড়া বুকে চাপিয়াও সে কেবল অধ্যাপক মহাশয়ের অনুরোধে স্বচক্ষে অন্যের সহিত তুলসীর বিবাহ দেখিতে প্রস্তুত হইয়াছে!

৯

অধ্যাপকের বাড়ীর কাজে তত ধূমধাম কিছুই হইবে না, তাঁহারা যজমান-বাড়ীতেই খরচ-বাহুল্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সামান্য-সামান্য রকম আয়োজন সব হইয়াছে, একধারে বরযাত্রীদের বসিবার স্থান—ছাত্রেরা সকলে খুব ব্যস্ততার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবিনাশও কাজ-কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু ম্লান মুখে। এমন সময় শেখর কহিল, "ভাই আমাদের প্রীতি উপহারখানা একবার বার কর। কেমন হলো, দেখা যাক্।" রামগোপাল পড়িতে আরম্ভ করিল,

"বাংলা পদ্য লিখ্‌তে হবে ব্যাপার বড়ই শক্ত।
টোলে কভু বাস করে না বাংলা ভাষার ভক্ত!
খুঁজে পেতে দেখি একবার রঘুনন্দন মূলটা—
একটুখানি তামাক সাজ, দিতে ভুলোনা গুলটা—
এ কি হ'ল ব্যাপার,ভায়া,চাঁইদাদার নাই ফুর্ত্তি!
বিদূষকের বুদ্ধিটি ত স্মৃতির বচনে পূর্ত্তি!"

এই প্রকারে কয়েক লাইন পদ্য পড়ার পর নাম সহি পাঠ করিল, "চতুষ্পাঠীর ভূতেরা—" সাং যুগল বাবুর চিড়িয়াখানা।"

লগ্নের প্রায় সময় হইয়াছে,অধ্যাপক মহাশয় বড়ই ব্যস্ত, কিন্তু এখনও বর আসিয়া পৌঁছিল না। অধ্যাপক মহাশয়ের মাথার ঠিক নাই—তিনি যে কি বিপন্ন হইয়াছেন, তাহা এই অবস্থায় ভুক্তভোগী লোকই ভাল বুঝিবেন। এমন সময় বরপক্ষের পরামাণিক আসিয়া সংবাদ দিল, "বরের পিতা বলিয়াছেন, আর দুই শত টাকা পণ বেশী না দিলে পাত্র আসিবে না।" অধ্যাপক মহাশয় সংবাদ শুনিবামাত্র পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া অবিনাশের হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন,"বাবা, এ বিপদে

তুমিই আমার ভরসা।" অবিনাশের চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। অবিনাশ কহিল, "চলুন, যাচ্ছি।"

* * * *

চতুষ্পাঠীতে খুব আনন্দ! অবিনাশের সহিত তুলসীর বিবাহ হইয়া গেল। সেদিন খুব আমোদে কাটিল বটে কিন্তু তার পর দিনের মত দুঃখ ছাত্রেরা জীবনে পায় নাই। চতুষ্পাঠী ভাঙ্গিয়া গেল, যে যার নিজের নিজের বাড়ী চলিল। প্রফুল্ল শ্বশুর-বাড়ী যাইলে নিশি-দিবা প্রভৃতির ন্যায় ছাত্রেরা অবিনাশকে রাখিয়া সাশ্রু-নয়নে অধ্যাপকের চরণ-প্রান্তে বিদায় গ্রহণ করিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকতা

হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকতার কথা সর্ব্বদাই আমরা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকি। ইহা যে অন্যান্য দেশের বিবাহপ্রথার চেয়ে অনেক ভালো, তাহা স্বীকার করিলেও নিরপেক্ষভাবে ইহাকেই আদর্শ বলা কত-দূর সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। হয়ত মানুষের স্বভাবের অসম্পূর্ণতার জন্যই কোন স্থলে এ পর্য্যন্ত আদর্শ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইতে পারে নাই; কিম্বা প্রথা ভাল হইলেও মানুষের দুর্ব্বলতার জন্য ফলে বেশী লোক বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে নাই। সুতরাং বাহিরের ফল দেখিয়াই নির্ব্বিচারে কোন প্রথার দোষ দেওয়া উচিত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের চরিত্রের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইতেছে, ততদিন কোন নিয়ম বা প্রথার ফল সর্ব্বাংশে ভাল হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু কোন প্রথা বা নিয়ম ভাল কি না, বিবেচনা করিতে হইলে ভাল এবং নির্দ্দোষ প্রাণীর উপর সে প্রথার দরুণ কোন অত্যাচার হইতেছে কি না এবং কেবল প্রথাই তাহাদের সদিচ্ছাবিকাশের ও আদর্শ-লাভের অন্তরায় হইতেছে কি না, দেখা উচিত। আমাদের দেশের বিবাহ-প্রথার সপক্ষে এক-বাক্যে জয়ধ্বনি করিবার পূর্ব্বে এই সকল বিষয়গুলি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশের বিবাহে লোকে অসুখী হইলে, তাহা জানা কঠিন হয় না। Divorce ইত্যাদি প্রথার জন্য সহজেই তাহা সকলের চোখে পড়ে! কিন্তু যাহারা সুখী হয়, তাহাদের কোন খবরই আমাদের কানে পৌঁছায় না। সেই জন্য আমাদের দেশের বিবাহে যে সকলেই সুখী হইতেছে, এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে আর বিলম্ব ঘটে না!

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের মত, প্রকৃত অবস্থা জানিবার সুবিধা থাকিলে আমাদের দেশের প্রথার সম্বন্ধেও বোধ হয় এতটা শ্লাঘা করা সম্ভব হইত না। পুরুষ ও নারী উভয়কে লইয়াই বিবাহ। সুতরাং দুই-পক্ষই

সুখী হইতেছে কিনা ও আদর্শ-লাভে বাধা পাইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে যে সকল কারণে Divorce ঘটে, আমাদের দেশে একপক্ষে যে তাহা ঘটে না, এ কথা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন? আর অপর পক্ষে তাহার বিন্দুমাত্র আভাস ঘটিলে নারীর কি দশা হয়, তাহা কি কখনো কাগজে-কলমে বাহির হয়? তবে সেজন্য কোন গোলমাল শুনিতে পাওয়া যায় না কেন? তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নয়, এবং তাহা হইলেই আমাদের বিবাহের আধ্যাত্মিকতা যে কোথায়, তাহা ধরা পড়িবে।

সে যে কোথায়, তাহা আর বলিতে হইবে না। সেই ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা নারীতেই—যাহার জন্য মনু হইতে আরম্ভ করিয়া অজাতশ্মশ্রু স্কুল-কলেজের ছেলেরা অবধি উপদ্রেষ্টা ও অনুশাসিতার আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। এক তরফার কথায় সত্য-মিথ্যা নির্ণীত হইতে পারে না। সুতরাং একপক্ষ যখন এত কালের শাসন-পর্ব্বতের তলায় বাক্‌শক্তিহীন, জড়ত্বপ্রাপ্ত, তখন আমাদের দেশের বিবাহের প্রকৃত তত্ত্ব কিরূপে প্রকাশ পাইবে?

বাস্তবিক বিবাহ যখন দুইপক্ষের সম্বন্ধ, তখন কেবল একপক্ষের উপর সমস্ত শাসন-ভার চাপাইয়া কিরূপে যে আধ্যাত্মিকতা লাভ হইতে পারে, তাহা বোঝা কঠিন। আত্মোৎসর্গ আদায় করা যেমন হীন, বাধ্যতা বা জড়ত্ব-প্রণোদিত দানও তেমনি গৌরবশূন্য। হিন্দু নারীর মহিমা-কীর্ত্তনের সময় হিন্দু পুরুষ যে কতখানি খাটো হইয়া পড়েন, তাহা না বুঝিয়া কিরূপে তাহাতে গৌরব বোধ করেন, ইহাই আশ্চর্য্য!

বাস্তবিক বিবাহ আত্ম-বলিদানের জন্য নয়। দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কও তাহাতে এক-তরফা হইতে পারে না। স্ত্রী, পুরুষ—উভয়েরই পক্ষে বিবাহ একটি অতি-প্রয়োজনীয় সংস্কার। আত্মবিকাশ, মনুষ্য-জীবনের সম্পূর্ণতা, চিরজীবনের সাহচর্য্য, বিভিন্ন প্রকৃতির গুণে পরস্পরের অভাব-পূরণের সহিত সৃষ্টিরক্ষার জন্য যে একটা প্রধান প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে প্রবল রহিয়াছে, তাহারও চরিতার্থতা ইহার মধ দিয়া হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার সার্থকতা দুইজনের জীবনের পরিপূর্ণতার উপর নির্ভর করে। একজনের বিলোপে তাহা হইতে পারে না। উভয়েই উভয়ের দ্বারা অধিকতর সম্পূর্ণ হইবে, ইহার বিবাহের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আমাদের প্রচলিত বিবাহ প্রথায় কতদূর সাধিত হইতেছে? আমাদের প্রথা প্রথম হইতেই একপক্ষকে বাদ দিয়া রাখিয়াছে। তাহার নিজের কোন সুখ, দুঃখ, অভাব বা আকাঙ্ক্ষার স্থান ইহাতে নাই। ইহাতে বাহিরে খুব সহজেই শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে দেখা যায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু সহজ পথই শ্রেষ্ঠ পথ কি না, ইহাই বিচার্য্য।

প্রকৃতির এমনি অমোঘ নিয়ম, তাহাকে এক জায়গায় চাপা দিলে তাহা অন্যত্র অন্য আকারে প্রকাশ পাইবেই। আমাদের দেশের বিবাহেও একপক্ষকে অস্বীকার করিতে গিয়া কোন পক্ষই সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। একজনকে যদি কেবলই দিতে হয় ও তাহার পাইবার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে দিবার উপযুক্ত ধন সে কোথায় পাইবে?

তাহার সে রিক্ততার, সে দানের মূল্যই বা কি ?

তার পর পাশ্চাত্য দেশের বিবাহিত জীবনের যে ব্যতিক্রম আমাদের এত বেশী চোখে পড়ে, আমাদের মধ্যে সে কারণ-গুলির যদি একান্ত অসদ্ভাব ঘটিত, তাহা হইলেও বা আমাদের গৌরব করিবার কিছু থাকিত! কিন্তু তাহার অস্তিত্ব যখন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, তখন আমাদের সমাজ তাহার কি মীমাংসা করিয়াছেন, দেখা যাক্; এবং তাহা সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ কি না তাহার বিচার করাও অনুচিত হইবে না। বিশ্বাস-ভঙ্গ এবং তাহার আনুসঙ্গিক পরিত্যাগ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদির জন্যই পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ-ভঙ্গ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সে অবস্থায় সমাজ কি করিয়া থকে? স্বামীর দুশ্চরিত্রতা ও তাহার আনুসঙ্গিক নানা কদর্য্য ব্যাপারে আমাদের দেশের মেয়েদের নারীত্ব ও মনুষ্যত্ব যে কিরূপে পদ-দলিত হয়, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যতই অকথ্য, অবর্ণনীয় অপমান বা যন্ত্রণা হউক না কেন, তাহাদের তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই! এমন কি আইনও যেখানে রক্ষা করে, সেখানেও তাহাদের ফল পাইবার কোন যোগ্যতা, অধিকার বা সুবিধা—সমাজ কিছুই রাখেন নাই। তাঁহারা কি ইহাকেও "আত্মোৎসর্গ" বলিতে চান? তা যদি বলেন, তাহা হইলে ঐ শব্দটী অভিধান হইতে উঠাইয়া দেওয়াই লাভ।

এদিকে স্ত্রীর বিষয়ে এতটুকু সন্দেহের কারণ ঘটিলে কি হইয়া থাকে? কোর্টের কোন বালাই না হইয়াই স্বামী তাহাকে যেখানে ফেলিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন। সত্য কারণ এতটুকু ঘটিলে, এমন কি বিপদে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইলেও তাহাকে নরক-কুণ্ডের পথে ফেলিয়া দিতেও দ্বিধা করেন না! ইহার নাম যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, তাহা হইলে পৈশাচিকতা শব্দটী কোথায় প্রযুক্ত হইবে জানা দরকার। পাশ্চাত্য দেশের দুর্ভাগ্য, তাহারা এত সহজে এই সকল জটিল প্রশ্নের সমাধান শিখিতে পারে নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য বিবাহও যে আদর্শ নয় এবং আমাদের বিবাহ-প্রথা যে তাহার চেয়ে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার গুণ-কীর্ত্তন সর্ব্বদাই হইতেছে, সুতরাং অন্য দিকটা কিছু দেখানোই আমার উদ্দেশ্য।

তার উপর বর যে-বয়সেরই হউন না, বা পূর্ব্বে যত বিবাহই করিয়া থাকুন না কেন, ১১।১২।১৩ হইতে আজকাল ১৫।১৬ বৎসরের কুমারীও আমাদের বিবাহের বাজারে প্রচুর মিলে। যখন একটী ৪০।৫০ বৎসরের (আরও উর্দ্ধবয়সের নাম না হয় নাই করিলাম) বিপত্নীকের সহিত ঐরূপ একটী কুমারীকে বিবাহ-সূত্রে জুড়িয়া দেওয়া হয়, তখনই বা সে বিবাহের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্থান কোথায় থাকে, জানিতে পারি কি? একটী কুমারীর পবিত্র জীবনকে প্রথম হইতেই বিশুদ্ধতার সমস্ত স্বাদ ও সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত করা অপেক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকারের অবমাননা আর কি হইতে পারে?

পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি উভয়ের সর্ব্ব প্রধান দাবী। সেইজন্যই সতীত্বের এত মহিমা! কিন্তু ঐ দাবী স্বামীর প্রতিও ঠিক সমানভাবে করিবার অধিকার ও সংস্কার পরমেশ্বর প্রত্যেক নারীর অন্তরেই দিয়াছেন। সমাজের ব্যবস্থা, শাসন, এমন কি আত্ম-উপলব্ধিরও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহা কতকটা ঢাকা আছে মাত্র। কিন্তু ক্রটী এমন প্রবল সংস্কার যে এত শাসনেও সম্পূর্ণ চাপা পড়ে নাই। সুতরাং প্রথম হইতে সেই অধিকারটুকুরও স্থান না রাখা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে? এক হিসাবে ইহা স্বাভাবিক বিবাহের'পর স্বামীর দুশ্চরিত্রতার অপেক্ষাও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। কারণ তাহা যতই ঘৃণ্য ও অপমানকর হউক না, স্বামীর উপর স্ত্রীর দাবী ও অধিকার যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে তিনি প্রথম হইতেই অন্যের; এবং তাঁহাদের দাবী ও অধিকার পরবর্ত্তী অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই অধিক। তিনি নিজে না থাকিলেও তাঁহার গৃহে সন্তান, স্বামী, সমস্তই তাঁহার। নবীনা তাহাতে একান্তই অনধিকার প্রবেশ করেন মাত্র; সুতরাং বয়সের গুরুতর পার্থক্যের জন্য যে সকল অস্বাভাবিক জঘন্যতার সৃষ্টি হয়, তাহা ছাড়িয়া দিলেও একজন বিশুদ্ধ কুমারীকে বিপত্নীকের সহিত বিবাহ দেওয়ায় কুমারীরই অবমাননা করা হয়।

ইহা ভাবিলে যদিও বিবাহের প্রকৃত আদর্শ-অনুসারে স্ত্রী পুরুষ কাহারোই একাধিক বিবাহ একেবারেই সমর্থন-যোগ্য নহে, তথাপি মনুষ্য চরিত্রের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া বিধবা-বিবাহও সমাজে প্রচলিত করা উচিত বোধ হয়। তাহা হইলে তবু কতকটা সাম্য ও শীলতা রক্ষা হইতে পারে। বাস্তবিক "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্" ধরিয়া বিবাহের উচ্চ আদর্শ যদি খর্ব্ব করিতেই হয়, তাহা হইলে বয়স্ক বিপত্নীকের সহিত বয়স্কা বিধবার বিবাহ তবু কতকটা সঙ্গত হইতে পারে। সঙ্গী-হিসাবেও সংসারাভিজ্ঞ দুইজনেই দুইজনকে বুঝিয়া চলিতে পারে। সেইজন্য এরূপ বিবাহ আদর্শ-হিসাবে নিম্নশ্রেণীর হইলেও ইহাতে জঘন্যতা বা প্রকৃতির উপর কোন অত্যাচার ঘটে না।

বঙ্গ-নারী।

আব্‌দার

তোমার আদর মিষ্টি কথা
সবার তরে রেখো গো,
আমায় কেবল অম্‌নি ক'রে
আড়-নয়নে দেখো গো।
চক্ষে আসে স্বরগ নামি
সেই চাহনি চাই যে আমি,
তোমার নয়ন-সঙ্গীতের ওই
ইঙ্গিতে সই ডেকো গো।

তোমার আঁখির দরবারেতে
পাই যেন পাই নিমন্ত্রণ।
আমি তোমার পূজক কবি
ভক্ত তোমার চিরন্তন।
জীবন-তরী ঝঞ্ঝা-ব্যাকুল
যদিই কভু হারায় গো কূল,
স্বরগ-পথের আলোক-গৃহ
সম্মুখে মোর থেকো গো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কিস্তিমাৎ

সকাল-বেলায় প্রাতঃস্নান ক'রে, দুর্গাকালী কুটনো কুট্‌তে যাচ্ছে, এমনসময়ে ঘরের ভেতর থেকে ভামিনী চেঁচিয়ে ডাক দিলেন, "দুগ্‌গাকালী, অ দুগ্‌গাকালী!"

"ঘুম না ভাঙ্‌তেই চ্যাচানি সুরু!" এই ব'লে দুর্গাকালী ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

ভামিনী বল্‌লেন, "গিন্নি, মস্ত এক সুস্বপ্ন দেখেচি। ভোরের স্বপন তো সত্যি হয়?"

দুর্গাকালী বল্‌লে, "সুস্বপ্ন! কি সুস্বপ্ন?"

ভামিনী বল্‌লেন, "দেখলুম, আমি ঘোড়-দৌড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েচি। অনেকগুলো ঘোড়া দৌড়োচ্চে। দৌড় থাম্‌লে দেখ্‌লুম, আমি যে ঘোড়ার ওপরে বাজী ধরেচি সেই ঘোড়াই প্রথম হয়েচে।"

দুর্গাকালীর উৎসাহ অল্পে অল্পে জেগে উঠছিল। সে ভামিনীর সাম্‌নে এসে দুই থাবা পেতে বসে আগ্রহভরে বল্‌লে, "তারপর?"

ভামিনী বল্‌লেন, "তারপর শুন্‌লুম, আমি পনেরো হাজার টাকার বাজী জিতেচি।"

দুর্গাকালী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, "টাকাটা পেলে তো?"

ভামিনী একটু দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "হাতে পাবার আগেই আহ্লাদে আমার ঘুম ভেঙে গেল।"

দুর্গাকালী মুখভার ক'রে বল্‌লে, "তা আমি আগেই এঁচে নিয়েচি। জেগে জেগেই যে মানুষ সব কাজ পণ্ড করে, স্বপ্নেও সে বোকামি তো কর্‌বেই! আচ্ছা, তবু এমন স্বপনটা যখন দেখ্‌লে, তখন একটা কাজই করনা কেন! আজ তো আপিসের সায়েব মরেচে ব'লে তোমার ছুটি?"

—"হুঁ।"

—"আজ ঘোড়দৌড় আছে তো?"

—"আজ শনিবার, আছে বৈকি!"

—"তবে কপাল ঠুকে 'রেস' খেলে এস। ঘোড়দৌড়ের দিনেই ভোরবেলায় যখন সুস্বপন দেখেচ, তখন চাই-কি ফলে যেতেও পারে।"

ভামিনী সন্দেহের সঙ্গে মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "এমন আল্‌টপ্‌কা টাকা পাওয়া কি আর আমার অদৃষ্টে ঘট্‌বে! গিন্নি, কত লোকে কত পায়, আমি কিন্তু আজ-পর্য্যন্ত পথ থেকে কোনদিন একটা ডবল-পয়সাও কুড়িয়ে পেলুম না। আমাকে বল্‌চ রেস্ খেল্‌তে?—হায় রে!"

দুর্গাকালী বল্‌লে, "ঐতো! ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরেচে! অদৃষ্ট কখন্ কার ওপরে প্রসন্ন হয়, তা কে বল্‌তে পারে? মনে নেই এটা মাঘ মাস, আর তোমার কর্কট রাশ? শাস্ত্রে লিখেচে, মাঘমাসে কর্কটের অর্থ লাভ হয়।"

ভামিনী কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়ে বল্‌লেন, "হুঁ, তা জানি বটে। কিন্তু কলিকালে কি শাস্ত্রবাক্য ফলে?"

দুর্গাকালী বল্‌লে, "এখনো চন্দর-সূর্য্যো উঠ্‌চে, শাস্ত্র আর ফল্‌বে না?—লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো, আজ ঘোড়দৌড়ে যাও, নিশ্চয় তুমি বাজী জিত্‌বে!"

হঠাৎ ভামিনী আঁৎকে উঠে খাট থেকে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে পড়্লেন।

—"ও কি! ও আবার কি হোলো?"

—"টিক্‌টিকি, টিক্‌টিকি! গায়ের ওপরে টিক্‌টিকি পড়েচে—রাম, রাম!"

—"টিক্‌টিকি পড়েচে? রোসো,—কোন্ দিকে গো,—ডানদিকে না বাঁদিকে?"

কোঁচা দিয়ে গা ঝাড়্তে ঝাড়্তে ভামিনী ঘৃণাভরে বল্লেন, "বাঁদিকে!"

দুর্গাকালী ভারি খুসি হয়ে ব'লে উঠল, "বাঁদিকে পড়েচে, বল কি গো! বাঁদিকে টিক্‌টিকি পড়্লে লাভ হয় গো, লাভ হয়! হে বাবা সত্যনারায়ণ! মুখ তুলে চাও বাবা, তোমার দোরে একটাকার সিন্নি চড়াব!"

এতক্ষণে ভামিনীরও একটু একটু বিশ্বাস হোলো। তিনি তাড়াতাড়ি পাঁজী খুলে দেখ্লেন,তার ওপর আজ আবার ত্র্যমৃতযোগ। তাঁর আর কোন সন্দেহ রইল না, নিজের সৌভাগ্য সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বল্লেন, "আজ আমার পোয়া বারো দুগ্‌গা, আজ আমার পোয়া বারো! এই দ্যাখো, আজ ত্র্যমৃতযোগ! পাঁজীতে লেখা রয়েচে, 'এই যোগ যাত্রাদিতে শ্রেষ্ঠ ও অভিমত ফলপ্রদান করে।' তুমি তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না স্বরু ক'রে দাও, আজ যা থাকে কপালে—এক-বার 'রেস্' খেলেই দ্যাখা যাক্!"

দুর্গাকালী বল্লে, "কিন্তু আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

ভামিনী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "তুমি? তুমি যাবে কি বল?"

দুর্গাকালী বল্লে, "কি জানো, তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে আমার ভরসা হয় না। শেষটা হাতে লক্ষ্মী পেয়েও হয়ত পায়ে ঠেল্‌বে!"

ভামিনী বল্লেন, "না, না, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই। জাননা, শাস্ত্রে আছে 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা'?"

"শাস্ত্রে"র এই বচনটা দুর্গাকালীর কোন দিনই ভালো লাগ্‌ত না। কিন্তু আজ ভালো না লাগ্লেও এই "শাস্ত্রবাক্য"টা অবহেলা কর্‌তে তারও ভরসা হোলো না। কাজেই সে বল্লে, "বেশ, আমি না হয় বাড়ীতেই থাক্‌ব। কিন্তু টাকা যদি পাও, খুব সাবধানে এন।"

ভামিনী বল্লেন, "তা আর বল্‌তে। একেবারে পেট-কাপড়ে বেঁধে আন্‌ব।"

দুর্গাকালী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না, না, তোমার কাপড়ের কসি বড় একটুতেই আল্‌গা হয়ে যায়।"

—"তবে বুকপকেটে।"

—"সেই ভালো। কিন্তু দেখো, শেষটা পকেট যেন কাটা না যায়!" এই ব'লে দুর্গাকালী হাত দুলিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নার আয়োজন কর্‌তে চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'লে ভামিনী চট্‌পট্ কাপড়-চোপড় প'রে নিলেন।

দুর্গাকালী বল্লে, "নাও, কুলুঙ্গীতে সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন, ওঁকে আগে প্রণাম ক'রে নাও।"

ভামিনী কথামত কাজ কর্‌লেন। এত ভক্তিভরে গণেশকে তিনি আর-কখনো প্রণাম করেন নি।

দরজার কাছে একটি জলভরা কলসী

রেখে দুর্গাকালী বল্লে, "এইবার এই কল্সীর দিকে তাকিয়ে ইষ্টদেবতার নাম কর্তে কর্তে সোজা বেরিয়ে পড়ো।"

ভামিনীর স্ত্রীর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে বেরুতে যাচ্ছেন, এমনসময়ে পথ থেকে কে ডাক্লে, "ভামিনীবাবু বাড়ীতে আছেন ?"

দুর্গাকালী দৌড়ে গিয়ে, জান্লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে এসে বল্লে, "কে একটা মাকুন্দ লোক ডাক্‌চে !"

ভামিনী বল্লেন, "গলা শুনে মনে হচ্ছে নন্দ ঘোষ।"

দুর্গাকালী বল্লেন, "খবর্দ্দার, ওর সঙ্গে দেখাও কোরো না, সাড়াও দিও না! ও আগে চলে যাক্, তারপর তুমি বেরিও।"

—"কেন ?"

—"কেন আবার—অযাত্রা! জানোনা, খনার বচনে আছে—

"যদি দেখ মাকুন্দ চোপা
এক পাও না বাড়াও বাপা।'

হতভাগা মিন্সে, ডাক্‌বার আর সময় পেলেন না, আর-একটু হ'লেই তো তোমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেত !"

এই মূর্ত্তিমান অযাত্রাটি ডেকে ডেকে গলা ভেঙে যখন হতাশ হয়ে চ'লে গেল এবং দুর্গাকালী যখন 'লাইন ক্লিয়ার" আছে কিনা দেখ্‌বার জন্যে জান্‌লা দিয়ে আর একবার উঁকি মেরে ভরসা দিলে, ভামিনী তখন তাম্বুলারক্ত নিশ্চিন্ত মুখে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

তাঁর বাসা থেকে ট্রামের রাস্তা ছিল খানিক তফাতে। গরমও পড়েচে চরম, ভামিনীর স্থূল বপুখানির স্বাভাবিক উত্তাপও যথেষ্ট ;—কাজেই ছাতার আড়ালে আত্মরক্ষা ক'রেও অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠলেন।

এর ওপরে আর এক বিপদ! ঘোড়-দৌড়ের উত্তেজনায় ভামিনী একটু অন্যমনস্ক হয়েও পথ চল্‌ছিলেন,—আচম্বিতে তাঁর কাণের কাছেই ভোঁ ক'রে একটা ভয়ানক পরিচিত ভেঁপু বেজে উঠ্‌ল—ভামিনী চমকে বুঝলেন, তাঁর ঘাড়ের ওপরেই মটরগাড়ী! পাশেই ছিল একটা কাণায় কাণায় ময়লা-ভরা 'ডাষ্টবিন'—দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ভামিনী তার ভিতরেই হুমড়ী খেয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেলেন।

কিন্তু যে ভেঁপু বাজিয়েছিল সে মটরগাড়ী নয়—একখানা সাইকেল মাত্র!

'ডাষ্টবিনে'র জঞ্জাল সর্ব্বাঙ্গে মেখে এবং দুর্গন্ধে ওয়াক্ থু করতে করতে ভামিনী কোন-রকমে বাইরে বেরিয়ে এস দেখ্‌লেন, এর-মধ্যেই সেখানে বেশ-একটি ছোটখাটো জনতার সৃষ্টি হয়েচে, আর সেই জনতার ভিতরে, তাঁর পরিচিত বন্ধু গঙ্গারাম হাতীও কোথা থেকে এসে যোগদান করেছেন।

গঙ্গারাম তো ভামিনীর অবস্থা দেখে হেসেই খুণ!

ভামিনী চটে বল্লেন, "আপনি কি মনে কর্‌চেন গঙ্গারামবাবু, যে আপনার হাসি এখন আমার বড্ড ভালো লাগ্‌চে ?"

গঙ্গারাম অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন, "মাপ করবেন ভামিনীবাবু, হাসিটা আমার অজান্তে মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়েচে! কিন্তু আপনি কল্‌কাতার ছেলে, সামান্য একখানা সাইকেল

দেখেই ভড়্‌কে মন্নলার কুপোর ভেতরে গিয়ে পড়েছিলেন কেন?"

ভামিনী নাকের ঠিক ডগা থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ কি-একটা বিশ্রী জিনিষ মুছে ফেলে বল্‌লেন, "কুপোর ভেতরে গিয়ে পড়েছিলুম স্বচক্ষে সর্ষেফুল দ্যাখ্‌বার জন্যে। কেমন, আপনার কৌতূহল মিট্‌ল তো? আপাতত আপনারা পথ ছেড়ে দয়া ক'রে বিদায় হ'লে আমি দুঃখিত হব না। আপনাদের বোঝা উচিত, আমি সং নই।"

গঙ্গারাম বল্‌লেন, "ভামিনীবাবু, সাম্‌নেই আমার শ্বশুরবাড়ী, আসুন, স্নান ক'রে জামা-কাপড় বদ্‌লে ফেল্‌বেন।"

উপায়ান্তর না দেখে ভামিনী ম্লানমুখে আস্তে আস্তে গঙ্গারামের পিছনে পিছনেই চল্‌লেন। স্নান ক'রে পরিষ্কার হ'লে পর গঙ্গারাম তাঁকে একটি কোট, একখানি কাপড় আর একখানি চাদর পর্‌তে দিলেন। গঙ্গারামকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ভামিনী আবার ঘোড়-দৌড়ের মাঠের উদ্দেশে ছুট্‌লেন। কিন্তু পথে এই বাধা পড়াতে তাঁর মনটা ভারি দমে গেল।

* * *

আজ আর দুর্গাকালীর অন্য চিন্তা নেই। এমন-কি আজ দুপুরে পাড়া বেড়াতে যেতেও তার মন উঠল না।

সারাদিন নানান দেবতাকে সে ষোড়শো-পচারে পুজো দেব ব'লে বারংবার প্রলুব্ধ করেছে এবং ঘন ঘন জান্‌লার কাছে গিয়ে দেখেছে যে, ভামিনীভূষণ হাসিমুখে ফিরে আস্‌ছেন কিনা!

বলা বাহুল্য,টাকাটা হাতে এলেই একখানা ভালো মাদ্রাজী শাড়ী, একটা হালফ্যাসানের ব্লাউস, আর একছড়া মটর-মালার জন্যে স্বামীর কাছে মনের বাসনা প্রকাশ কর্‌বে, সেটাও সে ইতিমধ্যেই স্থির ক'রে ফেলেছ।

এ'দিকে বেলা পড়ে এল। ভামিনী তবু ফেরেন না কেন? তবে কি ভোরের স্বপন, মাঘমাস কর্কটরাশ, বাম অঙ্গে টিক্‌টিকির পতন আর অমৃতযোগ, সমস্তই মিথ্যে হয়ে গেল, না গাঁটকাটা কি গুণ্ডা এসে পথের মাঝেই টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে স'রে পড়্‌ল?

দুর্গাকালীর উদ্বেগ যখন মাত্রা ছাড়াই ছাড়াই কর্‌ছে, তখন হঠাৎ নীচে থেকে ভামিনীর গলা পাওয়া গেল—"গিন্নি, গিন্নি!"

দুর্গাকালী হুড়মুড় ক'রে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল, আবেগে তার মুখ দিয়ে আর কথা ফুট্‌ল না।

ভামিনী বাড়ী কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "দুগ্‌গা, কিস্তিমাৎ! ব'লেই তিনি সাম্‌নের দিকে প্রাণপণে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন, দুর্গাকালীও তার ভিতরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ভামিনীর বুকের ওপরে মুখ রেখে চোখ মুদে চুপ ক'রে রইল।

আনন্দের প্রথম ধাকাটা কেটে গেল। দুর্গাকালী মুখ তুলে প্রথমেই জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কত টাকা জিত্‌লে গা?—পনেরো হাজার তো?"

ভামিনী বল্‌লেন, "হ্যাঁ, তুমিও যেমন, স্বপ্নে পনেরো হাজার টাকা পেয়েচি ব'লে সত্যি-সত্যিও তাই কি কখনো পাওয়া যায়? অত টাকা পাইনি। তবে যা পেয়েচি, তাও বড় কম নয়—দু'হাজার তিনশো!"

দুর্গাকালী আগ্রহভরে হাত বাড়িয়ে বল্লে, "কৈ, দেখি, দেখি!"

"এই যে, নোটগুলো কোটের ভেতর-দিক্‌কার পকেটে পুরে রেখেছি!"—ভামিনী কোটটা টপ্ ক'রে খুলে ফেলে তার ভিতরের পকেটে হাত চালিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ আর মুখ যেন কেমনতরো হ'য়ে গেল!

দুর্গাকালী ভয় পেয়ে বল্লে, "কি গো, টাকা কোথায়?"

ভামিনী অস্ফুট স্বরে নিজের মনেই বল্লেন, "না, না, তাও কি হয়, ভেতরের পকেট থেকে তো টাকা আর চুরি যেতে পারে না!" তিনি আবার ভালো ক'রে পকেটের ভিতরে বাগিয়ে হস্ত-চালনা কর্‌লেন। এবারে তাঁর হাত পকেটের মুখ দিয়ে ঢুকে, অত্যন্ত অনায়াসে তলা দিয়ে ফুড়ুক্ ক'রে বেরিয়ে পড়্‌ল।

দুর্গাকালী কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বল্লে, "টাকা কই গো?"

ভামিনী স্তম্ভিত নেত্রে গঙ্গারামের-দেওয়া জামার সেই ছিন্ন-পকেটের দিকে তাকিয়ে, হাঁ ক'রে পাথরের মূর্ত্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলেন।

দুর্গাকালী বল্লে, "তবে বুঝি এতক্ষণ চালাকি হচ্ছিল, টাকা-ফাকা কিছুই পাও-নি?"

বরাবরের মত ভামিনী এবারেও নিজের বোকামি ঢাক্‌বার জন্যে কাষ্ঠহাসি হেসে বল্লেন, "প্রিয়ে, স্বপন যদি সত্যি হোতো, তবে দুনিয়ায় আজ কি কেউ আর ফকির থাক্‌ত? আর টাকা কি এত সহজে পাওয়া যায়? এতক্ষণ আমি তোমাকে নিয়ে একটু মস্করা কর্‌ছিলুম!"

কিন্তু ভামিনী মনে মনে এটা বিলক্ষণই বুঝ্‌লেন যে, আজ তাঁর জীবনে স্বপ্নও সত্যি হয়েছে, টাকাও তিনি খুব সহজেই পেয়েছেন, আর সে টাকা চোর-ডাকাতেও কেড়ে নেয় নি,—কিন্তু কে জান্‌ত, ইষ্টুপিড্ গঙ্গারামের জামার পকেট এমন ভয়ানক ছেঁড়া? ঐ ছিদ্রপথেই তো তাঁর সদ্যহস্তগত দুর্লভ 'সৌভাগ্য' আবার পলায়ন করেছে!

ভামিনী জামাটা টান মেরে একদিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলে গেলেন,—জীবনে যে একটা ডবল-পয়সাও কুড়িয়ে পায়-নি, তার পক্ষে 'রেস' খেল্‌তে যাওয়ার চেয়ে পাগলামি আর কি আছে?

বলা বাহুল্য, দুর্গাকালী সে রাত্রে উনুনে আর আগুন দিলে না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

জাতি ও ভাষা

কোকিল-শিশু কাকের বাসায় প্রতিপালিত হইলেও কাকের স্বরের অনুকরণ করে না; কোকিল-শিশুর স্বরের প্রভাবে কাকের স্বরেরও মিষ্টতা জন্মে না। অশ্ব ও রাসভের মধ্যে আকৃতি-গত সাদৃশ্য থাকিলেও স্বরের সাদৃশ্য আদৌ নাই। কুকুর, বিড়াল, বানর,

বৃষভ সকল জাতীয় জন্তুরই স্বর বিভিন্ন জাতীয়। শক্তির অভাবে ব্যাঘ্র মহাশয় শৃগাল-ধর্ম্মী হইলেও শৃগালের স্বরের অনুকরণ করিতে পারিবেন না, অভিনব শক্তিলাভ করিয়া নীলবর্ণ শৃগাল তাহার স্বরের দ্বারাই পরিচিত হইয়াছিল। অপরের স্বরের অনুকরণ করিতে পারে,কেবল কাকাতুয়া প্রভৃতি কয়েকটী পক্ষী। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদিগকে ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং বহু গল্প ও আখ্যায়িকায় তাহাকে বক্তার আসন দেওয়া হইয়াছে। কাদম্বরী আখ্যায়িকায় শুক একটি অতি-প্রধান উপকরণ। বাগ্মী শুকের মুখনিঃসৃত আখ্যায়িকার প্রভাবে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য চণ্ডাল জাতিও রাজসভায় বরণীয় হইয়াছে। অপর জাতীয় জন্তুর স্বরানুকরণ-শক্তির হিসাবে ইতর প্রাণীর মধ্যে শুক শ্রেষ্ঠ। অন্য কোন প্রাণীই স্ব-স্ব স্বর পরিহার বা অন্যের ভাষা অনুকরণ করিতে অসমর্থ। আবার মনুষ্য-স্বরের বিশ্লেষণ সমর্থ শুক পক্ষীও মনুষ্যের ভাষা-গ্রহণে অসমর্থ। সে যে-শব্দের উচ্চারণ করে, তাহা তাহার নিকট নিরর্থক।

যদি ইতর প্রাণীরা ভাষা গ্রহণ বা ভাষার সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদেরও শিক্ষার উৎকর্ষ সম্ভবপর হইত এবং মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীর মধ্যে প্রভেদ থাকিত না। হিতোপদেশের কাক-কপোত, গৃধ্র-শৃগাল বা সোপানৎসক বিড়ালের ন্যায়(Puss in boots) যাবতীয় জন্তুগণ যদি কথা বলিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে আমরা তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যালয় দেখিতে পাইতাম; এবং বুদ্ধধর্ম্মী রাজা অশোকের নিকট তাহারা তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-পরিচালনার জন্য অর্থ-সাহায্য চাহিত! সংবাদ-পত্রেও বিজ্ঞাপন দেখা যাইত—"অমুক বিড়াল-বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক চার-কুড়ি টাকা বেতনে একজন এম-এ হেড্‌মাষ্টারের প্রয়োজন। বিড়াল-জাতীয়ের আবেদন সমধিক গ্রাহ্য হইবে এবং তাঁহার আবেদন মনোনীত হইলে তিনি তাঁহার জাতীয় স্বত্বের বলে আট্‌শত হইতে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতে পারিবেন। সত্বর সম্পাদক শুভ্রকায় কৃষ্ণশীর্ষ মিউ-মিউ মহাশয়ের নিকট আবেদন করুন।" ফল কথা, ভাষাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব এবং ভাষা-হীনতাতেই পশুর পশুত্ব।

জন্মের অল্পকাল পরেই মনুষ্য-শিশু স্বজাতীয় মনুষ্যের ভাষার অনুকরণ করিতে শিখে এবং কুকুর বিড়ালের স্বরের অনুকরণ দ্বারা বু-ব্বু, মিউ-মিউ প্রভৃতি শব্দে তাহাদের নামকরণ করিয়া নিজের ভাষা-সৃষ্টির শক্তির পরিচয় দেয়। আট বৎসর বয়সের বাঙ্গালী শিশু বঙ্গদেশের ভাষা বলিতে, বুঝিতে ও লিখিতে পারে। আর-আট বৎসরের মধ্যে তাহাকে ইংলণ্ড-দেশীয় ভাষা শিখিয়া তাহার সাহায্যে ইতিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনুশীলন করিয়া সেই সেই বিষয়ের কৃতকার্য্যতার পরিচয় ইংলণ্ডীয় ভাষার দ্বারাই দিতে হয়। এবং এই সময়ের মধ্যেই তাহাকে অন্যূন আর-একটী ভাষায় জ্ঞান লাভ করিতে হয়। সুতরাং ষোড়শ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমের মধ্যেই বাঙ্গালী বালক তিন-তিনটী ভাষা শিখিয়া ফেলে। কিন্তু সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতির বালক-গণ এত শীঘ্র ভাষা শিখিতে পারে না। তাহাদের নিজেদের ভাষা ও নিজেদের সভ্যতা যে-পরিমাণে অপরিপুষ্ট, তাহাদের সেই

পরিমাণেই ভাষা-শিক্ষার শক্তির ন্যূনতা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি ইহা অতি সত্য যে তাহারা বিদেশীয়ের বা বিজাতীয়ের ভাষা-গ্রহণে সমর্থ। তবে বিদেশীয় ভাষা অধিগত করিবার শক্তির ন্যূনতার জন্য তাহাদের জাতিগত শিক্ষা ও সভ্যতার ন্যূনতা; তাই বীরভূমের গ্রামে গ্রামে কর্ম্ম-ব্যপদেশে ফিরিবার সময় তাহারা বঙ্গ-ভাষায় কথোপকথন করিলেও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতে পারে না এবং বিবিধ প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিতেও পারে না। কারণ তাহাদের নিজেদের ভাষাই এরূপ সমুন্নত নয় যে তদ্দ্বারা ভাবনিষ্কর্ষ বা abstraction দ্বারা কোনও প্রকার চিন্তা চলিতে পারে। সেইজন্য তাহারা ভাব-বাচক বিশেষ্য পদ ও বিশেষণ পদের প্রভেদ করিতে পারে না। বঙ্গবাসী ও সাঁওতাল জাতির মধ্যে এই যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা ভাষা-শিক্ষার শক্তির অভাবের পরিচায়ক নহে, তাহা জাতিগত সভ্যতার তারতম্যের জ্ঞাপক। ভাষা শিক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায় সভ্যতা বা অধিকতর সভ্য জাতির ন্যায় চিন্তা করিবার শক্তি তাহাদের নাই। শিক্ষার সৌকর্য্য সংসাধিত হইলে তাহাদেরও সভ্যতা যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাও যে কালে জটিল চিন্তার অনুশীলনে সমর্থ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক আদিম জাতিই এখন স্পেন-দেশীয় ভাষা শিখিয়াছে।

অবিকৃতভাবে জাতীয় স্বরের সংরক্ষণ ইতর প্রাণীর ধর্ম্ম এবং তাহা ঐ স্বরের পরিবর্ত্তনের অসমর্থতার পরিচায়ক। ইতর প্রাণীর বাগ্‌যন্ত্র এরূপ স্থূলভাবে গঠিত যে তাহাতে নানাবিধ স্বরের উৎপাদন অসম্ভব। তাই তাহারা মান্ধাতার যুগ হইতে যেরূপ শব্দ করিয়া আসিতেছে, আজিও তাহার কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। এই কারণেই "হুক্কা-হুআ," "মিউ-মিউ," "ঘেউ-ঘেউ," "ঘোঁৎ-ঘোঁৎ" প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল শব্দ-উচ্চারণ-কারী প্রাণিসমূহের নাম আমরা বলিয়া দিতে পারি। মানুষের ধর্ম্ম ঠিক বিপরীত প্রকারের। উচ্চারণ ও অর্থের পরিবর্ত্তন দ্বারা ভাষার ক্রমশঃ পরিপুষ্টি-সাধনই মনুষ্য-ধর্ম্ম। মানব জাতির ভাষা অবিরত পরিবর্ত্তনশীল। যুগে যুগে ভাষার পরিবর্ত্তন হয় এবং আমাদের সংস্কৃত ভাষা পূর্ব্ব-পুরুষগণের মতে যোজনান্তে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ভাষার পরিবর্ত্তন বা বিভিন্ন ভাষা গ্রহণ দৈহিক বাগ্‌যন্ত্রে ন্যূনশক্তিতার নিদর্শন নহে; এই পরিবর্ত্তনই সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। এই শক্তি-প্রভাবেই মানবজাতি ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শক্তির অভাবেই ইতর প্রাণীর উন্নতি হয় না।

এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙ্গালী শিশু শৈশবেই বাঙ্গালা ও হিন্দী শিখে। জন্মের পর হইতেই সে চতুর্দ্দিকে হিন্দী ভাষা শুনিতে পায় এবং হিন্দী না বলিলে তাহার কথা কেহ বোঝে না। সুতরাং মাতৃ-ভাষার ন্যায় হিন্দী ভাষা তাহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে। জন্মকাল হইতে যে প্রদেশে শিশু বাস করিবে, সেই প্রদেশের ভাষা সে স্বভাবতঃই শিখিবে। ইহার অন্যথা পরিদৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ভৌগোলিক সংস্থানের সহিত ভাষা-বিশেষের সবিশেষ সম্পর্ক আছে।

স্থান ও কালের উল্লেখ ব্যতিরেকে ভাষার বিবরণ হয় না। বুদ্ধ-ধর্ম্মিগণ যে লিখিয়াছেন—

সা মাগধী মূল ভাসা নরা যায়াদি কপ্পিকা।
ব্রাহ্মণা চস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥

তাহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে মাগধী বা পালি ভাষা সেকালে প্রচলিত ভাষা ছিল, অশ্রুতালাপ শিশুগণ জন্মের পর মাতার মুখে শুনিয়া পালিভাষা শিখিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক হইত। সমাজ-সম্পর্ক-বিহীন অশ্রুতালাপ শিশু পালিভাষা বা কোনও ভাষা শিখিবে, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে।

দুইটী বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতি যদি একত্র হইয়া মিশিয়া এক দেশে বাস করে, তবে তাহাদের ভাষার পরিণাম কি হইবে? উভয় জাতিই যে পরস্পরের মধ্যে আলাপের জন্য স্ব স্ব ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিবে, তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। দুই ভাষার শব্দ-সম্পদ একত্র হইয়া উভয় ভাষার মিশ্রনে একটী অভিনব ভাষার সৃষ্টি করিবে। উভয় ভাষার ব্যাকরণের সমাবেশে ভাব-প্রকাশের উপকরণ বাড়িয়া যাইবে, এবং উভয় জাতির অভিজ্ঞতার ফল এই নব-গঠিত জাতির মনুষ্যগণ ভোগ করিবে। অর্থাৎ যদি প্রথম জাতির ভাষার শব্দ-সংখ্যা ক হয় এবং দ্বিতীয় জাতির শব্দ-সংখ্যা হয় খ, তাহা হইলে নব-গঠিত মিশ্রভাষার শব্দ-সংখ্যা হইবে, ক+খ। আর যদি প্রথম ভাষায় ভাব-প্রকাশের জন্য অবলম্বিত কৌশলের সংখ্যা অ এবং দ্বিতীয় জাতির আ হয়, তাহা হইলে নব-গঠিত ভাষার প্রকৃতি হইবে, অ আ (ক+খ)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগতে এ প্রকারের মিলন না ভাষায় না জাতিতে সঙ্ঘটিত হয়। উভয় জাতির সভ্যতা কখনই এক প্রকারের হয় না। উভয় জাতির মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কও এক জাতীয় হয় না। বিভিন্নতাই জগতের রীতি। হয় ত এক জাতি অতি সভ্য ও অপর জাতি অত্যন্ত অসভ্য হইবে। যেমন উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ ও আধুনিক যুগে কৃতোপনিবেশ ইউরোপীয়গণ। এ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডীয় ভাষাই সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তবে আদিম জাতীয়দিগের শব্দ-সম্পদ যে কিয়ৎ পরিমাণেও সুসভ্য আমেরিকা-বাসিগণের ভাষায় স্থান পায় নাই, এমন নহে। এমন কি তাহাদের বহুসংযোগী (Polysynthetic) ভাষার ব্যাকরণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমেরিকার নূতন ভাষায় সংক্রামিত হইয়াছে। ফলে A stick-to-it-ive-policy, Stick-to-it-ive-ness, Know-not-what-place প্রভৃতি শব্দ ইংরাজী ভাষায় সত্বালাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে যখন আর্য্যগণ প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তখন অনার্য্য আদিম নিবাসিগণ বন-জঙ্গল ও পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয়-গ্রহণ করিলেও তাহাদের মধ্যে সকলেই পলায়ন করে নাই। তাহাদের কতকগুলি দাস বা পরিচারকরূপে আর্য্য জাতির সহিত মিশিয়া যায়। ফলে আর্য্যগণের সংস্কৃত ভাষার সহিত বহু দ্রাবিড়ীয় অনার্য্য জাতির ভাষার উপকরণ মিশিয়া যায়। সংস্কৃত ট-বর্গ এই ভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কারণ ইরাণীয় ভাষা তথা ইউরোপীয় ভাষাসমূহে ত-বর্গ ও ট-বর্গে প্রভেদ নাই। কেবল অনার্য্য দ্রবিড়ীয় ভাষায় ট-বর্গীয় বর্ণ-সমূহের উচ্চারণের ছড়া-ছড়ি। আবার মালা, ঘোটক, মলয়, মীন,

কুটীর, বিড়াল, ঠক্কুর, খুল্ল, কোটি, কুটী, প্রভৃতি বহু সংস্কৃত শব্দ দ্রবিড়ীয় উপাদান হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। বহুকাল এদেশে রাজত্ব করার ফলে মুসলমানগণ এদেশে একটি নূতন মিশ্র ভাষা উর্দ্দুর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এদেশীয় আধুনিক ভাষাসমূহে অসংখ্য মুসলমান শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

আবার জাতি-সঙ্করতার পরিণামে সময়ে সময়ে ইহাও পরিদৃষ্ট হয় যে এক জাতির ভাষা একেবারে লোপ পাইয়াছে এবং কেবলমাত্র অন্য জাতির ভাষাই দেশে তিষ্ঠিয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে আগন্তুক জাতি সাধারণতঃ সভ্যতায় অগ্রগামী ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ইহুদীগণের জাতীয়তা সুনির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা নাই। যে দেশে তাহাদের জন্ম হয়, তাহারা সেই দেশের ভাষা অবলম্বন করে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের নিগ্রোগণ ইংরাজী ভাষায় এবং হায়তী দ্বীপ-নিবাসী নিগ্রোগণ ফরাসী ভাষায় কথোপকথন করে। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বহু-সংখ্যক ইণ্ডিয়ান জাতি স্পেনীয় ভাষায় কথোপকথন করে। মালয় বা পলিনীসীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ হইতে মেলানিসীয়গণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় হইলেও তাহারা মালয়-পলিনীসীয় ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। রুষিয়ার মোঙ্গলীয় অধিবাসিগণের ইউরল-আল্‌তাই ভাষাসমূহের স্থানে একটী স্লাবোনিক (Slavonic) ভাষার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সেমিতীয় আরবী ভাষা আফ্রিকার নিগ্রো ও ইথিয়োপীয় (Ethiopic) জাতি-সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতবর্ষে দ্রবিড়ীয়গণ সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। ইটালীদেশে লিগুরীয় (Ligurian), এত্রোস্কীয় (Etruscan) এবং আইবেরীয় (Iberian) প্রভৃতি বিভিন্ন অনার্য্য ভাষার প্রচলন ছিল। লাটিন ভাষার বিস্তারের পর সে সকল ভাষা লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সকল অনার্য্য-জাতি আর্য্যগণের সহিত সঙ্করভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এই সকল ভাষার একমাত্র প্রতিনিধি সর্ব্বনাম-সংযোগী বাস্ক্ (Basqe) ভাষা স্পেন দেশে পীরেনীজ পর্ব্বতে ও তাহার উপত্যকায় অবরুদ্ধ হইয়াছে।

এই তো গেল সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন জাতি-সমূহের সঙ্করতায় ভাষা-বিশেষের সঙ্করভাব-প্রাপ্তি বা সম্পূর্ণ তিরোধানের কথা। কিন্তু এক-বংশীয় ভাষাসমূহের মধ্যেও এই প্রকার ভাষান্তরের বিতাড়ন পূর্ব্বক আত্মপ্রতিষ্ঠার উদাহরণও যথেষ্ট আছে। ভ্রাতৃবিরোধ মনুষ্য-সমাজের কলঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহাকে ত্যাগ করা মনুষ্য-সমাজের সাধ্যাতীত। ভাষার বিষয়েও সেই একই কথা। ভাষায়-ভাষায় মারামারি বা ঠেলাঠেলি মানব-জাতির ভ্রাতৃবিরোধেরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র। গল্ বা ফ্রান্স হইতে কেল্টিক (Celtic) ভাষাকে এবং ইটালীর দক্ষিণ অংশ হইতে গ্রীক ভাষাকে বিতাড়িত করিয়া লাটিন আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কেল্টিক (Celtic) ভাষাকে কোণ-ঠেসা করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, টিউটনিক (Teutomic) ভাষা। বর্ত্তমানে যেখানে জর্ম্মণ ভাষা প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে সেখানে স্লাবোনিক ভাষা ছিল,

কিন্তু এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নও নাই। অরমীয়, চাল্‌ডীয়, আরবীয় প্রভৃতি সেমিতিক ভাষাসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র তৃতীয়টির সত্ত্বা বিদ্যমান আছে; আর সব লোপ পাইয়াছে। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রেও আমরা ভাষার জ্ঞাতিত্ব হইতে জাতির জ্ঞাতিত্ব অনুমান করিতে পারি না। ঐতিহাসিক যুগে সেমিতিক ভাষা ও সেমিতিক জাতির অবস্থানের সীমা-রেখা কখনও অভিন্ন ছিল না। আরবজাতি ও আসীরীয় জাতির মধ্যে অনেক প্রভেদ। সুতরাং আরবী ভাষা আরব জাতির আদিম ভাষা নহে। ফ্রান্সে যে কেল্টগণ বাস করিতেন, তাঁহাদের ভাষার সহিত লাটিন ভাষার জ্ঞাতিত্ব ও সাদৃশ্য থাকিলেও জাতিদ্বয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল না। সুতরাং লাটিন ভাষা ও কেল্টিক ভাষার মধ্যে জ্ঞাতিত্ব দেখিয়া উভয়-ভাষা-ভাষী জাতিদ্বয়ের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব অনুমান ভ্রমাত্মক হইবে।

এই-সকল কারণে যে-সকল রাষ্ট্রীয় জাতির এক একটী সাধারণ ভাষা আছে, তাহাদের মধ্যে জাতি-গত সঙ্করতা সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এক ফরাসী ভাষা যে জাতির জাতীয় ভাষা তাহাদের মধ্যে বেলজীয় (Belzae), কেল্টীয় (Celtae), আইবিরীয় বা Aquitani, ইটালীয়, টিউটনীয়, বারগণ্ডীয় ও স্কাণ্ডিনেবীয় জাতির একত্র সমাবেশ ও সঙ্করতা আছে। এই প্রকার ইটালী দেশে রয়েসীয় (Rhaetian), লিগুরীয় (Ligurian), গল্‌, এট্রস্কীয় (Etruscan) আইবিরীয়, গ্রীসীয়, অম্ব্রীয় ও ওস্কীয় জাতির বংশধরগণের সঙ্করতা আছে। ইহাদের মধ্যে গথিক, লম্বার্ডীক, টিউটনিক ও স্পেনীয় জাতিরও অল্পাধিক মিশ্রন আছে। সুতরাং 'লাটিন জাতি' বলিলে কোন একটা অবিমিশ্র জাতি বুঝায় না। আবার ইংলণ্ডের প্রাচীন ভাষার নাম (Anglo-Saxon); আংলো-সাক্‌সন্‌ কেবল সংজ্ঞার সুবিধা ভিন্ন জাতিগত সঙ্করতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেয় না। কারণ ইহাদের মধ্যে আঙ্গল্‌, সাক্‌সন্‌, জুট, স্কান্দিনেবীয়, আইবিরীয়, সিলুরীয়, গল্‌, বেলজীয় প্রভৃতি বহু জাতির অল্পাধিক সংমিশ্রন আছে।

এই সকল উদাহরণ ও ঐতিহাসিক তথ্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভাষা ও জাতির মধ্যে কোন মিল নাই। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, ভাষা-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানের সর্ব্ববাদিসম্মত সাক্ষ্য ব্যতীত আমরা কেবলমাত্র ভাষার সাম্য বা জ্ঞাতিত্ব হইতে জাতির সাম্য বা জ্ঞাতিত্বের অনুমান করিতে পারি না। ইতিহাসের সাক্ষ্য না থাকিলে আমরা কখনই অনুমান করিতে পারিতাম না, যে এককালে গল্‌ বা ফ্রান্স্‌ হইতে এক জাতীয় লোক আসিয়া এসিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক সেখানে প্রায় সপ্ত শতাব্দী ধরিয়া গ্যালেতীয় নামক একটী ফরাসী-ভাষা-সম্ভূত ভাষার ব্যবহার করিয়া অবশেষে তুর্কীভাষা অবলম্বন করিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগেই যদি ভাষা ও জাতির গতি-বিধি বিষয়ে এত বিশৃঙ্খলা, তবে অনৈতিহাসিক প্রাচীন যুগে ভাষা-সমূহের তথা জাতি-সমূহের অভিসংক্রম, একত্র সমাবেশ, মিশ্রন, স্থানচ্যুতি ও বিনাশ প্রভৃতির বিবরণ কে বলিয়া দিবে?

যদি কোনও জাতি কোনও ভৌগোলিক

সংস্থানের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অন্য কোন জাতির সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইয়া বহুকাল বাস করে, তাহা হইলে অবশ্য তাহাদের ভাষা অবিমিশ্রভাবে গঠিত হইবে। কিন্তু এরূপ ভাষার বা এরূপ জাতির উদাহরণ জগতে পাওয়া যায় কি না, জানি না। ফলতঃ ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় প্রমাদ-বর্জ্জনের জন্য আমরা (১) দুইটী জাতির মধ্যে আকৃতিগত ও ভাষাগত উভয়বিধ সাদৃশ্য না দেখিতে পাইলে কেবল মাত্র ভাষার সাক্ষ্য হইতে তাহাদের জাতিগত জ্ঞাতিত্বের অনুমান করিতে পারি না; এবং (২) যদি তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য অভ্রান্তভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে ভাষার জ্ঞাতিত্বের অভাব-নিবন্ধন তাহাদের জাতিগত জ্ঞাতিত্বের অপ্রামাণ্য অনুমিত হইবে না।

কেবল যে ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতেই আমরা জানিতে পারি যে একজাতি অন্য জাতির ভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাকৃতিক নিয়ম হইতেও আমরা এটুকু অনুমান করিতে পারি। অবশ্য ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ভাষা মনুষ্যের আকৃতিগত সম্পত্তি নহে, সমাজে অধিগত বিদ্যা। অর্থাৎ গাত্র-ত্বকের বর্ণ, মস্তিষ্কের গঠন, দীর্ঘতার অনুপাত, এবং কেশের প্রকৃতি আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে যে ভাবে জন্ম-মাত্র প্রাপ্ত হই, ভাষা সেরূপ উত্তরাধিকারের বিষয় নহে। জন্মের পূর্ব্বেই শিশুর ভাষা-জ্ঞান জন্মে না, জন্মের পর সে যাহাদিগের কথা শুনে, তাহাদিগেরই ভাষা শিখে। এই জন্যই বাঙ্গালীর শিশু মান্দ্রাজে ভূমিষ্ঠ হইলে তামিল ভাষা শিখিবে। এ বিষয়ে মান্দ্রাজী শিশুর সহিত তাহার কোনও প্রভেদ থাকিবে না। এরূপ স্থলে ভাষার জ্ঞাতিত্ব থাকা বা না থাকার জন্য শিশুর ভাষা-শিক্ষার পক্ষে কোনরূপ সুবিধা বা অসুবিধা ঘটিবে না। প্রাপ্তবয়স্ক যুবা বা প্রৌঢ় ব্যক্তির বাগ্‌যন্ত্র যখন কোনও ভাষা-বিশেষের উচ্চারণে অভ্যস্ত হইয়া যায় তখন তাহার পক্ষে নূতন ভাষার উচ্চারণ শিক্ষা করা অল্পাধিক পরিমাণে কষ্ট-সাধ্য ও সময়-বিশেষে অসম্ভব হইলেও শিশুর পক্ষে তাহা অনায়াস-সাধ্য; কারণ অভ্যাসের দ্বারা তাহার বাগ্‌যন্ত্র কঠোরতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাকে যেভাবে পরিচালিত করিবে, সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়া অভ্যাসের দ্বারা শব্দ-উচ্চারণের শক্তি অর্জ্জন করিবে। সময়ে সময়ে শারীরিক আকারের বিভিন্নতা-বশতঃ বাগ্‌যন্ত্রের গঠনের বিভিন্নতা ও তন্নিবন্ধন উচ্চারিত ধ্বনির আকৃতি-গত (timbre) বিভিন্নতা ঘটে। কিন্তু তাহার ফলে উপভাষার (Dialect) সৃষ্টি হইতে পারে বটে, তবে নূতন ভাষা গ্রহণ অসম্ভব হয় না। উত্তর আমেরিকার ইউরোপীয় অধিবাসিগণের ইংরাজী ও তদ্দেশবাসী নিগ্রোজাতির ইংরাজীতে কেবল-মাত্র উপভাষাত্মক প্রভেদ সঙ্ঘটিত হইয়াছে বটে, তবে উভয় ভাষাই ইংরাজী ভাষা। নিগ্রোজাতির শিশু যদি কেবলমাত্র মাতা-পিতার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ইংরাজী ভাষা-ভাষী ইউরোপীয়গণের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে সে বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী ভাষা শিখিবে। তাহার বাগ্‌যন্ত্রের গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহার ভাষার বিভিন্নতা হইবে না।

মনোবিজ্ঞানের হিসাবে দেখিলেও ইহা

সহজেই প্রতীত হইবে যে (১) **বিভিন্ন** জাতি ভাষা-গঠন বিষয়ে **অভিন্ন** প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে। এইজন্য তুর্কীজাতি ও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে জাতিগত প্রভেদ যথেষ্ট থাকিলেও ভাষার গঠন-বিষয়ে তাহারা অভিন্ন সমাসধর্ম্মিতা agglutination প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে; (২) একই ভাষা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রকার গঠন-প্রণালী অবলম্বন করে—যেমন ইংলণ্ডের প্রাচীন ভাষা Anglo-Saxon সংশ্লেষণ-ধর্ম্মী বা synthetic হইলেও আধুনিক ইংরাজী বিশ্লেষণ-ধর্ম্মী বা analytic; (৩) সর্ব্বপ্রকার ভাষাই মূলতঃ অভিন্ন প্রকার গঠন-কৌশল অবলম্বন করিয়াছে।

যদি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানব জাতি-সমূহের অবিমিশ্র অবস্থার বিবরণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলেই সেই সেই জাতির আদিম ভাষার বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। বিভিন্ন মানব জাতির সৃষ্টির কাল হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত তাহাদের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আবিষ্কারের কোনও সম্ভাবনা থাকিলে হয় ত আমরা দেখিতে পাইতাম যে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। কিছু সে উপায় নাই। আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মানব জাতির সংখ্যা অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতি ভাষার সংখ্যা অনেক বেশী। এবং যদিও শতাধিক বিভিন্ন প্রকৃতির ভাষা এই সমগ্র জগতে পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ধ্বনি-গত ও গঠন-প্রণালী-গত সাদৃশ্য ও পার্থক্য এরূপ জটিল যে মানব জাতির শ্রেণী-বিভাগ-অনুসারে ঐ সকল বিভিন্ন ভাষার শ্রেণী-বিভাগ একেবারেই অসম্ভব। এক প্রকৃতির ভাষার ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন-রীতির বৈষম্যের ফলে এই সকল বিভিন্ন ভাষা সমুদ্ভূত হইয়াছে, না, আরও অধিক সংখ্যক ভাষার পরিণামে নানাবিধ অপচয় ও পরিবর্ত্তনের ফলে এই সমস্ত ভাষা গঠিত হইয়াছে—সে বিষয়ে চিন্তা নিতান্তই নিষ্ফল। ফল কথা, জাতিতত্ত্বে মানবজাতির যে প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, তাহার সহিত ভাষার শ্রেণী-বিভাগের কোন সামঞ্জস্যই নাই।

মানব-জাতি-বিজ্ঞানে (Ethnolgy) মানবের নানাপ্রণালীতে শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে। জগতের মানবগণকে পেশেল (Peschel) সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:—(১) অষ্ট্রেলীয়, (২) পাপুনীয় (Papuan) অর্থাৎ নিগ্রো ও মিলনিসীয়গণ, (৩) মঙ্গোলীয় অর্থাৎ মালয়, ও আমেরিকার আদিম নিবাসী জাতিসমূহ, (৪) দ্রবিড়ীয়, (৫) হটেণ্টট ও বুশমান, (৬) নিগ্রো বা কাফ্রি, এবং (৭) ভূ-মধ্য-সাগরীয় (Mediterranean) অর্থাৎ আর্য্য জাতি, সেমিতিক জাতি ও হেমিতিক জাতি। ফ্লাওয়ার (Flower) সমগ্র মানবজাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—কৃষ্ণ, পীত ও শুভ্র। কিন্তু এই সকল উপায়ে ভাষার শ্রেণী-বিভাগ আদৌ সম্ভবপর নহে। কেশের প্রকৃতি অনুসারে হেকেল (Heckel) নরজাতির যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন, মূলতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়া মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী এবং কেশ ও চর্ম্মের বর্ণ লইয়া হক্সলী

(Huxley) নরজাতির নিম্নরূপ শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন :—

(ক) মসৃণ-কেশী—(Leiotrichi)

(১) গৌরবর্ণ দীর্ঘকপালী * (Leucous dolicho-cephalic) পীতচর্ম্মিগণ (the Xanthochroi) ;

(২) শুভ্র-কৃষ্ণ (Leucomelanous) অর্থাৎ কৃষ্ণকেশ ও শুভ্র ত্বকবিশিষ্ট অসিত-চর্ম্মিগণ (the Melanochroi).

(অ) দীর্ঘ-কপালী (dolicho-cephalic) আইবিরীয়, সেমিতিক, বর্ব্বর প্রভৃতি।

(আ) বিস্তৃত-কপালী (brachy-cephalic) মধ্য-ইউরোপীয়গণ (Rhaetians)।

(৩) পীতকৃষ্ণ (Xantho-melanous) অর্থাৎ পীতত্বক, ও কৃষ্ণকেশ-বিশিষ্ট।

(অ) দীর্ঘ বা মধ্য-কপালী (dolicho-or meso-cephalic)-এস্কিমো, অ্যাস্কিনিসীয় ও আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ।

(আ) বিস্তৃত-কপালী (brachy-cephalic) মঙ্গোলীয়গণ।

(৪) কৃষ্ণকায় দীর্ঘকপালী (Melanous dolicho-cephalic)-অষ্ট্রেলীয় ও দ্রবিড়ীয়গণ।

(খ) রোমশকেশী (Ulotrichi)—

(১) পীতকৃষ্ণ দীর্ঘ-কপালী (Xantho-melanous-dolicho-cephalic) হটেণ্টট ও বুশমান।

(২) কৃষ্ণকায় দীর্ঘকপালী (Melanous-dolicho-cephalic) নিগ্রো, নিগ্রাইটো, পাপুয়ান।

পীত-কৃষ্ণ বিস্তৃত-কপালী মঙ্গোলীয় জাতির কোনও বিশিষ্ট-ধর্ম্মী ভাষা নাই। পীত-চর্ম্মী জাতিসমূহের মধ্যে চীনবাসিগণের ভাষা উচ্চারণ, শব্দসম্পদ ও গঠন-প্রণালী-অনুসারে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে, তাতার, জাপানী, হিন্দু ও টিউটনগণের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। একাক্ষরী অব্যয়ধর্ম্মী স্বরসঙ্কেতী স্থান-বিন্যাসী চীনা ভাষা যে কোনও প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্ত্তমান সমাস-ধর্ম্মী (agglutinating) ভাষা-ভাষী মঙ্গোলীয়দিগের ভাষার অনুরূপ ছিল কি না তাহা কে বলিবে ? যদি শুভ্র-কৃষ্ণ দীর্ঘ-কপালী আইবিরীয়গণ ও শুভ্র-কৃষ্ণ দীর্ঘ-কপালী সেমিতিকগণের মধ্যে জাতিগত অভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়, তবে সর্ব্বনাম-সংযোগী (Pronoun-incorporating) সমাসধর্ম্মী বাস্ক্ ভাষার সহিত ত্রিব্যঞ্জন-ধাতুক অন্তঃ-স্বর-পুষ্ট (Vowel-infixing) বিচিত্রধর্ম্মী সেমিতিক ভাষার সাদৃশ্য কোথায় ? রোমশ কেশী দীর্ঘকপালী কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতি ও মসৃণ-কেশী মধ্যকপালী পীতকায় পলিনীসীয়-গণের মধ্যে জাতিগত কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও ভাষার আকৃতির হিসাবে তাহারা উভয়েই সমাস-ধর্ম্মী (agglutinating) পীতকৃষ্ণ পলিনীসীয়গণের ন্যায় ইংরাজগণ তুল্য-ভাবে ভাষায় বিশ্লেষণ-ধর্ম্মিতার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। চীনা ভাষার ন্যায় ইংরাজী ভাষাও দিন দিন স্থান-বিন্যাসী (Positional) হইয়া পড়িতেছে। আবার স স্থানে হ উচ্চারণ গ্রীস, পারস্য ও নিউজিলণ্ডে সমভাবে প্রচলিত।

---

* কপাল Skull বা মাথার খুলির পরিমাণ-অনুসারে এই সকল নামকরণ হইয়াছে। বিস্তার ও দীর্ঘতা অনুপাত ৭৫:১০০ হইলে দীর্ঘকপালী; ৭৫ অপেক্ষা অধিক ও ৮০ অপেক্ষা ন্যূন হইলে মধ্য-কপালী; এবং ৮০ বা ততোধিক হইলে বিস্তৃত-কপালী বলা হয়।

প-কার ব-কার ও ত-কার দ-কারের উচ্চারণ-বিভ্রাট জর্ম্মণীতে যেমন, পলিনীসীয়াতেও তেমনি। জাতিগতভাবে বিভিন্ন মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে সদৃশ গঠন-প্রণালী ও সদৃশ উচ্চারণ-প্রণালী সমুদ্ভূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং জাতিগতভাবে বিভিন্ন বহু সম্প্রদায়ের লোকে বিভিন্নপ্রকার গঠন-প্রণালী ও বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্ন জাতীয় মানব সম্প্রদায় দিগ্বিজয়-বাসনায় বা উপনিবেশ-স্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ পৃথিবীর নানাস্থানে বিচরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এক জাতীয় লোকের ভাষা অন্য জাতীয় জনগণের মধ্যে বহুবার বহুস্থানে প্রচলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হয় ত আংশিক বা পূর্ণ মাত্রায় জাতি-সঙ্করতা সংঘটিত হইয়াছে। মানবগণের জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ ভাষার প্রকৃতি নাই। ভাষার সাক্ষ্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্যের অনুমান সম্ভবপর। কিন্তু জাতিতত্ত্ব (Ethnology) বিষয়ক কোনও তথ্য ভাষার সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয় না। ভাষার বংশে বহু-কাল-ব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের পরিচয় প্রদান করে; কিন্তু ইহার অধিক আর কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূর্য্যাস্ত

বেগুনি মিশেছে নীলে কমলা-জর্দ্দায়,
মেঘমালা চাদরের একটি ফর্দ্দায়
দুনিয়ার সব রং হাসে, জাফরান
আসমানী তারি পাশে ধূসরের টান,
হিঙ্গুল হলুদ কালো আবীর সিঁদুর
কুসুম ফুলের বৃষ্টি ছেয়ে বহুদূর!
ঝালরের শেষ ধারে গেরুয়ার খেলা,
উদাসী চলেছে ছেড়ে সংসারের মেলা!

গুটানো আছিল দূরে শতরঞ্জখানা,
বিছানো হয়েছে জুড়ে আকাশ-সীমানা,
তারি পরে আকাশের রং-পরী যত
গুলাল কুঙ্কুম ফাগ খেলে অবিরত,
লাল মোলায়েম হল গোলাপী আভায়,
মিলনের পূর্ব্বরাগ স্বপনেতে ভায়,
রংগুড়ি ঝরে' পড়ে' নীলাম্বর হ'তে
রচে কনে-দেখা আলো ধরণীর পথে!

কাজলের মত কালো পরদার আড়ে,
চাঁদমুখ উঁকি দিয়ে যায় বারে বারে,
দিনমণি, দিবসের রাজ-অধিরাজ
কিরণে আলোক-রথ, নাহি সবে ব্যজ,
অরুণ দিলেন ছেড়ে সপ্ত-অশ্ব তাঁর
সপ্ত বর্ণে ছেয়ে গেল আকাশ অপার!
তপন করেন ত্বরা শুদ্ধান্তঃ প্রবেশ,
ফুরাল রংএর খেলা, এল দিন শেষ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

চয়ন

নূতন ব্যায়াম-পদ্ধতি

বাঙালী পিতা লেখাপড়ার দ্বারা সন্তানদের মানসিক উন্নতির চেষ্টা ক'রে থাকেন যথেষ্ট, কিন্তু ব্যায়ামের দ্বারা তাদের দৈহিক উন্নতির চেষ্টা কিছুমাত্র করেন না। তাঁরা জানেন না যে' মনের উপরে দেহের প্রভাব কতটা বেশী!

বাল্যে আর যৌবনে ব্যায়ামের অভাবে বাঙালীর দুর্ব্বল দেহ শীঘ্রই ভেঙে পড়ে। তারপরে আমরা ব্যায়ামের সার্থকতা বুঝি বটে কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও মনে করি যে, এ জীবনে আমাদের ব্যায়াম-চর্চ্চার বয়স পার হয়ে গেছে।

এটা ভুল ধারণা। মানুষের ব্যায়াম চর্চ্চার বয়স কখনোই একেবারে অতীত হয়ে যায় না। য়ুরোপের ব্যায়াম-গুরু বিখ্যাত ডাক্তার ক্রেজিউস্কিই তা প্রমাণিত করেছেন। একচল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম ব্যায়াম সুরু ক'রেও তিনি গায়ের জোরে সকলকে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। খালি তাই নয়, তাঁরই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির গুণে স্যাণ্ডো, প্যাজ উবিনি, পীয়ের বোন্‌স্, বিস্কো, সিজফ্রিড, অ্যাবার্গ, লুরিচ, কচ, ষ্টিন্‌বাচ্ ও হেকেনস্মিথ প্রভৃতি বিশ্বজয়ী পালোয়ানরা আপনাদের দেহ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্যার জেম্‌স্ ক্র্যান্‌টি বিখ্যাত বিলাতী ডাক্তারও সম্প্রতি বলেছেন, "কোন পুরুষ বা নারী যেন মনে না করেন যে, বেশী বয়স হয়েছে ব'লে তাঁদের ব্যায়াম করবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।" এমন কথা ভাবাই ভুল। আমরা বাত ও লাম্বেগো প্রভৃতি পীড়ার জন্যে কষ্ট পাই। উপযোগী ব্যায়ামের অভ্যাস করুন। আপনার বয়স কুড়ি বৎসর কমে যাবে।

স্যার জেম্‌সের পরামর্শে এবং কর্ণেল ক্রাডনের তত্ত্বাবধানে লণ্ডনের "কলেজ অফ আম্বুলান্সে" আজকাল অনেক মাঝবয়সী স্ত্রী-পুরুষ নিয়মিত-ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করেছেন। এই ব্যায়ামাগারে বয়স-সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই।

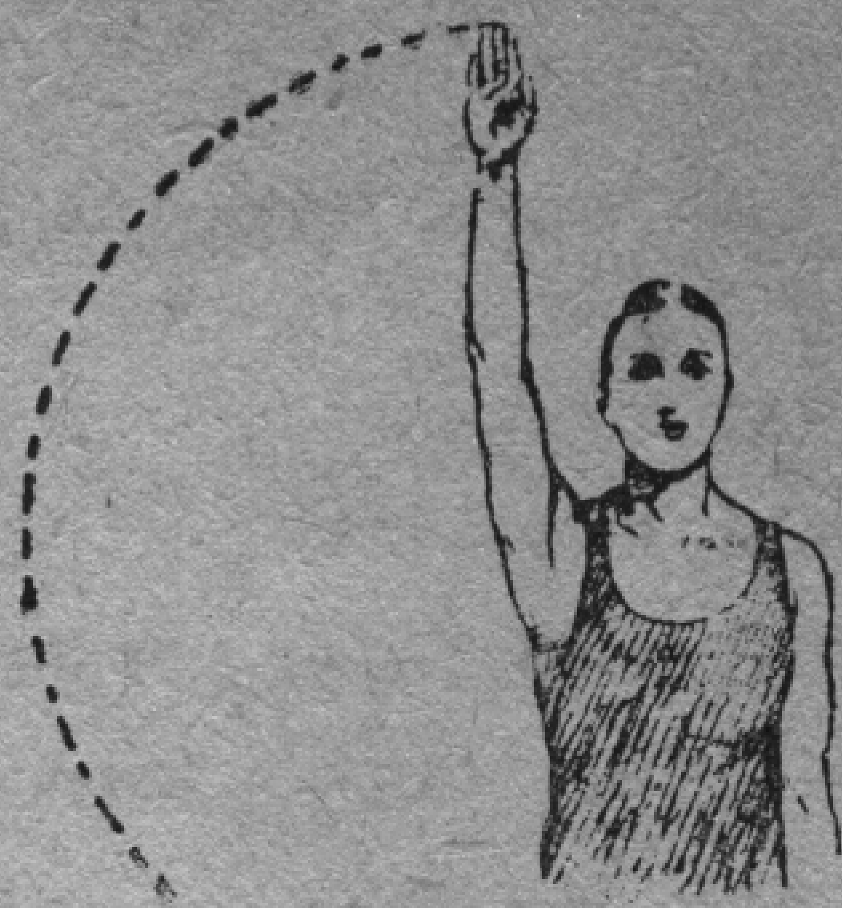
কর্ণেল ক্রেডেনের বয়স সত্তর বৎসর, কিন্তু আজও তিনি যুবকের মতন শক্ত সমর্থ দেহ-চর্চ্চার সম্বন্ধে সম্প্রতি তিনি যে বই লিখেছেন, প্রত্যেকেরই তা পড়ে দেখা উচিত।

তিনি বলেন, "আমার পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, দেহের কোন অঙ্গকেই সামান্যরকম আহত বা ব্যথিত না ক'রে, উপযোগী ব্যায়ামের দ্বারা দেহকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলা। আমরা তাঁর পদ্ধতি থেকে এখানে গুটিকয়েক ব্যায়ামের নিয়ম উদ্ধার ক'রে দিলুম। আপনারা পরখ ক'রে দেখলে উপকৃত হবেন।

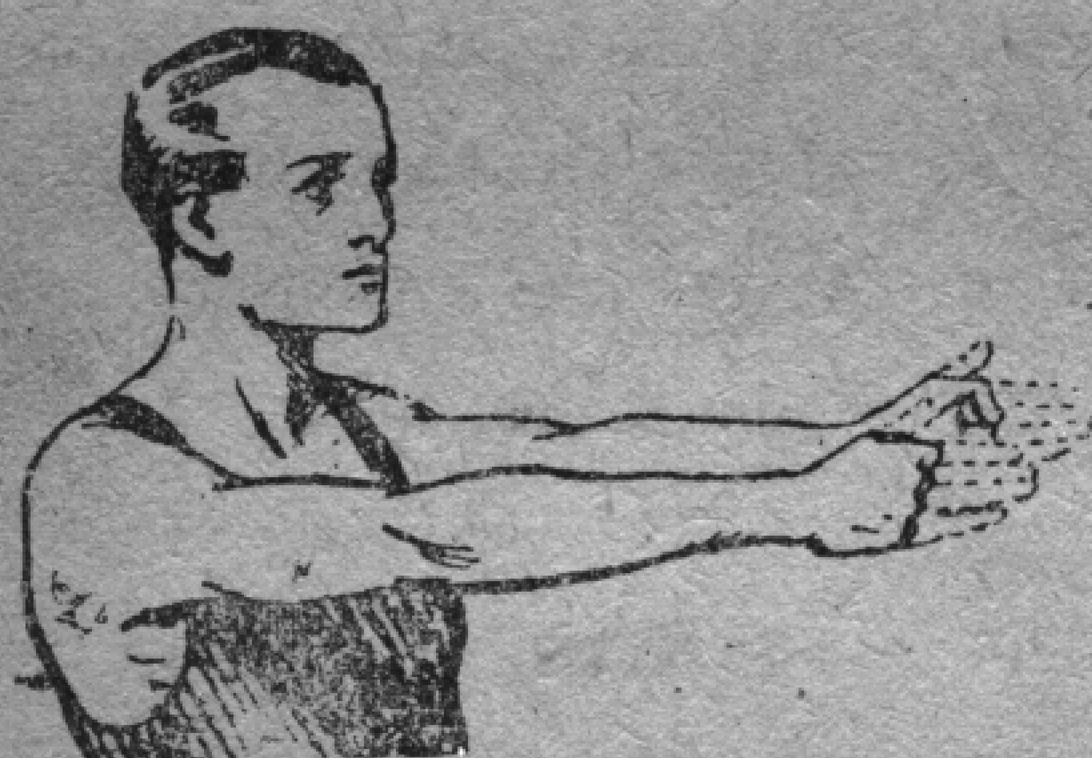
প্রথম ব্যায়াম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাহু দুটি সরলভাবে কাঁধের সঙ্গে সমান রেখে সাম্‌নে বাড়িয়ে দিন। (১ম ছবির মতন) হাতের আঙুলগুলি পরস্পরের গায়ে লেগে



১ম



২য়



৩য়



৪র্থ

থাক্‌বে, ছ'হাতের তালুও পরস্পরের সাম্‌না-সাম্‌নি থাক্‌বে।

বলুন—"এক !" সঙ্গে সঙ্গে ছুইহাতই তাড়া তাড়ি ও শক্তভাবে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে ফেলুন। তারপর বলুন—"ছুই !" সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠা আবার খুলে ফেলুন। এই ব্যায়াম প্রতিদিন যোলোবার করতে হবে।

প্রথম ব্যায়ামের উদ্দেশ্য, আঙুলের গাঁটের ভিতরে রক্ত-চলাচলের সুবিধা ক'রে দেওয়া। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের সন্ধিস্থলে uric crystals জমে গ্রন্থির সৃষ্টি করে, ফলে আঙুল ক্রমে বেটপ হয়ে পড়ে এবং সন্ধিস্থলে বাত, গাউট-বাত ও ফুস্কুড়ি প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। এই ব্যায়ামে এসব মুস্কিলের আসান তো হবেই, তাছাড়া আরো ঢের উপকার আছে।

দ্বিতীয় ব্যায়াম। প্রথম ব্যায়ামের মতই হাত বাড়িয়ে দিন, কিন্তু এবারে মুষ্টি-বদ্ধ ক'রে ছুই মুঠার ভিতরদিক পরস্পরের সাম্‌না-সাম্‌নি থাক্‌বে। "এক" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কর-পৃষ্ঠ ঘুরিয়ে ফেলুন—অর্থাৎ মুঠার ভিতর দিক মাটির দিকে আনুন। "ছুই" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মুঠা ঘুরিয়ে আবার পূর্ব্ব-অবস্থায় আনুন। এ ব্যায়ামও যোলবার করুন। এর দ্বারা হাতের কব্জি শক্ত হবে এবং জরাক্রান্ত লোকের পুরোবাহুর মাংসপেশী আর তার বন্ধনীগুলো আবার আগেকার মতই কার্য্যক্ষম হয়ে উঠবে।

তৃতীয় ব্যায়াম। রক্ষী সৈনিকের মতন সিধে হয়ে দাঁড়ান। হাতদুটি ঝুলিয়ে রাখুন। বাহুর উপরার্দ্ধ দেহের দুইপাশে চেপে রাখুন। —"এক!" দক্ষিণ বাহুর নিম্নার্দ্ধ দেহের সাম্নে ধাঁ ক'রে তুলে ফেলুন। (চতুর্থ ছবি দেখুন)—"দুই!" এবারে দক্ষিণ বাহু নামিয়ে পূর্ব্বাবস্থায় আনুন এবং ঠিক সেই সঙ্গেই বাম বাহুর নিম্নার্দ্ধ তুলে ফেলুন। ষোলোবার এইরকম করুন। এতে হাতের কনুই আর বাহুর উপরার্দ্ধের ব্যায়াম হয়।

চতুর্থ ব্যায়াম। সোজা হয়ে দাঁড়ান। —"এক!" সরল ভাবে দক্ষিণ বাহু মাথার উপরে তুলে ধরুন। এই কাজটি করবার সময়ে দেহকে সম্পূর্ণ স্থির রাখ্তে হবে,—মাথাও যেন একটুও না নড়ে।—"দুই!"—দক্ষিণ বাহু দেহের পাশে নামিয়ে এবং ঠিক সেই সঙ্গে বাম বাহু মাথার উপরে তুলে ফেলুন। (২য়ছবি দেখুন) এম্নি প্রত্যেক বাহু ষোলোবার সঞ্চালন করতে হবে। এতে বাহুর উপরার্দ্ধ, স্কন্ধদেশের ও বুকের ব্যায়াম হয় এবং ঐ-সকল অঙ্গের মাংসপেশীর মধ্যে রক্তচলাচলও বেড়ে ওঠে। এটি হচ্ছে নারীদের পক্ষে একটি চমৎকার ব্যায়াম,—কারণ এতে ক'রে তাঁদের বক্ষের উপরার্দ্ধ নিটোল এবং শীর্ণ ও কর্কশ কণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়েউঠবে।

পঞ্চম ব্যায়াম।—"এক!" কাঁধ না নড়িয়ে, মাথাটি আস্তে আস্তে ডানদিকে নিয়ে যান। (১ম ছবি দেখুন)—"দুই।" মাথা আবার দেহের সাম্নে আনুন। "তিন!" মাথা বাম দিকে ফেরান। "চার!" মাথা দেহের সাম্নে আনুন। এ ব্যায়ামও ষোলোবার করতে হবে। এটি বিশেষ ক'রে গলার ব্যায়াম।

ষষ্ঠ ব্যায়াম। দেহকে সরল রাখুন। —"এক!" মাথাটি পিছন দিকে যতটা পারেন নুইয়ে ফেলুন।—"দুই!" মাথা আবার পূর্ব্বাবস্থায় আনুন। "তিন!" চিবুককে গলার দিকে চেপে মাথা সাম্নের দিকে নুইয়ে ফেলুন।—"চার!" মাথা পূর্ব্বাবস্থায় আনুন। এম্নি ষোলোবার। এতে গলা ও মাথার উপকার হয়।

ভোরবেলায় উঠে, নিত্যক্রিয়া সেরে, খোলা জান্লার সাম্নে দাঁড়িয়ে, একমনে এই ব্যায়ামগুলি করবেন। অন্যমনস্ক ভাবে ব্যায়াম করলে তেমন উপকার হয় না। প্রত্যেক ব্যায়ামের সময়ে স্মরণ রাখ্বেন, কোন্ অঙ্গে মাংসপেশী সঞ্চালিত হচ্ছে। সকালে যাঁদের অসুবিধা হবে, তাঁরা রাত্রে ব্যায়াম করতে পারেন। কিন্তু যখনই ব্যায়াম করুন, একটা সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা চাই, আর ব্যায়ামও নিয়মিত হওয়া চাই। সপ্তাহে একদিন ছুটি।

পাঠকরা যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে আমরা দেহ, স্বাস্থ্য আর ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন উপকারী কথা ভবিষ্যতে প্রকাশ করতে পারি।

স্বপ্ন-বিচরণ

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেকেরই চলা-ফেরা করার অভ্যাস আছে। এ অভ্যাসের বিলাতী নাম "সোম্নাম্বুলিজ্ম্"। মানুষের মনের এ একটা গভীর রহস্য এবং আজও এর কোন একটা হদিস্ পাওয়া যায় নি।

ঘুমন্ত মানুষ কি ক'রে উঠে দরজা

খোলে, অন্ধকারে পথ চিনে যায়, উঁচু পাঁচিলে ওঠে এবং এমন-সব কাজ করে যাতে জাগ্রৎ অবস্থার ইচ্ছাশক্তি আর বিচার-শক্তির দরকার ?

ইচ্ছাশক্তির অস্থায়ী অভাবের নাম দেওয়া হয়েছে, নিদ্রা। কিন্তু যে নিদ্রিত লোক শয্যাত্যাগ করে, জামা-কাপড় পরে এবং বাড়ীর বাইরে যায়, তার যে একেবারেই ইচ্ছাশক্তি নেই, তাই বা কি ক'রে বলা চলে ?

বাইরে থেকে দেখ্‌লে মনে হয় বটে, চলন্ত ঘুমন্ত লোকের সমস্ত সচেতনতা বিলুপ্ত হয়েছে। আপনাকে সে দেখতে পাবে না। তার দৃষ্টি স্থির—সাম্‌নের দিকে প্রসারিত। তার কোন কোন শক্তি জেগে থাকে, আবার কোন কোন শক্তি ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে উঠ্‌লে সে আর মনে কর্‌তে পারে না যে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কি কাজ করেছে।

মনের ভিতরে আমাদের অজ্ঞাতে যে-সব বাসনা গোপন হয়ে থাকে, অনেক সময়ে তার জন্য নিদ্রা-বিচরণের অভ্যাস হয়। দেখা গেছে, একজন লোক ঘুমন্ত অবস্থায় একখানি উপন্যাসের তিন-চার পাতা লিখে ফেলেছে। জেগে উঠে সে আর কলম ধরে নি, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় পাণ্ডুলিপিখানি আবার যখন তার সাম্‌নে ধরা হোলো, সেও অমনি তার অসমাপ্ত লেখা আবার লিখতে সুরু ক'রে দিলে !

সাধারণতঃ স্বপ্ন-বিচরণ একরকম 'ডিলিরিয়ামে'রই ফল, মানসিক দুশ্চিন্তায় তার উৎপত্তি। ষাঁড়ের আক্রমণে ভয় পেয়ে একটি স্ত্রীলোকের কয়েকদিন ধ'রে স্বপ্ন-বিচরণ রোগ হয়েছিল। ঘুমিয়ে সে ষাঁড়ের মতন ডাকৃত এবং লোককে আক্রমণ কর্‌তে যেত। কিন্তু জেগে উঠে সে-সব কথা তার আর কিছুই মনে থাক্‌ত না।

অনেক স্বপ্নচর নর-নারী অনায়াসেই ঘুমিয়ে উঁচু উঁচু সরু পাঁচিল নিরাপদে পার হয়ে যায়। এ-রকম স্বপ্ন-বিচরণের অভ্যাস কেবল রাত্রেই দেখা যায় এবং অনেকের এই অবস্থা আবার কয়েকদিন স্থায়ীও হয়। এই অবস্থার নাম "fugue" (উচ্চারণ "ফিউগ")।

এম্‌নি অবস্থায় একজন স্ত্রীলোক লিখ্‌তে না জেনেও লিখ্‌তে পেরেছিল। খুব শৈশবে সে লিখ্‌তে জান্‌ত বটে, কিন্তু তারপর ত্রিশবৎসর আর কালি-কলম না ছুঁয়ে লেখার কায়দা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। এত দিন পরে স্বপ্নে সে তার শৈশব-শক্তিকে আবার নূতন ক'রে লাভ করেছিল! ফিউ-গের মহিমায় কত লোক দেশ ছেড়ে সুদূর বিদেশে গিয়ে পড়েছে, তারপর ক্ষুধ-তৃষ্ণায় জেগে উঠে নিজেকে এক অচেনা জায়গায় দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে !

স্বপ্ন-বিচরণের অভ্যাসটা সময়ে সময়ে বংশ-গত হয়। একই পরিবারে দুই বা তিনজন স্বপ্নচারীকে দেখা গিয়েছে। ভীরু সন্তানদের সাবধানে মানুষ না করলে, রাত্রে তারা ভয় পেতে বা স্বপ্নচারী হ'তে পারে। ঘুমিয়ে কথা কওয়া, স্বপ্ন-বিচরণের চেয়ে সাধারণ ব্যাপার। এ-শ্রেণীর অনেক লোক দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে জেগে ওঠে,—নিজের গলার আওয়াজেই ভয়াকুল হয়ে !

নারী-মনোবিজ্ঞান

আপনারা আজকাল খবরের কাগজে নারী-হন্তা লান্দ্রুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। লান্দ্রু জাতে ফরাসী। এখনো তার বিচার চল্‌ছে।

কিন্তু সে যে খুনী তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। সে পরে পরে এগারো-জন সুন্দরী যুবতীকে প্রেমে ভুলিয়ে বিবাহ না করে হত্যা করেছে! তাছাড়া আজ এই হত্যাপরাধের আসামী হয়েও অনেক ভদ্র মেয়েদের কাছ থেকে সে বিবাহের প্রস্তাব লাভ করছে! অথচ এই বিবাহ-প্রার্থিনী নারীর দল তাকে চোখেও কখনো দেখে-নি—আর খবরের কাগজে তার গুণের ইতিহাসও যা পড়েছে, তা এত ভয়ানক যে শুন্‌লেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

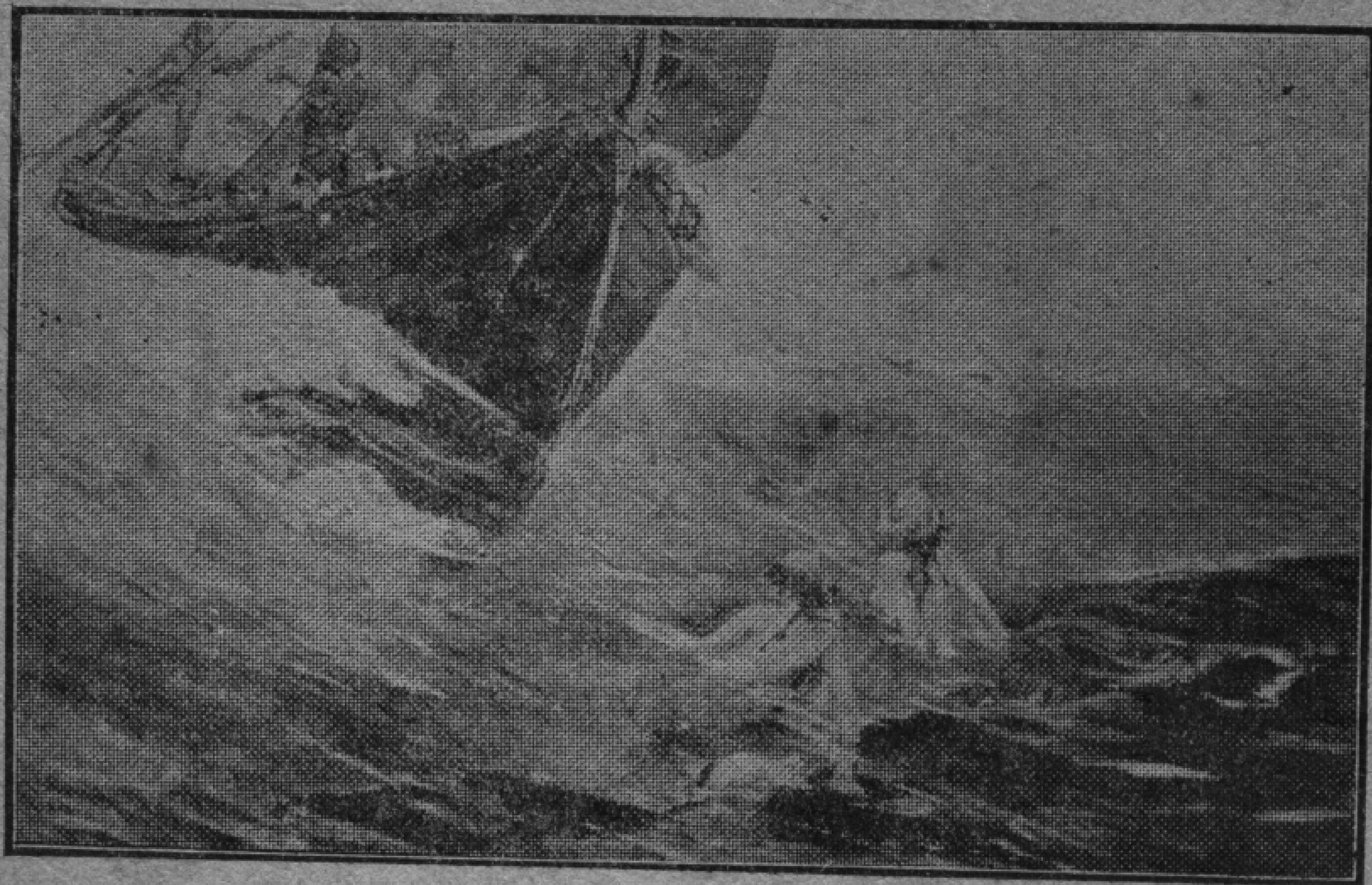
লান্দ্রুর বয়স হয়েছে ঢের—এমন-কি তাকে বুড়ো বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। তার চেহারাও ভালো তো নয়ই, বরং কুৎসিত। তবে মেয়েদের উপরে তার এই অসাধারণ প্রভুত্বের কারণ কি? মেয়েরা তার বয়স দেখে না, তার রূপ-গুণ বাছে না,—সে যে এগারোটি মেয়েকে খুন করেছে —এ খবরেও লান্দ্রুর উপরে তাদের বিরাগ হয়নি!

খালি লান্দ্রু ব'লে নয়,—পৃথিবীর আরো অনেক পাপিষ্ঠ, ধার্ম্মিক-নারীদের উপরে অসীম প্রভুত্ব বিস্তার কর্‌তে পেরেছে। তবে কি বলতে হবে যে, পাপিষ্ঠদের এমন এক বিশেষ শক্তি আছে, যার মহিমায় স্ত্রীলোকেরা না ভুলে থাকতে পারে না?

যে-সব পুরুষকে নারী-শিকারী বলা হয়, তারা নিশ্চয়ই মেয়েদের কোন সাধারণ দুর্ব্বলতার ছিদ্র দিয়ে তাদের মনের ভিতরে প্রবেশ করে। মেয়েরাও এই ভেবে ভ্রমে পড়ে যে, এতদিনে তারা মরমের যথার্থ মরমীর সন্ধান পেয়েছে। ফলে প্রতারকদের পশুত্ব আর রূপহীনতাকে আমোলে না এনে নারীরা নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ করে।

হত্যাকারী পামারের কথাই ধরুন। তার দেহ ও মন দুইই ঘৃণ্য ছিল। কোন জায়গায় সে কাজ পর্য্যন্ত কর্‌তে পারেনি; যেখানেই গেছে, চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু এমন যার চেহারা আর স্বভাব, ভদ্রবংশের সুশিক্ষিতা এক সুন্দরী যুবতী তাকেও স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছিলেন। খালি বিবাহ নয়, স্বামীকে তিনি প্রাণ-মন দিয়ে ভালোও বাসতেন। কিন্তু পাষণ্ড পামার পনেরো হাজার টাকায় তার স্ত্রীর জীবন বিমা করিয়ে, সেই টাকাটা তাড়াতাড়ি আদায়ের জন্যে বিষ খাইয়ে স্ত্রীকে মেরে ফেলেছিল।

জর্জ চ্যাপম্যানও বড় যে-সে লোক নয়। পরে পরে তিন-তিনটি যুবতী তাকে বিশ্বাস ক'রে বিবাহ করেছিল, কিন্তু চ্যাপম্যানের হাতে তিনজনেই নিহত হয়।



মৎস্য-নারী—কাল্পনিক

মৎস্য-নারীর কাহিনী আমরা কবিতায় আর রূপকথায় বরাবর শুনে আসছি। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই কেউ কখনো চক্ষে দেখ্‌তে পাই নি।

তবু অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, মৎস্য নর বা নারীর কল্পনা কাব্যের মহিমায় অতিরঞ্জিত হ'লেও, হয়তো এই শ্রেণীর জীব সত্য-সত্যই পাতাল-পুরের



মৎস্য-নারী—বাস্তবিক

গভীর রহস্যের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে। তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

ইতালীর কাছে বার্‌গেগি দ্বীপের পাশে একজন জেলে একটি অদ্ভুত আকারের সামুদ্রিক জীব ধরেছিল। মাথা থেকে ল্যাজ পর্য্যন্ত সেটি প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা। তার দেহের আধখানা মানুষের মত এবং আর-আধখানা মাছের মতন।

গায়ের আঁশগুলো হল্‌দে থেকে ক্রমে গভীর পিঙ্গল ও সবুজ রঙে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যে অংশটা মানুষের মতন দেখতে, তার কোথাও চুল বা রোঁয়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই! মাথার পিছনদিকে বলি-রেখা আছে এবং পাঁজ্‌রার হাড়গুলোও যথেষ্ট স্পষ্ট। মুখ-মণ্ডল যার-পর-নাই কুৎসিত। চোখ আর মুখ অতিরিক্ত রকমের বড়। দাঁতগুলো ছোট ছোট, মাছের দাঁতের মত। প্রত্যেক হাতে পাঁচটা ক'রে আঙুল, এবং সব আঙুলেই নখ আছে। দেহের তুলনায় বাহুটি বানরের মতন লম্বা। এর নাম দেওয়া হয়েছে, মৎস্য-নারী। কিন্তু খুব-সম্ভব এটি মৎস্য-নর বা মৎস্য-শিশু। যাই হোক্, এর চেহারা দেখলে কবির কল্পনা যে উচ্ছ্বসিত হবেনা, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই!

ছুটি বেয়াড়া রীতি

নারী দুর্ব্বল ব'লে, বিধবা হ'লে আমরা তাদের উপরে অত্যাচারের মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে তুলি। স্ত্রী মারা গেলে পুরুষ দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে, তুড়ির তালে টপ্পা গেয়ে বেড়াবে এবং প্রথম সুযোগেই আবার বিয়ে করবে, কিন্তু স্বামী মার



উল্কির গোঁফ

গেলে বালিকা-স্ত্রীকেও সমস্ত সাজ-পোষাক ফেলে দিয়ে ভূমিশয্যায় আশ্রয় নিয়ে, শুভ-উৎসবের ক্ষেত্র থেকে নির্ব্বাসিতা হয়ে, একাদশীর দিনে জলবিন্দুটি পর্য্যন্ত পান করতে পাবে না। এ-সব অত্যাচার আদিম বর্ব্বরতার যুগেই সম্ভব এবং এখনো কেবল মাত্র অসভ্য জাতিদের মধ্যেই এই ধরণের নিয়ম বর্ত্তমান আছে। যেমন অষ্ট্রেলিয়ার লারাকিয়া নামে অসভ্য জাতের মেয়েরা। বিধবা হ'লে তাদের দেহকে নানারকমে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে রাখা হয়। সে সব ক্ষতের দৃশ্য ভয়ানক। কেউ কেউ খরধার অস্ত্র চালিয়ে পৃষ্ঠদেশে অসংখ্য মাংস-পিণ্ডের মতন ক্ষতচিহ্ন ক্ষোদন ক'রে রাখে। আমরা এই শ্রেণীর একটি বৈধব্য-চিহ্নের ছবি এখানে দিলুম।



বিচিত্র বৈধব্য চিহ্ন

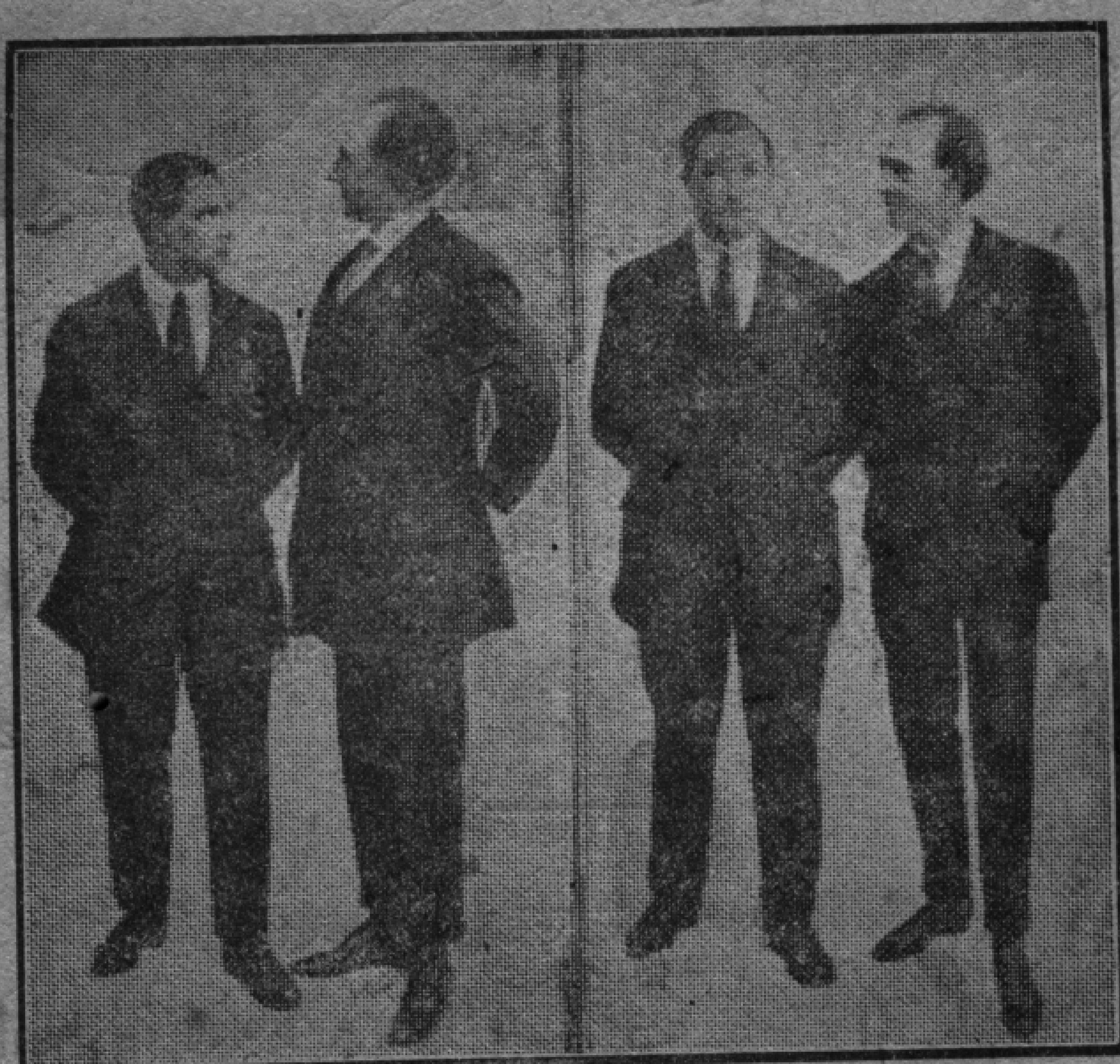
জাপানের "আইনু" জাতের মেয়েদের মধ্যে পুরুষের খাম-খেয়ালে বিশ্রী এক নিয়মের চলন হয়েছে। মেয়েদের বয়স বছর দুই হ'লেই তাদের প্রত্যেকের ওষ্ঠাধর এবং তার উপরেও—ঠোঁট ও নাকের মাঝখানে যাতনা-দায়ক এক-এক উল্কির দাগ দেগে দেওয়া হয়। তাতে তাদের ঠোঁট তো কালো হয়ে যায় বটেই,—বেশীর ভাগ নাকের তলাতেও এক-একটি নকল গোঁফের ছবি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। যে-মেয়ের মুখে এমনধারা উল্কি নেই, পুরুষরা তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না। "আইনু" মেয়েরা বাঙালীর মেয়েদের চেয়েও পরাধীন। তারা খালি নিজেদের রূপের উপরেই অত্যাচার সহ্য করে না,—তাদের সমস্ত জীবনই পুরুষের পায়ের তলায় দাসত্বের ও পশুত্বের জীবন, কেবল মাত্র নামেই তারা মানুষ!

খুসিমত ঢ্যাঙা হওয়া

বাইবেলে আছে, Can a man by taking thought add a cub to his stature ?

এ প্রশ্ন অনেকদিনের; তবু আজ পর্য্যন্ত এর জবাবে লোকে বলবে, "না"। হিব্রু কিউবিটের পরিমাণ আঠারো ইঞ্চির কম নয়! ফস্‌ ক'রে লম্বায় আঠারো ইঞ্চি বেড়ে ওঠা কি মুখের কথা!

কিন্তু বিলাতের বিখ্যাত যাদুকর মিঃ আর্থার কার্লটন ফিল্পস্‌, আপনার দেহের দীর্ঘতা আঠারো ইঞ্চি না হোক, সাত থেকে আট ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িয়ে তুলতে পারেন! আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন, এখানে নিশ্চয়ই বাজিকরের কোন ছল-চালাকি আছে। কিন্তু এর মধ্যে সত্যসত্যই চোখে ধূলো দেবার কোন চেষ্টা নাই। কার্লটন ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা নিজের হাঁটু, কোমর, বুক, গলা আর দেহের অন্যান্য অংশের মাংসপেশী বাড়িয়ে তুলে এই অসাধ্য সাধন ক'রে থাকেন। আপনার চোখের সাম্‌নেই দেখ্‌তে দেখতে তিনি বেড়ে উঠ্‌বেন। কার্লটনের বাড়ীতে একবার উইলার্ড নামে এক আমেরিকান এসেছিলেন। তিনিই প্রথমে নিজের দেহ-বর্দ্ধন ক'রে কার্লটনের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেন। কার্লটন সেই লোকটির কাছ থেকেই দেহ বাড়াবার এই কায়দাটি শিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু যাদু-বিদ্যাই কার্লটনের জীবিকা হ'লেও, এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটি তিনি সর্ব্বসাধারণকে দেখান না। কারণ তিনি



ডানদিকে কার্লটনের সহজ অবস্থার মূর্ত্তি। বামদিকের ছবিতে তিনি মাথায় বেড়ে উঠেচেন।

বলেন, এতে তাঁর দেহের নাকি অনিষ্ট হয়। একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা কার্লটনের এই শক্তি দেখে বলেছিলেন, "ভাগ্যে চোর ছ্যাঁচাড়রা দেহ বাড়াবার এই কায়দাটি জানে না! তাহলে তাদের সনাক্ত করতে কি মুস্কিলেই পড়তে হোতো!"

ঠুঁটো টম

আপনি যদি হাত থেকে বঞ্চিত হন: তাহ'লে কি করেন? নিশ্চয়ই খুব দুঃখিত হন! কিন্তু বিলাতের টম ক্ল্যাক এ-হেন দশাতেও একটুও মুখ-ভার ক'রে থাকে না। জন্মাবধি হস্তহীন, অর্থাৎ ঠুঁটো হয়েও সে অক্ষমের মত বসে নেই। দুই বাহুর গোড়া দিয়ে কলম, পেন্সিল বা তুলি ধ'রে সে এমন খাসা খাসা ছবি এঁকেছে যে, মোটে চৌদ্দ বৎসর বয়সে London County Council থেকে আর্ট-স্কলারসিপ লাভ করেছে। ব্যঙ্গ-চিত্রেও তার দক্ষতা আশ্চর্য্য। খেলা-ধূলাতেও উৎসাহ তার কম নয়। টম খালি খেলা দেখে বা খেলার গল্প ক'রেই তুষ্ট নয়, ফুটবল, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ (যদিও তার মুষ্টি নেই)—এমন-কি ক্রিকেটেও সে রীতিমত নাম কিনেছে। শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবেন, দু বাহু দিয়ে হাতল চেপে ধরে সে এত জোরে সাইকেল চালাতে পারে যে, অন্যের পক্ষে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই শক্ত হয়ে ওঠে। এই অল্প বয়সেই হাস্যরসিক বক্তা ব'লেও সে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। বাহাদুর টম ক্ল্যাক্‌, সাবাস!



টমের আঁকা মূর্ত্তি-চিত্র

প্রসাদ রায়।

সাঞ্চী ও উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য

উড়িষ্যার শিল্পকলা প্রসঙ্গে মাথুর (মাথুর প্রদেশের) ভাস্কর্য্যের আলোচনা-কালে, আমরা সাঞ্চী ও বরাহতের মৌলিক ও অবিমিশ্র ভারতীয় শিল্পধারা হইতে তত্রস্থ গঠনশিল্পে শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি বটে, কিন্তু উড়িষ্যার শিল্পের সহিত উহার যে কি সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে কোন বিশেষজ্ঞের মত ব্যক্ত করিবার অবসর পাই

নাই। ভৌতিক জীবনে যেরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, শিল্পেরও সেইরূপ আকার-গত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। একই আকৃতিতে উদ্বর্ত্তনের শেষ হয় না পরন্তু জীব-ধারার বিভিন্ন স্তরে উহা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়; প্রকৃত শিল্পও সেইরূপ অতীতের সহিত একেবারে সম্পর্ক-বিহীন নহে—উহা ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিক পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া আকারগত বিভিন্নতা লাভ করে মাত্র। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হেভেল কোনারকের সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত সাঞ্চীতে প্রাপ্ত একটি শীর্ষবিহীন বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, "উভয় মূর্ত্তিই ভারতীয় শিল্প-রীতিপরম্পরার অপূর্ব্ব অবিচ্ছিন্নতার (continuity) পরিচায়ক। যদিও মূর্ত্তি দুইটীর নির্ম্মাণ-কালের মধ্যে অন্ততঃ নয় শতাব্দীর ব্যবধান রহিয়াছে, তথাপি উভয়ের এরূপ পারিপাট্য-সাদৃশ্য যে উভয়ই একই যুগের একই শিল্পমতে দীক্ষিত শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। যেটুকু বৈলক্ষণ্য, তাহা কেবল মুরত দুইটীর ভঙ্গীতে। সূর্য্যমূর্ত্তির ব্যগ্র কর্ম্মনিরত ভঙ্গীটি ধৃতনভোমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডায়মান ভঙ্গির সহিতই তুলনীয়—নিখিল জগতের ধর্ম্মনীতি-শিক্ষয়িতা বুদ্ধদেবের সে গম্ভীর স্থৈর্য্য ইহাতে নাই।"

ভারতীয় শিল্প-বিষয়ে শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয়ের মত উপেক্ষণীয় নহে, তাই আমরা তাঁহার এ উক্তি সাদরে উল্লেখ করিলাম।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

শিশু-শিক্ষার নতুন ধারা

শিক্ষা আমাদের দেশের ছেলেদের কাছে যে বিভীষিকাময় মূর্ত্তি ধরে এসে দাঁড়ায়, তাতে ফল আর যাই হোক, শিক্ষা এবং শিক্ষকের উপর আমাদের আন্তরিক টানের যে অনেকখানি অভাব হয়, তা কেউ অস্বীকার কর্ব্বেন না। ইউরোপ আর আমেরিকা এই সহজ কথাটা বুঝতে পেরেছে—রক্ষণশীল দলের রাজা জনবুলও আজ "শাস্তি না দিলে ছেলে ভাল হয় না" এই শাস্ত্রবাক্যের সত্যতায় সন্দিহান হয়ে উঠেছে। ইউরোপে তাই আজ শিশুশিক্ষায় নতুন ধারা প্রবর্ত্তিত হচ্ছে।

ইউরোপে আজকাল অনেক স্কুলে ক্লাস-শাসন মাষ্টার মশাই করেন না—শাসন-দণ্ড সেখানে ছেলেদের হাতে। ছেলেরা যে নিজেদের স্কুল নিজেরা শাসন কর্ব্বে, এ অনেকে খুব ভাল মনে কর্ব্বেন না। তাঁরা এমন-কোন স্কুলের 'সুশাসন' সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠবেন—এবং ছেলেরা যে 'ধিঙ্গি' হয়ে উঠবে না, তা বিশ্বাস কর্ত্তে চাইবেন না। কিন্তু এই 'স্বরাজ' ইউরোপের অনেক ইস্কুলই লাভ করেছে এবং সে-সব স্কুল বেশ ভাল ফলই দেখিয়েছে। লণ্ডনের একটা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ই, এ, ক্রাডক্ মহাশয় তাঁদের স্কুলের 'স্ব-শাসনে'র কথায় বলেছেন, যে সেই স্কুলের শিক্ষার ভার শুধু শিক্ষকদের উপরে রেখে আর সমস্ত ভার ছেলেদের নির্ব্বাচিত একটা কমিটির হাতে দেওয়া হয়।

সেই কমিটি ক্লাস শাসন করে, বাড়ীতে তৈরী কর্ব্বার জন্যে পড়া নির্ব্বাচন করে দ্যায়, বাড়ীতে করা কাজের পরীক্ষা পর্য্যন্ত নেয়। প্রথম প্রথম এতে ছেলেদের একটু অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা গেল। একবার ছেলেরা বাড়ীর জন্যে দেওয়া ফ্রেঞ্চ পড়া পরদিন লিখে পরীক্ষা কর্ব্বার বন্দোবস্ত করে। দু'জন ছেলে সেই পড়া করে না এবং পরীক্ষাতে চল্লিশের কম নম্বর পায়। একশ'র মধ্যে চল্লিশ না পেলে পাশ নয়। তাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা কর্ত্তে মাষ্টার মশায় রাজী হলেন না। কারণ ওটা ছেলেদের জুরিস্‌ডিক্‌শন, তখন ছেলেদের কমিটি থেকেই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হল। কমিটি আদেশ করলে যে সেই ছেলে দুটো যে ফ্রেঞ্চ ক্রিয়াগুলো শিখে আসে নি, সেগুলো বাড়ী থেকে দুবার করে লিখে এনে পরদিন দেখাবে। পরদিন দেখা গেল যে তারা কমিটির আদেশ পালন করে নি। সেদিন কমিটি থেকে তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দেওয়া হল, কিন্তু তাতেও যখন তারা কিছু কাজ কল্লে না, তখন স্থির করা হল যে তাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য জুরী ডেকে আলোচনা করে স্থির করা হবে। সেদিন তাদের দুষ্কৃতি প্রকাশ করে এক নোটীশ প্রচার করা হল যে পরদিন বারোজন ছেলে-জুরী তাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর্ব্বে।

এ সমস্তের ফলে এই হল যে ছেলেরা তাদের এক-ঘরে করে রাখ্‌বে, শেষে তারা শাস্তি গ্রহণ করলে, তার পর থেকে আর কোনদিন এরকম অবাধ্যতা হয়নি এবং এই প্রণালী খুব সফল হল।

আর কতকগুলো স্কুলে—কতকগুলো মেয়ে-স্কুলেও—এই স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা আরও উন্নতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। টিপট্রি হল নামে এক স্কুল শ্রীযুক্ত নরম্যান ম্যাকমানের স্থাপিত। শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীরা বল্লে, আমরা যা বুঝি, এ স্কুলে তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ছেলেরাই এখানকার পড়ার এবং খেলার সময় নির্দ্দেশ করে। এই ছাত্র-শাসিত স্কুলের উপদেষ্টা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌মান। কোন কঠিন ব্যাপারে মাত্র তিনি উপদেশ দেন। এই ছাত্র-সঙ্ঘ যে শুধু নিজেদের শাসনই করে, তা নয়; তারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক।

এই যে শিশু-শিক্ষার নতুন ধারা, এতে শিশুশিক্ষাকে যতদূর সম্ভব পরিণতদের কঠিন নিগড় থেকে মুক্ত কর্ব্বার চেষ্টা হচ্ছে। শিশুর নিজেদের ব্যক্তিত্বকে নিজেরাই পরিস্ফুট করে তুলুক, এ ধারার এই মন্ত্র। কেমব্রিজের পার্স স্কুলে ছোট ছেলেদের এই প্রথায় গড়ে তোলায় তাদের এমন কবিত্ব-শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়েচে, যে তাদের কবিতা ভাল ভাল সমালোচকদের মুগ্ধ করে দিয়েছে, এই শিশু কবিরা অলৌকিক বা অসাধারণ নয়; তারা সাধারণ সুস্থ সবল শিশু। এই কবিতা তাদের স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠ্‌বার ফল।

ইটালিয়ান মহিলা ডাঃ মন্টিসরীর শিক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষক এবং কতক পরিমাণে সাধারণের মধ্যেও খ্যাতি লাভ করেছে। ডাঃ মেরিয়া মন্টিশরীর পদ্ধতিতে ছেলেদের কিছু শিখিয়ে দেওয়া হয় না—তারা নিজে নিজে শিখে নেয়। মন্টিসরী স্কুলে কোন শিক্ষক নেই। সেখানে একজন পরিচালিকা আছে মাত্র।

সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে আজকালকার শিক্ষা ছেলেদের উপর কর্ত্তৃত্বের ভার ছেড়ে দিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান কর্ত্তে শিখেছে। আজকালকার শিক্ষা-পদ্ধতি ছেলেদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে বেড়ে ওঠবার সুযোগ দেয়, তাদের শিক্ষকদের ঢালা ছাঁচে গড়ে তোলবার জন্য বেত্র আস্ফালন এবং চোখ গরম করে না।

আমাদের ছেলেরা সেই হাতে-খড়ির দিন থেকে যাঁদের শৈশবের স্বপ্নময় রাজত্বের দৈত্য বলে ভয় করে আসে, তাঁরা এ সব বিষয়ে বেশী কিছু চিন্তা কল্লছেন কি?

শ্রীসোমনাথ সাহা।

বর্ষা-মিলন

বাহিরে ঝরঝরে আকুল জলধারা,
শাঙন ঘন মেঘে উজল রবি হারা,
এমন বরিষণে
আজিকে প্রিয়া-সনে
মিশিতে প্রাণে-মনে
আকুলি' উঠে প্রাণ।
আজিকে বুকে বুকে দোঁহায় ঘিরে রাখা,
দোঁহার মুখে মুখে অধর পিয়ে থাকা,
দোঁহায় নিরজনে
নীরব আলাপনে
আবেশ-ঘুম-সনে
দোঁহাতে দোঁহে দান।
ঝলকি' শোনা যায় জলের ঝরঝরি,
উতল বায়ু-সাথে পাতার মরমরি,
শাঙন ঘন ছায়া
রচিছে ঘোর মায়া,
মোদের দুটি কায়া
নিবিড়ে মিশে যায়।
তটিনী ছুটে যায় উছল ভরা প্রাণে,
পুকুরে বারিখানি উপছে কানে কানে,
মোদের দুটি বুকে
অধীর প্রেম সুখে
উপছি 'সব দুখে
ভরিয়া উথলায়।
গুমরি' যত ওঠে শাঙন কালো মেঘ
আকুলি' যত নামে অঝোর জল-বেগ,
ততই মোরা ছুটি
শতেক বাধা টুটি'
দোঁহায় দোঁহে লুটি
ব্যাকুল বেদনায়।
কেবল চুমে' চুমে' অমিয়া পিয়ে থাকি,
কেবল ঘন ঘন দোঁহায় বুকে ঢাকি,
কেবল যেচে নেওয়া,
কেবল সেধে দেওয়া,
কেবল মিশে যাওয়া,
বিলানো আপনায়।
আজিকে ভরা ধরা,
ছায়া সে ঘুম-ভরা,
কেবল তৃষা-হরা
হিয়াতে হিয়া দান।
আজিকে বরিষণে
কেবল প্রিয়া-সনে
নিবিড়ে প্রাণে-মনে
মিশিতে চাহে প্রাণ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

আঁধি

শাশুড়ীর কথায় চট্ করিয়া সুষমাকে না লইতে পারিলেও, কথাটা কয়মাস দিনরাত অভয়াশঙ্করের মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ তুলিল। নানা-ভাবে বিষয়টাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন কি লাভ-লোকসানের হিসাবটাকেও বেশ করিয়া খতাইয়া শেষে তিনমাস পরে সুষমাকে হঠাৎ তিনি বিবাহ করিয়া বসিলেন।

বিবাহ করিয়া সুষমাকে লইয়া অভয়াশঙ্কর যেদিন গৃহে ফিরিলেন, সেদিন বাড়ীতে জ্ঞাতি-কুটুম্বিনী-মহলে অসন্তোষের একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। এতদিন নির্ব্বিবাদে নিঝঞ্ঝাটে এত-বড় সংসারটায় অবাধ কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া আসিয়া আজ হঠাৎ এই কোথাকার এক সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন বিয়ে-করা ধেড়ে বৌয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে! মানুষের শরীরে এ অপমান সত্যই সহ্য হয় না! তাই অপরাহ্নে সুষমা যখন দোতলার ঘরের সম্মুখে খোলা ছাদ হইতে নিখিলের কাপড়-চোপড়গুলাকে রৌদ্রে দেওয়ার পর ঝাড়িয়া পাট করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছিল, তখন তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া ঠিক নীচেকার রোয়াকে মেয়ে-মজলিসের চড়া গলায় কড়া রকমের মন্তব্য চলিতেছিল।

একজন বলিলেন,—সৎমা করবে ছেলে মানুষ! কথায় বলে, সৎমা, সতীন-পো না সতীনের কাঁটা—! ওদের আর কি? সব ঠাটই বজায় হল—তবে যেতে ঐ ছোঁড়াটাই জন্মের মত ভেসে গেল! আর-একজন বলিলেন,—তা না ত কি! তার উপর শিখিয়ে-পড়িয়ে মানিয়ে-বুনিয়ে যে নেব, তারও তো জো নেই, দিদি। একেবারে ধাড়ী বৌ,—ধুম্‌সো মাগী বললেই চলে! তবে'গে আমাদের একবার ঘুণাক্ষরেও জানানো হল না! কেন বাপু, আমরা কি মানা করতুম, না বাধা দিতুম! এমনি করিয়া মন্তব্যের সুর চড়া হইতে ক্রমশঃ আরো চড়া পর্দ্দায় উঠিতেছিল।—সুষমা জোর করিয়া মনটাকে সেদিক হইতে সরাইয়া লইলেও, কাণ তাহার অবাধে এই বিষ পান করিতেছিল। সতীন-পো না, সতীনের কাঁটা! কথাটা শুনিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এমনিই মানুষের মন! হায় রে, কেন, সতীন-পো বলিয়াই বা ভাবো কেন? সে ত স্বামীরই ছেলে! এটাই বা কেন মনে হয় না!

সন্ধ্যার পর গা ধুইয়া কাচা কাপড় পরিয়া সুষমা নিখিলকে লইয়া ছাদে বসিয়াছিল সে গল্প বলিতেছিল, আর নিখিল নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিল! এমন সময় নীচে হইতে মানদা ঠাকুরাণী আসিয়া নিখিলকে ডাকিলেন,—এসো দাদা, রান্না হয়েছে,—খাইয়ে দিই গে, এসো। তাঁহার আগমনে গল্পটা বন্ধ হইল। মানদা ঠাকুরাণীও এই যে-জীবটি বসিয়া আছে, তাহার পানে লক্ষ্যও করিলেন না, গ্রাহ্য করা দূরের কথা! গল্প বন্ধ হওয়ায় বিরক্ত হইয়া নিখিল বলিল—না, আমি মার কাছে খাব। মা আমায় খাইয়ে দেবে। এইখানে খাবার দিয়ে যেতে বল।

মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন,—ছি দাদা, এসো আমার সঙ্গে। বায়না করে না!

নিখিল বলিল—না, আমি তোমার হাতে খাব না, যে নোংরা হাত তোমার! আমায় মা খাইয়ে দেবে, বলচি—না, তবু—।

সুষমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—ছি বাবা, গুরুজন হন, গুরুজনকে মন্দ কথা বলতে আছে কি!

মানদা ঠাকুরাণী অপ্রসন্ন চিত্তে বলিলেন,—খাও তবে দাদা, খাও, মার রাঙা হাতেই খাও। তারপর বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন—অত যার দরদ বেশী, তারে বলে সেই যে কি—দেখো গো নতুন বৌমা, ছেলেটিকে একেবারে যেন কেড়ে নিয়ো না! ওর ধাত-টাত আমরা যেমন বুঝি, তেমন কি আর নতুন মানুষ, কালকের মেয়ে, তুমি বুঝবে? যা হোক, খেলা সুরু করেছ মন্দ না! গোড়াতেই এত! না জানি, আরো কি দেখব! বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সুষমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ-সব কথা-গুলার অর্থ কি! সুষমা কি করিয়াছে? সে ত কাহারো সঙ্গে একটা কথাও বলে নাই, তবে তাহাকে এমন ভাবে এই সব কথা শুনানো কেন? সে ত কোন অপরাধেই অপরাধী নয়! তবে—?

নীচে তখন মানদা ঠাকুরাণীর তীব্র ঝঙ্কার শুনা গেল,—যাও গো বামুন-মেয়ে, ছেলের খাবার উপরে নিয়ে যাও। দরদী মা এসেছেন, তাঁর হাতেই ছেলে খাবে। অভয়ের মনে যদি এই ছিল, তবে কেন এ মায়ার পাকে বাঁধলে বল দেখি! ছেলেটাকে আমার কোলে দিয়ে শেষ কেড়ে নেবে যদি! যত্ন কি আর আমি করছিলুম না, না, যত্ন জানি না? পেটে ধরিনি বটে, তবু ওর জন্যে নাড়ীটা যেন থেকে থেকে টন্‌টনিয়ে ওঠে!—মা—মা, ওরে আমার সাতপুরুষের মা—আদর করে গল্প শোনানো হচ্ছে! এর পর গলা টিপে রাজ্যেশ্বরী হয়ে বসবেন যখন—! হুঃ! দেমাক কি! আমাদের সঙ্গে একটু মেলা-মেশা নেই। মুখ টিপে ভিজে বেড়ালটি হয়ে, ছেলের জিনিষ-পত্তর নাড়া-চাড়া করছেন, ঘর-দোরের ধুলো ঝাড়চেন! আমরা কে? দাসী-বাঁদী বৈ ত নই! যেন ওঁরই সব—বরাত দিয়ে গেছলেন! আমরা যেন কিছুই দেখিনি শুনিনি! অত টস্ জানিনে বাপু,—সোনার লক্ষীর রাজ্যিপাট—উনি কোথেকে এসে দখল করে বসলেন দেখ না! —যাব কোথায়? বৌমা গো—আর কথা জোগাইতে না পারিয়া অতীতের শোকে মানদা ঠাকুরাণী সহসা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দোতলার খোলা ছাদে বসিয়া সুষমা কথাগুলা স্পষ্টই শুনিতে পাইল। আকাশে ছোট এক টুকরা চাঁদ উঠিয়াছিল—তাহারই আশে-পাশে কতকগুলা খণ্ড মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতে-ছিল। সুষমা গল্প থামাইয়া উদাস নেত্র মেলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। নিখিল কহিল,—বল না মা, তার পর কি হল? রাক্ষসীটা দাঁত বের করে রাজপুত্তুরকে তেড়ে গেল, তা রাজপুত্তুর কি করলে? ভয় পেলে না?

সে কথা সুষমার কাণেও গেল না, সে তেমনি অলসভাবেই আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। সত্যই ত, সারাদিনেও এই এতগুলি বর্ষীয়সী আত্মীয়ার সে কোন তত্ত্বই ত লয় নাই! কি করিয়াই বা লইবে? সে এই অপরিচিত ঘরে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ, সবে মাত্র এখানে আসিয়া পা দিয়াছে! তাঁহাদের

গায়ে পড়িয়া গিন্নি-বান্নীর মত সে আবার কি তত্ত্ব লইতে যাইবে? কৈ, তাঁহারা ত ডাকিয়া সুষমার সঙ্গে একটা কথাও বলেন নাই! অথচ সে বাড়ীর বৌ!

সুষমা ভাবিল, তবু সে ছোট, তাহারই উচিত ছিল, গিয়া সকলের সঙ্গে ভাব করা! কিন্তু অভয়াশঙ্করের আদেশ,—তাই ঘর-দ্বার দেখা-শুনা, নিখিলের প্রত্যেক খুঁটি-নাটি বুঝিয়া লওয়া—এ-সবগুলার দিকে আগেই সে মন দিয়াছিল। এ কর্ত্তব্য যে তার সকল কর্ত্তব্যের আগে। নিখিল বলিল,—বল না মা, গল্পটা। চুপ করে রইলে কেন?

সুষমা চমকিয়া বলিল—এই যে বাবা, বল্‌চি! তারপর গল্পের হারানো খেইটা ধরিয়া সুষমা কোনমতে সেটা শেষ করিল।

ওদিকে নিখিলের খাবার লইয়া বামুন-মেয়ে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। সুষমা বলিল,—একটা চাকর-বাকর কাকেও ডেকে দিন না—আমি ত চিনি না কাউকে। এখানে একটা আলো দিয়ে যাক্, নইলে অন্ধকারে খাবে কি করে?

বামুন-মেয়ে মাহিনার চাকর,—গতর খাটাইয়া খায়,—কর্ত্রীত্বও কখনো করে নাই, করিবার তোয়াক্কাও রাখে না! তার উপর সে দেখিয়াছে, এই মেয়েটি এখানে আসা অবধি নীচেকার মহলে তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ বিশ্রী ষড়যন্ত্র আর জল্পনা চলিয়াছে! অথচ বেচারী মুখের কথাটিও খসায় নাই! তার উপর সুষমার মিষ্ট কথায় তাহার প্রাণটাও একটু ভিজিল। সে বলিল,—এই যে মা, ডেকে দিচ্ছি—বলিয়া ব্রাহ্মণী খাবারের থালা রাখিয়া ওধারে গিয়া ডাকিল,—ওরে ও রামফল, —ও মেঘ্‌না—একটা হার্‌কেন দিয়ে যা না, এই দোতলার ছাদে। খোকা বাবু খেতে বসচে যে।

ব্রাহ্মণী আসিয়া সুষমার কাছে বসিল; অল্প কথায় তাহার পিতৃ-গৃহের পরিচয় লইয়া বলিল,—তুমি আমাদের সে বৌমার বোন্! তা এ বেশ হয়েছে মা। ছেলেটাকে দেখো বাছা। ওঁদের ত আর মায়া ধরে না! ছেলেটা সত্যিই ভেসে বেড়াচ্ছিল! যে অরাজক-পুরী হয়েছিল মা—তারপর সে নিখিলের বায়না প্রভৃতির সবিস্তার পরিচয় দিতে লাগিল, পরে একটু চাপা গলায় বলিল—বাড়ীতে যাঁরা সব আছেন, সব এক-একটী জ্যান্ত সাপ, বৌমা। দুধ-কলা দিয়ে কর্ত্তাবাবু এদের পুষচেন ত, আবার কর্ত্তাবাবুকেই উল্টে ছোবল দিতে পেলে সব বর্ত্তে যান্! তুমি মা ওঁদের একটু মেনে চলো! কথার কি ধার! কাউকে রেয়াৎ করেন না! সে বৌমা অমনি চব্বিশ ঘণ্টা একেবারে তটস্থ থাকতেন! পাণ থেকে চুণটুকু না খসে! আহা, বাছারে! বাবাঃ, বাবাঃ—কথায় বলে না, যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই? তা এখানকার কাণ্ড-কারখানাও ঠিক তাই!

হারিকনের আলোয় নিখিলকে খাওয়াইয়া তাহার মুখ ধোয়াইয়া দিলে ব্রাহ্মণী এঁটো তুলিয়া সুষমাকে বলিল,—তোমার খাবার এইখানেই নিয়ে আসি মা। তুমিও খেয়ে নাও।

সুষমা বলিল—থাক্, পরে খাব'খন। আমি নীচে গিয়েই খাব। কেন আবার কষ্ট করে এখানে আনবে?

ব্রাহ্মণী বলিল—ওমা, এ আবার কষ্ট কোন্

খানটায় মা—? তোমারই ত চাকর আমি। তা-ছাড়া এখনই খেয়ে নাও মা—। কার পিত্যেশেই বা বসে থাকবে? ওঁরা ডেকে বলবেন,—খাবে এসো, বৌমা? সে আশাও করো না বাছা। নিজেদের নিয়েই ওঁরা চব্বিশ ঘণ্টা মত্ত! তার পর কর্ত্তাবাবু—তা তাঁর খাবার ঐ ঘরেই ঢাকা থাকে। তিনি সেই দশটার পর উপরে উঠে খান। এ বাড়ীর ধারা ত জানো না মা, তুমি।

৭

অনেক রাত্রে অভয়াশঙ্কর উপরে আসিয়া দেখিলেন, খাটের উপর তাঁহার শুভ্র বিছানা পাতা, আর তাহারই একটি পাশে নিখিল শুইয়া ঘুমাইতেছে। নীচে একধারে তাঁহার খাবার ঢাকা রহিয়াছে এবং তাহারই পাশে সুষমা ভূমির উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরে বড় আলো জ্বলিতেছে। সেই আলোয় অভয়াশঙ্কর দেখিলেন, সুষমার মুখখানি যেন ঈষৎ মলিন, অথচ সেই মলিনতাটুকুর উপর প্রসন্নতার একটা হাসি ফুলের উপর জ্যোৎস্না-রেখার মতই মাখানো রহিয়াছে। বেচারী সুষমা! অভয়াশঙ্কর ভাবিলেন, মুখ দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না ত! এ বিবাহ প্রেমের জন্য, আরামের জন্য বা আমোদের জন্য তিনি করেন নাই,—শুধু সংসারে একটু সুবিধা করিয়া লইবার জন্যই না এ বিবাহ! কর্ত্তব্যের পথটাকে প্রশস্ত অবাধ রাখিবার জন্যই তিনি এই অনাথা বালিকাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, সে কথা ভুলিলে চলিবে না এবং এই কথাটাই সুষমাকে আজই ভালো করিয়া খুলিয়া বলা দরকার! সে যেন মস্ত-বড় আশা করিয়া শেষে নৈরাশ্যে না পস্তাইয়া মরে!

অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা।

এই একটি ডাকে উ বলিয়া সুষমা ধড়-মড়িয়া উঠিয়া বসিল। অভয়াশঙ্কর একটা চেয়ারে বসিলেন। সুষমা গায়ের কাপড়-চোপড় টানিয়া আপনাকে সম্বৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—কাছে এসো।

সুষমা অভয়াশঙ্করের কাছে গেল। অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, শোনো। বেশ স্থির হয়েই শোনো। সব অবস্থাই ত তুমি জানো। আর এও তুমি জানো, লীলাকে আমি কি ভালোই বাসতুম! তাকে হারিয়ে আর-একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কত শক্ত, তা তুমি হয়ত বুঝবে না! তবু বোঝবার চেষ্টা করো। স্ত্রীর আদর নতুন করে আর আমার পাবার নেই, তোমার কাছ থেকে আমি তা চাইও না। সে আদর আমি ভরপূর ভোগ করেচি, তার আর প্রত্যাশাও করি না। তবে এই নিখিলকে নিয়ে আমি বড়ই বিপদে পড়েচি। ওকে ঠিকভাবে মানুষ করতে গেলে, এমন-একজনের সাহায্য চাই, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে ওরই কাজে ঢেলে দেবে, তার প্রতিদানে কিছুরই আশা রাখবে না। সে আমার মনের সমস্ত পরিচয় নেবে, আর আমার মনের মত করেই নিখিলকে গড়ে তুলবে। আমি এমন একজন লোকই খুঁজছিলুম যে আমার স্ত্রী না হোক, তার মত হবে, বন্ধু হবে, খাঁটি বন্ধু। নিখিল তোমার খুব বশ,

তোমায় সে খুব ভালবাসে, তা-ছাড়া তোমাকেই সে তার মা বলে জানে,—মা বলে ডাকে। তুমিও নিখিলকে খুবই ভালবাস, তাই তোমাকে এই ঘরে এনে তার আসনেই প্রতিষ্ঠা করেচি। তুমি আচারে-ব্যবহারে সর্ব্ব-বিষয়ে তার মা হয়ে থাকো। ও যে মা-হারা, এইটুকু যেন ও না জান্‌তে পারে! ওকে কখনো সে অভাব তুমি বুঝ্‌তে দেবে না। পারবে কি সুষমা?

সুষমা মুখ নত করিয়া হাত দিয়া কাপড়ের আঁচল খুঁটিতে খুঁটিতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, পারিবে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার কাছ থেকে ঠিক স্বামীর ব্যবহার নাও পেতে পারো তুমি, তার জন্য দুঃখ বা অনুযোগ করো না! তোমাকে ঠিক স্ত্রী বলে আমি গ্রহণ কর্‌তে পারব বলে মনে হয় না। তবে সব কাজে আমার সহায় হও, বন্ধু হয়ে থাকো আমার। আমাকেও তোমার বন্ধু বলে জেনো। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু, প্রাণের বন্ধু হলে! কেমন?

সুষমা এবারও কোন কথা বলিল না—ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তোমার জীবনটা তুমি হয়ত ভাবচ, ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু তা নয়। একটা অনাথ মাতৃহীন শিশুকে যদি সব স্বার্থ, সাধ, আর কামনা বিসর্জ্জন দিয়ে মানুষ করে তুলতে পারো, তার মাতৃহীনতার মস্ত অভাব যদি তাকে বুঝ্‌তে না দাও, তাহলে সেটা খুব বড় কাজ করা হবে। ভগবান তোমাকে তার জন্যে আশীর্ব্বাদ করবেন, এ নিশ্চয় জেনো। তোমার সে নিঃস্বার্থ আন্তরিক সেবা কখনই নিষ্ফল হবে না, এও জেনে রেখো।

সুষমার দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। হায়রে, প্রথম যৌবনে স্বামীর তাহার এই প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ! সুষমার বয়স হইয়াছে, স্বামী কি বস্তু, তাহা সে বাঙালীর ঘরে জন্মিয়া এত খানি বয়সে খুবই বোঝে! তাহার তরুণ প্রাণে অজস্র সাধ আর কামনা পুষ্প-কলির মতই অজস্রভাবে ফুটি-ফুটি হইয়া রহিয়াছে। একটু প্রেম, একটু সোহাগ আর আদরের হাওয়ায় সেগুলা এখনি ফুটিয়া বিপুল শোভায় অমল সৌরভে সকলকে মাতাইয়া তুলিতে পারে—কিন্তু সেগুলাকে আর ফুটানো গেল না! অফুট কলি অনাদরেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে! ভগবানের আশীর্ব্বাদ? সুষমা কি তাহারই কাঙাল?

জোর করিয়া সে চোখের জল সম্বরণ করিল। নিখিলের মুখ চাহিয়া সে সমস্ত সহিবে, নিখিলের সুখের জন্য আপনাকে সে উৎসর্গ করিবে, বলি দিবে, ভাবিল। মা-হারা বেচারা নিখিল! 'বেশ, তাই হোক! তুচ্ছ একটা নারীর জীবন—বৈ ত না! সে জীবন এই নিখিলের সেবাতেই সার্থক হোক্!

অভয়াশঙ্কর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন; কেমন একটা অধীরতা বুকে লইয়া ঘরের মধ্যে কয়বার পায়চারি করিয়া বেড়াইলেন, পরে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সুষমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সুষমা তখনো সেই একই ভাবে চেয়ারের পাশে মুখ নামাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটা কথা প্রকাশের জন্য অভয়াশঙ্করের মনের মধ্যে ভারী

জোরে ঠেলা-ঠেলি করিতেছিল। সুষমার পানে চাহিতে প্রাণে একটু মমতাও জন্মিল। সে মমতাকে দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া তিনি কথাটা অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—আর-একটা কথা, সুষমা। ভিতরে আমাদের মধ্যে যে বন্দোবস্তই থাকুক, বাহিরে কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী। বাহিরের লোকে তোমাকে সর্ব্ববিষয়ে আমার স্ত্রী বলেই জানবে। এই বাড়ী, সংসার— বিষয়, এ সমস্তেরই কর্ত্রী তুমি! তুমিও সেইভাবে নিজেকে, আর সংসারকে চালাবে, তার একতিল কম নয়! আর দেখো, ঐ বিছানায় আমরা একত্রে দু-জনে না শুলেই ভালো হয়, বোধ হয়। খাটে তুমি আর নিখিল শুয়ো—আমি ঐ ওধারের ছোট স্প্রীংয়ের খাটটায় শোব'খন। কেমন?

সুষমা কোন কথা বলিল না। এতক্ষণে সে মনটাকে ঠিক করিয়া লইতেছিল—সমস্ত আদেশ সে বিনাবাক্য-ব্যয়ে শিরোধার্য্য করিয়া লইবে, স্থির করিল। তাই সে ঘাড় নাড়িয়া স্বামীর এ বন্দোবস্তটাতে নিঃশব্দেই সায় দিল।

অভয়াশঙ্কর তখন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাইতে বসিলেন। সুষমা ধীরে ধীরে আসিয়া পাশে বসিয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

৮

এমনি করিয়াই দিন কাটিতে ছিল। সুষমা নিখিলের মা না হইয়াও মা সাজিয়া নিখিলের সমস্ত অভাব ঢাকিয়া চলিতে লাগিল। অভয়াশঙ্কর শুধু দুই জনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিল,—যেন এই ভাবটায় কোথাও এতটুকু শৈথিল্য না আসিয়া পড়ে! বন্ধু বলিয়া মানিয়া লইলেও অভয়াশঙ্কর যে স্ত্রীর চক্ষে একেবারেই সুষমাকে না দেখিতেন, এমন নয়; তাহার উপর সকল বিষয়ে ক্রমে ক্রমে নির্ভর করিতেও লাগিলেন। এক-একবার মনে এমন আশঙ্কাও জাগিত, তাই ত, এ-একটা কি গোলমাল বাধাইয়া তুলিতেছি না ত! নিখিল সুষমাকে মা বলিয়া ডাকিতেছে, এজন্য এখন যেন কোথাও বাধিতেছে না। কিন্তু লীলা—তার স্থানটা কি জীবনের পৃষ্ঠা হইতে একেবারেই মুছিয়া ফেলিতে হইবে? লীলাকে কি একেবারে লোপ করিয়া দিবেন? নিখিল নিজের মাকে চিনিবে না? নিজের মার কোন পরিচয়ই জানিবে না? কখনো তাহার নামটুকুরও সম্মান করিবে না? এ ত লীলার স্মৃতির দস্তুরমত অপমানের ব্যবস্থাই তিনি করিয়া দিলেন! ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার সূত্রে এমনি জোট পড়িতে লাগিল যে তিনি বিরক্ত হইলেন এবং রাগটা গিয়া পড়িল শেষে বেচারী সুষমার উপর! জীবন-পথে সে যদি অমন করিয়া আসিয়া না জুটিত! নিখিলের সাম্‌নে অমনভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়া অমন স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া যদি সে না লইত, নিখিল যদি তাহার এতটা বশ না হইত! তাহা হইলে যে—

তাহা হইলে কে জানে, অভয়াশঙ্কর তাহাকে আনিয়া এখানে এই জটিলতা সৃষ্টি করিবার কল্পনাও করিতেন না! রূপের মোহ! অভয়াশঙ্কর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, কখনই না! নিখিলের জীবন-পথে আসিয়া না দাঁড়াইলে সুষমার পানে তিনি ফিরিয়াও তাকাইতেন না!

হায়রে, ইহারই নাম সংসারের পথ! সরল সোজা পথে চলিয়া যাইবার ভাগ্য যাহাদের হয়, তাহারাই শুধু ধন্য! আর সোজা পথে কাঁটার ঘা খাইয়া এই অন্ধকার গলির পথে যে হতভাগাদের ঢুকিয়া পড়িতে হয়, তাহাদের কি আর নিস্তার আছে রে! সুখ? শান্তি? সে আশা একেবারেই মিছা! পদে পদে মাথা ঠুকিয়া, পা পিছলাইয়া সে কি এক বিশ্রীভাবেই যে তাহাদের পথ চলা শেষ করিতে হয়! যখন এই দীর্ঘ যাত্রার মেয়াদ শেষ হয়, তখন সারা দেহ-মন ক্ষতের জ্বালায় বেদনার ঘায় অমনি টন্‌টন্ করিতে থাকে!

সুষমাকে আনিয়া প্রায় বৎসর কাল কোন মতে কাটাইয়া দিবার পর অভয়াশঙ্কর নিজে হইতে প্রতি পদে এমনি-নানান্ অশান্তি মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে লাগিলেন। সুষমার কি কোন দোষ ছিল? না। সে বেচারী এই তরুণ বয়সে ঐ নিখিলের সেবাতেই সমস্ত প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছিল! কম্পাসের কাঁটার মত সে ঐ নিখিলকে কেন্দ্র করিয়াই যা' এদিক-ওদিক নড়া-চড়া করিতেছে। যৌবনের সাধ, যৌবনের পিপাসা? যৌবন বস্তুটাকেই যে সে দুই হাতে ঠেলিয়া কোথায় সরাইয়া দিয়াছে, তাহার কোন নিশানাও মেলে না! সে ত আজ যুবতী নয়, স্ত্রী নয়, সে শুধু মা, নিখিলের মা। এ ছাড়া তাহার আর অন্য কোন পরিচয় নাই!

এমনি ভাবে থাকিয়া থাকিয়া এই জীবনটাতেই সে এমনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিল যে, নারীর শাস্ত্রে ঐ যে স্বামীর আদর, স্বামীর সোহাগ বলিয়া কতকগুলা কথা আছে,সেগুলা মোটেই তাহার কাছে ঘেঁস দিতে পারিল না, সেগুলা মনের কোণে ছোট একটা ঢেউও তুলিল না! যেন একেবারে সেই তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সের পর বালিকা-কাল কাটাইয়া সে হঠাৎ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর-বয়সে সন্তানের জননী ও গৃহের কর্ত্রীতে প্রোমোশন লইয়া বসিয়াছে! মধ্যকার বয়সটা যেন মোটে তাহার নাগালই পায় নাই, তাহাকে সে স্পর্শও করিতে পারে নাই!

এই আত্মপ্রসাদটুকু লইয়াই বিবাহের পরে একটা বৎসর সে বেশ একরকম কাটাইয়া দিল। পরে সহসা একদিন এটুকুতেও বাহির হইতে খোঁচা পড়িতে লাগিল।

সংসারে এমন মানুষ বিস্তর দেখা যায়, যাহারা নিজেদের কোন লাভ, কোন স্বার্থ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও পরের অনিষ্ট খুঁজিয়া বেড়ায়! অভয়াশঙ্করের সংসার-দুর্গে এই যে কুটুম্বিনীর দল প্রকাণ্ড অক্ষৌহিণীর মতই খাইয়া বসিয়া নিতান্ত অলসভাবে কালক্ষেপ করিতেছিল, তাহারা এখন উপস্থিত কোন কাজ হাতে না পাওয়ায় সুষমার বিরুদ্ধে দুই-চারিটা মিথ্যা অপবাদ তুলিয়া অভয়াশঙ্করের কাণ ভারী করিয়া তুলিতে লাগিল। সুষমা কোনদিন ইহাদের কাহারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া কাহারো অবাধ কর্তৃত্বে হাত চালায় নাই ত! সংসারে নিজেকে সকলের পিছনে রাখিয়াছে, তবুও এই সব কুটুম্বিনীর দল আগে চলিতে চলিতেও ঘোড়ার মত পিছনে চাট্ মারিয়া বেচারীকে জর্জ্জরিত করিতে ছাড়িল না। সুষমার অপরাধ, সে শান্ত, সাত চড়েও তাহার মুখে কথা বাহির হয় না—আরো অপরাধ, নিখিল তাহাকে পাইয়া একেবারে অজ্ঞান। তার উপর সেবার পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবার সময় কর্ত্তা অমনি সোহাগ

করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন! 'কৈ, লীলাও ত বাড়ীর অত আদরের বৌ ছিল, সে কি কখনো পশ্চিমে গিয়াছে! তবে? কর্ত্তার সঙ্গে নিখিল একা গেলেই চলিত, চাকর-বাকরে কি আর তাহাকে দেখিতে পারিত না? না পারিলেও তাঁহারা ছিলেন ত,—ঐ সূত্রে অমনি দুই-চারি জায়গায় তীর্থ টাও নয় সারিয়া আসিতেন! তা না, তাঁহারা রহিলেন ঘরে পড়িয়া, সংসার আগ্‌লাইয়া, আর সঙ্গে চলিলেন কে? না, দ্বিতীয় পক্ষের সোহাগের বৌ! অমন করিয়া চুপ-চাপ থাকিলে কি হইবে, ও কি কম মেয়ে! বাঙালীর ঘরে ধেড়ে বৌ কি কখনো ভালো হয়? তাহারা ঐ স্বামীটিকেই চেনে শুধু! বৌ ত বলিতে পারিত, উঁহাদের সঙ্গে নাও, তীর্থ করিবেন! সবই জানা আছে গো, জ্ঞাতি-কুটুম্বিনী আর এই আত্মীয়ার দল, যত ভালো, যত বড় সম্মানের পাত্রীই হোন না তাঁরা, দাও তাঁহাদের ছুট্ করিয়া!

৯

নিখিল ইদানীং বড় দুরন্ত হইয়া উঠিতেছিল। সেদিন পড়িয়া হাত-পা ছড়িয়া ফেলিলে এই সব জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীরা তখন অবশ্য দেখিতে আসিলেন না,—কিন্তু পরে এক সময় অবসর বুঝিয়া সুষমার অসাক্ষাতে বেশ সোহাগের ভঙ্গীতে তাহার বিরুদ্ধে অভয়াশঙ্করের কানে লাগাইতে বসিল; বলিল,—ছেলেমানুষ বৌ, যাহোক্ পেটে এখনো একটি ধরেনি ত—ছেলের ধকল চব্বিশ ঘণ্টা ও সইতে পারবে কেন, বাবা? ওর নিজেরই এখন খেলবার বয়স। এই যে ছেলেটাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়া দিতেই বাছা গেল অমনি দুম্ করে পড়ে—রগের কাছটা ছিঁড়ে গেছে! ভাগ্যে ছুটে গিয়ে চারটি দুব্বো ঘাস ছেঁচে দিলুম!

অভয়াশঙ্কর মনে মনে বিষম চটিয়া গেলেন, কি পড়িয়া গেল, তা দেখা নাই, তার উপর আবার ভূতের ভয় দেখাইয়া ফেলিয়া দেওয়া! ঠিক! এ ত নিজের মা নয়, এ যে সাজা মা! নিজের মা হইলে কি আর এটা পারিত? কিন্তু এ রাগ তিনি প্রকাশ করিলেন না, মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

তার পর আবার সেদিন—সুষমা তখন গা ধুইতে গিয়াছিল। নিখিল সেই অবসরে ছোট আলমারির মাথায় চড়িয়া লীলার ছবির উপর সুষমা নিজের হাতে গাঁথিয়া মস্ত যে ফুলের মালাটা ঝুলাইয়া দিয়াছিল, সেইটা টানিতে গিয়া ছবিটাকে দুম্ করিয়া ফেলিয়া দিল। কাঁচ ভাঙ্গিয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। সেও অমনি তড়াক্ করিয়া লাফ দিয়া যেমন পলাইবে, পায়ে ভাঙ্গা কাঁচ ফুটিয়া গেল। কিন্তু সে কথা কাহারও কাছে বলা চলে না ত! সে সেই কাঁচ্-ফোটা পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একেবারে ছাদের সিঁড়ি বহিয়া চিল-কোঠায় গিয়া আশ্রয় লইল। সুষমা আসিয়া কাণ্ড দেখিয়া অবাক! চীৎকার করিয়া ডাকিল,—নিখিল। নিখিলের কোন সাড়া নাই! ভৃত্যেরা খোঁজ করিয়া আসিয়া জানাইল, খোকা বাবু বাড়ী নাই। সুষমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চারিধারে লোক ছুটিল। অভয়াশঙ্কর গৃহে ছিলেন না। নিখিলের কোন সন্ধানই কেহ আনিতে পারিল না—ওদিকে সন্ধ্যাও গাঢ় হইয়া আসিল,—সুষমা অশ্রু-সজল চোখে কত দেবতার মানত করিতেছে, এমন সময় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিখিল আসিয়া

হাজির। সে চিল-কোঠায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে যে এত খোঁজ চলিতেছে, সে তাহার কিছুই জানিত না। মার বুকে মুখ লুকাইয়া ছবি ভাঙ্গার কথা সে ধীরে ধীরে বলিল। সুষমা বলিল,—ছি, তোমাকে না কত দিন বলেচি যে ও আলমারির উপর উঠবে না! কথা শোনোনি! আমি আর কখ্‌খনো তোমায় ভালোবাসব না, গল্প বলব না ত!

নিখিল কাঁদিয়া বলিল—না মা, সত্যি বলচি মা, আর-কখ্‌নো এমন কাজ করব না।

বাড়ীতে তখন হুলস্থূল বাধিয়া গেল। গরম জল,—নরুণ,—চূণ—ডাক্তার—শুনিয়া আত্মীয়ার দল উপরে উঠিলেন না,—কি জানি খাটিতে হয় যদি,—তাঁহারা নীচে বসিয়াই টিপ্পনী কাটিতে লাগিলেন।

সে রাত্রে অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিয়া ছবির কাঁচ ভাঙ্গা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। লীলার ব্রোমাইড এনলার্জ্জমেণ্ট—কত টাকা ব্যয়ে করানো হইয়াছে, কত যত্নের সামগ্রী—সেই ছবির এই দুর্দ্দশা! সগর্জ্জনে তিনি ডাকিলেন—নিখিল।

নিখিল তখন নীচে রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছিল, সুষমা পাশে বসিয়া পাখা করিতেছিল, কাজেই তখনি উঠিতে পারিল না, সে মানদা ঠাকুরাণীকে বলিল—একবার যান্‌ না পিশিমা, তিনি এসে ডাকচেন, কি চাইছেন। নিখিলের খাওয়া না হলে আমি ত যেতে পারচি না, বামুনদিরও হাত জোড়া।

মানদা ঠাকুরাণী উপরে গিয়া কহিলেন—কি বাবা? নিখিলকে ডাকচ? সে খাচ্ছে, বৌমা তাকে খাইয়ে দিচ্ছেন! তাও বলি, এখন ডাগর হচ্ছে, নিজের হাতে খেতে শিখুক। এখন থেকে অভ্যাস করা ভালো। ঠেসে খাইয়ে দিলে পেটের মাপ ত বোঝা যায় না। শেষে কি জন্মের মত লিভারের দোষ জন্মে যাবে? নতুন বৌমার সব ভালো, কেবল ঐ যে কি গোঁ, নিজে যেটি ধরবেন,—যত বলি, ওরে বেটী, তুই সেদিনের মেয়ে, এ-সব বুড়ীদের কথা মান্‌তে শেখ্‌—তা—যাক্‌, হ্যাঁ ভালো কথা, তোমার খাবার আনতে বলব কি বাবা?

অভয়াশঙ্কর বিরক্তির স্বরেই বলিলেন—না। তার পর নিজের মনে বলিলেন,—ছবিখানা ঝুল্‌চে কোথায় সেই তেশূন্যে, তা ওর উপর যুদ্ধ করতে যাওয়া কেন? নিখিল আজকাল ভারী পাজী হয়েচে, দেখচি!

মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন—বকো না বাবা, আহা, মা-হারা কচি বাচ্ছা! ওর কি জ্ঞান আছে, বল? আর তাও বলি, ছেলেদের একটু দাবে রাখা ভালো। অত আদর দিলে যে মাথা খাওয়া হয়। তা ত বৌমা শুনবেন না! এ'ত আদর করা নয়, এ যে শত্রুতা-সাধন। এই যে আমাদের কাছে ও এদ্দিন ছিল—কৈ, এ রকম হয়নি ত! হবে কেন? কি বংশে জন্ম ওর!

অভয়াশঙ্কর আরো বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—থামো তুমি! কি কথায় কি কথা এল। মানদা ঠাকুরাণী তখন গালের মধ্যে একরাশ তামাকের গুল পুরিয়া খানিকটা পিক্‌ ফেলিয়া বলিলেন,—ঐ ছেলে কি ও-ছবি নামাতে পারে! বৌমার আমার যেমন ছেলেমান্সী, বল্‌লেন, আলমারির উপর দাঁড়িয়ে পাড়ো দেখি! ছেলেমানুষ টাল রাখতে

পারবে কেন? গেল ওটা দুম্ করে পড়ে। পায়ে কাঁচ ফুটে পাটাও যায়! শেষে কত করে কাঁচটা তুলে দিলুম। চুণ দিয়ে রেখেছি, আওরাবে না।

মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এমন অনর্গল মিথ্যা বলিতে পারে, চোখে না দেখিলে কে ইহা বিশ্বাস করিবে? কাজেই এ ধারণা অভয়াশঙ্করের মোটেই হইল না যে, কথাটা ভয়ঙ্কর মিথ্যা! তাই তিনি সুষমার উপর বিরক্ত হইয়াই বলিলেন,—কেন, ও ছবি পাড়বার কি দরকার হয়েছিল?

—বুঝি, কাঁচ-টাঁচ সাফ করবার জন্যে,—হবে।

—তা চাকর-বাকর কাকেও বললে চল্‌তো না! ঐ একরত্তি ছেলেকে ফরমাস করা!

—যাক্, বকো না বাবা, ও কথা আর তুলো না। ছেলেমানুষ ভয়ে অমনি কাঁটা হয়ে আছে, বেচারী! আমিও অনেক বুঝিয়েছি! তবে মনে থাকে না ত ওঁর! বড় হোন্, জ্ঞান হোক্, এ-সব দোষ তখন সেরে যাবে বৈ কি।

বিরক্ত হইয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—জ্ঞান আর কবে হবে! চিতেয় সেঁধুলে? আরো একজন মানুষও ত ছিল—কৈ, তার—

তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন—হুঁ, কিসে আর কিসে! তাঁর মত বৌ কি আর জন্মায় গা? আমাদের যদি সে বরাতই হবে বাবা, তাহলে কি আর ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে চলে যায়! মানদা ঠাকুরাণীর দুই চোখে জল আসিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তুমি এখন যাও।

মানদা ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন। অভয়াশঙ্কর নিজের ঘরে আসিয়া কৌচটার উপর গিয়া পড়িয়া রহিলেন। বিশৃঙ্খলা—বিশৃঙ্খলা,—চারিদিকে বিষম বিশৃঙ্খলা! আসল যার যায়, নকল দিয়া সে কি না তার অভাবও পূরণ করিতে চায়? হারে মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা!

ওদিকে বেচারী সুষমা জানিতেও পারিল না, তাহার নামে স্বামীর মনে এখানে একজন কি বিষটাই ঢালিয়া দিয়া গেল! সে তাহার কোন শত্রুতা, তাহার কাছে কোন অপরাধই করে নাই ত, কাজেই সন্দেহই বা কেন হইবে?

অভয়াশঙ্কর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া গম্ভীরভাবে কৌচেই পড়িয়া রহিলেন। লীলা,—লীলা—লীলা! হায় রে, কি স্ত্রীই তিনি হারাইয়াছেন! সুষমার বিরুদ্ধে নালিশ তুলিয়া তিনি তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিবেন, এমন প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। সেটাতে নিজেকে বড় খাটো করা হইবে! তবে—তবে—?

ভাবিয়া অভয়াশঙ্কর একটা পথ বাহির করিলেন। সুষমা নিখিলকে লইয়া ঘরে আসিলে অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন—নিখিল।

সে স্বরে নিখিল বেশ বুঝিল, এ বিচারকের কৈফিয়ৎ-তলবের সুর!

—বাবা—বলিয়া অপরাধী নিখিল বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—ছবির কাঁচ ভাঙ্গলো কি করে?

বাপের মুখের পানে চোখ তুলিতেই নিখিল দেখিল, কি গম্ভীর, রোষ-রক্ত সে মুখ! ভয়ে তাহার মুখে আর কথা ফুটিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—বল।

সুষমা আসিয়া বলিল—ও আর কখনো করবে না, বলেছে। এবারটি ওকে মাপ করো।

—তুমি চুপ কর। অভয়াশঙ্করের স্বরে যেন বাজ-হুঙ্কার দিয়া উঠিল। এমন স্বর সুষমা ইহার পূর্ব্বে আর কখনো শোনে নাই—তাহার সমস্ত মন চকিতে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার বেয়াদবি বড্ড বাড়চে, নিখিল। কাল থেকে আমি আলাদা বন্দোবস্ত করচি, দাঁড়াও। আদরে-আব্দারে তুমি একেবারে গোল্লায় যেতে বসেচ—কাল থেকে সব ব্যবস্থা আমি উল্টে দিচ্ছি। পরে একটু স্থির হইয়া তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আজকের মত শোওগে যাও।

ফৌজদারীর আসামীর মতই অতি ধীর পায়ে নিখিল গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। অভয়াশঙ্কর কৌচটার উপর তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

সুষমা এতক্ষণ কাঁটা হইয়া গিয়াছিল—এখন মুখ তুলিয়া সে বলিল,—বসে রইলে যে! খাবে না?

—না।

—অত রাগ করেছ কেন? একটা কাঁচ অসাবধানে ভেঙ্গে ফেলেচে—

—অন্য দশখানা কাঁচ ভাঙ্গলে অত দোষ হত না। এ কোন্ ছবির কাঁচ, তা লক্ষ্য করে দেখেচ কি?

কথার শেষ দিকটায় স্বরে যেন অনেকখানি স্নেহ মিশানো ছিল! সুষমা তাহা লক্ষ্য করিয়াও যেন লক্ষ্য করে নাই, এমনি ভাবে বলিল—জানি। দিদির ছবির কাঁচ। নিখিলের মার ছবি।

—হুঁ। বলিয়া অভয়াশঙ্কর সুষমার পানে চাহিলেন, পরে বলিলেন,—নিখিলের ভার,—এখন ও বড় হয়েছে—এখন আমিই নিতে পারব। এতদিন তুমি যা করেছ, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আর তোমাকে ওর জন্যে কষ্ট দিতে চাই না—কাল থেকে তোমার ছুটী!

হঠাৎ এ কথাটা এমনি বেমানান্ শুনাইল যে সুষমা প্রথমটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, এ-সব কথা কেন? এ কথার মানে কি? একখানা ছবির কাঁচ ভাঙ্গিয়াছে, তার জন্য ছেলে এত-বড় কি অপরাধ করিয়াছে যে কৃতজ্ঞতা, ছুটী—এমনি সব অর্থহীন মস্ত-মস্ত কথা তোলা!

সুষমা বলিল,—তুমি কি বল্‌চ, বুঝতে পারচি না। এ সব কথার মানে—?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—মানে আর কিছু নয়! তোমার নিজেরো আব শীঘ্রই ছেলে কি মেয়ে—একটা হচ্ছে ত—তাকে দেখা-শোনার ভার তোমার হাতেই পড়বে। এত তুমি পারবে কেন?

চকিতে একখানা কালো মেঘ সুষমার মনের উপর ভাসিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত স্বচ্ছতা-টুকুকে ঢাকিয়া দিল। গর্ভে তাহার সন্তান আসিতেছে, সত্য—কিন্তু সে কি তাহাকে চাহিয়াছিল? কোনদিন স্বপ্নেও ত সে ইহাকে চাহে নাই! নিখিল আছে, নিখিলকে সে তাহার পেটের বলিয়াই জানে—তবে আর-একটা নূতন সন্তান লইয়া সে কি করিবে? প্রয়োজন কি! স্বামী যে প্রায়ই রহস্য করিয়া বলেন,—তোমার পেটে যদি ছেলে হয়, তাহলে দু'বেটাতে জমিদারী নিয়ে লাঠালাঠি করবে আর কি! আজ এ কথায় তাহার মনে হইল,

সে ত তবে তামাসা নয়! আর গর্ভে এই জীবটির আসার সম্ভাবনা অবধি স্বামীর মনেও যেন অনেকখানি ভাবান্তর হইয়াছে! যে সব কথা কখনো তোলেন নাই, এখন প্রায়ই সেই সব কথা তুলিয়া গুম্ হইয়া থাকেন! আজ অভয়াশঙ্করের এই কথায় তাঁহার মনটা সুষমার কাছে ভারী স্পষ্ট হইয়া উঠিল; কোথাও আর এতটুকু ঝাপ্‌সা রহিল না। অমনি তাহার অপমানিত নারী-গর্ব্ব সজোরে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল—কি তুমি ও-সব কথা বল, বল দেখি! এই যে আসচে,—জানি না, এ কে—ছেলে না মেয়ে? কিন্তু যেই হোক্—এ যদি স্বয়ং ভগবানও হন্, জেনো, নিখিলের মঙ্গলের জন্যে, তোমার দুর্ভাবনা দূর করবার জন্যে একে দু' হাতে গলা টিপে আমি মেরে ফেলতে পারি। নিখিলের অকল্যাণ করবে এ? নিখিলকে আমি পেটে ধরিনি, সত্যি, তবু আমি জানি, ও আমারই পেটে জন্মেচে, ও আমার এক—আমার সব। ওর মঙ্গলের পথে যে কাঁটা হবে, সে আমার পরম শত্রু! তুমি স্বামী, ইষ্টগুরু, তোমার বড় আমার আর কেউ নেই, তোমার এই দুই পা ছুঁয়ে শপথ করচি, যখন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ তোমার মনে জেগেচে, তখন জেনো, আজ থেকে ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে আমি এই প্রার্থনা করবো, যেন জন্ম নেবার আগেই এর মৃত্যু হয়—! আমি একে পেটে ধরচি, আমি এর মা—তবু সেই মা হয়েও বল্‌চি, এ মরুক্,—এই দণ্ডে মরুক্!

সুষমা চিরদিন অল্প কথা কয়, আজ সে এ কি হইয়া উঠিল? উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! অভয়াশঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন।

সুষমার পায়ের তলায় মাটিটা তখন ভয়ঙ্কর বেগে যেন দুলিয়া উঠিয়াছে! সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। সমস্ত ঘরটা চকিতে যেন চোখের সামনে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এবং নিমেষে চারি-ধার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, অভয়াশঙ্কর তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার মূর্চ্ছিত দেহখানি শয্যার উপর বিছাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

প্রভাত-স্বপ্ন।—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কলিকাতা। বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি ছোট গল্পের বহি। প্রভাত-স্বপ্ন, ঘড়িওয়ালা জীবন্মৃত, সত্যের আবরণ, বন্ধু, অন্তঃসলিলা ও বিবেচক—এই কয়টি গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলিতে ঘটনা-সংস্থান আছে,—লেখার ভঙ্গীও মন্দ নয়। তবে ছোট গল্পের আর্ট সব গল্পে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। ঘড়িওয়ালা, বন্ধু ও বিবেচক—এই তিনটি গল্প চমৎকার হইয়াছে—নাটকীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। রচনা আশাপ্রদ। তবে একটা ত্রুটি চোখে পড়িল—কথোপকথনে কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা এক সঙ্গে বেমালান্‌ভাবে মিশিয়া বহু স্থানে রসভঙ্গ করিয়াছে। 'প্রভাত-স্বপ্ন' গল্পটি একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে—আর একটু ছাঁট-কাট করিলে গল্পটি জমিত ভালোই। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই মনোরম হইয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত।—তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, দি নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস, ১৬৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। প্রাচীন ও নব্য বঙ্গীয় সমাজের মিলনের মুখে পণ্ডিত শিবনাথের অভ্যুদয়। তাঁহার জীবনের কাহিনী নব্য-সমাজ-গঠনের কাহিনী—আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক, জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। শিবনাথের জন্ম হয় কলিকাতার দক্ষিণে, মজিলপুর গ্রামে, ইংরাজী ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে শিবনাথের বংশ-পরিচয়, বাল্যজীবনের কথা পরে নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া কি করিয়া তাঁহার কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিল, তাহার বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শিবনাথ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা ঠেলিয়া সংস্কার ঠেলিয়া কিরূপ অদম্য উৎসাহে, কিরূপ অকুতোভয়ে তাহার পিছনে চলিয়াছিলেন, কিরূপে সেই সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কন্যার দ্বারা লিখিত হইলেও রচনা কোথাও পক্ষপাত-দুষ্ট হয় নাই,—Boswellism ইহার কোথাও নাই, এ কথা দৃঢ়কণ্ঠে আমরা বলিতে পারি। রচনাটি প্রাঞ্জল—এবং শিবনাথ-চরিত্রের মূল সূত্রটিও এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের কোথাও হারাইয়া যায় নাই—ইহা লেখিকার পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। শিবনাথের সহিত আমাদেরও সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল। প্রথম যৌবনে তাঁহার কাছ হইতে বিস্তর উপদেশ, বিস্তর পরামর্শ পাইয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। এমন সদানন্দ মুক্ত-প্রাণ, সরল-চিত্ত মহানুভব ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। সহানুভূতি, সর্ব্ব-ভূতে দয়া, ও জ্ঞানচর্চ্চায় বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কি অসাধারণ উৎসাহ ছিল! এসব দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি—এ শুধু শিবনাথের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের কাহিনী নয়; এখানি বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের কয় পৃষ্ঠা—এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসাগর, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথের পিতা-মাতা-পত্নী প্রভৃতির বহু চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা বাঙলায়, সুদৃঢ় মনুষ্যত্বের ছবি দেখিতে চান্ তাঁহারা এ গ্রন্থ পাঠ করুন।

সাহিত্যিকা।—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, ৪।এ মোহনলাল ষ্ট্রীট। মিত্র প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ। কবিত্বের ত্রিধারা, স্বদেশী সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য, মিস্‌টিক কবি, ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও ভারতীয় করুণরস, আধ্যাত্মিকতা, কাব্য ও তত্ত্ব, প্রতিভার কথা, শিল্পকলার কথা, চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা, সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য—এই কয়টি সন্দর্ভ এই গ্রন্থে গুচ্ছাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলায় এ ধরণের গ্রন্থ খুব অল্পই আছে—'সাহিত্যিকা' বাংলা সাহিত্যের সম্পদ-স্বরূপ হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তরুণ লেখকের সমালোচনার অসাধারণ শক্তির, চিন্তাশীলতার ও জ্ঞানের প্রচুর পরিচয় পাই। Literary criticismsএ এমন হাত বাংলায় আজকাল অল্প সমালোচকেরই আছে। Critical study কাহাকে বলে, এ গ্রন্থ-পাঠে সকলে তাহার পরিচয় পাইবেন। খুব গুরুতর বিষয়ও লেখক যুক্তি-তর্কে এমন সরলভাবে সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন, বিশ্ব-সাহিত্যের স্বরূপ ও বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি-ভঙ্গী এমন পরিষ্কার সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন যে, এ গ্রন্থ বারবার পড়িয়াও পড়ার সাধ মেটে না। তরুণ লেখকের জীবন দীর্ঘ হোক, সাধনা সফল হোক্—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২৮ [৪র্থ সংখ্যা

লিপিবিদ্যা

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে—Speech is silveren, silence golden. আমরাও বলি,—শতং বদ, মা লিখ। প্রবচন-দুটি আপাততঃ প্রতীপ মতের অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ প্রতীপ নহে। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, উভয় ভাষাতেই বাক্-সংযমের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে ইংরাজীতে মুখের কথাটি পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয়, আর এদেশে বাচালতা বর্জ্জনীয় হইলেও অসংযত লিপি-চালনা নানা দোষের আকর বলিয়া বিবেচিত। মুখের কথাটা বেশীদিন স্থায়ী হয় না—কারণ মানব-মনের প্রকৃতিই হইল বিস্মৃতি-শীলতা। আর লেখাটা যেন ঐ কথাটারই ফটোগ্রাফ। যখন দেখিব, তখনই ফটোগ্রাফ-চিত্রিত বস্তু বা ভাবটীর স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিবে। তাই আমরা এরূপ স্থায়ী ভাষায় কথা বলার পক্ষপাতী নহি।

এরূপ উপদেশের মূলে এই একটি অভ্রান্ত তথ্য নিহিত আছে যে আমাদের কথা বলিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। যখনই আমরা দুইজন লোক একত্র থাকি, তখনই কিছু-না-কিছু বলিতে হইবে—চুপ করিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। আর চুপ করিয়া থাকা যাহার স্বভাব, সে নর-সমাজে নিন্দিত বা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই আমাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত করিবার উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে। তাই আমাদের দেশের বহুদর্শিতার উপদেশ—বোবার শত্রু নাই।

দুইজন লোক একত্র হইলে কথা বলিবার প্রবৃত্তি যদি স্বাভাবিক হয়, তবে যাহাকে তুমি ভালবাস, যাহার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে, যাহার বিচ্ছেদ সহ্য করা তোমার পক্ষে কষ্টকর, তাহার বিচ্ছেদ-কালে তাহার সহিত মনো-ভাবের আদান-প্রদানের আবশ্যকতা বোধ করা তোমার পক্ষে অতি স্বাভাবিক, তাহার কুশল সংবাদ পাইবার জন্য আগ্রহও তোমার

হইবেই হইবে। তোমার সুখ-দুঃখ, তোমার মনের বেদনা, প্রাণের যাতনা তাহাকে না জানাইয়া তুমি থাকিতে পারিবে না। তাই সভ্য জগতে রাজকীয় ডাক-বিভাগের এত সমাদর। তিন দিন ডাক বন্ধ থাকিলে সভ্য সমাজে হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। যেখানে তুমি যাইতে অসমর্থ, সেখানে তোমার কথাও যাইতে পারে না। সুতরাং তোমার কথার একটা ফটো তুলিয়া, সেই ফটো লোক-মারফত বা ডাক-মারফত পাঠাইতে হয়। তোমার কথার ফটোটাই হইল লেখা বা লিপি।

আমাদের মনের ভাব বা প্রাণের বেদনা ভাষায় প্রকাশ পায়। সুতরাং ভাষাই আমাদের মনের ভাবের ফটো; আর এই ফটোর ফটো হইল, লেখা। রসনা যে শব্দটী উচ্চারণ করে, সেই শব্দের সহিত একটী মনোভাবের অবিনাভাব সম্পর্ক। অর্থাৎ শব্দটী শ্রুতি-গোচর হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাব আমাদের মনো-নয়নের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ শব্দটীর সহিত বিজড়িত যে-ভাব, তাহাকে আমরা ঐ শব্দের অর্থ বলি। শব্দটা ঐ অর্থের বাহন, কারণ অর্থ শব্দ দ্বারা বক্তার মন হইতে শ্রোতার মনে বাহিত হয়। আবার শব্দটাকে অর্থ বা মনোভাবের ফটো বা চিত্রও বলা যায়। কারণ যে বস্তুটীর অর্থ ঐ শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহার একটী চিত্র বা ফটো মনো-নয়নের সম্মুখে উদিত না হইলে মন তাহাকে চিনিয়া লইতে পারে না। ইংরাজীতে ইহাকেই Imagination বা কল্পনা বলে। 'গোলাপ' এই নামটী করিবা মাত্র গোলাপের একটা চিত্র বা image তোমার মনশ্চক্ষু দেখিতে পায়, তাই তুমি ঐ নাম-গ্রাহ্য বস্তু গোলাপটীর ধারণা করিতে পার। আমাদের লেখা বা লিপি আবার এই উচ্চারিত শব্দের ফটো বা চিত্র।

এই লিপি বা কথার ফটো আবার নানা জাতীয়। আমি ইংরাজী, বাঙ্গালা, গ্রীক, পারসী, ব্রাহ্মী, ফিণিসীয় প্রভৃতি লিপির বিভিন্নতার কথা এখানে বলিতেছি না। ধীরে ধীরে বলিয়া গেলে বালকেরা শ্রুতিলিপি লিখিতে পারে, তাড়াতাড়ি বলিলে পারে না। সুতরাং গড়ের মাঠে বা টাউন হলে বক্তৃতা হইলে তাহা লিখিয়া লওয়া লিপিবিদ্যা-কুশল বালকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেই কারণে বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য Short-hand writing বা সংক্ষিপ্ত লিপি নামে এক অভিনব লিপি-প্রণালীর আবিষ্কার হইয়াছে। আবার টেলিগ্রাফের মেসিনে আমাদের বর্ণ-মালার অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া টেলিগ্রাফের জন্যও টক্কা ও টরে নামক দুইটী শব্দের সাহায্যে বর্ণমালার যাবতীয় বর্ণের উচ্চারণ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং টেলিগ্রাফ-প্রণালীও একপ্রকার ভাষার ফটো বা লিপি। কিন্তু ভাষায় উচ্চারিত শব্দের অক্ষুণ্ণ ফটো চিত্রিত হয়, গ্রামোফোন্ রেকর্ডে। ইহাও এক প্রকার লিপি বা ভাষার ফটো, তাই ইহার নাম রেকর্ড বা লিপি। সুতরাং লেখনী-সাহায্যে উৎপন্ন লিপি ব্যতীতও অনেক প্রকার লিপি আছে, যাহার সাহায্যে আমরা ভাষার ফটো অঙ্কিত করি।

আরও একপ্রকারের লিপি আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি—চিত্র। চিত্র-সাহায্যে আমরা

অনেক কথা বলিতে পারি। চিত্রে মনোভাব স্বাভাবিক লিপিতে প্রকাশ পায়, চিত্রিত ভাষা কৃত্রিম ভাষা নহে। তবে প্রকৃত বস্তুর প্রতিকৃতি যতদূর সম্ভব প্রকৃতের অনুরূপ হওয়া চাই। নতুবা কর্ণ-বিশিষ্ট শৃঙ্গ-বিহীন চতুষ্পদ জীবমাত্রেই অশ্বের বাচক বা প্রকাশক হইবে না। কারণ অশ্ব, মেষ, শৃগাল, গর্দ্দভ প্রভৃতি বহু পশুরই ঐ সকল গুণ আছে। সুতরাং চিত্র-বিদ্যা দ্বারা লিপিবিদ্যার কার্য্য চালাইতে হইলে লেখকের অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দররূপে বহু পদার্থের চিত্র আঁকিবার শক্তি থাকা চাই। কিন্তু লেখকের শক্তি থাকিলেও পাঠকের নিকট অভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং কেবলমাত্র চিত্র-শিল্পের দ্বারা লিপি-বিদ্যার কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায় না।

লিপিবিদ্যা আবিষ্কারের সর্ব্বপ্রথম স্তরেই কিন্তু এই চিত্র-বিদ্যা, কারণ বিনা বর্ণ-বিশ্লেষণে আধুনিক যুগের লিখন-প্রণালী যে আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। আবার কোনও প্রকার লিখন-প্রণালী আবিষ্কৃত না হইলে বর্ণ-বিশ্লেষণেরও যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই, তাহাও প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এক-একটা অর্থ-প্রকাশক শব্দই আমাদের ভাষার উচ্চারণ-কালে একক বা Unit স্থানীয়। শিশু যখন কথা বলিতে শিখে, তখন বর্ণ-বিশ্লেষণ না করিয়াই সমুদায় শব্দটীর উচ্চারণ আয়ত্ত করে। পরে লিপি-বিদ্যার সহিত পরিচয় হইলেই সে বর্ণ-বিশ্লেষণ দ্বারা এক একটী শব্দের বাণান বা বর্ণ-যোজনা করে। বিনা বর্ণ-বিশ্লেষণেই শিশু জল, জপ, জন, জজ, জগ্, প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখে, অথচ লিপি-শিক্ষার আবশ্যকতা না হইলে বর্ণ-বিশ্লেষণের কথা ভাবিতে পারে না। কারণ বর্ণ-বিশ্লেষণ ব্যাপারটী abstraction বা ভাবনিষ্কর্ষ-সাপেক্ষ। কলম, কাগজ, কমল, করণ প্রভৃতি শব্দে যে 'ক' বর্ণের সত্তা আছে, তাহা ঐ সকল শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করা যায়। কিন্তু কলম-কাগজ প্রভৃতি কোনও শব্দ বিশেষে নাই—এমন একটা যে ক-বর্ণ, তাহার সত্তা লিখিবার কালেই অনুভূত হয়। সুতরাং বর্ণমালা-ঘটিত লিখন-প্রণালীর অভিব্যক্তি বর্ণমালা-আবিষ্কারের পূর্ব্বে হয় নাই; এবং সেই জন্যই ইহা প্রাথমিক লিখন-প্রণালী নহে।

অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার অসভ্য জাতিগণ লিখিতে জানিত না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনোভাবের আদান-প্রদানে একেবারে অনভ্যস্ত ছিল, তাহা নহে। অঙ্কন-বিদ্যা ও চিত্রের সাহায্যে তাহারা মনোভাব লিপিবদ্ধ করিতে পারিত। অবশ্য এ উপায়ে মনোভাব প্রকাশ যে সম্পূর্ণ বা অক্ষুণ্ণ হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। বায়োস্কোপে যেমন চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়া চিত্র-সাহায্যে নাট্যের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, ঐ সকল অসভ্য জাতি সেই প্রকার এক-একটী সংবাদ বা অভিমত লিখিয়া পাঠাইবার জন্য কয়েকটী চিত্র একত্র সজ্জিত করিয়া পাঠাইত। ইহা দ্বারা জটিলতা-বর্জ্জিত ও ভাবনিষ্কর্ষবিহীন অতি-সরল মনোভাবসমূহ কোন রূপে প্রকাশিত হইত; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই প্রকার লিখনের ফলে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত এবং বিষ-দান স্থানে

বিষয়া-দানের ন্যায় বিপরীত অর্থও প্রকাশ পাইত।

কথায় বলে—বোবার কথা কালায় বোঝে। অর্থাৎ উচ্চারিত ভাষা ভিন্ন কেবল-মাত্র অঙ্গ-ভঙ্গী বা সঙ্কেত দ্বারা যে ভাষা প্রকাশ করিবার চেষ্টা হয়, তাহা সকলের বোধ-গম্য হয় না। অবশ্য কতিপয় বিশ্বজনীন সঙ্কেত আছে, যাহা সকলেই বুঝিতে পারে —যেমন কর-প্রসারণ পূর্ব্বক আহ্বান, বা অঙ্গুলি-তর্জ্জনপূর্ব্বক ভীতি-প্রদর্শন। কিন্তু এ সকল সঙ্কেত দ্বারা অতি অল্পমাত্র মনোভাবই ব্যক্ত করা যায়। বাগিন্দ্রিয় সাহায্যে উচ্চারিত ভাষা না হইলে কোন রূপ জটিল ভাব প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং চিত্রদ্বারা ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফলে এক-একটী চিত্রের এক-একটী অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইত—যেমন এক-একটী উচ্চারিত শব্দের এক-একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে। এই প্রকারে যে ভাষার অভিব্যক্তি হইত, তাহাও বিনা শব্দোচ্চারণে ভাব-প্রকাশের জন্য বক্তৃ-বোদ্ধব্যের মধ্যে এক একটা অর্থ পরিগ্রহ করিত। চিত্রদ্বারা ভাব-প্রকাশের চেষ্টার ফলে একটা convention বা সঙ্কেত-গ্রহণের ব্যবস্থা পরস্পরের মধ্যে না হইয়াই থাকিতে পারে না। অমুক চিত্র দ্বারা অমুক অর্থ প্রকাশ পাইবে, এরূপ একটা ব্যবস্থা না থাকিলে লিখন-কার্য্যে চিত্রের যোগ্যতা হয় না।

আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেনদেশীয় কর্ম্মচারিগণ যখন দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে শাসন-কার্য্যাদি পরিচালনার জন্য গমন করেন, তখন তাঁহারা ঐ দেশের আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে এক প্রকার রজ্জু-লিপি বা কুইপু-লিপি প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে উহারা বর্ণমালার বিশ্লেষণমূলক লিপিবিদ্যায় অভ্যস্ত ছিল না এবং অদ্যাপি তাহাদের ভাষা লিখিবার জন্য কোন প্রকার বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই। কেবল ইউরোপীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণের প্রযত্নে উহাদের অলিখিত ভাষা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ইংরাজী, গ্রীক, রোমিক প্রভৃতি বর্ণমালা হইতে বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরে ও নীচে চিহ্ন দিয়া এক প্রকার বর্ণ-মালার সৃষ্টি করা হইয়াছে। আজকাল এই বর্ণমালার সাহায্যেই আমেরিকার আদিম-জাতির ভাষাসমূহ (Red Indian dialects) লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। Smithsonian Societyর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফ্রান্জ বোআস (Franz Boas) এই উপায়ে আমেরিকার ভাষার জন্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ব্যাকরণ ও পুরাণ, গল্প বা ছড়া-কাহিনীই উল্লেখ-যোগ্য। সে যাহাই হউক, এই আমেরিকার মধ্যে পেরু দেশে যে কুইপু-লিপি প্রচলিত ছিল, তাহার দ্বারা সাধারণতঃ সন্ধি-বিগ্রহের সর্ত্ত বা অনুমতি এবং রাজাদেশ প্রচার এক অদ্ভুত উপায়ে লিপিবদ্ধ হইত। কুইপু একপ্রকার রজ্জু, দুই-তিন ফুট দীর্ঘ, নানাপ্রকার গ্রন্থিপূর্ণ ও বিবিধ বর্ণে চিত্রিত। রজ্জু মধ্যে রজ্জুর অবস্থান, গ্রন্থির সংখ্যা, সূক্ষ্ম ও স্থূল সূত্র, ও বর্ণ প্রভৃতির দ্বারা ভাব-প্রকাশ হইত, কোনও বাস্তব বস্তুর বাচক ভাব প্রকাশ করিতে বর্ণের ব্যবহার হইত না; ভাব-নিষ্কর্ষ (বা abstract idea) প্রকাশের জন্য বিবিধ বর্ণ ব্যবহৃত হইত। শুভ্রবর্ণ দ্বারা রৌপ্য বা শান্তি (সন্ধি) এবং রক্ত বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ বা যুদ্ধ (বিগ্রহ)

প্রকাশ করা হইত। বলা বাহুল্য, সর্ব্বসম্মত বিধান বা convention ব্যতিরেকে এই প্রকার মূর্ত্তি-বিশিষ্ট বহু-বর্ণ-চিত্রিত লিপিদ্বারা অর্থ-প্রকাশ সম্ভব-পর হয় নাই। কিরূপভাবে গ্রন্থিসমূহ সজ্জিত করিলে, গ্রন্থির সংখ্যা কত হইলে, কি প্রকার বর্ণের (colour) ব্যবহার করিলে, কি প্রকার অর্থপ্রকাশ পাইবে, তাহা লিপিকরকে ও পাঠককে শিখিতে ও অভ্যাস করিতে হইত। অথচ সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ এই উপায়ে সম্ভবপর ছিল না। কোনও দার্শনিক গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক তথ্য এ প্রকার লিখন-প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করা যাইত না।

চীন দেশেও এক কালে বর্ণ-বিশ্লেষণ-মূলক লিপি-প্রণালী ছিল না। বিস্তৃত চীন-সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা ভাষার অস্তিত্ব সত্ত্বেও লিপি এক প্রকারেরই ছিল। এবং তাহাও বিনা বর্ণ-বিশ্লেষণে মনোভাবমাত্র প্রকাশ করিত। T. Nelson & Sons কর্ত্তৃক প্রকাশিত The World and its people শীর্ষক স্কুল পাঠ্য গ্রন্থশ্রেণীর Asia খণ্ডে এই চীন দেশের লিপির বিবরণ আছে :—

Chinese has no alphabet, but 214 simple words from which all the others are derived.

Here, for instance, is the character for the word *sun* 日. If we wish to write the word *morning*, we place the word *sun* above a line which stands for the horizon, and thus we get 旦. The character for *tree* is 木. If we place two of these characters together, thus 林, we have the sign for forest.

Now though all educated Chinamen know what is meant by these signs, they speak different languages in different parts of the Empire. You will understand this better when you rememb r that an Englishman, a Frenchman, a German. a Russian, or a Spania d understands exactly what the figure 2 means when he sees it written or printed. The Englishman, however, says *two,* the Frenchman *deux,* the German *zei,* and thus they cannot understand one another unless they have studied each other's language. Each has a different name for 2, though all have the same sign. In the same way all Chinamen use the same sign for a particular thing though they give it a different name in different parts of the Empire. The sign for book-language is not spoken by any one.

অর্থাৎ চীনবাসিগণের বর্ণমালা বলিয়া কিছু নাই। ইহাদের আছে ২১৪টী মৌলিক শব্দ এবং এই ২১৪টী মৌলিক শব্দের সাহায্যেই যাবতীয় জটিল শব্দ লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহাদের এক একটী মৌলিক শব্দের জন্য এক একটী চিহ্ন আছে। চিহ্নের দ্বারাই

ঐ মৌলিক শব্দনিষ্পন্ন যাবতীয় জটিল শব্দ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যবস্থা বা convention আছে। একটী লম্বভাবে অঙ্কিত সরল রেখার দুই পার্শ্বে শাখা-প্রশাখা জ্ঞাপক তিনটী রেখা সংযুক্ত করিলে চীন দেশের লিপিতে বৃক্ষ শব্দ লিখিত হয়। দুইটী বৃক্ষ পাশাপাশি রাখিলে অরণ্য শব্দ, এবং তিনটী বৃক্ষ একত্র করিলে ছায়া শব্দ লিপিবদ্ধ হয়। এ লিপির সহিত ভাষার কোনও সম্পর্ক নাই। সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে নানা ভাষার অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাহাদের লিপি এক। এ লিপি দর্শনেন্দ্রিয়ের ভাষা। চক্ষু দ্বারা দেখিয়া এই সকল লিপিবদ্ধ শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। উচ্চারিত শব্দের যেমন একটা সর্ব্ব-সম্মত অর্থ আছে, এই সকল লিপিরও সেই প্রকার এক একটা সর্ব্ব-সম্মত অর্থ আছে। অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করে, এই লিপি পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাই করিয়া থাকে। এই সকল লিপির জন্য নির্দ্দিষ্ট কোনও বাচনিক প্রতিরূপ নাই, অর্থাৎ এই লিপি কোনও প্রকার উচ্চারিত ভাষার চিত্র বা ফটো নহে, বক্তার মনোভাবের চিত্র বা ফটো। ইউরোপে (2) ২ দুই অঙ্কটী সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও বিভিন্ন ভাষায় ইহার বিভিন্ন নাম আছে। ঐ অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ্য ভাবটীর বাচক শব্দ সকল দেশে অভিন্ন নহে। ইংলণ্ডবাসী বলিবে *two*, ফ্রান্সবাসী বলিবে *deux*; কিন্তু জার্ম্মাণ বলিবে *zei*; কিন্তু ঐ অঙ্কটী দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে চিনিয়া লইবে এবং ভাবটী বুঝিবে।*

এই প্রকার ভাষা-নিরপেক্ষ বুদ্ধি-মাত্র-গ্রাহ্য লিপি ideograph বা ভাবলিপি নামে অভিহিত। এই লিপির অনুবাচন হয় না, কারণ ইহার বাচনিক প্রতিরূপ নাই। বাক্য বা উচ্চারণের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কেবল-মাত্র অনুমনন বা নিদিধ্যাসন বৃত্তির এই প্রকার লিপির দ্বারা প্রকাশ্য ভাবটী সদ্যই আমাদের বুদ্ধি-গ্রাহ্য হয়।

লিপির অভিব্যক্তির পূর্ব্ব স্তরে এই ভাব-লিপির আবিষ্কার প্রত্যেক জাতির মধ্যেই হইয়াছে। বহুকাল এই ভাবলিপির সাহায্যে মনোভাবের আদান-প্রদান চলিয়াছে; এই লিপির অসম্পূর্ণতা বশতঃ নানা দেশে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে; নানারূপ অসুবিধা পরিহার পূর্ব্বক যোগ্যতর লিখন-প্রণালী আবিষ্কারের জন্য ধারাবাহিকভাবে বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা চলিয়াছে; অবশেষে বর্ণ-বিশ্লেষণ-মূলক লিখন-প্রণালীর অভিব্যক্তি হইয়াছে।

যদি ভাষার সাহায্য ব্যতীত এই প্রকার ভাব-লিপি বা ideographyর সাহায্যে সমস্ত পৃথিবীতে মনোভাব-মাত্র প্রকাশের জন্য একটা অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইত, তাহা হইলে নানা দেশে নানা ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা থাকিত না। বিভিন্ন দেশের লোকে এই ভাব-লিপি বা ideographyর সাহায্যেই পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারিত, এবং বাঙ্গালী শিশুকে

* বর্ত্তমান কালে চীনদেশে লিখন-পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

psalm, knight, doubt, debt প্রভৃতি ইংরাজী শব্দের বিচিত্র বর্ণ-যোজনা লইয়া দিশাহারা হইতে হইত না। সুতরাং সমগ্র জগতের মধ্যে ভাষা-গত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে একটা একতা সংস্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার নহে। ভাবের অভিব্যক্তি ভাষা অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দের দ্বারা যেরূপ সুচারুভাবে সম্ভবপর, অন্য কোনও প্রকার সঙ্কেত বা ইঙ্গিতের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উচ্চারিত ভাষাই যখন সুচারুরূপে আমাদের মনোভাব প্রকাশের প্রকৃষ্টতম উপায়, তখন এই কার্য্যের জন্য অন্য কোনও অভিনব উপায়ের আবিষ্কার করিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ প্রকৃষ্টতম উপায়ের চিত্র বা ফটো লওয়াই লিপিবিদ্যার চরম উদ্দেশ্য। শ্রবণেন্দ্রিয় সাহায্যে শ্রোতব্য শব্দের দর্শনেন্দ্রিয় সাহায্যে গ্রাহ্য চিত্র সুচারুরূপে অঙ্কিত করিতে পারাই হইয়াছে লিপিবিদ্যার চেষ্টা।

অঙ্কন-লিপি বা রজ্জু-লিপির দ্বারা শিক্ষিত সমাজে লিখন-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তবে আমেরিকা-বাসিগণের মধ্যে যে এই প্রকার লিপি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে আমরা তাহাদের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ কল্পনা করি না। যে কারণে তাহারা সমগ্র বাক্যের বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শব্দের সত্ত্বা বুঝিতে পারে নাই, সেই মনোবৃত্তির খর্ব্বতা-নিবন্ধনই তাহারা মনোগত সমগ্র ভাবটীকে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়া ছিল; কারণ বিশ্লেষণ-কার্য্য তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। F. Muller বলিয়াছেন—

For those, who, like the American Indians, possessed languages of the poly-synthetic type, and whose mental processes had not arrived at the analysis of the sentence into individual words, much less into individual sounds, no other method of ocular communication of thought-world suggest itself than one which expressed a whole conception as a unit. For the representation of the component elements, first, as far as words, then as far as syllables, and finally as far as sounds, it was necessary to find some new point of departure.

ভাব-লিপি বা ideographyর সাহায্যে এক-একটী শব্দ-গ্রাহ্য ভাব এক-একটী চিহ্ন দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। চিত্র-লিপি বা রজ্জু-লিপিতে যেমন সমগ্র ভাব-প্রকাশক বাক্য বা sentenceএর প্রতিলিপি একক বা unit স্থানায়, ভাব-লিপি বা ideographyতে তাহা নহে। ভাব-লিপির সাহায্যে একটী বাক্য বা sentence কয়েকটী চিহ্ন বা symbol একত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং বাক্য-চিত্র বা sentence-writing অপেক্ষা ভাব-চিত্র বা ideographyর যোগ্যতা অধিকতর; কারণ এই লিখন-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে, এবং বস্তুতঃ পক্ষে এই ভাব-লিপি বা ideography হইতেই বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে।

চীনবাসিগণ প্রাচীনকালে যে চিত্র-লিপির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মিশর দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ যে hieroglyphic বা চিত্রমূলক cuneiform লিপি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, এবং আমেরিকার অপেক্ষাকৃত সমুন্নত (Aztec) অজ্‌তেক জাতি যে প্রকার লিপির ব্যবহার করিত, তাহাতে এক-একটী শব্দ-বোধক এক-একটী চিত্র বা চিহ্ন পরিকল্পিত হইয়াছিল। সমগ্র বাক্য একটী চিহ্ন দ্বারা অভিব্যক্ত হইত না। প্রথমতঃ এক-একটী ভাবকে চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কারণ তাহা না হইলে হয়ত ভাব-প্রকাশে বাধা ঘটিতে পারে। কিন্তু স্পষ্টভাবে প্রত্যেক চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে লিপিকার্য্য সময় সাপেক্ষ ও কষ্ট-সাধ্য হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বসাধারণে সে প্রকার লিখন-প্রণালী অভ্যাস করিতে পারে না। সেইজন্য ক্রমে ক্রমে ভাব-প্রকাশক চিহ্ন-স্বরূপ চিত্রটীর সৌন্দর্য্যের সমাদর কমিয়া যাহাতে অল্পায়াসে বা অনায়াসে চিত্রটী অঙ্কিত করা যায়, তাহারই চেষ্টা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং অবশেষে যে মূল বস্তুটীর প্রতিকৃতি অবলম্বনে ভাব-প্রকাশক লিপির আবির্ভাব হইয়াছে, সেই মূল বস্তুর সহিত তাহার চিত্রের কোন সাদৃশ্যই রক্ষিত হয় না।

এইরূপ লিখন-প্রণালীতে কিরণ-জাল পরিবেষ্টিত বৃত্তের দ্বারা সূর্য্যরূপ-বস্তু-প্রকাশ্য ভাব লিপিবদ্ধ হইতে পারে। বৃক্ষ, চতুষ্পদ, মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতির জন্যও সহজে বুঝা যাইতে পারে, এই প্রকার এক-একটী চিত্রের কল্পনা স্বাভাবিক। কিন্তু abstract idea বা ভাব-নিষ্কর্ষ বুঝাইবার জন্য যে বস্তু হইতে ঐ ভাব নিষ্কর্ষণ-দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, সেই বস্তুর বা বস্তুদ্বয়ের চিত্র-লিপি স্থানীয় হইতে পারে। চীনদেশের প্রাচীন লিপিতে 'শ্রবণ' ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের চিত্রের পার্শ্বে একটী দরজার চিত্র পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই প্রকারে পরস্পর-পরিশ্লিষ্ট হস্তদ্বয়ের চিত্রই উক্ত চীনদেশের লিপি-প্রণালীতে '**বন্ধুত্ব**' শব্দের বাচক ছিল। মিশরের ভাব-চিত্রে **তৃষ্ণা** বুঝাইবার জন্য জলের চিত্রের পার্শ্বে ধাবমান গো-বৎস অঙ্কিত হইত। চীনদেশে **পর্ব্বতের** বাচক চিহ্ন ছিল তিনটী শৃঙ্গ বিশিষ্ট একটী পর্ব্বতের চিত্র M কিন্তু লিপিকরের সুবিধার জন্য এই চিহ্ন তিনটী মাত্র বিন্দুযুক্ত একটী রেখাতে পরিণত হইয়াছে, ⊥; দুই পদ যুক্ত λ চিত্রটি **মনুষ্য** শব্দের বাচক। মিশরের লিপিতে **সিংহী** শব্দের বাচক ছিল ইংরাজী L অক্ষরের ন্যায় একটী অস্পষ্ট সিংহী-চিত্র ℒ; এবং পরে এই চিত্র হইতেই L অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে।

বস্তু-বিশেষের চিত্র হইতে তাহার ভাব-প্রকাশক চিহ্নের আবিষ্কার-মূলক লিখন-প্রণালীতে লিপি-সৌকর্য্যার্থ কালক্রমে ভাব-প্রকাশক লিপি বা চিহ্নগুলি যে মূল বস্তুর চিত্রের স্বরূপ হারাইয়া বসিবে, ইহাই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। চীন ও মিশর দেশে আন্দাজ খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বর্ষে এই ভাবলিপি-সমূহ মূল বস্তুর চিত্রের স্বরূপ হারাইয়া অঙ্কন-সৌকর্য্য-মূলক সরল ও বক্র রেখা প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হয়।

এই প্রকার লিখন-প্রণালীর একটী প্রধান

অসুবিধা এই যে ইহাতে বস্তু বিশেষের ভাব লিপিবদ্ধ করিলেও ক্রিয়ার কাল বা বিবিধ সম্ভাবনাদির ভাব (tense and mood) লিপিবদ্ধ করিতে পারে না, বা পারিলেও অতি বিচিত্র উপায়ে পারে। তাহাতে দার্শনিক চিন্তা-প্রণালীর অভিব্যক্তি ত হইতেই পারে না, উপরন্তু দৈনন্দিন কার্য্য-সম্পাদনের উপযোগী ভাষাও লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই প্রকারের চিন্তা-প্রণালীতে 'যদি' শব্দ-গ্রাহ্য ভাব-প্রকাশক চিত্রের কল্পনা অসম্ভব। আবার এক-একটী বিচ্ছিন্ন ভাব লইয়া যদি এক একটী লিপির কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষের চিন্তা-গ্রাহ্য অসংখ্য ভাবের জন্য অসংখ্য লিপির কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই জন্য চীন দেশের বস্তু-বিশেষের ভাব বা অর্থ-প্রকাশক চিত্রমূলক চিহ্নগুলি তত্তৎ শব্দের উচ্চারণ-মূলক ধ্বনির চিহ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে homophone বা homonym বলা হয়। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহাদের উচ্চারণে প্রভেদ না থাকিলেও অর্থগত বিভিন্নতা আছে। এই সকল শব্দকে homophone বা homonymবলে। অর্থের পরিবর্ত্তে ধ্বনির প্রকাশ-চেষ্টার ফলে চীন দেশের লিখন-প্রণালীর যথেষ্ট সরলতা সম্পাদিত হইয়াছে এবং এই সকল অক্ষর বা ধ্বনি-বোধক লিপির সংখ্যা হইয়াছে, আন্দাজ পাঁচ শত।

চীন দেশের ভাষায় সমোচ্চারণ ও বহু অর্থ-প্রকাশক শব্দের সংখ্যা এত অধিক যে অর্থের পরিবর্ত্তে ধ্বনি-প্রকাশের চেষ্টাতেও লিখন-প্রণালীর প্রকৃত সরলতা সম্পাদিত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ—'হুবঁ' শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শব্দের অর্থ—'ঈগল পাখী', 'রাজপুত্র', 'শীতল জল', 'ভয়' প্রভৃতি, এবং আরও কত অর্থ আছে। সুতরাং লিখিবার কালে ঐ ধ্বনির বাচক একটী চিত্রে কাজ চলে না। সুতরাং ঐ শব্দের দ্বারা প্রকাশ্য অর্থ যথেষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য ঐ হুবঁ ধ্বনি-বোধক চিত্র বা চিহ্নের পার্শ্বে রাজপুত্র, শীতল জল প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য আর-একটী করিয়া চিত্র আঁকিয়া দিতে হয়।

মিশর দেশেও এই প্রকার সমোচ্চারণ শব্দ-সমূহের জন্য এক-একটী চিত্রের কল্পনা ঠিক এই ভাবেই হইয়াছিল, এবং তাহার অর্থ বুঝাইবার জন্যও ঐ প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, উদাহরণ স্বরূপ নেফের্ শব্দের অর্থ—'যৌবন','অশ্ব-শাবক', 'বীণা' প্রভৃতি হইলেও—নেফের্ *nefer* শব্দের পার্শ্বে স্বর, সুর বা sound শব্দের বাচক একটি চিত্র দিয়া বীণা শব্দের বাচক লিপি হইত।

এক একটী অর্থবোধক অক্ষর বা syllable লইয়া চীন দেশের ভাষা গঠিত বলিয়া চীনবাসিগণ আর তাঁহাদের লিখন-প্রণালীর সরলতা-সম্পাদনের চেষ্টাও করেন নাই। বর্ণ-বিশ্লেষণ তাঁহাদের আবশ্যকই হয় নাই।

কিন্তু মিশর বা Egypt দেশের ভাষা mono-syllabic বা অক্ষর মাত্রের সমষ্টিতে গঠিত নহে। ইহাদের এক-একটা শব্দে একের অধিক অক্ষর ছিল এবং উপসর্গ ও প্রত্যয় দ্বারা ইহাদের ভাষায় শব্দ গঠিত

হইত। সুতরাং বস্তুমাত্র-বোধক শব্দের বাচক অক্ষর লইয়া ইহাদের কাজ চলে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইহাদের ভাষায় সোন্ (son) শব্দের অর্থ ভ্রাতা; সোনা (sona) আমার ভাই; সোন্‌ক্ (sonk) তোমার ভাই; সোন্‌ফ্ (sonf) তাহার ভাই; সোন্‌উ (sonu) ভ্রাতৃগণ; সোন্‌ত্ (sont) ভগিনী। এই সকল প্রত্যয় হইতে বিশ্লেষণ করিয়া লইলেই পাঁচটী বর্ণ a, k, f, u, t পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণ ভাবে ভাষার কার্য্য-নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইহাদের লিখন-প্রণালীতে বর্ণ-বিশ্লেষণ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। তাই এক-একটী শব্দের বোধক চিত্র-লিপি অবশেষে এক-একটী বর্ণ বা অক্ষরের লিপি হইয়াছে। ঈগল পাখীর বাচক ahom শব্দের প্রতিলিপি হইতে a, মুখ-বাচক ro হইতে r, এবং সিংহী-বাচক laboi হইতে l অক্ষরের লিপি এই প্রণালীতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

এই প্রকারে যখন এক-একটী অক্ষরের বাচক পঞ্চবিংশতি লিপি উদ্ভাবিত হইল, তখনও মিশর-বাসিগণ সমগ্র শব্দ-বাচক ধ্বনির লিপি পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদিগের অতি-প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহে যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অকারাদি বর্ণের বিশ্লিষ্ট লিপি ও সমগ্র শব্দের ধ্বনি-বাচক লিপি যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহারা পঁচিশটী বর্ণের আবিষ্কার করিলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐ পঁচিশটী বর্ণের লিপির ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের উদ্ভাবিত এই লিপিবিদ্যা যাঁহারা নিজেদের ভাষার লিখন-প্রণালীতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই বর্ণ-বিশ্লেষণ-মূলক লিপিসমূহের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক উপায়ে করিয়াছেন। বেবিলোনের ফিনিসীয়গণ ব্যবসায়-প্রসঙ্গে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন; তাঁহারা মিশর দেশের উদ্‌ভাবিত এই বর্ণমালা স্বদেশে লইয়া গিয়া ব্যবহার করেন এবং তাঁহাদের যত্নে এই বর্ণমালা পরিপুষ্টি লাভ করে।

এখন যে-যে স্তরে বর্ণমালা-মূলক লিপির আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করিব :—

(১) ভাব-প্রকাশক লিপি—

(ক) সমগ্র বাক্যের চিত্র—আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ।

(খ) এক-একটী শব্দ-গ্রাহ্য ভাবের চিত্র (ideograms বা ভাব লিপি)—মেক্সিকো-বাসিগণ, চীনের প্রাচীন অধিবাসিগণ ও আদিম মিশর-বাসিগণ।

(২) ধ্বনি-প্রকাশক লিপি—

(ক) শব্দ-লিপি বা phonograms (এক চিত্রের দ্বারা বহু সমোচ্চারণ শব্দের লিখন) চীনের আধুনিক লিপি, প্রাচীন মিশরের লিপি।

(খ) অক্ষর বা syllable লিখিবার প্রণালী—জাপানী ও সেমিটিক বক্রলিপি (cuneiforms)

(গ) বর্ণমালা-মূলক লিপি—(সম্পূর্ণ বর্ণ-বিশ্লেষণ হয় নাই, সমগ্র শব্দের ধ্বনি-বাচক, লিপির প্রথম অক্ষরের উচ্চারণে ব্যবহার, ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্র লিপিবদ্ধ, স্বরবর্ণ বিশ্লেষণ হয় নাই)—সেমিটিক। মিশরের লিপি এই সোপানে আসিয়া ক্ষান্ত হয়, পরবর্ত্তী প্রণালীতে উন্নীত হইয়াছিল।

(ঘ) বিশুদ্ধ বর্ণমালা-মূলক লিখন-প্রণালী (প্রত্যেক বর্ণের জন্য পৃথক পৃথক চিহ্ন)— গ্রীস ও ইটালি দেশে, উত্তর-কালে মিশর দেশে ও পারস্য দেশের বক্র লিপিতে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কবে সে ডাক্‌লো কোকিল

কবে সে　ডাকলো কোকিল,
　ফুটলো বকুল,
হৃদয়ে　ছুটলো তুফান,
　ভাস্‌লো দুকুল!
কে এসে　বাসিয়ে ভাল,
　বাস্‌লে ভাল,
আদরে　রাখ্‌লে বুকে,
　বুক জুড়াল!
আকাশে　লক্ষ চাঁদের
　লক্ষ বাতি
দিল গো　জ্বালিয়ে দিল
　বাসর-রাতি!
বাতাসে　ঘোম্‌টা খসে
　পড়ল কখন,
হোলো সে　চারটি চোখের
　চকিত্‌ মিলন!
কত-না　চাঁদনি রাতি
　চাঁদের সনে
কেটেছে　জাগিয়ে জেগে
　সঙ্গোপনে!
কত সে　প্রণয়-লীলা,
　প্রেম-অভিনয়!—
হৃদয়ে　হৃদয় রেখে
　প্রাণ-বিনিময়!

তবুও　মিট্‌তো সে কই—
　প্রণয়-তৃষা?
পিপাসা　জ্বল্‌তো বুকে
　দিবস-নিশা!
বিরহে　পথটি চেয়ে
　মিলন-আশে,
কত না　দাঁড়িয়ে থাকা—
　পথের পাশে!

কোকিলে　দেয় না সাড়া
　আর ত এখন,
ঝরেছে　বকুল গোলাপ
　হায় গো কখন!
দেখে সে　ফুলের স্বপন
　মনের ভুলে
কাননে　ধায় ভ্রমরে
　কান্না তুলে!
আকাশে　সোনার চাঁদে
　নিব্‌লো আলো,
ঢেকেছে　মুখটি মেঘে
　নিবিড় কালো—;
পরীরা　আর নামেনা
　স্নানের তরে,
জ্যোছনা　অমল ধবল
　শ্বেত সায়রে!

ছোটে না	হৃদয়-নদী	মেটেনি	মিট্‌বে না আর
	তুফান বুকে,		প্রণয়-তৃষা—
খোলে না	ঝরণা মধুর,	পিপাসা	জ্বলচে বুকে
	মিষ্টি মুখে।		দিবস নিশা—।
ভেঙেছে	সোনার স্বপন	বিরহে	পথটি চেয়ে
	প্রেম-অভিনয়		মিলন-আশে
জীবনে	আর কভু নয়	কাতরে	দাঁড়িয়ে আজো
	আর কভু নয়!		পথের পাশে।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

গুলুর বে

(গল্প)

বয়স জিজ্ঞাসা করিয়া সাহেব যখন শশীর নিকট হইতে জবাব পাইলেন, যে, সে এণ্ট্রান্স ক্লাশ অবধি পড়িয়াছে, তখন তিনি মুক্তারাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এ রকম লোক আর কতগুলি আছে? এই সামান্য কথাটার জবাব দিতে না পারায় মুক্তারাম বাবু শশীর উপর খুব চটিয়াছিলেন, দাঁতে দাঁত দিয়া মুখে বাড়্ বাড়্ করিয়া কি বলিতেছিলেন। মুখের ভাব বদলাইবার চেষ্টা করিলেও সাহেব তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

"পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ইংরেজের মুখ কি কখনো দেখেচে? এই প্রথম, তার উপর আপনাদের উচ্চারণ,—ও ঘাব্‌ড়ে গিয়েছে, সাহেব।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "চাটার্জ্জি, স্কুলে গিয়েছিল অন্ততঃ এই রকম ছেলে দেখে এনো। যা হোক, একে আমি উপস্থিত unpaid apprentice নেবো, কি রকম কাজ করে দেখে মাহিনার বন্দোবস্ত করবো।"

মুক্তারাম বাবুর আশা ছিল না যে সাহেব এতটা দয়া করিবেন। তিনি ইহাতেই কৃতার্থ হইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিয়া নিজের কাজে আসিলেন।

মুক্তারাম চট্টোপাধ্যায় বার্টন ব্রাদার্স-এর অফিসের বড় বাবু, বেতন মাসে দেড়শত টাকা মাত্র। অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন করিতে হয়, এজন্য আর্থিক অবস্থা তত সচ্ছল নয়। ডায়মণ্ড হারবার লাইনের গড়িয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে নোনা গ্রামে তাঁহার নিবাস। তিনি নিরীহ প্রকৃতির লোক, কখনও তাঁহার সহিত কাহারও ঝগড়া বা বচসা হইয়াছে বলিয়া

শুনা যায় না। যথাসাধ্য লোকের উপকারই করিয়াছেন। কাহারও উপরোধ তিনি এড়াইতে পারিতেন না, এ-কারণ যে যখন তাঁহাকে চাকরির জন্য ধরিয়া বসিয়াছে, তিনি পাত্র-অপাত্র বিবেচনা না করিয়া নিজের অফিসেই হউক বা অনুরোধ-উপরোধ করিয়া অন্য কোন সওদাগরী অফিসেই হউক, চাকরি করিয়া দিয়াছেন। মুক্তারাম বাবুর অনুগ্রহে নোনা গ্রামের কেহ বেকার বসিয়া ছিল না। তাঁহার জনৈক বন্ধু স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক একদিন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া ছিলেন, "মুক্তো থাকতে গ্রামের ছেলেদের লেখা-পড়া হবে না।" সত্যই স্কুলে শিক্ষকেরা যে সকল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিবার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি করিতেন, তাহারাই স্কুল ছাড়িয়া মুক্তারাম বাবুর শরণাপন্ন হইয়া পড়িত, চাকরিও পাইত। এই জোরেই বোধ হয় দয়াল চক্রবর্ত্তীর পুত্র শশী যখন তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে পারিল না, অভিভাবকের পত্র ও সেক্রেটারি মহোদয়ের অনুরোধেও যখন হেডমাষ্টার মহাশয় তাহাকে উঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন সে শিক্ষক-দিগকে ভয় দেখাইয়া ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া স্কুল পরিত্যাগ করিল। দিনের বেলায় ছিপ ফেলিয়া আর রাত্রে থিয়েটারের আখড়ায় গিয়া রিহার্শাল দিয়া কিছুদিন সে কাটাইয়া দিল। বাপ দয়াল চক্রবর্ত্তী তেজারতি কারবার করিয়া অনেক পয়সা করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় টাকা ধার না দিলে গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই কাজ-কর্ম্ম করা দুরূহ হইয়া পড়িত। শুনা যায়, তিনি নাকি টাকা ধার দিবার সময় প্রথম মাসের সুদটি কাটিয়া লইয়া বাকী টাকা দিতেন, আর হ্যাণ্ডনোট বা খতের সহিত তদুপযুক্ত মকর্দ্দমা খরচের জন্য নোটও গাঁথিয়া রাখিয়া দিতেন, পাছে ভবিষ্যতে টাকার অভাবে মকর্দ্দমা করিবার কোন অসুবিধা ঘটে। টাকা থাকিলে লোকে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকে। যাহা হউক, তাঁহার অবস্থা সকল বিষয়ে সচ্ছল হইলেও তিনি যে ইংরাজী জানেন না, সাহেবের চাকরি করেন না, আর লোকে তাঁহাকে দয়াল বাবু না বলিয়া চক্রবর্ত্তী-মশায় বলে, ইহাই তাঁহার বড় কষ্টের কারণ। সে কারণ পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া শশীবাবু করিবেন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ভগবান তাহাতেও বাদ সাধিলেন।

স্বামী-স্ত্রীতে প্রত্যহই কল্পনা করেন, মুক্তারাম বাবুকে ধরিয়া যদি একটি চাকরির জোগাড় করা যায়! আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও শশী কিছুতেই মুক্তারাম বাবুর কাছে যাইতে ইচ্ছুক নয়, কারণ স্কুল ছাড়া, থিয়েটার করা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার পুত্র হরির সহিত তাহার সে দিন বিশেষ ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।

নিজের ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা মুক্তারাম বাবু বরাবর পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, সে কারণ পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে কলিকাতায় মেসে রাখিয়া পড়াইতেন, দেশের ছেলেদের সংসর্গে যাহাতে সে আসিতে না পারে। তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণও হইয়াছিল। হরি প্রশংসার সহিত এণ্ট্রান্স ও ইণ্টার মিডিয়েট পাশ করিয়া এই বৎসর বি-এ দিয়াছে।

কলিকাতা হইতে সে যখনই বাড়ী আসিত, গ্রামের ছেলেদের সহিত মিশিত না। এজন্য তাহারা তাহাকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করিত। কিন্তু তাহাদের স্বভাব-চরিত্র আচার-ব্যবহার দেখিয়া হরির মনে বড়ই কষ্ট হইত। পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে তাহাদের মন অন্যদিকে ফিরাইতে পারে, এজন্য গত দুই বৎসর বদ্ধপরিকর হইয়া গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপন, ডিবেটিং ক্লাবের অনুষ্ঠান, সেবক-সমিতির প্রতিষ্ঠা, ব্যায়াম-চর্চ্চার ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতেছে। যখনই কলেজ হইতে অবকাশ পাইত, বাড়ী আসিয়া এই সব সম্বন্ধে কতদূর কি হইতেছে না হইতেছে, কোন্ কোন্ ছেলে খারাপ হইয়া যাইতেছে, স্কুলে কাহার কাহার পড়া-শুনার সুবিধা হইতেছে না-হইতেছে, এ সব সম্বন্ধে সে বিশেষ তদন্ত করিত, এবং যথাসাধ্য প্রতিকারেরও চেষ্টা করিত। ফলে এ কাজে তাহার সঙ্গীও অনেক জুটিল, কিন্তু প্রকৃত কথা ধরিতে গেলে তাহার মিত্র অপেক্ষা শত্রুই অধিক হইয়া পড়িল। সে ছেলেদের নেতা হইয়া চলিতে চায়, যাকে-তাকে শাসন করিতে চায়, যাত্রা-থিয়েটারের আখড়া উঠাইয়া দিতে চায়, পর-নিন্দা পর-চর্চ্চার অন্তরায় হইতে চায়, এ-সব গ্রামের সকলে অবাধে সহ্য করিবে কেন? মুখে অনেকে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারে না বটে, কিন্তু সর্ব্বদা তাহাদের ইচ্ছা, কিসে হরিকে জব্দ করা যায়। সম্প্রতি থিয়েটার উপলক্ষ্য করিয়া শশী ও অপর কয়েকটি ছেলে—ছেলে কেন—অনেক অভিভাবকের সহিত তাহার বিশেষ কলহ হইয়া গিয়াছে! থিয়েটার করিলেই লোক উৎসন্নে যায়, এটা নাকি তার ভুল ধারণা! থিয়েটার দেশের কত উপকার করিয়াছে, ভারতে বাঙ্গালী যে আজ বড় হইয়াছে, থিয়েটারই তার একটি কারণ! এই থিয়েটার করিয়াই লোকে জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। যাত্রা-থিয়েটার করা, সঙ্গীত আলোচনা করা প্রভৃতি সমাজের উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম উপায়! এ সকল তর্কে হরি কোন জবাব দিত না, কিন্তু ঐ লোকগুলার উপরে সে হাড়ে হাড়ে চটা ছিল। শশীকে স্কুলে ত্যাগ করিয়া ঐ দলে মিশিতে দেখিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ফল বিপরীত দাঁড়াইল। শশী হরির সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিল; আর এই কারণেই হরিদের বাড়ী আসিয়া সে তাহার বাবাকে চাকরির জন্য ধরিতে পারিতেছিল না।

পুত্র যখন কিছুতেই আসিল না, তখন একদিন চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী স্বয়ং মুক্তারাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। হরির মা বড়ই বিষণ্ণ, মেয়ের বিবাহের সব ঠিক, কিন্তু পণের টাকা কোথাও জোগাড় হইতেছে না, বিবাহের দিন ক্রমাগত পিছাইয়া দিতে হইতেছে। বরপক্ষীয়েরা এবার বলিয়া দিয়াছেন, ১৫ই বা ১৬ই তারিখে যদি বিবাহের দিন স্থির করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অন্যত্র পুত্রের বিবাহ স্থির করিবেন। মাত্র দশ দিন বাকী, টাকা কোথায়? তাহাদের কোন জবাবও দেওয়া যাইতেছে না। অবসর বুঝিয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী পুত্রের চাকরির কথাটা পাড়িয়া বলিলেন, "দেখ বৌ, শশে আমার ছেলে ভাল। নবীন মাষ্টার, তিন্ তিনটে পাশ, বলতো,

দিদি, তোমার ছেলে খুব ইংরজী জানে, আর এ পোড়া দেশের মাষ্টারেরা কিনা তাকে ক্লেলাসেই তুললে না! যাক্ ভাই, যদি ঠাকুরপো শশেকে একটা চাকরি করে দেয়, টাকা ধারের জোগাড় আমিই করে দেব, ভাবতে হবে না।"

"আঃ, বাঁচালে দিদি! তোমার দেওর তো ঘরেই আছে, চল না ভাই।"

মুক্তারাম বাবু সমুদ্রে ভেলা পাইলেন। কত লোকের কত চাকরি করিয়া দিয়াছেন, আর শশের চাকরি করিয়া দিতে পারিবেন না? নিশ্চয়ই পারিবেন।

পরদিন প্রাতে যথাসময়ে শশী মুক্তারাম বাবুর বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলে হরি তাহার বাপকে বলিল, "বাবা, আপনি যে বসন্ত কাকাকে আশা দিয়েছিলেন, ফটিকের—"

ঠিক সেই সময় বসন্ত বাবু গামছা-স্কন্ধে দন্ত মার্জ্জন করিতে করিতে মুক্তারাম বাবুর পুষ্করিণীতে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে সেইখানে আসিলেন। শশীর পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া ইসারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? মুক্তারাম বাবু বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, ফটিকের কথাই তো বলেছিলুম, কিন্তু গুলের বে যে হয় না—হাজার টাকা কে দেয়, বল?" বসন্তবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না, "তাতো বটেই" বলিয়া তিনি পুষ্করিণীতে নামিলেন। "মুখ্যুটার আবার চাকরি—!" বলিতে বলিতে হরি বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। কথাটা শশীর কাণ এড়াইল না; সে চটিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

২

কুঠীওলারা যাইবার দুই ঘণ্টাও বিলম্ব হইল না, গ্রামের মধ্যে একটা গুজ-গুজ ফুস্-ফুস্ চলিল—"হাজার টাকা দিয়ে চাকরি, ব্যাপার কি সোজা?" সকলেই অবাক্ হইয়া গেল, মুক্তারাম বাবু এমন ঘুষখোর!

পথে ও গাড়ীতে মুক্তারাম বাবু শশীকে সাহেব কি কি প্রশ্ন করিতে পারেন, সেই সব প্রশ্ন ও তাহার জবাবে কি বলিতে হইবে শিখাইতে শিখাইতে লইয়া গেলেন, কিন্তু ফলে সে এক প্রশ্নের উত্তরে অন্য জবাব দিয়া বসিল। সাহেবের নিকট অপ্রতিভ হইয়া মুক্তারাম বাবু শশীকে খুব কতকগুলা ভৎর্সনা করিলেন। শশী চটিয়া গেল। "চাকরি না করলে সে খেতে পাবে না এমন তো নয়, তবে আর দু'কথা শোনানো কেন?" সে এই ভাবিয়া তখনই বাড়ী যাইতে উদ্যত হইল। এখন স্বার্থ মুক্তারাম বাবুর, তিনি তাহাকে চাকরি দেওয়াইবেনই, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, দু' একদিন মাত্র এপ্রেণ্টিশ-গিরি করিয়া পরে বলিয়া-কহিয়া পাকা চাকরি করাইয়া দিবেন। শশীর কোন কথাই ভাল লাগিল না, সে আড়াইটার গাড়ীতে বাড়ী চলিয়া আসিল। সাহেব যাহাতে অন্ততঃ পনেরো টাকা বেতনও মঞ্জুর করেন, মুক্তারাম বাবু সেজন্য পুনরায় চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলেন।

বাড়ীতে আসিয়া শশী মার নিকট কাঁদিয়া পড়িল। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী তখনই পাড়া মাথায় করিয়া তুলিলেন। হরির মা কুঠি-ওলাদের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিলেন। গৃহিণী থামিয়া বাটীতে আসিলেন বটে, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় থামিবার পাত্র নন; স্ত্রীকে বলিয়া উঠিলেন, "জানিগো জানি, বোকারামের বেটা

মুক্তোরাম, তা আর কত ভাল হবে? আমার বাপের খেয়ে মানুষ হয়েছিল; এখন কি আর সে কথা মনে আছে? গলা দে' জল উলে গেছে। ও এখন মুক্তোরাম বাবু আর আমি শালা দয়াল চক্কোবর্ত্তী! দেখবো, দেখবো, মেয়ের বের টাকা কে দেয়?"

বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর নিকট শশীর মার কথাগুলি শুনিয়া মুক্তারাম বাবু হাসিয়া ফেলিলেন, যথাযথ ঘটনা স্ত্রী-পুত্রকে বিবৃত করিলেন। হরি বলিল, "তখনই তো বলেছিলুম, ও-সব মুখ্যুদের নিয়ে গিয়ে সাহেবের কাছে কেবল খেলো হওয়া।"

যাহা হউক, পরদিন হরি আসিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয়কে বলিয়া গেল যে, সাহেব শশীকে সেইদিন অফিসে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন, সে যেন আজ যায়। তাহার কথা শুনিয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী বলিলেন, "দেখলে, মুক্তো-ঠাকুরপো কি সে রকম লোক—আমার মাথার যত চুল, তত পেরমাই হোক—সোনার দোতকলম হোক—আসুক্ শশেটা—"

"ওগো, তুমি মেয়ে মানুষ, বোঝো না, বোঝো না, ফস করে একটা কথা বলে ফেল! মুক্তো ভেবেছিল, বেগ দিলে আরও হাজার টাকা বেরুবে। উহু, দয়াল চক্রবর্ত্তী সে ছেলেই নয়। এখন দেখলে সব যায়, তাই—"

"হলোই না হয়। আর এক হাজার ধার! অম্‌নি তো আর নিচ্ছেনা, সুদও কোন্ ছাড়বে?"

"আজ-কালকার বাজারে শুধু হাতে টাকা দেবে কে?" বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুত্রের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। শশী সে দিন তাহাদের থিয়েটারের চাঁদা আদায় করিতে দূর গ্রামে অন্য একটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই তাহাদের "হরিরাজ" অভিনয় করিতে হইবে—সময়ও আর নাই।

অফিসের সময়ের মধ্যে চক্রবর্ত্তী তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না, সেও আসিয়া জুটিতে পারিল না, সুতরাং সে দিন তাহার আর অফিসে আসা হইল না।

শশী আসিতে পারিল না বটে, মুক্তারাম বাবু কিন্তু সাহেবের নিকট গিয়া অনেক ধরিয়া-করিয়া তাহাকে কুড়ি টাকা বেতনে শিক্ষানবীশ করাইয়া লইলেন। কেননা সেইদিনই বড় সাহেবকে কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে, আর তিনি যে কবে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহারও স্থিরতা নাই। ম্যানেজার সাহেব স্বয়ংই তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্য্য দেখিবেন, ছোট সাহেব অ্যাশিষ্ট করিবেন।

ছেলের চাকরি হইল, চক্রবর্ত্তী এখন নিশ্চয়ই টাকা ধার দিবেন এই ভাবিয়া মুক্তারাম বাবু কালবিলম্ব না করিয়া কয়েকদিনের ছুটি লইয়া পাত্রের বাপের হাতে-পায়ে ধরিয়া, তিন হাজার টাকার পরিবর্ত্তে নগদ দেড় হাজার টাকায় চুক্তি করিবার জন্য সেই দিনই আড়াই-টার সময় অফিস হইতে বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় দয়াল চক্রবর্ত্তীকে দিবার জন্য স্বগ্রামবাসী নিমাই বোসের নিকট একখানি পত্র দিয়া গেলেন।

ভাগ্নে ফটিকের চাকরি হইল না। বসন্ত বাবু ছোট সাহেবকে ধরিয়া বসিলেন, তিনিও সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বড় সাহেব শশীকে এপ্রেন্টিস

লইবেন, মুক্তারাম বাবুর নিকট প্রতিশ্রুত। ছোট সাহেব বিলাত হইতে সবে আসিয়াছেন, অফিসে নূতন, অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। এ দেশের ধরণ-ধারণ শিখিতে বিলম্ব আছে। বড় সাহেবের কথায় ছোট সাহেব ক্ষুণ্ণ হইলেন, উপস্থিত কিছুই করিতে পারিলেন না, পরে সময় পাইলে তিনি মুক্তারাম বাবুকে দেখিয়া লইবেন বলিয়া বসন্ত বাবুকে আশ্বাস দিলেন।

শশীর চাকরি লইয়া মুক্তারামবাবুর স্বগ্রাম-বাসীরা, যাঁহারা যাঁহারা ঐ অফিসে ছিলেন, সকলেই তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাঁহার আড়ালে (সম্মুখে বলিতে কেহই সাহস করিতেন না) বলিয়া যাইতে লাগিলেন, এমন কি কি উপায়ে তাঁহাকে জব্দ করা যায়, তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিতে বিরত হইলেন না। মুক্তারাম বাবুর অপরাধ ভগবানই জানেন। তিনি এতদিন নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের অনেকরই চাকরি করিয়া দিয়াছেন, যখনই পারিয়াছেন উচ্চ পদগুলি স্বগ্রামবাসী-দিগকে দেওয়াইয়াছেন। সেই কারণে বসন্ত বাবু আজ তাঁহার সহকারী, নিমাই বোস খাজাঞ্চী, অধর রায় গুদাম-রক্ষক প্রভৃতি। বোধ হয় ইহাই তাঁহার প্রধান অপরাধ। এই সামান্য ব্যাপার লইয়া তাই ইহাঁরা আজ তাঁহার উপকারের প্রতিদান দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। জল খাইবার সময় এই আন্দো-লনটি তাঁহারা যেরূপ পাকাইয়া তুলিলেন, তাহাতে মনে হয় মুক্তারাম বাবু না জানি কি ভীষণ কাজই করিয়াছেন! আসল কথা, অফিসে মুক্তারাম বাবুর প্রতিপত্তি তাঁহাদের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ বিশেষ দোষে মুক্তারাম বাবুর তিরস্কার আর তাঁহাদের সহ্য হয় না। তিনিও কেরাণী,তাঁহারাও কেরাণী, তবে তাঁহার এত কর্ত্তৃত্ব, এত প্রভুত্ব কেন ?

জলখাবারের ঘরে মুক্তারাম বাবুর বিপক্ষে এই কুৎসা বিদ্রূপ একমাত্র নিমাই বোসের বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার প্রতি-বাদের ফল আরও ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল।

"হ্যাঁ হে, হ্যাঁ, চাকরি করতে এসেচি বলে আর তো জীবনটা বিক্রী করে দিই নি! একটা conscience তো আছে! অফিসে তো বড়বাবুগিরি ফলাবেনই, কিন্তু বাড়[illegible]ও কেন, বল ? সমাজে তিনি এমনই বা কি বড় কুলীন ?"

"আবার গিন্নিটি ভাবেন, তিনিই যেন আমাদের খেতে পরতে দিচ্ছেন।"

"সেও না হয় সহ্য হয়—ওদিকে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় ছেলেটি ? যাক্ সে সব কথা—একবার পুলিশে খবর পেলে—"

"তা আর বাকি কেন থাকে, ভাই ? কৃতজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় তো দিচ্ছ, বেনামী চিঠিতেও বুঝি—"

"দেখ নিমাই, মুখ সামলে কথা কয়ো। এটা তোমার বাবুর বৈঠক নয় যে অন্যের নামে যা ইচ্ছে বলে যাবে। এটা কোম্পানির আপিস—"

"ওহে অধর, তুমিও যে পাগল হলে! থামো না !"

বসন্তবাবুর কথায় অধর প্রভৃতি সকলেই থামিয়া গেল। নিমাই "স্থান-ত্যাগেন দুর্জ্জনং" নীতির অনুসরণ করিল। তাহার পশ্চাতে একটা বিকট হাস্যরোল উঠিল।

বসন্তবাবুর ভয় হইল, পাছে নিমাই বেনামী চিঠির কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। কি উপায়ে তাহার মুখ বন্ধ করা যায়, ইহাই তাঁহার এখন প্রধান ভাবনা হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আপনার জায়গায় আসিয়া কাজে মনোনিবেশ করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু পারিলেন না; লেজারে debit ও credit sideএ পাঁচ টাকা দশ আনার অনৈক্য মিলাইতে পারিলেন না; বড়ই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সহসা কি-একটা বুদ্ধি তাঁহার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। তখনই নিমাইয়ের কাছে আসিয়া জেরেমী কোম্পানীর চেকটার কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখনও সেটি তৈয়ার হয় নাই শুনিয়া একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। "সমস্ত দিন ঝগড়াই করচে, তা কাজ করবে কখন! পারবে না বল্লেই হত, ছোট সাহেবকে বলে আসতুম।" বড় বাবুর অনুপস্থিতিতে বসন্তবাবুই কর্ত্তা, সুতরাং ছোট সাহেবই মনিব। বিনা বাক্যব্যয়ে নিমাই চেক-বুক লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন; তাহা দেখিয়া ছোটবাবু ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কই, Case টা কই? Hurry up. জানো ত আজ Mail day!" নিমাই Case দেখাইয়া দিল। ছোটবাবু তদ্দণ্ডেই জেরেমী কোম্পানীর কাগজ-পত্র, চেক-বুক প্রভৃতি এরূপভাবে টেবিল হইতে উঠাইয়া লইয়া ছোট সাহেবের ঘরে ফিরিয়া গেলেন যে, নিমাই বুঝিতেও পারিল না, তিনি কি কি কাগজ লইয়া গেলেন, আর কিই বা ফেলিয়া গেলেন।

বসন্তবাবুকে দেখিয়াই ছোট সাহেবের মুক্তারাম বাবুর নামে ম্যানেজারের নিকট বেনামী পত্রের কথা পাড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার নিজেরও ধারণা, বড়বাবু টাকা লইয়াই লোক-জনের চাকরি করিয়া দেন, সে জন্য অফিসের strength এত weak হইয়া পড়িয়াছে। ভাল লোক recruit হইতেছে না।

সর্ব্বনাশ! বসন্তবাবু যে ভয় করিতে ছিলেন, ছোট সাহেব সেই প্রসঙ্গই, তুলিয়া বসিয়াছেন! বিশেষ ধূর্ত্ততার সহিত সেটি চাপা দিয়া ওয়াট্‌সন ব্রাদাসে'র debit noteটা, ক্যাক্সটন্ এণ্ড সন্‌সের invoiceটি, জেরেমী কোম্পানীর চেক্‌টি পেশ করিয়া দিলেন; যথাযথ সই করাইয়া কাগজগুলি সত্বর উঠাইয়া লইলেন। আজ mail day, সেগুলি despatch করা চাই। আসিবার সময় একখানি কাগজ তাঁহার হাত হইতে সাহেবের ঘরের মেজেয় পড়িয়া গেল, তিনি যেন তাহা দেখিতে পাইলেন না। সাহেবের টেবিল হইতে কোন প্রয়োজনীয় কাগজ পড়িয়া গিয়াছে বিবেচনা করিয়া চাপরাশি উহা সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল। কোন দেশীয় সদাগরের পত্র হইবে ভাবিয়া ছোট সাহেব একটি সরকারকে দিয়া সেটি পড়াইয়া লইলেন। আসিয়া অবধি যে অবসর তিনি অন্বেষণ করিতেছিলেন, আজ দৈবক্রমে তাহা মিলিল। পত্রখানি ম্যানেজার সাহেবের সম্মুখে ধরিয়া তাহার মর্ম্ম যেমন শুনিয়াছিলেন, বুঝাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুক্তারাম বাবুর বিপক্ষে বেনামী পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু বড় বাবুর শত্রুপক্ষীয়েরা এই সব করিতেছে, তা ছাড়া কোন প্রমাণ না থাকায় আর

পত্রে আবেদনকারীর দস্তখত নাই বলিয়া তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু ছোট সাহেব এখন ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি পরদিন শশীকে ম্যানেজার সাহেবের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার এই চাকরির জন্য মুক্তারাম বাবুকে তাহার বাবা কত টাকা দিয়াছেন? সে ধার দেওয়ার ইংরাজী জানিত না, অথচ ইংরাজীতে এমন জবাব দিল যে, সাহেবেরা বুঝিলেন, ধার করিয়া তাহার বাপ হাজার টাকা মুক্তারাম বাবুকে দিয়াছেন। বেনামী চিঠি, মুক্তারাম বাবুর স্বহস্তে লেখা পত্র আর শশীর সাক্ষ্যে ম্যানেজার সাহেবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, মুক্তারামবাবু উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বাড়ী যাইবার সময় মুক্তারাম বাবুর পত্র খানি নিমাই খুঁজিয়া পাইল না, টাকার কথা লেখা আছে, সুতরাং অপরকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা শ্রেয় নয়। চক্রবর্ত্তীকে মুখেই সকল কথা বলিয়া দিবে মনস্থ করিয়া শেষ-ট্রেনে নিমাই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পত্রখানি কোথায় গেল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

৩

কয়দিন পরে ভাবী বৈবাহিকের বাটী হইতে বরাবর অফিসে আসিয়া ম্যানেজার সাহেবের হুকুম দেখিয়া মুক্তারাম বাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বসন্তবাবু তাঁহাকে কি বুঝাইয়া দিলেন, ভগবান জানেন। শুনিয়া তিনি নিমাইয়ের উপর আন্তরিক চটিলেন এবং তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও উচিত বিবেচনা করিলেন না। পদচ্যুত লইয়া কর্ম্ম করিতে ঘৃণা বোধ করিয়া কর্ম্মত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়া বাড়ী আসিলেন। ব্যাপার কি, নিমাইও কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বাড়ীতে আসিয়া তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, মনের দুঃখ মনেই রাখিলেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুঁচড়োর ওরা কি রাজী হল?"

মুক্তারাম বাবু বলিলেন, "হাঁ।"

তাঁহার স্ত্রী বাহিরে আসিয়া সকলের নিকট সমাচারটা ব্যক্ত করিলেন, ভাবী বৈবাহিকের শতমুখে প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মুক্তারাম বাবু বিমর্ষ, শয্যায় শয়ন করিয়া ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। কেহই তাঁহার কষ্ট বুঝিল না। পরদিন প্রাতে স্ত্রী যখন রন্ধন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন মুক্তারাম বাবু বলিলেন, "এখন আর ব্যস্ত হতে হবে না,এত তাড়াতাড়ি রাঁধবার আবশ্যক নেই!"

"কেন, আপিস নেই?"

"না।"

"কিসের ছুটি?"

"একেবারে ছুটি।"

কথাটা স্ত্রী কিছুতেই ধারণা করিতে পারিলেন না, কেবল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। "চাকরি গেছে গো" বলিয়া মুক্তারামবাবু হাসিয়া গাড়ুটি লইয়া বাগানে চলিয়া গেলেন। স্ত্রী হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আপন-মনে বলিলেন, "ভগবান, তোমার মনে এই ছিল? সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে মেয়ের বে'র চেষ্টা করতে গিয়ে শেষ চাকরিটি পর্য্যন্ত গেল!"

মুক্তারাম বাবু একজন দক্ষ Book-keeper, সুতরাং সদাগর অফিসে তাঁর চাকরির

ভাবনা নাই। চেষ্টা করিলে কোন না কোন অফিসে জুটিয়া যাইবে, এ আশা তিনি রাখেন, কিন্তু উপস্থিত, কন্যার বিবাহের টাকা কে ধার দেয়, এই ভাবনাই তাঁহার প্রবল হইল। আহারে তাঁহার রুচি নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই, একই ভাবনা—কোথা হইতে টাকার জোগাড় করিবেন! ভোর হইতে না হইতে পুত্র হরি আসিয়া খবর দিল, জেলেরা আসিয়াছে। "বেশ তো, পুকুরে নামাইয়া দাও," বলিয়া তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, "ওগো, এখনো ওঠোনি, সন্দেশ-রসগোল্লা যে বসন্ত ঠাকুরপো এখনো আনেন নি। রাই ঘোষেরা যে এখনও এল না, তত্ত্ব যাবে কখন্?"

"হ্যাঁ, হরেকে একবার বসন্তর কাছে পাঠিয়ে দাও না।"

"পুকুরে যে জেলে নেমেছে, তাদের চোখে চোখে না রাখলে পাঁক তুলে মেরে দেবে।" কথা শেষ হইতে না হইতে বসন্তবাবু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,"এই নাও বৌদি, তোমার সন্দেশ-রসগোল্লা। কোথায় রাখবে? এই যে দাদা, এখনও ওঠেন নি যে!"

"রাত্তিরে তোমরা চলে গেলে, তখন তো দেড়টা, তার পর আর ঘুম এল না।"

"ঐ তো কেমন আপনার এক ভাব! আপনার চাকরির ভাবনা কি? সাম্স্ মার্টিনের এজেণ্ট হার্টফিড সাহেব সেদিন কত খোসামোদই করেছিল, এখনো তারা লোক পায় নি, নিশ্চয়ই নেবে।"

"ও সব কথা ছেড়ে দাও বসন্ত, আমি চাকরির কথা ভাবচি-নে। নিমে আমার কি করবে? কথা হচ্ছে, টাকা চাই যে!"

"কেন, চক্রবর্ত্তী?"

"তার টাকা—"

"আহা, অম্নি তো নয়, হ্যাণ্ডনোট লিখে দেবেন।"

"হাঁ, তাতো দেবো—"

"আচ্ছা, চলুনই না, কি বলে, দেখা যাক্। গরজ তো আপনার।"

চক্রবর্ত্তীর বাটী আসিয়া উভয়ে টাকার কথা পাড়িলেন। চক্রবর্ত্তী বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি হে, নিমাই এসে খবর দেবা-মাত্র সেই রাত্রেই যে তোমার বৌদিদি টাকা দিয়ে এসেছেন।"

"সে কি—!"

"আহা, বৌমাকে ভাল করে জিজ্ঞেস্ করে এসো দেখি। মেয়েলি ব্যাপারে কোন কাজ করাই ঝকমারি!"

মুক্তারাম বাবু বাড়ী ফিরিলেন। বসন্তবাবু চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া শপথ করিতে উদ্যত হইলে বসন্তবাবু বলিলেন, "ওহে, চক্কোবর্ত্তী, তুমি যে এত কাঁচা কাজ কর, এ আমার ধারণা ছিল না। এখন অস্বীকার করলে কি করবে বল তো?"

"দোহাই তোমার,কি করব, বল? আমার যখের পুঁজি। এক এক টাকা আমার বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত।"

"ওহে চক্কোবর্ত্তী, এত ব্যস্ত হলে কি চলে! বারেন্দরের ছেলে হয়ে এই বুদ্ধিটা মাথায় খেল্‌ল না দাদা? শোনো, বলি, শোনো কানে কানে—"

"ঠিক বলেছ। হাঁ, হাঁ, ঐ কাজই ঠিক।" বলিয়াই অদূরে মুক্তারামবাবুকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "আঃ দাদা, বয়স হয়েছে পা বাড়িয়েই আছি। এখন কি আর সব কথা সব সময়ে মনে থাকে!"

"দয়াল-দা, ওরাতো বল্লে, বৌদি টাকা দেন নি —।"

"আহা, সেই কথাই তো বলছি! তোমার বৌদিদি টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়েছিল, বল্লে, কালীঘাট থেকে এসে দিলেই হবে। আমি বল্লুম, না, এখনই শশেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসো। আচ্ছা, আসুক কালীঘাট থেকে। উপস্থিত আমার কাছ থেকেই দিচ্ছি।"

"হ্যাঁ দাদা, তা হলে বাঁচাও।"

"দেখ, তোমাকে অবিশ্বাস করছিনে, তবে কি জান, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সব সময়েই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। তা একটা হ্যাণ্ডনোট—"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই, দোয়াত-কলমটা বার করুন, এখনি লিখে দিচ্চি। stampও আছে।"

মুক্তারাম বাবু হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলেন। চক্রবর্ত্তী বসন্ত বাবুকে দিয়া পড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা কি আর তুমি মিথ্যে বলবে! হ্যাণ্ডনোট যদি নাই থাকে!" চক্রবর্ত্তী হ্যাণ্ডনোট লইয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন, ঘণ্টাখানেক পরে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া অন্য কথার অবতারণা করিয়া গল্প ফাঁদিয়া দিলেন।

মুক্তারাম বাবু বলিলেন, "দাদা, আর কতক্ষণ বস্‌বো! আজ যে আমার ঢের কাজ।"

"হাঁ, এই যে নিমাইয়ের মা এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে দেরী হয়ে গেছে। আজকে আর বেশী খরচ-পত্র করো না, নমো-নমো করে সেরে ফেল না। আচ্ছা, এখন এস।"

মুক্তারাম বাবু হাসিয়া বলিলেন, "টাকাটা—?"

"টাকা? টাকা কি পাও নি! আমি দয়াল চক্রবর্ত্তী, আমার সঙ্গে জুচ্চুরি? মুক্তো, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে, তোমরা স্ত্রী-পুরুষে ছেলের চাকরি করে দেবে বলে একটা মেয়েমানুষকে ঠকিয়ে হাজার টাকা গাপ্ করবার চেষ্টায় ছিলে। আবার নিমাইয়ের মা—"

"এ কি বলছেন!"

"এখন একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে! যা হয়ে গেছে, যেতে দাও, আর পাঁচজনের কাছে বলে খেলো হয়ো না।"

কথায় কথায় বেশ বচসা হইয়া গেল। আদালতের আশ্রয় ব্যতীত যখন ইহা মিটিবে না, তখন এখানে বৃথা বিবাদ করিয়া ফল নাই। বসন্তবাবু মুক্তারাম বাবুকে লইয়া চলিয়া গেলেন। মুক্তারাম বাবুর চোখ ফাটিয়া জল আসিল; তিনি বলিলেন, "বসন্ত, এ বিপদে—"

"আমার কাছে টাকা থাক্‌লে কি আর চক্রবর্ত্তীর এই অপমানটা সহ্য কর্‌তে হত, না এর দোর তার দোর করতে হত? টাকা আছে নিমাইয়ের—"

"পাজিটার নাম করো না, বসন্ত। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, ও এত-বড় বিশ্বাসঘাতক। আমি ওর এমন কি অনিষ্ট করেছি যে, ও এই কাণ্ডটা করলে। খেতে পেত না, মা পরের বাড়ী ভাত রেঁধে বেড়াত, তাই ওকে পয়সা

খরচ করে লেখাপড়া শেখালুম, অফিসে চাকরি করে দিলুম। তার এই প্রতিদান!” মুক্তারাম বাবুর চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল। চক্ষু মুছিয়া তিনি বলিলেন, “পাজিটা সেদিন মেয়েদের কাছে সাউখুড়ী করতে এসেছিল,তখনই দুর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। তা ওর কি লজ্জা আছে? হেসে চলে গেল। হাসির মানে আজ বুঝলাম, বসন্ত। চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ওর মা কেন এসেছিল, বুঝলে ত? চক্রবর্ত্তী সাদা লোক, তার মাথার ভেতর এত প্যাঁচ নেই।” মুক্তারাম বাবু টাকার চেষ্টায় অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বসন্তবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নিমাইকে খবরটা দিবার ইচ্ছা করিলেন 'মার মুখে চক্রবর্ত্তীর বৃত্তান্ত কিছু কিছু শুনিয়া ব্যাপারটা জানিবার জন্য নিমাই আসিতেছিল, পথেই বসন্তবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বসন্তবাবু আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন—চক্রবর্ত্তীর হাজার হাজার টাকা একেবারে গাপ, কৌশলে তাহার হ্যাণ্ডনোট লেখানো প্রভৃতি,—কেবল নিজের বুদ্ধিটুকুর পরিচয় দিলেন না।

“বসন্ত দাদা, এ হতে পারে না। কখনই নয়, কখনই নয়, আমি ও শুনতে চাই না। হয় চক্রোবর্ত্তীর বদমায়েসী, না হয় শশেটার কারসাজী। সে ত পরের কথা, এখন উপায়? টাকা না পেলে যে মেয়ের বে হবে না, দাঁড়িয়ে অপমান—বসন্ত দা, তোমার তো ব্যাঙ্কে টাকা—”

“হ্যাঁ হে হ্যাঁ, লোকে আমারই টাকা দেখে। আর থাকেও যদি, দিয়ে শেষে আদালত ঘর করি আর কি! তোমার থাকে, দাও না কেন।”

“টাকা থাকলে এই দণ্ডেই দিতুম। দেখি, গহনা বন্ধক দিয়ে কিছু জোগাড় করতে পারি কি না?”

“আদায় করবে কি করে? শেষে একটা মনোমালিন্য হবে। তার চেয়ে Neither a lender, nor a borrower be.”

“আচ্ছা” বলিয়া নিমাই বাটী চলিয়া গেল। মার নিকট সব কথা বলিল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই টাকার জোগাড়ে ব্যস্ত ছিলেন নিজের ও বৌয়ের নিকট হইতে নগদ দুই শত টাকা বাহির করিয়া দিলেন, আর বৌয়ের তাগা বালা লইয়া বন্ধক দিতে ছুটিলেন। মুক্তারাম অসময়ে তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার ছেলের পড়িবার খরচ দিয়াছেন, চাকরি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের আজ যাহা-কিছু সবই তো মুক্তারাম বাবুর দৌলতে। যাহা হউক সর্ব্বসমেত সাতশ' টাকা মাত্র জোগাড় হইল। নিমাই টাকাগুলি লইয়া অনতিবিলম্বে মুক্তারাম বাবুর বাটী ছুটিল। সদরে একটি মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া—তাহার সম্মুখে জনৈক সাহেব পদচারণা করিতেছেন। নিমাইকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,তাঁহার নাম মুক্তারাম বাবু কি না? ঘটনাচক্রে মুক্তারাম বাবুও সেই সময়ে বাটী আসিতেছিলেন, নিমাই তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, “আমি নই, মুক্তারাম বাবু ঐ যে আসছেন।”

“Thanks” বলিয়া মুক্তারাম বাবুকে লক্ষ্য করিয়া সাহেব বলিলেন, “Good morning Mookaram Babu. Here is a warrant for you.” মুক্তারামবাবু পুলিশ সাহেবের হাত হইতে আদেশটি লইয়া পড়িলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল,

বলিলেন, "Do your duty, sir. নিমাই, তোমার কি এত শত্রুতা সেধেছিলুম—?"

নিমাই হতভম্ব। দারোগা, জমাদার, কনষ্টেবল সকলে তখন বাটী প্রবেশ করিলেন। মেয়ের আজ গায়ে-হলুদ ও আইবুড়া ভাত। অনেক লোকজন নিমন্ত্রিত। আহারাদির জোগাড়-যন্ত্র, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি হইতেছিল। কত জন-মজুর খাটিতেছিল। সকলে যে যাহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপার দেখিবার জন্য বাটীর ভিতর সমবেত হইল। পুলিশ স্ত্রীলোকদিগকে ঘাটে যাইতে বলিয়া দিল। পাঁচ-সাত জন ভদ্র লোক ব্যতীত সকলকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থানা-তল্লাসী আরম্ভ হইল।

হরির মা বসন্তবাবুর বাড়ী গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, বসন্তবাবু নড়িলেন না। তিনি কি করিবেন, কতদিন হরিকে বুঝাইয়াছেন যে, বদ ছোকরাদের সহিত মেসে তাহার থাকা উচিত নয়! তাঁহারা কি করিবেন? হারাধন বাবুর বাটী আসিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো, একবার আমাদের বাড়ী চল।"

"হাঁ, আমি পুলিশ ঘর করি, শেষে চাকরিটীও যাক। ছেলেকে শাসন করবার জন্য তখন যে আমরা কত বলেছিলাম···।"

এই হারুবাবুকেই মুক্তারাম বাবু জেল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! যাহা হউক, হরির মা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া কাহারও হাতে ধরিলেন, কাহারও পায়ে পড়িলেন, কিন্তু গ্রামের কেহই আসিতে সাহস করিল না। বাড়ীর আশে-পাশে দাঁড়াইয়া সকলে মজা দেখিতে লাগিল। চক্রবর্তীর হাজার হাজার টাকা উড়াইয়া দেওয়া, অফিসের আসবাব চুরি,—পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিতে লাগিল, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

বেলা একটার সময় থানাতল্লাসী শেষ হইলে সাহেব আর একটী আদেশ মুক্তারাম বাবুকে পড়িতে দিয়া তাঁহার পুত্র হরিকে বলিলেন, "Follow me!" মুক্তারাম বাবু বসিয়া পড়িয়া হরির দিকে চাহিলেন, চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কথা বাহির হইল না। হরি বাপ-মাকে নমস্কার করিয়া সাহেবের সহিত মোটরে উঠিল। হরির মা কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো, ওর যে এখনও খাওয়া হয় নি।" দারোগা বাবু বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নেই মা, আমরা খাওয়াব, আমরা তো মানুষ।"

"ওগো তোমরা যে পুলিশ।" বিকট শব্দ তুলিয়া মোটর ছুটিল, হরির মার পাষাণভেদী ক্রন্দনে গ্রামের লোক ছুটিয়া আসিল। মুক্তারাম বাবু বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

৪

পর দিন ১৫ই বৈশাখ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নোনাগ্রামে পাঁচসাতখানি মোটর গাড়ী ভোঁ-ভোঁ করিয়া প্রবেশ করিল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বাহির হইয়া পড়িল, "ব্যাপার কি?" কেবল গভর্ণমেণ্ট অফিসের বাবুরা স্ব স্ব বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া অপরের নিকট হইতে খবর পাইবার প্রত্যাশায় ছটফট করিতে লাগিলেন। যাহারা পুলিশ সাহেব, দারোগাবাবু, কনষ্টেবল সিংদের দেখিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, কাহাদের বর আসিয়াছে। "বর এসেছে", "বর এসেছে" বলিয়া একটা হৈ-চৈ

পড়িয়া গেল, সকলেই গণ্ডগোল করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তো অভ্যর্থনা করিয়া বর আনিতে আসিল না। তখন বরকর্ত্তা ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, এইটি কি নোনা গ্রাম?"

পার্শ্বস্থ ভদ্রলোক বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ!"

"মুক্তারাম বাবুর বাড়ী কি এইখানে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তিনি কি বাড়ী আছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বলি, 'আজ্ঞে হ্যাঁ', তাঁর বাড়ীটা কোথায়, দেখিয়ে দিতে পারেন?"

"আজ্ঞে, ঐ যে চণ্ডীমণ্ডপ দেখা যাচ্ছে, ঐটেই তাঁর।"

বিবাহ-বাড়ী যে এ-রকম নির্জ্জন হইতে পারে, তাহা কেহ ধারণা করিতে পারে না। বরকর্ত্তা রাগ করিয়া মোটর ফিরাইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু দুই-এক জন ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, "ওহে, অত রাগ করলে হবে কেন? বিবাহের বন্দোবস্ত বোধ হয় অন্য বাড়ীতে। এ রকম তো হয়। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর—এই যে—এ কি হে, মুক্তারাম বাবুকে ধরাধরি করে আনছে, অ্যাঁ—" সকলেই মোটর হইতে নামিয়া অগ্রসর হইলেন। মুক্তারাম বাবু শ্রীধর বাবুর পা জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "বড়ই বিপদ, মশাই—আমার ছেলে—"

পাঁচ-সাতজনে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, বলেন কি—কি ব্যায়রাম?"

শ্রীধর বাবু মুক্তারাম বাবুকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার গা আগুন! "এ কি, আপনার জ্বর?"

"সব বলচি, চলুন। ওঃ—বসন্ত—উঃ বাবা হরি—বসন্ত—" সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। বসন্তবাবু সে ত্রিসীমায় নাই। বরকর্ত্তা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কি করা কর্ত্তব্য। হরির দলের ছেলেরা মুহূর্ত্ত-মধ্যে মুক্তারাম বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে বরযাত্রীদিগের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে তথায় লইয়া গেল। মায়ের প্রাণ বাধা মানিল না, পুত্রের নাম ধরিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। অকল্যাণের দোহাই দিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিল। বরযাত্রীদের আহারাদির আয়োজন-উদ্যোগ চলিল।

সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বর অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকিয়া বসিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না। তিনি সম্প্রতি ডেপুটিগিরির জন্য nomination পাইয়াছেন। এখন এরূপ-স্থলে বিবাহ করিলে তাঁহার চাকরি পাওয়া সম্ভব হইবে না। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের অনেকেই পিতা ও পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন। মুক্তারাম বাবু ভাবী বৈবাহিকের হাতে-পায়ে ধরিয়া অনেক কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শ্রীধর বাবু লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কিছুতেই মত দিতে পারিবেন না। তিনি কলিকাতায় যাইবেন বলিয়া মোটরে উঠিলেন। মোটর ছাড়িয়া দিল। এমন সময় "হরি এসেছে, হরি এসেছে" বলিয়া একটা চীৎকার উঠিল। মোটর থামিল। শ্রীধরবাবু নামিলেন। মুক্তারামবাবু তখনও জ্বরে কাঁপিতেছেন, দুই একবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিলেন না, একদৃষ্টে হরির পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"বাবা, ও কিছু নয়, গ্রামের লোকে আমার নামে মিথ্যে কি লিখেছিল—"

"শুধু লেখা? পুলিশকে ডেকে এনে বাড়ী দেখিয়ে দেওয়া—"

"অ্যাঁ, এমন লোকও আছে?"

"তার অভাব নেই, মশাই! (নিমাইকে আসিতে দেখিয়া) ঐ যে, ঐ রাস্কেলটাই আসছে। এখনও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি? আবার আমার বাড়ী—? (দয়াল চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়া) এ কি! দলকে দল যে! ভগবান্, এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নি?" আর সামলাইতে না পারিয়া কম্পিত ওষ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, না, দোহাই দয়াল দা, তোমার পায়ে পড়ি, ভদ্রলোকদের কাছে আর অপমান করো না। নিমাই, একটি দিনও যদি তোমার কোন উপকার করে থাকি, তা হলে আমি তোমার হাতে ধরে বলছি ভাই, আজ আমায় ক্ষমা কর, আজ আর কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিতে এসো না—"

"বাবা, কি বলছেন? ও-কথা বলবেন না, নিমাই-কাকাই তো খরচ-পত্র করে আপনাদের ম্যানেজার সাহেবকে ও আর একটি ভাল ব্যারিষ্টার সাহেবকে নিয়ে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমায় ছাড়িয়ে এনেছেন। নিমাই-কাকার কথায় ম্যানেজার সাহেব সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন,—এই দেখুন, আপনাকে তিনি চিঠি দিয়েছেন।"

শ্রীধর বাবু সাহেবের পত্রে আর কিছু বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, লাট-সাহেব যে হরিকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন, ইহাতে তিনি একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হরিকে লইয়া মুক্তারাম বাবু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় সদর দরজায় দয়াল চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে হ্যাণ্ডনোটটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর দাদা, লোকের পরামর্শে শশে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়েও দেয় নি, আমি মুখ্যু-সুখ্যু লোক, ভাই, অত কৌশল বুঝতে পারিনি, কিন্তু তুইও তো পারিসনি! যাহোক ভাই, শশের আর চাকরিতে কাজ নেই, ফটিকেরই করে দিও।"

"কি বলছ দয়াল-দা?"

দয়াল চক্রবর্ত্তী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "পরে বুঝিয়ে বলব। নিমাই স্ত্রীর গহনা পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়ে টাকার জোগাড় করে এনেছে। আরও দরকার হয়, দয়াল চক্রবর্ত্তী হাজির আছে। শ্রীধর বাবু সম্মত আছেন, বে কবে হবে? এখন ভদ্রলোকদের আহারাদির কি উদ্যোগ হল, দেখ।"

পাড়ার একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, "নিমে-দা যখন আছে, কিছু দেখতে হবে না।" মুক্তারাম বাবু দরজার উপর বসিয়া পড়িলেন। নিমাই আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গেল, বিছানায় শোয়াইতে গিয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষে জল। মুক্তারাম বাবু নিমাইয়ের হাত দুটি ধরিয়া কি বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলেন না।

"করেন কি! আমি যে ছোট ভাই, দাদা!" বলিয়া নিমাই তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন। হরিকে কাছে থাকিতে বলিয়া নিমাই চকিতের মত বাহিরে আসিয়া বর-বরযাত্রাদের সম্ভাষ করিয়া দিল।

ভিতরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন চলিল—কাল গুলুর বে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্রিটিশ-শাসনের এক যুগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চৈৎ সিংহ যখন পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর ১৭৭৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিলেন, তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এরূপ অতিরিক্ত টাকা আর তাঁহাকে দিতে হইবে না। মিল তাঁহার ভারতের ইতিহাসে সে কথা বেশ স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। পর বৎসর হেষ্টিংস আবার পাঁচ লক্ষ টাকা চৈৎসিংহের নিকট চাহিলেন। চৈৎসিংহ এবার দিতে অস্বীকার করিলেন। হেষ্টিংস তখন ইংরাজ-সেনানায়ককে কাশীরাজের নিকট হইতে বলপ্রয়োগ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিতে আদেশ দিলেন। চৈৎসিংহকে বাধ্য হইয়া পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হইল।

১৭৮০ সালে পুনরায় পাঁচ লক্ষ টাকার জন্য তাগিদ আসিল। রাজা চৈৎসিংহ এবার এক সহজ উপায় স্থির করিলেন। তিনি নিরুপায় হইয়া হেষ্টিংসকে দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ দিলেন। হেষ্টিংস দুই লক্ষ টাকা লইলেন। চৈৎসিংহ ভাবিলেন যে তাঁহার বিপদ দূর হইল। হেষ্টিংসকে দুই লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহাকে বার্ষিক অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা আর কোম্পানীকে দিতে হইবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় চৈৎসিংহ হেষ্টিংসকে একেবারে চিনিতে পারেন নাই। হেষ্টিংস দুই লক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার জন্য আবার তাগাদা পাঠাইলেন। অনেক ইংরাজ-লেখক বলিয়াছেন যে হেষ্টিংস উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই—চৈৎসিংহের প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকাকে ঘুষ বলা উচিত নয়! মেকলে তাঁহার ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জীবন-চরিতে এই বিষয়ে বেশ সুন্দর লিখিয়াছেন, "তিনি (হেষ্টিংস) বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভা এবং বিলাতের ডাইরেক্টরগণ এই দুই পক্ষের নিকটই এই ব্যাপার কিয়ৎকাল নিশ্চয় গোপন করিয়াছিলেন; এবং পরেও এইরূপ গোপন রাখার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। ধরা পড়িবার ভয়ে অবশেষে তিনি প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।"

হেষ্টিংস ঐ দুই লক্ষ টাকা কোম্পানীর ভাণ্ডারে দিলেন এবং পুনরায় চৈৎসিংহকে পাঁচ লক্ষ টাকার জন্য তাগিদ দিলেন। চৈৎসিংহকে পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর এবং তাহার উপর জরিমানা স্বরূপ আরও এক লক্ষ টাকা দিতে হইল।

১৭৮০ সালে রাজাকে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য কোম্পানীর জন্য নিযুক্ত করিতে আদেশ হইল। রাজা বিষম বিপদে পড়িলেন। হেষ্টিংসকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবার বিশ লক্ষ টাকার লোভ দেখাইলেন। হেষ্টিংস বিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চাহিলেন। তিনি এখন ভিতরে ভিতরে বারাণসী অযোধ্যায় নবাবকে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। বর্ক এই কথা

পার্লামেণ্টে হেষ্টিংসের বিচারের সময় জ্বালাময়ী ভাষায় বলিয়াছিলেন।

তৎপরে হেষ্টিংস স্বয়ং বারাণসী গমন করিলেন। রাজা চৈৎসিংহ যথাসাধ্য বিনীত ভাবে হেষ্টিংসের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। হেষ্টিংস রাজার সহিত মোটেই ভদ্রভাবে ব্যবহার করিলেন না। তারপরে রাজার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ করিয়া বিস্তৃত এক চিঠি হেষ্টিংস রাজাকে পাঠাইলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই চিঠিখানি ফরেষ্ট সাহেবের State Paper গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ছাপা আছে (৭৮৩-৪ পৃষ্ঠা)। রাজাও পত্র পাঠমাত্র আপনাকে দোষমুক্ত করিয়া একটী উত্তর পাঠাইলেন। উত্তর পাইয়া হেষ্টিংস একেবারে ক্রোধোন্মত্ত হইলেন এবং রেসিডেণ্ট মার্কহাম সাহেবকে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন যেন রাজা চৈৎসিংহকে বন্দী করা হয়। রাজা কোনও আপত্তি না করিয়া মার্কহামের নিকট আপনাকে সমর্পণ করিলেন এবং এই অপমানে ব্যথিত হইয়া তাঁহার রাজত্ব কোম্পানীকে দিয়া সামান্য বৃত্তি লইয়া অবসর-গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

রাজা চৈৎসিংহ বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার প্রজাবর্গ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কোম্পানীর সৈন্যদিগকে নিহত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাদের অপমানিত রাজাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিল। হেষ্টিংস অসুবিধা বুঝিয়া চুণারে পলায়ন করিলেন।

সমস্ত বারাণসীর প্রজাবর্গ তাহাদের লাঞ্ছিত অধিপতির অপমানকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। কিছুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহের পর কোম্পানী জয় লাভ করিল। চৈৎসিংহ সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তাঁহার এক আত্মীয়কে বারাণসীর সিংহাসনে হেষ্টিংস বসাইলেন এবং রাজস্বও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

ইহাতে বাৎসরিক বিশ লক্ষ টাকা লাভের ব্যবস্থা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী করিলেন। কিন্তু চৈৎসিংহের যে গুপ্তধন যথেষ্ট আছে বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত ছিল তাহা একেবারে অমূলক প্রমাণিত হইল। হেষ্টিংস লোক-মুখে শুনিয়াছিলেন যে রাজা চৈৎসিংহের প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় কোটী টাকা গুপ্তধন আছে এবং সেই আশায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া তাহার সিকিও পাওয়া যায় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় কোম্পানীর অর্থানুকূল্যের জন্য চৈৎসিংহের উপর হেষ্টিংসের নির্য্যাতন হইয়াছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক হেষ্টিংসের কার্য্য নির্দ্দোষ বলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহা কোম্পানীর ভাণ্ডারে যায় নাই। কোম্পানীর সৈন্যেরা তাহা দিতে অস্বীকার করিল এবং হেষ্টিংস তাহা Prize money স্বরূপ সৈন্যদিগকে দান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রত্যাবর্ত্তন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমনিভাবে যখন দিন কাটিতেছিল, তখন একদিন তাহার বৈচিত্র্য-হীন জীবন-পথে একটু পরিবর্ত্তন আসিয়া নিরানন্দ জীবনটাকে যেন ধীরে ধীরে সহনীয় করিয়া তুলিল। সেদিন অপরাহ্ন-বেলায় স্কুল হইতে ফিরিয়া অরুণ দেখিল, মুক্তা ঠাকুরাণী মজুর লাগাইয়া বাড়ীর আশ-পাশের জঙ্গল সাফ করাইতেছেন। বর্ষায় ঘাস ও আগাছা জন্মিয়া চারিদিক অপরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। পুকুর-পাড়েও বিস্তর বন্য গুল ও অপরিচিত অনাবশ্যক বন্য গাছের ভিড়। গৃহকর্ত্রীর অমনোযোগে এতদিন এগুলা সতেজে ও সগর্ব্বে বর্দ্ধিত হইবার অবসর পাইয়াছে।

অরুণকে আসিতে দেখিয়া ঠাকুরাণী বলিলেন, "আজ হিমুরা এসে পৌছুবে, সন্ধ্যের গাড়ীতে। চিঠি দিয়েচে। তুমি একবার ইষ্টিসানে যেয়ো ত বাছা। দালানে লণ্ঠনটা সাফ করিয়ে রেখেচি, হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেয়ো। যে আঁধার রাত!" কথা কয়টি বলিয়াই তিনি ফিরিয়া পুনরায় নিজের তদারক-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন দেখিয়া অরুণ নীরবে স্বীকার-উক্তি জানাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিল, ঘরে ঢুকিয়া তাকের উপর বই কয়খানি রাখিয়া দিয়া সে তাঁহার মাদুর-পাতা তক্তাপোষের বিছানায় শুইয়া পড়িল। শরীর এমনই ক্লান্ত মনে হইতেছিল যে কোটটি খুলিয়া রাখিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না। অন্যদিন এ সময় সে তাহার সারাদিনের ইতিহাস, স্কুলের পড়া, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে তর্ক, সহপাঠিদের বাক্-বিতণ্ডা ও সমালোচনা, নূতন শোনা কোন সংবাদ এই সমস্তই চিন্তা করিত। আজ আর সে-সব কিছু তাহার মনে পড়িল না। এখনি-পাওয়া নূতন অধিকারের চিন্তাই তাহার প্রধান হইয়া উঠিল। প্রথমেই তাহার মনে হইল, কে এই হিমু, আর কি জন্যই বা সে আসিতেছে? ইহাকে যে সে আনিতে যাইবে, তা চিনিবে কিরূপে! এই হিমু স্ত্রী কি পুরুষ, সে খবরও সে জানে না। যদি স্ত্রীলোক হয়, সধবা কি বিধবা, যুবতী কি বৃদ্ধা, তাহারও স্থিরতা নাই। অরুণ শেষটা স্থির করিল, পুরুষ হওয়াই সম্ভব। নহিলে ট্রেনে আসিতে সাহস করিত কি? মুক্তা ঠাকুরাণী আবার বহুবচনান্ত হিমুরা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে সে একা আসিতেছে না— সঙ্গে আরো লোক আছে। এই হিমুর চিন্তা তাহার ভাল লাগিতেছিল। যেই আসুক— যাহারাই আসুক, তবু একটু পরিবর্ত্তন ত মিলিবে। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত এই একঘেয়ে ভাব—এ যেন আর সহ্য হয় না!

অরুণ মনে করিল, ষ্টেশনে যাইবার পূর্ব্বে মুক্তা ঠাকুরাণীর নিকট প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ জানিয়া লইবে। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেলে জামা খুলিয়া পুকুর-ঘাটে গিয়া সে মুখ-হাত ধুইয়া আসিল। পুকুর-পাড়ে বড় একটা বেল গাছ থাকায় লোকে তাহাকে "বেল পুকুর" আখ্যা দিয়াছিল। বেল পুকুরের জল বড় স্বচ্ছ ও স্বাদু; তাই পাড়ার ও দূরের অনেক লোক

পানীয় জলের জন্য এই বেল পুকুরেই জল লইতে আসিত।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। স্বচ্ছ জলের উপর বাতাসের খেলা বড় মিষ্ট লাগিতেছিল। শরীর যেন জুড়াইয়া যাইতে-ছিল। কিন্তু অরুণ জানিত, এ সময় পাড়ার মেয়েরা জল লইতে বা গা ধুইতে আসিবে। বিদেশী হইলেও তরুণ বয়স দেখিয়া কেহ তাহাকে লজ্জা করে না, বরং উপযাচিকা হইয়া অনেকে তাহার সহিত কথাও কহিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে সে বিপন্ন হইয়া পড়ে। বাহিরের আঘাত লোকে দেখিতে পায়—ব্যথা সারিল কি না বুঝিতে পারে, কিন্তু অন্তঃকরণের ক্ষত, এ যে সহজে সারে না - সে খবর রাখিবার মত দরদীও ত সহজে মেলে না। লোকে তাহাকে প্রশ্ন করে, তাহার অতীত জীবনের সম্বন্ধে সকৌতূহলে। কিন্তু সে আলোচনা যে তাহার পক্ষে কি, সে খবর ত কেহ রাখে না! তাই কৌতূহল-লেশ-হীন মুক্তা ঠাকুরাণীর আশ্রয়ই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। এখানে তাহাকে অতীত-বর্ত্তমানের কোন জবাবদিহিই করিতে হয় না।

বাড়ী হইতে ষ্টেশন প্রায় দুই মাইল দূরে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—একটু পূর্ব্বে যাওয়াই উচিত ভাবিয়া সে মুক্তা ঠাকুরাণীর উদ্দেশে ঘরের বাহির হইল। দুই বেলা আহারের সময় ছাড়া ঠাকুরাণীর বিনা-আহ্বানে সে বড় কখনো ভিতর-বাড়ীতে যাইত না; তাই একটু ইতস্তত করিয়া শেষে সে ঢুকিয়া পড়িল। উঠানের দুই ভাগে তিনখানি করিয়া ছয়খানি ঘর; তিনখানি পাকা, তিনখানি কাঁচা। পাকা তিনখানির মধ্যে যেখানির বাহির ভাগে দরজা সেই খানিতে অরুণ থাকে, বাকী দুইখানি ঠাকুরাণীর শয়ন ও উপবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাঁচা মাটীর গোময়-লিপ্ত আলিপনা-চিত্রিত দুই-খানি ঘর পূজা ও ভাঁড়ারের; অন্যখানি রন্ধনের। এখন সেখানি অনাবশ্যক-বোধে খালি পড়িয়া আছে। এ ছাড়া উঠানের অন্য অংশে কাঠ প্রভৃতি রাখিবার জন্য একখানি দরমা-ঘেরা চালা ঘরও ছিল। গ্রীষ্মের দিনে রন্ধন-গৃহের বাহিরে মাটীর দালানে রান্না হয়।

অরুণ ভিতরে আসিয়া মুক্তা ঠাকুরাণীর উদ্দেশ পাইল না। শুইবার ও ভাঁড়ার ঘরের দরজায় তালা লাগানো। সম্ভবতঃ তিনি পাড়ায় কাহারো বাড়ী বেড়াইতে বা কোন রোগীর খবর লইতে গিয়াছেন। ষ্টেশন দূরে। ট্রেনের খুব বেশী দেরী নাই। বিলম্ব অনুচিত বুঝিয়া সে দালানের সম্মুখে রক্ষিত চৌকা কাঁচের আবরণী-বেষ্টিত পুরাতন দেশী লণ্ঠনটি হাতে ঝুলাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। পকেটে দেশলাই লইল। এখনও কিছু বেলা আছে,—এখন হইতে অনাবশ্যক তৈল পুড়াইবার ইচ্ছা না হওয়ায় লণ্ঠনটা আর জ্বালিয়া লইল না।

ছুটির দিন প্রায়ই সে ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিত। ষ্টেশন-মাষ্টার আশুবাবুর সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল। ষ্টেশনটি খুব ছোট্ট, প্লাটফর্ম্মটুকুও তাই। গ্রামের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া তাহা মানাইয়াছিল ভাল। তবু সেই কটা রঙের কাঁকর-বিছানো ক্ষুদ্রকায় প্লাটফর্মের পশ্চাৎভাগে রাঙা রং লাগানো কাঠের বেড়ার গা ঘেঁষিয়া যে সব নিত্য-পরিচিত ফুলের গাছ ফুলে ও পাতায় স্থানটিকে সুদৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অরুণের চোখে বড়

সুন্দর বোধ হইত। বেড়ার গায়ে তরুলতার সরু পাতার সহিত রাঙা রাঙা সরু ফুলগুলি কি সুন্দর! দূরে যতদূর দৃষ্টি চলে, দর্শন-যোগ্য কিছুই ছিল না। হরিৎ ক্ষেত্রের নয়ন-লোভন দৃশ্যেও এখানে অভাব। অসমতল সরু সরু মাটীর রাস্তা, ডোবা, খানা, ঝোপ, জঙ্গল, বাঁশবন, মাঠ ও পচা পুকুর—ইহাই এখানকার দর্শনীয় বস্তু। তবু স্থানাভাবে এইখানেই সে বেড়াইতে আসিত। যাত্রীপূর্ণ ট্রেনগুলি চলিয়া যাইত, সে তাই দেখিত। কেহ উঠিত, কেহ নামিত, ডেলি প্যাসেঞ্জার অনেকগুলি থাকিত। তাই ষ্টেশনটি ছোট হইলেও লোকের গমনাগমনে কোন বাধা ছিল না। কাজের অভাবে বসিয়া সে ষ্টেশন-মাষ্টারের কার্য্য দেখিত। আজও সে তাঁহার শরণ লইল। আশুবাবু হাসিয়া আশ্বাস দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন আসিয়া পড়িল। অনেকগুলি ডেলি প্যাসেঞ্জার নামিয়া গেলেন। নিত্য আনাগোনা তাঁহাদের অভ্যাস হইয়া যাওয়ায় মুখে বা চোখে কাহারও কিছুমাত্র ব্যস্ত ভাব ছিল না! অরুণ থার্ড ক্লাশের স্ত্রীলোকদের কামরায় জানালার বাহিরে একখানি মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অনেকগুলি অপরিচিত মুখের মধ্য হইতে সেই মুখখানি বিশেষ করিয়া দর্শকদের চোখে পড়িতেছিল। সে একটি বছর দশেক বয়সের মেয়ের মুখ। মুখখানি বড় সুন্দর। একবার চোখে পড়িলে আবার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে! তাহার সুন্দর মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটিয়াছিল। অরুণকে কাছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি কহিল, "এটা কোন্ ইষ্টিসান?"

অরুণ কহিল, "খাল্‌দা।"

"খাল্‌দা! বলেচি ত আমি। ও মা, নাবো, নাবো, গাড়ী ছেড়ে দিচ্চে যে—বাঃ—" বলিয়া সে একটা মস্ত পুঁটুলি টানিয়া নামাইয়া নিজেও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িল। পরে পুঁটুলি রাখিয়া অবগুণ্ঠনবতী এক বিধবা নারীকে নামাইয়া লইল।

"ট্রেনে জলের কল্‌সী রইল যে—" বলিয়া সে পুনরায় ব্যস্তভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইতে অরুণ তাহাকে থামাইয়া নিজে কল্‌সীটা নামাইয়া দিল। ততক্ষণে ষ্টেশন-মাষ্টারও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অরুণের সহিত তিনিও প্রত্যেক কামরায় দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিতেছিলেন। "মুক্ত ঠাকুরুণের বাড়ী কে যাবেন?" বলিয়া তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করিতেছিলেন; অরুণকে ইহাদের প্রতি মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুক্তা ঠাকুরাণীর নাম শুনিয়াই মেয়েটির চোখে সাফল্য ও আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল, "আমরা যাব!" আশুবাবু অরুণের পানে চাহিয়া, ইংরাজীতে বলিলেন, "You have found them, all right." বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতেও একবার পিছন ফিরিয়া মেয়েটির পানে চাহিয়া গেলেন। এমন জায়গায় এমন মুখ ত সাধারণত ত চোখে পড়ে না, কাজেই একবার চোখে পড়িলে বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ট্রেণ চলিয়া গেলে অরুণের যেন চমক ভাঙ্গিল। সে অপ্রতিভভাবে অগ্রসর হইয়া রমণীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আসুন, আমি

আপনাদেরই নিয়ে যেতে এসেচি যে।" "মা, শুনচ, দিদিমা আমাদের নিতে লোক পাঠিয়েছেন ?" বলিয়া মেয়েটি মস্ত পুঁটুলিটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অগ্রসর হইল দেখিয়া মা জলের কলসী লইয়া অনুবর্ত্তী হইলেন। অরুণ লণ্ঠন জ্বালিয়া পুঁটুলি লইতে গেলে সে বাধা দিয়া কহিল, "নাও যদি ত কলসীটাই নাও। মা রোগা মানুষ, কষ্ট হচ্চে। তোমাদের অ-গঙ্গার দেশ কি না, তাই মা এক ঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে এসেচে।" বলিয়া সে মায়ের নিষেধ না মানিয়া কলসীটা তাঁহার কাছ হইতে টানিয়া নামাইয়া অরুণের হাতে পুঁটুলিটা দিয়া নিজেই কলসী লইল। কলসীটি ছোট হইলেও অরুণের পক্ষে তাহা বহন করায় অসুবিধা হইত। হাতে ঝুলাইয়া অত পথ চলা সম্ভব নয়। অন্য উপায়ে লওয়াও তাহার পক্ষে মুস্কিল। তাই কৃতজ্ঞ হইয়া মনে মনে সে এই ছোট মেয়েটীর বিবেচনা-বুদ্ধির প্রশংসা করিল। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে পথের অন্ধকার খণ্ডিত করিয়া অরুণ আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া পল্লীগ্রামের পথে এখনই বেশ অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছে। আকাশে চাঁদ নাই। এ রাত্রে উঠিবার আশাও ছিল না—নক্ষত্র এখানে-ওখানে দুই-চারিটা সবে ফুটিতে সুরু করিয়াছে। অনভ্যস্ত পথে পশ্চাৎ-বর্ত্তিনীরা অতি-কষ্টে চলিতে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে পায়ে হুঁচট লাগিয়া মেয়েটি আঃ-উঃ করিতেছিল। মাকে সে যথাসম্ভব সাবধান করিতেছিল। "দেখে চল মা, এ দিকটায় একটা গর্ত্ত আছে। সাম্‌নে উঁচু,—বাঁ দিক ঘেঁষে এসো,—বৃষ্টির জল জমে আছে—" ইত্যাদি সতর্কতা-জ্ঞাপনের সহিত অসন্তুষ্ট মন্তব্য-প্রকাশেও তাহার বিরক্তি ছিল না। "মাগো, কি দেশ তোমার মামীর! যেমন বন, তেম্‌নি কি পথের ছিরি হতে হয়! হ্যাঁগা, দেশের মানুষেরা কি আলো জ্বালে না ? তোমাদের কোথাও ত এক বিন্দু আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বাঃ! ঐ যে আলো জ্বলচে! দেশে বুঝি ঐ একটি ছাড়া আর মানুষ নেই ?" বলিয়া সে অরুণের উদ্দেশে প্রশ্ন করিলে বাধা দিবার ভাবে একটুখানি রুক্ষস্বরে মা কহিলেন, "হিমু, —"মেয়ে বুঝিল, মা তাহাকে নীরবে পথ চলিতে আদেশ দিতেছেন। তাই কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়াই চলিল। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকা তাহার স্বভাব নয়। তাছাড়া এই অন্ধকার অপরিচিত পথে শত বাধা বর্ত্তমান! কোথাও পথের ধারে কুকুর "ঘেউ" করিয়া ছুটিয়া চলিয়া ... বনের ভিতর শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। কাছেই বাঁশবনে বাতাসের আন্দোলনে পাতায় সর্ সর্ মর্ মর্ ধ্বনি উঠিল। সে চমকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; কহিল, "ওমা, শোন, শোন—রায়পুরের মতন এখানেও আবার শেয়াল ডাকে। হ্যাঁগা, এখানে বাঘ বেরোয় ? ফেউ ডাকে ?" তাহার স্বরে যথেষ্ট ভয়ের আভাষ পাওয়া যাইতেছিল। অরুণ তাহাকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কিছু না—বাঘ-টাঘ এখানে নেই,—দিনের বেলায় দেখবে এখন—তেমন বনও এ সব নয়। এই যে এবার আমরা বাড়ীর কাছেই এসে পড়েচি।" বলিয়া এবার সে নিজে পিছনে থাকিয়া তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিল। বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরে ঢুকিতে রমণীর যেন

পা উঠিতেছিল না। অনেক দিনের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি মনের ভিতর আথালি-পাথালি করিতেছিল। নব বৈধব্যের শোকের তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিতে ছিল। তবু ধৈর্য্যশালিনী নারী কোনমতে দেহ খানাকে টানিয়া লইয়াই যেন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অরুণ মাটীর দাওয়ার উপর কাপড়ের পুঁটুলিটি নামাইয়া হিমুর কাঁখের জলের কলসীটি নামাইয়া পাশে রাখিল। দালানের শেষ প্রান্তে কাঠের দেরকোর উপর বাতাসে নিভু-নিভু হইয়াও একটি মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাহারই অল্প দূরে বসিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী হরিনামের ঝুলি হাতে করিয়া মালা জপ করিতে ছিলেন। ইঁহাদের দেখিয়া জপের মালা মাথায় ঠেকাইয়া সে ছড়া ঝুলির ভিতর রাখিয়া দেয়ালের হুকে টাঙ্গাইয়া উঠানে নামিয়া আসিলে বিধবা নত হইয়া তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিলে দেখাদেখি মেয়েটিও তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিধবার শীর্ণ কম্পিত দেহখানি কাছে টানিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে মারে, কি বেশে তোকে দেখ্‌লুম্ রে— আমার রাণীর গায় এমন ছাই কে মাখিয়ে দিলে রে—!"

অরুণ নীরবে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে জানিত, এখন তাহাকে এখানে আর কোন প্রয়োজন হইবে না। নিজের অজ্ঞাতে তাহারও দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে ছিল। দুঃখের জ্বালা যে সে ভালো করিয়াই জানে। তাই দুঃখীর দুঃখে তাহার স্মৃতি-সমুদ্রও উথলিয়া উঠিয়া একবৎসরের পুরাতন শোককে আজ যেন আবার নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিল। ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নী দেবীর স্নেহমাখা মুখ সে কি কখনো ভুলিতে পারিবে! বুকের ক্ষত লোক-চক্ষে অদৃষ্ট থাকিলেও তাহার বেদনা ত ব্যথাতুরের অজ্ঞাত থাকে না। সকল-কিছুর ভিতর দিয়াই বোধ-শক্তি সেইখানেই যে আগে গিয়া পৌঁছায়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সহরে

(সকালে)

আকাশ হতে রোদের রেখা বাড়ীর মাথা চুমে,
শীতল ছায়া বিছিয়ে আঁচল লুটিয়ে রহে ভূমে,
পথখানি সে ঝাপ্‌সা ধোঁয়ায় কাহার পানে ধায়,
কোন্ অজানার গোপন কথা মরম উতলায়!

(দুপুরে)

বায়স হাঁকে, চড়ুই ডাকে, জড়িয়ে রোদে বাড়ী,
কাঁশারিদের ঝম্‌ঝমানি, কড়া নাড়ানাড়ি,
আস্‌ছে পাশের বাড়ী হতে শিশুর কল-কথা,
স্তব্ধতারি মধ্যখানে বক্ষে ব্যাকুলতা!

(সন্ধ্যায়)

সাঁঝের আলো বিদায়-কালে করুণ চোখে চায়,
গাছের পরে লক্ষ কাকে জায়গা নাহি পায়,
চল্‌ছে গাড়ী, ছুট্‌ছে ঘোড়া, কাজের নাহি শেষ,
আমার বুকে হাত বুলাল শান্ত সে কোন্ দেশ!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

হিমাদ্রি-অঙ্কে

এক রকম ভাবটা সব সময়ে ভাল লাগে না। নরম-গরমের ভিতর দিয়া জীবনটাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিলে কতকটা আরাম পাওয়া যায়। ষোড়শোপচারে আহারের পর চাটনির প্রশংসা সর্ব্বত্রই শুনা যায়। যদি একটা বিরাট অন্ধকার সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তরু-শির চুম্বন করিয়া উদীয়মান কনক-কান্তি উষার অরুণ-ছটা এতটা নেত্র-প্রীতিকর হইত না।

একঘেয়ে ভাব বড়ই অসহ্য, উত্থান-পতন চাই, নহিলে জীবনটাকে ধরিয়া রাখা যায় না! ঔরংজীব কবে রাজা হইয়াছিল, সে কথা কি আর কাহারও মনে আছে? কিন্তু আজ যদি তাহার রাজ্যটা তেমনি চলিয়া আসিত, তাহা হইলে ঐতিহাসিকদের মাথা একেবারে গরম হইয়া উঠিত।

কলিকাতার দুর্ভাগ্য, কর্ম্মগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া একটা auto-maton হইয়া পড়িয়াছি। একটু ভাবিবার সময় নাই, একটা হাই তুলিবার সময় নাই; ঘড়ির কাঁটার মত অনবরত চলিয়াছি—সূর্য্যের সঙ্গে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা জুড়িয়া দিয়াছি! সেই সকালে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রটির মত সারাদিন ঘুরিয়া-ফিরিয়া রাত্রি এগারোটার পর শয্যায় অস্ত-গমন! সূর্য্যও হার মানিয়াছে;—তাহার ছুটী সাড়ে পাঁচটা কি ছ'টার পর—আর এ যে রাত্রি এগারোটা! জীবন যেন একটা তপ্ত মরুভূমি, সেখানে একটা অভ্রভেদী শৈল-শিখর নাই, একটা গিরিগাত্র-বাহিনী নির্ঝরিণীও নাই, একটা কুঞ্জ নাই, শ্যামা-দোয়েলের মধুর ঝঙ্কারও নাই! কতবার মনে করিয়াছি যে রুটিনটার একটু ওলট-পালট করিয়া দিই, একবার এই নির্ম্মম বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, মুক্ত আকাশের পাখীর মত উধাও বাহির হইয়া পড়ি, কিন্তু এই লোহার বাঁধন ছেঁড়ে কৈ! এ যে সেই "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল"র হাড়টি, সে হাড় আর বাহির হইতে চায় না, আড় হইয়া গলার মধ্যে আটকাইয়া গিয়াছে! কখনও কখনও দূরাগত বীণা-ধ্বনির মত আশার অমৃত-বাণী কানের কাছে গুণগুণ করিয়া গাহিতেছে, "টুট্‌ল বাঁধন, টুট্‌ল রে" কিন্তু তাহার ফলে সেই—

"বাঁধ মা বাঁধ মা মোরে, বাঁধ মা কঠিন ডোরে
বাঁধা যে পড়েছি আমি কোথা যাব বল না।"

হঠাৎ পুঁথির পাতা উল্টাইয়া গেল। যে চিন্তা এতদিন বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইত, দয়াময় বিধাতা আজ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চলিলেন। কলিকাতার চারিদিকে বড় বড় বুক-চাপা বাড়ীর মাঝখানে ছোট একটা বাড়ীতে বাস, আকাশ দেখিতে হইলে বাহিরে আসিয়া মুখ তুলিয়া চাতক পাখীর মত হাঁ করিয়া উপর-পানে চাহিতে হয়। এই রকম গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে শুইয়া শুইয়া আনমনে এটা-সেটা কত-কি ভাবিতেছি, এমন সময় গুরুজীর আহ্বান আসিল। সাক্ষাতে গুরুজীর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা

হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে তিনি কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইয়া, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভবন আশ্রম-পদ-সমূহে বিচরণ করিয়া কিঞ্চিৎ শান্তি-সুখ অনুভব করিবেন। বহুদিন হইতেই জানিতাম, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে বৈরাগ্য-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তথাপি আমার প্রত্যয়-মন্থর চিত্ত এ কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। এ কথাও জানি যে তাঁহার কল্পনা টলিবার নয়, তথাপি আমি বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে নবীন তাপসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বদ্রীনাথ যাচ্ছি, আপনিও চলুন।" আমি বলিলাম, "সে কি কথা! আর দুই-একদিন পরে, আমাদের স্কুল বন্ধ হবে, এই কটা দিন অপেক্ষা করুন, ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ব।"

তাহাই হইল। ১২ই মে আমাদের যাত্রার দিন।

আগ্রা, দিল্লী, দেরাদুন, মুশৌরি প্রভৃতি চঞ্চলশ্রী নগরী-দর্শনের ইচ্ছা কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই। যে শান্ত-সৌন্দর্য্যে বিশ্ব-নিয়ন্তার চিরমধুর-শ্রী পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, প্রকৃতি দেবীর অনন্ত-সৌন্দর্য্য-নিলয়, সেই মহাতীর্থ-দর্শনই আমার চির-বাঞ্ছিত।

সে আজ অনেক দিনের কথা, কুমার-সম্ভবের পাতা উল্টাইয়া—

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং
ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য
উদ্বেলিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গানি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥

এই শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে পাগলের মত উন্মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি জানি কেমন হইয়া গিয়াছিলাম।

আর আজ (আমি) সেই "অনন্ত-রত্ন-প্রভব" হিমালয়ের সৌন্দর্য্য-রাশির মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিতে যাইতেছি! এ চিত্তের গতি, অনুভূতি ও অবিরাম আনন্দ-স্পন্দন কেমন করিয়া বুঝাইব?

তখন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, পথ-ঘাট ভিজিয়া একশা', আমার চোখের পাতাও একটু ভিজিয়া আসিল। বাদলা মাথায় লইয়া রওনা হইলাম। যাইবার সময় বড়দাদাকে বলিলাম, "দাদা, আসি।" তিনি বলিলেন, "এস;" স্বর গম্ভীর ও স্নেহপূর্ণ। আজও তাহা আমার মনের ভিতর ধ্বনিত হইতেছে। সেই একমাত্র "এস" শব্দে তিনি অনেক কথাই বলিলেন!

১২ই মে সোমবার রাত্রি সাড়ে নয়টার গাড়ীতে (বম্বে মেলে) আমরা প্রথমতঃ কাশী রওনা হইলাম। পুণ্য-তীর্থ কাশীধাম—জগতের কত ভাগ্যবান্ সেখানে আসিয়া ধন্য হইয়াছেন! আমার অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য এতদিন ঘটে নাই। মন আনন্দে নাচিতে লাগিল। কাশীধাম দেখিতে এমন হইবে, বিশ্বনাথজীর মন্দিরটা এত ফুট উঁচু হইবে, গঙ্গার জল শীতল ও অমৃতবৎ মধুর হইবে—ট্রেণে বসিয়া এইরূপ নানা কল্পনা করিতে লাগিলাম। ট্রেণে বড় ভিড়। প্রথমতঃ বসিবার, এমন কি দাঁড়াইবারও স্থান হইল না। তবে কথায় বলে, "বস্‌তে পেলে শুতে চায়!" আমাদেরও তাই হইল। কয়েকটি ভদ্রলোকের অনুগ্রহে আমরা একটু বসিবার স্থান পাইলাম। নানা রূপ সরস-নীরস কথাবার্ত্তায় কোন রকমে চলিয়াছি। মাথা রাখিবার স্থান নাই—নিদ্রা যাই কি করিয়া! ঘোড়ার মত দাঁড়াইয়া ঘুমানো অভ্যাস ত কখনও নাই।

ট্রেণ তেমনই চলিয়াছে—নদী, প্রান্তর, বন, উপবন, গিরিপথ অতিক্রম করিয়া সমানে চলিয়াছে। কতই অভিনব দৃশ্য চোখের সাম্‌নে আসিতেছে-যাইতেছে, কিন্তু এক নিদ্রার অভাবে সমস্তই নীরস। আমরা যে গাড়ীতে চড়িয়াছিলাম, সেই গাড়ীতে আর একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি গয়া যাইতেছেন। শুনিলাম, তিনি সেইখানেই থাকেন। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, তাঁর সেখানে বিশেষ প্রতিপত্তিও আছে। ভদ্রলোক "ঠিক হউক আর ভুল হউক" নানা বিষয়ে ঝাঁ ঝাঁ মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকেন। কোন ভদ্রলোক গুরুজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বদ্রীনাথ যে অতি দুর্গম স্থান, কেমন করে যাবেন? আর কেনই বা যাবেন?" তৎক্ষণাৎ সেই গয়া-নিবাসী উত্তর করিলেন, "মশাই, আপনি কি বুঝবেন? ওঁর প্রাণে এখন electric current ছুটেচে, দেখতে পাচ্ছেন না?" আমিও সহযাত্রী জানিয়া বলিলেন, "বৃথা! এঁর দ্বারা হবে না। Curiosity satisfy কর্ব্বার জন্য যাচ্ছেন—একটু গিয়েই ফিরতে হবে।" আমার শরীরটা কৃশ দেখিয়াই এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের যেরূপ অনুমান-শক্তি, তাহাতে একটা ন্যায়ের টোল খুলিয়া বসিলে পণ্ডিত-সমাজে একটু নাম করিতে পারেন!

১৩ই মে মঙ্গলবার মোগল-সরাইএ গাড়ী বদলাইয়া বেলা দশটার সময় কাশী ষ্টেশনে পৌছিলাম। এখানে দুইটি ষ্টেশন—একটি কাশী, অপরটি বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট। আমরা কাশী ষ্টেশনেই নামিলাম। বেলা এগারোটার সময় গুরুজীর বন্ধু অনন্তরাম বাবুর বাড়ীতে পৌছিলাম। সেখানে যে সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম, সে কথা বলাই বাহুল্য।

কাশী—গঙ্গাই কাশীর প্রাণ, কাশীর সৌন্দর্য্য, কাশীর গৌরব। গঙ্গা বরুণা হইতে অসি পর্য্যন্ত আজ বৃত্তাকারে প্রবাহিত। জল মেঘ-মুক্ত নীল আকাশের মতই নির্ম্মল। অনেক রাজা ও জমিদার স্নানার্থীদিগের সুবিধার জন্য গঙ্গার সমগ্র তীর ব্যাপিয়া শত শত স্নান-ঘাট করিয়া দিয়াছেন। একধারে মানমন্দির হিন্দুর জ্যোতিষের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দুটি ঘাটে শব দাহ করা হয়, একটি হরিশ্চন্দ্র-ঘাট, অপরটি মণিকর্ণিকা। মহারাজ চৈৎসিংহের রাজ-ভবন গঙ্গার উপরেই অবস্থিত—সমগ্র ভারতে যাঁহার যশোরাশি ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই মহীয়সী দেবী অহল্যারও একটি ঘাট দেখিলাম—সলিলান্তগামিনী অসংখ্য সোপানরাজি স্ফটিক-নির্ম্মল ভাগীরথী-তরঙ্গ চুম্বন করিয়া অসি হইতে বরুণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সোপান-শ্রেণীর উপর হইতেই বহুজনপূর্ণ সুমার্জ্জিত রথ্যা বিবিধ আপণ-শোভিত শিলাময় অগণিত বসতি-সমাকুল বিপুল নগরী ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিয়াছে। গঙ্গা-বক্ষে বিচিত্র বেশ-ধারী নরনারীপূর্ণ নৌকাগুলি ইতস্তত ভাসিয়া যাইতেছে, তীরোপবিষ্ট শত শত সমাগত ভক্তের উপাসনাময়ী মূর্ত্তির শান্ত-ছায়া ধারণ করিয়া ভাগীরথী কুলু-কুলুস্বরে বহিয়া চলিয়াছে। প্রবাহিনীর অপর পার্শ্বে বালুকাময়ী শুভ্র সৈকত-ভূমি অতি-দূর পর্য্যন্ত গিয়া তরুরাজির নীল রেখার সহিত মিলাইয়া গিয়াছে! এই গঙ্গার তীরে, স্তিমিত-নেত্র যুক্ত-কর শত শত ভক্তের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদু তরঙ্গোচ্ছ্বাসের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রুদ্ধ

ধার ভগ্ন করিয়া প্রাণের উৎস ছুটিয়া বাহির হইল।

কত নগ-নগরী ধন্য হইল, তব
চুম্বি চরণ-যুগ মারি!
কত নর-নারী ধন্য হইল মা,
তব সলিলে অবগাহি—
বহিছ জননি! ভারতবর্ষে
শত শত যুগ-যুগ বাহি
করিছ শ্যামল কত মরু-প্রান্তর
শীতল পুণ্য-তরঙ্গে।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম। বেলা তখন পাঁচটা। নৌকা করিয়া নাগোয়ার কাছাকাছি গিয়া নৌকা হইতে নামিলাম; সন্ধ্যার হাওয়ায় গঙ্গাতীরে একটু বেড়াইয়া আবার নৌকায় উঠিলাম। সন্ধ্যার আগমনে নবোদিত শশিকলার স্মিত কিরণে উচ্ছ্বসিত মন্দানিল-স্পর্শে ঈষদান্দোলিত গঙ্গাবক্ষে এক অপূর্ব্ব হৃদয়-প্লাবিনী মধুময়ী শ্রী ধারণ করিল। গুরুজী গাহিতে লাগিলেন—"চাঁদ উদিল, ঐ শ্যামচাঁদ এলো কই?" ধীরে ধীরে সঙ্গীত-রব অনন্তে মিশিয়া গেল। মন হারাইয়া গৃহে ফিরিলাম।

২

রাত্রে লুচি-তরকারী তত ভাল লাগিল না। অনন্তবাবুর আত্মীয় বৈজমল আমাদের বড়ই যত্ন করিতেছে। কিন্তু রাত্রে যে ঘরে আমাদের শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেখানে বায়ুর নাম-গন্ধও নাই, গরমে ঘুম আসে না! রাত্রি এগারোটার পর আর সে ঘরের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না। একটা কম্বল লইয়া আমরা বরাবর গঙ্গার ঘাটে চলিলাম। অহল্যা ঘাটে গিয়া দেখি, কতকগুলি কাঠের তক্তা পাতা আছে, তাহারই উপর কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। গুরুজী শুইবামাত্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। বড় আরামেই শুইয়াছিলাম, ঘুম কিন্তু তখনই আসিল না, কারণ তখন আমি গুরুজীর মৃদু-মধুর নাসিকাধ্বনি হারমোনিয়মের প্রথম পর্দ্দার (সি শার্প) কাঁপানো সুরের সঙ্গে মেলে কি না, তাই ভাবিতেছিলাম। সকাল বেলা "এ শুৎনে-ওয়ালা ভাই উঠো" এই স্বরে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একেবারে স্নানাদি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

আজ ১৪ই মে। গুরুজীর বন্ধু গোপাল বাবুর বাড়ীতে আহারাদি করিয়া বেলা সাড়ে নয়টার পর একখানি এক্কা চড়িয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিলাম। তখন মেল ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। Cantonment stationএ মেল-ভ্রমে প্যাসেঞ্জার ট্রেণে চড়িয়া হরিদ্বার রওনা হইলাম। যাত্রী কম ছিল; বেশ নিদ্রা হইয়াছিল, কিন্তু দুই দিন ধরিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের নন্দদুলালী চালে প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেণে এতদূর পথ পাড়ি মারা আমার অদৃষ্টে এই প্রথম। শুনিলাম, গুরুজীর এরূপ অনেকবারই হইয়াছে। যাহা হউক টাইম টেব্‌ল্ না দেখিয়া ট্রেণে চড়িবার আক্কেল সেলামি বেশ পাইলাম। পথে বৈজমলের কথা অনেকবার মনে হইল, ভদ্রলোকের যত্নে কেমন একটা আন্তরিকতা ও মধুরতা ছিল।

লুকসর ষ্টেশনে ট্রেণ বদলাইয়া দেরাদুন মেলে চড়িয়া বসিলাম। তাড়াতাড়িতে গুরুজী গায়ের চাদরটা আগের গাড়ীতেই ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ভারি বরাত-জোর, তাই একটি ভদ্রলোক

অনুসন্ধান করিয়া চাদরটি আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। ইতিপূর্ব্বে একবার হরিদ্বার আসিয়াছিলাম, সেখানে আর না নামিয়া, হৃষিকেশ রোড ষ্টেশনেই নামিবার সঙ্কল্প করিলাম। ট্রেণ হইতে হরিদ্বারের গঙ্গা দক্ষিণে রাখিয়া চলিলাম। দূর হইতে গঙ্গার দৃশ্য অতি-রমণীয় —আরও দূরে নীলধারা দেখিতে পাইলাম; নীলধারার জল নীল আকাশেরই প্রতিচ্ছবি। লাইনের দুই দিকে জঙ্গল, দুই চারিটা ময়ূর এ-দিকে ও-দিকে খেলা করিতেছে; কোনটি বা পশ্চিমগগনশায়ী সূর্য্যের আলোকে তাহার পুচ্ছ মেলিয়া দিয়াছে।

আজ ১৫ই মে। বেলা পাঁচটার সময় হৃষিকেশ রোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, এখান হইতে হৃষিকেশ ৭ মাইল। তখনই একটি টঙ্গা করিয়া (ভাড়া ১৷৷০) রওনা হইলাম। হৃষিকেশ যাইবার রাস্তাটি অতি সুন্দর, মাঝে মাঝে দুই-একটি গিরি-নির্ঝরিণী বিজন বন-ভূমির বক্ষ বহিয়া আনমনে কোথায় চলিয়াছে। তখনও আমাদের স্নানাদি কিছুই হয় নাই। পথিমধ্যে একটি স্বচ্ছ নির্ঝরের জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় স্নিগ্ধ-শ্রী হৃষিকেশধামে উপনীত হইলাম।

হৃষিকেশ

টঙ্গা হইতে নামিয়াই দেখিলাম, মহাত্মা কালী কম্লীওয়ালার বৃহদায়তন ধর্ম্মশালা। সেইখানেই আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালার সম্মুখেই রাস্তা, রাস্তার দুইদিকে নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ অনেকগুলি দোকান। পথ প্রস্তরময় ও সুমার্জ্জিত। এই পুণ্যতীর্থ ক্রমে ক্রমে একটি নগরে পরিণত হইতেছে। চারিদিকেই বড় বড় রাস্তা। কোনটির নাম উড রোড, কোনটির নাম চন্দ্রশেখর রোড ইত্যাদি। এখানে P. W. D. র একটি সুদৃশ্য বৃহৎ বাংলো আছে। হৃষিকেশে ঢুকিলেই বাংলো দেখা যায়। ডাকঘর, তার-ঘর ও হাসপাতাল সবই আছে। খাবারের দোকান অনেকগুলি আছে, সেখানে কলিকাতার মত নানাবিধ মিষ্টান্নও পাওয়া যায়। এখানেও পাণ পাওয়া যায়, কিন্তু হৃষিকেশের পর হইতেই যাত্রীর কণ্ঠ-সরসকারী প্রিয়সখা 'পাণ' ডুমুরের ফুল হইয়া গিয়াছে। শুধু হৃষিকেশ কেন, কোথাও সিগারেটের অসদ্ভাব দেখিলাম না; কলম্বিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া কাঁচি, থ্রী ক্যাস্‌ল্‌স্, ষ্টেট এক্সপ্রেস্—সমস্তই পাওয়া যায়। ধন্য সিগারেটের মহিমা! যেখানে সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম, যেখানে পূতবাহিনী গঙ্গার বিমল সলিলে সকল বাসনা পরিতৃপ্ত হয়, সেই দূর হিমালয়-শিখরেও তোমার বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছ!

হৃষিকেশজীর মন্দিরটি গঙ্গার একটু উপরেই অবস্থিত। মন্দিরাধিষ্ঠাতৃ দেবতা উচ্চে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট হইবে। মূর্ত্তি পাষাণময়ী, অতি গম্ভীর। দর্শন-কালে মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। কেন, তাহা বলিতে পারি না। মন্দিরের সম্মুখেই উন্মুক্ত আকাশ, নিম্নে গঙ্গা, দৃশ্য অতি মনোরম। অন্যপার্শ্বে গঙ্গার বাঁকের উপর শুভ্র বালুকা-শোভিত তীরে অনেকগুলি অগ্নিহোত্রা সাধুর আশ্রম দেখিলাম। অতিথির প্রতি তাঁহাদের আদর-যত্নের কোন ত্রুটি নাই। গঞ্জিকা-টঙ্গিকা তাঁহাদের বেশ চলে। বোধ হয় ঠাণ্ডা

বরদাস্ত করিবার জন্যই এই রকম একটা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার ধর্ম্মশালা হইতেই চলিয়া থাকে। *

মহাত্মা কালী কম্লীওয়ালার ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। এখানে সাধু ও দরিদ্র তীর্থযাত্রীদিগকে সদাব্রত দেওয়া হয়। হৃষিকেশ-নিবাসী ও অন্যান্য সমাগত সাধু মাত্রেই এই ধর্ম্মশালায় প্রতিদিন অন্ন পাইয়া থাকেন। সদাব্রত-প্রার্থী সাধু ও দরিদ্র তীর্থযাত্রী হৃষিকেশ-ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষের নিকট হইতে সদাব্রতের অনুমতি-পত্র লইয়া বদ্রীনাথ গিয়া থাকেন। এইরূপ সদাব্রতের ব্যবস্থা মহাত্মা কালী কম্লীওয়ালার প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় আছে, কিন্তু হৃষিকেশ ধর্ম্মশালা হইতে অনুমতি-পত্র না পাইলে অন্যত্র এই অনুগ্রহ পাওয়া যায় না। হৃষিকেশ ধর্ম্মশালাই কম্লীওয়ালার অন্যান্য ধর্ম্মশালার head-quarters ; এখানে আরও কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে, কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা কি রকম, তাহা জানি না, জানিবার সুবিধাও ঘটে নাই।

সে সময় যাত্রীর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে অনেক চেষ্টা করিয়াও অত বড় বাড়ীর মধ্যে একটা ছোট-খাট কামরাও আমরা পাইলাম না, সব কামরাই ভরিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ কৃপা করিয়া তাঁহার বসিবার স্থানটি আমাদের বিশ্রামের জন্য রাত্রির মত ছাড়িয়া দিলেন। অন্যান্য ধর্ম্ম-শালাতেও চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ফল হইল না। সর্ব্বত্রই সেই "ন স্থানং তিলধারণং"। যাত্রীর মধ্যে প্রায় সকলেই মাড়োয়ারী, বাঙ্গালীর মুখ দেখিলাম না। ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠাতা মাড়োয়ারী, অধ্যক্ষ মাড়োয়ারী, দোকানদারও বেশীর ভাগ মাড়োয়ারী। যে সমস্ত বড় বড় নূতন ইমারত তৈয়ারী হইতেছে, তাহারও অধিকারী মাড়োয়ারী। শুধু হৃষিকেশ নয়, সর্ব্বত্রই এই রকম। বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত এই একই ভাব দেখিতে পাইলাম, এক কথায় সমস্ত উত্তরাখণ্ড মাড়োয়ারীর বলিলেও চলে। এই শত শত যাত্রী,—সকলেই অবশ্য বদ্রীনাথ যাইবে না, লছমন-ঝোলা পার হইয়া গঙ্গাজীমে স্নান করিয়া দেশে ফিরিবে ; বদ্রীনাথের যাত্রী খুবই কম।

তার পর হোটেলের কথা। একটী মাত্র হোটেল—মালিক দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ। ডাল, ভাত আর হাতে গড়া মোটা মোটা চাপেটী রোটী সেখানে পাওয়া যায়—ডালটা রাঁধে ভাল—যাহারা রন্ধনাদি কার্য্যে অসমর্থ, অথচ ধর্ম্মশালার আতিথ্য-গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাহাদের গতি ঐ হোটেলে। দোকানে অবশ্য লুচি, তরকারি, সন্দেশ, দুধ সবই পাওয়া যায়। খাবার জিনিষগুলি কলিকাতার খাবারের চেয়ে ভাল বলিয়াই বোধ হইল। এ রকম খাঁটী জিনিষে তৈয়ারী ভাল খাবার আরও দুই-এক জায়গায় পাইয়াছিলাম। বদ্রীনাথের খাবার অতি উৎকৃষ্ট। সেখানকার বড় বড় মালপোর কথা আমার আজও বেশ মনে পড়ে। কিন্তু অন্ন পাইলে এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালী লুচি-সন্দেশ ফেলিয়া দেয়। হোটেল-স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কেত্তা চাউর দেগা ?" চাউর মানে ভাত! আবার আহারের Bill হইল, "চাউরের" পরিমাণ হিসাবে। দেখিয়া একটু হাসিলাম। চাউর ও ডাল তরকারীর তুলনায় দাম কিছু বেশী

পড়িল। যাহা হউক, এত ক্ষুধায় আহার বেশ তৃপ্তির সহিতই হইয়াছিল।

আহারাদি শেষ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেছি, এমন সময় পথে একটি বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের দেখা হইল। তিনি পাগলের ভাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তায় বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় পাইলাম। আলাপ-পরিচয়ে জানিলাম, তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃত বেশ জানেন। আমাদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়া বালুচরের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "রাজোচিত শয্যাও ইহার নিকট মলিন, এ যে আমার মায়ের কোল রে!" এটা সেটা অনেক কথার পর "তবে বসুন, আমি আসি" বলিয়াই ঝড়ের মত সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। গুরুজী কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন, আমিও তদবস্থ। সম্মুখে গভীরনাদিনী, খরস্রোতা গঙ্গা,—চারিদিকে জ্যোৎস্নাপ্লুত পাদপ-মণ্ডিত গিরিশ্রেণী, উপরে দূরবিস্তারী নীল নির্ম্মল আকাশ—এ যেন মহাভাবের নিত্য লীলাভূমি!

ক্রমেই রাত্রি বাড়িতে লাগিল। অনিচ্ছাকৃত অলস পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে গৃহের দিকে ফিরিলাম। আশ্রম হইতেই গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গ ও ছল-ছল কল-কল নাদ তীরবর্ত্তী বিস্ময়মুগ্ধ পথিকের হৃদয় ভগবৎ-ভক্তিতে পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল।

পয়সা খরচ করিয়া লোক এখানে আসে কেন? শুধু একা নয়, সবল সুস্থকায় যুবা নয়—যুবা, বৃদ্ধ, সকলেই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু-সন্তান গুলিকে লইয়া এই দূরদেশে দারুণ দুঃখ ও আপৎ মাথায় লইয়া আসে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর গৃহের কোণে বসিয়া পাওয়া যায় না—; ঐশ্বর্য্যে, শিক্ষায় ও সভ্যতায় সমৃদ্ধ দেশ-পর্য্যটনেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। এ প্রশ্নের উত্তর চিরমধুর শান্ত প্রকৃতির কোলে, ইহার প্রতি অণু-পরমাণুতে ধ্বনিত হইতেছে! যে একবার এই নগ্ন বিরাট প্রকৃতির সামনে দাঁড়াইবে, সে-ই ইহার উত্তর পাইবে। ইহার এক একটি রেণুতে যে বিপুল সৌন্দর্য্য নিমেষে তরঙ্গায়িত হইতেছে তাহা পৃথিবীর নয়—স্বর্গের! ইহা শুধু নেত্রের তৃপ্তি-কর নয়—অন্তরের অতি-গভীর আনন্দ-স্পন্দন!

৩

বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলাম, ধর্ম্মশালায় আসিয়াই শুইয়া পড়িলাম। নিদ্রা অনেকক্ষণ হইতেই চোখের পাতা দুটিকে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। শুইবামাত্র অবাধে আপনার কার্য্য সে শেষ করিল। ভোরের হাওয়ায় ঘুম ভাঙ্গিলে হৃদয়-তন্ত্রীতে যেন কাহার মৃদু-মধুর স্নেহের আকর্ষণ বোধ করিলাম। বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলাম। এতদিন গাড়ীতে আসিয়াছি,—আজ হইতে হাঁটা পথ আরম্ভ হইল। সকাল বেলাতেই একটা মুটের মাথায় লোটা-কম্বল তুলিয়া দিয়া জয় নারায়ণ বলিয়া স্বর্গাশ্রমের দিকে চলিলাম।

১৬ই মে। হৃষিকেশ হইতে গঙ্গাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রায় ছয় মাইল পথ আসিয়া একটি আশ্রমে পৌঁছিলাম। সম্মুখেই একটি গেট, গেট পার হইয়া ভিতরে ঢুকিলাম। অনেকগুলি কক্ষ-বিশিষ্ট গৃহ,—তাহাই আশ্রম। মাঝের ঘরটি খুব বড়। সেই ঘরে নানাবিধ পুস্তক রহিয়াছে; একটি লাইব্রেরী বলিলেও

চলে। সামনে বারাণ্ডা, বারাণ্ডার পরই বাগান। U, P.র জজ মহাত্মা বৈজনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার গুরু মহাত্মা সাধু রামতীর্থ স্বামী এম, এ মহোদয়ের স্মরণার্থে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্থানটি অতি মনোরম। আশ্রমের সামনেই লছমন ঝোলা যাইবার পাহাড়ি পথ। তাহার পরই একটি বৃহৎ স্নান-ঘাট, গঙ্গার স্বচ্ছ বারি ঘাটটির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ-যাত্রিগণ এইখান হইতেই মাল-পত্র লইয়া যাইবার জন্য কাণ্ডীওয়ালা ভাড়া করিয়া থাকেন। বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত যাওয়া আসায় কাণ্ডীওয়ালার ভাড়া কিছু ৪৫৲ টাকার কম পড়ে না। খোরাকির দরুণ তাহাদিগকে দৈনিক দুই পয়সা, কখনো বা চার পয়সা করিয়া দিতে হয়। এইখানে ছাপান ডাণ্ডিও পাওয়া যায়। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, হৃষিকেশেও এইরূপ ডাণ্ডি ভাড়ার ব্যবস্থা আছে।

আশ্রমের বাহিরে আসিয়া নৌকার আশায় ঘাটের উপর বসিয়া পড়িলাম। এইখানে নৌকা পাওয়া যায়। পার হইয়া স্বর্গাশ্রম যাইতে হয়। যাহারা বরাবর লছমন ঝোলা হইয়া বদ্রীনাথ যায়, তাহাদের আর নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইবার প্রয়োজন হয় না। হৃষিকেশ ও লছমন ঝোলার মাঝখানে গঙ্গার অপর পার্শ্বে স্বর্গাশ্রম সুতরাং এইখান হইতেই নৌকা করিয়া স্বর্গাশ্রম যাওয়াই সুবিধাজনক। এপার হইতেই স্বামীজীর সেই সৌম্য, সমুন্নত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। নৌকার বিলম্ব দেখিয়া গুরুজী বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমার মনে হইল, লাফ দিয়া স্রোতস্বিনী পার হইয়া যাই। "এ না-ওয়ালে, তুরন্ত্ আও" বলিয়া বহু-বার ডাকিলাম। কিন্তু ডাক শোনে কে! প্রত্যুত্তরে কেবল গঙ্গার কল-কল স্বরই কানে বহিয়া গেল। গুরুজী রসিক্ লোক, বেশ গাহিতে পারেন; তিনি ঘাটে বসিয়া গান ধরিলেন,

"আমি ভক্তের তরে ঘাটে ঘাটে
নিয়ে বেড়াই ভাঙ্গা তরী।"

আর দেরী সহ্য হয় না, বেটা "না-ওয়ালে" কি এখনও ঘুমাইতেছে? বড়ই রাগ হইল। কিন্তু রাগ করিই বা কাহার উপর, আর মাথা ভাঙ্গিই বা কাহার? পকেটে কতকগুলা ছোলা ছিল, বসিয়া তাহাই চর্ব্বণ করিতে করিতে রাগের শান্তি করিতে লাগিলাম। অবশিষ্ট ছোলা গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া মাছের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম—সময় বুঝিয়া মৎস্য-ভায়াও don't care করিয়া দিল।

এই প্রসঙ্গে হৃষিকেশের গঙ্গায় মাছের কথা মনে হইল। আটার গুলি করিয়া জলে ফেলিয়া দিবামাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসিয়া সেগুলি টপাটপ্ গলাধঃকরণ করিতে থাকে, সে এক অপরূপ দৃশ্য! এক এক ঝাঁকে আশি-নব্বইটা মাছ থাকে; মাছগুলি ওজনে পাঁচ-ছয় সের হইতে এক মণ দেড় মণ হইবে। ইচ্ছা করিলে দুই-একটা মাছ ধরিতেও পারা যায়, তাহারা একেবারে মানু-ষের কোলের কাছে আসিয়া পড়ে। আমা-দিগকে বোধ হয় বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে

পারে নাই, নহিলে সাহস করিয়া এতটা কাছে আসিত না।

এই সবে সাতটা, গুরুজী ইহারই মধ্যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বহু চেষ্টাতেও, দুধ ত দূরের কথা, একটু গুড়ও পাইলাম না। অবশেষে প্রতিপদের চাঁদের মত দূরে নৌকাখানি দেখা দিল। নৌকা ঘাটে না লাগিয়া আঘাটায় লাগিল; মুটিয়াকে ডাকিলাম, সে ইতি পূর্ব্বেই তাহার প্রাপ্য ছ'আনা পয়সা পাইয়াছিল; মুটিয়া কলির ধর্ম্ম পালন করিয়াছে, অবসর বুঝিয়া বুদ্ধিমানের মত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে। কি করি, নিজে মুটিয়ার পদাভিষিক্ত হইয়া নৌকায় উঠিলাম। গঙ্গার মাঝে গিয়া নৌকা আর চলে না; নীচে বড় বড় পাথর, নৌকা তাহাতে আটকাইয়া গিয়াছে, মাঝিরা বহু কষ্টে নৌকা আরও কতকদূর লইয়া গিয়া সকলকেই নামিতে বলিল। কি জানি কেন, আমাদের উপর একটু দয়া হইল আমাদিগকে নামিতে নিষেধ করিল। কোনরকমে তীরে পৌঁছিয়া মোট মাথায় স্বামীজীর আশ্রমে গিয়া মোট রাখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া একটা তক্তার উপর বসিয়া পড়িলাম।

তারপর স্বামীজির আদরের কথা—সে আর কি বলিব! যিনি জগতের প্রত্যেক মানবকে আত্মবৎ দেখেন, তাঁহার যত্নে যে কি এক মধুরতা, কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয়



নীচে বড় বড় পাথর, নৌকা তাহাতে আট্‌কাইয়া গিয়াছে।

ভাব মাখানো আছে, তাহা বলা যায় না। স্বামীজীর মধুর উপদেশগুলি আমার সর্ব্বদাই মনে পড়ে। আমি বেশ বুঝিলাম, তাঁহার জীবনে প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক অনুষ্ঠানই উপদেশ-পূর্ণ! তাঁর প্রত্যেক কথাতেই এক একটী শাস্ত্রীয় সত্য নিহিত। একটা দৃঢ়তার, একটা মহা কর্ত্তব্য-পরায়ণ-তার ভাব তাঁহার কথায় ও কার্য্যে বেশ পরিলক্ষিত হয়—তাঁহার মহানুভবতা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিয়াছি।

স্বর্গাশ্রমে মহাত্মা কালী * কম্লীওয়ালার একটিধর্ম্মশালা আছে, সাধুত্তম আত্মপ্রকাশ স্বামী এই ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ, তাঁহারই যত্নে ও ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ শত শত সাধু ও দরিদ্র-নারায়ণ সমাদরে অন্ন পাই-তেছেন। ধর্ম্মশালার পাশে একটু নীচেই স্বামীজীর আশ্রম, আশ্রম অতি রমণীয় ও নির্জ্জন। স্বর্গাশ্রম প্রকৃতই স্বর্গাশ্রম! সম্মুখেই পুণ্য-সলিলা খরস্রোতা কল-নাদিনী গঙ্গা! পরপারে অত্যুন্নত সুদীর্ঘ শৈলমালা প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় সকল সময়েই এই আশ্রম মধুময়! চন্দ্রালোকে স্নিগ্ধ তরুরাজির পল্লবান্তরবাসী ময়ূরগণের কেকারব তাপস-গণের অলৌকিক আনন্দ উৎপাদন করে, বিহগকুলের শ্রুতিসুখদায়ী কলধ্বনি বায়ুমণ্ডলের স্তরে স্তরে মূর্চ্ছিত হইয়া আনন্দ তরঙ্গ ছুটাইয়া দেয়।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে স্বামীজী ও আর একটী সাধুর সঙ্গে আমরা আশ্রমের একটু দূরে একটা গুহা (সেখানকার লোকে গুহাকে গুফা বলে) দেখিতে বাহির হইলাম। গুহার নাম শুনিয়া মনে ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল, কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে ঔৎসুক্যের কোন কারণ ছিল না। তবে সেই স্থানটীর বৈচিত্র্য ভুলিবার নয়। তরঙ্গময়ী গঙ্গা গুহার দ্বার-দেশ ধ্বনিত করিয়া ঘোর রবে বহিয়া চলিয়াছে! এইখানে পাহাড়ের উপর চারিদিকেই নিবিড় জঙ্গল। স্বামীজী বলিলেন, এই জঙ্গলে সময়ে সময়ে দুই একটা বুনো হাতি দেখা যায়, ভালুকেরও ভয় আছে। একদিকে ভীষণতা, শৈলমালার দিকে অগ্রসর হইতে ভয়ে পা কাঁপিতে থাকে, অপর দিকে অনন্ত রূপরাশি ছড়াইয়া দিয়া হরিপদ-তরঙ্গিনী গঙ্গা। যখন সন্ধ্যার রক্তিম রাগে সমস্ত প্রদেশ উচ্ছ্বসিত, তখন নীরবে সুমন্দ পদক্ষেপে আশ্রমের দিকে ফিরিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় গুরুজীকে লইয়া একটু বিপদে পড়িয়া ছিলাম—সহসা ভাবাবেশে তিনি অত্যন্ত উতলা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আজ ১৭ই মে। আজও স্বামীজীর আশ্রমে। প্রাতঃকালে নৌকা করিয়া রাম-তীর্থের আশ্রমে গিয়া গঙ্গাকে দক্ষিণে রাখিয়া লছমন-ঝোলার দিকে অগ্রসর হইলাম। শুধু গুরুজী ও আমি—সঙ্গে আর কেহ নাই।

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ।

* কাল কম্বল গায়ে দিতেন বলিয়া তাঁহার নাম "কালী কম্লীওয়ালা" কেহ কেহ এই কথাও বলিয়া থাকেন।

দুপুর-অভিসার

(গৌড় সারঙ্—দাদ্‌রা)

যাস্ কোথা সই একলা ও' তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?
সাঁজ ভেবে তুই ভর দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুর-পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাস্‌নে একা হাবা ছুঁড়ি,
অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই !
ছাখ্ রঙ্ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ্‌বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুড়ি' ;
পিক-বধূ সব টিট্‌কিরি দেয় বুল্‌বুলি চুমকুড়ি
ওলো বউল-ব্যাকুল রসাল তরুর সরস ঐ শাখে ॥
দুপুর বেলায় পুকুর গিয়ে একুল ওকুল গেল দুকুল তোর,
ঐ চেয়ে ছাখ্ পিয়াল-বনের দিয়াল ডিঙে এলো মুকুল-চোর।
সারঙ্ রাগে বাজায় বাঁশী নাম ধরে' তোর ওই,
রোদের বুকে লাগ্‌লো কাঁপন সুর শুনে ওর সই।
পলাশ অশোক শিমুল-ডালে
বুলাস্ কি লো হিঙুল গালে তোর ?
আ'— আ' ম'লো যা' ! তাইতে হা ছাখ্
শ্যাম চুমু খায় সব সে কুসুম লালে !
পাগ্‌লী মেয়ে ! রাগ্‌লি নাকি ? ছি ছি দুপুর-কালে
বল্ কেম্‌নে দিবি সরস-অধর-পরশ সুই তাকে ?

কাজী নজরুল ইসলাম।

একটি প্রশ্ন

বেদ-বেদান্তের উপর বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপিত নহে। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর, (Soul) ও হিন্দুর জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধ মতে "নির্ব্বাণ" অর্থ বিলীন হওয়া নহে। নির্ব্বাণ লাভের অর্থ—কুপ্রবৃত্তি বিনাশ, অজ্ঞতা বিনাশ ও প্রকৃত জ্ঞানলাভ দ্বারা ইহজীবনেই প্রকৃত শান্তিলাভ। অথচ বুদ্ধদেবকে আমরা অবতার বলিয়া মানি। ইহার কারণ কি ?

যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার সদুত্তর প্রদান করেন, তবে পরম বাধিত হইব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গল্পের আর্ট

(গল্প)

দার্জিলিংএর ডাকগাড়ীতে একখানা প্রথম শ্রেণীর মেয়েদের কামরায় সেদিন যাত্রী ছিলেন দুটী তরুণী। বাঙালী ঘরেরই মেয়ে, দুজনেই বেশ সুন্দরী। সমানই বয়স দুজনের, হাব-ভাব, বিশেষ ধরণের পরা সাড়ীটী, সৌখীন জাঁকালো জামার কাট্‌টী আর সব মিলে মোটের উপর সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন সাজ-গোজটী এঁদের ঠিক একই রকমের।

সঙ্গে খবরদারি করবার জন্যে পুরুষ মানুষ কেউ নেই, অথচ এঁরা চলেছেন এই দীর্ঘ রাস্তা—সাড়ে তিনশ' মাইলেরও উপর—"সোমত্ত মেয়েমানুষ"—ব্যাপারটা "কি জানি বা আজকালকার" গোছের হলেও কথাটা সত্য এবং সেজন্য মেয়ে দুটীর কোনো-রকম শঙ্কা বা এতটুকু স্বস্তির অভাবও ছিল না। তাঁরা দিব্যি খোস্ হালে, বহাল-তবিয়তে আইন-কলেজের বাহাদুর ছেলেদের মতই বে-পরোয়া চলেছিলেন। মেয়েদুটী কুমারী, গ্রাজুয়েট, ইংরেজী সাহিত্যে এ-গ্রুপে এম-এ পড়েন।

একজনের নাম লালিমা রায়, আর এক জনকে বোর্ডিংএ মেয়েরা ডাকতো নেলী বলে, কিন্তু নাম জারী হয়েছিল নিলীনা দেবী নামে—আর সে খাঁটী আইন-সঙ্গত নামজারী, কারণ ডিগ্রির দলিল দু'খানা জজ পূজনীয় স্যর আশুতোষ নিজের হাতে দস্তখত করে দিয়েছিলেন।

লালিমার মামা মিঃ ভউমিক দার্জ্জিলিংএ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করেন—টেলিগ্রাফের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট। এঁরা দুই বন্ধুতে মিলে মাঝে মাঝে শৈল-ভ্রমণে যান, এবারও এপ্রিলে গেছলেন। এবার পাহাড়ের সিক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য আর মেঘলা দেশের মধুর শোভায় মন ভরে নিয়ে কলকতায় ফিরে চলেছেন!

লালিমা ইলেক্‌ট্রিক পাখাখানার নীচে গদির উপর বর অঙ্গের ভর না রেখে খুব একটানা মনোযোগে একখানা মাসিক কাগজ পড়ছিলেন। আর নিলীনা বালিশটার উপর হেলে পড়ে কখনো দেখছিলেন, গাড়ীর কাঠের ন্যায় ঠকঠকে চোকোলেট বালিশের উপর আলোর নাচ্‌না, কখনো বা কাঁচের বন্ধনের ভিতর তার উজ্জ্বল, সরু, তারে-গড়া দেহটা, আবার কখনো চোখ বুজে ভাবছিলেন বুঝি, কাকার ছেলে ভণ্ডুলের চোখ-মুখ-ভরা দুষ্টুমির কথা!

ওদিকে লালিমাটি চুপ! এদিকে এই অশ্রান্ত, বিনিদ্র ডাকগাড়ী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটেছে—আর লোহার রাস্তার উপর তার চাকার শক্ত আঘাতগুলো ঝণঝণ করে উঠ্‌চে—বেচারী আর কতক্ষণ পারে, এটা-ওটা-সেটা নিয়ে একলাটী আনমনে! স্তব্ধ নিশীথের এ নিঃশব্দ যাত্রা গল্পে গুলজার হয়ে উঠ্‌লেও না-হয় সহ্য হয়!

এবার তাই বাঁ হাতের সুগোল কনুইটীর উপর ঈষৎ একটু উঁচু হয়ে উঠে তিনি বল্‌লেন,

—“এই—তুই—রাখ্ বল্‌চি—নইলে কাগজ টেনে ফেলে দেব।”

“থাম্ না, একটু চুপ করে ঘুমো।”

“না—তা হলে তুই চেঁচিয়ে পড়্।”

“ভাবের পাকা জহুরী আর্টটা কষে দেখ্‌চি, চেঁচিয়ে পড়লে ধরা-ছোঁয়া যাবে না।”

“আর্ট ধরে ছুঁয়ে আর কাজ নেই—তুই না হয় একটা গল্প বল্।”

লালিমা হ্যাঁ-না কিছুই না বলে কাগজের এ দিকটা উল্টে ও-পিঠের প্রথম লাইনটা আরম্ভ করে দিলেন। বাহিরের ভিজে হাওয়া খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এসে গায়ের উপর সির্‌সির্ করে উঠছিল বলে নিলীনা ফেরোজা রঙের শালখানা পায়ের উপর খানিক টেনে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন—সাড়ীর আঁচলটা ঘাড়ের কাছে বালিশের হুইপিং দেওয়া ফ্রিলটার উপর লুটোপুটি খেতে লাগলো।

খানিকক্ষণে পড়া শেষ করে মিস্ লালিমা উঠে বসবার উদ্যোগ করছেন—এমন সময় গাড়ী এসে একটা ষ্টেশনে দাঁড়ালো। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর উজ্জ্বল আলোর নীচে দাঁড়িয়ে একটী ফুটফুটে বাবু—চশ্‌মা-পরা—হাতে একখানা সরু বেতের ছড়ি—একজন বারান্দা-ওয়ালা টুপী-চড়ানো রেলের বাবুর সঙ্গে ব্যস্ত ভাবে কি কথা কইছিলেন—লালিমার দৃষ্টি হঠাৎ সার্সির স্বচ্ছতা ভেদ করে সেই বাবুটীর উপর গিয়ে পড়লো। তিনি পাশের খড়-খড়িটা ফেলে দিয়ে নিলীনাকে চট্ করে টেনে এনে বাইরের দিকে দেখিয়ে বল্‌লেন—“অস্থির হচ্ছিলি, শোন্, গল্প বলি।”

“বা রে, গল্প বল্‌বি তা টেনে-টুনে বাইরের দিকে দেখিয়ে কি—?”

“থাম্, বেশ প্রস্তুত হয়ে সাড়ী-টাড়ী এঁটে-সেঁটে বোস্! মনে কর্, ঐ বাবুটীর নাম নীহার রঞ্জন রায় এম্, এস্, সি পাশ, ম্যাথেমেটিক্‌সে ফার্ষ্ট ক্লাস্।”

“তা আমার কি?”

“তুই শ্রীমতী নিলীনা দেবী বি, এ ইংলিশে ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স পেয়েছিস্। সারা অঙ্গে তোর যৌবনের পূরো সাড়া—দিব্যি শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে। শ্রী দিয়েছে রং, ধী দিয়েছে কান্তি, উঁচু নাক, ডাগর চোখ, রাঙা গালে অঢেল স্বাস্থ্য, হাসলে টোল খেয়ে যায়, মিষ্টি হাসি, ফর্সা তনুর দিব্যি গড়ন। পরেছিস্ একখানা ঢাকাই শাড়ী, কোরা জমি, ফিকে সবুজের ধারি ভরে জরীর কারু-করা তার পাড়, ষ্টিচ্ দিয়ে ড্রেস্ করে তৈরী। বুটিদার আঁচলটা বুকের পাশ দিয়ে এসে নেমেছে বাঁ দিকে, পাশটা ঘাড়ের উপর সোনার ব্রোচে আঁটা। কষা-বডিসের উপর ঢিলে ব্লাউশ—পিস্ কেটে এক সেলাইএ তৈরী, পিঠের দিকে বোতাম আট্‌কানো। এলানো চুলে জড়ানো খোঁপা। টেরির মত বেঁকিয়ে টানা সিঁথি, দু'পাশে চুল প্লেন করে আঁচ্‌ড়ানো। বাঁ হাতের মণিবন্ধে সোনার ব্রেস্‌লেটে ছোট একটি রিষ্টওয়াচ আঁটা। লঘু-রাঙা পায়ে চিক্‌চিকে কালো রেশ্‌মী মোজা পরা, আর সাদা ক্রোম লেদারের ঘুন্টি-বাঁধা জুতাজোড়ার পাতলা হুঁটো ছিল উঁচু করে তোলা, পেটী-কোটের হাতে-বোনা ক্রোসে লেসের চওড়া ঝালরটা তার গোড়া অব্‌ধি এসে পড়েছে।”

নিলীনার লাগ্‌ছিল নেহাৎ মন্দ না—আর এটাও তিনি জানতেন যে লালিমার হাত কিছুতেই এড়ানো চলবে না—গল্প শুনন আরম্ভ

করেচেন, তখন শেষ না ক'রে তিনি ছাড়চেন না, কাজেই গল্প শোনবার জন্যে বেশ কায়েমী রকমে এক বেঞ্চের উপরেই মুখোমুখী হয়ে বসে বললেন, "কাপড়-চোপড়ের কথাটা অবিকল গ্রাফিক—একেবারে ফোটোগ্রাফ বল্‌লেও চলে! কিন্তু চেহারার কথাটা কি করে বলা যায়! পুরুষ মানুষও কেউ যে নেই কাছে।—আচ্ছা, মেনে নিলুম, গ্রাফিক্—granted."

"হ্যাঁ, description graphic না হলে চল্‌বে না—ঐখানেই আর্ট।——তারপর দার্জ্জিলিং থেকে ফেরবার পথে এই ষ্টেশনে দুজনের দেখা হয়ে গেল—হঠাৎ—সুমুখো-সুমুখি চোখোচোখি—কিম্বা আর একটু মোলায়েম কবিতা করে, আঁখিতে-আঁখিতে,—বুঝ্‌লি?"

"বুঝেচি, কিন্তু নিলীনা দেবী ডাগর ডোগরটী—ডব্‌গে উঠ্‌ছিলেন বলে—তরুণী মিস্ লালিমা কুমারীর মর্য্যাদা নষ্ট হতে দিতে তো তিনি কিছুতেই পারেন না—তাই মাঝে পড়ে নিজেই নীহার বাবুকে লুপে নিলেন।"

"না, নিলীনা কিছুতেই এ ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হলেন না। কোন প্রয়োজন না থাক্‌লেও তিনি চট্ করে নেমে গিয়ে নীহার বাবুকে ছোট্ট একটী নমস্কার করে বল্‌লেন—'মাপ্ করবেন—ইন্‌ট্রোডিউস্ কচ্ছি—এইট্রে কি ডাউন দার্জ্জিলিং মেল?' নীহার-বাবু হঠাৎ থতমত খেয়ে—কারণ তুই মেয়ে-মানুষ আর তিনি নেহাৎ পুরুষমানুষ—কোন মতে নম্—ও—স্-কার, আজ্ঞে হ্যাঁ-া-া-া" বল্‌তেই বেচারী ঘেমে—একদম্ জলে; রেলের বাবুটী গোল-করে বাঁধানো বেতের লাঠীর মত চেহারায়, ইংরেজীর ৭এর মত মুখ ফাঁক করে, মিঠে মিঠে গোলাপী হাসির সঙ্গে বল্‌লেন, 'This is madam, down Darjeeling mail—আপনি—অ্যাঁ—অ্যাঁ—mean to travel অ্যাঁ-this train?'

"নিলীনা কটাক্ষে তাচ্ছিল্য ব্যক্ত করে বল্‌লেন—"হ্যাঁ।" "তা—তা—if you ভাল মনে করেন—আমি for the night আপনার একটা berthও reserve করে দিতে পারি—if your ladyship pleases!'—ইচ্ছে, যদি তোর একটুখানি হাসি কুড়িয়ে পায়—শিরোপার মত করে তুলে নিয়ে—booking officeএ গিয়ে দেখাবে—অর্থাৎ সত্যির উপর আরো দুপোঁচ লাল চড়িয়ে গল্প করবে। আহা বেচারীরে! থাক্, কিন্তু নিলীনা দেবী—মানে তুই, রেলের বাবুর বেলায় নেহাৎ কাঠখোট্টা, কৃপণের আঁদি—করুণা করে এককণা হাসিও বেচারীকে বিলিয়ে দিবি নে। নীহার বাবুকে নেশায় রাঙা করে তোলাই ছিল তোর কল্প-কল্পনা। 'No, thanks, I decline' বলে নীহারবাবুর দিকে তাকিয়েই মনের মত মিষ্টি করে বল্‌বি—'ধন্যবাদ! কিছু মনে করবেন না।"

"নীহারবাবু এতক্ষণ—"বরফ" হচ্ছিলেন বুঝি—?"

"হয়ে গিয়েছিলেন—ঠাণ্ডা—হিম—রিম্-ঝিম্ খেয়ে ভদ্দর লোক বলবেন, 'না না-আপনার—goodness—আমার—মৌজ এ্যাঁ—না—এ আর মনে করবার কি?' 'না আর কিছু নয়, তবে একটি অপরিচিতা মেয়ে—এ-রকম করে হঠাৎ এসে আপনাকে প্রশ্ন কচ্ছে,' আপনি

হয়ত নির্লজ্জা প্রগল্ভা মনে করবেন। কিন্তু—আমি গাড়ীখানা ঠিক চিন্‌তে পাচ্ছিলুম না, তাই আপনাকে বিরক্ত করলুম, ধন্যবাদ—নমস্কার।"

"এর পর তুই তাড়াতাড়ি এসে গাড়ীতে উঠলি। নইলে আর লেখাপড়া শিখ্‌লি কি! খুব smart, forward হওয়াই দরকার কি না—নয়ত আর ভাব কি হল—প্রস্ফুটিত হবে কি? এর পর শোন্—চার চোখের এই নিমেষের মিলন দুজনকারই মর্ম্মের উপর চিরদিনের জন্যে স্পষ্ট গভীর একটা দাগ টেনে দিয়ে গেল। প্রাণের হাজারো গোপন কথা—দৃষ্টির পথ দিয়ে বিদ্যুতের মত ছুটে গিয়ে ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠতে চাইলে—কিন্তু লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে এবার দাঁড়ালো মাঝখানে দেয়াল রচনা করে', আর পেতে না পেতেই ছাড়াছাড়িটা দিলে তার উপর কাঁটা, লোহার মোটা শিকে কঠিন বাধা-বেষ্টন গড়ে। তবু স্মৃতিটা এই ঘটনার অশরীরী অনক্ষর ইঙ্গিত দিয়ে দুজনেরই হৃদয়-বীণার লুকোনো পর্দ্দাটীতে মিঠা একটা সুর জমিয়ে তুল্‌তে লাগলো।"

"আর লালিমা নিখুঁত ক'রে তার স্বরলিপি রচনা করলেন!"

"স্বরলিপি তুমি নিজেই লিখ্‌লে গো ঠাকরুণ। কল্‌কাতায় ফিরে এসেই খবরের কাগজে নীচের এই বিজ্ঞাপনটী দিলে—"গত মঙ্গলবার রাত্রে·········ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মের উপর জলের কলটীর সাম্‌নে আমি একখানি রুমাল হারিয়েচি। সাদা জমি, হাতে 'হেম্‌' দিয়ে বর্ডার মোড়া—তার নীচে সুতো টেনে বার করে সূচের কাজ করা। প্যাটার্ণটা কতকটা "H" এর ধরণের।—একপাশে "আস্‌মানী" silkএ একটা "N" অক্ষর তোলা আছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন, দয়া করে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হব।"

"নীহারবাবু যে এ বিজ্ঞাপনের জবাব দেবেন, তার কি মানে আছে?"

"মানে নিশ্চয় আর নির্ঘাৎ আছে। তুমি সত্যিই যে একখানা রুমাল চট্ করে তার পাশে ফেলে আস্‌বে।"

"তা রেলের বাবুটীও তো সেখানা কুড়িয়ে পেতে পারেন!"

"বুকের ভর-পুর গন্ধে প্লাটফর্ম্মের তপ্ত হাওয়া হাল্‌কা করে, সাড়ী দুলিয়ে রূপের বিদ্যুৎ চম্‌কিয়ে তুই চলে যাবি—রেলের বাবু তো তাতে—moon-struck—"

"নীহারবাবুই বা বাদ পড়বেন কেন?"

"তিনি—হাজার হলেও লেখাপড়া শিখেছেন কিনা,—একসঙ্গে হোঁদা, রাম্ আর কুৎকুৎ তিনটে কথ্‌খনো বন্‌বেন্ না—তোর দিকে হাঁ করে খানিকটা তাকিয়ে থাক্‌বেন, গাড়ী ছেড়ে না যাওয়া অবধি অবিশ্যি—তারপর খেয়াল হতেই দেখলেন, পাশেই রুমাল—গন্ধে ভুরভুরে! তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধর্‌লেন—নেহাৎ প্লাটফর্ম্মের উপর, তাই—নইলে চুমোও খেতেন, নিশ্চয়।"

"Dear me! বড় বেশী বল্‌ছিস্ কিন্তু!"

"থাম—আর্ট মাটী করিস্‌নে।—দিন দু-এক পর ছোট একটী প্যাকেট—রেজেষ্ট্রী ডাকে—তা বলাই বাহুল্য—আর ক' ছত্র লেখা তুই পেলি। নীহার বাবু নিজের হাতে

লিখ্ছেন,—'গাড়ী ছেড়ে গেলে রুমালখানা পেয়েছিলুম—ঠিকানা জানবার তো কোন উপায় ছিল না, তাই পাঠাতে পারিনি, ক্ষমা কর্‌বেন কি? নমস্কার!"

"আহা! অফুটন্ত ফুলের গোটা কুঁড়ি টাট্‌কা তুলে তারই রেণু গন্ধ মিলিয়ে, জমিয়ে গুঁড়িয়ে গড়া মন্মথের ফুল-তুণীরের তীক্ষ্ণ সে শর এসে লাগ্‌লো তোর মর্ম্মেরই মাঝখানে—কোথায় রে সেই মরমী, মনের দরদী, প্রিয় বন্ধু তোর, সখা তোর, ওহো—হো, তুই বুঝি মূর্চ্ছা গেলি!"

"ঐ,—মোটে মাপ কর্‌বেন কথাটাতেই?"

"বারে! একজন গ্রাজুয়েট, কত-বড় sentiment তোর, গভীর গাঢ় করে তা ফুটোতে হবে তো!—তারপর তুই কৃতজ্ঞতার ভাবে ভরে চিঠি লিখ্‌বি:—

"বহু ধন্যবাদ! রুমালখানার সঙ্গে একটা বিশেষ স্মৃতি জড়িত ছিল বলেই এত আগ্রহ। ফিরে পাবার আশা ছিল না। কিন্তু পেলুম, আপনার এ অনুগ্রহ চিরদিন মনে থাকবে। কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করলে সত্যই সুখী হব। একবার যদি দেখা হত, নিজের মুখে আপনাকে ধন্যবাদ দিতাম। নিবেদন, ইতি।

"এইবার লোকটা নিঃসন্দেহেই মারা গেল। একেবারে সোজা হৃৎপিণ্ডে এমন গুরু আঘাত! সে কোন্ স্বপ্নলোকের কল্পনা-বৈচিত্র্যে রঞ্জিত তার মন সোনার পাখায় ভর দিয়ে অপরূপ এক নীলিমার রাজ্যের পানে উধাও উড়ে গেল। ভাবলে—'একবার যদি দেখা হত!' —সত্যি একবার যদি দেখা হত! দু'জনেরই মনে যখন 'একবার যদি দেখা হত'—দেখাও তখন হলোই। নীহারবাবু হাইকোর্টে তাঁদেরই একটা মামলার তদ্বির কর্ত্তে কল্‌কাতায় এলেন। খোঁজ-খবর নেওয়া হল—অবিশ্যি সেটা মামলার সম্পর্কে নয়—শ্রীমতী নিলীনা দেবীর মোকাম সাকিম হাল-চাল সম্বন্ধে। কিন্তু একেবারে অপরিচিত—হঠাৎ গিয়ে তোর বাড়ীতে হাজির হন্ কি ভদ্রতায়? তাই একটা চমৎকার সুযোগের, আর ঈষৎ লজ্জা-নত একজোড়া কার ঘনকৃষ্ণ চক্ষু-পল্লবের সন্ধানে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করলেন— আদ্দির চুড়িদার আর বার্ণিস লপেটা উড়িয়ে, নাকের উপর চশমা, চুলের মাঝে টেরী বাগিয়ে তোদের বাড়ীর নীচে দিয়ে যাতায়াত করতেও ত্রুটি কর্‌লেন না—কিন্তু কি হতভাগ্য—দর্শন আর মেলে না—বেচারী এক রকম নিরাশই হয়ে পড়লেন। তুই ত আছিস রোজই আশায়—ডাকপেয়াদা কখন রসিকের রাঙা হাতের দুটী ছত্র এনে দিয়ে যায়— এমন সময় একদিন মঙ্গলবারে ক্লাশের পর, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর গেটে তুই মোটরে উঠ্‌তে যাচ্ছিস্, হঠাৎ তোর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চ'লে গেল—সাম্‌নেই নীহারবাবু! মনে পড়লো, মঙ্গলবার—বারটা যে তোর বুকের গোপন কক্ষে হীরার অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। নীহারবাবু একবার থম্‌কে দাঁড়িয়েই—তোর মুখখানার দিকে চোখটা তুলেও না,—অথচ তুলেও—দেখাটা যেন তুই বুঝ্‌তে পারিস্‌ও, আবার বুঝ্‌তে পারিস্‌ও না, এই রকম করে আর কি তাকালেন। তুই অম্‌নি হাসিতে রতির অধরের কুঙ্কুম-রাগ ফুটিয়ে বল্‌লি—'এই যে, নমস্কার।'

"বেচারী তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার

করে—একটু কিন্তু-মতন হয়ে মাথা নীচু করলেন। তুই বল্‌লি—'আপনার দয়া আমি জীবনে ভুলবো না—রুমালখানা আমার সত্যিই বড়—বড়-বেশী প্রিয়।'

'এ আর দয়া কি! আপনার জিনিষ পেয়ে আপনাকেই ফিরিয়ে দিয়েছি,এ'ত সোজা সরল কথা, আমার কর্ত্তব্য।' তোর কানে বুঝি বাঁশী বেজে গেলরে—"বাজিল ঐ শ্যামের বাঁশরী যমুনায়"—তুই বেভুলভাবে বল্‌লি, 'না। আপনার দয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। চলুন, রাস্তায় গল্পটা ভাল দেখায় না—Won't you see me home? আমি বাড়ীতে আপনার কত গল্প করেছি!' 'Most willingly—কিন্তু—' তুই বল্‌বি—কেন, 'আপনার কি কোথাও engagement আছে?'

'না—তা কিছু নেই,তবে—এক-মোটরেই?' তুই প্রাণের হো-হো হাসিটা চেপে মুখের কোণে মুচ্‌কিয়ে তুলে, একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেছিস্ যেন, এম্‌নিভাবে বল্‌লি—'বা, তাতে কি? আপনি তো আর বাঘ-ভাল্লুক বা সেইরকম কোনো জানোয়ার নন্ যে আপনার সঙ্গে একগাড়ীতে গেলে কিছু ভয়ের কারণ আছে—আসুন।' বেচারী নীহার বাবু আর আপত্তি না করে, এসে বস্‌লেন, মোলায়েম—মোলায়েম, চারিদিকে, নীচে,পাশে, শুধু মোলায়েম—এক মোলায়েম মোটরের গদি —আর এক মোলায়েম পাশে তুই—কিন্তু নিরীহ লোকটী পাড়াগেঁয়ে নায়ক, নেহাৎ জড়সড়-গোচ্ হয়ে কোঁচাটা বেশ করে সেরে গুঁজে নিলেন—কি জানি, পাছে কোঁচার ডগাটা উড়ে গিয়ে তোর গায়ে পড়ে—এইরকম একটা ন যযৌ ন তস্থৌ রকমের নাজেহাল অবস্থায় কোনোমতে বসে রইলেন, পায়ের তলা থেকে থেকে রি-রি শির-শির করে শিউরে উঠতে লাগলো, মোটরের পেট্রল-গ্যাস বুঝি অটো-মোবাইলের চাকা ছেড়ে ওঁরই অঙ্গের উপর তার ক্রিয়া আরম্ভ করলে! যা হোক্, তুই তার পর বাড়ী নিয়ে গিয়ে ড্রইং রুমের গদি-আঁটা সোফার উপর তাঁকে বসিয়ে, বৈদ্যুতিক পাথাখানা মাথার উপর ছেড়ে দিয়ে, চা-টা খাইয়ে ঠাণ্ডা স্থির করে তুল্‌লি। এর-পর থেকেই পদ্ম সুরু হলো। তোর কাজল-চোখের অপাঙ্গ বেঁকিয়ে হাসি, গালের উপর ছোট্ট একটি টোল,—মুগ্ধ হয়ে গেল তরুণ! এম্‌নি যাওয়া-আসা, তাঁর পিয়ানো বাজিয়ে "তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণী" গান, আর তোর—"অবাক হয়ে" শোনা, কত গল্প, আলাপ,—আস্তে আস্তে ওস্তাদের সেতারে সুরের মত প্রণয় ক্রমশঃ গাঢ়, জমাট বেঁধে উঠ্‌লো!—শেষ কালে একদিন রূপসীর মুখের উপর বারান্দার রেলিংএর অন্তরাল-ছিন্ন গোধূলির আরক্ত আলো পড়ে পরীর হাতে ফাগের আল্‌পনা চিত্র করে দিচ্ছিল যখন, তরুণ তোর মুখখানা তুলে ধরে ইত্যাদি, একবার মোটে শিউরে উঠে সুন্দরী তোর সারা অঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগ্‌লো।"

নিলীনার মুখের উপর থেকে কাণের মূল পর্য্যন্ত এবার সত্যিই লাল হয়ে উঠ্‌লো। সে চটে গিয়ে বল্‌লে,—"এ তোর বড্ড বাড়াবাড়ি, লক্ষ্মীছাড়ি।"

"চট্‌ছো কেন যাদু,—এইতো আর্ট, গল্পের আর্ট। এ একটা গল্প তো নয়—

নীলার টুক্‌রো, নীহারিকার জ্যোতি, এ হ্যাজেলিন স্নোর মত মোলায়েম, ফ্রেঞ্চ-বোকের মত সুগন্ধি ঝর-ঝরে ভাব, তর্‌ তরে ছন্দ। মেয়েরা যে রূপের ফাঁদ পেতেই বসে আছে—তরুণ পাখী ধর্‌বার জন্যে—যা-হয়, একটা দোয়েল, টুন্‌টুনি পেলেই হল!"

গাড়ী অনেকক্ষণ হলো ষ্টেশন ছেড়ে আবার ছুটতে আরম্ভ করেছিল, গল্প ত দুজনের বেড়ে জমে উঠে সমানে চলেছিল সোজা—সটান্‌। হঠাৎ "কুলী—কুলী চাই" শব্দে চমক ভাঙ্‌তেই খড়খড়ি ফেলে দিয়ে দুজনে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখেন—সান্তাহার এসে গেছে। তারপর তো ছন-ফুল আর ঘাস-বন, দিব্যি পরিষ্কার ফসা দিন,—চৈত্রের খর রৌদ্রে কি আর আর্ট জমে?

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আদর্শ-বিপর্য্যয়

আদালতে একদল উকীল দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা মনে করেন, কেবল বচন-বিন্যাসে বা গলাবাজিতে কাজ সারবেন, তাই মকদ্দমার কাগজ-পত্র, সাক্ষীর জবানবন্দী বা আসামীর সওয়াল-জবাব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, সে সময়টা তাঁরা হয় কথার মালা গাঁথেন কিম্বা গলা শানিয়ে নেন। আমার সন্দেহ হয়, মুখুজ্যে মশায় যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ওকালতি করবার সময় (ভারতী জ্যৈষ্ঠ), সেই পন্থাই অনুসরণ করেছেন, কারণ সেটাই সহজ পন্থা—এমন-কি, তিনি যে লেখার প্রতিবাদ করেছেন, তাও শেষ-পর্য্যন্ত পড়বার ধৈর্য্য রাখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না,—যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্যের উপরে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও। তাঁর সৌজন্যের মাত্রাতিরিক্ততার অবকাশে তাঁর ক্ষুব্ধ হিন্দুত্বের অপমান-বেদনা বড় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাই অনন্যোপায় হয়ে, চোখে যা দেখা যায়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছেড়ে তিনি আমাদের সনাতন হিন্দুত্বের safety valve,—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যদি ভাগ্য-ক্রমে মহাভারত আমার পড়া না থাকতো, তবে তাঁর কথায়, যুধিষ্ঠিরকে তিনি যেমন এঁকেছেন, তেমনই মেনে নিতুম, এবং তাঁর রচনাটি এমন পরিপাটী যে, আসামী এতদিন বেঁচে থাক্‌লে তাঁরও হয়ত সন্দেহ হত যে, বর্ণনাটি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

যদি জানতুম, দেশের লোক মহাভারত পড়েন, তবে এ প্রতিবাদ লেখা প্রয়োজন বোধ করতুম না, কিন্তু উপস্থিত লেখক মশায়ের রচনা-পাঠে আমার সে বিশ্বাস দূর হয়েছে; তাই আবার লিখতে বস্‌লুম—আমার নিজের কথা নয়, মহাভারত-কার এবং স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের আত্মীয়-স্বজন তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবতেন, সেই-সমস্ত নজীর উদ্ধৃত করে দেখাবার জন্য।

আমার নিজের কথা বলবার ছিল অনেক, কিন্তু স্থানাভাববশত সেটা মুলতুবি রইলো,

আর পূর্ব্ব-প্রবন্ধে যা লিখেছি তাও চাপা থাক্, কারণ নিজের লেখা উদ্ধার করার মত বিরক্তি-জনক কাজ আর কিছুই নেই—মুখুজ্যে-মশায় সেটা পড়েন নি, কিন্তু আমিও নাচার। তাঁর কথামত এইবার যুধিষ্ঠির-চরিত্রকে কাব্য-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করবো। কাব্য-সামালোচনায়, কবি যা লিখেছেন আমরা তার উপরেই নির্ভর করি প্রায় সমস্তটা, কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই; অবশ্য কেবল ব্যাখ্যা নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন কথা বলা দায়, কারণ ধর্ম্ম জিনিষটা সম্বন্ধে তাঁর সময়ে বহু মত-ভেদ ছিল এবং আপামর সকলেই স্বীকার করতেন যে, তার গতিও খুব সূক্ষ্ম। তবে এ কথা সত্য যে, ধর্ম্মের উপরে তাঁর বিশ্বাসের মূলে সাহস ছিল না, ছিল অদৃষ্টবাদীর নিশ্চেষ্টতা ও সুযোগ-পন্থীর চাতুর্য্য; অথচ অপরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি পুরুষকারের দোহাই দিতে ক্রটি করেন না। তবে ধর্ম্মাচার-পালনে তিনি যে ভাটপাড়ার পণ্ডিতকেও হারিয়ে দিতেন, এ-কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য।

যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার শুধু এখনকার কালের সঙ্কর-রুচিদের কাছে নয়, তাঁর সম-সাময়িক লোকের কাছে এবং এমন-কি তাঁর সহোদর ভাই ও স্ত্রীর কাছেও যথেষ্ট ভীরু বলে বোধ হয়েছিল, তবে তাঁরাও হয়ত রজ-স্তমোর আধিক্যে তাঁর সত্ত্বগুণজ শান্ত ভাবকে শ্রদ্ধা করতে পারেন নি!

মানুষের চরিত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের আধিক্য অনুসারে মানুষ-বিভাগে যথেষ্ট গোল আছে, কারণ মানুষ প্রধানত মাটীর মানুষ, দেব-বিভূতি তার যতই থাক্ (মুখুজ্যে মশায় ত এই রকমই বলেন), কাজেই একটা বিশেষ গুণের চেয়ে এই তিন গুণের সমা-বেশেই তার জীবন গড়ে ওঠে—এই তিনের দ্বন্দ্বেই তার চারিত্র্য। যুধিষ্ঠির-চরিত্রে নাকি সত্ত্বের প্রভাব ছিল বেশী! দেখা যাক্ তাঁর জীবনে শুভ্রত্ব ও শান্ত ভাব কতখানি প্রতিফলিত হয়েছিল। অবশ্য একথা একশোবার সত্য যে, তথা-কথিত সত্ত্বাশ্রিত যুধিষ্ঠিরের স্বভাব-ধর্ম্মশীলতা "জলের শৈত্য-গুণের মতো নিশ্চেষ্ট" (?) হয়ে উঠেছিল এবং কালক্রমে জড় পিণ্ডে পরিণত হতো যদি ভীমার্জ্জুনের মত সোদর ও দ্রৌপদীর মত স্ত্রী লাভ করবার সৌভাগ্য না থাকতো। আর্য্য ভারতের ইতিহাস পড়েছি, কিন্তু যে আত্মাটি ছেনে যুধিষ্ঠির-চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে তার সাক্ষাৎ পাই নি—হয়ত Sir Oliver Lodge বা Sir Conan Doyle কালে এর পাত্তা দিতে পারবেন। কিন্তু যদি কোনকালে ভারতে ও-আত্মা জন্মগ্রহণ করে, তবে আমরা সভ্য জগতের hewers of wood and drawers of water হয়ে থাকবো, নিশ্চয়ই।

বিশ্বকেন্দ্রে দ্বন্দ্বের সংঘাতে যে দুটো দিকের কথা তিনি বলেচেন, ধরা যাক্, ন্যায়ের দিকে যুধিষ্ঠির সেই কল্পনীয় মূর্ত্ত হয়েছেন। এই বার মহাভারত খোলা যাক্:—

ভীমার্জ্জুনের বাহুর পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েছি, কিন্তু এই অদ্ভুত বাহু-বিশিষ্ট জীব-শরীরের যুধিষ্ঠির কোন্ অংশ, মুখুজ্যে মশায় তা লিখ্তে ভুলেছেন। যুধিষ্ঠিরের বীর্য্য

সত্যই অত্যধিক শান্ত! অথচ বকের পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছেন, "অস্ত্র-শস্ত্রই ক্ষত্রিয়ের ভাব, কাজেই তাঁর নিজের জীবনে এই নিশ্চেষ্ট বীরত্ব, নীরব কবিত্বের মতো অদ্ভুত ও হাস্যজনক নয় কি? শল্যের সঙ্গে তিনি লড়েছেন বটে,—কিন্তু শল্য যে কত-বড় বীর, তা আমরা কেন, সে সময়ের অনেকে তা জানতেই পারেন নি, তাই দেখি, দুর্য্যোধন শল্যকে সারথ্যে আহ্বান করে বার বার কর্ণের পরাক্রমের কথাই বলেছেন, কারণ তাঁর মতে "কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান।"

জতুগৃহে যাবার আগে ও পরে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মের চেয়ে অসহায়তার পরিচয়ই মহাভারতে পাওয়া যায়, আর দ্যুত-সভায় তিনিই একমাত্র লোক যিনি চুপ করে ছিলেন, অসীম ধৈর্য্যে নয়, মহাভারত-কার বলেন, 'অচেতন-প্রায় হয়েই তুষ্ণীম্ভাব" অবলম্বন করেছিলেন, কারণ আমাদের সত্ত্বস্থ পুরুষ তখন বুঝতে পেরেছেন যে, এত-বড় বিপত্তি ও অপমান-লাঞ্ছনার মূল তিনিই। কর্ত্তব্য-বোধে জীবন-যুদ্ধে সাংসারিক অধিকার-বৈভব সমস্ত পণে রাখা বীরত্ব-ব্যঞ্জক, কিন্তু তার একটা সীমা আছে। অপরের দেহ, অপরের অর্জ্জিত সম্পদ বা অংশ-জাত সম্পত্তি পণে রাখা শোভা পায় বোধ করি, কেবল নিশ্চেষ্ট ধর্ম্মশীলের; কারণ অর্জ্জন-ক্লেশ তাঁকে কোন কালেই বহন করতে হয় না। দ্রৌপদীতে তাঁর মমত্বাভিমান তাঁকে পণে দেবার কারণ নয়, মহাভারত-কারকে বিশ্বাস করলে বলতে হবে, শকুনির বিদ্রূপই তার কারণ। দ্রৌপদীকে পণে বসানো সম্বন্ধে তর্ক প্রথম তুলেছিলেন দ্রৌপদী নিজে, প্রাজ্ঞেরা নয় (দ্যুতপর্ব্ব—পঞ্চষষ্ঠিতম অধ্যায়)! যুধিষ্ঠির ও প্রাজ্ঞদের মুখ-পানে তাকিয়ে যখন দ্রৌপদী বার বার এই প্রশ্ন করেছেন, তখন সব মহাত্মাই চুপ করেছিলেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন একমাত্র যুবক বিকর্ণ,—বিনা-দোষে অপমানিতা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার মত ভদ্রতারও তাঁর অভাব ছিল। কর্ম্মফল যুধিষ্ঠির আর কৈ ভোগ করলেন? শাস্তি পেলে শুধু নির্দ্দোষ ভায়েরা, বিনা-অনুমতিতে যাদের তিনি নিজের অধিকার-বিভবের সামিল করে পণে বসালেন।

মুখে কঠোর ভবিতব্য ও কর্ত্তব্য-বোধের দোহাই দিলেও যুধিষ্ঠিরের মনে গর্ব্ব ছিল প্রচুর, তাই যখন দ্বিতীয়বার দ্যুতে আহূত হলেন, তখন—"বহুতর লোকাপবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্ম্ম-ভয়ে" যুধিষ্ঠির দ্যুতে প্রবৃত্ত হলেন, আর শকুনিকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ কোন রাজাই দ্যুতে আহূত হয়ে প্রতিনিবৃত্ত হতে পারেন না। পূর্ব্বের সহস্র পরাজয় ও তন্নিমিত্ত লাঞ্ছনা ও অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের লজ্জাও তাঁকে গর্ব্ব থেকে রক্ষা করতে পারে নি। কারণ তিনি জানতেন, ভবিতব্যের ঝঞ্ঝা-পদক্ষেপে আর যার পাঁজরা ভাঙুক, তাঁর তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না; ভীমার্জ্জুন তাঁদের ভাঙা পাঁজরা নিয়েও জ্যেষ্ঠের সেবা করবেন, এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। দ্যুত-ক্রীড়ায় তাঁর কর্ত্তব্য-বোধের চেয়ে আসক্তি ছিল অনেক বেশী, অন্তত অর্জ্জুন কর্ণ-পর্ব্বে এই কথাই বলেছেন—তাঁর অন্য ভাইদের ও স্ত্রীর মতামত মহাভারতেই আছে, আশা

করি, মুখুজ্যে মশায় একবার সেগুলো পড়ে দেখবেন।

"ঈর্ষাসিন্ধু মন্থন-সঞ্জাত জয়-রস" পান করবার তাঁর সাধ ছিল খুবই, কিন্তু আত্ম-শক্তির অভাবে সে সাধ সম্পূর্ণ মেটাতে পারেন নি। কর্ণপর্ব্বে যখন অর্জ্জুনকে বাক্য-যন্ত্রণা দিয়ে যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন, মুখুজ্যে মশায়কে একবার সেই অধ্যায়গুলি পড়তে অনুরোধ করি। সেইখানে তাঁর নিজের কথাতেই প্রমাণ হয়েছে, স্বার্থ-বিদ্বেষের কলুষ তাঁর তথা-কথিত অকলঙ্ক শুভ্রতাকে কতখানি মলিন করেছিল। "অনুজ-স্নেহ নিঃস্বার্থ-পরতার পরিচয়-ও লাঞ্ছনা অপমান পাইয়া ফিরাইয়া দিবার অপ্রবৃত্তি" প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সত্য তত্ত্ব "রাজ্য"-লোলুপ যুধিষ্ঠিরের আত্মকথায় মিলবে, অবশ্য যদি তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না করা হয়।

শক্তিহীনের পক্ষে ক্ষমা কাপুরুষতার নামান্তর। অসহায় অবস্থায় ধার্ম্মিকতার গর্ব্বে ক্ষুব্ধ ধর্ম্মের কোপ থেকে শত্রুকে রক্ষা করাও সহজ, কিন্তু নিপতিত শক্তিহীন শরণাগত শত্রুকে ক্ষমা করা সাজে শুধু তাঁদের, যাঁরা সত্ত্বের অভিনয় না করে জীবনে তা পাবার চেষ্টা করেন। আমাদের ধর্ম্মভীরু ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠিরের জীবনে একবার যখন এই রকম শত্রুকে ক্ষমা করবার সময় এসেছিল, তখন তিনি কি করেছিলেন তার পরিচয় মিলবে গদাযুদ্ধ-পর্ব্বে। হ্রদশায়ী হৃত-সর্ব্বস্ব অত্যাচারী দুর্য্যোধন যখন তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে, তখন তিনি যে শুধু তাকে ক্ষমা করতে পারলেন না তা নয়, অশেষ বাক্য-যন্ত্রণা দিয়ে, অপমানের পর অপমান কোরে বেচারীকে মরণের মুখে ছুটে যাবার মত বিষিয়ে তুললেন—বিদ্বেষ-বিবৃহিত হয়ে সুযোধন বোলে কোলও দিলেন না—মহাত্মা যীশুর মত ভদ্রভাবে ক্ষমাও করলেন না। অসপত্ন রাজ্য-শাসনের সাধটুকুও দুর্য্যোধনকে তিনি জানিয়ে দিতে ত্রুটী করেন নি।

তিনি ভোগ-প্রয়াসী নন, এ-কথা জোর করে বলা চলে না, তবে বিবাহ করা সম্বন্ধে তাঁর একটু বিপদ ছিল। তখন বিবাহ করতে হলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মার্কা নিলেই চলতো না—স্বয়ম্বর-সভায় বীর্য্যের পরীক্ষা দিতে হোত এবং বাঙালীর মেয়ের মত তখনকার মেয়েরা এত সস্তায় বাজারে বিকোতো না—উলূপীর মত, সুভদ্রার মত মেয়ে জিনতে পারতো একা অর্জ্জুন, তাই যুধিষ্ঠিরের মত ক্লীবকে কোন মেয়েই বিবাহ করতে সম্মত হন নি। একটিমাত্র মেয়ে—যিনি বাধ্য হয়ে তাঁর স্ত্রীত্ব স্বীকার করেছিলেন, তিনি হিন্দু-নারী হয়েও স্বামীকে মূঢ় উন্মত্ত বলতে ত্রুটি করেন নি, এবং কেবল শিষ্টাচারের খাতিরেই তাঁকে পতিত্বে স্বীকার করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের এ-কথা অবিদিত ছিল না, তাই অর্জ্জুন-প্রীতিই দ্রৌপদীর পতন-কারণ নির্দ্দেশ করে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন।

ধর্ম্মের জয় ট্রাজিক কি কমিক তা ঠিক জানি না, কিন্তু যুধিষ্ঠির-চরিত্রটি বেশ মজার বটে। শান্তি-পর্ব্বের অন্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বের সপ্তম অধ্যায়ে দেখি যে, কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রলয়ের বীভৎসতায় ভয় পেয়ে, আমাদের মহাপুরুষ, পাছে নানা পাপের ভাগী হতে হয়, তাই বেচারী ভায়েদের ঘাড়ে সব পাপ চাপিয়ে 'কা তব কান্তা' বলে বেমালুম সরে

পড়বার চেষ্টা করছিলেন, এবং হয়ত কৃতকার্য্যও হতেন, যদি তাঁর চার ভাই ও দ্রৌপদী বারবার এইরকম ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে তাঁকে যথেষ্ট গালি না দিতেন। তাঁকে তাঁরা যা যা বলে গালি দিয়েছেন, তার মধ্যে সত্যের ভাগই বেশী এবং যে বহুপৃষ্ঠা-ব্যাপী উক্তিগুলো এখানে উদ্ধৃত করা অসম্ভব-বোধে মুখুজ্যে মশায়কে শান্তি পর্ব্বটা পড়ে দেখতে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করছি।

আমার মনে হয়, উদ্ধৃত কবির উক্তিটি যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রয়োগ করলে নিছক অত্যুক্তি হয়ে ওঠে, কারণ ওর একবর্ণও যে সত্যি নয় তার একমাত্র প্রমাণ মহাভারত, যার নজীর আমি যতদূর সম্ভব দেখিয়েছি। যুধিষ্ঠির-চরিত্রের বিচারে আমার রুচি-সঙ্কার্য্য কিম্বা মুখুজ্যে মশায়ের সত্যানভিজ্ঞতা ও অত্যুক্তি কোন্‌টা বেশী প্রকাশ পেয়েছে, তার বিচার নিরপেক্ষ পাঠকের হাতে দিয়ে আমি বিদায় নিতে চাই।

আদর্শই হোক্, আর সত্যই হোক্, যুগের পরীক্ষা-নিকষে রেখাপাত করেই তা অমরত্ব লাভ করে, এতে বিচলিত হবার কিছু নেই। যদি তার মধ্যে যথার্থই কিছু খাঁটী থাকে তবে তা নিশ্চয় বাঁচবে। বিচার করতে ভয় পায় শুধু তারাই,—মনের গোলামি যাদের সত্যকে জানবার সাহস দেয় নি। এ কথা জানা উচিত যে সাহসের আর যাই দোষ থাক্, সেটা অধঃপতনের পথ নয়।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

নবীনের দেশ

সেথা সোনালি ও রাঙা রাঙা
কচি কিসলয়,
সেথা, অবুঝের সবুজের
নব অভিনয়।
সেথা গুল্ বুলবুল্
করে পয় পয় ভুল,
দোলে তুল্‌তুলে ঢুল্‌ঢুলে
বন্ ফুলচয়।

সেথা লালিমায় টুক্‌টুকে
অধরের লাল্
সেথা আলোকের চুমা চায়
গোলাপের গাল।

সেথা পাপিয়ার সুর,
ঢালে সুধা ভরপুর,
সেথা ফেলে চুপ্ অপরূপ
রূপ্ শরজাল।

সেথা কমলের সুরে বাজে
প্রণয়ের বীণ্
সেথা আব্‌ছায়ে পরীদের
নাচ্ রাতদিন।
জাগে উৎসব-রব,
সেথা উদ্দাম সব,
সেই পুলকের অলকাতে
সকলি নবীন।

সেথা ফুলধনু ধনু লয়ে
সঙ্কোচে ধায়,
সেথা উমা-মুখ-শশীপানে
মহাদেব চায়।
সেথা হাসে বধূ-বর
নাচে কিন্নরী-নর,
দেখে দেবতারা আসি হাসি
গগনের গায়।

সেথা বাসেরি আভাস আসে
মঞ্জরীতে,
নহে অলিকুল বীতরাগ
গুঞ্জরিতে।
সেথা অঞ্চলালোক
করে চঞ্চল চোখ,
ছোটে রামধনু-আঁকা পথে
সঞ্চরিতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রিয়ার উদ্দেশে

৪

তোমার চিঠি! কি মিষ্টি চিঠি তোমার—তুমি যেন চিঠিখানিকে ভরে আছ! আমার পাশে তোমার স্পর্শ অনুভব করছি—তোমার গলার স্বর যেন কাণে বেজে উঠছে। এ যেন তোমার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে নিয়েছি—Luxembur; বাগানের পিছল পথে তোমায় যেমন কোরে ধরেছিলুম। কতবার যে তোমার চিঠি পড়েছি তা গুণতে পারি না—বোধ হয় সবটা আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে, অথচ যে সব জায়গা ভাল লেগেছে, সে সব জায়গা বারবার না দেখে তৃপ্তি হচ্ছে না। তোমার কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয়ের বর্ণনাটি আমার খুব ভাল লেগেছে! তখন রাত হয়ে গেছে, সব আলো নেবানো, আর পথগুলি যেন বদ্ধ কালো নদীর মত শব্দহীন, প্রাণহীন, মরণের বাসা! তারপর আকাশে অকস্মাৎ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠলো—machine gunএর শব্দ শোনা গেল, জ্বলন্ত এরোপ্লেন নামতে নামতে চারদিক আলো করে দিলে। ঘরের ছাদের উপর বোমার শব্দ হল,—আচ্ছা, তুমি কি ভয় পাও নি? তোমার চিঠিতে ভয় পাবার কোন আভাষই নেই। তুমি লিখেছ, "নিজের দিক থেকে বিচার করলে এইটে ঘটার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। এ-থেকে আমি খুব ভাল কোরে বুঝতে পারলুম, এখানে আমার কত কাজ আছে"—এ স্বার্থপরতার মধ্যে বীরত্ব আছে, সাহস আছে। যুদ্ধের প্রথম লাইনে পুরুষেরা যেমন গৌরব বোধ করছি, তোমার কাজে তুমি ঠিক তেমনি গৌরব বোধ করছো। আত্ম-বিসর্জ্জনের এই মহান্ সুযোগ সবাইকে বিশেষ কোরে টানছে। আমার মনে হয়, শান্তির সময়েও এই সুযোগ ছিল,—শুধু দেখবার মত কারও চোখ ছিল না—হয়ত সে আত্ম-বিসর্জ্জন এখনকার মত এত মহৎ নয়—।

তুমি যে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছ, তা নিয়ে আমার ভাববার কথা অনেক; কিন্তু আমি ভাবচি না। বিপদের আগুন তোমার মনেও আলো জ্বেলেছে এতে আমি সব-চেয়ে খুসী। একদিন ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্যে Joan of Arc ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধে নেমেছিলেন, তোমার মধ্যে ততখানি নাটকত্বের অবকাশ নেই, কিন্তু বীরত্ব তোমার সমানই। তবে Ford car তোমার ঘোড়া, আর আমেরিকান, Red Cross এর uniform তোমার বর্ম্ম, এবং শিশু-হত্যা নয়, শিশু-রক্ষাই তোমার কাজ। সত্য কথা বলতে গেলে তোমার কাজটিই আমি বেশী পছন্দ করি। আমার দিকে চেয়ে হয়ত তুমি বলবে যে, তোমার কাজের আমি বেশী দাম দিচ্ছি—ব্যাপারটা সত্যিই খুব সাধারণ।—স্বীকার করি, ফ্রান্সে এটা খুব সাধারণ। পরের জন্যে নিজের প্রাণ দেওয়া ফরাসীদের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে এ অভ্যাস কারও নেই, কেবলমাত্র নিজেকে নিরাপদ করবার চেষ্টা Fifth Avenueতে বিশেষ বিরল নয়।

কি অভাবনীয় বৈচিত্র্য! তোমরা আমেরিকানরা সাধারণতই রোমান্টিক নও। তোমার কাণ্ডজ্ঞান এত বেশী যে, তাতে আর সব মনোভাব চাপা পড়ে গেছে। তোমার কথাই ধর।—তোমার অতুল সম্পদ হাজারো বিলাস ছেড়ে তুমি হাজার মাইল দূরে দাসীর কাজ করতে এসেছ! মরনকে আলিঙ্গন করা কিছু অসম্ভব নয়, অথচ তোমার মধ্যে কোনোরকম উত্তেজনা দেখচি না! প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ আলোয় ধরে তোমার বীরত্বকে তুমি খর্ব্ব কর, যেন সেটা কিছুই নয়! ফরাসীরা কিন্তু একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের পা যেন মাটীতেই পড়ে না, তারা যেন সারা জীবন এরোপ্লেন চড়ে আকাশে উড়ছে, তারা বর্ত্তমানকে ইতিহাসের আলোয় দ্যাখে এবং মনে করে, তাদের রক্ত ভবিষ্যতের ভিতর দিয়ে লাল ধারায় গড়িয়ে চলেছে। আমরা ইংরেজরা নিজেদের গৌরব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন—শুধু মুখে আমরা তার আলোচনা করি না। আমরা খুব বড় কাজ করি বটে, কিন্তু আস্তাবলের সহিসের ভাষায় তা প্রকাশ করি। আমরা আত্ম-প্রশংসা আর মনোভাবকে অতিমাত্রায় ডরাই। মনে যত-কিছুই অনুভব করি না কেন, অবহেলার ছলে সেটাকে ঢাকতে চাই। তোমাদের মধ্যে কিন্তু এই ছলের জুয়োচুরিটা নেই। তোমরা পরের জীবন বাঁচাতে যাও, কিম্বা tango নাচো,—তোমাদের মনোভাব কিন্তু একই থাকে, দুটো কাজের মধ্যে কোন রকমের প্রভেদ তোমাদের চোখে পড়ে না। যে কাজ করতে যাচ্ছ, সেটা করার মধ্যে মননটুকুই তোমাদের মুগ্ধ করে। কেবল কাজটার জন্যে তোমাদের কোন উৎসাহ নেই। সেই কারণে যা-কিছুই কর, তাতে তোমাদের মাথা কখনো ঘুলিয়ে যায় না।

একটু আগে মনোভাবের কথা বলছিলুম। আমরা ইংরেজরা সেটাকে ঘৃণা করি, আর লুকোবার চেষ্টা করি। আমার কথাই ধর। তোমার কাছে ভালবাসার কথা তুললুম না কেন, বলতে পারো? পাছে তোমার মনকে আঘাত করি। যে লোক যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা মেয়েদের পক্ষে

শক্ত নয় কি? লোকটার জন্যে তোমাদের মনে করুণা ছাড়া আর কোন ভাব জাগে না, অথচ মনে হয়, সেটা যেন ভালোবাসা। সেইজন্যে নিজের হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য-প্রকাশের লজ্জায় তোমাকে ভালোবাসা জানাতে চাই নি, অথচ সেই ভাবের বশেই এই ময়লা গর্ত্তের মধ্যে বসে কাগজের উপর রাশি রাশি মনোভাব ঢালছি,—যার কোন উদ্দেশ্য নেই, মানে নেই, যা একেবারে পণ্ডশ্রম।

জীবনকে নিয়ে আমি মহা সমস্যায় পড়েছিলুম। যুদ্ধের আগে জীবনকে আমি ভারী ডরাতুম। কোনো-কিছু ঠিক করে ধরা আমার ধাতে ছিল না। ভবিষ্যতের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে নানারকম কল্পনা করতুম, কোন-কিছু করতে হলে কত দ্বিধা-সংশয় মনের মাঝে জেগে উঠতো। সামরিক নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমি একটা উদ্দেশ্য পেয়েছি, সাহস করে বাঁচতে এবং প্রয়োজন হলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মরতে শিখেছি। বুঝতেই পারছো, তোমাকে দেখবার পর থেকে আমার আগেকার উদ্দেশ্য কি রকম ঘুলিয়ে গেছে। মেয়েকে ভালবাসবে অথচ ভবিষ্যতের মাঝে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবে না; তার অভাব বোধ করবে অথচ হাল ছেড়ে দেবে,—এ একেবারে অসম্ভব।

যতই কিছু বলি না কেন, আমাদের মিলনের অভাবনীয় বৈচিত্র্য আমাকে চঞ্চল করে তুলছে। এ যেন একেবারে মধ্য-যুগের ঘটনা। এ যেন পুরানো আখ্যায়িকার গন্ধে ভরপুর। সাধারণ লোকে টেনিস-পার্টিতে তার ভাবী-স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম মেলে, থিয়েটারে অনুরাগ জানায়, আর গির্জ্জায় গিয়ে বিয়ে করে। তুমি আর আমি, কিন্তু মোটেই তা করিনি। আমাদের প্রথম দেখা হল, হঠাৎ আমেরিকায়, বিদায়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে। তারপর দেখা উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে, প্যারিসে। আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলুম, দুজনেই সৈনিকের কর্ত্তব্যে যোগ দেবো বলে। আমাদের জীবন সবে-মাত্র আরম্ভ হয়েছে—বিপুল বিশ্ব আমাদের সাম্‌নে দীর্ঘ বিস্তারে পড়ে আছে, তবুও অন্তরের একটা চির-দীপ্ত আদর্শের জন্যে আমরা সকল ভালবাসা, যৌবনের সকল সম্ভাবনা, আর এই ধরিত্রীর সকল মোহ ত্যাগ করলুম। সব-চেয়ে গৌরবের কথা, আমরা এটিকে অন্য সব জিনিষের চেয়ে বড় করে দেখি। আরও বিচিত্র যে, আমি হত্যা করি, আর তুমি বাঁচিয়ে তোলো; অথচ আমাদের উভয়ের কর্ত্তব্যের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব আছে—অভাবনীয় ধ্বংস ও দুর্গন্ধের মধ্যে থেকে তোমার লেখা পাতা আমার কাছে আসে, আর আমার গুলো তোমার কাছে যায় (কতকগুলো যায় বটে, আমি যা কিছু লিখি, তার সবগুলো যদিও নয়)। এই জরা, দুঃখ, দারিদ্র্য ও বেদনার উপরে আমাদের আত্মা জেগে উঠেছে। ইতিহাসের সব-চেয়ে কুৎসিত ব্যাপার আমাদের চারদিকে নিত্য ঘটছে, কিন্তু এই-সবের সঙ্গে লড়াই করতে হবে ব'লেই আমাদের আত্মা ভিতর থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে, আত্মপ্রসার লাভ করছে! এ কি অভাবনীয় রকমে আশ্চর্য্য নয়? প্রিয়া আমার, তুমি আমেরিকান, তোমার মনে কি কোন উত্তেজনাই জাগছে না?

তোমার চিঠি কেমন করে এল বল দেখি? তোমার প্রথম চিঠি?—উপত্যকার

পাশ দিয়ে লম্বা একটা ঢিবি আছে, মস্ত এক চড়াই—এখন সেটা বরফে ঢাকা পড়ে একেবারে কাঁচের মত হয়ে গেছে, এরই পাশে-পাশে গুহার মত ট্রেঞ্চের সার, এই ঝোপ-ঝাড়ের তলায় কত লোক অজানা ও অতীত অপরাধের ফলে মরে ছড়িয়ে পড়ে আছে। হুন্‌ই হোক, আর ফরাসীই হোক, আজ বছরখানেক পরে তাদের সমানই দেখাচ্ছে, Uniform এর তফাৎ ব'লে যা-কিছু বোঝা যাচ্ছে। ঢিবিটার উপরে আরও অনেক ট্রেঞ্চ আছে—একেবারে মৌচাকের মত; সেগুলো শত্রুর দৃষ্টির সাম্‌নে বলে এখন নষ্ট হয়ে গেছে। আমি যে ট্রেঞ্চে আছি, সেটা ঢালুর দিকে মাঝ-পথে। সেখানে হয় রাত্রে, না হয় সকালে, কুয়াশার অন্তরালে যেতে পারা যায়। একটা Dug-out বোমার ঘায়ে নষ্ট হয়ে গেছে, তার উপরে লুকিয়ে দেখবার একটা ফোকর আছে, সেই ফোকরের মধ্যে দূরবীন্ বসিয়ে জর্ম্মাণদের গতি-বিধির আভাস লক্ষ্য করাই আমার কাজ। কাল হঠাৎ কুয়াশার অন্ধকার খানিকটা কেটে গেলে আমি দেখলুম, শত্রুরা সব কাজে লেগেছে। জায়গাটা ম্যাপের কোন্ খানে, ঠিক করে নিয়ে গোলন্দাজদের 'ফোন্' করে কুয়াশার ঘোর কাটবার অপেক্ষায় রইলুম। দেখলুম শত্রুরা শ্র্যাপনেল নিয়ে খোলা মাঠের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ছুটলো, আমি অনুসরণ করলুম, আমার দৃষ্টি-সীমা ক্রমাগতই বেড়ে চল্লো। নিরাপদ হবার পক্ষে তাদের একমাত্র বাধা ছিল, কাঁটা-তারের বেড়া। তারা সেই তারের তলা দিয়ে, মাঝ দিয়ে গোলে পালাবার চেষ্টা করলে, আর সেই-খানেই গুলির আঘাতে পেরেক-পোঁতা হয়ে গেল। আমি গুণলুম, দশজন মরেছে, আর প্রায় সেই পরিমাণ লোক আহত হয়েছে। শান্তির সময়ে একটা কুকুর মারলেও আমার কষ্ট হোত, আর এখানে নর-হত্যা করলেও আমার বিবেকে বাধে না। অদ্ভুত! এই অন্তরালে আমি যেন ভগবানের মত বসে আছি, জগতের কাজ সব দেখছি, আর খেয়াল-মত নির্দ্দেশ করছি—কার মরবার পালা পড়েছে!

ঠিক এইখানেই ভোরের বেলায় তোমার চিঠি পেলুম। খাবার নিয়ে আমার আর্দ্দালী যখন গুড়ি মেরে ঢুকলো, চিঠিখানি তখন তার হাতেই ছিল। তোমার চিঠি—! পড়লুম—এই যেমন লিখছি—এক-চোখে তোমার চিঠি পড়ছি, অন্য চোখে শত্রুর গতি-বিধি লক্ষ্য করছি। সম্ভবত কুয়াশার আড়ালে বসে কোনো জার্ম্মান গোলন্দাজও ঠিক এমনই করছে। সেও আমার মত বাঁচতে চায়, তার ভালবাসার পাত্রীকে সে আমারই মত দেখবার জন্যে উৎসুক। আমার সঙ্গে তার কোনো শত্রুতাই নেই, অথচ যদি সুবিধা পায় তবে আমাকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে মেরে ফেলতে তার বাধবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধে সব-চেয়ে ভয়ানক ব্যাপার এই যে, এটা নিতান্ত যান্ত্রিক। যে-হাত আঘাত করছে, সে-হাত কেউ দেখতেই পায় না। ক্রমওয়েলের সেনাদল শত্রুদের সাম্‌না-সাম্‌নি লড়েছিল, দায়ুদের গাথা গাইতে গাইতে তারা মরণের মুখে ছুটেছিল, আর আমরা কামানের জমাট ধোঁয়ার আড়ালে ট্রেঞ্চ থেকে লুকিয়ে বার হই, আর নিঃশব্দে শত্রু সংহার করি।

আমার মনের চোখ দিয়ে তোমায় দেখিনি, তুমিও আমায় দেখনি। আমরা যে ধরণের

লোক, আমাদের সত্য প্রকৃতি যা, Parisএ পরস্পরের কাছে পুরোপুরিভাবে তা ধরা পড়ে নি। বেল্ট আর বোতামের পিতল ঘষে মেজে চকচকে করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, সামাজিকতা বজায় রেখে গল্প করেছি, সামান্য ত্রুটিতেই চমকে উঠেছি, খুব ওজন করে গম্ভীরভাবে খেয়েছি। লোকের মন হরণ করবে বলেই যেন তুমি পোষাক পরতে; মোটর না পেলে বা বৃষ্টি এলে তোমার জন্যে ভেবে আমি আকুল হতুম। আর এখন শুধু হত্যা করবার জন্যে সুযোগ খুঁজচি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু সেই জন্যেই অপেক্ষা করছি! আর তুমি সৈন্যদলের পিছনে ময়লার মধ্যে দিয়ে নিজের কাজে চলেছ! পরস্পরের কাছে সব কথা পরিষ্কার করে বলবার আর উপায় নেই, কিন্তু সেই সাধারণ তুচ্ছ জীবনের আবর্জ্জনা-স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, বলিষ্ঠ সাহস নিয়ে মরার মধ্যেও গৌরব আছে।

কুয়াশা উবে আসচে। এবার আমার দৃষ্টি আরও খরতর করতে হবে। এই আর একখানা চিঠি লেখা হ'ল। ভবিষ্যতে যেদিন যুদ্ধ থামবে, তোমায় সব কথা বলবার মত ফুরসুৎ পাবো, সেদিনের জন্যে একে অপেক্ষা করতে হবে। প্রিয়া আমার! Joan of Arc আমার! বিদায়—তোমার পাণ্ডুর গোলাপের সৌন্দর্য্য, তোমার মার্কিন রেড ক্রশের কর্ত্তব্য, সকলের কাছে বিদায়! Dormenর বনে Joan স্বপ্ন দেখেছিল! আর তুমি স্বপ্ন দেখেছ New York সহরের গগনস্পর্শী প্রাসাদ-কক্ষে! দু-জনেই তোমরা কর্ত্তব্যের আহ্বানে ছুটে বেরিয়েছ। তোমাদের জীবনের মাঝে যত শতাব্দীরই ব্যবধান থাক্, তোমাদের আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই!

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

কুক্কুট প্রসঙ্গ

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-পাঠে জানা যায় যে, আর্য্যদিগের নানা প্রয়োজনে কুক্কুটের সম্পর্ক ছিল। ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতের উচ্চারণভেদ কুক্কুটের ধ্বনি হইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। এবিষয়ের প্রমাণ, দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কুক্কুট ক্রমে যে তিনটি শব্দ করিয়া থাকে,যাহাকে স্থানবিশেষে সাধারণত লোকে মোরগের বাঁক্ বলে, সেই শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পাণিনি মুনি "উকালোঽজ্-হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, টীকা-কারগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (১)।

মহাভাষ্য-পাঠে জানা যায় যে, বন্যকুক্কুট আর্য্যদিগের ভক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইত, এবং গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল (২)। মহর্ষি পরাশর উপদেশ করিয়া গিয়াছেন যে,কুক্কুট-ডিম্বের পরিমাণানুসারে

১। উবর্ণে কুক্কুটরুতৌ প্রসিদ্ধাত্বাদুবর্ণভাক্।

২। অভক্ষ্যপ্রতিষেধেন বা ভক্ষ্যপ্রতিষেধঃ। তদ্‌যথা অভক্ষ্যো গ্রামকুক্কুটঃ, অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকরঃ, ইত্যুক্তে গম্যত এতৎ আরণ্যো ভক্ষ্যইতি।

চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের প্রতিব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তে যতগুলি গ্রাস খাইবার নিয়ম আছে, সেইগুলি মোরগের ডিমের মত করিতে হইবে, তাহা না হইলে পুণ্য হইবে না, এবং পাপও বিদূরিত হইবে না (৩)।

হেমাদ্রি-ধৃত লক্ষণকাণ্ডের বচন হইতে জানা যায় যে, কুক্কুটডিম্বের পরিমাণানুসারে বাণলিঙ্গের লক্ষণ অবধারিত হইয়াছিল (৪)। প্রাচীন যুগে কুক্কুটের লড়াই একটা বিশেষ আমোদের বিষয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে উদাহরণের অভাব নাই। উহা সজীব দ্যূতের অন্তর্গত। কাদম্বরী কাব্যের নায়ক চন্দ্রাপীড় বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে পথিমধ্যে কুক্কুট প্রভৃতির লড়াই দেখিয়াছিলেন (৫)।

বৃহৎসংহিতা পাঠে জানা যায় যে, সেকালে রাজবাড়ীতে কুক্কুট পোষা হইত, এবং তন্ন-তন্ন করিয়া তাহার দোষ-গুণের বিচার করা হইত। বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, যে কুক্কুটের লোম এবং অঙ্গুলি সরল, মুখ নখ ও মাথার চূড়া তাম্রবর্ণ, এবং শরীরের বর্ণ শুভ্র, রাত্রির অবসানে যে মধুর শব্দ করে, সেই কুক্কুট রাজার রাজ্যের এবং রাজার অশ্বের বৃদ্ধি করিয়া থাকে (৬)।

টীকাকার ভট্টোৎপল গর্গের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই বচনগুলির অর্থ হইতে জানা যায়, যে কুক্কুট শ্বেতবর্ণ, যাহার নখ ও চঞ্চু তাম্রবর্ণ, যাহার ঘাড়ের লোম সরল, যাহার অঙ্গুলি আবৃত নহে, এবং যাহার অঙ্গ সুঠাম ও মাথার চূড়া তাম্রবর্ণ, সেই কুক্কুট প্রশস্ত। যে কুক্কুট অত্যালাপী অর্থাৎ অধিক-ভাষী, যাহার ঘাড় যবের মত, যাহার মুখ সুন্দর, বর্ণ দধির মত, মুখ প্রশস্ত, মাথা বড় এবং চরণ হরিদ্রাবর্ণ, সেই কুক্কুট প্রশস্ত। মোটামুটি বলা হইয়াছে যে,—যে সকল কুক্কুটের চরণ খঞ্জ নহে, মুখ তাম্রবর্ণ এবং বর্ণ তৈলাক্তের মত, সেই সকল কুক্কুট প্রশস্ত। পক্ষান্তরে যে সকল কুক্কুট উৎসাহহীন, বিবর্ণ এবং বিকৃতস্বর, সেইগুলি নিন্দিত (৭)।

বরাহমিহির অপর একটি লক্ষণে বলিয়াছেন, যে বিহগ (কুক্কুট পাখী) যবগ্রীব অর্থাৎ যবসদৃশ গ্রীবাযুক্ত (টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, লোকে যাহা "যবগিয়া" নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই "যবগ্রীব"), অথবা যে পাখী বদরসদৃশ অর্থাৎ সুপক্ব বদর ফলের মত রক্তবর্ণ, যে পাখীর মস্তক বৃহৎ এবং শ্বেত রক্ত নীল প্রভৃতি নানা বর্ণ-যুক্ত এবং নির্ম্মল, সেই কুক্কুট যুদ্ধে প্রশস্ত, অথবা যে পাখী মধুর মত বর্ণযুক্ত অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ অথবা ভ্রমরের মত কৃষ্ণবর্ণ, সেই কুক্কুটও যুদ্ধে জয়প্রদ।

৩। কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণন্তু গ্রাসং বৈ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথা ভাবদোষেণ ন ধর্ম্মো ন চ নিষ্কৃতিঃ॥ ১-অ। ২।

৪। পক্বজম্বুফলাকারং কুক্কুটাণ্ডসমাকৃতিং।

৫। আবদ্ধ-মেষ-কুক্কুট-কুবর-কপিঞ্জল-লাবক বর্ত্তিকাযুদ্ধম্।

৬। কুক্কুটস্ত্বৃজুতনূরুহাঙ্গুলিস্তাম্রবক্ত্র নখ-চূলিকঃ সিতঃ।
রৌতি সুস্বরমুষাত্যয়ে চ যো বৃদ্ধিদঃ স নৃপরাষ্ট্র-বাজিনাম্।
৬২। অ ১

৭। শ্বেতস্তাম্রনখঃ শুক্লস্তাম্রাক্ষস্তু জুবালধিঃ।
অনাবৃতাঙ্গুলিঃ স্বঙ্গস্তাম্রচূড়ঃ প্রশস্যতে॥
অত্যালাপী যবগ্রীবো দধিবর্ণঃ শুভাননঃ।
প্রশস্তাস্যঃ স্থূলশিরা হারিদ্রচরণো দ্বিজঃ॥
অখঞ্জাস্তাম্রবক্ত্রাশ্চ স্নিগ্ধবর্ণাশ্চ পূজিতাঃ।
দীনাশ্চৈব বিবর্ণাশ্চ বিস্বরাশ্চ বিগর্হিতাঃ॥

বর্ণিত লক্ষণরহিত কুক্কুট প্রশস্ত নহে। যে কুক্কুটের শরীর এবং স্বর ক্ষীণ, অথবা চরণ খঞ্জ, সেই কুক্কুটও মঙ্গলকর নহে (৮)।

কুক্কুটীর লক্ষণ বলা হইয়াছে, যে কুক্কুটী মৃদু-মধুর শব্দ করে, যাহার শরীর স্নিগ্ধ অর্থাৎ তৈলাক্তের মত মোলায়েম, যাহার মুখ ও চক্ষু সুন্দর, সেই কুক্কুটী রাজাদিগের সম্পৎ, যশ, যুদ্ধে জয় এবং বীর্য্যোৎকর্ষ প্রদান করে (৯)।

বরাহমিহিরের অপর একটি বচন পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন যুগে রাজছত্রে কুক্কুট-পক্ষ নিহিত হইয়া ছত্রের শোভাসম্পাদন এবং রাজার সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিত (১০)।

প্রদর্শিত বচনাবলী হইতে রাজবাড়ীতে কুক্কুট পোষণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "প্রায়শ্চিত্তবিবেকে" পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, মার্জ্জার কুক্কুট ছাগ কুকুর শূকর এবং অন্যান্য পাখী পোষণ করিলে "রোম-পূয়বহ" নামক নরক-গামী হইতে হয়। এইরূপ যে বচন আছে, উহা জীবিকার জন্য মার্জ্জারাদি পোষণে দোষজ্ঞাপক এমত বুঝিতে হইবে (১১)। সুতরাং শাস্ত্রমতে আমোদের জন্য কুক্কুট প্রভৃতি পোষা গৃহস্থ মাত্রের পক্ষেই দোষাবহ নহে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

বৈশাখ ১৩২৮।

শিশু-মঙ্গল

ইংরাজীতে যাহাকে Child welfare বলে, একটু উদ্ভট শুনাইলেও বাঙ্গালায় তাহাকে বলিব শিশুমঙ্গল। খাঁটি বাঙ্গালায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, কি করিলে যথার্থভাবে শিশুকে মানুষ করা যায়, তাহাই আমাদিগের আলোচনার বিষয়। "মানুষ করা" বলিতে গেলে, তাহার সঙ্গে দেহের, মনের ও অপরাপর চিত্তবৃত্তির একাধারে ও সম্যক পরিমাণে স্ফূর্ত্তি বুঝায়। আপনারা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন—প্রত্যেক পিতামাতাই ত নিজ নিজ সন্তানকে "মানুষ করেন," তবে আবার সে কথা নূতন করিয়া আমি আর কি বলিব? ইহার উত্তর আমি দুইটি কথা বলিতে চাহি;—প্রথমতঃ এ দেশে পিতামাতা সন্তানকে যে ভাবে মানুষ করেন, তাহা যথার্থ ও যথেষ্ট নহে; এবং দ্বিতীয়তঃ; পিতামাতারা জানেন না, ও জানিতে চাহেন না যে, তাঁহারা কর্ত্তব্য যথেষ্ট ও যথার্থরূপে প্রতিপালন করিতেছেন না।

প্রথম উত্তরের প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, পিতামাতার কর্ত্তব্য যদি যথেষ্ট ও যথার্থরূপে প্রতি-

---

৮। যবগ্রীবো যো বা বদরসদৃশো বস্তু বিহগো
বৃহন্মূর্দ্ধা বর্ণৈর্ভবতি বহুভির্যস্ত রুচিরঃ।
স শস্ত সংগ্রামে মধু-মধুপ-বর্ণশ্চ জয়কৃন্ন
শস্তো যোঽতোঽন্যঃ কৃশতনুরবঃ খঞ্জচরণঃ॥ ২।

৯। কুক্কুটী চ মৃদুচারুভাষিণী, স্নিগ্ধমূর্ত্তি-রুচিরাননেক্ষণা।
সা দদাতি সুচিরং মহীক্ষিতাং শ্রী-যশো-বিজয়-বীর্য্যসম্পদঃ।

১০। বিচিতং তু হংসপক্ষৈঃ কৃকবাকু-ময়ূর-সারসানাং বা।
দৌকূল্যেন নবেন তু সমন্ততশ্ছাদিতং শুক্লদেহম্। ১।

পালিত হইত, তাহা হইলে এ দেশে প্রকৃত মানুষের অভাব হইত না। যদি স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই যে, এদেশে কচি ছেলেকে বাঁচাইয়া, একটু বড় করা, কত দুরূহ ব্যাপার। এদেশে এক-বৎসরে ১৭,২৭,১৭৩ শিশু জন্মায়; তাহার মধ্যে, এক বৎসর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতেই, ১৬,২৭,৩৩১ শিশু মারা পড়ে! যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা যকৃতের দোষ, ম্যালেরিয়া, পেটের পীড়া, সর্দ্দি-কাশি, প্রভৃতি কত শত ব্যারামে ভুগিয়া তবে বাঁচে; তাহারা প্রাণে বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু রোগা ও রুগ্ন হইয়া সাগুবালির ও বিলাতী গুঁড়াখাদ্যের শ্রাদ্ধ করিয়া তবে বাঁচিয়া থাকে। এদেশে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া কয়টি শিশু জন্মায়? কয়টি শিশু হৃষ্টপুষ্ট হইয়া জন্মিয়া টুকটুকে হাসিমুখে নীরোগ হইয়া, চারিদিকে প্রাণের স্পন্দন ছড়াইয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইতে পায়? এ দেশে শিশুরা রোগা ও রুগ্ন, স্ফূর্ত্তিহীন এবং তাহাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি অত্যন্ত কম। এই ত গেল তাহাদিগের স্বাস্থ্যের অবস্থা। তাহার পরে যদি তাহাদিগের লেখাপড়ার কথা ধরি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? যাঁহারা "ভদ্র" নামে চলিত, তাঁহাদিগেরই মধ্যে লেখা-পড়ার কিছু চলন আছে—যাঁহারা তথাকথিত "ইতর" তাঁহারা একেবারেই অশিক্ষিত। আবার ভদ্রদিগের মধ্যে, স্ত্রীলোকেরা বেশীর ভাগই অশিক্ষিত। বলা বাহুল্য, শুধু বই পড়া বিদ্যা বা কেতাবতী শিক্ষাকেই আমরা শিক্ষার মাপকাটি ধরিয়া লইয়াছি—যদিও প্রকৃত শিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ।

এইবার প্রকৃত শিক্ষার কথা ধরিয়া দেখা যাউক, আমাদিগের শিশুরা সে শিক্ষা কতটুকু ও কি ভাবে পায়। প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না ঘটিলে, ঘরে পিতামাতার এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্য্য না ঘটিলে, সজীব সমাজের প্রচেষ্টা ও সহানুভূতি, না থাকিলে, এবং দেশের রাজার সাহায্য না পাইলে—কথনো প্রকৃত শিক্ষা হয় না। যে শিক্ষা মানুষের দৃষ্টির বিস্তার ঘটায়, মনের উন্নতি আনে, চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির উপচয় করে এবং তাহার সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সজাগ ও কর্ম্মঠ করে, সে শিক্ষাই মানুষ গড়ার সহায়ক। যে মানুষের সে শিক্ষা ঘটিয়াছে, যে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, যে নিজে পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারে, সে সমাজের একজন চূড়া। তাহার দেহের স্বাস্থ্য অটুট, তাহার নৈতিক বল সুদৃঢ়, তাহার ধর্ম্ম নির্ম্মল। এ রকম শিক্ষা আমাদের দেশে কয়টী শিশু পায়? এই শিক্ষার প্রভাবে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়; ইহার অভাবে মানুষ অমানুষ হয়। কয়টি পিতামাতা বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের শিশু এই শিক্ষার কণামাত্রও পায়? আমাদের দেশের ছেলেরা ধর্ম্ম আচার ও অনুষ্ঠান-বাহুল্যের মধ্যে থাকে; অথচ উচ্ছৃঙ্খলতার বেশ পরিচয় দেয়। তাহারা সমাজের অষ্টবন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও অসংযম ও অধর্ম্মের পরিচয় প্রতি পদে দিয়া থাকে; কারণ নৈতিক মেরুদণ্ড কয়জনের আছে? আত্মনির্ভর, আপনার লোকের প্রতি বিশ্বাস, আপনার স্বজনের প্রতি আত্মবোধ, স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা, স্বমত পোষণ করিবার সৎসাহস কয়জনের মধ্যে দেখা যায়?

তাই বলিতেছিলাম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম—যে দিক দিয়াই দেখি, ছেলে মানুষ করার বিষয়ে বাঙ্গালী পিতামাতার অসাফল্যের পরিচয় চতুর্দ্দিকেই বর্ত্তমান।

কিন্তু আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এতটা অসাফল্য অতিশয় প্রকট হইলেও, আমরা তাহাকে দেখিয়াও দেখি না এবং বুঝিয়াও বুঝি না। আমরা সংবাদপত্রে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা পড়ি—কিন্তু শিহরিয়া উঠি না! আমরা নিত্য ঘরে ঘরে ব্যারামের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখি, কিন্তু তাহাতে বিচলিত হই না। আমরা যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাই, কিন্তু তাহারা দাঁড়ের পাখী ছাড়া আর কিছু যে হয় না—ইহা—বুঝিয়াও বুঝি না। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, কতকটা একটা আন্তরিক অব্যক্ত মর্ম্ম-বেদনার তাড়নায় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে যখন বিদ্যালয় ছাড়িয়া সম্প্রতি বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেটা যে ষোল আনা হুজুগ বা সাময়িক উত্তেজনার

বশে করিয়াছিল, তাহা আমি মনে করি না। ভিতরে অসাফল্যের বৃশ্চিক-দংশনে পীড়িত ছাত্রগণ ঐ উত্তেজনাকে হেতু করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু ছাত্রেরা, নিজ ব্যথা কোথায়, ও কি আকারে রহিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, সেটাকে যে রীতিমত অনুভব করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু তাহাদিগের সে বেদনার বিষয়ে তাহাদের পিতামাতারা ও সমাজ উদাসীন। ছাত্রদিগের এই চাঞ্চল্যের উপরের ফেনাগুলিই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, অন্তরের স্রোত কোন্ দিকে বেগে যাইতেছে তাহা নিরূপণ করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারাইলেন, এবং এমন সুযোগ তাঁহারা নিত্যই ত্যাগ করিতেছেন! কিন্তু তাই বলিয়া, বাঙ্গালীরা যে শিশুদিগের প্রতি মমত্বহীন, তাহা নহে। বস্তুতঃ এই বাঙ্গালা দেশে শিশুলাভ করিবার জন্য এবং শিশুকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিবার জন্য, এমন কৃচ্ছ্রসাধ্য কাজ বা ব্রত নাই, যাহা বাঙ্গালীর মেয়েরা পারেন না বা করেন না। বাঙ্গলা দেশে, নন্দের দুলাল, যাদুমণি প্রভৃতি যেমন গালভরা নামগুলি আছে, এমন আর কোথায় আছে? এই বাঙ্গালাদেশেই যখন হিন্দুরা সুস্থ ছিলেন, তখন প্রত্যেক শিশু যে কেবল তাহার নিজ নিজ পিতামাতার যত্ন ও আদরের সামগ্রী ছিল তাহা নহে—প্রত্যেক শিশুই নিজ সমাজের, দেশের ও নিজ রাজার যত্ন ও আদরের গচ্ছিত ধন ছিল। কিন্তু আজ অদৃষ্টের কি উপহাস, সেই পুণ্যভূমি বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়া, বাঙ্গালীরই কাছে আমাকে অতি দীনভাবে বাঙ্গালাদেশের শিশুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হইতেছে; এমনটি কেন হইল?

এই কথার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। জ্ঞানের অভাব, দৈন্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিদেশীর আধিপত্যই, প্রধানতঃ এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ চতুষ্টয়। আমরা একে একে সেই কথাগুলির আলোচনা করিব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া সেগুলি শুনিবেন।

প্রথম কারণ অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা নানাবিষয়িণী। আমাদের দেশে শুধু ভদ্রলোকেরাই বই পড়িয়া লেখাপড়া শিখেন! তাঁহারা অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন; কিন্তু নিজ নিজ দেহ-তত্ত্ব, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে একেবারে মূর্খ থাকিতে তৃপ্তি বোধ করেন। তাঁহারা নিজ নিজ সংসারে স্ত্রীলোকদিগের মেয়েলি আচার মাথায় পাতিয়া লয়েন এবং সংসারে, স্ত্রীলোক-সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে ভালবাসেন। বাটীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নাটক নভেল পড়া বিদ্যার বেশী লেখাপড়া শিখান কর্ত্তব্যও মনে করেন না। বাঙ্গালীর সমাজেও স্ত্রী শিক্ষার আদর নাই, বরং স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য-বিধায়িনী ব্যায়াম-বিধির প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। এই গেল ভদ্র সমাজের কথা। তথাকথিত ইতর সমাজে, সকল প্রকার জ্ঞানের অভাবের সঙ্গে রাশীকৃত লোকাচার ও দেশাচারের বিড়ম্বনা যথেষ্ট আছে, এবং এই আচারের স্তূপ, অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফল কি কি, অতি সংক্ষেপে তালিকা দিলাম। এ দেশের অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, লেখাপড়া শিখিলে, স্ত্রীলোক বিধবা হয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে দেহকে সুকোমল রাখাই তাহার "লক্ষ্মী-শ্রী," বজায় রাখিবার প্রধান সহায়—অঙ্গচালনা করিলে না কি দেহের সৌষ্ঠব নষ্ট হয়, রমণী পৌরুষভাবাপন্না হন। অন্তঃস্বত্ত্ব অবস্থায় শিশুর মঙ্গল কামনা করিয়া অষ্টম মাসে কাষ্ঠে (অর্থাৎ যান-বাহনে) উঠিতে প্রত্যবায় আছে; —কিন্তু গর্ভবতী বধূকে সংসারে নিত্য গঞ্জনা-তাড়নায়, দুঃখের ভাতকে সুখে খাইতে দোষ নাই। গর্ভাবস্থায় এঁটো পাতে, রমণীকে অতিকষ্টে বমনকে দমন করিয়া খাইতে বাধা নাই; এবং জাতি ও শুচি-বিড়ম্বিত হিন্দুর বিষ্ঠা-থুথু মিশ্রিত পথের ধূলিসিক্ত গুরুজনের চরণ-ধূলি জিহ্বায় স্পর্শ করা দূষণীয় নয়। গর্ভ-ধারণ হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত নিত্যই সহজ-প্রসব মাদুলি, শিকড়, ঔষধ প্রভৃতি ধারণ বা সেবন করিয়া নিত্য ভয় পাওয়ায়, কোনও দোষ না কি হয় না! রমণীদিগের মধ্যে অজ্ঞতার কি ঘোর ঘনান্ধকার

—তাহা এই সামান্য কয়টি কথা হইতেই বুঝা যায়।

এই রমণীরা, স্বয়ং বালিকা থাকিতে থাকিতেই, সন্তান-সম্ভবা হন। যে বয়সে এই ব্যাপার ঘটে, সে বয়সে না দেহের, না জ্ঞানের, না বুদ্ধির পক্বতা লাভ হয়। অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া রমণীরা নিজ স্বাস্থ্য সহজে হারান এবং শিশুদিগকে যথেষ্ট ভোগান। গর্ভাবস্থায় কি খাইতে হয়, কি ভাবে থাকিতে হয়, কি করিলে শিশুর মঙ্গল হয়, কি করিলে শিশুর অমঙ্গল হয়—এ-সব কথা তাঁহারা কিছুই জানেন না—অথচ ভাবী বংশধরের জননী হইয়া পড়েন। বাড়ীর কর্ত্তারা এ সম্বন্ধে নিজেরাই অজ্ঞ; কাজেই কতকগুলি মেয়েলি-শাস্ত্রসম্মত প্রথানুসারে সকল জিনিষেরই ব্যবস্থা হয়। সেই দুই-একটি প্রথার কথা বলিতেছি, শুনুন।

প্রথম ব্যবস্থা—আঁতুড় ঘর। হিন্দুদিগের মধ্যে আঁতুড় ঘরের মত অশুদ্ধ জায়গা আর নাই। দেহের যেমন-তেমন ময়লা অবস্থায়, যেমন-তেমন ময়লা কাপড় পরিয়া, আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে পারা যায় —কিন্তু আঁতুড় হইতে বাহিরে আসিলে, পরণের কাপড় ছাড়িয়া স্নান পর্য্যন্ত করিতে হয়। আঁতুড় ঘর এমন ঘোর অশুদ্ধ স্থান যে, সে ঘরে ঢুকিলে, দেবতার মাদুলি কবচ পর্য্যন্তও মাহাত্ম্য হারায়। আঁতুড় ঘরে যত কিছু জিনিষ-পত্র দেওয়া হয়—সে সকলই ফেলিয়া দিবার কথা; কিন্তু কোনও কোনও সংসারে, একই আঁতুড়ের বিছানা-পত্র পর-পর বহু আঁতুড়ে ব্যবহৃত হয়। বাড়ীর মধ্যে সব-চেয়ে নিকৃষ্ট ও অকেজো জায়গায় আঁতুড় ঘর করা হয়। উঠানের মাঝে, পায়খানা বা পাতকুয়ার বা গোয়াল ঘরের কাছে, এমন একটি জায়গা বা ঘর বাছিয়া লওয়া হয়, যেটির কোনও রকমে গৃহস্থের কোনও দরকার নাই। আঁতুড় ঘরের সাজ-সরঞ্জাম—বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে অকেজো, সব চেয়ে কম দামী যে সব ছেঁড়া ভাঙ্গা পুরাতন জিনিষ তাহাই। কিন্তু আঁতুড় ঘরের পক্ষে সব চেয়ে অপরিহার্য্য, সব চেয়ে দরকারী জিনিষ কি, তাহা জানেন? সে জিনিষ দুইটি—একটা আগুন বা ধুনি, অপরটি পর্দ্দা। যদি ঘরের ভিতরে ঘর এবং তাহার ভিতরে ঘর কি জানিতে চাহেন, তবে আঁতুড় ঘরে যাইবেন। পাছে ঠাণ্ডা লাগে, অথবা পাছে অপদেবতার উৎপাত হয়, এই ভয়ে আঁতুড়ের ভিতরে-বাহিরে পর্দ্দার বাহুল্য এবং ঘরের যে কোনও রন্ধ্র থাকে, তাহাও সযত্নে বুজাইয়া দেওয়া হয়। এহেন নরককুণ্ডে, বাঙ্গালা দেশের ভাবী বংশধরেরা আসিয়া উপস্থিত হন! প্রসূতির আর্থিক অবস্থা যেমনই হউক না কেন, পুরাতন ছেঁড়া জামা-কাপড় ও জীর্ণ পুরাতন কম্বল ব্যতীত, তাঁহারও আর কিছু পাইবার যো নাই। এইরূপ নরককুণ্ডে আঁতুড় ঘর করার ফল কি, জানেন? এমন ঘরে প্রসব করিয়া অনেক স্থলে প্রসূতি ও শিশু দম আটকাইয়া মারা পড়ে; কোথাও প্রসূতির বাঁকা জ্বর হইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া যায়; সে জ্বরকে Puerperal fever বা আঁতুড়ের জ্বর বলে। এই জ্বরটা এত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রসবের তৃতীয় দিনে জ্বর হইবেই বলিয়া আমরা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি; জ্বর হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হই না; না হইলে, বরং মনে মনে একটু চিন্তিত হইয়া পড়ি! এমন ঘরে প্রসব করিয়া সন্তানসহ প্রসূতি ধনুষ্টঙ্কারে মারা পড়ে— ছেলেদের ধনুষ্টঙ্কারকে "পেঁচোয় পাওয়া" ও প্রসূতির ধনুষ্টঙ্কারকে "বাতাস লাগা" বলে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা শুনুন। এদেশে মেয়ে জন্মিলেই তাহার যেমনই স্বাস্থ্য হউক না কেন, বিবাহ দিতেই হইবে; এবং বিবাহ হইলেই, অল্প বয়সে সন্তান হইতেই হইবে। আর, সন্তান প্রসবের পর সকলেরই আঁতুড়ে ধাই থাকা চাই। এই ধাইটি বাঙ্গালীর সংসারে মাতৃত্বের গৌরবে মহিমান্বিত; অর্থাৎ, হিন্দুশাস্ত্রে যত লোকে মাতৃপদবাচ্য, এই ধাইটি তাহার অন্যতম। এদেশে এত জাতি-বিচার, কিন্তু ধাইটি তথাকথিত অতি নীচ জাতীয়া হইলেও, সে নামগৌরবে ও পদমর্য্যাদায় বঞ্চিতা নহে। ধাইদের এত আদর কেন? তাহার উত্তরে বলিব—অজ্ঞতা। বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, ধাইয়েরা সুকৌশলে প্রসব করাইতে পারে, সেই জন্যই তাহাদের এত আদর। কিন্তু, অপর অনেক ভ্রান্ত ধারণার মত,

এটাও একটা মস্ত ভ্রান্ত ধারণা। ধাই ত দূরের কথা, পাশকরা প্রবীন চিকিৎসকেরাও অনেক সময়ে প্রসব-কৌশল কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন না—এই জন্যই বিশেষজ্ঞ প্রসব-কৌশল-বেত্তা পুরুষ ডাক্তারের প্রয়োজন। শুধু এ দেশে কেন, সমস্ত পৃথিবীতে, কবে কোথায় কোন্ পাশ-করা প্রসব-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মেয়ে-ডাক্তার, প্রসব-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পুরুষ-ডাক্তার অপেক্ষা বড় হইতে পারিয়াছেন? অর্থাৎ, পাশ করার পর হইতে, ক্রমাগত মেয়েদের রোগ ও প্রসব-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও,ভাল ভাল পাশ-করা প্রবীণ-মেয়ে ডাক্তারেরাও যখন প্রসব-কৌশল-কুশলা বলিয়া নাম করিতে পারেন নাই,—তখন নিরক্ষর ধাই প্রসব-কৌশল সম্বন্ধে কি জানিবে বা কি বুঝিবে? কিন্তু এই জাতীয় রমণীদিগের প্রতি গৃহস্থের কি অগাধ বিশ্বাস, কি অচলা ভক্তি! তাঁহারা জানেন না যে, এই ধাইয়েরাই অধিকাংশ স্থলে সূতিকা জ্বর ও ধনুষ্টঙ্কারের হেতু। এই ধাইয়েরাই কতক স্থলে প্রসবে বিঘ্ন ও বিপত্তির হেতু হইয়া থাকে! একমাত্র আমাদিগের অজ্ঞতার জন্যই—"যার হাতে খাই নাই, সে বড় রাঁধুনী" হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় ব্যবস্থা নাড়ী কাটা। নাড়ী কাটা হয়, চেঁচাড়ী সাহায্যে। পল্লীগ্রামে, বেড়া বা বাঁশ ঝাড় হইতে এবং সহরে, ঠোঙা বা অপর অপর জিনিষ হইতে চেঁচাড়ী সংগ্রহ করা হয়। গ্রামের বাঁশঝাড়ের গোড়ায় যত কিছু আবর্জ্জনা সবই ফেলা হয়। আর সেই পবিত্র স্থান হইতে নাড়ী কাটিবার অস্ত্র সংগৃহীত হয়। হইবে না-ই বা কেন? যেমন আঁতুড়-ঘর তেমনি ধাই, কাযেই তাহাদিগের উপযোগী হাতিয়ারও সংগ্রহ করা ত চাই। বাহুল্য-ভয়ে, মেয়েদিগের অজ্ঞতার আর দৃষ্টান্ত দিব না। অনুগ্রহ করিয়া লক্ষ্য করিবেন যে, এই অজ্ঞতা শুধু নিরক্ষর রমণীকুলের মধ্যে নাই—এদেশের তথা-কথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও ইহা পুরামাত্রায় রহিয়াছে। এবং সব-চেয়ে অমঙ্গলের কথা এই যে, যাঁহারা অজ্ঞ, তাঁহারা জানেন না যে তাঁহারা অজ্ঞ; কাজেই, অজ্ঞতা দূর করার জন্য কোনও চেষ্টা নাই।

এদেশে শিশুদিগের অমঙ্গলের দ্বিতীয় হেতু, দৈন্য। এই দৈন্য শুধু আর্থিক দৈন্য নহে—এ ভাব-দৈন্য, হৃদয়-দৈন্যও বটে। এ দৈন্য ঘটিয়াছে বলিয়া, আজ আমরা যেমন পেট পূরিয়া খাইতে পাই না, তেমনি আমরা সমপ্রাণতা কাহাকে বলে, তাহা ধারণাও করিতে পারি না, আমরা যে মানুষ এবং মানুষের যে কতকগুলি নৈসর্গিক দাবী ও কর্ত্তব্য আছে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি না।

শিশুমঙ্গলের তৃতীয় অন্তরায়—সামাজিক বিশৃঙ্খলা-জীর্ণ ও আবর্জ্জনাময় পুরাতনকে যে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে, এ কথা আমি বলি না। জাতিভেদ, বিধবা বা বাল্য বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কথা এ স্থলে বলিতে চাহি না। কিন্তু যে সামাজিক বিধির কল্যাণে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর ন্যায় একত্র পল্লীবাসে থাকিয়া পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী থাকিতাম, সেই সামাজিক বিধির মূলে কুঠারাঘাত হওয়ায়, আজ সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট পাইতেছে—নিরপরাধ শিশুকুল। পল্লীগ্রামে জলকে আর নারায়ণ জ্ঞানে পবিত্র রাখা হয় না, গাভী আজ মাতৃজ্ঞানে পূজিতা নয়, উৎসৃষ্ট বৃষ গ্রামে আর স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পায় না, দীর্ঘিকা খনন করান আর পুণ্যকার্য্য নহে, নবান্ন আজ আর জাতীয় উৎসব নয়, বিনা বেতনে বিদ্যাদান করা আর অধ্যাপকের কাজ নয়—যে হেতু, সমাজ আর অধ্যাপককে প্রতিপালন করে না, বৈদ্যগণ আর ভূস্বামীর অনুগ্রহ পান না বলিয়া, বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতে অক্ষম। ফল কথা, আমাদিগের সামাজিক প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে খান্ খান্ করিয়া আজ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। তাহার ফলে দেশের মধ্যে ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপ। গোচারণের ভূমি না থাকায় এবং উৎকৃষ্ট বৃষের অভাবে আজ গোজাতির নিরতিশয় দুর্দ্দশা—বাঙ্গালীর প্রধান খাবার দুধ-ঘী আর চক্ষে দেখা যায় না। শিশুরা দুধ না পাইয়া, সাগু, বার্লি ও বিলাতী গুঁড়া খাইয়া দেহ ও দেশকে দীন করিতেছে! ভাল জলের অভাবে গ্রামে গ্রামে আমাশয়, ওলাউঠা, বাত-শ্লেষ্মা-বিকার (যাহাকে Typhoid fever বলে) বাড়িতেছে—এবং তাহাতে কত শিশুর প্রাণনাশ ঘটিতেছে। আজ পল্লীগ্রামে সুপেয় জল নাই, যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য নাই, সহরে সুপেয় জল থাকিলেও

ভেজাল-খাদ্যের অতি বাহুল্য। আমাদিগের নিজ সমাজ যদি আজ সজীব থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে আজ ধর্ম্ম-রাজের অত মাশুল- আদায় করিবার ক্ষমতা থাকিত না। কিন্তু আমরা ঘরের ঠাকুরকেও তাড়াইয়াছি এবং পরের কুকুরকেও তৎস্থানে বসাইতে পারিতেছি না বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছি! ব্যস্ত হইয়া ক্ষিপ্তের মত বেড়াইলে ত চলিবে না, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

আমাদিগের কর্ত্তব্য কি কি, এইবার সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

আমাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য—অনুভূতি আনা। যতক্ষণ না আমরা প্রত্যেকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে (যাহাকে চলিত কথায় 'হাড়ে হাড়ে' বলে) বুঝিব যে ব্যাপার কি ও আমরা কোথায় যাইতে বসিয়াছি, ততক্ষণ আমরা কোনও কাজ করিতে পারিব না। আমরা আজকাল অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়াছি। তাহা তামসিকতার লক্ষণ—যদিও আমরা মুখে নিজেদের সাত্ত্বিকতার বড়াই করিয়া বেড়াই। আজ আমাদিগের সকলকেই বুঝিতে হইবে যে—এদেশে শিশুমৃত্যু ও জীবন্মৃত শিশুর সংখ্যা বেশী হওয়ায়, এ দেশের দৈন্য ক্রমশই বাড়িতেছে। যাহারা জীবন্মৃত তাহাদিগের চিকিৎসায় ও ভরণ-পোষণে যে প্রভূত সময়, চেষ্টা ও অর্থব্যয় হয়, তাহা না হইয়া তাহারা যদি কাজের লোক হইতে পারিত, এবং যাহারা মারা পড়ে, তাহারা যদি বাঁচিয়া থাকিত, তবে আজ তাহারা কত টাকা রোজগার করিয়া দেশকে বড় করিতে পারিত! শুধু কি তাই? লোক-বল এ সংসারে একটা অতি-বড় বল। আমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি, সে কথা ভাবিতে বা ধারণা করিতেও চাই না। আমরা কেহ কেহ এত বড় স্বার্থপর হইয়াছি যে, একটার বেশী দুইটা ছেলেকে মানুষ করিতে নারাজ—যে হেতু তাহার জন্য যে বেশী ব্যয় পড়ে সে ব্যয় করিতে গেলে নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভাগ কমিয়া যায়। আজ এ বিলাতি চিন্তার ধারা ভুলিয়া বিলাতী রজোগুণের আশ্রয় লইতেই হইবে। কিন্তু রজোগুণের উপযোগী কর্ম্মপ্রেরণা দিবে কে বা কি?—হাড়ে হাড়ে আপনাদের "অত্যন্ত" অনুভূতিই সে প্রেরণা দিতে পারে। একলা একলা ঘরে ঘরে, সকলেরই দেশের কথা ভাবা চাই, এবং দলবদ্ধ হইয়াও এই সকল কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা চাই। শুধু মুষ্টিমেয় কতকগুলি শিক্ষিত লোককে লইয়া কাজ করিলে চলিবে না—যাহারা বহুবর্ষের আবর্জ্জনার মধ্যে নিজ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে, সেই তথাকথিত ইতর লোককে ডাকিয়া লইয়া সকলে মিলিয়া একসঙ্গে হাড়ে হাড়ে পুনঃ পুনঃ অনুভব করিতে হইবে—তবে কাজ হইবে, নতুবা নহে।

আমাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—সমাজ গঠন করা চাই, জাতি-বিচারের রেষারেষি দলাদলি ত্যাগ করিয়া, সকলে সদ্ভাবে একত্র থাকিতে পারে, এমন ব্যবস্থা করিতেই হইবে। দল না বাধিলে, সমাজ গঠন না করিলে, সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে লোকমত সৃষ্ট হয় না। লোকমতের সৃষ্টি না করিতে পারিলে আমাদিগের ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদন চিরকাল উপেক্ষিত হইয়াছে ও হইবে। যতদিন আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিলাম, ততদিন ইংরাজ আমাদিগের সঙ্গে মিশিতে ও সদ্ভাব রাখিতে প্রয়াসী ছিল; কিন্তু আজ আমরা স্ব স্ব প্রধান ও দলভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া, ইংরাজ আমাদিগের কোনও কথায় কর্ণপাত করে না। শুধু তাহাই নহে; আজকাল বিলাতী বিলাসিতার অনুচিকীর্ষু ও মোহগ্রস্ত কোনও কোনও পিতামাতা, নিজ নিজ সন্তানকে আপনার নিজস্ব ভাবিয়া মোহবশতঃ কতই না বিলাসের উপকরণ যোগান, কিন্তু স্থলবিশেষে এই ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও শিশুকুল মাত্রেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আজ যদি আমরা আবার সমাজকে জাগাইতে পারি, সেই সমাজ যদি আবার সকলের শিশুকে সমাজের গচ্ছিত ধন মনে করে, তবে শিশুমঙ্গল সাধন করা অতীব সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কথা-প্রসঙ্গে বলি, আজো যখন কোন পুণ্য দিনে, ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মঙ্গল-শঙ্খ একসঙ্গে বাজিয়া উঠে, তখন, আমার বিদেশী ও বিজাতীয় বিদ্যালব্ধ ভাব দেশীয় কুসংস্কার বিদ্বেষ এ সকল কথা ছাপাইয়া, আমার এ ক্ষীণ দেহের ধমনীর মধ্যে শোণিতপ্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে—আমি হিন্দু এই ভাবটি অনুভব করি বলিয়া। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার এমনিই মহিমা।

আমাদিগের তৃতীয় কর্ত্তব্য—জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বস্তর চাপে আমরা মরিতে বসিয়াছি—মনে, ধনে ও প্রাণে। আজকাল একটি ছেলেকে পড়াইতে যে কত টাকা ব্যয় হয়, তাহার হিসাব আমরা করি না; করিলে, বোধ হয়, আমাদিগের চোখ ফুটিত। তাহার উপরে, জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল শুধু পর-বিদ্যা অধ্যয়নেই কাটে। তবে অল্পায়ু বাঙ্গালী উপার্জ্জন কত বৎসর বয়সে ও কতদিন ধরিয়া করিবে? এই প্রকারে ধন ও প্রাণ দিতে রাজী আছি, যদি তদুপযোগী কিছু ফল লাভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষায় তাহা ত হয় না—বরং অপচয়ের মাত্রাই বেশী। তাহার দুই-একটা নমুনা লউন।—এ দেশে অতি শিশু, ও এম-এ ছাত্র, উভয়েই, বিদ্যালয়ে ১০॥০ হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পড়ে ও নানা বিষয়ের পুস্তক পড়ে—অর্থাৎ মুড়ি-মিছরির এ দেশে এক দর। এদেশে শিশু-দিগের পরীক্ষাতেও বয়বাত্র-ঠকানো প্রশ্ন করিয়া, চুল-চেরা বিচার করিয়া নম্বর দেওয়া হয়। এদেশে কচি ছেলেদিগকে সপ্তাহান্তে, পক্ষান্তে ও মাসান্তে exercise বা অনুশীলনীর পেষণ-যন্ত্রে পেষণ করা হয়; তদুপরি ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক পরীক্ষাও গৃহীত হয়—অথচ বৎসরান্তে যে পরীক্ষা হয়, সে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে না পারিলে, বালকটি অনেক সময়ে, উপর শ্রেণীতে উঠিতে পায় না। মেধা যেমনই হউক না কেন, এদেশে প্রত্যেক ছাত্রকেই বহুবিদ্যার এককালে অনুশীলন করিতে হয়। অথচ এমনই শিক্ষার মহিমা যে, এদেশের ছেলেরা নিজ দেশের কথা জানে না এবং নিজ নিজ দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছুই শিখে না। মোটের উপরে, এ দেশের কেতাবতী শিক্ষার ফলে, বালকদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে; বুদ্ধি-বিবেচনা আড়ষ্ট হইয়া আসে, স্বাধীন চিন্তাশক্তি লোপ পায়। ঠিক এই সকল কারণে, শিক্ষাকে অনতিবিলম্বে জাতীয় শিক্ষায় পরিণত করা অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজ্য-চালনার উপযোগী কর্ম্মচারীবৃন্দ-সৃষ্টিকারী এই বিকৃত ও বিচিত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে, প্রকৃত মানুষ-গড়ায় আয়ত্তমে লইয়া আসিতে হইবে—ইহার জন্য ক্ষণবিলম্ব করাও উচিত নয়।

আমাদের চতুর্থ কর্ত্তব্য—কর্ম্মী সৃষ্টি করা। এদেশে ত্যাগী ও কর্ম্মী লোকের অভাব নাই—অভাব আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া, একলক্ষ্য করিয়া, তাঁহা-দিগের দ্বারা কাজ আদায় করা। শুধু একটু নেতৃত্বের অভাবে, অনেক সময়ে, আমরা কত কাজ হারাই। মুখসর্ব্বস্ব, ভোগবিলাসী বা স্বার্থান্বেষী নেতার দ্বারা যে কাজ হয়, তাহা স্থায়ী হয় না। অপর দেশে, দশে মিলিয়া যে কাজ করে, তাহাই ভাল হয়; আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই, সকল অনুষ্ঠানেই এক ঢোল এক কাঁসির প্রাধান্য দেখা যায়—দশে মিলিয়া, হয় কাজ পণ্ড হয়, নতুবা দশজনের মধ্যে নয় জন, কতকটা নির্ব্বিকার ভাবে থাকেন—একজনে যাহা করে, তাহাতেই সায় দিয়া খুনী হন। আলস্যই ইহার মূল হেতু, ঈর্ষাও ইহার কথঞ্চিৎ কারণ বটে।

মোটামুটি ভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলাম বটে, কিন্তু এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা এইরূপ মোটা কথায় কাজে নামিতে চাহেন না; তাঁহাদিগকে কাজ বাছিয়া দিলে, তাঁহারা অনায়াসেই কাজে লাগিতে পারেন। যাঁহারা সেরূপ ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছেন, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া দুই একটি কাজের তালিকা দিলাম।

প্রথম—খাঁটি দুধ চাই। কচি ছেলের পক্ষে, প্রায় একবৎসরকাল বয়স পর্য্যন্ত, মায়ের দুধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, আজ তাহার অভাব অত্যন্ত বেশী। কাজেই, গরুর দুধের প্রয়োজন। কিন্তু গোচা-রণের মাঠের অভাবে, উৎকৃষ্ট জাতির বৃষের অভাবে, উপযুক্ত গো-সেবার অভাবে, গোমাংস ভক্ষণের আধিক্য এবং দুগ্ধবতী গাভীর রপ্তানি বশতঃ, গো-দুগ্ধ আজ বিরল হইয়া পড়িতেছে। কাজেই, ফুকা দেওয়া, পালো মিশ্রিত, মাঠা তোলা, জলীয় দুধ ব্যতীত দুধ পাইবার যো নাই। অথচ, এই দুধ না পাইয়া, বিলাতী গাঢ় দুধ, বিলাতী গুঁড়া খাবার, সাগু, বার্লি, জঘন্য দোকানের খাবার কত শিশু যে খাইতে বাধ্য হয়, তাহা বলা যায় না। অবস্থা হিসাবে যদি পল্লীতে প্রত্যহ কতক পরিমাণে খাঁটি ফুটান দুধ বিতরণ বা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে অনেক শিশু বাঁচিয়া যায়।

দ্বিতীয়—শীতের সময়ে, শীত-বস্ত্র চাই। এ দেশে শীতের সময়ে গরীবদিগের কচি ছেলে-মেয়েরা যত সর্দ্দি-কাশিতে ভোগে ও মারা যায়,তত আর কেহ নহে। যদি শীতের সময়ে, দুঃখীদিগের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা যায়, তাহা হইলে অনেক শিশুর প্রাণ রক্ষা হয়। বিশেষতঃ, আজকাল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার যে রকম প্রকোপ, তাহাতে ঐরূপ করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। টুক্‌রা কাপড়ের মধ্যে তুলা ভরিয়া জামা করিয়া দিলে, শস্তায় ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

তৃতীয়—গ্রামে গ্রামে ধাইদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। যাহাতে ধাইয়েরা এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, সে জন্য তাহাদিগকে, সামান্য খরচ করিয়া বিলাতী তুলা, টিংচার আইয়োডিন; সুতা, একটু লাইসল নামক পচন-নিবারক ঔষধ প্রভৃতি বিনামূল্যে দান করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে—কি করিতে নাই। এতদ্ব্যতীত, যদি বৎসরান্তে একটা মহকুমার ধাইদিগের কাজের সুফল অনুসারে, কোন-রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে আরো ভাল। এই সকল কার্য্যে শুধু যে পরিশ্রমী, ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন, তাহা নহে, অর্থেরও প্রয়োজন যথেষ্ট।

চতুর্থ—প্রত্যেক গ্রামে, যাহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমে, তাহা প্রাণপণে করিতে হইবে। ম্যালেরিয়া তাড়ান মুখের কথা নহে; কিন্তু ইহার প্রকোপ কমাইবার চেষ্টা করা কঠিন নয়। বন-জঙ্গল কাটান, খানা-খোঁদল বুজান, মশারি টাঙ্গাইয়া শোওয়া, যথেষ্ট মাত্রায় কুইনাইন খাওয়া—এগুলি গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টায় সম্ভব। শিশুরা যত সহজে এবং যত বেশী সংখ্যায় ম্যালেরিয়ার ভোগে, অপরে তেমন ভোগে না। এই জন্য শিশু-মঙ্গলেচ্ছায় যত কিছু কর্ত্তব্য আছে, এটি তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম।

পঞ্চম—গর্ভিণী-পরিচর্য্যা। গর্ভবতী রমণীদের নিজ প্রতি ও গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা যাহাতে তাঁহারা জানিতে পারেন, তজ্জন্য, কাগজ ছাপাইয়া বা বক্তৃতা দ্বারা, জ্ঞান প্রচার করা উচিত। ঘরে ঘরে সুশিক্ষিতা মেয়ে ডাক্তার বা রমণীকে পাঠাইয়া এ বিষয়ে ব্যবস্থা করা চাই।

আজ নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, আমাদিগকে সমস্ত শিশুরই ভার লইতে হইবে। শিশুর ভার লইতে হইলে, শিশুর জননীর ভারও সেই সঙ্গে লইতে হয়। যাহাতে তাহারা প্রাণে বাঁচে, যাহাতে তাহারা বাঁচিয়া মানুষ হইয়া ওঠে, দেশের ভাবী সম্পদ, ভাবী আশা সেই শিশুকুলের জন্য সকলকেই অবহিত হইতে হইবে। কেহই যেন নিজেকে ক্ষুদ্র বা ক্ষীণ মনে না করেন, কেহ যেন কাজের বহর দেখিয়া ভীত না হয়েন, যাঁহার যেমন শক্তি তিনি তেমনি ভাবে কাজ করিবেন।—মোট কথা, সকলেরই কিছু না কিছু কাজ করা চাই। কাজ করিতে হইলে, যে জ্ঞান ও ধারণার আবশ্যক, যে প্রেরণার যোজনার প্রয়োজন, তাহাও যোগাইতে হইবে।

কাজ অনেক, সময় স্বল্প; কিন্তু এই বিশ্বের নিয়ন্তা শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া, মহাত্মা গান্ধীর মঙ্গল-শঙ্খনিনাদে, সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের অগ্রদূত যে সকল মহাপ্রাণ দেশের কাজে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুসরণ করা ছাড়া আর গতি নাই।

("বাসন্তী" হইতে পুনর্মুদ্রিত)।

মিলিতোনা

(Theophile Gautierএর ফরাসী হইতে)

১৮৪০, জুন মাসের কোন সোমবারে, একটি সুশ্রী যুবাপুরুষ—কিন্তু দেখিলে মনে হয় মেজাজটা বড়ই খারাপ—বীর-ভূমি মাদ্রিদ্ নগরে সান্ বের্ণার্ডো রাস্তার ধারে অবস্থিত একটা গৃহের অভিমুখে চলিতেছিল।

এই গৃহের একটি জান্‌লার ভিতর দিয়া পিয়ানোর সঙ্গীত-স্বরলহরী বাহির হইতেছিল। যে অসন্তোষের ভাব যুবকের মুখে প্রকাশ পাইতেছিল, এই সঙ্গীত শ্রবণে তাহা যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। প্রবেশ করিতে যেন ইতস্তত করিতেছে এই ভাবে সে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তথাপি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, মনের সমস্ত বিতৃষ্ণাকে অতিক্রম করিয়া, যুবক দ্বারের অর্গল খুলিল—অর্গলের শব্দ হইবামাত্র, সিঁড়িতে ধপাধপ্ পায়ের শব্দ শুনা গেল—একজন তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

মনে হইতে পারে, হয়ত বেশী সুদে টাকা ধার করা, কিংবা কোনও ধার শোধ করা, কিংবা কোন বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজনের কাছে ধম্‌কানি খাওয়া—এইরকম কোন একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারের চিন্তায়, ডন-আন্দ্রের স্বভাব-সিদ্ধ চিরহাস্যোজ্জ্বল মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু এ-সব কিছুই নহে।

ডন্-আন্দ্রের কোন ধার ছিল না; টাকা ধার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; তাহার আত্মীয়-স্বজন সবাই পরলোকগত; কোন উত্তরাধিকারসূত্রেও কোন সম্পত্তিলাভের তার প্রত্যাশা ছিলনা; তার কোনও চটা-মেজাজের খুড়ী কিংবা কোনও খামখেয়ালি খুড়োও ছিলনা যে তাহাদের নিকট হইতে সে তিরস্কারের আশঙ্কা করিবে।

নারীরঞ্জনপরতার হিসাবে তাকে প্রশংসা করিতে না পারিলেও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, সে প্রতিদিন একবার করিয়া ডনা-ফেলিসিয়ানার দরবারে হাজ্‌রিসই করিত।

যুবতী ডনা-ফেলিসিয়ানা উচ্চবংশের রমণী; দেখিতে বেশ সুশ্রী; যথেষ্ট ধনসম্পত্তি আছে; ইঁহার সহিত ডন-আন্দ্রের শীঘ্রই বিবাহ হইবার কথা।

অবশ্য ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহাতে ২৪ বৎসর বয়স্ক কোন যুবাপুরুষের মুখ অন্ধকার হইতে পারে, অথবা ষোড়শী-বয়স্কা কোন তরুণীর সহিত দুই এক ঘণ্টা কাটানো কোন যুবকের পক্ষে এমন-কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপারও নহে।

মেজাজ হাজার খারাপ হইলেও কৃত্রিম হাবভাব প্রকাশ করিতে কোনো বাধা হয় না। আন্দ্রে সিঁড়িতে উঠিবার সময়েই মুখের চুরোটটা ফেলিয়া দিয়াছিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কাপড়ে-লাগা চুরোটের ছাই কাপড় হইতে সে ঝাড়িয়া ফেলিল; মাথার চুলে হাত বুলাইয়া চুলটা একটু দুরস্ত করিয়া লইল এবং গোঁফের ছুঁচালো অগ্রভাগ আর-একটু উপরে তুলিয়া দিল, এবং

মুখের বিরক্তি ভাবটা অপসারিত করিয়া ওষ্ঠাধরে মৃদু মধুর একটি হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াই তার ভাবনা হইল—যদি ফেলিসিয়ানার মাথার আসে,—যে যুগল-বন্ধ গানটা সেদিন শেষ হয় নাই, সেই গানটা আবার আমার সহিত এক সঙ্গে ২০ বার করিয়া গান করিবে, তাহা হইলে ষাঁড়ের লড়াইয়ের আরম্ভটা আমার দেখাই হইবেনা।

আন্দ্রে মনে মনে এই অশঙ্কা করিতেছিল, এবং সত্য কথা বলিতে কি, এই অশঙ্কার যথেষ্ট হেতুও ছিল।

ফেলিসিয়ানা একটা টুলের উপর বসিয়া ঈষৎ সম্মুখে হেলিয়া, স্বরলিপি-পত্রের যে অংশটা অতি দুরূহ ও জটিল, সেই অংশটা দেখিতেছিল আর পিয়ানোয় তাহা বাজাইতে চেষ্টা করিতেছিল; আঙ্গুলগুলা ফাঁক করিয়া, হাতের দুই কুনুই ও দেহ—দুইয়ের মধ্যে দুইটা কোণ রচনা করিয়া, পিয়ানোর পর্দ্দাগুলার উপর অঙ্গুলির আঘাত করিয়া এই দুরূহ অংশ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিল; এরূপ অধ্যবসায় কোন ভাল বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে আরও উপযুক্ত হইত সন্দেহ নাই।

ফেলিসিয়ানা তাঁর কাজে এরূপ ব্যাপৃত যে, আন্দ্রে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। বাড়ীর পরিচিত লোক ও ঠাকুরাণীর ভাবী পতি মনে করিয়া দাসী মনিবকে খবর না দিয়াই আন্দ্রেকে প্রবেশ করিতে দিয়াছে।

ফেলিসিয়ানা পিয়ানোর সহিত যুঝাযুঝি করিতেছে। আন্দ্রে তাঁর পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। এই বাজনায় বাধা দেওয়া উচিত কিনা—এই কথা আন্দ্রে যতক্ষণ মনে মনে ভাবিতেছে ততক্ষণ এই ঘটনার স্থানটা এক-নজরে যদি আমরা দেখিয়া লই, তাহা হইলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

এক-রকম অনুজ্জ্বল ফিকে রঙে দেয়াল রঞ্জিত। জান্‌লা ও দরজার চারিধারে কৃত্রিম ঢালাই কাজ, ধূসর রঙের অলীক ফ্রেম। নামজাদা ওস্তাদের কতকগুলা কালো রঙের তক্ষণ-চিত্র (engraving) ঠিক্ সৌষাম্য রক্ষা করিয়া সবুজ রেশমের রজ্জু দিয়া ঝুলান হইয়াছে। কালো ঘোড়ার বালাঞ্চির গদি বিশিষ্ট সোফা-কৌচ যাহার পৃষ্ঠদেশ "Lyre" বীণাযন্ত্রের আকারে গঠিত, কতকগুলো কেদারা, একটা আলমারি, একটা খোদাই কাজ-করা মেহগনি কাঠের টেবিল, একটা দেয়াল-ঘড়ি, দুই পাশে দুইটা বেলোয়ারি ঝাড়—ইত্যাদি সুরুচিব্যঞ্জক আস্‌বাবে ঘরটি সজ্জিত।

শার্শি-জান্‌লা,—ফুল-কাটা সুইস্-মস্‌লিনের পর্দ্দায় বিভূষিত। তাছাড়া কাচের কতকগুলা কুকুর, চিনামাটির কতকগুলি মূর্ত্তিপুঞ্জ (group); মিনার ফুলে বিভূষিত, রূপালী তারের জরাউ-কাজ করা ঝুরি; অ্যালাব্যাষ্টার পাথরের কাগজ-চাপা; স্পা-নগরের প্রসিদ্ধ রং-করা বাক্সো—এই-সব উজ্জ্বল বিলাস-দ্রব্যে ঘরের দাঁড়ানো-শেল্‌ফ্-তাক্ ভারাক্রান্ত। এই প্রকার সৌখীন দ্রব্য-সংগ্রহে ফেলিসিয়ানার কলানুরাগের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ফেলিসিয়ানা প্যারিসে শিক্ষিতা, সুতরাং প্যারিসের সমস্ত প্রচলিত ঢং তিনি পুরামাত্রায় অবগত ছিলেন।

ফেলিসিয়ানার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার

পিতা পুরাতন আসবাব সকল বাজে জিনিসের গুদাম-ঘরে চালান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দশ-ডেলে ঝাড়, চার-বর্ত্তিকাবিশিষ্ট দীপ, রুশীয় চর্ম্মে আচ্ছাদিত আরাম-কেদারা, ড্যামাস্ক্ নগরের বুটিদার গোলাপি কাপড়, পারস্যদেশীয় গালিচা, চীনদেশের ছাতা, ঢাকা-দেওয়া দেয়াল-ঘড়ি, লাল মখ্‌মলের আস্‌বাব-পত্র, বিচিত্ররত্ন-খচিত বই-য়ের আল্‌মারী, বাদামী কাঠের প্রকাণ্ড টেবিল, চারি-কপাট-ওয়ালা বাসনের তাক্-আলমারি, দশ-দেরাজ-ওয়ালা কাপড়ের আল্‌মারি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফুলের টব্—এই-সব স্পেনদেশের বিশিষ্ট সৌখীন সামগ্রীর স্থান,—তৃতীয় শ্রেণীর কতকগুলা আধুনিক বিলাস-সামগ্রী অধিকার করিয়াছে। সভ্যতার আলোকে অন্ধ কতকগুলি অবোধ লোক এই-সব খেলো জিনিসেই মুগ্ধ যাহা একজন সামান্য ইংরেজ দাসীও পছন্দ করিবে না।

শ্রীমতী ফেলিসিয়ানা দুই বৎসর পূর্ব্বেকার সৌখীন ঢং-এর পরিচ্ছদে বিভূষিতা; বলা বাহুল্য; তাঁর সাজসজ্জায় স্পেনদেশীয় কিছুই ছিল না। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের পরিচ্ছদে যাহা কিছু চিত্রবৎ নেত্রাকর্ষক, কিংবা কোন বিশেষ কুলপরিচায়ক, তাহা তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না; তাঁহার পরিচ্ছদের রং খুব ফিঁকে ও অস্পষ্ট;—ফুলকাটা কিন্তু ফুলগুলি প্রায় অদৃশ্য। এই কাপড় আসলে ইংলণ্ড হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু জিব্রাল্টারের সাহসী বে-আইন আমদানী-কারীরা প্রবঞ্চনা করিয়া উহা প্যারিসের কাপড় বলিয়া চালাইয়া দেয়। কোন মধ্যবিত্ত লোক তাহার কন্যার জন্য ঐ রকম কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় পছন্দ করে না। তাঁহার বুক-কাটা আঁটাসাঁটা অঙ্গরাখার খোলা অংশ হইতে অর্দ্ধব্যক্ত ভীরু সৌন্দর্য্যরাশি একটা জরির পাড় বিশিষ্ট একপ্রকার উত্তরীয়-বাসে সলজ্জভাবে আবৃত। পায়ের গঠনানুরূপ পায়ে সরু বুট-জুতা; পা যেরূপ ক্ষুদ্র ও সুবক্র, তাহাতে তাঁহার বংশসম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

তাছাড়া ইহাই তাঁহার বংশের একমাত্র নিদর্শন, নচেৎ তাঁহাকে সহজেই একজন জার্ম্মাণরমণী অথবা উত্তর-প্রদেশীয় ফরাসী রমণী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; তাঁর নীল চোখ, কটা চুল, সমস্ত মুখের রং গোলাপী;—নভেল প্রভৃতি পাঠ করিয়া স্পেন-রমণী সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহার সহিত উক্ত লক্ষণগুলির মিল হয় না। "ম্যান্‌টিলা" নামক স্পেন-দেশীয় নারীর ওড়না তিনি কখনই পরিধান করিতেন না। "ফাণ্ডাঙ্গো" ও "কাচুচা" নামক স্পেনদেশীয় নৃত্য তিনি জানিতেন না। কিন্তু "কুয়াড্রিল" ও "ওয়াল্‌ট্‌স্" নামক নৃত্যে তিনি পরিপক্ক ছিলেন। তিনি কখনই ষাঁড়ের লড়াই দেখিতে যাইতেন না, মনে করিতেন, উহা একটা বর্ব্বরোচিত তামাসা; পক্ষান্তরে, তিনি ফরাসী ভাষা হইতে অনুদিত প্রহসনাদি এবং ইটালীর সঙ্গীতাদি শুনিতে থিয়েটারে যাইতেন। সায়াহ্নে তিনি সাক্ষাৎ প্যারিস্ হইতে আনীত টুপি পরিয়া, সাধারণের হাওয়া খাইবার জায়গায় গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতেন।

তরুণী ফেলিসিয়ানা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রথানুগামী ও কায়দা-দুরস্ত ছিলেন।

আন্দ্রে মনে মনে ভাবিতেন,—যদিও স্পষ্ট করিয়া মুখে ব্যক্ত করিতে পারিতেন না :—"সম্পূর্ণরূপে কায়দা-দুরস্ত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিরক্তিজনক !"

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কেন আন্দ্রে, যাহাকে তেমন ভাল লাগে নাই, তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। ইহা কি ধনের লোভে ? না ; ফেলিসিয়ানার প্রভূত ধন-সম্পত্তি থাকিলেও আন্দ্রে তাহাতে প্রলুব্ধ হইতে পারে না—কেননা তাহারও ধন-সম্পত্তি কম ছিল না। এই অল্পবয়স্ক দুই ব্যক্তির পিতামাতারাই এই বিবাহটা স্থির করিয়াছেন ; পাত্র ও পাত্রী তাহাতে কোন আপত্তি করে নাই এইমাত্র ; এইক্ষেত্রে, ধনসম্পত্তি, বংশ, বয়স, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আশৈশব বন্ধুত্ব—সমস্তই একত্র মিলিত হইয়াছিল। আন্দ্রে, ফেলিসিয়ানাকে স্বকীয় ভাবীপত্নী বলিয়া মনে করিতে চিরদিন অভ্যস্ত ছিল। তাই আন্দ্রে যখন ফেলিসিয়ানার বাড়ী যাইত, তখন আন্দ্রের মনে হইত নিজের বাড়ীতেই প্রবেশ করিতেছে। তাছাড়া আন্দ্রে দেখিল, —যে সব গুণ থাকা আবশ্যক, ফেলিসিয়ানার সে সব গুণই আছে ; ফেলিসিয়ানা দেখিতে সুশ্রী, ছিপ্‌ছিপে-গড়ন ও ফর্সা-রং। ফেলিসিয়ানা ফরাসী বলিতে পারে, ইংরেজী বলিতে পারে, ভাল চা তৈরী করিতে পারে। তবে এ কথা সত্য, তাঁর হাতের তৈরী ঐ উৎকট পাচনটা আন্দ্রের রসনায় অসহ্য ছিল। ফেলিসিয়ানা নৃত্য করিত, পিয়ানো বাজাইত এবং জল-রঙের ছবিও ভাল করিয়া ধুইতে পারিত। খুব কড়াক্কড় পুরুষও ইহা অপেক্ষা অধিক কিছুই দাবী করিতে পারে না।

ফেলিসিয়ানা, জুতার মচ্‌মচ্‌-শব্দেই তাঁহার ভাবী পতির উপস্থিতি অবগত হইয়াছিলেন ; তিনি না ফিরিয়াই বলিলেন :—"ও ! তুমি আন্দ্রে !"

কোন তরুণ-বয়স্কা রমণী একজন পুরুষের ছোট নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছে দেখিয়া যেন কেহ বিস্মিত না হন। কিছুদিনে একটু ঘনিষ্ঠতা হইলেই স্পেনদেশে এইরূপ নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রথা আছে। আমাদের মধ্যে ভালবাসাবাসির স্থলেই এইরূপ ব্যাপ্‌টিজমের নাম ধরিয়া ডাকিবার রীতি আছে। কিন্তু স্পেনের রীতি সেরূপ নহে।

"আন্দ্রে তুমি ঠিক সময়ে এসেছ ; যে যুগলবন্ধ গানটা মার্কিসের ওখানে আজ আমাদের গাইতে হবে, সেইটে আর একবার অভ্যাস করব মনে করছিলুম।"

আন্দ্রে উত্তর করিল :—

"আমার মনে হয়, আমার যেন একটু সর্দ্দি হয়েছে।"

আর এই কথাটা সপ্রমাণ করিবার জন্যই যেন আন্দ্রে একটু কাশিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তার এই কাসিবার চেষ্টাটা বিশ্বাস জন্মাইতে পারিল না। ডনা ফেলিসিয়ানা তাঁহার ওজর আদৌ গ্রাহ্য না করিয়া, অতি নিষ্ঠুরভাবে বলিলেন :—

"ও কিছুই নয় ; ঐ গানটা আর একবার আমাদের একসঙ্গে গাইতে হবে। আরও একটু পাকাপোক্ত করে নিতে হবে। তুমি আমার জায়গায় পিয়ানোর সম্মুখে বসে আমার গানের সঙ্গে একটু পিয়ানোতে সঙ্গৎ করবে কি ?"

বেচারা আন্দ্রে ঘড়ির দিকে একবার

বিষণ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিল। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। হতাশভাবে, হস্তিদন্তের পর্দ্দার উপর হাত ফেলিল। বেশী আড়ম্বর না করিয়া, যুগলবন্ধটা শেষ করিয়াই আন্দ্রে আবার ঘড়ির দিকে তাকাইল। ফেলিসিয়ানা আড়চোখে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। ফেলিসিয়ানা বলিল ঃ—"আজ দেখ্‌ছি তোমার মনের টান ঘড়ির দিকেই বেশী—ঘড়ি ছেড়ে তোমার দৃষ্টি আর কোথাও যায় না।"

"ও দৃষ্টিতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না—সহজ ভাবেই ঘড়ির উপর আমার চোখ পড়েছিল।...সময়ে কি যায় আসে যখন আমি তোমার কাছে আছি।"

এই কথা বলিয়া, সসম্ভ্রমে ফেলিসিয়ানার হস্তের উপর আলগোচে একটি চুম্বন স্থাপন করিবার জন্য আন্দ্রে ফেলিসিয়ানায় হস্তের উপর রসিক-জনের ধরণে মস্তক অবনত করিল।

—"হপ্তার অন্যদিনে দেখ্‌তে পাই ঘড়ির কাঁটার দিকে তোমার বড়-একটা লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু সোমবারে দেখতে পাই অন্য রকম!"...

—"কেন, সময়টা ঐ রকম দ্রুত সকল দিনই যায় না কি? বিশেষত যে সময় আমি তোমার সহিত একসঙ্গে সঙ্গীত অভ্যাস করি?"

—"সোমবার ষাঁড়ের লড়ায়ের দিন; আর দেখ আন্দ্রে, এটা তুমি অস্বীকার কর্ত্তে চেষ্টা কোরো না যে, আমার পিয়ানোর সম্মুখে বসে থাকার চেয়ে এই সময়ে ঐ লড়ায়ের জায়গায় উপস্থিত থাকৃতে তোমার বেশী ভাল লাগ্‌বে? তবে কি, তোমার এই ভীষণ আসক্তিটা কখনই ঘুচ্‌বে না? যখন আমাদের বিবাহ হয়ে যাবে তখন আমি সভ্যরকমের নিরীহ ধরণের আমোদ-প্রমোদে তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পার্‌ব।"

—"সেখানে উপস্থিত হবার স্পষ্ট কোন মৎলব আমার ছিল না......তবে এ কথা আমি স্বীকার করি—যদি কথাটা শুনে তুমি অসন্তুষ্ট না হও—কাল আমি একটা লড়ায়ের আখ্‌ড়ায় গিয়েছিলুম, সেখানে গাভিরা প্রদেশের চারটে বড় বড় ষাঁড় এসেছে...... বেশ জাঁকালো রকমের তাদের গল-কম্বল, পা শুকো ও সরু, চন্দ্রকলার মত সিং; আর এমন হিংস্র, এমন বুনো, যে একজন বৃষ-চালককে গুঁতিয়ে ঘায়েল করেছিল! আজ মল্লদের মুষ্টি যদি বেশ দৃঢ় থাকে, মনে যদি বেশ সাহস ও ভরসা থাকে তাহলে তারা ষাঁড়ের উপর আজ সুন্দর কায়দায় ছোরার আঘাত করতে পারবে!" আন্দ্রে খুব উৎসাহের সহিত এই কথাগুলি বলিল।

আন্দ্রে যখন এইরূপ বর্ণনা করিতেছিল, ফেলিসিয়ানায় মুখে একটা ঘোর অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। ফেলিসিয়ানা আন্দ্রেকে বলিল ঃ—

"তোমার উপরেই চিকন্‌চাকন, আসলে তুমি একজন আস্তো বর্ব্বর। তোমর ঐ বুনো জন্তুদের বর্ণনা শুনে আমার গা শিউরে শিউরে উঠছে—আর তুমি ঐ ভীষণ কাণ্ডগুলো কেমন আনন্দের সঙ্গে বল্‌চ—যেন অতি সুন্দর জিনিস।"

বেচারা আন্দ্রে মাথা হেঁট করিল; কারণ

সে ইতিপূর্ব্বে এই মল্লক্রীড়ার বিরুদ্ধে কতকগুলা ভীরু ও বীর্য্যহীন ব্যক্তির আসার বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিল; এবং সেই বক্তৃতার কথা অনুসারে সে এখন আপনাকে "অবনতি সময়ের রোমক" বলিয়া, "কশাই" বলিয়া, "রাক্ষস" বলিয়া যেন একটু অনুভব করিতে লাগিল। অর্দ্ধ বিদ্রূপাত্মক একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া ফেলিসিয়ানা বলিলঃ—"দেখ আন্দ্রে গাভিরার বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি—এ অভিমান আমার নাই; কিন্তু তোমার এই আমোদে আমি তোমাকে বঞ্চিত করতে চাইনে; তোমার শরীরটা আছে এইখানে, কিন্তু তোমার আত্মাটা আছে সেই লড়ায়ের আখ্‌ড়ায়; তোমাকে দেখে আমার দয়া হচ্চে; আচ্ছা, তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম কিন্তু শুধু এই সর্ত্তে যে তুমি সেই মার্কিসের সঙ্গীত-উৎসবে সকাল-সকাল এসে যোগ দেবে।"

আন্দ্রের হৃদয় অতি সুকুমার, সে অন্যকে পারতপক্ষে ব্যথা দিতে অনিচ্ছুক, তাই ফেলিসিয়ানার অনুমতি সত্ত্বেও তখনই সেই অনুমতির সদ্ব্যবহার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না, আরও কিছুক্ষণ সে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল, এবং একটু বিলম্ব করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল—যেন সে ফেলিসিয়ানার কথাবার্ত্তার মোহিনীশক্তিতেই আটকিয়া পড়িয়াছিল।

আন্দ্রে ধীরপদক্ষেপে চলিতে চলিতে যখন তাহার বাগ্‌দত্তার বারাণ্ডার দৃষ্টিবহির্ভূত হইল, তখন স্ফূর্ত্তির সহিত পা চালাইয়া শীঘ্রই ষাঁড়ের লড়ায়ের আখ্‌ড়ায় যাইবার রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

কোন বিদেশী লোক দেখিলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইত যে, পথিকেরা সবাই এক একদিকেই যাইতেছে; যাইতেছে সবাই, আসিতেছে না কেহই। সহরের লোক-চলাচলের এই অদ্ভুত দৃশ্য প্রতি সোমবারে ৪ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। আন্দ্রে চলিতে চলিতে আর একটা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। এই নানা নদী একত্র মিশিয়া যেরূপ সমুদ্রে আসিয়া পড়ে সেইরূপ এই ক্রম-ঢালু রাস্তাটা ক্রমশ চওড়া হইয়া শহরের দ্বার দেশে নামিয়া আসিয়াছে। এই সুন্দর চওড়া ক্রম ঢালু রাস্তাটি লণ্ডন প্যারিসকেও তাক্ লাগাইয়া দিতে পারে। রাস্তায় দুইধারে ধব্‌ধবে সাদা বাড়ীর সার। রাস্তাটা শেষ হইয়াছে দ্বারের মত একটা ফুকরে আসিয়া; সেই ফুকরের ফাঁকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিচিত্র বর্ণের নিবিড় জনতা যেন পিপীলিকার সারি ক্রমে স্থূল হইতে সুক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে। চারিদিকে ধূলা উড়াইয়া, পাদচারী, অশ্বারোহী, গাড়ী, আড়াআড়ি ভাবে চলিয়াছে, ঠেলাঠেলি করিয়া জড়াজড়ি করিয়া চলিয়াছে। চারিদিক হইতে আনন্দ ধ্বনি ও চীৎকার কোলাহল সমুত্থিত হইতেছে। লোকেরা উন্মত্তভাবে বাজি রাখিতেছে। বেটো ঘোড়ার পৃষ্ঠদণ্ডের উপর প্রযুক্ত বেতের আঘাত শব্দে চারিদির প্রেতিধ্বনিত হইতেছে। অশ্বতরের মাথার সাজ হইতে লম্বমান, ঘণ্টিকা গুচ্ছের টুন্‌টুন্ শব্দে কর্ণ বধির হইতেছে।

এই মানব-সমুদ্রের মধ্যে, তিনকালগত ৪টা প্রাচীন অশ্বযোজিত তিমি মৎস্যাকার কতকগুলা স্পেনদেশের সে-কেলে গাড়ী এবং ঢিলা-নড়নড়ে চেরিয়াট্ গাড়ী দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; ঐসব

গাড়ীর গিল্টি মুছিয়া গিয়াছে, রং জ্বলিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে আধুনিক কালের প্রতিনিধি স্বরূপ অশ্বতরযোজিত অম্‌নিবস্‌ গাড়ীও ছুটিয়া আসিতেছে।

আন্দ্রে খুব স্ফূর্ত্তির সহিত দ্রুতপদে চলিয়াছে। এইরূপ দ্রুত চলা স্পেনবাসী-দিগের একটা বিশেষত্ব। স্পেনীয়দিগের মত হাঁটিতে পৃথিবীর আর কোন জাতিই পারে না। তাঁর পকেটে কিছু টাকা পয়সা ও ছায়া-স্থানে বসিবার একটা টিকিট্‌ আছে। তাঁর স্থানটা বেড়ার খুব নিকটে। এই স্থানটা দড়ি দিয়া ঘেরা—পাছে ষাঁড়গুলা দর্শকদের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে। এই স্থানে চাষা লোকের সহিত ঘ্যাসাঘেসি করিয়া বসিতে হইবে, তাহাদের কাপড়ের ঘেমো গন্ধ, তাদের চুলে চুরোটের ধোঁয়ার গন্ধ সহ্য করিতে হইবে,—এই সমস্ত জানিয়াও সম্ভ্রান্তজনোচিত 'বক্স্‌' আসন ছাড়িয়া আন্দ্রে এই ইতর লোকদের স্থানই পছন্দ করিয়াছে। কেননা এখান হইতে লড়ায়ের সমস্ত খুঁটিনাটি ভাল করিয়া দেখা যায়, ও ঠিক্‌ বুঝিতে পারা যায়।

বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও আন্দ্রে, লেস্‌-দেওয়া মখ্‌মল কিংবা রেশমী কাপড়ের অবগুণ্ঠনে স্বল্পাধিক মুখ-ঢাকা সুন্দরীদিগের মুখচন্দ্র দর্শনসুখে আপনাকে কখনই বঞ্চিত করিত না। এমন কি, আন্দ্রে যদি কখন দেখিত, সূর্য্যোত্তাপ হইতে মুখবর্ণের মাধুর্য্য রক্ষা করিবার জন্য গালের একপাশে আতপত্রের মত হাত-পাখার আড়াল করিয়া কোন সুন্দরী রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, অমনি সে দ্রুত পা বাড়াইয়া তাহাকে এক নজরে দেখিয়া লইত, এবং তখনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, অবসর-মত সেই সুন্দরীর অর্দ্ধাবৃত মখ-শ্রী মনে মনে ধ্যান করিত।

আজ, এই সুন্দরীসন্দর্শনকাজে সচরাচর অপেক্ষা আন্দ্রের যেন একটু বেশী যত্ন লক্ষিত হইল। সুন্দর মুখ দেখিলেই তাহার উপর আন্দ্রের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিপতিত হইতেছিল, তাহার কাছ দিয়া একটি মুখও এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। মনে হয় যেন আন্দ্রে এই জনতার মধ্যে কাহাকে খুঁজিতেছে।

ধর্ম্মনীতির উপদেশ অনুসারে, স্বকীয় বাগ্‌দত্তা ছাড়া (স্পেনীয় ভাষায় যাকে Novia নব্যা বলে) পৃথিবীতে আর কোন ললনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে নাই। কিন্তু এই কঠোর সত্যপালনধর্ম্ম রোমকজাতি ছাড়া অন্যত্র অতীব বিরল।

বিগত সোমবারে আন্দ্রে মল্লরঙ্গভূমির এক বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট একটি বালিকাকে দেখিয়াছিল, তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য এবং তাহার মুখের ভাবটি অতি অপূর্ব্ব। যদিও আন্দ্রে স্বল্পক্ষণমাত্র তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, তথাপি তাহার মুখশ্রী আন্দ্রের মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ একটা ছবি দেখিলে যেরূপ হয় এই আকস্মিক নারীদর্শনের স্মৃতি তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী স্থায়ী হইবার কথা নহে—কেননা আন্দ্রে ও "মানোলা" তরুণীর মধ্যে কোনও অর্থপূর্ণ ইসারাও বিনিময় হয় নাই। তরুণী "মানোলা" নামক নিম্ন শ্রেণীর বলিয়াই মনে হয়। আন্দ্রে ও তরুণীর মধ্যে তাই অনেক গুলি বেঞ্চের ব্যবধান ছিল। তাছাড়া তরুণী আন্দ্রেকে

দেখিয়াছিল কিংবা তাহার প্রতি আন্দ্রের মুগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, এরূপ বিশ্বাস করিবারও কোন হেতু আন্দ্রের ছিল না। তরুণীর দৃষ্টি রঙ্গভূমিতেই নিবদ্ধ ছিল। সেখান হইতে ক্ষণেকের জন্যও তাহার দৃষ্টি অন্যত্র ধাবিত হয় নাই। দেখিলে মনে হয়, রঙ্গ দর্শন ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাহার যেন ঔৎসুক্য নাই।

এই ঘটনাটা শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবার কথা, কিন্তু ইহা আন্দ্রের মনে এরূপ দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে ভুলিতে পারে নাই।

সায়াহ্নে,—অবশ্য অজ্ঞাতসারে, আন্দ্রে অন্য দিন অপেক্ষা বেশীক্ষণ ধরিয়া বেড়াইল। অন্য দিন যেখানে সৌখীন সম্ভ্রান্ত লোকেরা ভ্রমণ করে সেইখানেই তাহার বেড়াইবার আড্ডা ছিল—কিন্তু আজ সেই স্থান ছাড়াইয়া যেখানে "মানোলা" নামক নিম্নশ্রেণীর রমণীরা যাতায়াত করে সেই ছায়াময় সংকীর্ণ বীথি-পথে সে বেড়াইতে লাগিল। এবং তাহার 'অপরিচিতাকে' যদি দৈবক্রমে আবার দেখিতে পায় এই আশায় সে সম্ভ্রান্তজনোচিত শোভন বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল।

আজ আবার আন্দ্রে লক্ষ্য করিল—যাহা আগে কখনই তাহার চোখে পড়ে নাই—ফেলিসিয়ানা তার কটা চুলের কটা রং একটু কমাইবার জন্য অনেক কষ্ট করিয়া কলপ লাগাইয়াছে—এবং তাহার পাণ্ডুবর্ণ পক্ষ্মবিশিষ্ট চোখে কোন একটা ভাবের খেলা নাই—ভাবের মধ্যে, সুশিক্ষিত মহিলা-সুলভ একটা এক ঘেয়ে লাজুকতার ভাব আছে মাত্র। বিবাহ-কালে তাহার জন্য না জানি কি সুখ সঞ্চিত আছে তাহা ভাবিয়া আন্দ্রে একটা হাই তুলিল।

আন্দ্রে রঙ্গভূমির তোরণদ্বারের খিলান-পথ দিয়া যখন চলিতেছিল, তখন দেখিতে পাইল, জনতা ভেদ করিয়া একটা গাড়ি যাইতেছে—আর চারিদিক হইতে লোকেরা তাহার উপর সমস্বরে অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে। কোন আমোদে ব্যাঘাত জন্মাইলে, স্পেনের লোকেরা পদ-চারীর প্রাধান্য সমর্থন করিবার জন্য আমোদের ব্যাঘাতকারীর প্রতি এইরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

এই গাড়ীর সাজসজ্জায় উল্লাসের বাড়াবাড়ি লক্ষিত হয়; গাড়ীর প্রকাণ্ড দুই চাকা রক্তবর্ণ—গাড়ীর গাত্র, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, ফুলশর-বিদ্ধ হৃদয় প্রভৃতি প্রেম-নিদর্শন ও চিত্রে সমাচ্ছন্ন।

গাড়ীতে জোড়া অশ্বতরের অর্দ্ধ দেহের লোম ছাঁটা। অশ্বতর স্বীয় শিরোভূষণ হইতে লম্বিত ঘণ্টিকা-গুচ্ছ মাথা ঝাঁকাইয়া নিনাদিত করিতেছে। সাজের কারিগর, এই সাজে ঝাপ্পা ঝোপ্পা, জরির জরাও ফিতা, মাথার চূড়াগুচ্ছ, নানারঙের চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে অলঙ্কার—কত কি দিয়া যে ভূষিত করিয়াছে তার ঠিকানা নাই। দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, অশ্বতর যেন একটা চলন্ত ফুলের তোড়ায় যোজিত হইয়াছে।

ভীষণদর্শন এক কোচ্‌ম্যান—লম্বা-হাতা কামিজ-পরা, কাঁধে জরির কাজ-করা চামড়ার পটি-লাগানো, চালকের আসনে বসিয়া, অশ্বতরের অস্থিময় পৃষ্ঠভাগের উপর এমন সজোরে চাবুক মারিতেছে যে তাহার আঘাতে অধীর হইয়া অশ্বতর আবার নবোদ্যমে চার পা তুলিয়া ছুটিয়াছে।

এই গাড়ী নিজগুণে যে বিশেষ বর্ণনার যোগ্য তাহা নহে—আমার এই গাড়ীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি, আর এক কারণে। গাড়ীখানা দেখিয়া আন্দ্রের মুখে একটা প্রীতিকর বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই ষাঁড়ের রঙ্গাঙ্গনে খালি গাড়ী প্রায় আসিতে দেখা যায় না। এই গাড়ীর ভিতর দুইটি লোক ছিল।

প্রথম, একটি বৃদ্ধা, বেঁটে ও স্থূলাকার, সেকেলে ধরণে কালো পোষাক পরা; তার এক-আঙ্গুল খাটো গাউনের নীচে হইতে হল্‌দে রঙের ঘাগ্‌রার ধার দেখা যাইতেছে;—কতকটা ক্যাষ্টেলের চাষা লোকদের মত। বৃদ্ধার মুখ চওড়া, চ্যাপ্‌টা, সীসবর্ণ; নিতান্ত সাধারণ ধরণের মুখ বলিয়া মনে হইত—যদি চোখের চারিধারে ভূষা রঙের রেখামণ্ডল-বিশিষ্ট জ্বলন্ত-অঙ্গারের মত দুইটা চোখ এবং ওষ্ঠাধরের উপর অঙ্কিত সুস্পষ্ট গোঁফের রেখা মুখে একটা হিংস্র ভীষণ ভাব আনিয়া অনন্যসাধারণ করিয়া না তুলিত। যদিও তার প্রেমের কাল বহুদিন হইল বিগত হইয়াছে—কোন কালে ছিল কিনা তাও সন্দেহ—তথাপি সে কাঁধের উপর মখ্‌মলের পাড়-ওয়ালা ম্যানিলা-বহির্বাস বেশ একটু মন-ভুলনিয়া ধরণে বিন্যস্ত করিয়াছে, এবং সবুজ কাগজের একটা বড় হাতপাখা বেশ একটু হাবভাবের সহিত বাগিয়া ধরিয়াছে।

ইহা সম্ভব নহে যে, এই অপরূপ সঙ্গিনীটির বদনচন্দ্র দর্শনে আন্দ্রের মুখে একটা সন্তোষের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি ১৬ বৎসর কিংবা ১৮ বৎসরের তরুণী—১৬ বৎসরের হওয়াই বেশী সম্ভব। একটা হাল্‌কা-ধরণের রেশমী 'মান্টিলা'-ওড়না একটা উচ্চ ঝিনুকের চিরুণীর উপরে বিন্যস্ত। তরুণীর বিপুল কেশজালে রচিত চাঙ্গারী-আকারের খোঁপা;—চিরুণী, খোঁপার চারিধার ঘিরিয়া আছে। ওড়নার বেষ্টনের মধ্য হইতে তরুণীর ঈষৎ পীতাভ সুন্দর নেত্রবিমোহন মুখখানি দেখা যাইতেছে। গাড়ীর মধ্যে সম্মুখ দিকে পা ছড়ানো—ছোট্ট পা-দুখানি; পায়ে ফিতা-ওয়ালা সাটিনের জুতো; পাত্‌লা সুকুমার হাত-দুটি—যদিও একটু রোদে পোড়া। তরুণী এক হাতে ওড়নার দুই খুঁট লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতেছে, আর এক হাতে একটা ফুর্‌ফুরে রুমাল ধরিয়া আছে—এই হাতের আঙ্গুলে রুপার আংটি ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে···মালোলা-শ্রেণীর রমণীদিগের অলঙ্কার-কৌটাস্থিত ইহাই সব চেয়ে দামী অলঙ্কার। তরুণীর জামার হাতায় কালো জেট্-পাথরের বোদাম ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। ইহাই তরুণীর সমগ্র পরিচ্ছদ—এই পরিচ্ছদ একেবারে নিছক্ স্পেনদেশীয়।

যে মুখ-খানি আট দিন ধরিয়া আন্দ্রের মনে অহর্নিশি জাগিতেছে সেই মধুর মুখখানি আন্দ্রে দেখিয়াই চিনিতে পারিল।

রঙ্গভূমির প্রবেশ-দ্বারে গাড়ী উপনীত হইবামাত্র, আন্দ্রে খুব দ্রুত চলিয়া একই সময়ে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল। কোচ্‌ম্যান গাড়ী হইতে নামিয়া ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, সুন্দরী উহার স্কন্ধের উপর অতি লঘুভাবে অঙ্গুলি-অগ্রভাগের ভর দিয়া গাড়ী হইতে নামিল; পক্ষান্তরে বৃদ্ধাকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিতে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাই হোক্, কোনপ্রকারে বৃদ্ধাও

নামিয়া পড়িল। এই দুই রমণী আসন গ্রহণের জন্য কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আন্দ্রে উহাদের পিছনে পিছনে চলিল।

সুরসিকা ভাগ্যলক্ষ্মী, আসনের নম্বরগুলি এমনভাবে বণ্টন করিয়াছিলেন যে, আন্দ্রের আসন দৈবক্রমে সেই তরুণীর আসনের পাশেই পড়িয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন

আত্মার প্রমাণ

আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বরাবরই তর্কাতর্কি হচ্ছে। কেউ বলছেন, "আত্মা আছে", কেউ বলছেন, "নেই"। কোন্ পক্ষের মত্ ঠিক, আমরা তা জানিনা; কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী মাসিক পত্রের সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী মিঃ আলফ্রেড পিয়ার্স এ-সম্বন্ধে যে কথাগুলি প্রকাশ করেছেন, আমরা এখানে তার কতৃক অংশ তুলে দিলুম ।ঃ—

"নীচে আমি যে ঘটনাগুলির বর্ণনা করেছি, তার দ্বারা আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেও আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমি কিছুই বল্‌তে চাই না। প্রেতেরা মানুষকে দেখা দিতে এবং জীবিতের সঙ্গে কথা কইতে পারে কিনা, আমার তা জানা নেই। কিন্তু এ-কথা আমি জানি যে, আমাদের মধ্যে এমন-কিছু একটা আছে—যাকে আত্মা বা ব্যক্তিত্ব বা আর যাই-ই ব'লে ডাকুন—যা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেও টিঁকে থাকতে পারে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে, যা অজর ও অমর।

প্রথম ব্যাপারটি ঘটেছিল আমার বালক-বয়সে। 'প্রিন্স কন্সর্ট'কে দেখবার জন্যে আমাকে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাজকুমার যখন সস্নেহে আমাকে মাথা চাপড়ে আদর করলেন, তখন বিষম উত্তেজনায় হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লুম, আমার জ্বর হোলো। এই জ্বরের সময়েই আচম্বিতে আমি জান্‌তে পারলুম যে, আমার যে দেহ বিছানার উপর পড়ে আছে, স্বচক্ষে তা দেখ্‌তে পাওয়া, আমার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়!

আমি স্বচক্ষে দেখলুম, আমার দেহ অজ্ঞান অবস্থায় শোয়ানো রয়েছে, আর ডাক্তার, 'নার্স' ও মা সকলেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমার সেবা-শুশ্রূষা করছেন।—এই বিচিত্র দৃশ্যটা খানিকক্ষণ ধ'রে আমি দর্শন করলুম—তারপরেই আবার অন্ধকার! তারপরে "দেহবিশিষ্ট আমি" আবার হারা

জ্ঞান ফিরে পেয়ে, অসুখ থেকে খুব চট্‌পট্‌ সেরে উঠলুম!

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বহু বৎসর পরে। সে-সময়ে আমার পরিবারের সকলেই 'স্কার্লেট ফিভারে'র দ্বারা আক্রান্ত। পাছে আমারও অসুখ হয়, সেই ভয়ে ডাক্তারের উপদেশে আমি স্থানান্তরে গিয়ে বাস করছিলুম।

হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় জেগে উঠে আমি দেখলুম যে, যদিও আমার দেহ শয্যাশায়ী রয়েছে, তবু কিন্তু আমি আর সে ঘরে নেই—আমি রয়েছি আমার নিজের বাড়ীতে, আমার স্ত্রীর ঘরে,—আমার বাসা থেকে প্রায় এক পোয়া তফাতে! আমি লক্ষ্য করলুম, আমার স্ত্রীর বিছানাটি অন্যদিকে সরিয়ে আনা হয়েছে—এ কথা আমি আগে জানতুম না। তারপর 'নার্স'কে সেই ঘরে ঢুকতে দেখলুম। সে এসে গ্যাস নিবিয়ে দিলে এবং আমার স্ত্রীর বিছানার পাশে বসে ছোট একটি 'স্পিরিট ষ্টোভ' জ্বাল্‌লে।

দিনের বেলায় ডাক্তার যখন আমার স্ত্রীর রোগের 'রিপোর্ট' দিতে এলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আমার স্ত্রীর বিছানাটি সরানো হয়েচে কেন?"

ডাক্তার বল্‌লেন, "কে তোমাকে এ-কথা বল্‌লে? তবে বুঝি তুমি বোকামি ক'রে আবার তোমার স্ত্রীর পাশে গিয়েছিলে? তাহ'লে আমি স্পষ্টই ব'লে রাখ্‌চি, তোমারও অসুখ হ'লে সেজন্যে আমি দায়ী—"

তাঁকে বাধা দিয়ে আমি বল্‌লুম, "সত্যি বল্‌চি, আমি একবারও সেখানে যাই-নি।" এই ব'লে আমি যা দেখেছি তার প্রত্যেক কথাটি তাঁর কাছে প্রকাশ কর্‌লুম। ডাক্তার তো অবাক! তিনি তখনি 'নার্স'কে ডেকে পাঠালেন। সেও আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। কারণ আমি যা দেখেছিলুম, সত্যিই তা ঘটেছিল।

কলমের প্রলাপ!

নবীন লেখকদের রচনায় একটু অসামঞ্জস্য দেখলেই সমালোচকেরা একেবারে অধীর হয়ে ওঠেন। এটা যে দোষ, তাতে আর সন্দেহ নেই—কিন্তু এ দোষে খালি নবীনরা নন,—প্রবীণ ও প্রতিভাবান্ লেখকদের রচনাতেও কলমের এমন অনেক প্রলাপ দেখা যায়। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে দেখি, বাঙালীর মেয়ে শান্তি দেশী কাপড় প'রেই ঘোড়ার দুদিকে দুই পা রেখে ঘোড়ার পিঠের উপরে চ'ড়ে বসেছে!

কিন্তু সেক্‌সপিয়ার অন্যান্য দিকের মতন এদিকেও বঙ্কিমচন্দ্রকে উচিয়ে গেছেন! তাঁর নাটকে কিং জন আর তাঁর ব্যারনরা রণক্ষেত্রে দস্তুরমতন কামান ব্যবহার করতে ছাড়েন-নি—যদিও কামানের আবিষ্কার হয়েছে তার ঢের পরে! তাঁর আর একখানি নাটকের পাত্র মুদ্রাযন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন—ছাপাখানা সৃষ্টি হবার ঠিক দুশো বৎসর আগে! "জুলিয়াস সীজারে" সেক্‌সপিয়ার "Striking clocks"এর কথা বলেছেন!

থ্যাকারে তাঁর বেভুল মনের আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়েছেন। লেডি কিউকে এক জায়গায় তিনি মেরেছেন তো বটেই, তার উপরে তিনি তাঁকে কবরে না পূরেও নিশ্চিন্ত হন-নি। কিন্তু শেষকালে দেখা যায়, এই লেডি কিউই দিব্যি জলজ্যান্ত বেঁচে-বর্ত্তে (প্রেতমূর্ত্তিতে নয়) রয়েছেন!

অ্যান্থনি থ্রোলোপ বর্ণনা করেছিলেন, "অ্যাণ্ডি স্কট মুখে চুরোট গুঁজে রাজপথে শীষ দিতে দিতে যাচ্ছে!"—অথচ একসঙ্গে শীষ দিতে ও চুরোট টান্‌তে পারে, দুনিয়ায় এমন মানুষ বোধ হয় একজনও নেই। সমালোচকরা যখন এটি দেখিয়ে দিলেন, থ্রোলোপ তখনও প্রথমে ভ্রম-স্বীকারে রাজি হন-নি। তারপর নিজেও চুরোট টান্‌তে টান্‌তে শীষ দিতে না পেরে, পরের সংস্করণে বেচারী অ্যাণ্ডি স্কটের মুখ থেকে চুরোটটি কেড়ে নেন!

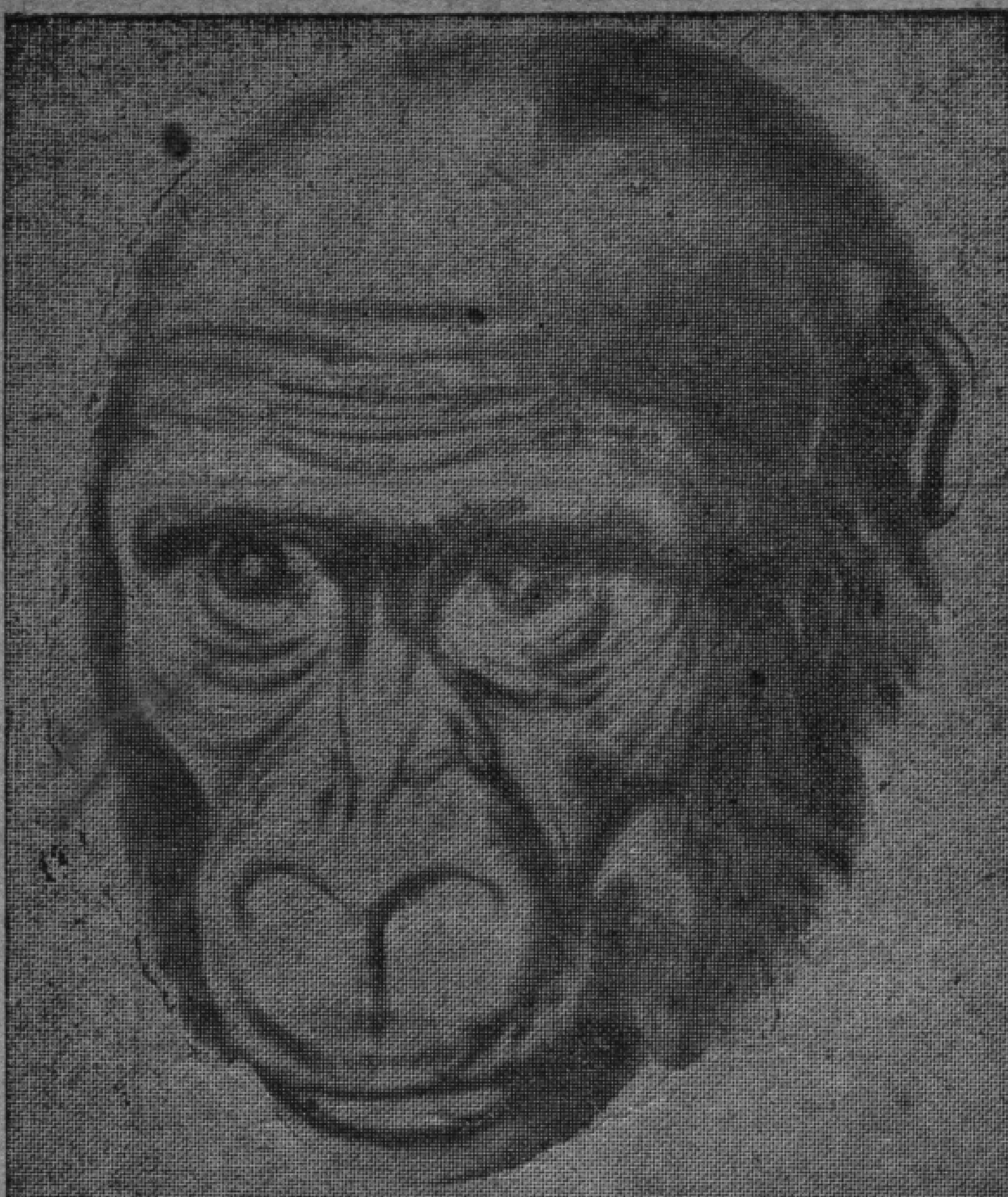
নারী-ভক্ত বনমানুষ

জন ডেনিয়েল একটি গরিলার নাম। সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে, বানর-জাতীয় জীবদের মধ্যে গরিলাই সব-চেয়ে বেশী হিংসুটে। পোষও সে সহজে মানে না। তাদের মেজাজ বড়ই খারাপ, তাই অনেক কষ্টে পোষ মানালেও তাকে বিশ্বাস করা চলে না—যে-কোন মুহূর্ত্তে চটে উঠে সে তার মনিবের ঘাড় মট্‌কে দিতে পারে। গরিলা একে দুর্ল্লভ, তার উপরে বন্দী-দশায় বেশী দিন বাঁচেও না। তাই এত-বড় আলিপুরের চিড়িয়াখানাতে একটিও গরিলা নেই।

কিন্তু ডেনিয়েল মানুষের পোষও মেনেছিল যথেষ্ট, বেঁচেও ছিল অনেক দিন। বিছানা ভিন্ন তার ঘুম হোতো না, আদর্শ ভদ্রলোকের মতন সে আদব-কায়দা বজায় রেখে টেবিলে ব'সে খানা খেতে পারৃত, তারপর কারুর মুখাপেক্ষা না ক'রেই এঁটো কাঁচের বাসনগুলো নিজের হাতেই ধুয়ে-মেজে তুলে রেখে দিত। কারুর হুকুমে সে এ-সব কাজ করৃত না, অধিকাংশ অভ্যাসই তার মানুষের কাছে দেখে-শেখা।

নেশার দিকে ডেনিয়েলের বেজায় ঝোঁক্ ছিল। রোজ অন্তত বার-তিনেক মদ টান্‌তে না পার্‌লে তার চল্‌ত না। মদ না পেলে তার শরীর খারাপ হয়ে যেত—মুখ ভার ক'রে বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে সে চুপচাপ ব'সে থাকৃত। বন্দীদশায় এই বিষাদের ভাবই গরিলাকে দীর্ঘজীবী করৃতে পারে না। তাই নিয়মিতরূপে তাকে মদ খেতে দেওয়া হোতো। মদের গেলাসে বোধ হয় সে তার সব দুঃখকে চুবিয়ে মেরে অন্যমনস্ক হয়ে থাকৃত! ডেনিয়েল বুঝে নিয়েছিল, বিমর্ষভাবে বসে থাকলেই সে মদ খেতে পাবে। তাই সে পুরোমাত্রার উপরেও আরো দু-এক পাত্র টান্‌বার মতলবে, মাঝে মাঝে চালাকি ক'রে বিমর্ষভাব ধারণ করৃত। কিন্তু তার পালক ডেনিয়েলের এ জোচ্চুরি অনায়াসেই ধ'রে ফেল্‌ত। লোকে জানে, গরিলারা আহার বিষয়ে চরম বৈষ্ণব—মাংস-টাংস স্পর্শ করে



ডেনিয়েল

না। কিন্তু ডেনিয়েল ছিল দেব-কুলে দৈত্যের মত, প্রতিদিন অন্তত পোয়াখানেক মাংস না পেলে তার খ্যাঁট্‌ যুৎসই হোতো না।

ডেনিয়েল খুব ভালোবাস্‌ত বরফ, আর খুব ঘৃণা কর্‌ত কডলিভার অয়েল। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কৌশলে ক'রে তাকে কড-লিভার খাওয়ানো হোতো। একটি পাত্রে খানিকটা কুল্‌পীর বরফের সঙ্গে কডলিভার অয়েল মিশিয়ে তার সাম্‌নে রেখে তার পালক বল্‌ত—"ডেনিয়েল, খবর্দ্দার! এটা তোমার খাবার নয়, তুমি যেন খেয়ে ফেলো না!" এই ব'লে সে চ'লে যেত। সে চোখের আড়াল হ'লেই কুল্‌পীর লোভ সাম্‌লাতে না পেরে, ডেনিয়েল চোঁ চোঁ ক'রে পাত্রটা খালি ক'রে ফেল্‌ত! পাছে পালক এসে বাধা দেয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি করার দরুণ ডেনিয়েল কুল্‌পীতে কডলিভারের গন্ধ পর্য্যন্ত ধর্‌তে পার্‌ত না।

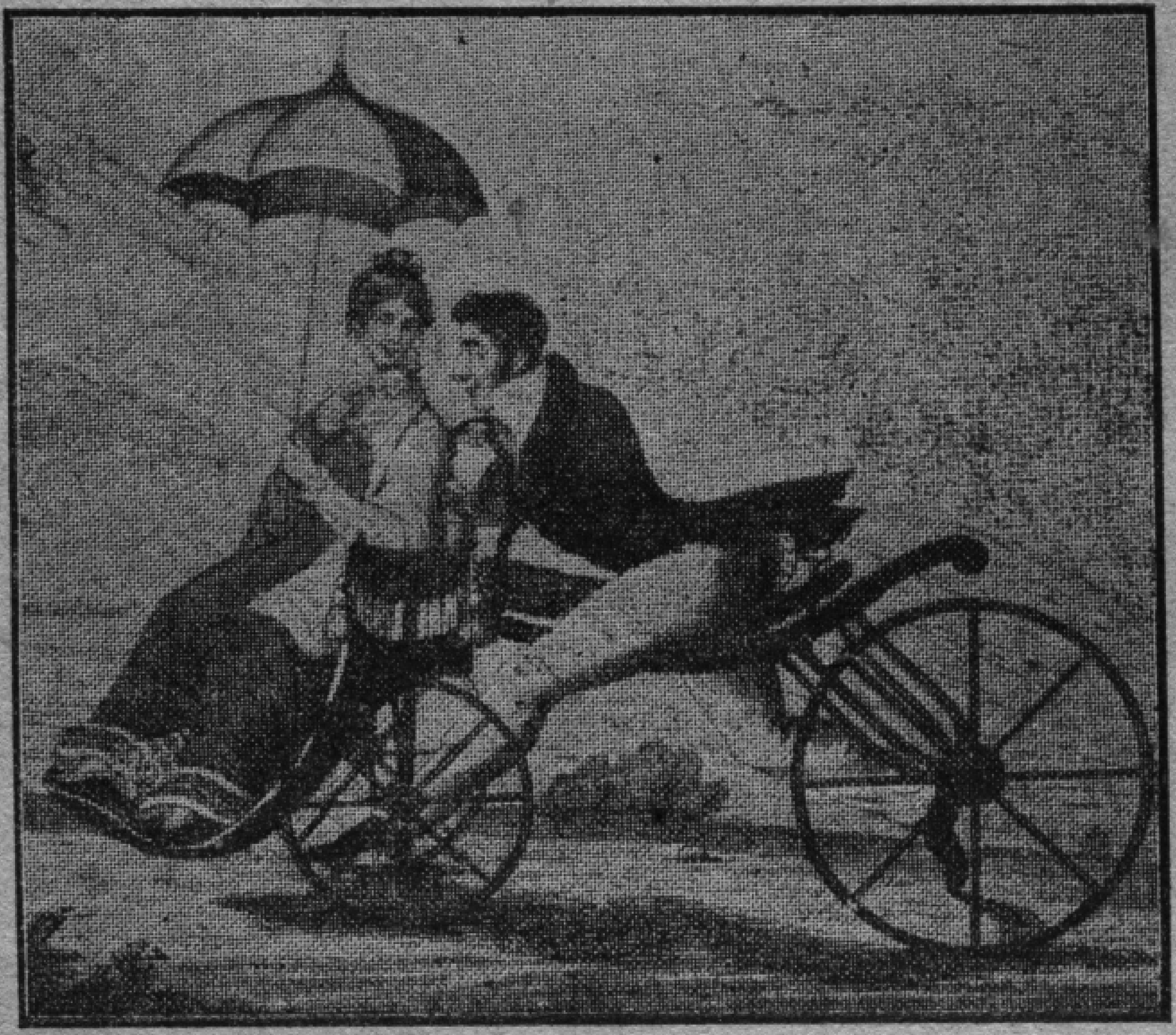
তিনবছর বয়সে মানুষের ছেলের যতটা ভাষা-জ্ঞান হয়, মানুষের ভাষায় ডেনিয়েলেরও ঠিক ততটাই দখল ছিল। ইংরেজীতে "ঐ কাগজের টুক্‌রোটা কুড়িয়ে আনো তো" এবং "অমন অসভ্য হোয়ো না" প্রভৃতি কথা সে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ত।

ডেনিয়েল সুন্দরী নারী পেলে পুরুষের দিকে ফিরেও তাকাতো না। তার খাঁচার সাম্‌নে যখন একদল পুরুষ এসে দাঁড়াত, তখন সে ভারি বিরক্তভাবে নিজের মনেই চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌ত, কিন্তু মেয়ে দেখ্‌লেই ডেনিয়েল-মহাশয় খুসিমুখে সেক্‌হ্যাণ্ড করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিত। সুন্দরীর হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে সুখী ও তৃপ্ত হয়ে ব'সে থাকত! ডেনিয়েলের চেহারা যখন বড়-সড়ো হয়ে উঠ্‌ল, তখন তাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। সেখানে গিয়ে মনের খেদে বেচারা মারা যায়।

মরবার সময়ে তার বয়স হয়েছিল মোটে সাড়ে-চার বছর। কিন্তু এই বয়সেই তার দেহের ওজন হয়েছিল দু'মণ এগারো সের। তার

বুকের মাপ ছিল আটচল্লিশ ইঞ্চি, গলা কুড়ি ইঞ্চি, উপর-হাত বারো ও সিকি ইঞ্চি, পায়ের ডিম এগারো ইঞ্চিরও বেশী। গায়ের জোরও ছিল তার অসাধারণ। তিনজন বলিষ্ঠ নাবিককে শিশু ডেনিয়েল, দড়ি ধ'রে এক হাতেই আনায়াসে হিড়্হিড়্ ক'রে টেনে আন্তে পার্ত!

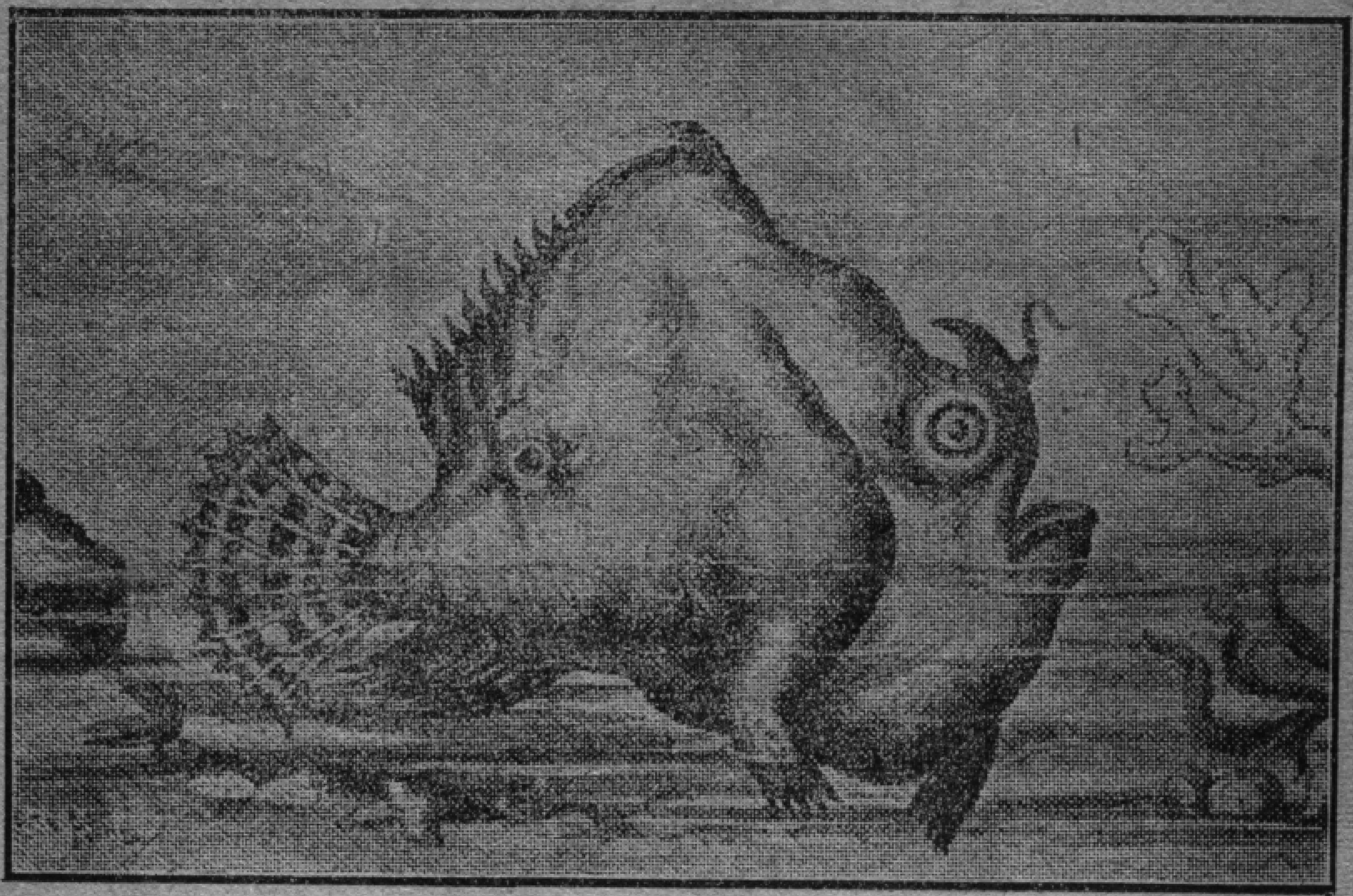
প্রথম সাইকেল বা 'প্রেমিকের গাড়ী'



'প্রেমিকের গাড়ী'

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারন ড্রেইস "দোলা-ঘোড়া" উদ্ভাবন করেন। বিলাতে তারপর দোলা-ঘোড়ায় চড়া একটা সামাজিক ঢং হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তারপর সাইকেলের চলন সুরু হয়। অবশ্য এ যুগের আর সে-যুগের সাইকেলে তফাৎ আছে আকাশ-পাতাল। প্রথম সাইকেল তৈরি হয়েছিল দুজনের বস্বার জন্যে। কোন রসিক সেই সাইকেলকে "প্রেমিকের গাড়ী" ব'লে বর্ণনা করেছেন। ছবিতে যে সাইকেলখানি দেখা যাচ্ছে, সে-যুগের সাইকেল অনেকটা এই রকমেরই ছিল। সাম্নের আসনে এক সুন্দরী বসে আছেন এবং পিছনে এক ভদ্রলোক গাড়ীখানিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন—আসলে তাঁকে ব'সে ব'সেই ছুটতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, খুব তেলা ও ভালো রাস্তাতেও এমন-একখানা ভারি গাড়ীকে ঠেলে নিয়ে যেতে রীতিমত কষ্টদায়ক কস্রতের দরকার হোতো। তবে কিনা সে মেহনৎ সুদে-আসলে উঠে যেত,—সাম্নের আসনের সুন্দরী যখন ভঙ্গীভরে গ্রীবাটি বেঁকিয়ে, মুখ ফিরিয়ে একটুখানি মধুর হাস্য উপহার দিতেন। ছবিতেও দেখুন, শ্রীমতী দুর্ল্লভ হাস্যের দ্বারা শ্রীমানকে কতটা উৎসাহিত ক'রে তুলছেন!

চলন্ত মাছ



ঠেঙো মাছ

প্রকৃতি যেমন আলোক ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, জীবরাজ্যেও তেম্‌নি তাঁর বিচিত্র খেয়ালে স্বরূপ-সুন্দরের সঙ্গে কত-না কিম্ভুত-কিমাকার প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে! মাছ তো অনেক-রকমের আছে, কিন্তু আপনারা চলন্ত মাছের অপরূপ চেহারা কখনো দেখেছেন কি? এর রং হল্‌দে, এখানে-ওখানে পিঙ্গল রঙের ছিটে কাটা ও ডোরা টানা। তার caspal হাড় (যে হাড়ে মানুষের কব্জি গড়ে) দুটো অসাধারণ দীর্ঘ, হাড়দুটোর ডগায় ছোট ছোট দুখানা কঠিন ও পেশী-বহুল ডানা—সে ডানার জোরও বড় কম নয়। এ-ডানাদুটোকে আসলে নখওয়ালা থাবা ছাড়া আর-কিছুই বলা যায় না। এ মাছ বিদেশী নয়, আমাদেরই প্রতিবেশী, কারণ ভারত-সাগরে তার বাস।

মান্ধাতার কাকাতুয়া

কাপ্তেন হার্ব্বার্ট সি, কেণ্ট একটি আশ্চর্য্য কাকাতুয়ার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "খাঁচার ভিতরে কাকাতুয়াটিকে যখন আমি প্রথম দেখ্‌লুম, তখন দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলুম। মস্ত-একটা পাখী, কিন্তু এমন ন্যাড়া যে, গায়ের কোথাও একটি পালক পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সে ক্রমাগত তার মাথা তুলছিল আর নামাচ্ছিল। আমাকে দেখে এই বেয়াড়া জীবটি "হা, হা, হা," ক'রে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "চোখের মাথা খাও! আমার পালক নেই—আমি উড়্‌তে পার্‌চি না!" আমি বল্‌লুম, "কি হে বুড়ো ইয়ার,



মান্ধাতার কাকাতুয়া

কাছ থেকে একে পেয়েছিলুম, তাঁর কাছেও এটি চল্লিশ বছরের চেয়েও বেশী কাল ছিল। জীব-বিজ্ঞানের পণ্ডিতরা একে পরখ ক'রে বলেছেন, এই কাকাতুয়ার বয়স একশো-চল্লিশ বছরের কাছাকাছি হবে।

এই কাকাতুয়ার চঞ্চু প্রতি-দশবৎসর অন্তর দু' ইঞ্চি ক'রে বাদ দিতে হয়। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, চঞ্চুর সবটা যদি বজায় থাক্‌ত, তা হ'লে আজ আঠারো ইঞ্চি লম্বা হয়ে উঠ্‌ত। এই কাকাতুয়া ঠিক মানুষের

ব্যাপার কি ?" সে বল্‌লে, "আমাকে একখানা বিস্কুট দাও ! দেখ্‌তে পাচ্ছ না আমি উড়্‌তে পার্‌চিনা—আমার পালক নেই ?" আমি তাকে খানকয়েক বিস্কুট দিয়ে খুসি করলুম।

যাঁর কাকাতুয়া, তিনি বল্‌লেন, "এই পাখীটি আমার কাছে আজ ত্রিশবৎসরের উপর থেকে আছে। আমি আবার যাঁর

মতই কথা কইতে শিখেছে,—যখন যে-রকম দরকার, ঠিক সেই রকম কথা সে কেউ না ব'লে দিলেও লাগ-সৈ জায়গায় ব্যবহার করতে পারে। আমি যখন তাকে দেখে হোটেল থেকে বিদায় নিলুম, সে তখন আবার হা হা ক'রে হেসে ব'লে উঠ্‌ল, "চোখের মাথা খাক্‌ ! বিলের টাকা না সুধেই পালাচ্চে !"

হাসির হদিস

মুখকে হাসিমাখা ক'রে তুল্‌তে এবং আতঙ্কের ভাব প্রকাশ কর্‌তে কতগুলো মাংসপেশীর দরকার হয় ? প্রায় একুশ জোড়া ! একখানি সুন্দর মুখ এগারোটি মাংসপেশীতে ভাঁজ-করা থাকে ; নাকের মাংসপেশীর সংখ্যা পাঁচ থেকে ছয় এবং চক্ষুপুটের চার জোড়া। মস্তিষ্কের ভিতরকার পদার্থের উপরেই মুখ-ভাবের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং

মস্তিষ্কের মধ্যে রোগ হ'লে মুখের ভাবও বদ্‌লে যায়। এইজন্যেই কথায় বলে, "মুখ হচ্ছে আত্মার দর্পণ।" রূপসীর নিটোল কপোল যখন হাসির ধাক্কায় টোল খেয়ে যায়, তখন আমরা বড়ই তারিফ করি! রূপের পূজারী কবিরা তো সেই রাঙা গালের ছোট্ট ছুটি কূপ ভরিয়ে তোল্‌বার জন্যে, কাব্য-রসের কলসীকে একেবারে উপুড় ক'রে দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন! কিন্তু আসলে সেই টোল-খাওয়া গাল রূপসীর একটি খুঁৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, কেবলমাত্র মংস-পেশীর বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতার দরুণই নর-নারীর গণ্ডদেশে টোলের জন্ম হয়!

প্রসাদ রায়।

আকাশ-যান

আকাশ-পর্য্যটনের যুগের সবে আরম্ভ হয়েছে। এ সম্বন্ধে যে সব নতুন অবিষ্কার হচ্ছে এবং হবে, সে সব আজকালকার উদ্ভাবিত আকাশ-যান ইত্যাদিকে নগণ্য ক'রে তুল্‌বে। আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু দেখ্‌বার কিছুই এখনো দেখা হয়নি বললে ভুল বলা হয় না। আমরা এতকাল আকাশে ওড়াকে বিস্ময়ান্বিত চোখে দেখেই এসেছি, এইবার আমাদেরও ওড়ার সময় এসেছে। এতে আমাদের জীবন কার্য্যতঃ দীর্ঘতর করে দেবে। এখন পথ চলতে যত সময়ের অপ-ব্যবহার হচ্ছে, তার অর্দ্ধেকও আর আবশ্যক হবে না। যে সময় বাঁচবে তা আমরা অন্য কাজে ব্যবহার কর্ত্তে পার্ব্ব। আজ যা মানুষের একটা জীবনে সম্ভব নয়, ঘণ্টায় একশো মাইল বেগের আকাশ-যানের কল্যাণে অদূর ভবিষ্য যুগে সেটা সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এরোপ্লেন চালানো আজ নব-উদ্ভাবিত মানুষী শক্তি-সম্পন্ন যন্ত্র দিয়ে সম্ভব হয়ে উঠেছে। এরোপ্লেন-চালককে এরোপ্লেনের উচ্চতা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়। কতকগুলো রঙিন্ আলো তাকে এখন কুয়াশার মধ্যে এ সম্বন্ধে সাহায্য কচ্ছে। এক এক রঙের আলো এক এক-স্তর উচ্চতায় জ্বলে উঠে চালককে উচ্চতা জানিয়ে দ্যায়।

আজকালকার এরোপ্লেন তাদের আকারেরও খুব পরিবর্ত্তন করে ফেল্‌ছে। বাতাসের মধ্যে দিয়ে দ্রুত বেগে চল্‌বার সময় যত কম বাতাসের বাধা অতিক্রম কর্ত্তে হয়, এরোপ্লেনের ততই সুবিধা। আজকাল তাই মনোপ্লেন বাইপ্লেনের স্থান অধিকার কচ্ছে।

যুদ্ধের মধ্যে এবং পরে যে-সব পরীক্ষা হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশ-যানের পক্ষে জলযানের মত তার নিজের স্থানে ভেসে থাকাই সহজ—তার বারে বারে মাটীতে নামবার দরকার নেই। শীঘ্রই জাহাজে চড়ার মত এরোপ্লেনে চড়বার উপযুক্ত খুব উঁচু প্লাটফরম তৈরী হ'বে। সেই আকাশচুম্বী প্লাটফরমে ওঠবার জন্য লিফ্‌ট্ থাক্‌বে। সব-উপরে একটা ঢাকা-ঘর থাক্‌বে। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে ঢাকাঢোকা পথের সাহায্যে যাত্রীরা এরোপ্লেনে চড়ে বস্‌বে। অনেক উঁচু বলে অনেকে ভয় করেন। কিন্তু এগুলো খুব ঢাকাঢোকা দিয়ে তৈরী হবে—সেইজন্য কারো

মাথা ঘুরে যাবার ভয় নেই। অনেকে আশা কচ্ছেন, খুবই শীঘ্র লণ্ডন থেকে আমেরিকা যাবার এই রকম পথ তৈরী হবে। তাতে অ্যাটলান্টিক পার হতে লাগ্‌বে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা।

আকাশ-যানের আর একটা বিস্ময়জনক আবিষ্কারের চেষ্টা চল্‌ছে। অনেকে পেট্রোলের এঞ্জিনের বদলে ইলেক্‌ট্রিক শক্তির সাহায্যে আকাশ-যান চালানোর আশা কচ্ছেন। এর অসুবিধে হচ্ছে এই যে, ইলেক্‌ট্রিসিটি বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সম্প্রতি তারহীন টেলিফোনের পরীক্ষায় এই স্থির হয়েছে যে, আকাশে তারহীন বৈদ্যুতিক প্রবাহের একটা পথ তৈরী হওয়া সম্ভব। আশা করা যাচ্ছে যে, বোধ হয় গুরু-পেট্রোল এঞ্জিনের স্থান শীঘ্রই লঘু ইলেক্ট্রিক মোটরে অধিকার কর্ব্বে। কেউ কেউ আবার তার-হীন ইলেক্‌ট্রিক-প্রবাহে চালিত চালক-হীন এরোপ্লেন চালাবার কল্পনা কচ্ছেন। বোধ হয়, ভবিষ্যতে এরোপ্লেনেরা নিজে নিজেই তাদের গন্তব্য পথে যাত্রা কর্ব্বে।

এই বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে এমন এক যুগ আস্‌বে, যখন হয়ত সে যুগের লোকেরা এই বিংশ শতাব্দীকেও ছেলেখেলার যুগ বলে মনে করবে।

পাখীদের দাঁত

পৃথিবীর প্রথম যুগে পাখীদের প্রথম উদ্ভবের সময় যে তাদের দাঁত ছিল, তার যে দুটো নমুনা পাওয়া গিয়েছে, তার প্রথমটা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি পশ্চিম ক্যানসাসে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেটা ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে রাখা হয়েছে।

ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মের প্রোফেসার এইচ, টী, মার্টিনের মতে, দ্বিতীয়টি প্রায় আড়াই কোটি বছর আগের যুগের—সে যুগকে খড়ি-মাটির যুগ বলা হয়। এর প্রস্তরীভূত কঙ্কালে দশটা দাঁত আছে। এটা পাঁচ ফুট লম্বা। এর ছোট্ট-একটু লেজ ছিল, কিন্তু পাখা ছিল না। এ ছিল জলজ পাখী। আজকালকার পেঙ্গুইনের সঙ্গে এর অনেকটা মিল দেখা যায়।

ঘুম-পাড়ানি কল

একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক একটা ঘুমের কল আবিষ্কার করেছেন। কতকগুলো ছোট্ট ছোট্ট ব্যাটারী থেকে শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করে এই কল মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ আমাদের স্নায়ুকে শিথিল করে এমন একটা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে, যাতে সকলের পক্ষেই অতি সহজে ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব হবে।

যাঁদের পক্ষে ঘুম খুব সুলভ নয়, তাঁদের কাছে এটা একটা মস্ত সুখবর।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

বর্ষায়

শ্রাবণ-দিনের শেষে
বরষা নেমেছে এসে
সন্ধ্যার অঞ্চল ধরি' ধরণীর স্তব্ধ গৃহতলে
মৃদুপদে মেঘাবগুণ্ঠিতা। রবি গেছে অস্তাচলে
দণ্ড চারি আগে।
ধরার চেতনক্লান্ত আঁখিপুটে ধীরে এসে লাগে
ঘুমের পরশখানি গুরুভার অবশ অলস।
তরুণীরা ফিরে গেছে কলরবে ভরিয়া কলস
ঘাট হতে; আম্রবন-ছায়ে
সে পদ-পরশ-স্মৃতি বুকটিতে জড়ায়ে জড়ায়ে
পড়ে আছে পথখানি আবেশ-নিঃসাড় স্পন্দহারা
আপনারি অস্ফুট আলোয়।—সহসা নামিল ধারা
বিপুল ঝর্ঝরে। সুপ্তা ধরণীর তন্দ্রা গেল টুটে
বাঁধা পড়ে' একেবারে আকাশের কোটি বাহুপুটে,
আঁখি না মেলিতে আঁখি ছেয়ে গেল চুম্বনে চুম্বনে।

আম্‌লকি বনে
গেয়ে উঠিল না পাখী, কলাপ বিস্তারি'
শিখীদল দাঁড়াল না পথের দুধারে সারি সারি
পুরচারিকার মতো পুষ্পঅর্ঘ্যবাহী। বকশ্রেণী
পারিজাত-হার ত'র কাজল জলদবেণী
জড়ায়ে দিল না রচি'।—কিছু কোথা নাহি,
নয়ন-সলিলে অবগাহি'
ধরণী নিরন্ধ্র এই অন্ধকার মহাশূন্যে চায়;
আজি এ নিবিড় বরষায়
বরষা সে নিজে নাহি!
তৃণপুঞ্জ ওঠে মর্ম্মরিয়া,
ভূমিতল হতে শ্বসি' ওঠে নিখিলের হিয়া,

'কে গো, কোথা তুমি? তব শীতল পরশ
রোমকূপে রোমকূপে সঞ্চারিল অমৃতসরস
প্রীতিরসধারা।
বাসর শিয়রে মোর নিবিয়াছে সব ক'টি তারা।
ছায়াপথ-পানে চেয়ে নিশিনিশি প্রহর-যাপন
পলকে করিয়া সমাপন
কে এলে অজানা হতে একেবারে হৃদয়ের পারে;
খোল গো, গুণ্ঠন খোল, লুকায়ে রেখো না আপনারে
হে নিষ্ঠুর!'

সাড়া তবু নাহি দিল কেহ,
একটি বিরাট বোবা স্নেহ
আরো সুনিবিড় করে বুক তারে লইল আবরি'
হিয়ার মন্দিরে বন্দী করি' অন্ধ করি'।
ক্ষণেক রহে সে অচেতন
সেই আলিঙ্গন পাশে সুখাবেশে মৃতের মতন,
তারপর ধৈর্য্য টুটে। ললাট-বহ্নিতে জ্বেলে বাতি
গগনেরে চিরি' চিরি' খুঁজিয়া করে
সে পাতিপাতি,
বজ্র হয়ে টলে পড়ে ধরাতলে ব্যর্থ মূর্চ্ছাহত।
উন্মাদের মত
উতলা বাতাসে যায় যথা তথা ছুটি'।
মুঠি মুঠি
বনের বিক্ষোভে ছেঁড়ে আপনার চুল!

দুখানি দোদুল
অশ্রুধারা আঁখিকোণে কখন্ জেগেছে নাহি জানি,
বাহিরের এ বরষাখানি

লুকায়ে নীরব-পায়ে পশিয়াছে আমারো এ গেহে,
তেমনি বিরাট বোবা স্নেহে
আমারেও ঘিরেছে কে ! এককোঁটা
মোর আঁখিজল
বুকে তার ঘনায়েছে বেদনা-বিহ্বল
কোটি বরষার মত।—কেঁপে ওঠে বুক !
অচেনা সর্ব্বস্ব ওগো খোল খোল
খোল তুমি মুখ।
তুমি জানো, আমি ভালো জানি,
তুমি কতখানি মোর—আমি যে তোমার কতখানি,
কেন তবে মিছে ছল ? এত কাছে, তুমি
মোর ইহ-পরকাল তব কেশপাশে চাবি
তোমারে দেখিয়া লই অন্তরের সঞ্চিত আ

আকাশের, মনের কালোয়
মিশে হয় একাকার। আঁখি মুছে চাহি সব ঠাঁই :
বাহিরে বরষা ঝরে, একা ঘরে আমি আছি,—
সে কোথাও নাই !

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

৩

সুড়ঙ্গ পথ ঃ—

আমি কখনো কখনো ভাবি, কাঞ্চীপুরের রাজপুত্রের মাথায় এমন দুর্ব্বুদ্ধি জাগল কি করে যাতে রাজার ছেলে রাজপুত্রের গৌরব ভুলে চোরের মতো সুড়ঙ্গপথে রাজকন্যা লাভ করাটাই পরম পুরুষার্থ বলে মনে করতে পারলেন। আর ওপথে যে রাজকন্যা লাভ হয় সে রাজকন্যা যে লাভ করার যোগ্য নয়, এই সহজ কথাটাও মনে উদয় হলোনা। ভাটমুখে তেমন রূপগুণের বর্ণনা শুনলে যে "মনের দ্বার" "খুলে যায়" এবং কবাট লাগে না সেকথা জানি। কিন্তু তাই বলে সেই খোলাদ্বার দিয়ে যুগ যুগান্তের শিক্ষা-সংস্কার মর্য্যাদা-জ্ঞান এমন উধাও হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে এইটেই আশ্চর্য্য। যাই হোক, মা কালীর বিশেষ বরে বিদ্যালাভটা যদিও কোনপ্রকারে ঘটেছিল কিন্তু কোটালের হাতে নাকালের মাত্রাটাও এমন চরমে উঠেছিল যে ভারত-চন্দ্রকেও তীব্র বেদনাভরে বলে উঠতে হয়েছিল,—

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥"

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কত চাঁদই যে রাহুর আহার হয়েছে সে কথা মনে হলে ক্ষোভে লজ্জায় ধিক্কারে প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠে। কি সব সোণার চাঁদ ছেলে ! ভগবান আপনার হাতে তাদের কপালে মনুষ্য-মর্য্যাদার রাজটীকে পরিয়েই পাঠিয়ে-ছিলেন, কিন্তু গ্রহের ফেরে দক্ষিণ মশানে চোরের মতো তাদের বলি হতে হলো।

আজ যদি তারা থাকতো তাহলে এই একান্ত প্রয়োজনের দিনে কেবলমাত্র চিত্তরঞ্জনকে সম্বল করে ভারতের অ প্রদেশের নিকট লজ্জায় মাথা হেঁট

থাকতে হতোনা আমি এই সব তরুণ যুবকদের কোনও দোষ দিইনে। আমাদের কবিরা লেখকেরা বক্তারা আমাদের এই কলঙ্কিত লাঞ্ছিত দাসজীবনের লজ্জা ও অপমান সম্বন্ধে তাঁদের অনুভূতিকে একান্ত উদগ্ররূপে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁদের পক্ষে জীবনটা এক অখণ্ড ধিক্কারের মতোই বোধ হচ্ছিল, নিশ্বাস নেওয়ার বাতাসটুকু পর্য্যন্ত বিষাক্ত বলে ঠেকেছিল। তারা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করছিল স্বাধীনতা ভিন্ন জীবনটার এমন কোনো মূল্যই থাকতে পারে না যে, সেটাকে একটা ছেঁড়া দুর্গন্ধ ময়লা ন্যাকড়ার পুঁটলির মতো পরমায়ুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু, এই তাদের পণ। তারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করার জন্যই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে ত্যাগ পরম সম্পদের মূল্য, যে মৃত্যু অমৃতের সিংহদ্বার, যে দুঃখ বিধাতার চিরন্তন পাকা খাতায় ঋণের ঘরে জমা হয়ে ওঠে তার কথা তাদের কেউ শোনালেন না। দেশের নেতারা দেশ জুড়ে উত্তেজনার খোলা ভাটি খুলে দিলেন এবং যথাসম্ভব দূরে থেকে, তাদের উন্মত্ত মৃত্যু-অভিসারের জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। সেই ঘোর দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক বেদনায় দীর্ণকণ্ঠে মরণযাত্রী দেশবাসীদিগকে আহ্বান করলেন, সেই চিরদিনের জীবনের পথে, যে পথের শিয়রে অনন্তকালের—ধ্রুব-তারা আপনার মৃদুস্নিগ্ধ শান্তজ্যোতি বিকীরণ করছে। কিন্তু মজ্জমান ব্যক্তি যেমন মরণের নেশায় বিভোর হয়ে উদ্ধারকারীকে আঁচড়ে পিঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে, সমস্ত দেশ তেমনি রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করতে প্রবৃত্ত হলো। রবীন্দ্রনাথ কবি ও ঋষি। তিনি যদি মহাত্মা গান্ধীর মত কর্ম্মীও হতেন তাহলে বাংলা দেশের ইতিহাসের ধারা অন্যপথে বইতো, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মনোভাবের বিশ্লেষণ।—এই আঁধার পথে রসাতল-যাত্রা সম্বন্ধে সকল বৃত্তান্ত আমার জানা নেই, থাকতেও পারে না। ক্ষণিক বিদ্যুতের চকিত আলোকে যেটুকু চোখে পড়েছে, তাই থেকে যে ধারণা জন্মেছে সেইটেই খুলে বলবো। যে মনোভাবের দরুণ এই আত্মঘাতের পথটাই প্রশস্ত বলে মনে হয়েছিল, উপরে তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেছি। আর একটু খুলে বলা দরকার। এই মনোভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখলে নিম্নলিখিত কয়েকটা জিনিষ পাওয়া যায়। (১) দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা লিপ্সা। (২) ইংরেজের প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ। (৩) একান্ত অধৈর্য্য। (৪) রাজনৈতিক ব্যাপারটাকে ধর্ম্ম হতে বিশ্লিষ্ট করে দেখার প্রচলিত কুসংস্কার। (৫) বাহুবল ছাড়া স্বাধীনতা লাভের অন্য উপায় নাই এই বিশ্বাস। (৬) ইয়ুরোপের প্রতি দাস-মনোভাব বশতঃ এনার্কিষ্ট ও নিহিলিষ্টদের কার্য্য-কলাপের প্রতি অন্ধ অনুরাগ। প্রথম চারটের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। শেষ দুটো সম্বন্ধে একটু খুলে বলা দরকার।

মহাপুরুষেরা যদিও প্রাচীন কাল হতে ধর্ম্মবলের মহিমা কীর্ত্তন করে আসছেন,

মানুষের মনে সে কথার ছাপ তেমন ভাবে পড়েনি। মানুষ মুখে যাই বলুক, আদিম জানোয়ারী সংস্কার-বশে নখ-দন্তের বলের উপরই আসল আস্থা রাখে। যার নখদন্তের বহর ও ধার যত বেশী তাকেই সে তত বড় বলে ভাবে এবং শ্রদ্ধাও সম্ভবতঃ করে থাকে। কাজেই নখদন্তের ব্যবহার দ্বারাই যে ইংরাজকে তাড়িয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে হবে সে সম্বন্ধে এই সব যুবকদের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নখদন্তের ধারের পরীক্ষায় জয়লাভ করা পাগলের পক্ষেও স্বপ্ন। কাজেই কোনও একটা ফন্দীর দরকার। ফন্দীটাও ইয়ুরোপের কল্যাণে জানতে বাকী রইল না। সেখানকার নানা দেশের নিহিলিষ্ট ও এনার্কিষ্ট সম্প্রদায় কিরূপ নব নব উৎপাতের সৃষ্টি ক'রে সেখানকার বড় বড় গবর্ণমেণ্টগুলোকে পর্য্যন্ত কিরূপ বিধ্বস্ত করে তুলেছে—সেই সব বাহাদুরির কাহিনী নিয়ে একটা রীতিমত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেইটেই হবে এঁদের বেদ-কোরাণ। তার উপর জুটলেন গীতা। কারণ, ভারতবর্ষীয়ের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ধাতে হত্যা—বিশেষতঃ গুপ্তহত্যা সইবেনা, এ ভয়টা গোড়া হতেই তাঁদের দস্তুরমতো ভাবিয়ে তুলল। ওই ধাতটার একটু পরিবর্ত্তন করা চাই-ই। ধাত-পরিবর্ত্তন বিষয় গীতা যে আমোঘ দৈব-ঔষধ, এটা ভারতবর্ষের বহুযুগের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। "ক্ষুদ্রহৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠপরন্তপ" গীতার এই মহাবাণী, কত অনার্য্যজুষ্টম স্বর্গম কীর্ত্তিকর ক্লৈব্য দূর করে, মানুষকে সোজা স্বর্গের আলোর পানে দাঁড় করিয়েছে, কত কার্পণ্য-দোষোপহত স্বভাব, ধর্ম্মসংমূঢ় চেতাকে নিশ্চিত শ্রেয়ের পথ দেখিয়ে দিয়েছে, কে তার হিসাব করবে? কিন্তু সকলেই জানেন অমৃতও মহাবিষ হয়ে উঠতে পারে প্রয়োগের দোষে। গীতার মর্ম্মগত মহাসত্যের অখণ্ড ঐক্য হতে বিচ্ছিন্ন করে গোটাকতক শ্লোককে এঁরা মানুষের স্বাভাবিক দয়া-মায়া-মমতার সংহার সাধনের কাজে লাগিয়ে দিলেন। তাঁরা নিজেদের মনকে বোঝাতে লাগলেন, "হত্যা! সেটা আর এমন বেশী কি? সে আত্মাকে পুরানো ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়ে নতুন কাপড় পরানো।" যাহোক নতুন কাপড় পরানোর কাজটা তেমন জোরে না হোক দিন-কতক একরূপ মন্দ চললনা। আর সেটা গীতার নামেই চলতে লাগল। একথা তাঁরা ভুলে গেলেন, গীতা মানুষকে যা করতে চায় তা "নির্ম্মম" বটে কিন্তু "ঘাতক" নয়, কঠিন বটে কিন্তু নিষ্ঠুর নয়। সে মানুষকে করতে চায় ভক্ত, যার প্রধান লক্ষণ "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এবচ

নির্ম্মমো নিরহঙ্কার সমদুঃখসুখ ক্ষমী।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ইত্যাদি।

এইরূপে মনটাকে শান্ বেঁধে নিয়ে তাঁরা কাজ সুরু ক'রে দিলেন। কাজটা এক কথায় বলতে গেলে মৌচাক-ভেঙে মধু খাওয়ার কাজ। অর্থাৎ লোকে যেমন ধোঁয়া দিয়ে বা অন্যরূপ উৎপাত ক'রে মৌমাছি তাড়িয়ে চাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করে, সেই ভাবে ইংরেজকে তাড়িয়ে স্বাধীনতার মধু পান করতে হবে। এই উৎপাতের সমস্ত অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ খুঁটীনাটির আলোচনা করার প্রয়োজন দেখি না। সেটা প্রীতিকরও নয়। মোটা-মুটি বলতে গেলে এইরূপ প্ল্যান ঠিক করা হোলো। সমস্ত দেশ জুড়ে গুপ্ত সমিতির জাল বুনতে হবে। সেখানে হত্যা-লুণ্ঠনাদি উৎপাতের সলা-পরামর্শ স্থির হবে। বিদেশ হতে অস্ত্রশস্ত্রাদির আমদানী করতে হবে। ঝোপে-জঙ্গলে গোপনে কুচকাওয়াজ ক'রে যুদ্ধ-বিদ্যাটা কতক আয়ত্ত ক'রে নিতে হবে। টাকা কড়ির জন্য বিশেষ বেগ পেতে হবে না কারণ মায়ের কাজে টাকা খরচ পরম পুণ্যের কাজ। সে পুণ্য কেউ যদি স্বেচ্ছায় লাভ করতে না চায় তাকে জোর ক'রে গছিয়ে দিতে হবে। অস্ত্রশস্ত্র কিছু যোগাড় হয়ে যুদ্ধ-বিদ্যাটা আয়ত্ত হলেই এক সময়ে নানাস্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের অবতারণা করতে হবে। এইরূপে কিছুকাল চালাতে পারলেই শাসন-চক্রটা একেবারে অচল হয়ে পড়বে এবং কাজে কাজেই ইংরেজের পক্ষে এদেশে রাজত্ব করার মায়া কাটানো ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। ইংরেজ চলে গেলেই বাস্ আর কি—একেবার হয় স্বাধীনতার চতুর্ব্বর্গ ফল হাতে হাতে প্রাপ্তি হবে।

এ পাথর ধর্ম্মাধর্ম্ম ভালো-মন্দর বিষয় আলো-চনা করার প্রয়োজন নাই। কারণ, সেটাতো একেবারে আকাশের আলোর মত দেদীপ্যমান। এযে একেবারে খাঁটী রসাতল-যাত্রার পথ সে সম্বন্ধে এ পথের যাত্রীদেরও বোধ হয় কোনও সন্দেহ ছিল না। তাঁদের চাল-চলন ও সে সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বহর দেখে সেটা বেশ বোঝা যায়। তবে একথা ঠিক কোনও রকমে তাঁদের মনে এ বিশ্বাস যে স্থান পেয়েছিল যে, রসাতলের চরম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দা ঠেলে ফেললেই একেবারে বৈকুণ্ঠ-ধামে মা-লক্ষ্মীর পায়ের পদ্মফুলটির ঠিক তলায় গিয়ে পৌঁছান যাবে।

ইংরেজকে তাড়াবার পক্ষে এই পথটিই সব চেয়ে সোজা ও উপযোগী কিনা তা আমি জানিনে। জানার যে বিশেষ কিছু দরকার আছে তাও মনে করিনে। কারণ এটা আমি ঠিক জানি যে, আমাদের অন্তরের অধীনতা দূর না হ'লে ইংরেজ আইনের দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা দিতে পারে না, একথা যেমন সত্য, আমাদের অন্তরে স্বাধীনতার পূর্ণ উপলব্ধি লাভ হ'লে, তারা আইনের দ্বারা একদিনও আমাদের অধীন করে রাখতে পারবে না, এ-কথাও তেমনি সত্য। গুটিপোকা পূর্ণ-পরিণতি লাভ করলেই প্রজা-পতি হয়ে মুক্ত আলো বায়ুর নিমন্ত্রণ-রক্ষা করলেই, কোষের আবরণ যতই কঠিন হোক তাকে আর আটকে রাখতে পারবে না। কিন্তু তাই ব'লে আবরণটা বিদীর্ণ ক'রে দিলেই পূর্ণ-পরিণত প্রজাপতির মুক্ত আলোকে বিহার-লীলা সুরু হবে, এমন আশা করলে আশাভঙ্গের দুঃখ আমাদের কপালে সুনিশ্চিত।

ইংরেজ তাড়াবার পথ এটা হোক না হোক, এটা যে স্বাধীনতা লাভের পথ নয় একথা সুনিশ্চিত। কারণ, স্বাধীনতার পথ মুক্ত উদার আলোকে প্রসারিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার পথ যে পথে, আবালবৃদ্ধবনিতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেই বিরাট রথ টেনে নিয়ে যেতে পারে। এই যে কোটি নরনারীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরমধৈর্য্যে একান্ত নিষ্ঠায়

বৃষ্টিবাদল আলো-আঁধারে ঐ মহারথ টেনে নিয়ে যাওয়া, এতেই দেশাত্মবোধের জন্ম। ভৌগোলিক নামের একত্ব হতে নয়। এই দেশাত্মবোধ যতই ব্যাপক ও পরিণত হয়ে উঠবে, আমরা অন্তরের মধ্যে ততই বললাভ করবো এবং আমাদের যুগযুগান্ত সঞ্চিত যে পাপ অধীনতার মূর্ত্তি ধরে আমাদের এতদিন পদদলিত ক'রে আসছে তার প্রভাব ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসবে। কিন্তু উৎপাতের এই গোপন সুড়ঙ্গপথে সমস্ত দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বিকাশের অবকাশ কোথায়? কোন্ লক্ষ্য, কোন ব্রত, কোন সাধন-অনুষ্ঠান, সাধারণ সুখ-দুঃখ, সফলতা-বিফলতার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাদের মিলনের অটুট বাঁধনে বাঁধনে? ক্ষুধিতের অন্নের সংস্থান নয়, পীড়িতের আরোগ্যদান নয়, আর্ত্তের ভয়ত্রাণ নয়, লাঞ্ছিতের অপমান-মোচন নয়, অজ্ঞের শিক্ষা-বিধান নয়, কেবলমাত্র খুন ও লুঠের গোপন ষড়যন্ত্র, আমাদের স্বার্থমগ্ন সংকীর্ণ অনুভূতিকে তিরিশ কোটির সুখদুঃখের বিশাল ক্ষেত্রে প্রসারিত ক'রে দেবে? তিরিশ কোটি লোকের পক্ষে এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ার আশা করা, দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত উৎকট কল্পনার পক্ষেও অসম্ভব! তারাও সেটা ভালরকমের জানতো, সেইজন্যই গোপনতার জন্য তাদের এমন প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। তাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গদলের লোকগুলি ছাড়া সমস্ত দেশটাকে তারা সন্দেহের চোখেই দেখত। যাদের উপর এত সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাদের স্বাধীনতা দান করা ইংরেজের পক্ষেও যেমন অসম্ভব, এদেশের লোকের পক্ষেও তেমনি। সন্দেহ ও অবিশ্বাস যে পথের অবশ্যম্ভাবী ফল, সে পথ যে স্বাধীনতার পথ হতেই পারেনা, সে কথা কোন প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখেনা।

তারপর আর একটী কথা আছে। আমি পূর্ব্বে বলেছি স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না, অনুগ্রহ করেও নয় জোর করেও নয়। ইংরেজ চান অনুগ্রহ ক'রে দিতে, আর এঁরা চান জোর ক'রে। যারা স্বাধীনতা ভোগ করবে দুই পক্ষই তাদের এমন নগণ্য মনে করেন যে, তাদের মতামতটা হিসাবের মধ্যে আনা বাহুল্য বিবেচনা করেন। এঁদের উন্মার্গগামী পেটরিয়টিস্‌মের রথচক্রতলে সমস্ত দেশের লোকের স্বাধীনতাকে দলিত পিষ্ট ক'রে এঁরা ছুটেছিলেন সমস্ত দেশের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জন কর্‌তে। অকস্মাৎ পাষাণ প্রাচীরের সংঘাতে রথখানি চুরমার হয়ে তাঁদের রথযাত্রা কিরূপ অপঘাতে অবসান লাভ করে, সে কথা সকলেই জানেন। সেরূপ না হ'লেও আসল ফললাভ বিষয়ে যে বেশী কিছু তারতম্য হতো, সেরূপ মনে করার কোনও কারণ নাই। এঁদের স্বাধীনতার সঙ্গে কোনও দিন সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটেনি। যা কিছু পরিচয় হয়েছিল সে কেবল ইংরেজী কেতাবের ছবির মারফতে। সুতরাং আসল স্বাধীনতাকে দেখলেও চিনতে পারতেন না। যাকে রথে চাপিয়ে দেশে নিয়ে এসে রাজ-সিংহাসনে বসাতেন, সে হয় তো স্বাধীনতার মুখোস-পরা একটা প্রকাণ্ড জুলুম। স্বাধীনতার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় থাকলে অপরের স্বাধীনতাকে এমন অনায়াসে পদদলিত ক'রে যেতে পারতেন না। এঁদের স্বাধীনতার সঙ্গে যে কোনও দিনই পরিচয় হয়নি তার আর একটী প্রমাণ, এঁদের ঐকান্তিক গোপনের

প্রয়াস ও আলোকে-ভীরুতা। ও-জিনিষটাই এমনি যে মনে প্রাণে কর্ম্মে ওর সাক্ষাৎ উপলব্ধি হ'লে,উপনিষদের ঋষিদের মতো উদার অকুণ্ঠিত কণ্ঠে আপনিই উদ্গীরিত হয়ে উঠবে

"শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রা।"

স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না, সকলকে নিজে অর্জ্জন করে নিতে হয় একথা যেমন সত্য; স্বাধীনতার উদারবাণী প্রাণ হ'তে প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে ভয় মোহ অবসাদ দৈন্য দূর ক'রে তাকে পরম উপলব্ধির যোগ্য ক'রে তুলে, একথাও তেমনি সত্য। কিন্তু সে অনুষ্ঠান ইংরেজের ভয়ে ও দেশবাসীর প্রতি সন্দেহ-বশে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত কুণ্ঠিত ও আত্মগোপনশীল, তার মধ্যে এই উদার অকুণ্ঠিত প্রেরণা আশা করা বাতুলতা মাত্র।

ইংরেজ তাড়ানোঃ—এঁরা ইংরেজ-তাড়ানোটাকেই সর্ব্বপ্রধান—এমন কি একমাত্র কাজ ব'লে মনে করেন, এতেই প্রমাণ হয় 'স্বরাজে'র প্রকৃত ধারণাটা পর্য্যন্ত এঁদের নাই। ইংরেজ চলে গেলেই কি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতিস্থাপন হবে? অস্পৃশ্য জাতীয়েরা মাথা তুলে উঠবে? শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি বাণিজ্য শিল্পের সুব্যবস্থা আপনিই গড়ে উঠবে? দেশাত্মবোধ আপনিই জেগে উঠবে? পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহের বাঁধন নিজে হ'তেই খসে পড়বে? আসল কথা, স্বরাজের পাঁচ ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধে বেড়ে থালায় সাজিয়ে কেউ কোথাও অপেক্ষা ক'রে বসে নাই যে, পথটা কোনও রূপে মাড়িয়ে যেতে পারলেই তার পর ক্রমাগত চব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের ভূরি-ভোজনের পালা চলতে থাকবে। আমাদের প্রতি-পদক্ষেপে স্বরাজ গড়ে গড়েই চলতে হবে এবং এই গড়নের কোনও দিনই শেষ হবে না। কারণ মানুষের আআদর্শও অসীম এবং তার অসম্পূর্ণতারও অন্ত নাই। যে পথ গোড়া হতেই স্বরাজ সৃষ্টির অনুকূল সেই পথই স্বরাজের পথ, অন্য পথ মরীচিকা মাত্র।

সম্মুখ সমর বা মহাজন যেন গত স পন্থা—

এইবার কিছু গোলে পড়া গেল। যুদ্ধ জিনিষটা যে আদিন জানোয়রী জিঘাংসাবৃত্তির চরম অভিব্যক্তির ফল এবং তরোয়াল হ'তে আরম্ভ ক'রে শস্ত্রশকট (Armoured car) ও ট্যাঙ্ক (tank) পর্য্যন্ত সে নখ দন্ত শৃঙ্গেরই পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত সংস্করণ সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের দিক দিয়ে বিচার করলে যুদ্ধ মাত্রই যে মোক্ষকামীর পক্ষে সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জনীয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আর মোক্ষ মুক্তি স্বরাজ স্বাধীনতা যখন একই জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা তখন মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে উহা পরিহার্য্য, একথাও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মানুষের অশ্রান্ত কল্পনা যুদ্ধের কি সৌন্দর্য্য ও মহত্বের কি স্বর্গপুরীই না রচনা করেছে! এক একটা সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এক একটা মহাযুদ্ধের মধ্যে আপনার চরমতম বিকাশ লাভ করেছে। এক একটা যুদ্ধের উন্নত ও প্রবলতম ভাবোচ্ছ্বাস বেলাভূমিতে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের রেখার মতো মহাকাব্য বা ইতিহাসের মধ্যে আপনার চিহ্ন রেখে গেছে। রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড প্রভৃতি মহাকাব্যে কবির অন্তর যুদ্ধকে অবলম্বন ক'রে যে অমৃতের ধারা উৎসারিত করেছে, তা চিরদিন মানুষকে অমরত্বের আস্বাদন দিয়ে আছে। রাম লক্ষ্মণ ভীষ্মার্জ্জুন লিওনিডাস, সিনসিনেটাস, ওয়াশিং-

টন প্রভৃতি মানবকুল-গৌরবেরা যুদ্ধকে অবলম্বন ক'রেই আপনাদের চূড়ান্ত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথি সখা ও গুরু। ন্যায়ের জন্য ধর্ম্মের জন্য সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন কেবল এদেশের নয়, সব দেশের ক্ষত্রিয়দের চোখেই প্রাণের চরম চরিতার্থতা। কেবল কুরুক্ষেত্র নয়, ম্যারাথন থার্ম্মাপলি হলদিঘাট প্রভৃতিও চিরদিন মানুষের কাছে মহা ধর্ম্মক্ষেত্র ও তীর্থ-ভূমি। মুসলমানের জেহাদ ও খ্রীষ্টানের ক্রুসেড, ধর্ম্মান্ধতার সংকীর্ণতা সত্ত্বেও চরিত্রের সুপ্তশক্তি-গুলিকে জাগিয়ে তুলে, কত নিতান্ত সাধারণ লোককে যে প্রতিদিনকার তুচ্ছতার গ্লানি হ'তে উদ্ধার ক'রে মহত্ত্বের শিখরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছে তার সংখ্যা নাই। কার্ব্বলার পবিত্র ক্ষেত্রে ইমাম হাসান ও তাঁর অনুবর্ত্তীরা-আপনাদের সমস্ত দেহ মন প্রাণকে যে মহাআত্ম বিসর্জ্জনের শিখারূপে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন, তার আলো আজ পর্য্যন্ত মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করছে। এক কথায় বলতে গেলে, মানুষের আদিম যৌন প্রবৃত্তির পঙ্ক হ'তে প্রেমের শতদল পদ্ম ফুটে উঠে যেমন সংসারকে ধন্য ক'রে তুলেছে, জিঘাংসাবৃত্তির বেলাতেও ঠিক সেইরূপই ঘটেছে।

কাজেই যুদ্ধব্যাপারটাকে মানুষের ইতিহাস হতে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করার দিকে আমার আন্ত-রিক ঝোঁক থাকলেও সে কথাটা খুব খোলা গলায় জোর ক'রে বলতে পারছিনে। যে কবি খুবতীব্র ঘৃণার সঙ্গেই "War is a blood-paste ring wind-pipe-slitting art" ব'লে যুদ্ধের সার্টিফিকেট সুরু করেছিলেন তাঁকেও পরের লাইনে সুরটা নরম ক'রে "unless its cause is sanctified by justice" এই মর্ম্মের একটা কথা জুড়ে দিতে হয়েছিল। কেবলমাত্র লেখায় জুড়ে দেওয়া নয়, আস্ত গ্রীক স্বাধীন-তার যুদ্ধটাকেও জীবনের সঙ্গে জুড়ে না দিয়ে তিনি কোন রকমেই শান্তি পাননি। যুদ্ধ ব্যাপারটা মানুষের অন্তরকে এমনি অধিকার ক'রে বসেছে যে যাঁরা বাহুবলকে সম্পূর্ণ বরখাস্ত ক'রে দিয়ে জগতে প্রেম ও শান্তি বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেও বৈষ্ণবের বাড়ীর পূজার কুমড়ো বলির মতো সামরিক ভাষা বেমালুম প্রবেশ লাভ করেছে। প্রমাণ Salvation Army এবং মহাত্মা গান্ধীর চরকার Munition নামকরণ।

যুদ্ধটাকে মানুষের চাকরি হতে চিরদিনের মতো বরখাস্ত করা সম্বন্ধে আমি যে একটু সামান্য মাত্র দ্বিধা প্রকাশ করেছি, সেটা কেবল ধর্ম্ম ন্যায় ও স্বাধীনতার যুদ্ধ লক্ষ্য ক'রে, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ন্যায় ও ধর্ম্ম যে কোন পক্ষে সেটা ঠিক ক'রে নির্ণয় করা শক্ত। যে যুদ্ধটার জের এখনও মিটেনি, সেই চোখের সামনের যুদ্ধটাতেও ন্যায় কোন্ পক্ষে তা এখনো কেউ বুঝতে পারল না। মোকদ্দমার আসামী ও ফরিয়াদী দুই পক্ষই যেমন মা-কালীর নিকট জোড়া পাঁঠা মানত করে, বড় বড় খ্রীষ্টান জাতিরাও তেমনি নির্দ্দিষ্ট দিনে একত্র হয়ে আপন আপন অস্ত্রশস্ত্রের উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা ক'রে থাকেন, এটা অনেকবার দেখা গিয়েছে। যা হোক এটা একটা অবান্তর কথা। স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে যুদ্ধের উপযোগি-তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাক্।

১। ভালো দিক :—

(ক) যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা লাভের পথটা চিরদিনের চেনা পথ। আমি পূর্ব্বেই বলেছি এটা মহাজনের পথ।

(খ) যুদ্ধের উৎসাহ অতিসহজেই মানুষকে প্রাত্যহিক লাভ-ক্ষতির খুটিনাটী হিসাব হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে ত্যাগের জন্য উন্মুখ ক'রে দেয়।

(গ) মৃত্যুর সম্মুখে মুখোমুখী ক'রে এক মনে দাঁড়ালে হিন্দু-মুসলমান ও অস্পৃশ্যতার সমস্যা অতি সহজেই মিটে যেতে পারে।

(ঘ) কেবল সৈন্যেরাই যে যুদ্ধ করে তা নয়। ঠিক ভাবে দেখলে দেখা যায় সমস্ত দেশের লোকই যুদ্ধ করে। কাজেই দেশের সমস্ত ব্যাপারকেই রীতিমত ব্যবস্থার (organisation) সামিল ক'রে নিতে হয়। এতে জাতির কার্য্য শত গুণে বেড়ে উঠে।

(ঙ) লক্ষ লক্ষ লোক একব্রত একলক্ষ্য নিয়ে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত হ'লে তাদের মধ্যে অতি সহজেই একপ্রাণতা জন্মে। ঠিক ভাবে দেখলে মনে হয় এক একটি সেনাদল যেন এক একটি বিরাট ব্যক্তি।

(চ) দেশের জন্য যুদ্ধ করলে দেশাত্মবোধ একেবারে প্রাণে প্রাণে মুদ্রিত হয়ে জীবনের সামিল হয়ে উঠে। তার আর কিছুতেই মার থাকেনা।

(ছ) ষড়যন্ত্রে যেমন চরিত্রে ভীরুতা নীচতা ও সংকীর্ণতা জন্মে থাকে সম্মুখ-যুদ্ধে সেরূপ হয় না।

(জ) যুদ্ধদ্বারা স্বাধীনতা লাভ করলে সেটা আর কেউ কেড়ে নেওয়ার আশঙ্কা প্রায়ই থাকে না।

২। মন্দ দিক

(ক) অস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন ন্যায় ও ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করার আর অন্য উপায় নাই, এরূপ মনে করা মানুষের পক্ষে নিতান্তই অপমানজনক। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন—

"—অস্ত্র দিয়া রাখিতে হইবে ধর্ম্ম ?
বাহুবল দুর্ব্বলতা করায় স্মরণ।"

একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাছাড়া ধর্ম্মের ন্যায়ের সত্যের নিজের এমন কোনো শক্তি নাই যে আপনাকে জয়ী করতে পারে—এই যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে যে পায়ের নীচের দাঁড়াবার মাটীটুকু পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না! ধর্ম্মের যদি সে বলটুকু পর্য্যন্ত না থাকে তাহলে জগৎ আশ্রয় পাবে কিসের উপর? জীবনটা যে তাহলে মাতালের স্বপ্নের মতো নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে মানুষ যে—

"অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত্ত জগতে"

নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়বে! তাছাড়া এ-বিশ্বাসে পরিতৃপ্তিই বা কোথায়? চিরন্তন ধর্ম্ম আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে আমার ভিতর দিয়ে অধর্ম্মের উপর জয়লাভ করলেন, এ-বিশ্বাসে একটা গভীর পরিতৃপ্তি আছে। কিন্তু দৈবাৎ আমার অস্ত্রগুলো বেশী ধারালো হওয়াতে ন্যায়ধর্ম্ম জয়ী হলেন—এরূপ মনে করায় কোনই তৃপ্তি নাই। আর তৃপ্তি পায় না বলেই মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। রাম্যও বলতে হয় কাপড়ও তুলতে হয়। আসলে তার বিশ্বাসটা Powder dry রাখার উপর কিন্তু তবুও Trust in God ব'লে মনটাকে ভুলাতে হয়। আর আসল

জায়গাটাতে এরূপ মিথ্যার আক্রমণ ঘটায় মানুষের যা-কিছু চেষ্টা সবই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

(খ) এ-পর্য্যন্ত বাহুবলের দ্বারাই ন্যায় ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এ কথাটা ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমেরিকা যে স্বাধীনতা লাভ করেছিল তার কতটাই বা মনের বলে সেটার হিসাব করা শক্ত। ধর্ম্মের বলের সঙ্গে অস্ত্রের বলের ভেজাল ঘটায় মানুষ ধর্ম্মের বলটা যে কতদূর তা টের পাচ্ছে না। সেইজন্য এত মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্ত্বেও মানুষের চিরদিনের মোহ কিছুতেই ঘুচ্ছেনা। সভ্যতার গোড়ায় থেকে মানুষ তো পেনাল কোড দিয়ে অপরাধ শাসনের কাজে লেগে আছে, কিন্তু অপরাধের বোঝা তো বেড়েই চলেছে। পেনাল কোড অপরাধের বাহিরের প্রকাশটাকেই বন্ধ করতে পারে, তার বীজটাকে তো নষ্ট করতে পারে না, কাজেই সেই বীজ নব নব মূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে।

(গ) যুদ্ধকে একবার আশ্রয় করলে আর তাকে ছাড়ানো শক্ত হয়ে ওঠে। তখন আত্মরক্ষার অছিলায় ক্রমাগত অস্ত্র-শস্ত্রের বহর বাড়াবার দিকেই রোখ চেপে যায়। তাছাড়া যুদ্ধের অভ্যাসটা ঠিক রাখার জন্য অন্যায় যুদ্ধের অবতারণাও দরকার হয়ে পড়ে।

(ঘ) যুদ্ধের পথে স্বাধীনতা লাভ করার চেষ্টায় একটা বিপদও আছে। দৈবাৎ কোনও পরাক্রান্ত সেনাপতি যদি সেনাদলের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে, তাদের সাহায্যে অনায়াসেই সে একাধিপত্য লাভ করতে পারে। বহুবার এরূপ ঘটেছে।

দুদিকের সব কথাই খুলে বললেম, পাঠকগণ বিচার ক'রে দেখবেন। আমার নিজের কথা বলতে পারি যুদ্ধটাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা সম্বন্ধে প্রথমে যে একটু দ্বিধার ভাব ছিল, এখন দেখছি তার অনেকটাই কেটে গেছে। এতে অসামঞ্জস্যের অপরাধ একটু হয়েছে হয়তো। তা হোক। সেই ভয়ে আমি চিন্তার স্রোতটাকে আটক ক'রে রাখতে প্রস্তুত নই।

আমি এতক্ষণ সাধারণ ভাবে যুদ্ধের দোষ-গুণ আলোচনা ক'রে এসেছি। আমাদের 'স্বরাজ' লাভের পক্ষে যুদ্ধের কোনও উপযোগিতা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে একটী কথাও বলি-নি। বলার কোনও প্রয়োজনও দেখিনি। কারণ তাতে কেবল কাগজ ও কালী নষ্ট।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

আঁধি

১০

তার পর এক মাস ধরিয়া প্রত্যহই প্রায় সুষমার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ীর লোকে ব্যাপারটাকে যখন ফিট্‌-না-ফাট্‌, ঢং—বলিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও টিট্‌কারীর বাণে খোঁচাইতে লাগিল, অভয়াশঙ্কর তখন কড়া মেজাজে চড়া দর দিয়া নিখিলের জন্য এক মাষ্টার মহাশয় আনাইয়া তাহাকে সেই মাষ্টারের জিম্মায় কায়েমী করিয়া দিতে নিযুক্ত রহিলেন; এ সংবাদ তেমন করিয়া তাঁহার কাণেও পৌঁছিল না। শেষে যখন এক প্রতিবেশিনী আসিয়া হঠাৎ খানিকটা ভয় দেখাইয়া গেল,—ঠিক এমনি অবস্থা ও-পাড়ার ঐ নক্‌ড়ো বাগ্দীর দ্বিতীয় পক্ষের বৌটারও হইয়াছিল গো। বেচারী বৌটা মরা সতীনের হাওয়া লাগিয়া মরিতে বসিয়াছিল, শেষে কোথা হইতে সেই বিশে চাঁড়াল আসিয়া ঝাঁটার ঘায়ে ভূত তাড়ায়। বৌটা অমনি জল-সমেত দুই-দুইটা বড় কলসী দাঁতে করিয়া বহিয়া লইয়া গেল! শুনিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। তাই ত ভূত,—মুখের হাসি মুখে চাপিয়া মানদা-ঠাকুরাণী কমিটী ডাকিয়া প্রস্তাব করিলেন, বিশে চাঁড়ালকে এখনি আনোনা কর্ত্তব্য—না হইলে ভূতের সঙ্গে একত্র বাস নিরাপদ নয় ত, কিন্তু—

এই কিন্তুটা মর্ম্মে মর্ম্মে সকলেই বুঝিল। অভয়াশঙ্কর চিরদিন একরোখা,—ঠাকুর-দেবতাই মানিতে চাহেন না, এ'ত কথার কথা, কোথা-কার ভূত-প্রেত! তাহার উপর অত সোহাগের বৌ মরিয়া ভূত হইয়াছে, এ কথা যাহার মুখে শুনিবেন, সে যত বড় গুরুজনই হোক্ না কেন, তাহার সেই মুখ তদ্দণ্ডে শাণের মেঝেয় ছেঁচিয়া দিবেন! কাজেই ভরসা করিয়া তাঁহার কাণে ব্যাধি ও প্রতিকারের উপায়টা কেহ তুলিতে পারিল না, শুধুই ভয়ে কাঁটা হইয়া টিপ্পনী কাটা কাজটাই বন্ধ করিল। তখন সুষমার বিপদ বাড়িল। এই কমিটি হইবার পূর্ব্বে মূর্চ্ছার সময় তবু দুই-চারিজন গিয়া একটু ধরিত, মুখে-চোখে জল-আছড়াও দিত, এখন ফিট্‌ হইলে সে ত্রিসীমাও কেহ মাড়াইতে চাহে না, বরং সেদিক হইতে বহু দূরে সরিয়া যায়।

সেদিন মধ্যাহ্নে ঘরের খড়খড়ির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ সুষমার ফিট্‌ হইল। ফিটের মাত্রাও সেদিন একটু বেশী; পাশে কেহ ছিল না। খড়খড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে সার্শির কাঁচ ভাঙ্গিয়া সুষমা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দে অভয়াশঙ্কর উপরে আসিলেন; আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া বিরক্ত হইলেন, কিন্তু বিরক্তির মধ্যে মমতাও যে একটু না জাগিল, এমন নয়। বেচারী! নিজেই মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়া, স্মেলিং শল্টের শিশির ছিপি খুলিয়া ঘ্রাণ দিয়া রোগীকে কোনমতে চাঙ্গা করিয়া তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এ ত বিষম উৎপাতে পড়া গেল! একটু স্বস্তিতে থাকিবার আশা করিয়া এ কি বিপত্তিই ঘাড়ে করিয়াছেন! এ সব বালাই কোন দিনই

ছিল না ত! গৃহে কাহারো অসুখ দেখিলে বিশ হাত দূরে থাকাই ছিল তাঁহার বিধি—কিন্তু এখন এ অবস্থা দেখিয়া সরিয়া থাকিলেও চলে না ত! বাড়ীতে এই যে এতগুলা স্ত্রীলোক তাঁহারই অন্ন ধ্বংস করিয়া শুইয়া বসিয়া আরামে গা গড়াইয়া লইতেছে, ইহাদের কি এতটুকু আক্কেলও হয় না? সুষমার দিকে তাঁহার মন ততটা নাই থাকিল, তবুও তাহাকে তিনি বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, এ গৃহের কর্ত্রীও এখন সুষমাই ত। উহারা সেই কর্ত্রীকে এ-রকম অবহেলা করিবে! উপরে অভয়াশঙ্করের হুঙ্কার শুনিয়া মানদা ঠাকুরাণীর দলের দুই-চারিজন সেখানে আসিয়া উদয় হইলে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এই যে লোকটা হাত-পা কেটে রক্তগঙ্গা হল, তা মুখে জল দেবার জন্যে তোমাদের কারো দেখা নেই! আমি সেই বাইরে থেকে এসে মুখে জল দি! তোমাদের দ্বারা এটুকু উপকারও হবে না!

ঠাকুরাণী-কোম্পানির দল ভাবিল, একবার ভূতে পাওয়ার কথাটা পাড়া যাক্‌, কিন্তু অভয়াশঙ্করের রাগের ঝাঁজে বাতাসটা তখনো এমন তাতিয়া ছিল, যে সে কথা বলিতে কাহারো আর সাহস হইল না! অভয়াশঙ্কর বিষম ক্রুদ্ধভাবেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অভয়াশঙ্কর চলিয়া গেলে রমণীরা সুষমার কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ বৌমা, এ ত ভাল কথা নয়, বাছা। রোজ রোজ এমন কাণ্ড—বিশেষ এই অবস্থায়! একজন রোজা ডাকিয়ে দেখানো দরকার। আচ্ছা, কি রকম ছায়া-টায়া দেখ, বল ত? পাশে পাশে ঘোরে শুধু, না, ভয়ও দেখায়? কার মত দেখতে, চিনতে পারো কি?

সুষমা কথাগুলার অর্থ না বুঝিয়া তাহাদের মুখের পানে কৌতূহল-দৃষ্টি তুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহারা তখন স্পষ্ট করিয়াই কথাটা খুলিয়া বলিল,—জানাইয়া দিল যে, এই প্রথম নয়, অমন কত জায়গায় দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রীরা মৃতা সপত্নীর হাতে বিষম নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে! স্বামীর ভাগ দেওয়া কি সহজ কথা! বাঁচিয়া নাই থাকিল, ঐ যে সুষমারও পেটে একটি আসিতেছে না,—কাজেই নিজের ছেলেটির কোন খোয়ার হয়, এই ভয়ে মৃতা সপত্নী সেইটির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই এমন করিয়া লাগিয়া পড়িয়াছে! হোক বোন্‌,—এক স্বামী হইলে মার পেটের বোন্‌ও পর হয়, এ ত কোন দূর-সম্পর্কের বোন্‌ বৈ ত না—তাও জীবিত-কালে কেহ কারো মুখও দেখে নাই!

শুনিয়া সুষমার সমস্ত মন এমন ঘৃণায় ভরিয়া গেল যে কষ্ট হইলেও সে কোনমতে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ওদিকে অভয়াশঙ্কর ভাবিতেছিলেন,—সুষমার এই অবস্থায় প্রত্যহ এ রকম ফিট হওয়াটা ঠিক হইতেছে না ত! একজন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া যাক্‌। তার পরে দেখা-শুনার জন্য একজনকে সর্ব্বদা কাছে রাখা দরকার! কাহাকে রাখা যায়? ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, শাশুড়ীর শরণ লওয়া ছাড়া উপায় নাই! কিন্তু তিনি কি আসিবেন? লীলার মৃত্যুর পর তাহারি সাজানো ঘরে পা দেওয়া—তবুও তিনিই যখন ধরিয়া-বাঁধিয়া আবার বিবাহ দেওয়াইয়াছেন, এবং সুষমা যখন তাঁহারই সম্পর্কীয়া ভাই-ঝী, তখন হয়ত আসিতেও পারেন!

ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইয়া তিনি শাশুড়ীকে পত্র লিখিয়া দিলেন। তাঁহার যে শীঘ্র আসা দরকার, চিঠিতে সে কথা বিশেষ করিয়াই লিখিয়া দিলেন।

১১

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী নিজের বিষয়-সম্পত্তির একটা পাকা রকম বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থ-দর্শনে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অভয়াশঙ্করের ডাক গিয়া পৌঁছিল! তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সুষমার শীর্ণ শরীর দেখিয়া শিহরিয়া বলিলেন,—শরীরের এমন অযত্ন কর্‌ছিস্ কেন, মা? তোর হাতে যে মস্ত ভার রয়েছে। সকলের আগে সেই জন্যেই যে তোর নিজের শরীরের উপর নজর রাখা দরকার। না হলে এ ভার রাখতে পারবি কেন?

সুষমা পিশিমার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল,—শরীর ত আমার ভালই আছে, পিশিমা।

তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া পিশিমা বলিলেন,—সে ত দেখতেই পাচ্ছি।

দুপুর বেলায় আহারাদি করিয়া উপরে আসিয়া তিনি দেখিলেন, সুষমা ঘরের মেঝেয় আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। নূতন বন্দোবস্তে নিখিলের জন্য মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছিল। মাষ্টার মশায়ের কাছে তাহাকে এখন রুটিন-মত সারা সকাল ও দুপুরটা থাকিতে হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গেই সে খানিকটা হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসে। অর্থাৎ অন্তঃপুরের সঙ্গে তাহার সম্পর্কটা খাওয়া-পরা বাদ একেবারে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিখিলের দিদিমা ভুবনেশ্বরী আসিয়া সুষমাকে বলিলেন—শুয়ে কেন, মা? অসুখ করছে কি?

সুষমা উঠিয়া বসিয়া বলিল,—না। এমনিই শুয়ে আছি, পিশিমা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—একটু গল্প-সল্প কর্ দিকি আমার সঙ্গে। এখানকার ব্যবস্থা ত আমি এসে ভাল দেখচি না, মা। তুই কি কিছু দেখিস্ না, শুনিস্ না?

সুষমা মুখ নীচু করিয়া নীরবেই বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কতক্ষণই বা এখানে এসেচি! তবু আমি সবই বুঝতে পারচি, মা। এদের ঝাঁজেই তুই এমন শুকিয়ে মলিন হয়ে গেছিস্, না? অমন যে কাঁচা সোনার বর্ণ—তাও বলি, এরা কে, বল্? অভয় ত যত্ন-আত্তি করে, তবে—?

সুষমা বিপদে পড়িল। সে কি বলিবে? স্বামী যত্ন-আত্তি করেন না, এ-কথা বলা চলে না। কেন না, তাহার অসুখ-বিসুখে দেখা-শুনা, ডাক্তার ডাকা,—তা-ছাড়া গহনা-পত্র কাপড়-চোপড় প্রচুর দিয়াছেন, দিতেছেনও—সংসারের কর্তৃত্বও তাহারই হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন,—কিন্তু হায়, এইগুলাই কি নারীর সর্ব্ব পাওয়ার মধ্যে! নারী কি এইগুলা পাইয়া গৃহ-রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেই তাহার সকল দুঃখ ঘোচে?

সুষমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—আমার এও কেমন মনে হচ্ছে, মা, যে অভয় বুঝি তোকে তেমন ঘেঁষ দিচ্ছে না! তাকে তোর কাছে একটিবারও দেখলুম না,—এরি বা মানে কি? নিখিলই বা কোথায়?

সেই এসে যা একবার দেখেচি—এরা কোথাও গেছে নাকি ?

সুষমা বলিল,—না, নিখিল বাইরে মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়তে গেছে।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—মাষ্টার মশায় আবার কবে এল ?

সুষমা বলিল,—মাস-খানেক হবে। সকালে খাবার খেয়ে বাইরে যায়, তার পর ন'টার পর ভিতরে আসে, চাকরের কাছে নায়, নেয়ে ভাত খেয়ে আবার বাইরে যায়। মাষ্টার মশায় বাইরে ভাত খান কিনা, সেইখানে সেও তখন থাকে। দুপুর বেলা দুধ পাঠানো হয়। খেয়ে পড়ে, লেখে, তার পর চারটের সময় ভিতরে এসে জল-খাবার খেয়ে গা-টা মুছে বেড়াতে বেরোয়।

শুনিয়া ভুবনেশ্বরী কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে রহিলেন, পরে ডাকিলেন,—সুষু—

—পিশিমা—বলিয়া সুষমা ভুবনেশ্বরীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া দিল। তাহার দুই চোখের পিছনে জল ঠেলিয়া আসিয়া ছিল, কিছুতেই সে তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কাঁদিস্ নে মা। এর জন্য দায়ী আমি। কিন্তু এ-রকমটি যে হবে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি! তাই ত, তোর জীবনটা, মা, এম্‌নি করেই আমি নষ্ট করে দিলুম! ভুবনেশ্বরী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

সুষমা বলিল,—এই নিখিলকে কেড়ে নেওয়াই আমার বড়-বেশী বাজচে, পিশিমা। আমার জন্যে আমি কিছু ভাবি না, কোন দুঃখই নেই আমার। আমি ত নিজের জন্যে কিছু তেমন প্রত্যাশাও করিনি কোনদিন। কাজেই সেজন্যে দুঃখ হবে কেন ?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তা জানি, মা। তোমার এত-বড় উঁচু মন দেখে আমি তা খুবই বুঝেছিলুম। তাতেই ভেবেছিলুম, তুই আবার সব ঠিক করে নিতে পারবি, তোর কোন দুঃখ থাকবে না। কিন্তু এ কি হল! হায়রে, শুধু ঐ একরত্তি ছেলেটার মুখ চেয়ে নিতান্ত স্বার্থপর হয়ে তোর এত বড় সর্ব্বনাশ করে বসলুম! তারপর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া, বসিয়া সুষমার মুক্ত কেশগুলার মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন,—অভয়কে আমি বলব একবার ?

সুষমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া শশব্যস্তে বলিল,—না না পিশিমা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। তুমি আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলো না ওঁকে, লক্ষ্মীটি।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তা বলে তুই এত-খানি হেনস্তা সয়ে পড়ে থাকবি—কিছু পাবি না—তোর সম্বল বলে, সান্ত্বনা বলে ? এত বড় পাপের ফল যে কখনো ভালো হতে পারে না মা—সেই ভেবেই যে আরো আমি শিউরে উঠ্‌চি।

সুষমা বলিল,—না পিশিমা, আমার ত এখানে কোন দুঃখ নেই। তোমায় ত বলেচি, এই এত বড় সংসারের কর্তৃত্ব উনি আমারি হাতে তুলে দিয়েছেন। দাস-দাসী, লোক-জন, এ সমস্ত আমারই তাঁবে রয়েছে! নিজের হাতে আমি তাদের মাইনে দিচ্ছি, কাজ-কর্ম্ম দেখচি-শুন্‌চি—আমাকে তারা এতটুকু অমর্য্যাদা-অসম্মানও করে না ত—

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—এইটেই কি মেয়ে-মানুষের সম্বল ? এইতেই তার সব পাওয়া হল, এই কথা আমায় তুই বোঝাতে চাস্, সুষু ?

সুষমা বলিল,—সব মেয়েমানুষের বুদ্ধি ত সমান নাও হতে পারে। কেউ কর্ত্তৃত্ব পেয়েই সব পায়, কেউ বা আর-কিছুর কাঙাল।

বাধা দিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কিন্তু তুই কি ঐ কর্ত্তৃত্বের কাঙাল—এই কথা আমায় বল্‌তে চাস্ রে?

সুষমা কিছু বলিল না। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—এ আমি জানি যে, তুই নিখিলের মধ্যে তোর সব কামনা ডুবিয়ে বসে আছিস্! সেই নিখিলকে তোর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তোকে একেবারে কাঙালের অধম করে যে ওরা ছেড়ে দেবে, এ আমার কখনোই সহ্য হবে না। আমার সে নেই—বল্‌তে গেলে—কেউই নেই, কিন্তু তোকে ধরেই তার সব আমি তেমনি অটুট্ তেমনি বজায় রাখতে চাই যে! তারপর আরো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন,—নিখিলের সম্বন্ধে এমন বন্দোবস্ত হঠাৎ হল কেন? নিখিল কি তোকে মানে না? না, সে তোর কাছে আসতে চায় না?

সুষমা বলিল,—আমায় আর তেমন পায় না বলে বেচারী কি মলিন শুকনো মুখ নিয়েই ঘুরে বেড়ায়, পিশিমা। তার চেহারা দেখেচ ত—মুখে তার হাসির চিহ্নও নেই!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—হুঁ, দেখেচি বটে—আমার কাছেও আসে না বড়। থাবার সময় আমি বল্‌লুম,—হ্যাঁরে,তোর মা গেল কোথায়? আসেনি? তা সে বললে, মার যে অসুখ, দিদিমা। নীচেয় নামতে মার কষ্ট হবে। বাবা বায়না করতে বারণ করে দেছে।—আহা, চোখদুটি অম্‌নি ছল্‌ছলিয়ে এল। তারপর ঐ মানদা বললে, নিজের হাতে না খেয়ে ওর অসুখ করছিল কি না, ডাক্তারে তাই বলেছে, কেউ যেন খাইয়ে না দেয়! …তাছাড়া আমার অত ন্যাওটো ছিল, তা আমার সঙ্গেও দুটো ভালো করে কথা কইলে না রে, খাওয়া হতেই বাইরের দিকে ছুটল, বল্‌লে,—তুমি এখানে আছ দিদিমা, যাও, মার কাছে বসোগে, যাও। মার যে অসুখ, আমি বাইরে যাচ্ছি—মাষ্টার মশায়ের খাওয়া দেখতে হবে কি না আমায়।—তখন এত বুঝিনি ত!

সুষমা বলিল,—হাঁ, ঐ কথাই বলেছেন, যে নিখিল মাষ্টার মশায়ের খাওয়ার সময় তাঁর কাছে বসে তাঁর খাওয়া দেখবে, কোন অসুবিধা বা কষ্ট যেন তাঁর না হয়! বলেন, ছেলে বড় হচ্ছে, এখন থেকেই ওর সব দিকের শিক্ষা হওয়া দরকার।

—বটে!—বলিয়া ভুবনেশ্বরী চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

১২

ভুবনেশ্বরী স্থির করিয়াছিলেন, পাঁচ-সাত দিন এখানে কাটাইয়া তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িবেন—কিন্তু তাহা পারিলেন না।

এই বাড়ীটির মধ্যে অন্তঃপুরখানি দখল করিয়া অভয়াশঙ্করের অন্নে যে জীবগুলি শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছিল, তাহাদের কথাবার্ত্তা ও ধরণ-ধারণ হইতে ভুবনেশ্বরী স্পষ্টই বুঝিলেন,—সুষমার উপর কেহই বড় প্রসন্ন নয়। ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে সুষমার বিরুদ্ধে মিথ্যা করিয়া কিছু লাগাইতে পারিলে সকলেই যেন বর্ত্তাইয়া যায়,—অথচ সুষমার দোষ যে কি, তাহারও একটা সুস্পষ্ট

অভাব কেহ দিতে পারে না। ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, এই যে একটা আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব, সুষমার অসুখেও কেহ তাহার দ্বারে উঁকি দিয়া উদ্দেশটুকুও লইতে চাহে না—এই সহানুভূতির অভাবই যে সুষমাকে মারিয়া রাখিয়াছে! তিনি স্পষ্টই চোখে দেখিয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া সকলে নানা গল্প ফাঁদিয়া হাসির জমক তুলিয়া আসর জমাইয়া দিয়াছে, যেমনি সুষমা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি সকলের হাসি-গল্পের স্রোতে ভাঁটা পড়িল—কাজের অছিলা তুলিয়া কে কোথায় সরিয়া গেল। কেন—এ কেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া ভুবনেশ্বরী ইহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাইলেন না।

অথচ এই সবগুলার জন্যই যে তাহার মনে সুখ নাই, শরীর ক্রমশ কৃশ-দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, ইহাও তিনি বেশ বুঝিলেন। সুষমার এ অবস্থায় মনটাকে স্ফূর্ত্তিতে রাখা ভারী প্রয়োজন—নহিলে পেটের সন্তানটি কেন, তাহাকেও রক্ষা করা কঠিন হইতে পারে! ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, যতদিন সুষমা ভালয়-ভালয় প্রসব না হয়, ততদিন ত তিনি এখানে থাকিয়া যাইবেনই, তা ছাড়া অভয়াশঙ্করকে বলিয়া নিখিলকে সুষমার সঙ্গী করিয়া রাখার প্রয়োজনীয়তাটাও বুঝাইয়া তাহাকে এখন সুষমার কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

তাই সেদিন ভুবনেশ্বরী সুষমাকে বলিলেন,—আজ অভয় খেতে এলে আমি বলব'খন, যে-পর্য্যন্ত ভালোয় ভালোয় তোরা দু'জন/দু'ঠাঁই না হোস্, নিখিলকে যেন তোর কাছেই রাখে, তোর মনটাও তাতে ভাল থাকবে।

সুষমা মিনতির সুরে বলিল,—না পিশিমা, আমার কথা ওঁকে তুমি কিছু বলো না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কিন্তু তোর মনটা যে ভালো রাখা দরকার মা।

সুষমা বলিল,—তোমার যেমন কথা। আমার মন বেশ আছে, পিশিমা! কে বললে তোমায়, আমার মনে ফুর্ত্তি নেই?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—যে শরীর হয়েচে, পেটের ওটা বাঁচবে কেন?

সুষমা উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ কেমন লজ্জা হইল, বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া গেল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—দ্যাখ্ মা, ঐ সব মাগীগুলোর দিকে ফিরেও তাকাস্‌নে। এ ত আত্মীয় পোষা নয়, সাপ পোষা। তাকেও কি কম জ্বালান্ জ্বালিয়েছে, ঐ মানদা ঠাকরুণটি—ওঁর মুখের কি বিষ! এক বারের কথা বলি তবে, শোন্,—সেদিন দ্বাদশী, দ্বাদশীর দিন ভোর হবার আগেই মা আমার উঠে স্নান-টান সেরে ওঁকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ কাপড় পরে ওঁর জলখাবার সাজিয়ে দিত। সেদিনও তাই করে শ্বেত-পাথরের রেকাবিখানি সাজিয়ে যেই সামনে ধরে দিলে, জানিনা, ওঁর কি হয়েছিল,—উনি কুট্‌মট্ করে চেয়ে সেই রেকাবিতে মারলেন এক লাথি—লাথি খেয়ে সে বেচারী ত মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল আর রেকাবিও অমনি দেয়ালে গিয়ে ঠেকে ভেঙ্গে চুরমার হল। মা আমার তখনি উঠে মাগীর সেই দুই পা ধরে সেধেছে, কি অপরাধ হয়েছে? এমন উনি! তা ওদের কথায় কিছু মনে করিস্‌নে! কে ওরা?

সুষমা বলিল,—না পিশিমা, আমি ত ও-সব কিছুই মনে করি না। ওঁদের খাওয়া-দাওয়া আমি নিজে সব দেখি-শুনি —সাধ্যমত কোন ত্রুটি থাকতে দিইনে ত —মুখ ফুটে নিন্দেও করিনি কোনদিন, তবে কারো মুখে হাসিও দেখলুম না কখনো, এই বড় দুঃখ, পিশিমা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—হাসির বরাত কি ওরা করে এসেছিল মা, যে ওদের মুখে তুই হাসি দেখবি! সব সংসারেই এই রকম গোমড়া-মুখো সাপ দু'একটা আছে। আমাদেরা একটু-আধটু ভুগতে হয়েছিল মা—তোদের বয়সে। তবে এতখানি নয়। যাই হোক্, অভয়কে বল্‌চি, আমি,—যে বাবা, ছেলে যদি মানুষ করতে চাও ত এ সংসর্গে তাকে রেখো না। অন্য ব্যবস্থা করো। অভয়ের মনেও এজন্যে অশান্তি কি কম! সে থাকতেও এটুকু ছিল, এখনো রয়েছে।

বৈকালে নিখিল খাইতে আসিলে দিদিমা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—তোর মার অসুখ নিখিল, তা তুই তোর মার কাছে দু'দণ্ড বসিস্ না কেন রে?

নিখিল বলিল—সেজঠাকুমা বলছিল, মার অসুখ, মার কাছে গিয়ে মাকে জ্বালাতন করতে বাবা বারণ করেছে—তাই যাই না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—মার জন্যে মন কেমন করে না বুঝি তোর?

নিখিল মুখে কোন জবাব দিল না—দিদিমার কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ একেবারে ছল-ছলিয়া উঠিল।

দিদিমা বলিলেন,—আয় দেখি মার কাছে। মার কত আহ্লাদ হবে'খন।

ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, এই যে নিখিল সুষমা-বেচারীকে সঙ্গ দিয়া তাহাকে একটু সুখে রাখিতে পারে, এটুকুর বিরুদ্ধেও ঐ সব রমণীগুলার কি এ নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র! অথচ কেন—সুষমা কি করিয়াছে? কি অপরাধ? কোন ধনে কাহাকেও সে বঞ্চিত করে নাই —কোন বাদ সাধে নাই ত! নামেই সে সংসারের কর্ত্রী—কিন্তু সকল কর্তৃত্ব ত ইহাদের হাতেই!

নিখিলকে পাইয়া সুষমার খুবই আনন্দ হইল—নিখিলও কতদিন পরে মাকে পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল। মার বুকে মুখ গুঁজিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সে ডাকিল—মা,—

—নিখিল, বাবা আমার—বলিয়া সুষমা দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া তাহাতে অজস্র চুমা দিল। সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভুবনেশ্বরী সে দৃশ্য দেখিলেন। তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

সেদিন হইতে নিখিলের ব্যবস্থাগুলা একটু শিথিল হইল। সুষমার শরীর ও মন একটু যদি স্বস্তি পায়—পাক্! মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়ার সময়টুকু ছাড়া দিনের বাকি সময়টা সে সুষমা ও দিদিমার কাছে গল্পে ও খেলায় কাটাইয়া দিবার অনুমতি পাইল।

১৩

দুই-তিনমাস মন্দ কাটিল না। তারপর একদিন শেষ রাত্রে হঠাৎ সুষমার সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া এক ভীষণ যন্ত্রণা ঠেলিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল জ্বর দেখা দিল।

ডাক্তারের ভিড়ে বাড়ী ভরিয়া গেল—এবং অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে পাঁচ-সাতদিন কাটাইবার পর সুষমা এক মৃত সন্তান

প্রসব করিয়া একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল।

পাশ-করা নার্শের তদারকে ও ভুবনেশ্বরীর অক্লান্ত সেবায় প্রায় সপ্তাহ-পরে কঙ্কাল-সার দেহখানা নাড়িয়া সুষমা কোনমতে পাশ ফিরিয়া শুইল, পরে জীর্ণ চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষীণ স্বরেই ডাকিল,—পিশিমা—

ভুবনেশ্বরী নিকটে ছিলেন, বলিলেন,—কি মা ?

শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি ভুবনেশ্বরীর পায়ের উপর রাখিয়া সুষমা বলিল—কৈ পিশিমা ?

ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, সুষমা কি চাহিতেছে। নার্শকে ইঙ্গিত করিলে নার্শ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

সুষমা ক্ষীণ কণ্ঠে আবার ডাকিল—পিশিমা—

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বুঝেচি মা, কি চাচ্ছ। আগে সেরে ওঠো, তখন দেখ্‌বে।

সুষমা বলিল—না পিশিমা, বল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—ছেলে।

সুষমার মুখে আনন্দের এতটুকু আভাসও দেখা গেল না। সে চুপ করিয়া চক্ষু মুদিল। ভুবনেশ্বরী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—এখন কথা কয়ো না মা, চঞ্চল হয়ো না। ডাক্তার বকবে। আগে সেরে ওঠো—সব পাবে।

ছোট একটী নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা বলিল,—বেঁচে আছে ?

নার্শ বলিল—আছে বৈ কি, বৌদিদি।

সুষমা বলিল,—এত এতেও আছে! কি হবে পিশিমা ?

ভুবনেশ্বরীর চোখে জল আসিয়াছিল—তিনি কিছু বলিলেন না, সজল চক্ষে সুষমার পানে চাহিয়া রহিলেন। সুষমা চোখ বুজিয়াছিল—তাহার চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সুষমা ডাকিল,—পিশিমা—

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কেন মা ?

সুষমা অতি কষ্টে মৃদু স্বরে বলিল—ঠাকুর-দেবতাও কি মিথ্যা হল, পিশিমা ? আমি যে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছিলুম গো—

—কি প্রার্থনা, মা ?

—যে, ও যেন মরে !

ভুবনেশ্বরীর দুই চোখে বাণ ডাকিল—আঁচলে চোখের জল মুছিয়া তিনি বলিলেন,—ষাট্‌, ষাট্‌—ও কথা বলতে আছে মা ? মা হয়ে সন্তানের সম্বন্ধে—ছি মা—

সুষমা বলিল—না পিশিমা, ওকে মেরে ফেলো—

—সুষু—

সুষমা ব্যস্ত হইয়া বলিল,—সত্যি মেরে ফেলো, পিশিমা। ও আমার নিখিলের শত্রু—তার বিষয়ের ভাগ নেবে, তার সঙ্গে লাঠালাঠি করবে! মেরে ফেলো, ওকে মেরে ফেলো !

—ছি, ছি, চুপ কর—ও সব কি বলছ মা ?

ভুবনেশ্বরী দেখিলেন, সুষমার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

নার্শ বলিল—আপনি ঘুমোন্ দেখি, বৌদিদি—

সুষমা বলিল—না,আগে ওকে মেরে ফেলো —তবে ঘুমোব। মেরে ফেলো। মারবে না? তবে দাও, আমাকে দাও—বলিয়া সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। ভুবনেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—কাকে আর মারবে মা? সে কি আছে? সেই দিনই গেছে সে। হুঁঃ, তেমন বরাতই যদি তোর হবে, মা—

সুষমা বলিল,—এঁ্যা, গেছে? সে নেই—মারা গেছে? পিশিমা, সত্যি করে বল।

আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—সে কি বেঁচে এসেছিল, মা, যে যাবে? পেটের মধ্যেই তার সব শেষ হয়েছিল। যে তুমি পাষাণী মা—

—সত্যি, এ সত্যি পিশিমা?

—হ্যাঁ মা—কেন মিথ্যে করে বলব! মা হয়ে তুমি যখন ঐ প্রার্থনাই করছিলে—

—সাধে করেছিলুম, পিশিমা!···আঃ বাঁচলুম! বলিয়া ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিল।

এমন সময় ডাক্তারকে লইয়া অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিলেন। ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া, বুক দেখিয়া ইংরাজীতে বলিলেন,—Progressing fairly, তবে ভারী সাবধানে রাখতে হবে। কোন রকম excitement না হয়।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—সাবধানে রাখতে হবে বৈ কি। যে ব্যবস্থা বলবেন, তাই করবো।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে সুষমা চমকিয়া আবার এ-পাশ ফিরিয়া অভয়াশঙ্করের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—এবারে আর তুমি রাগ করবে না, আমার উপর? বল।

অভয়াশঙ্কর কাছে আসিলেন—সুষমার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া তাহার কপালে হাত রাখিলেন; রাখিয়া বলিলেন,—রাগ কেন, সুষমা?

সুষমা অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল,—রাগ নয়? নিখিলকে তবে কেড়ে নিয়েছ কেন! যদি ছেলে হয়, ঝগড়া করবে—বলে? কেমন, বলেছিলুম ত,—প্রার্থনা করচি, সে মরবে। ঠাকুর সে প্রার্থনা শুনেচেন।—আর তুমি রাগ করবে না? বল। সুষমা ধীরে ধীরে অভয়াশঙ্করের হাতখানি আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল।

অভয়াশঙ্করের বুকের মধ্যে কি একটা বেদনা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। স্থির দৃষ্টিতে তিনি তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, মমতায় প্রাণটাও ভরিয়া গেল।

রোগ-শীর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া সুষমা বলিল—আর রাগ করো না, লক্ষ্মীটি। সে গেছে,—আর ত নিখিলের ভয় নেই। তুমিও নিশ্চিন্ত হলে ত! বল, রাগ নেই, আমার উপর? বল!

অভয়াশঙ্কর কোন জবাব দিলেন না। তাঁহার পলক-হীন চোখ হইতে এক ফোঁটা গরম জল টপ্ করিয়া সুষমার গালের উপর ঝরিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

গৃহ-শিল্প। বা দরিদ্রের অন্ন-সংস্থান। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। গৃহ-শিল্প প্রচার সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, কাত্যায়নী প্রেসে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ। মূল্য আট আনা মাত্র। এই গ্রন্থে চরকা, সুতা ও তাঁত,—ইহাদের ব্যবহার, উপযোগিতা প্রভৃতির সম্বন্ধে বেশ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, "বঙ্গদেশে সাত কোটী লোকের বাস। তন্মধ্যে স্ত্রীলোক অর্দ্ধেকের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী হইবে। তথাপি আমরা ৩॥ সাড়ে তিন কোটী বলিয়াই স্ত্রীলোকের সংখ্যার হিসাব রাখিলাম। তন্মধ্যে শিশু, বালিকা, অতি-বৃদ্ধা প্রভৃতির সংখ্যা আড়াই কোটী বাদ দিলেও, এক কোটী স্ত্রীলোকে চরকার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন—তাহা হইলে একজনকে সাত-জনের আবশ্যকীয় সুতা জোগাইতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইবে, কার্য্যকালে একটী লোকের দ্বারা সাতজনের কেন, অন্ততঃ ১০ জনের সুতা প্রস্তুত হইবে।" আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—তাঁহাদের হাতে সাধারণতঃ পয়সা-কড়ি থাকে না। বিধবা অসহায়া স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই—আত্মীয়-স্বজনের নিকট হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিয়াই অনেককে খাইতে হয়। দরিদ্র পরিবারে স্ত্রীলোকে সুতা কাটিয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন, ও তাহার দ্বারা সংসারে অনেকখানি সচ্ছলতা আনিতে পারেন।

লেস তোলা, জরির পাড় বোনা—এ সবগুলা সৌখীন কাজ,—ইহাতে অর্থেরও প্রয়োজন বেশী। ও-সব কাজের কাছে চরকায় সুতা কাটা ততটা সৌখীন না হইলেও, ইহার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তাহা আজ দেশের লোকে বুঝিয়াছে। প্রত্যেক গৃহে যদি একটা করিয়াও চরকা চলে, তবে মোটা কাপড়টার সংস্থান সহজেই হইতে পারে। গ্রন্থে সুতায় রং করা ও অন্যান্য গৃহশিল্পের (Cottage industry) কথাও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি উপাদেয়, তবে একটা জায়গায় লেখকের মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই—লেখক কল-কারখানার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। আমাদের মতে, কল-কারখানায় টাকাটা দেশের দরিদ্র সাধারণের মধ্যে আরো বিস্তারিতভাবে ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ মিলে। এ গ্রন্থখানি সকলের পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

স্বরাজে বঙ্গমহিলার কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গুপ্ত-জায়া প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক দেশের এই দুর্দ্দিনে বঙ্গমহিলা-গণকে সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যে উদ্‌বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মীর এই গ্রন্থ পড়িয়া দেখা উচিত।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সঙ্কলিত। কাশীধাম, অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-সমাজরক্ষা মহাসভার পক্ষে শ্রীতারাচরণ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি লিমিটেড প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা মাত্র। লেখক বলেন, ইহলোক-বাসীর সহিত পিতৃলোকবাসীর অধ্যাত্ম সম্বন্ধকে সন্নিকট ও ঘনিষ্ঠতর করা কার্য্যকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলে। অনুষ্ঠাতার হৃদয়ের শ্রদ্ধাই হইতেছে, এই ক্রিয়ার প্রধান উপাদান—এই জন্যই ইহাকে বলা হয় শ্রাদ্ধ। শাস্ত্রীয় কথা ছাড়িয়া দিলেও, সেণ্টিমেণ্টের দিক দিয়া যখন দেখি, ইহলৌকিক সর্ব্ব-প্রকার সম্পর্কবন্ধন যাঁহাদের সহিত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সহিত একটা মধুর পারলৌকিক সম্বন্ধ বিজড়িত রাখিবার জন্য এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, তখন মন কি এক পবিত্রভাবে ভরিয়া যায়! প্রতি বৎসর মৃত আত্মীয়ের মৃত্যু-তিথিটিতে মৃত ব্যক্তিকে এই যে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা—ইহার মধ্যে কেমন একটি মধুর সান্ত্বনাও নিহিত আছে! এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পৃথিবীর নানা প্রাচীন-জাতির মধ্যে মৃত আত্মীয়স্বজনকে যে বিভিন্ন উপায়ে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করার প্রথা আছে, তাহা বিবৃত করিয়া লেখক হিন্দুর শ্রাদ্ধানু-ষ্ঠানকে শুধু শাস্ত্রের দিক দিয়া নহে, প্রাণের দিক দিয়া, মনের দিক দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার সে চেষ্টা সফল ও হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ]　　ভাদ্র, ১৩২৮　　[৫ম সংখ্যা

প্রত্যাবর্ত্তন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মেয়েটির ভাল নাম হিমানী; কিন্তু লোকে তাহাকে হিমু বলিয়াই ডাকে। হিমু সুন্দরী। তাহার সুগৌর সুশ্রী দেহের মধ্যে সব-চেয়ে সুন্দর ছিল, তাহার চোখদুটি। ঘন-কৃষ্ণ, ছবিতে আঁকার মত অতিসূক্ষ্ম ভ্রূর নীচে যে দুটি আলো-করা কালো চোখ ছিল, তেমন চোখ সাধারণতঃ বড় একটা কাহারো চোখে পড়ে না। যদি বা ভাগ্যক্রমে কাহারও পড়িত, সে আর সেই যাদু-করা চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি হইতে নিজের মুগ্ধ দৃষ্টি সহজে ফিরাইয়া আনিতে পারিত না। হিমু বালিকা; সে তাহার সদা-চঞ্চল সদা-সহাস্য চক্ষে যে কতখানি মদিরতা ও মধুরতা মাখানো আছে, তাহার কোন হিসাব রাখিত না। তাই আত্মীয়-অনাত্মীয় যুবা-বুড়া সকলকার পানেই অসঙ্কোচে অনায়াসে হাসিয়া চাহিতে তাহার এতটুকু কৃপণতা দেখা যাইত না। পুরুষ-মহলে তাই তাহার খাতির থাকিলেও মেয়ে-মহলে তেমন সুখ্যাতি-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। গ্রাম্য বালিকা-দলে মিশিয়া ইঁচড়ে-পাকা কাঁঠালের মত পাকিয়া উঠিয়া শৈশবেই নিজের স্ত্রীত্ব-বোধের কোন প্রমাণ না দিয়া সে ছেলেদের দলে মিশিয়া ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি, পুকুরে সাঁতার কাটা এবং সর্ব্বোপরি লজ্জার কথা, গাছে চড়িয়া কোথায় পেয়ারায় রং ধরিল, কোথায় আমের গাছে মুকুল টুটিয়া ফল দেখা দিল, কার বাগানের গোলাপজাম ও ফল্‌সা গাছের ফল অধিক মিষ্ট, তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপরতা দেখাইতে সুরু করিল,—ইহাতে তাহাকে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না। এই অকুণ্ঠিত নারীত্ব-বোধ-হীন সারল্য ও শ্রীমণ্ডিত মেয়েটির পানে চাহিয়া প্রথম দর্শনেই অরুণের মনে হইয়াছিল, এ মেয়ে

দেখিবার মত বটে! অবারিত-গতি বন্য-প্রকৃতি এই মেয়েটির সহিত আলাপ করিতেও তাহাকে এতটুকু ক্লেশ পাইতে হইল না। সে নিজেই উপযাচিকা হইয়া প্রথম দিনেই সাধিয়া ভাব করিয়া ফেলিল। তাহার বিশৃঙ্খল বহিগুলিও দড়ির আল্‌নার এলোমেলো কাপড়-জামাগুলি হিমু গুছাইয়া রাখিল; ঘরখানির চারিপাশ তক্তাপোষের নীচে পর্য্যন্ত ঝাঁট দিয়া এক রাশ ধুলা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। কুণ্ঠিত লজ্জায় অরুণ তাহার হাত হইতে ঝাঁটা লইতে গেলে হাত দিয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া হাসিয়া সে কহিল, "বা রে! পুরুষমানুষ বুঝি কখনো ঘর ঝাঁট দেয়,আবার! সরো গো মশাই, সরো, ভারী ত জানো তুমি! আমি সব ঠিক করে দিচ্চি।"

স্বল্পভাষী লাজুক অরুণ ইহা লইয়া বেশী বাক্‌বিতণ্ডা করিল না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই অরুণ যখন দেখিতে পাইল, পাড়ার একটি সমবয়সী ছেলের সহিত মিশিয়া পদ্মফুলের লোভে বেলপুকুরের গভীর জলে রাজ-হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া দুইধারে জল ছড়াইয়া পূর্ণ জলে সূর্য্যালোকের হীরক দীপ্তি ফেলিয়া সাঁতার কাটিয়া সে-ই চলিয়াছে, তখন জানলার বহির্দ্দেশ হইতে নিজ বিস্মিত উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টি ফিরাইয়া আপনার চির-প্রচলিত নিয়মে পাঠ্য পুস্তকে তাহা সংলগ্ন করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না।

মেয়েটি যখন-তখন ঝড়ের মত তাহার ঘরে অনাহূতভাবেই প্রবেশ করিতে লাগিল; আবার বিনানুমতিতে তেমনি করিয়াই সে বাহির হইয়া যাইত। কখনো উৎপাতে-উপদ্রবে তাহার পাঠের ব্যাঘাত ঘটাইত, অনর্গল অপ্রাসঙ্গিক বাজে কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিয়া দিত; আবার কখনো তাহার বই-খাতা গুছাইয়া ঘর ঝাঁট দিয়া কুঁজায় জল ভরিয়া অরুণের শত নিষেধ-মিনতি উপেক্ষা করিয়া তাহার বিছানা রৌদ্রে দিয়া অনেক প্রকারে তাহাকে সাহায্য ও আন্তরিক স্নেহ প্রদর্শন করিত। তীব্র রৌদ্রে বুক যখন শুকাইয়া ফাটিয়া ওঠে, তখন দুই-চারি বিন্দু বৃষ্টিধারা-কেও সে অল্প বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে না। স্নেহ-হীন পরাশ্রিত অরুণের পক্ষে এই যে অযাচিত অপূর্ব্ব স্নেহ,—তৃষাতুরের পক্ষে অমৃত-বিন্দুর মতই তাহা মোহকর। তাহার উদ্দেশ্য-হীন জীবনে সে যেন আবার উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাইতেছিল। ছুটির পর বাড়ী ফিরিবার পথে এখন মনে পড়ে, তাহার জন্য পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিবারও কেহ আছে। অনেক সময়েই তাহার আশা সফল হইত। হাজার খেলার প্রলোভন উপস্থিত থাকিলেও এ সময়টা হিমু কেবল তাহার জন্যই অপেক্ষা করিয়া থাকিত। বাড়ীর অনতিদূরে রায়েদের আম-বাগানের হেলিয়া-পড়া একটা বৃদ্ধ বটের মোটা গুঁড়ির আসনে বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া মৃদু সুরে নূতন শেখা "ওরে পাগল বেরুস্‌নে আজ পথে, রাজা বেরিয়েছেন আজ রথে—" গাহিতে গাহিতে হিমু তাহার কালো চোখের প্রতীক্ষা-ভরা দৃষ্টি পথের পানেই প্রসারিত করিয়া রাখিত। দূর হইতে চোখে চোখে মিলিলে চারি চক্ষে মিষ্ট হাসির আদান-প্রদানের সহিত দুই জনের চক্ষুই যেন বলিয়া উঠিত, "আশা-প্রতীক্ষা পূর্ণ হইয়াছে।" কোনদিন ছুটিয়া গিয়া অরুণের মানা না মানিয়া সে তাহার হাতের বহি-

গুলি কাড়িয়া লইয়া লঘু ত্রস্তগতি হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়া যাইত। আবার কোন দিন যেন তাহাকে গ্রাহ্যই নাই, সে যেন কোথাকার কে একজন অপরিচিত পথিক মাত্র, এমনি অনাগ্রহ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে উদাস দৃষ্টিতে আনমনে চাহিয়া কষ্ট-সঞ্চিত এবং বহুক্ষণের যত্ন-রক্ষিত আমড়া ফল গুলির অম্ল রস-গ্রহণে একান্ত মনোযোগী হইয়া থাকার ভাণ করিত। অরুণ স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। অবস্থা তাহাকে আরও সংযত ও কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে সহজে কাহারো সহিত মিশিত না, নিজ হইতে অগ্রসর হইয়া কাহারো সহিত আলাপ করিত না। তবু তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে কেহ গর্ব্বিত বলিয়া কোনদিন সন্দেহ করিত না। বিনীত শান্ত যুবকের সকরুণ কুণ্ঠা তাহাকে দূরে ঠেলিয়া না ফেলিয়া মানবের অন্তরের দিকেই আকর্ষণ করিত; তবু এই নির্লিপ্ত লাজুক ছেলেটিও অনেক সময় হিমুর নিকট তাহার সংযমের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইত। মন খুলিয়া ইহার সহিত গল্প করিয়া তাহার বুকের বোঝা সে লঘু করিয়া লইত। মনে হইত, জীবনের সার্থকতা আছে। ইহা শুধুই গর্দ্দভের ভার বহন নহে।

এই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নর-নারীর মধ্যে যে কেমন করিয়া এত শীঘ্র এতখানি ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল, তাহা যিনি মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্য নিয়ত সৃষ্টি করিয়াছেন, বুঝি, তিনিই বলিতে পারেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এতদিন এই বাড়ীতে বাস করিয়া দুই বেলা আহারের সময় ব্যতীত অরুণ কখনো বাড়ী ভিতরে যাইত না—যাইবার প্রয়োজনও হইত না। পূর্ব্বে কলসী হইতে জল গড়াইয়া কুশাসনখানি বিছাইয়া লইয়া সে আপনি আহারের স্থান করিয়া লইত। হিমু আসিবার পর এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল, "বা রে—পুরুষ মানুষ বুঝি নিজে নিজে ঠাঁই করে? সরো, সরো, ভারী ত জানো, অমনি করে বুঝি জল আছড়া দিতে হয়—" ঠাঁই করিয়াই রান্নাঘরে খবর হয়, "অরুণ দা এসেচে, ভাত বাড়ো।" ভাত গরম থাকিলে পাখা লইয়া অরুণের পাতের সাম্‌নে সে বাতাস করিতে বসিয়া যায়। অরুণের লজ্জারক্ত বিপন্ন মুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া সাহায্য করিতে গিয়া তাহাকে সে বিপন্ন করিয়াই তুলিত। নির্ব্বোধ বালিকা অরুণের সহিত নিজের পার্থক্যের কথা বুঝিত না,—তাই অনেক সময় অরুণের ব্যবহারের অর্থ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইত। কখনও রাগ করিত, কখনও অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিত। অরুণ দুঃখিত হইত—কিন্তু সাধিত না। এক বেলা বা এক দিন সহস্র ছুতায়-নাতায় তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, এমনি ভাবে আনাগোনা করিয়াও যখন অরুণের তরফ হইতে মৌন বিষণ্ণ দৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যাইত না, তখন অগত্যা দেওয়াল বা বইকে মধ্যস্থ রাখিয়া তাহারই সহিত কথা কহিয়া বালিকা আপানার মান রক্ষা করিত।

হাঁড়িকুড়ি বা পুতুল সাজাইয়া মেয়েলি খেলা তাহার ভাল লাগিত না। তদপেক্ষা দাঙ্গাহাঙ্গামায় পৃষ্ঠ দেওয়াই তাহার লাগিত ভাল। অবিরত ঠাকুরমার কাছে উপদেশ, প্রতিবাসিনীদের তীব্র মন্তব্য এবং মায়ের কঠোর তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া অনেক সময় আপনার অব্যাহত গতিকে সে সংযত করিবার চেষ্টা করিত, আবার কখনো বা বিদ্রোহী ভাবে বাঁকিয়া বসিত—বেশ,এখানে সে থাকিবে না। এ ছাইয়ের দেশ—এর চেয়ে আমাদের বাকুল ঢের ভাল, সেখানে মানুষরা মানুষের এত নিন্দা করিয়া বেড়ায় না।

অরুণ একদিন একখানা প্রথম ভাগ কিনিয়া আনিয়া তাহার লেখা-পড়া শিখিবার কথা তুলিলে প্রথমটা মুখে আঁচল চাপা দিয়া সে খুব এক চোট হাসিয়া লইল, তারপর গম্ভীর হইয়া কহিল, "লেখা-পড়া— মাগো, মেয়েমানুষে বুঝি আবার লেখা-পড়া শেখে? তাহলে চাকৃরি করতেও যায়, পাগড়ী বাঁধে, জুতো পরে?"

নারীত্বের সম্বন্ধে এতখানি সজাগ সতর্কতা দেখিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহার বিরক্ত বিদ্রোহী চিত্ত বইখানাকে ছুড়িয়া ঐ বেল-পুকুরের জলে নৌকা ভাসাইতে চাহিত। সে প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিত, "কেন বাবু, আমি পড়ব না, পড়্‌ব না—পড়তে পারব না, এই রইল তোমার বই।" বলিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অরুণ যখন তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া আপনার বই খুলিয়া নোট লিখিতে আরম্ভ করিত, তখন সে একটুখানি অপেক্ষা করিয়া জোর দিয়া পুনরায় বলিত, "শুনচো অরুণ—আমি পড়্‌ব না!" অরুণ লেখা হইতে চোখ না তুলিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন অনাগ্রহ ভাবে "আচ্ছা" বলিয়া কাজ করিয়া যাইত। অগত্যা আবার তাহাকে বসিতে হইত এবং দুর্ব্বোধ্য স্মরণাতীত নিষ্ঠুর অক্ষর-গুলার উপর চোখ রাখিয়া তাহাদের দুর্ব্বোধ্য কর্কশ একঘেয়ে শব্দগুলাকেই মুখস্থ করিতে হইত। অরুণ যদি তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিত, জোর করিয়া বলিত, যে, না, তাহাকে পড়িতেই হইবে, তবে সেই দিনই সে পড়ার দফা রফা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারিত। কিন্তু এই যে মৌন আদেশ, নীরব অভিমান,—ইহার উপর জোর চলে না—ইহাকে লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় না, ব্যথা দিতেও পারা যায় না।

এমনি করিয়া যখন প্রথম ভাগ সাঙ্গ হইয়া গেল, তখন দ্বিতীয় ভাগ পড়িতে আর সে কোন আপত্তি করিল না। পাঠের রস-বোধের সুখ অনুভব করিতে শিখিয়া তাহার মনে পুস্তকের গল্পগুলি যেন অভিনব এক নূতন দেশের নূতন আনন্দ আনিয়া দিতে লাগিল! দেখিয়া অরুণ মনে মনে হাসিলেও প্রকাশ্যে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কহিল, "তাইতো মেয়ে মানুষের যে লেখাপড়া শিখ্‌তে নেই, তা ত আমার জানা ছিল না। তবে আর কি হবে? যদু ময়রার মেয়ে কুসিকে সেদিন কলেজ যাবার সময় প্রথম ভাগ পড়্‌তে দেখেছিলুম, না হয় বিকেল বেলা একবার করে তাকেই পড়তে শিখিয়ে আস্‌ব—বইখানা কি নষ্ট হবে!" হিমু অনাগ্রহভাবে "বেশ ত—" বলিয়া চলিয়া গেলে অরুণ আপনার পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিল।

পরদিন সেই দুই পয়সা দামের বিচিত্র চিত্র-শোভিত বর্ণশিক্ষাখানির কোন উদ্দেশ

পাওয়া গেল না—দুইদিন উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া ও অরুণের নিকট হইতে সুগভীর মৌনতা-ছাড়া ভর্ৎসনা বা ক্রোধ কিছুই যখন পাওয়া গেল না—তখন অপরাধিনী তাহার চুরির মাল বাহির করিয়া দিয়া শান্তভাবে জানাইল যে এইবার সে পড়িতে শিখিবে এবং এমন অপরাধ আর কখনও করিবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ সর্ত্তও রহিল যে অরুণ "যাকে-তাকে"—অর্থাৎ আর কাহাকেও পড়াইতে পারিবে না। অরুণ হাসিয়া তাহাতেই সম্মতি দিল—শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে আবার সন্ধি স্থাপিত হইল। একান্ত মনোযোগের সহিত অরুণ এই দুর্দ্দান্ত বন্য হরিণীকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফলে অনেকখানি কৃতকার্য্যও হইল। প্রথম প্রথম এই বাঁধা-ধরা নিয়মের ভিতর বদ্ধ থাকাও দুর্ব্বোধ্য রেখাগুলার চেহারা ও নাম স্মরণ রাখা হিমুর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল—এমন কি, অনেক সময় সে-গুলা যেন বিস্মৃত-প্রায় কোন্ সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কাহিনী রাখিয়া তাহার মনে হইত। মা ও দিদিমার মুখে সে রূপকথার অনেক নায়ক-নায়িকার অদ্ভুত ইতিহাস শুনিয়াছিল। তখন ছাপার অক্ষরেও সেই সব অভিনব গল্পাবলীর অপূর্ব্ব রহস্য-পাঠে সে শুধুই মুগ্ধ নয়, পুলকিতও হইত। কল্পনার সাহায্যে নিজেকে সেই সব রূপকথার রাজকন্যাদের আসনে বসাইয়া হীরা-মণি-মাণিক্যে সাজাইয়া পাতাল-পুরীর মাণিক-জ্বালা কক্ষের সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শায়িতার পানে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিত। কখনো মনে হইত, সে যদি সত্যসত্যই কঙ্কাবতী হইয়া যায়,—আর ঝিনুকের নৌকা চড়িয়া ঐ বেলতলার পুকুরে ভাসিতে থাকে! কেমন মজা হয়! মা আসিয়া ডাকিতে থাকে,—

"কঙ্কাবতী মা আমার, ঘরে ফিরে এসো না।
কাঁদিছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর করো না।
ভাত হল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।
কঙ্কাবতী মা আমার সাতদিন উপবাসী।"

কঙ্কাবতী-রূপিনী হিমুও অমনি বলে,—

"বড়ই পিপাসা মা, না পারি সহিতে" ইত্যাদি। কেমন মজা হয়—ভারী চমৎকার খেলা!

আচ্ছা, সে যদি কঙ্কাবতীই হয়, তবে খেতু হইবে কে? ঐ ত মুস্কিল। হিমু ভাবিল, আচ্ছা, অরুণদাদা খেতু হইলে কেমন হয়? দূর! এ মীমাংসা কিন্তু মনঃপূত হইল না। সে কি ভাল হইবে? অরুণদার জাম খাইয়াই না তাহার এমন দশা ঘটিয়াছে! তবে থাক্, খেতুকে আর আনিয়া কাজ নাই। সে তাহার কল্পনার ঝিনুকের নৌকা কূলে ভিড়াইয়া ঝুপ্ করিয়া তীরে নামিয়া পড়াই সদ্যুক্তি স্থির করিল। মায়ের কোল ছাড়িয়া বাঘের পিঠে চড়িয়া পাহাড়ের গুপ্ত গুহায় রাজ-অট্টালিকার লোভ করিয়া তাহার কাজ নাই!

হিমুর এই বিদ্যা-শিক্ষায় আনন্দ-লাভের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত, অরুণ। ক্রমে ঠাকুরমার ঝোলা, বেঙ্গমার দেশ, নেকড়ে বাঘ ও শৃগালের রাজ্য পার হইয়া সে এখন রামায়ণ-মহাভারতে আসিয়া পৌঁছাইল। পরীক্ষা দিয়া অরুণ ফলের মুখ চাহিয়া বসিয়াছিল। এ সময় তাহারও সময়ের অভাব ছিল না। তাই পঠন ও পাঠন খুব উৎসাহের সহিতই চলিতেছিল। পাঠে অনুরাগ বাড়িয়াছিল বলিয়া হিমুর যে স্বভাবেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; এই পাঠ লইবার ও দিবার সময় সে অরুণকে

সাধাইয়া বিরক্ত করিয়া তুলিত। আবার সে সত্য বিরক্ত হইলে ক্ষমা চাহিত, কাঁদিয়া অনর্থ বাধাইত। এই অত্যন্ত লঘু-প্রকৃতি মেয়েটিকে অরুণ তাই কোনমতেই পর মনে করিতে পারিত না। মেয়ের আবদার-বায়নার সমাধানে মাকেও অনেক সময় অরুণের প্রতি মনোযোগী হইতে হইত। স্বভাব-গুণে সে সকলেরই স্নেহ আকর্ষণ করিত। তাছাড়া জবরদস্তিতেও অনেক সময় তাহার পাওনার বেশী আদায় করিয়া লইত। মুক্তা ঠাকুরাণী "মেয়ে-ছেলের" এত আহ্লাদেপনা পছন্দ করিতেন না। তাই মালতী দেবীকে সাবধান করিয়া দিতে গিয়া বলিতেন, "রানু, ওর আখের নষ্ট করো না, মা—অত আদর দিয়ো না। শেষ পস্তাতে হবে।" মালতী দেবী সজল স্নেহ-ভরা চক্ষে মেয়ের পানে চাহিয়া সুধু ম্লান হাসি হাসিতেন। এই একটুখানি আদর-আবদারের সমাধান করা ছাড়া তাঁহার স্বর্ণ-প্রতিমাকে দিবার মত যে আর কিছুই তাঁহার ছিল না। এটুকুও সে চাহিয়া না পায় কেন? বিধাতা যদি ললাটে উহার দুঃখের ছবিই আঁকিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ত তোলাই আছে,—যে কয়দিন সেটা চোখে না পড়ে, সে কয়দিন তবু চোখ বুজিয়া কাটাইয়া দেওয়ায় ক্ষতি কি!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

শাক্যসিংহের ধর্ম্মের পরিণতি

যখন মানব শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে ও স্বীয় জাতির নিয়তি-নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত ছিল, তখন অতি অমনোযোগী দর্শকও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, পৃথিবীর কোন-কিছুই স্থায়ী নহে; সুউচ্চ বিটপী, সুন্দরতম কুসুম, বলবত্তম পশু, দৃঢ়তম গিরি—সকলই ধ্বংস-প্রবণ; এমন কি মানবও ধূলিসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং সেই ধূলিই তাহার অন্তিম পরিণতি। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা ধাতুর নিরন্তর পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে চন্দ্র নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইয়াও অপরিবর্ত্তনীয়, উদ্ভিদের সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত, আর মানব-জীবন-স্রোতের গতি অবিশ্রাম প্রবহমান।

চিন্তার ধারা এইরূপে বহিতে বহিতে ক্রমশঃ ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুৎ এই চতুর্বিধ মূল ভূত সম্বন্ধে বিভেদ-জ্ঞান, তাহাদের শাস্বততার বিষয়ে প্রতীতি ও আত্মার শরীরান্তর গ্রহণ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে। ক্রমে প্রজনন-শক্তিমতী সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতিকে দেবী বলিয়া ধারণা জন্মে। কিন্তু আবার মানব বুঝিতে পারে, তাহারই অন্তর্নিহিত এমন একটা অদৃশ্য শক্তি আছে, যাহা শারীরিক ক্রিয়াসমূহকে চালিত ও সংযমিত করে। এই শক্তির সম্বন্ধে—ইহাকে চৈতন্য প্রাণশক্তি অথবা অন্তরাত্মা যাহাই বলা যাউক—প্রথম প্রথম তাহার এই ধারণা হয়, যেন তাহা প্রকৃতিরই অংশীভূত, কিন্তু পরে তাহা স্বতন্ত্র ও প্রকৃতির অপেক্ষাও বড় বলিয়া পরিগণিত হইল।

পরে সেই শক্তি ক্রমে পৃথিবীর মূলীভূত আদি কারণ অথবা সৃষ্টির আদিকর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হইল।

খুব সম্ভবতঃ গ্রীসে এবং ভারতে মানবের চিন্তা এই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিল। কাল-ক্রমে উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আপনাদের দৃঢ়চিত্ততা-গুণে জনসাধারণকে নিজবশে লইয়া আসিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা পরমেশ্বরের মানবীয় বিকাশ, ও অবতার-স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। মৃত্যুর পরও তাঁহারা দেবযোনি বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে দুই দেশেই তাঁহারা বীর (hero) শ্রেণীভুক্ত হইয়া পূজা, অর্চ্চনা ও ভক্তির পাত্র হইয়া রহিলেন। শাক্যসিংহের ধর্ম্ম-প্রচারের বহুপূর্ব্বে ক্রকুছন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপের স্মরণ-রক্ষার্থ 'স্তূপ' রচিত হইয়াছিল।

শাক্যসিংহ প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে হজশন সাহেবের মত এই, "Monastic asceticism in morals and philosophical scepticism in religion." প্রাচীনতর দুইটা দর্শন-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার এই উক্তি বিশেষভাবে প্রযুজ্য। সেই দুটী সম্প্রদায়ের নাম **স্বাভাবিক** এবং **ঐশ্বরিক**। নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। হজশন সাহেব মনে করেন যে, এতন্মধ্যে স্বাভাবিক তত্ত্বই মৌলিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকাশ বিশেষ। কিন্তু স্বাভাবিক ধর্ম্মমত জড়বাদেরই রূপান্তর হওয়াতে কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্য-মতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। এই তত্ত্ব প্রধান অথবা মহাপ্রধানকে মূল প্রকৃতি অর্থাৎ সকল বস্তুর মূল প্রভব বলিয়া ধরা হইয়াছে, এবং মূলপ্রকৃতি হইতেই বুদ্ধির উৎপত্তি। রাজগৃহে ছয়বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শাক্যসিংহ ঠিক এই মতবাদকেই বর্জ্জন করেন। কুশীনারে পরিনির্ব্বাণের সময়ে তিনি ভিক্ষুদিগকে যে অন্তিম অভিভাষণ করিয়া-ছিলেন, সেই অভিভাষণ স্বাভাবিকগণ-প্রচলিত শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধী। ইহাতে বৌদ্ধত্রয়ীতে **বুদ্ধ** (Supreme Intelligence 'পরম বুদ্ধি') ধর্ম্মের (material nature বা জড় প্রকৃতি) অগ্রে প্রথম 'রত্ন' স্বরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব শাক্যসিংহ-প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব "বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ" এই ত্রয়ীরই তত্ত্ব।

দার্শনিক এবং transcendentalএর দিক দিয়া **বুদ্ধ** মানে মন (mind চিৎ), **ধর্ম্ম** মানে জড়বস্তু (matter 'অচিৎ'), এবং **সঙ্ঘ** মানে এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অথবা প্রতি-ভাসিক জগতে প্রথমোক্ত বুদ্ধ ও ধর্ম্মের সংযোগ। ব্যবহার ও ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে, বুদ্ধ হইতেছেন এই ধর্ম্মের নশ্বর প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ, ধর্ম্ম তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, ও সঙ্ঘ সেই ধর্ম্মবিশ্বাসী অনুচরগণের একত্র অবস্থান।

সকল বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ভিতর একটা সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে—তাহা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ। প্রবৃত্তি হইতেছে মানবের অবস্থা; আর নিবৃত্তি হইতেছে দেব অথবা স্বয়ম্ভুর—বুদ্ধই হউক আর ধর্ম্মই হউক—অবস্থা। ঐশ্বরিকগণের মতে পরমেশ্বর আদি বুদ্ধ, শূন্য অথবা গণিতবিদ্‌গণের বিন্দুর মত নিরাকার এবং (নিবৃত্তিতে) যাবতীয় বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়াও অনন্তরূপধারী, সমস্ত জগদ্ব্যাপক, এবং (প্রবৃত্তিতে) সমগ্র জগতের

সহিত একীভূত। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার নিবৃত্তিই আকার, কিন্তু সৃষ্টির নিমিত্ত তিনি স্বয়ং ক্রিয়া-ন্বিত (ক্রিয়া-প্রবৃত্ত—তুঃ এক হইয়া বহু হইবার ইচ্ছা করিতেছি) হইলেন। এবং পঞ্চজ্ঞান ও পঞ্চধ্যান সাহায্যে তিনি পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত পঞ্চ দৈবীবুদ্ধ অথবা পঞ্চ **ধ্যানী-বুদ্ধের** সৃষ্টি করিলেন। যথা—

বুদ্ধ	তন্মাত্র	ইন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয় বিষয়
১। বৈরোচণ	ক্ষিতি	দৃষ্টি	বর্ণ
২। অক্ষোভ্য	অপ্	শ্রবণ	শব্দ
৩। রত্নসম্ভব	তেজ	ঘ্রাণ	গন্ধ
৪। অমিতাভ	মরুৎ	স্বাদ	রস
৫। অমোঘসিদ্ধ	ব্যোম	স্পর্শ	ঘনতা

এই পঞ্চ দৈবীবুদ্ধ পঞ্চধাতু ও তদ্ধর্ম্মের মুর্ত্তি স্বরূপ (Hodgson regards them to be personifications of the active and intellectual powers of Nature).

কানিংহাম সাহেব বলিতেছেন যে বহু বোধিসত্ব, লোকেশ্বর ও বুদ্ধশক্তিদের নাম আমি করিতে চাই না, কেন না আমার ধারণা যে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই; পরন্তু, শাক্যসিংহের ধর্ম্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, পরবর্ত্তী কালে ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গী-ভূত হন। এই সময়কার বৌদ্ধগণ শ্রমসাধ্য ধর্ম্মপ্রচার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অবসর-বিনোদনার্থ দর্শনের খুঁটিনাটী লইয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। আর ইহাও আমার ধারণা যে, যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতেছিল ও মানব ক্রমশঃ সেইদিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মণেরা এই প্রতিদ্বন্দ্বী বলবত্তর ধর্ম্মের সংঘাত হইতে আত্মরক্ষার্থ বাগ্‌বিন্যাসের একটু ইতর বিশেষ করিয়া উপচীয়মান ধর্ম্মের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইল। বৌদ্ধ দর্শন ও ব্রাহ্মণদের সাংখ্যের ভিতরে যে বহু সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাহা কেবল পূর্ব্বোক্ত অনুমান সাহায্যেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কোলব্রুকও এই সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে দুই ধর্ম্মের মধ্যে সৌসাদৃশ্য এত বেশী যে একের মতবাদ হইতে অন্যের মতবাদ বাছিয়া দেওয়া শক্ত। বাগ্-বিন্যাসের তফাৎ হইলেও অন্তর্গত ভাব (idea) একই; সেই জন্য বাহ্যতঃ কোন না কোন পার্থক্য থাকিলেও বস্তুতঃ কোন অনৈক্য ছিল না।

ব্রাহ্মণদের নিরীশ্বরবাদ (কপিলের) ও বৌদ্ধ স্বভাব-তত্ত্বের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই তত্ত্ব অনুসারে বৌদ্ধত্রয়ীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতেছেন মহাপ্রজ্ঞা (Hodgson. P. 77) তিনি স্ব-ভব অর্থাৎ নিজ হইতেই উৎপন্ন এবং তাহা হইতেই যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। স্বভাবক ত্রয়ীতে ধর্ম্ম স্ত্রীরূপে বিরাজিত।

ব্রাহ্মণদের সেশ্বর তত্ত্বের সহিত বৌদ্ধদের ঐশ্বরিক তত্ত্বের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। ঈশ্বরকে স্বীকার করে বলিয়া দুই তত্ত্বের নাম ঐরূপ হইয়াছে। বৌদ্ধদের মতে এই ঈশ্বরই বীজ-বুদ্ধি অর্থাৎ আদিবুদ্ধ, যাঁহা দ্বারা যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ঐশ্বরিক ত্রয়ীতে প্রথম স্থান বুদ্ধের ও দ্বিতীয় স্থান স্ত্রীরূপী ধর্ম্মের।

এই স্থানে পঞ্চমানুষী বুদ্ধ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ পঞ্চ বোধিসত্ত্বের একটা তালিকা দিতেছি :—

মানুষীবুদ্ধ	ধ্যানীবুদ্ধ	ধ্যানী বোধিসত্ত্ব
১। ক্রকুছন্দ	বৈরোচন	সমন্তভদ্র
২। কনকমুনি	অক্ষোভ্য	বজ্রপাণি
৩। কাশ্যপ	রত্নসম্ভব	রত্নপাণি
৪। গৌতম	অমিতাভ	পদ্মপাণি (অবলোকিতেশ্বর)
৫। মৈত্রেয়	অমোঘসিদ্ধ	বিশ্বপাণি

বোধিসত্ত্বদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অধ্যাপক গ্রুণ্‌ওয়েডেল সাহেব বলিয়াছেন—"যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ-কারিগণ তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাচীন হিন্দু দেবগণের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে নাই, পরন্তু নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও সেই শ্রদ্ধা প্রকাশের অবকাশ খুঁজিতেছিল। তাহারা দেখিতে পাইল যে বৌদ্ধ ট্রাডিশনের ভিতর ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি পূর্ব্বতন ধর্ম্মের অনেক দেবতাই রহিয়াছেন। হীনযান নামক দক্ষিণ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল না, কেবল হিন্দুনামধারী বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও নারায়ণকে গ্রহণ করা হইল। কিন্তু মহাযান সম্প্রদায়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। হিন্দু দেবদেবীগণ তো গৃহীত হইলেনই, অধিকন্তু তাহাদের সৃষ্টি ক্রমান্তর্গত অপ্রমেয় যুগে যুগে তাঁহাদের স্থান* করিয়া দেওয়া হইল; অতএব তাঁহারা ঐ তন্ত্রের সবিস্তারে নামমালায় ও পুরাণে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইন্দ্র অথবা শক্র হইলেন শতমন্যু ও বজ্রপাণি এবং তাঁহার স্বর্গের নাম হইল ত্রয়স্ত্রিংশলোক। বৌদ্ধ পুরাণে খ্যাত ব্রহ্মা তাঁহার প্রধান গুণসমূহের জ্ঞানপ্রদীপ, অতিপ্রাকৃত বল মঞ্জুশ্রীকে অর্পণ করিলেন। তখনও সরস্বতী ও লক্ষ্মী তাঁহার পত্নীই রহিলেন। বিষ্ণু অথবা পদ্মনাভের গুণাবলীর সহিত অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির সামঞ্জস্য আছে। বিরূপাক্ষ শিবের একটি বিখ্যাত নাম। সপ্ততথাগত ব্রাহ্মণ সপ্তর্ষির স্থান অধিকার করিলেন। এমন কি গণেশও বাদ গেলেন না; তিনি হইলেন বিনায়ক ও দৈত্য বিনতক (জাপানী বিনয়কিয়া)। বিরূপাক্ষ হইতেছেন পশ্চিমলোক দিক্‌পাল। অর্হৎ মৌদ্গললায়ন মহাস্থান অথবা মহাস্থানে প্রাপ্ত নামধারী বোধিসত্ত্ব হইলেন এবং শৈব ত্রিমূর্ত্তির অনুরূপ এক লৌকিক ত্রিমূর্ত্তি পর্য্যায় বুদ্ধ অমিতাভের বাম পার্শ্বে স্থান অধিকার করিলেন। ঐরূপ মৈত্রেয়েরও স্থান লাভ ঘটিল; শাক্যমুনি ও অবলোকিতেশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া আর একটী বৈকল্পিক ত্রিরত্ন গড়িয়া উঠিল।

হ্যাভেল সাহেব বলেন, বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রোক্ত দেবোৎপত্তি বিবরণ মতে পরমেশ্বর আদিবুদ্ধ (যাঁহার সহিত হিন্দুদের ঈশ্বরের সামঞ্জস্য আছে) এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন। সেই ইচ্ছার নাম প্রজ্ঞা। বুদ্ধ ও প্রজ্ঞা সংযুক্ত হইলেন। সেই ইচ্ছা সঞ্জাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ নামে পাঁচটি দৈব জীব উৎপন্ন হইলেন। এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ আপন আপন হইতে পঞ্চধ্যানী বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন। এই বোধিসত্ত্বগণ বিশ্বের বিবর্ত্তন ও সংরক্ষণে স্বীয় স্বীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণু যেমন, বৌদ্ধদের অবলোকিতে-

শ্বরও তেমনই; উভয়েই স্রষ্টা ও পাতা। বিষ্ণুর মত অবলোকিতেশ্বর নানা নিদর্শনাত্মক অলঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহার মস্তকে একটি ক্ষুদ্র অমিতাভের মূর্ত্তি আছে। মধ্যাহ্ন সূর্য্য যেমন বিষ্ণুর চিহ্ন, অমিতাভেরও সেইরূপ চিহ্ন।

বুদ্ধদেবের মহিমামণ্ডিত ব্যক্তিত্ব দার্শনিক ভিয়ানে পড়িয়া ক্রমশঃ ধ্যানীবুদ্ধ ও বোধি-সত্ত্বে পরিণত হইল। বুদ্ধগণ রূপলোকে বাস করেন বলিয়া খ্যাতি আছে; ধ্যানীবুদ্ধগণ তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক সদ্বস্তু। লোক-শিক্ষার্থ যে কোন বুদ্ধ কিয়ৎকালের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই উচ্চ-তর আধ্যাত্মিক কোনও এক ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিকল্প, কেবল মানুষ-দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। এক মানুষী বুদ্ধের তিরো-ভাব ও দ্বিতীয় মানুষী বুদ্ধের আবির্ভাবের শতাব্দীতে অবকাশে ধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ একজন মুখ্য ও পরিপালকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বিধায় ধ্যানীবুদ্ধেরা নিজ হইতেই স্বল্পবীর্য্য বোধিসত্ত্বগণের সৃষ্টি আপন হইতে করেন। অবশেষে এই সকল আধ্যাত্মিক আলোচনার ফলে এক পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা আদিবুদ্ধের কল্পনা করা হইল। অতএব কথার মার-পেঁচ ছাড়া মহাযান তন্ত্র ও হিন্দু দেবতা তন্ত্রে বাস্তবিক পক্ষে কোনও ভেদ নাই।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্মভূমি এই ভারত হইতে ইহা লোপ পাইল কেন? ইহার কারণ হইতেছে এই যে, হিন্দুদর্শনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন মতগুলি আর্য্য চিন্তাধারার মুখ্য স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া রহিল—যেমন যমুনা নিজস্রোত গঙ্গার সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। বৌদ্ধদের নীতি (ethics) এখন হিন্দুধর্ম্মশিক্ষার প্রধান উপাদান হইয়া রহিয়াছে এবং এই হিসাবে বুদ্ধের ধর্ম্ম-শক্তি আজিকার ভারতে তেমনই অটুট রাখিয়াছে, যেমন এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়।

Buddhism as a distinct sect disappeared from the land of its birth only because in the general evolution of Hindu philosophy, its doctrines merged into the main current of Aryan thought as the river Jumna is lost when it unites with the waters of the Ganges.

কানিংহাম সাহেব বৌদ্ধধর্ম্মলোপের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর বৌদ্ধধর্ম্মের পতন দ্রুত ও প্রবল হইয়া উঠিল। নূতন নূতন বংশের উদ্ভব হইল, তাহারা শাক্যকে চিনিত না। শিলাদিত্যের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সেস্থানে আসিল দিল্লীর তোমর, কনোজের রাঠোর ও মহোবার চান্দল্ল বংশ। অষ্টম শতাব্দীতে এই সকল বংশের উদ্ভব হইয়াছিল। তৎপ্রবর্ত্তিত অগণিত মুদ্রা ও খোদিত লিপি তাহাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুগত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। তবুও বৌদ্ধধর্ম্ম সারনাথ,মালব ও গুজরাটে কিছুদিন টিঁকিয়া ছিল। একাদশ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ উপাসকগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ বিতাড়িত হন, যাইবার আগে তাঁহারা মূর্ত্তিগুলিকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য সার-নাথে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। এখনও রাশি

রাশি ভস্ম ছড়াইয়া রহিয়াছে—তাহা হইতে বুঝা যায় যে অগ্নি সংযোগ করিয়া মঠগুলিকে ধ্বংস করা হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের কারণ হইতেছে এই যে, একটা ছাড়া মুক্তির সকল পথই রুদ্ধ হইয়াছিল। সেই একটা পথও সহজ ছিল না। মঠে প্রবেশ করিয়া এক স্তর হইতে ক্রমোচ্চ স্তরে উঠিয়া তবে মুক্তিলাভ হইত। অতএব অ-সন্ন্যাসী কাহারও মুক্তির আশা দুরাশা ছিল। আদর্শের অত্যুচ্চতা হেতু মুক্তি সাধারণের অনধিগম্য হইয়া উঠিয়াছিল। অটুট বিশ্বাস, নির্দ্দোষ ধর্ম্ম, পরম জ্ঞান—এই সব ব্যতিরেকে সংসারবন্ধন মোচন ও বুদ্ধত্ব লাভ অসম্ভব ছিল। যাঁহারা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন (দীক্ষিত হইয়াছিলেন), তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইত, সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতা সকলের কাছেই আশা করা যাইত,—সেইরূপ নিরন্তর প্রার্থনা ধ্যান ব্যতিরেকে অর্হৎ কিংবা বোধিসত্ত্বের পদলাভ সুদূরপরাহত হইয়া উঠিত। অতএব একটী ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ না থাকায় সকলকেই—দুর্ভাগ্য-তাড়িত আশাহত ব্যক্তি, স্বামী-উপেক্ষিতা নারী, পুত্র-তাড়িতা বিধবা, ইন্দ্রিয়-সেবাজনিত অবসাদতুষ্ট মানব ও পরম ভক্ত—সকলকেই ঐ এক পথেরই পথিক হইতে হইয়াছিল। তাহার উপর মঠগুলি অগাধ ধন সঞ্চয় করিয়া ধনলোভী রাজা ও ঈর্ষান্বিত প্রজার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই যখন সেগুলি ক্রমশঃ নৃপতিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতে লাগিল—তখন প্রজারা অবিচলিতভাবে সেই তামাসা দেখিতে লাগিল। যে ধর্ম্মাবাসের উপর তাহাদের তিলমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, তাহার রক্ষার জন্য কনিষ্ঠাঙ্গুলিও কেহ উত্তোলন করিল না! বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি যাহা ভারতবর্ষের মত সমগ্র মহাদেশ জুড়িয়া ছিল, তাহা সূর্য্যাস্তের ইন্দ্রধনুর মত নিমেষে লয় প্রাপ্ত হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার Modern Buddhism নামক পুস্তকে অনেকগুলি উড়িয়া ভাষায় লিখিত আপাতমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বাস্তবিক তাহা খাঁটী বৈষ্ণব গ্রন্থ নহে, তাহাতে আদিবুদ্ধ প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবগণের উল্লেখ আছে ও উড়িষ্যাতে এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম তথা তদবলম্বী বৌদ্ধগণ বিরাজিত। তাহাদিগকে এক হিসাবে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা যায়। ধর্ম্মপূজাও বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মেরই পূজা।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

---

* [প্রমাণ—১–১০,১৬-১৭—Cunningham's 'Bhilsa Topes;' ১১—Monier Williams :—Buddhism ; ১২—Grunwedell's Buddhist Art in India ; ১৩-১৫—Havell's The Ideals of Indian Art ; ১৮—N. N. Basu's Modern Buddhism]

জটাবুড়ি

এ ধরারে কর্‌লে ধনী অনেক ধনে,
কর্‌লে ধনী দেহে মনে।
ভোরের হাওয়া চুমোয় মাতায়
তরুণ তরু পাতায় পাতায়,
ভ্রমর মাতে কমল-বনে।

খর্জ্জুরেরই বক্ষ থেকে দিবস ভরে'
মরুর বুকে মধু ক্ষরে।
কুলিশ-কঠিন শিলার দেশে
রসাল এবং বারোমেসে
আঙুর আনার আপেল ধরে।

নিদাঘেরই তিয়াস-তাপের মুখে ধর
বাদল-বারি ঝর ঝর।
পাথর-কুচি বালুর তলে
ফল্গু-ধারা লুকিয়ে চলে
স্বচ্ছ শীতল স্নিগ্ধতর।

বিজন বিলে নাম-না-জানা ফুলের বাসে
কত কথাই মনে আসে!
জলকণাদের লাজুক ভাষা
বুকে তাদের বেঁধে বাসা
দিনের আঁখির আলোয় ভাসে!

*　　*　　*　　*

বিলের ধারে ফল্গুনদীর একটি বাঁকে
থুড় থুড়ো এক বুড়ি থাকে।
চুলগুলো তার ধুলোয় কটা,
রোদ-বাতাসে বেঁধে জটা

মাথার 'পরে রসে-ভরা বনের ফলে
পাখীদিগের আহার চলে।
আধ-মেলা তার মুখের 'পরে
শুক্‌নো পাতা খসে' পড়ে,
খিদে ডোবে চোখের জলে।

জল-পিপাসায় ফল্গুনদীর চড়ার বালি
দাঁত দেখায়ে হাসে খালি।
পাতার আতপত্র-তলে
মুখটি ঢাকা, বর্ষা জলে
দেহটিরে ধোয়ায় ঢালি'।

বনের পথে প্রণয়ীদের আনাগোনা;
লুকিয়ে কথা যায় যে শোনা।
বুড়ি ডেকে ফাটায় গলা,
শোনে কি কেউ, যায় না বলা,
পাতার আড়াল ঠেসে বোনা।

মায়েরা যায় ছেলে কোলে, গাগর কাঁখে,
বুড়ি কেবল চেয়েই থাকে।
ছেলের মুখে খেয়ে চুমো
কয় তারা, বাপ, ঘুমো ঘুমো,
জুজুবুড়ি পথের বাঁকে!

এম্‌নি করে জুজুবুড়ির দিবস কাটে।
শঙ্খ বাজে পল্লীবাটে।
মন্দিরে হয় রোজই অতি
জাঁক-জমকে দেবারতি,

* * * *

তবু মাঝরাতে সুখ উঠে বসে শয্যা ছেড়ে,
ঘুম টুটে দুঃস্বপ্ন হেরে।
জটাবুড়ি ধুলার পরে
ঘুমায় শুয়ে অকাতরে ;—
কোলের ছেলে কে নেয় কেড়ে ?

প্রণয়ীরা পরস্পরে ভালোবেসে
বুকে টানে প্রেমাশ্লেষে।
পরস্পরের দেহের ভারে
বুকের শুধু ভারই বাড়ে,
রয় না প্রণয় রাত্রিশেষে।

এম্‌নি করে এই পৃথিবীর সকলখানে,
সকল সুরে, সকল গানে,
যেমন করেই যে তারে গায়
ক্রন্দনেরই সুর লেগে যায়
অজানা এক ব্যথার টানে।

কেউ জানে না এই যে ব্যথা, এর বাসা যে
জটাবুড়ির বুকের মাঝে।
দিবস-নিশি অগোচরে
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে,
সবার বুকে বুকে বাজে।

ধরা-রাণীর নয়ন দুটি হয়ে নত
রহে সেথায় নিমেষ-হত।
দেহভরা স্বাস্থ্য-জ্যোতি,
আভরণের হীরে-মোতি,
হৃদয়ে তাঁর বিষম ক্ষত !

* * * *

নিকট-দূরে সব মানুষের চিতে চিতে
বাঁধন জাগে অলক্ষিতে।
বিনি-সূতার মালা হতে
একটি যে ফুল ঝর্‌ল পথে,
শিথিলতা সবগুলিতে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

লছমন ঝোলা

রামতীর্থের আশ্রম হইতে লছমন ঝোলা দেড় মাইল। আশ্রম পার হইয়াই একটি ক্ষুদ্র চড়াই দেখিতে পাইলাম। পার্ব্বত্যপথে চলিতে অনবরত চড়াই ও উৎরাই পার হইয়া যাইতে হয়। আমরা এই প্রথম চড়াই পাইলাম। পরে যে সকল চড়াই দেখিয়াছি, তাহার তুলনায় এ সকল বল্মীক-স্তূপ বলিলেও হয়। দেখিতে দেখিতে লছমন ঝোলার নিকটে আসিয়া পড়িলাম, বামদিকে একটি রাস্তা পর্ব্বতগাত্র

পড়িয়াছে। সেই রাস্তার উপরে একটা কাষ্ঠ ফলকে কালো মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে, "Tehri reserve forest"। তাহার পর একটু নামিলেই লছমন ঝোলা, অতি রমণীয় স্থান ; ইহাও একটী পুণ্যতীর্থ। দেশ-বিদেশের শত শত যাত্রী এই তীর্থে স্নান করিতে আইসে। আমরা যখন সেখানে পহুঁছিলাম, তখন যাত্রীর সংখ্যা খুব কমই ছিল ; পাঁচ-সাত জনের বেশী হইবে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহাদের



বর্ত্তমান লছমন ঝোলা। (গঙ্গাতীর হইতে)

পদব্রজে যাইতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক বলিয়া মনে হইল। অতি দূর পথ যাইতে হইবে বলিয়া ভদ্রলোক একটি ডাণ্ডী ভাড়া করিয়াছেন। ডাণ্ডী দেখিতে অনেকটা baby-carএর মত। Baby carগুলি একটু ছোট এবং সচক্র, কিন্তু এই ডাণ্ডীরূপ জিনিষটী অপেক্ষাকৃত বড় ও চক্রহীন। চারিজন মানুষে এই যান বহন করিয়া লইয়া যায়। এইরূপ যানের ভাড়া কাণ্ডী বা ঝাঁপানের চেয়ে অনেক বেশী। তীর্থে যাহারা জলের মত অর্থ ছড়াইতে চায়, ডাণ্ডী করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ তাহাদেরই পোষায়।

একটু গিয়াই রাস্তার বামদিকে একটি মন্দির দেখিলাম। এই মন্দিরে লক্ষ্মণজীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি আছে। আমরা স্বার্থশূন্য, ত্যাগী মহাপুরুষের চরণে প্রণাম করিলাম। মন্দিরের নিম্নেই গঙ্গা, মহাকায় পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া পতিত-পাবনী—রম্য তপোবন আভোগ পবিত্র করিয়া ছুটিয়াছে। গঙ্গার চোখ-জুড়ানো ভুবন-ভুলানো রূপটি ভাষায় বলিবার নয়, আঁকিয়া দেখাইবার নয়। এই রকমই কোন স্থানে বসিয়াই শঙ্করাচার্য্য বোধ হয়—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে!
ত্রিভুবন-তারিণি তরলতরঙ্গে!"

এই ছন্দোময়ী বাণীর মধ্য দিয়া অমৃতের উৎস ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। কবির "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" জননীর স্বচ্ছ তট-নিকটেই জন্মলাভ করিয়াছিল। সৌন্দর্য্য কোথায় লুকান রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে! এই পর্ব্বত-গাত্রে উচ্ছ্বাসময়ী গঙ্গার চঞ্চল বক্ষে কোথায় যে এই সৌন্দর্য্যের,

এই মন-মজানো ভুবন-ভুলানো আকর্ষণের বীজটী লুকানো আছে, তাহা বলা যায় না; তাহা মানুষের জ্ঞানের বাহিরে। এইখানে আসিলে মন-প্রাণ সকলই হারাইয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু কেন হারাই, কিসে হারাই, তাহা বলিতে পারি না। তীরে আরও দুই-একটি দোকান আছে। এই সকল দোকানে চাল, ডাল, আটা, 'নিমক,' 'ঘিউ' পাওয়া যায়। যাত্রীদের অনেকেই গঙ্গার এই পুণ্য-সলিলে স্নান করিয়া ডাল, চাল, 'নিমক,' ও 'ঘিউ'এর সংযোগে অপূর্ব্ব খাদ্যে পথ-হাঁটা ক্ষুধার শান্তি করিয়া গৃহের পথে ফিরিয়া থাকেন; বদরি-কাশ্রমে যাইতে অনেকেই সাহস করেন না।

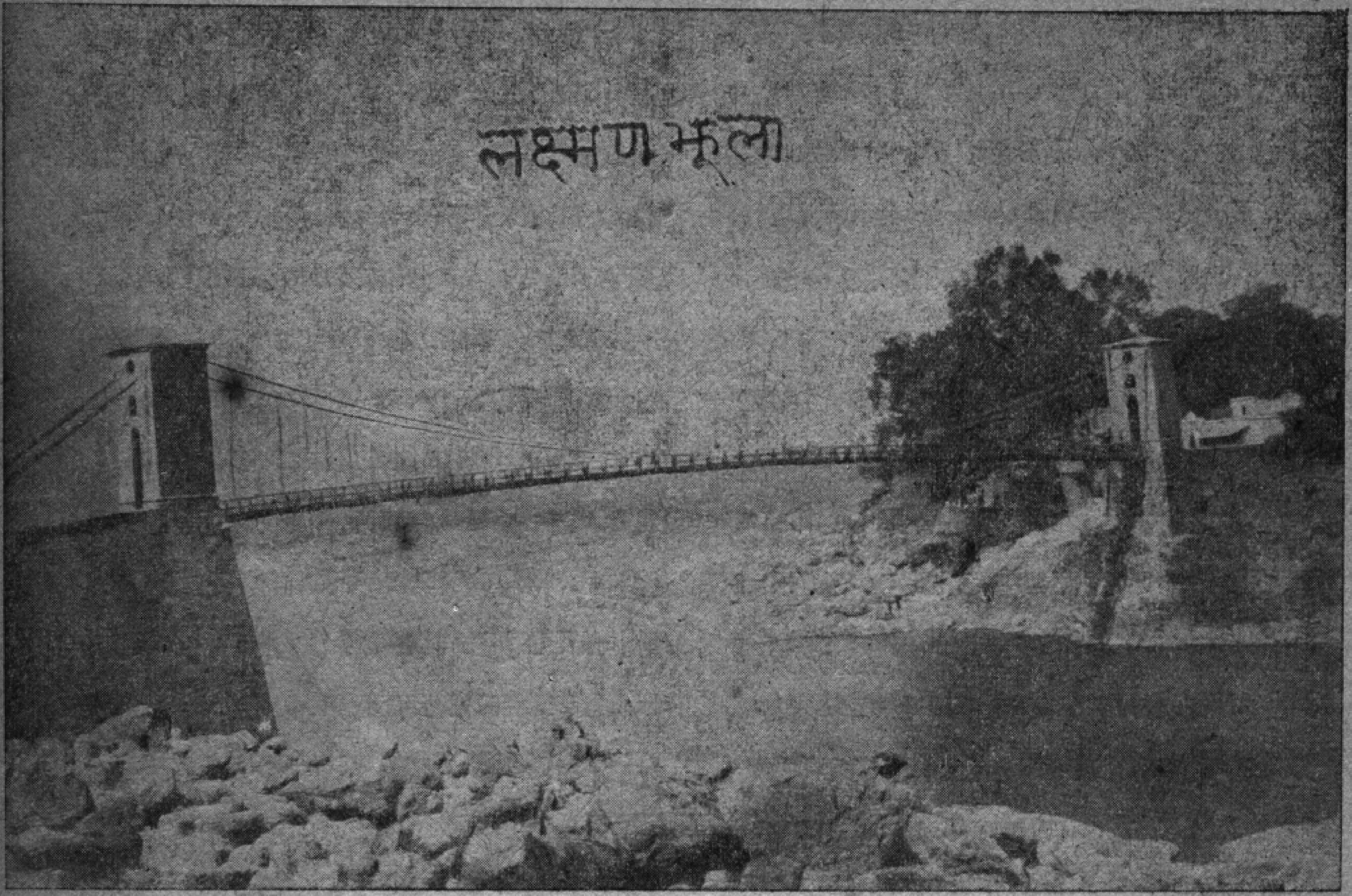
একটা কিংবদন্তী আছে যে রামানুজ লক্ষ্মণ দড়ির ঝোলার সাহায্যে তরঙ্গময়ী গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। আজকাল যাত্রীদের সুবিধার জন্য তীর্থভক্ত মাড়োয়ারীর অর্থে দড়ির ঝোলার স্থানে কাষ্ঠ ও লৌহ-নির্ম্মিত সেতু রচিত হইয়াছে। আর টলটলায়মান দড়ির ঝোলা হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবার ভয় তীর্থযাত্রীর নাই। আগে বোধ হয় লছমন ঝোলার নাম শুনিয়াই তীর্থযাত্রী দূর হইতে বদ্রীনাথকে নমস্কার করিয়া গৃহে ফিরিত। এই রকম দড়ির ঝোলা পার হইয়াও যাঁহারা সেকালে বদ্রীনাথ যাইতেন, তাঁহাদিগকে adventurous বলিলে বোধ হয় ক্ষমার অযোগ্য হইব না।

এই ঝোলা পার হইয়া বদ্রীনাথ-যাত্রীগণ গঙ্গাকে বামে রাখিয়া চলিতে থাকেন। এই খান হইতেই সহযাত্রীর সংখ্যা কমিতে থাকে।

জনশ্রুতি আছে যে পরমভক্ত বালক ধ্রুব এইখানে,এই গঙ্গাতীরেই তপস্যা করিয়াছিলেন। এখনও কয়েকটি সাধুর আশ্রম এখানে দেখা যায়। এইস্থান যে তপস্যার পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র তাহা একবার এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেই বুঝা যায়। এখানে যে আসিবে তাহারই প্রাণ গলিয়া যাইবে; সংসারক্লিষ্টচিত্ত ব্যক্তি প্রেমমুখর হইয়া বিভুগুণ গান করিবে। কতবার মনে হইল, সংসারশ্রান্ত অলস দেহকে কোমল বালুকা-রাশির উপর ঢালিয়া দিই। কতবার ধূলার উপর শুইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গঙ্গার কল কল ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম; নিজের কথা, দেশের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা—সব ভুলিয়া গেলাম। পুনঃ পুনঃ বালক ধ্রুবের তপোময়ী মূর্ত্তি মনে হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল। হায় ধ্রুব! হায় তপস্যা! হায় একান্ত নির্ভর! সন্তান-বিরহিনী জননীর স্নেহময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া অতি শৈশবে জন-মানবশূন্য নিবিড় গিরি-বনস্থলীতে তুমি কাহার জন্য কাঁদিয়াছিলে? হে বীর তাপস! হে গুরু! এই নির্ভর আমাকে শিখাইয়া দাও। আমিও সব ভুলিয়া তোমারই মত "কোথায় হরি! দেখা দাও!" বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াই।

কঠিন প্রাণ হঠাৎ কোমল হইয়া গেল;—সংসারের শত চিন্তায় যাহাকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখিতাম, আজ সেই চিরচঞ্চল মনের মধ্যে কিসের শান্তি-স্নিগ্ধ স্পর্শ-সুখ অনুভব করিলাম।

ধীরে ধীরে বালুচর হইতে উঠিয়া আশ্রমের দিকে ফিরিলাম। পথের দুই দিকে সারি সারি বন-পাদপ-শোভিত উটজশ্রেণী; বায়ুমণ্ডল সাধুগণের তানলয়সম্বলিত ভজন-গীতির সুরে মুখরিত! বড়ই আনন্দে পথ হাঁটিতে হাঁটিতে আশ্রমে ফিরিলাম। বেলা তখন প্রায় ১০ টা।



লছমন-ঝোলা

স্বামীজির আদর-যত্নে আমরা ফুলিয়া উঠিয়াছি। সে স্নেহ, সে যত্ন মানুষের নয়। এ যত্নে আমরা ঈশ্বরের করুণা দেখিতে পাইয়াছি। কি মহানুভবতা! শিশুর ন্যায় কি সরলতা! সংসারে এরকম সহৃদয়তা দেখিতে পাই কৈ?

স্বামীজি একখানি বই পড়িতে দিলেন, বইটির নাম, From Poverty to Power, By James Allen; অতি উপাদেয় গ্রন্থ, কতকটা পড়িলাম। চারিদিকে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি, বইএ চোখ দিয়া কি থাকা যায়? যাহা দেখি, তাহাতেই চোখ ভরিয়া যায়, প্রাণ ভরিয়া যায়! দিন বেশ সুখেই কাটিয়া গেল।

আজ ১৮ই মে; আজও স্বামীজির আশ্রমে। এমন আদর আর পাইব কোথায়? আজ আহারাদির পর বদ্রীনাথ রওনা হইব। স্বামীজি সঙ্গে একখানি বই দিলেন (The Path to the Masters of Wisdom), পথে পড়িব বলিয়া। বলিলেন, "পথে বড় শীত, আরও কম্বল লইয়া যাও"—এই বলিয়া ভাল ভাল দুই চারিটা কম্বল বাহির করিয়া দিলেন; যদি পথে টাকার অভাব হয়, তাই টাকাও দিতে আসিলেন। আবশ্যক-মত টাকা ও কম্বল আমাদের সঙ্গে ছিল, আর দরকার হইল না। পথে সকল জায়গায় তেল পাওয়া যাইবে না, তাই ভাল 'পুষ্পল তৈল' বাহির করিয়া দিলেন; চুলে জটা বাঁধিবে, তাই একখানি চিরুণীও দিলেন। নিজে কিন্তু তিনি এ সব ব্যবহার করেন না, নিজের জন্য তাঁর কোন খেয়ালই নাই।

আমাদের জন্য লুচি-তরকারি, নিজের সেই দেড়খানি শুক্‌ন রুটি! সংসারের ঠিক উল্‌টাটি। এ কি যত্ন! সমস্ত হৃদয়টা পরের জন্য! এরই নাম সাধুত্ব! আরও কত উপদেশ তিনি দিলেন, পথে এই এই জিনিষ খাইবে; এই এই জিনিষ খাইবে না। শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; বেশী জল বা বেশী টক (আম টাম)* খাইও না, পেটের অসুখ করিবে,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিতার স্নেহ, মাতার যত্ন, গুরুর আশীর্ব্বাদ সঙ্গে লইয়া রওনা হইলাম। আশ্রম ছাড়িতে প্রাণ চাহিতেছে না; স্বামীজি বলিলেন, "আমারও দুই-এক দিন একটু ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইবে।" আহারাদির পর স্বামীজির স্নেহের কোল ছাড়িয়া তাঁহার পবিত্র চরণ বন্দনা করিয়া রওনা হইলাম। চোখের কোণে দুই-এক ফোঁটা জলও আসিয়া জমা হইল।

"জয় বদ্রী বিশাল লাল কি জয়"—এই জয়-শব্দে দিগন্ত মুখরিত করিয়া আশ্রম পশ্চাতে রাখিয়া চলিলাম। আশ্রমের একটি লোক শ্রীনগর যাইতেছিল; (শ্রীনগর স্বর্গাশ্রম হইতে ৫।৬ দিনের পথ) তাহাকে ডাকিয়া স্বামীজি বলিয়া দিলেন, "নারায়ণ দত্ত, তুমিও যাচ্ছ, ভালই [redacted]-এঁদের সঙ্গে সঙ্গে যেয়ো, তবু অনেকটা সুবিধা হবে।" দুঃখের বিষয় নারায়ণজি অতি দ্রুতগামী, পথে আর তার সঙ্গসুখ আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল না।

আবার সেই লছমন ঝোলা! সেইখানে একটু বসিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। মনটা একটু কেমন কেমন করিতে লাগিল। বাঙ্গালীর মায়ের কোল ছাড়িতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; একটু যেন কেমনতর হইয়া পড়িলাম। মুখে কথাটী ছিল না! মনের ফটো লইবার উপায় থাকিলে ফটো লইয়া দেখাইতে পারিতাম—সে কি এক অদ্ভুত ভাব, না দুঃখ, না আনন্দ; না শান্তি, না চাঞ্চল্য। স্তব্ধ, নির্ব্বাক, ঔদাস্যময়!

গঙ্গাকে বামে রাখিয়া চলিয়াছি; পথ ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। পাহাড়ের উপরে উপরে রাস্তা। বামে নিম্নেই স্বচ্ছ-সলিলা অনন্তরূপময়ী চঞ্চল-বাহিনী গঙ্গা। কখনও ঘন নিবিড় ছায়ায় সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে; আবার কখনও বা গাছে গাছে পাতায় পাতায়, প্রস্তর-পৃষ্ঠে গঙ্গাজলে সূর্য্যরশ্মি ফলিত হইয়া আলোকের তরঙ্গ ছুটাইয়া দিতেছে। মাঝে মাঝে পথের ধারে কুসুম-কাননে ভ্রমর-গুঞ্জনে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইতেছে, যেন স্বর্গের পথে চলিয়াছি! সমতল ক্ষেত্র আর দেখা যায় না, গঙ্গার দুইকূল চাপিয়া সোজাসুজি পর্ব্বতমালা উঠিয়া গিয়া আকাশ ছুঁইয়াছে। সকলই অভিনব, সকলই রমণীয়, পথ অতি দুর্গম, আবার মধ্যে মধ্যে অল্লাধিক চড়াই, তবুও ক্লান্তি বোধ হইতেছে না। গুরুজি প্রায়ই মন্থরগামী,—ভাবাবেশে কি পথ-পর্য্যটনে

* পথে মাঝে মাঝে কচি আম পাওয়া যাইত; রোদের সময় বড় ভালও লাগিত। পথে এক মালাবার কোচিবাসী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গী হইয়া ছিলেন, তিনি বেশ আমের চাটনি তৈয়ার করিতে পারিতেন। তাঁহার কৃপায় পাথুরে মুখটা মাঝে মাঝে একটু সরস করিয়া লইতাম।

অপটুতা-বশতঃ তাহা বলিতে পারি না। নধর নন্দদুলালের মত চেহারা পাহাড়ের সঙ্গে খাপ খাইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে দুই-একটি নবীন যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, আর অম্‌নি সেই জয়-শব্দ—"জয় বদ্রীবিশাল লাল কি জয়" পর্ব্বতে পর্ব্বতে ধ্বনিত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। মালাবার-কোষ্ট-নিবাসী কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হইল; তাঁরা আমাদের মত ফকিরী চালে বাড়ী হইতে বাহির হন নাই; সংসার-শুদ্ধ মাথায় লইয়া তাঁহারা তীর্থের পথে পা দিয়াছেন—তাঁহাদের বাস্ত দেবতাটিকেও সঙ্গে লইয়াছেন—পথে দেবতাটির পূজাদিও খুব ঘনঘটার সহিত চলিত, প্রসাদে বঞ্চিত হইতাম না। আর যাহাই হউক, তাঁহাদের সঙ্গে পথ-হাঁটায় পান-তামাকের যোগাড়টা বেশ হইয়াছিল। ইহাদের কর্ত্তা যিনি, তাঁহার হৃদয়টি স্নেহে পরিপূর্ণ। তাঁর সেই স্নেহের পরিচয় আমরা অনেকবার পাইয়াছিলাম।

লছমন ঝোলা পার হইয়া দেড় মাইল আন্দাজ, যাইতেই গরুড়-চটি পাইলাম; চটিটি দেখিতে মন্দ নয়। চটির পাশেই একটি বাগান, তাহাতে কলা, লেবু প্রভৃতি ফলের ও নানারকম ফুলের গাছ হইয়াছে ও সাম্‌নেই দক্ষিণে একটি ঝরণা পাহাড়ের গা দিয়া ঝুর ঝুর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাশেই গঙ্গা, সেই অনন্তরূপময়ী অমৃত-বাহিনী—। মনে হইলে বুকের ভিতরটা এখনও কেমন করিয়া উঠে!

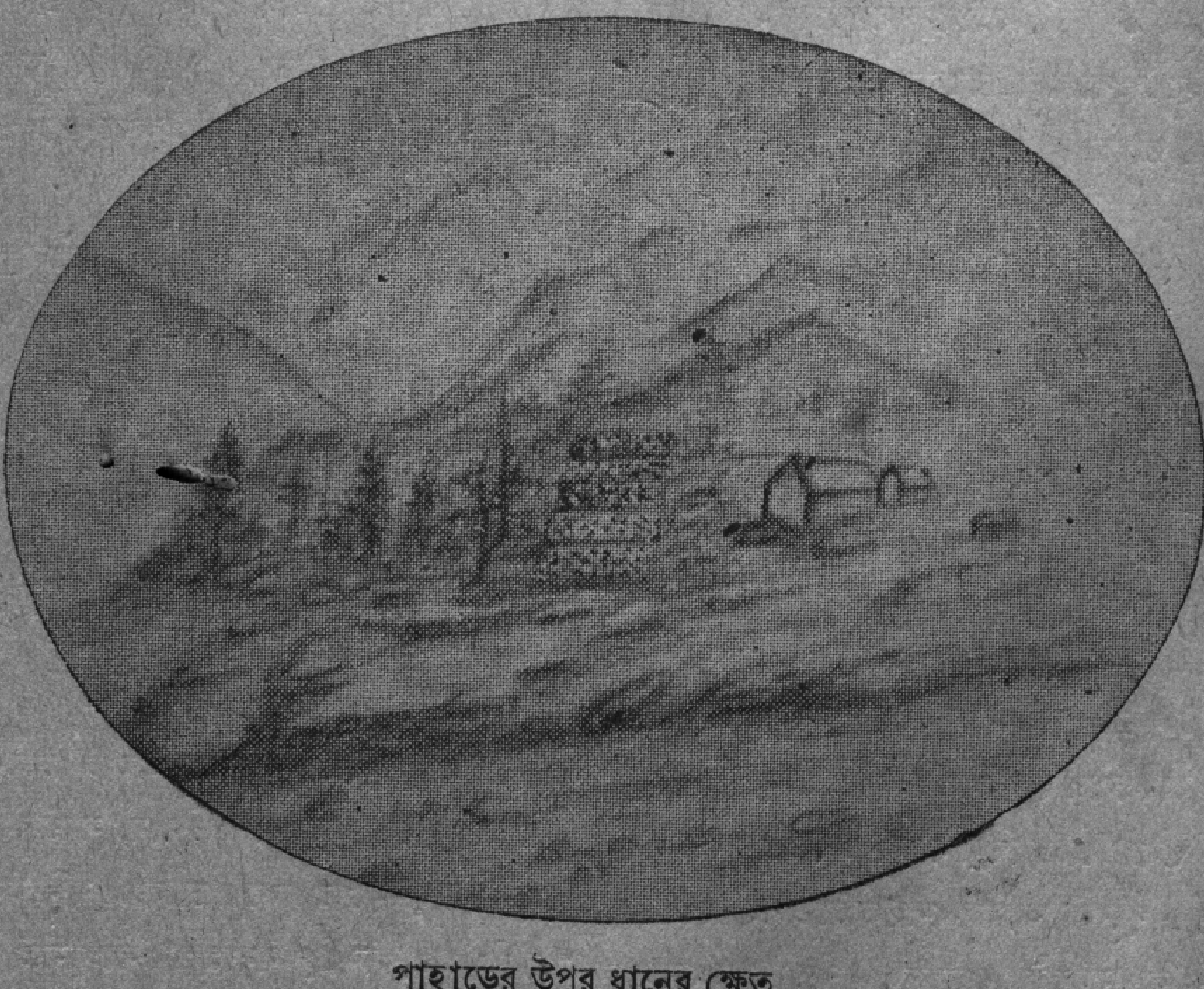
মাঝে মাঝে দেখিতে পাইলাম, ধ্রুব-প্রহ্লাদের চেলার মত ছিটেফোঁটা-কাটা ছেলের দল ভক্ত তীর্থ-যাত্রীর অকাতরে দত্ত দুই একটি পয়সা হাতাইবার জন্য গাছের ছায়ায় বসিয়া বদ্রীনাথের স্তুতি-গান করিতেছে। কোথায় বদ্রীনাথ, তার কূল-কিনারা নাই, তবুও তাদের সেই গান শুনিয়া মনে হইল, আর একটু হাঁটিলেই বাবা বদ্রীনাথের পায়ের কাছে গিয়া পড়িব।

লছমন ঝোলা পার লইয়া মৌনা চটি পর্য্যন্ত পথটি প্রায়ই ঘনবনাচ্ছন্ন। যাইতে যাইতে একটু একটু গা ছম্ ছম্ করে। লছমনঝোলার চার মাইল উপরে ফুলবাড়ি চটি। বেলা প্রায় তিনটার সময় এইখানে পহুঁ-ছিলাম। ডাল চাল আটা "নিমক মশালা" ছাড়া এখানে আর কিছুই পাওয়া যায় না। তবে গঙ্গা অতি নিকটে; সেই জলেই স্নান, সেই জলই পান—এইমাত্র সুবিধা; অন্যত্র আবার যাত্রীদের অদৃষ্টে এ সুবিধাটিও ঘটে না। স্থানে স্থানে চটিগুলি পাহাড়ের এত উপরে যে, সেখান হইতে কেবল দর্শনমাত্রই ঘটিয়া থাকে, স্পর্শন কল্পনাতীত, নামিতে ত্রিভুবন টলিয়া যায়। ফুলবাড়ির গঙ্গার ঢেউ বড় বেশী, ঢেউগুলি তালগাছের মত বলিলে তার আর নূতনত্ব থাকে না—পাহাড়ের কোলে পাহাড়ের মত ঢেউগুলি আসিয়া দুই কূল কাঁপাইয়া দিতেছে; ঢেউয়ের মুখে পড়িলে দুই-চারিটা হাতীও সদ্য গঙ্গালাভ করিবে!

ইহার দুই মাইল উপরে গুলর চটি নামে চটি, আসলে একখানি অতি জীর্ণ খোড়ো চালা মাত্র; যাইবার সময় সেখানে যাত্রীর নাম-গন্ধও পাইলাম না। দূর হইতে দেখিলাম, আমাদের সেই নারায়ণজী বসিয়া বসিয়া তখনো হুঁকায় টান দিতেছে, তাহার পাশে আর একটা

লোক কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। আমাদের দেখিয়া নমস্কার করিল। আমরা তেমনই চলিয়াছি।

গুলর চটি পার হইয়া একটু যাইতে না যাইতেই আমরা যাহা দেখিলাম, তাহা অতি বিস্ময়কর ও ভয়প্রদ। এক বৃদ্ধা মাড়োয়ারী রমণী তীর্থ-দর্শনের আকুল উৎকণ্ঠায় প্রাণের মায়া ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে; রমণী অতি বৃদ্ধা, হাঁটিতে পারিতেছে না। লাঠির উপর ভর দিয়া—দুই-এক পা চলিতেছে, আবার থামিতেছে; পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, কে জল আনিয়া দিবে? পদে পদে পদস্খলিত, কে পদদ্বয়ে শক্তি-সঞ্চার করিবে? দুর্গম পার্ব্বত্য পথ, চারিদিকে নিবিড় অরণ্যানী, একাকিনী রমণী কিরূপে এই দূর দুর্গম পথ অতিবাহন করিয়া চলিবে? ধন্য প্রভু বদ্রীনারায়ণ! ধন্য তোমার আকর্ষণ! যমরাজের প্রচণ্ড দণ্ড চোখের সাম্‌নে দেখিয়াও বৃদ্ধা পশ্চাৎপদ হইতেছে না; তবুও চলিয়াছে, আকুল আবেগে, উদাস দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া আবার চলিয়াছে। কি অচল বিশ্বাস! এর-চেয়ে আর কি কঠোর তপস্যা থাকিতে পারে? গুরুজির প্রাণ গলিয়া গেল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না—"মা, আমাদের কাঁধের উপর ভর দিয়া চল"—এই বলিয়াই পিতার মত তাহার হাতটি কাঁধের উপর তুলিয়া লইলেন। তবুও কি বৃদ্ধা চলিতে পারে? তাই ত কি করা যায়, উপায় কি? সাত-পাঁচ ভাবিয়া বৃদ্ধাকে পিঠের উপর তুলিয়া লইয়া যাইতে চাহিলে বৃদ্ধা সাহস করিল না। অগত্যা দুইজনে বৃদ্ধার দুইটি হাত কাঁধের উপর রাখিয়া ধীরে



পাহাড়ের উপর ধানের ক্ষেত

ধীরে চলিতে লাগিলাম। মালাবার বন্ধুদের খুঁজিলাম, পাইলাম না, তাঁহারা অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছেন। এ ক্ষুদ্র সাহায্যে কি হইবে? সম্মুখে পথ অনন্ত,বৃদ্ধা সম্পূর্ণ নিঃশক্তি! বৃদ্ধাকে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বলিয়া আমরা বৃদ্ধার অগ্রগামী সহযাত্রিদের অন্বেষণে ছুটিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, তাহার সহগামীর আনুকূল্যে বৃদ্ধা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। পথে আমাদের সঙ্গে আর একবার দেখা হইয়াছিল, বৃদ্ধা তখন কাণ্ডীতে।

কাণ্ডী জিনিষটা কি, তাহা বোধ হয় পাঠকগণ কতক বুঝিয়াছেন। একটা খুব-লম্বা ঝুড়ির মত, তাহারই উপর পদব্রজে গমনে অসমর্থ যাত্রী বহুকষ্টে উপবেশন করে, আর সেই মানুষ-শুদ্ধ কাণ্ডিটা পিঠের উপর তুলিয়া লইয়া অতি কষ্টে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাহাড়ী কঠোর-প্রাণ দীন কাণ্ডি-ওয়ালা তাহার জীবিকা অর্জ্জন করে।

'ফুলবাড়ি' পার হইয়া আর গঙ্গা দেখিতে পাইলাম না। বরাবর গঙ্গার তটে তটে না গিয়া 'ফুলবাড়ি' পার হইয়াই যাত্রীদিগকে একটু বাঁকিয়া যাইতে হয়। গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা নির্গত হইয়া আমাদের পথের পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের উপর ধানের ক্ষেত দূর হইতে দেখা যাইতেছে। তাহারই মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে এক একটি কুটীর বড়ই সুন্দর। নীরব পর্ব্বত-বক্ষে যেন চাঞ্চল্যের ছবি আঁকিয়া দিয়াছে!

গুলর চটির তিন মাইল উপরে মৌনাচটি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা সেই চটিতে পহুঁছিলাম। চটিগুলি সমস্তই খোড়ো, বারাণ্ডার মত, চারিদিক ফাঁকা, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাতেই কোনরকমে রাত কাটাইতে হয়। এখানে গুড় চিনি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়; চিনিটা তত ভাল নয়, দরও খুব বেশী (একসের ১৷৹), তাহাতে আবার কি মিশাইয়া দিয়াছে। এখানে অনেকগুলি যাত্রীর সহিত আমাদের দেখা হইল। বৃদ্ধার সহযাত্রীদিগকেও এখানে দেখিলাম; বৃদ্ধাকে আনিবার জন্য তাহারা একটি ঘোড়া ও সঙ্গে লোক পাঠাইয়া দিয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে দুই-চারিজন বাঙ্গালীও ছিলেন। পরে অনেক স্থানেই ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে।

পথ হাঁটিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; ক্ষুধা বেশ হইয়াছিল। "অবিয়স্তীর ঠন্‌কার ঘা" ভাত রাঁধিলাম, একেবারে গলা! গুরুজি দেবতার ভোগ দর্শনের মত একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। আমি কি করি? নিজের রান্না কি খারাপ হয়, অতি-কষ্টে দুই-এক গ্রাস গলাধঃকরণ করিলাম।

মালবার দেশবাসী কোন এক ভদ্রলোকের সহিত আমাদের এইখানে দেখা হয়, অতি সুন্দর লোক, তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার সহিত কথা কহিতে মাথার টনক নড়িয়া যায়! তিনি বাঙ্গালা, হিন্দি, ইংরাজী কি সংস্কৃত কোন ভাষাই জানেন না। তবে কাজ চালাইয়া লইবার মত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অনেক শব্দই তিনি জানেন। ইঙ্গিতাদির দ্বারা অনেক কাজই সারিয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে একটি টেঁকঘড়ি ছিল; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"সময় কত?" অমনি তিনি মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ্যাঁ time,কালঃ? সময়ঃ?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁর

ঘড়িটিও দেখাইলেন। ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিলাম; তখন তিনি অঙ্গুলি ও ভাষার সাহায্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন;—টু (two) টু (two) (সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলিপ্রদর্শন) অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধ (আঙ্গুল মুড়িয়া) half, half—এই রকমে তাঁর বক্তব্য তিনি শেষ করিলেন।

আহারাদি যে কেমন হইল, তা আত্মারামই জানেন, তারপর "নিদ্রাতুরানাং কিবা চাষবাড়ি" সেইখানেই কম্বল বিছাইয়া শয়ন ও নিদ্রা। মালাবার-বন্ধুও পাশে শুইয়া।

ইনি কথাবার্ত্তায় প্রায় অনুস্বার ব্যবহার করিতেন এবং "চল বা চলুন" না বলিয়া বলিতেন, "পোঁ পোঁ," এইজন্য আমোদ করিয়া আমরা তাঁর নাম রাখিয়াছিলাম, "ইঙো পোঁ।"

আমাদের সঙ্গে মুটিয়া বা কাণ্ডিওয়ালা ছিল না, কম্বল,গায়ের কাপড়, দুই-একটা জামা মাত্র সঙ্গে, ইহার জন্য আবার পরাধীনতা কেন? আর একটা কথা—ক্লেশ-স্বীকার, তীর্থদর্শনে "আরাম" বর্জ্জনীয়; তাই লোটা-কম্বল স্কন্ধে তুলিয়া পাহাড়ি পথ হাঁটিতে সুরু



অতি কষ্টে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাহাড়ী কঠোরপ্রাণ দীন কাণ্ডীওয়ালা তাহার জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

করিয়াছিলাম। কিন্তু পাহাড়ি "চড়াই উতরাই"এর ঠেলা সাম্‌লাইতে পরণের ধুতি-খানিও যে ভারী বোধ হয়, তা ত আর আগে জানিতাম না। জানিলে ক্লেশ-স্বীকারের কথাটিও মুখে আনিতাম না। গুরুজি ত—আর বলিব না—একেই কাতর, তার উপর লোটা-কম্বল! গায়ের ভার লাঘব করিবার জন্ত হাতের ধুতিখানি একটি পথিককে ডাকিয়া বিলাইয়া দিলেন। তাই ঘুমাইবার আগেই একটি মুটিয়া ছোকরা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম।

ভোর না হইতেই যে যার আপনার পোটলা-পুটলি বাঁধিয়া কেহ বা স্বয়ং, কেহবা কাণ্ডিওয়ালার মাথায় পর্ব্বত-প্রমাণ লোটা-কম্বলের বোঝা তুলিয়া দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—আমরাও গা মেড়া দিয়া "জয় বদ্রীবিশালনাথ কি জয়" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। স্বামীজি একটি লাঠি দিয়াছিলেন, গুরুজির হাতে সেই "স্বামীজিওয়ালা লাঠি", আর মাথায় পগ্‌গ, সকালবেলা, নূতন তেজ, ঠাণ্ডা হাওয়ায় খুব চলিয়াছেন।

আজ ১৯শে মে সোমবার। সামনেই দুরন্ত চড়াই। পথ বরাবর উঠিয়া গিয়া আকাশ ছুঁইয়াছে; একটি পর্ব্বতের উপর উঠিতে না উঠিতেই সাম্‌নে আর একটি পর্ব্বত, তার পর আর একটি, তার পর আর একটি; পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, ক্রমশঃ উঠিয়াই চলিয়াছি; পথ আর ফুরাইতে চায় না। চড়াইয়ের অন্ত নাই, কোন্ স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য চড়াইয়ের পর চড়াই ক্রমশই মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। যাত্রিগণ চলিয়াছে ধীরে ধীরে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে; যেন সকলে এই নূতন চলিতে শিক্ষা করিতেছে।

ধীরি ধীরি পাটি পাটি করিয়া চলিয়াছি, যেন কে শিকল দিয়া পা-দুটি বাঁধিয়া ফেলিয়া নীচের দিকে টানিতেছে। বুকের ভিতর বর্ষাকালের বিজলী হাওয়া ছুটিয়াছে। যাত্রীরা দুই-এক পা যায়, আবার দাঁড়ায়; বন্ধুবর ইঙো পোঁর নিকট এক লোটা জল ছিল, তাই এক এক গণ্ডুষ পান করিয়া সকলে দম রাখিতেছি। সকালবেলার ঠাণ্ডা হাওয়াও হার মানিয়া যাইতেছে,ঘামের চোটে পরণের কাপড়টি পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। জামা কি আর গায়ে রাখা যায়, চাদরটিও ভারি ঠেকিতেছে। মাথার চুলগুলো কামানো থাকিলে বোধ হয় কষ্টের অনেকটা লাঘব হইত। চট্টগ্রামের এক ভদ্রলোক ত রাস্তার উপর শুইয়া পড়িবার যোগাড় করিয়াছিলেন। এখনও অনেক পথ, ইহারই মধ্যে এই, না জানি, পরে আরও কি হইবে! আজ গুরুজির অবস্থা কিছু শোচনীয়, ঈশ্বরের কৃপায় বপুটি ত কম বিপুল নয়! পাহাড়ী চড়াই ঠেলা যে কি শক্ত ব্যাপার, তা এই রকম বপুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিলিতোনা

২

যে সময়ে দর্শকেরা তুমুল কোলাহল সহকারে রঙ্গভূমি অধিকার করিল—গ্যালারির ধাপগুলা ক্রমশ নিবিড় জনতায় কালিমবর্ণ ধারণ করিল, সেই সময়, পিছনের একটা দরজা দিয়া কতকগুলা মল্ল নেপথ্য হইতে বাহির হইয়া প্রবেশ করিল।

চুণ-কাম-করা একটা মস্ত দালান—বিষাদ-ময় ও নগ্ন। কেবল দেয়ালে ঝোলানো মেরী দেবীর ধূমান্বিত চিত্র রহিয়াছে—মাতৃদেবীর সম্মুখে ছোট ছোট মোম-বাতির পীতাভ বিকম্পিত শিখা মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। সকলেরই মনে মৃত্যুর আশঙ্কা; মল্লগণ দেবীর একান্ত ভক্ত ও কুসংস্কারাপন্ন; প্রত্যেকেরই এক-একটা রক্ষাকবচ আছে; সেই রক্ষা-কবচের উপর উহাদের অগাধ বিশ্বাস; কতকগুলি পূর্ব্বসূচনা বা নিমিত্ত দেখিলে উহারা দমিয়া যায়, আবার কতকগুলি দেখিলে সাহস ও ভরসা পায়। উহারা বলে,—কোন্ লড়াই মারাত্মক হইবে তাহা উহারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারে। মাতৃদেবীর সম্মুখে মানৎ করিয়া একটা বাতি পোড়াইলে এই ভাগ্যলিপির সংশোধন হয় এবং বিপদ কাটিয়া যায়। তাই ঐ দিন, ১২টা বাতি জ্বালানো হইয়াছে। আন্দ্রে পূর্ব্বরাত্রে যে গাভীরার ভীষণ প্রচণ্ড ষাঁড়ের কথা ফেলিসিয়ানার নিকট বলিয়াছিল—তাহার সত্যতা ইহা হইতেই সপ্রমাণ হয়। প্রায় বারো জন মল্ল রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল। কাচবৎ মসৃণীকৃত ছিট্‌বস্ত্রে পৃষ্ঠ আবৃত। মাতৃদেবীর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সকলেই খুব ঝুঁকিয়া মাথা নোয়াইল। এই কর্ত্তব্যটি শেষ করিয়া, উহারা টেবিলের উপর যে অগ্নিপাত্র ছিল তাহা লইবার জন্য গমন করিল। কাঠের হাতল-যুক্ত এই ক্ষুদ্র পাত্রটি অঙ্গারে ভরা, সিগারেট্-পায়ীদিগের সুবিধার জন্য ইহা টেবিলের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। উহারা সিগারেট্ হইতে ধূম ফুৎকার করিতে করিতে পায়চালি করিতে লাগিল অথবা দেয়াল ঘেঁসিয়া বরাবর যে কাঠের বেঞ্চ রহিয়াছে তাহার উপর গট্ হইয়া বসিল।

উহাদের মধ্যে কেবল একজন পরমারাধ্যা দেবী-চিত্রের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কোন প্রকার ভক্তির চিহ্ন প্রদর্শন না করিয়া, একান্তে পৃথকর্ভাবে বসিয়াছে এবং পায়ের উপর পা আড়ভাবে রাখিয়া স্নায়ুর উত্তেজনা-বশে ঘনঘন পা দোলাইতেছে। পায়ের রেশমি মোজা চিক্‌চিক্ করিতেছে; হঠাৎ মনে হয় যেন মার্বেলের পা। হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জ্জনী উহার খাটো হাতা-বিহীন চোগার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়াছে এবং তিনভাগ ভস্মীভূত সিগারেট্ ঐ দুই আঙ্গুলে খুব দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে। সিগারেটের আগুন প্রায় আঙ্গুলের মাংসে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু ঐ মল্লবীরের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। দেখিলে মনে হয় যেন কি এক সর্ব্বগ্রাসী চিন্তায় নিমগ্ন।

লোকটির বয়স ২৫ হইতে ২৮ বৎসরের মধ্যে। মুখের রং রোদে-পোড়া, চক্ষুদ্বয় জেট্-পাথরের মত কালো, চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া। এই সমস্ত লক্ষণে আণ্ডালুজ প্রদেশের লোক বলিয়া বুঝা যায়। সাহসী যুবকবৃন্দের জন্মভূমি সেভিল সহর হইতে নিশ্চয় আসিয়াছে—সেই সব যুবক যাহারা গিতার বাজায়, দুষ্ট অশ্বকে বশে আনে, বন্য বৃষদিগকে বল্লমে বিদ্ধ করে, যাহাদের বাহু লোহার মত শক্ত, যাহাদের হস্ত স্বল্প কারণেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। ওরূপ বলিষ্ঠ শরীর ও সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় দেখা যায় না। দৈহিক বল এমন এক সীমায় আসিয়া থামিয়াছে, যাহার পর দেহ কেবল গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কি মল্লযুদ্ধ, কি দৌড়ধাপ উভয়ের পক্ষেই শরীর বেশ সুগঠিত। বৃষযুদ্ধের মল্ল তৈয়ারী করিবার জন্যই যেন প্রকৃতিদেবী ইচ্ছা করিয়া তাহার এই শরীর গড়িয়াছেন। তাহার খাটো-হাতা-হীন চোগার খোলা-অংশের ফাঁক হইতে দেখা যাইতেছে—ভিতরকার মাংস-রঙের ফতুয়ায় কতকগুলো চুম্‌কি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

একটা আংটিতে তার গলাবন্দের প্রান্তদ্বয় আট্‌কানো রহিয়াছে—আংটির রত্নটি বেশ দামী বলিয়া মনে হয়; এই বহুমূল্য রত্নের সহিত সমস্ত পরিচ্ছদই তাহার উচ্চবংশ সূচিত করিতেছে।

এই মল্লবীরের নাম জুয়াঙ্কো। একজন সুশ্রী ও সুবেশী নারীবল্লভ যুবকের যাহা হওয়া উচিত—উহার চেহারায় কিন্তু সেরূপ একটা খোলা-খালা ভাব ছিল না; আসন্ন যুদ্ধের ভয়ে তাহার চিত্তশান্তি কি বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল? এই যুদ্ধে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু জুয়াঙ্কোর মত বলিষ্ঠ নবীন যুবকের চিত্ত কোন বিপদের আশঙ্কায় কথনই আকুল হইতে পারে না।

ও-সব কিছুই নহে! এক বৎসর হইতে জুয়াঙ্কোর এইরূপ মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইছে। উহার সমবিপদভাগী সঙ্গীদের সহিত স্পষ্ট বৈরিতা না থাকুক, উহাদের সহিত মন-খোলাখুলি বা আমোদ-প্রমোদের ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। কেহ যদি উহার সহিত ভাব করিতে অগ্রসর হইত, সে তাহাকে বাধা দিত না—কিন্তু নিজে কাহারও সহিত গায়ে-পড়িয়া বন্ধুত্ব করিত না। যদিও আন্দালুস-প্রদেশের লোক, জুয়াঙ্কো ইচ্ছা করিয়া চুপ্‌চাপ্ করিয়া থাকিত। তথাপি, কখন কখন বিষণ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া জুয়াঙ্কো একটা কৃত্রিম উল্লাসের অসংযত উচ্ছ্বাসের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিত। অন্যসময়ে সচরাচর মিতপায়ী, কিন্তু এই সময়ে অপরিমিত সুরাপানে মত্ত হইয়া শুঁড়িখানায় গোলমাল করিত, তাণ্ডব-নৃত্য করিত, এবং অনর্থক ঝগড়া বাধাইয়া ছোরা চালাইতেও কুণ্ঠিত হইত না; তাহার পর যথন নেশার ঝোঁক চলিয়া যাইত, আবার সে মৌনভাব ধারণ করিত, আবার কি-এক চিন্তায় মগ্ন হইত।

স্থানে স্থানে সমবেত এই সব লোক-মণ্ডলীর মধ্যে, একসঙ্গে নানাপ্রকার কথাবার্তা চলিতেছিল; প্রেমের কথা হইতেছিল, রাজ-নীতির কথা হইতেছিল—সবচেয়ে বেশী বৃষদের কথা হইতেছিল।

স্পেনীয় ভাষা-সুলভ আড়ম্বরময় শিষ্টাচারের

ভাষায় একজন মল্ল আর একজন মল্লকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ—"হজুর, মাজপুল্লের কালো ষাঁড়টার সম্বন্ধে আপনার কি মত? অর্জনা যে বল্‌ছিল, 'ষাঁড়টার নিকট-দৃষ্টি', তা কি সত্যি?"

—"ওর একটা চোখ্‌ 'নিকট-দৃষ্টি' আর একটা 'দূর-দৃষ্টি'; তার উপর বিশ্বাস করা যায় না।"

—"আর সেই লিজাসোর ষাঁড়টা—যার কালো রং—সে কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে শিঙের গুঁতো দেবে মনে করেন?"

—"আমি তা বল্‌তে পারি নে; আমি কাজে তাকে কখন দেখি নি; তোমার মত কি, জিয়াঙ্কো?"

যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া—সম্মুখস্থ যুবকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই জিয়াঙ্কো উত্তর করিল ঃ—"ডান দিকের শিং দিয়ে।"

—"কেন?"

—"কেননা, সে তার ডান্‌ কানটাই সর্ব্বদা নাড়ায়, এইটেই অব্যর্থ চিহ্ন।"

এই কথা বলিয়া জুয়াঙ্কো, অবশিষ্ট সিগারেট্‌টা ঠোঁটে ধরিয়া একটানে উহাকে শুভ্র ভস্মে পরিণত করিল।

বৃষযুদ্ধের নির্দিষ্ট সময় আসন্ন হইল। জিয়াঙ্কো ছাড়া আর সব মল্লেরাই আসন হইতে উঠিয়া পড়িল; কথাবার্ত্তা একটু ঢিমা হইয়া আসিল—বল্লমধারী অশ্বারোহী-দের বল্লমের আঘাতের চাপা আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল। উহারা একটা প্রাচীরের গায়ে বল্লমের আঘাত করিয়া বল্লমের তীক্ষ্ণ ধারের পরীক্ষা করিতেছিল। রক্ষীরা বাহুর নিম্নভাগের উপর উহাদের রক্তবর্ণ বহির্বাসের ভাঁজগুলা একটু গুছাইয়া রাখিয়া একটু 'ভাবন' করিয়া নয়নাকর্ষকভাবে সারি দিয়া দাঁড়াইল।

একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল; কেননা, রঙ্গস্থানে যে সময়ে মল্লেরা প্রবেশ করে, এই প্রবেশের মুহূর্ত্তটা বড়ই ভীষণ-গম্ভীর, যাহারা চিরহাস্যময় তাহারও এই সময় বিষণ্ণ হইয়া পড়ে।

সকলের শেষে, জুয়াঙ্কো গাত্রোত্থান করিল; বহির্বাসটা খুলিয়া বেঞ্চের উপর ফেলিয়া রাখিল। তাহার পর তাহার অসি ও অশ্বতরকে লইয়া ঐ বিচিত্রবর্ণ লোক মণ্ডলীর মধ্যে মিশিয়া গেল।

তাহার ললাট হইতে চিন্তা-মেঘ অন্তর্হিত হইল। তাহার চোখ্‌ দুটা জ্বলিতে লাগিল, প্রসারিত নাসারন্ধ্র দিয়া সজোরে নিশ্বাস বহিতে লাগিল। একটা ঔদ্ধত্যের ভাব সমস্ত মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশেই যেন বুক ফুলাইয়া সদর্পে পদক্ষেপ করিতে লাগিল।

উহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ, উহার পোষাকও তেম্‌নি জাঁকালো।

শেষ তূরীধ্বনি হইয়া গেল; এইবার সময় হইয়াছে। এক্ষণে বল্লমধারী অশ্বা-রোহীগণ, ষাঁড়ের আগমন যাহাতে না দেখিতে পায় এইজন্য তাহাদের অশ্বের ডান চোখের উপর রুমাল নামাইয়া দিয়া, অন্য সহযাত্রীদের সহিত মিলিত হইল এবং শৃঙ্খলার সহিত রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল।

যখন জুয়াঙ্কো রাণীর নির্দিষ্ট আসনের

সম্মুখে নতজানু হইল, তখন জুয়াঙ্কোর উদ্দেশে দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে একটা বাহ্‌বা-সূচক গুঞ্জন সমুত্থিত হইল। জুয়াঙ্কো যুগপৎ বিনয় ও গর্ব্বসহকারে এমন শোভনভাবে জানু নত করিয়াছিল, যে পুরাতন রাজ-কর্ম্মচারীরা সকলেই একবাক্যে বলিল যে, এরূপ সুচারুভাবে পূর্ব্বতন প্রখ্যাত মল্লেরাও কেহ করিতে পারে নাই। এইসময় একজন সার্কাশের ভাঁড় ঘোড়া ছুটাইয়া আসিল; তার পা রেকাব হইতে বাহির হইয়া পড়ায়, পড়িবার ভয়ে সে ঘোড়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া যেন অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে এইরূপ ভয়ের অভিনয় করিতে লাগিল।

আন্দ্রে যুদ্ধ-ক্রীড়ার এই সব গৌড়চন্দ্রিমার দিকে বড় একটা লক্ষ্য করে নাই। ইতিমধ্যে একটা ষাঁড় শিং দিয়া একটা ঘোড়ার উদর বিদ্ধ করিয়া অন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। তখনও আন্দ্রে সকলের দিকে একবারও চাহিয়া দেখে নাই!

আন্দ্রের পাশে যে তরুণী বসিয়াছিল, আন্দ্রে তাহার দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। যদি তরুণী তাহা জানিতে পারিত তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই খুব বাধো-বাধো ঠেকিত—সঙ্কোচ বোধ হইত। তরুণী আন্দ্রের নিকট পূর্ব্বাপেক্ষা আরও চিত্তমোহিনী বলিয়া মনে হইল অনেক সময় স্মৃতির সহিত মানসী মিশিয়া স্মৃতিকে অবাস্তব করিয়া তোলে; তাই প্রেমিক স্বকীয় স্বপ্ন-দৃষ্টাকে বাস্তব জীবনে যখন আবার দেখিতে পায়, তখন অনেক সময় তাহার মোহ ছুটিয়া যায়, ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। এই অপরিচিতার সৌন্দর্য্যকে কল্পনা তিলমাত্রও বাড়াইতে পারে নাই। বস্তুত স্পেনীয় সার্কাসের নীল প্রস্তরের আসন-ধাপের উপর ওরূপ পূর্ণ-আদর্শের রূপসী ইতিপূর্ব্বে কখনই উপবিষ্ট হয় নাই।

যুবক আন্দ্রে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া মনে মনে তরুণীর পার্শ্ব-মুখের তারিফ্ করিতেছিল। কি সুন্দর মুখের ডৌল; যেন ভাস্কর পরিষ্কার-রূপে পাথর হইতে খুদিয়া বাহির করিয়াছে। পাত্‌লা পাত্‌লা গর্ব্বিত নাসিকা, নাসারন্ধ্র ঝিনুকের ভিতরকার অংশের মত গোলাপী; কপালের পার্শ্বদেশ ভরাট্ ও পরিপুষ্ট, তাহার উপরে নীল শিরার জাল ঈষৎ দেখা যাইতেছে। ওষ্ঠপুট সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মত তাজা, সুপক্ব ফলের মত সরস;—আধো-হাসিতে ঈষৎ-উন্মুক্ত, এবং মুক্তার মত দন্তপাঁতি যেন তড়িৎ-প্রভায় উদ্ভাসিত। বিশেষত ঘন-কৃষ্ণপক্ষ্মরাজি-শোভিত দুটি ডাগর চোখের দৃষ্টি তীরের মত মর্ম্মভেদী।

ইহা খাঁটি গ্রীক্ সৌন্দর্য্য, কিন্তু আরব-চরিত্রযোগে যেন আরও একটু পরিমার্জ্জিত—সেই একই বিশুদ্ধতা, কিন্তু উহার সহিত যেন একটু বুনোভাব মিশ্রিত; সেই একই রূপ-মাধুরী, কিন্তু উহাতে যেন একটু নৃশংসতার আমেজ আছে। অমল ধবল ললাটের উপর ধনুকের মত সুবক্র কালো ভ্রূযুগল চিত্রকর যেন তুলি দিয়া সুস্পষ্ট রেখায় আঁকিয়া দিয়াছে। চোখের তারা ভ্রমরকৃষ্ণ; ওষ্ঠপুট সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় টুকটুকে।

তরুণীর ন্যায় বৃদ্ধার দৃষ্টি ক্রীড়াঙ্গনের ঘটনাবলীর প্রতি নিবদ্ধ ছিল না; কুকুর যেমন চোরকে ঘ্রাণের দ্বারা ধরিবার চেষ্টা করে, ও তাহার উপর নজর রাখে, কতকটা সেই ধরণে সে শুধু আন্দ্রের ভাব-সাব আড়চোখে

আড়চোখে লক্ষ্য করিতেছিল। বৃদ্ধার মুখশ্রী কদাকার, ভ্রূকুটি-কুটীল ও অপ্রীতিকর; মুখের বলি-রেখাগুলা খুব গভীর; এবং তার চোখের চারিদিকে চক্রাকারে যে কালো রেখা পড়িয়াছে, তাহা কতকটা পেঁচার চোখের চারিদিককার পালকের ঘেরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার বরাহ-দন্ত তাহার শুষ্ক-কঠিন ওষ্ঠাধরকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছে। তার মুখ-ভ্যাংচানো মুখখানা স্নায়ব স্পন্দনে মুহুর্মুহু সঙ্কুচিত হইতেছে।

আন্দ্রেকে তরুণীর ধ্যানে অবিচলিতভাবে নিমগ্ন দেখিয়া, বৃদ্ধার চাপা কোপ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইল; আপন বেঞ্চে বসিয়া একটু ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; হাতের হাত-পাখাটা নাড়িতে লাগিল, পার্শ্বস্থ তরুণীকে ক্রমাগত কনুয়ের গুঁতো দিতে লাগিল; এবং উহার দিকে যাহাতে মুখ ফিরাইতে বাধ্য হয় এই উদ্দেশে তাহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু, হয় সে সত্যই বুঝিতে পারিতেছিল না, কিংবা ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিল না,—দুই এক কথার উত্তর দিয়া আবার সে তাহার পূর্ব্বভাব—সেই গভীর মনোযোগের ভাব ধারণ করিল।

আন্দ্রে আপন-মনে অস্ফুটস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল:—"ডাইনী বুড়িটা জাহান্নমে যাক্!—পুড়িয়ে মার্‌বার প্রথাটা এখনো থাক্‌লে বেশ হ'ত! যে রকম চেহারা, সেকাল হ'লে, ওকে গাধায় চড়িয়ে চৌরাস্তায় নিয়ে দৌড় করাত।"

জুয়াঙ্কোর বৃষবধ করিবার পালা এখনো আসে নাই—রঙ্গাঙ্গনের মধ্যে সে অবজ্ঞার ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—প্রচণ্ড বৃষগুলাকে যেন নিরীহ মেষ মনে করিয়া তাহাদের প্রতি একবারও দৃক্‌পাত করিতেছে না! কিন্তু জুয়াঙ্কো যেই একটু গা নাড়া দিয়াছে, দুই তিন পা পূর্ব্বস্থান হইতে সরিয়া গিয়াছে, অমনি প্রচণ্ড রোষাবিষ্ট বৃষটা গুঁতাইবার ভঙ্গী করিয়া উহার দিকে ছুটিয়া আসিল।

জুয়াঙ্কো তাহার সুন্দর জল্‌জ্বলে কালো চোখের দৃষ্টিতে 'বক্‌স্‌'—'গ্যালারি'—'ষ্টল্‌' প্রভৃতি সকল আসনগুলি পরে-পরে একবার দেখিয়া লইল। ঐ-সব আসনে যেন অসংখ্য প্রজাপতির বিচিত্র রঙের হাতপাখা ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষ-স্পন্দনের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছিল। মনে হয়, জুয়াঙ্কো যেন দর্শক-দিগের মধ্যে কাহাকে খুঁজিতেছে। উহার দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া, অবশেষে যেখানে তরুণী ও বৃদ্ধা বসিয়াছিল, সেই নিম্ন-শ্রেণীর আসনে আসিয়া উপনীত হইল, তখন বিদ্যুতের ন্যায় তাহার শ্যামল মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। এবং সকলের দৃষ্টিগোচর না হয়—এইভাবে একটু মাথা নোয়াইল। রঙ্গপীঠে নটেরা যেরূপ একটু ইঙ্গিতে অভিবাদন করে, কতকটা সেইরূপ।

বৃদ্ধা মৃদুস্বরে বলিল:—

"মিলিতোনা, জুয়াঙ্কো আমাদের দেখ্‌তে পেয়েছে; সাবধান, বেশ ভদ্র হয়ে বোসো। ঐ যুবকটি তোমার পানে প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে; আর জান ত জুয়াঙ্কোর কি-রকম সন্দিগ্ধ মন!"

মিলিতোনাও মৃদুস্বরে উত্তর করিল:—

"তাতে আমার কি যায় আসে?"

—"তুমি ত জানো, যার উপর ও অসন্তুষ্ট হয়, তার আর রক্ষা থাকে না।"

—"আমি ত ঐ লোকটির দিকে তাকাই

নি। তা ছাড়া, আমার যা ইচ্ছা তা আমি কি করতে পারি নে? আমি কি আমার নিজের প্রভু নই?”

কিন্তু—একবারও আন্দ্রের দিকে তাকায় নাই,—মিলিতোনার এই কথাটি একটি ছোট-খাটো মিথ্যা কথা। তাকাইয়া দেখে নাই বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের তাকাইয়া দেখিবার দরকার হয় না—উহারা এক নজরেই সব দেখিয়া লয়। বর্ণনা করিতে বলিলে, বোধ হয় তরুণী আন্দ্রের শরীরের সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারিত।

আমরা সত্য ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি। অতএব সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তরুণীর আন্দ্রেকে একজন সুপুরুষ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তরুণীর সহিত কথাবার্ত্তা সুরু করিবার একটা উপায়-স্বরূপ আন্দ্রে একজন ফল ও মোরব্বা-বিক্রেতাকে ইসারা করিয়া ডাকিল। সে ঐ রঙ্গশালার ডাকা বারান্দায় কমলানেবু, ফলের মোরব্বা, লজেঞ্জিস্ ও অন্যান্য মিষ্টান্ন বিক্রী করিয়া বেড়াইতেছিল। উহারা দর্শকদের মধ্যে রসিক লোক বুঝিয়া ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে আনিয়া ধরে। আন্দ্রের পার্শ্বে একজন পরম রূপসী উপবিষ্টা দেখিয়া, একজন বিক্রেতা উহার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিল তাহার খাদ্যসামগ্রী ঐখানে অনায়াসেই গতাইতে পারিবে। একটা কাষ্ঠ-দণ্ডের আগায় বসানো মোরব্বার বাক্সো আন্দ্রের নিকট দিল।

আন্দ্রে একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া মোরব্বার খোলা বাক্স তরুণীর সম্মুখে ধরিল—এবং এই কথা বলিল :—

—“আপনার কিছু লজেঞ্জিস্ চাই?”

তরুণী চট্ করিয়া আন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত আন্দ্রেকে দেখিতে লাগিল।

আন্দ্রে উহাকে আরও প্রলোভিত করিবার জন্য বলিল “নেবুর মোরব্বা, পুদিনার মোরব্বা।”

মিলিতোনা, সহসা মনস্থির করিয়া, তাহার ছোট ছোট আঙুলগুলি বাক্সের মধ্যে দিল এবং একমুঠা লজেঞ্জিস বাহির করিয়া লইল। সেখানকার উপস্থিত একজন লোক গুন্ গুন্ করিয়া বলিল, “ভাগ্যিস্ জুয়াঙ্কোর পীঠ অন্য-দিকে ফেরানো আছে—নৈলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হ'ত।”

তাহার পর আন্দ্রে, বৃদ্ধার সম্মুখে বাক্সটা বাড়াইয়া দিয়া, খুব ভদ্রভাবে ও মধুর স্বরে বলিল—“ঠাকরুণ, আপনারও কি কিছু চাই?” তাহার এই দুঃসাহসিক প্রস্তাবে একটু থতমত খাইয়া সব লজেঞ্জিসগুলিই সে উঠাইয়া লইল।

তথাপি, তাহার শুষ্ক হাতের মুঠায় মোরব্বাগুলি লইবার সময় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একবার রঙ্গশালার চরিদিকে চোরা-চাহুনী চাহিয়া লইল। এবং তাহার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল। ঠিক এই মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বাজনা বাজিয়া উঠিল।

জুয়াঙ্কোর এইবার বৃষ মারিবার পালা। রাণীর box-এর দিকে অগ্রসর হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া বৃষ বধ করিবার অনুমতি চাহিল, এবং একটু জাঁকের ভাবে গাত্রের বহির্বাস খুলিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল। যে জনতা এতক্ষণ তুমুল কোলাহল করিতেছিল, হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা আসিল।

সকলেই উৎকণ্ঠাসহকারে শেষ-পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যে বৃষকে জুয়াঙ্কো বধ করিবে, সে বৃষটা বড়ই ভীষণ। ঐ বৃষের পরাক্রম সম্বন্ধে সমস্ত খুটিনাটি বিবরণ আমরা পাঠককে বলি নাই—আমরা আন্দ্রে ও মিলিতোনার কথা লইয়াই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। পাঠকগণ আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ৭ টা ঘোড়া অন্ত্রশূন্য ও ছিন্নাঙ্গ হইয়া বালুভূমির উপর স্থানে স্থানে সটান পড়িয়া আছে। দুইজন বল্লমধারী অশ্বারোহী ঘোড়া হইতে পড়িয়া সমস্ত অঙ্গ থেঁৎলিয়া,গিয়াছে উহারা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলায়ন করিয়াছে। বেড়ার নিকটে যে সকল রক্ষী ছিল তাহারা সাবধানে কাঠের রেকাবের উপর পা রাখিয়াছে, তেমন তেমন বিপদ দেখিলে, রেকাবের উপর পায়ের ভর দিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। বিজয়ী পুঙ্গব রণাঙ্গণে সদর্পে মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে। রণাঙ্গণের স্থানে স্থানে রক্তের ডোবা জমিয়া গিয়াছে। রক্তের দাগগুলার উপর ধূলি ছিটাইয়া দিবে—অঙ্গণ-ভৃত্যদিগের সে সাহসও হইতেছে না। বৃষ প্রমত্ত হইয়া দরজায় শিংএর আঘাত করিতেছে এবং বিচরণ-পথে অশ্বের মৃতদেহ লইয়া শিং দিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে।

জনতার মধ্য হইতে একজন ঐ ভীষণ বৃষটাকে সম্বোধন করিয়া বলিলঃ—"লাফাও ঝাঁপাও, দাপাদাপি কর, যাই কর বাছাধন, আর একটু পরেই জুয়াঙ্কো তোমাকে ঠাণ্ডা করে দেবে।"

বস্তুতই জুয়াঙ্কো ঐ ভীষণ পশুটার দিকে দৃঢ়পদে ও দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হইল। এইরূপ ভাব দেখিলে বৃষ ত বৃষ, সিংহও পিছু হটিয়া যায়।

আর একজন শত্রুকে অসিতে দেখিয়া বৃষটা বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, একটা চাপা-ধরনে কণ্ঠধ্বনি করিল, মুখ-গলিত লালা ঝাড়িয়া ফেলিল, পায়ের খুর দিয়া মাটি আঁচড়াইতে লাগিল, দুই তিনবার মাথা নোয়াইযা তাহার পর, কয়েক পদ পিছু হটিল।

জুয়াঙ্কোকে চমৎকার দেখিতে হইয়াছে: অবিচলিত সঙ্কল্প তাহার মুখে প্রকাশ পাইতেছে, চোখে স্থির দৃষ্টি, সাদায়-ঘেরা কালো চোখের তারা জলজ্বল্ করিতেছে—সেই নেত্র-নিসৃত অদৃশ্য কিরণচ্ছটা তীরের মত বৃষকে বিদ্ধ করিতেছে; যে চৌম্বক আকর্ষণী-শক্তি দ্বারা প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রবশকারী ডান্-আম্বুর্গ্ ব্যাঘ্রদিগকে ভয়বিহ্বল করিয়া পিঞ্জরের কোণে বসাইয়া দিত, বৃষটাও অজ্ঞাতসারে যেন সেই আকর্ষণী-শক্তি অনুভব করিতে লাগিল।

জুয়াঙ্কো যেমন এক এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিল, পশুটা তেমনি এক এক পদ পিছাইতে লাগিল।

পাশব বলের উপর নৈতিক বলের এইরূপ জয়লাভ দেখিয়া, লোকেরা উৎসাহে মত্ত হইয়া উঠিল; উন্মত্তের ন্যায় উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিল। করতালি, চীৎকারধ্বনি, ভূতলে পদাঘাত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুই শোনা যায় না। কতকগুলি সৌখীন লোক খুব শব্দ করিবার জন্য একরকম্ ঘণ্টা ও ঢোল্ সঙ্গে আনিয়াছিল—তাহাই সজোরে বাজাইতেছিল।

উপরিস্থ সোপানের উচ্চ আসন সমূ

হইতে যে প্রশংসাধ্বনি হইতেছিল, তাহার তুমুল শব্দে রঙ্গশালার ছাদ যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

জুয়াঙ্কোর উপর অজস্র প্রশংসা বর্ষণ হইতেছে, জুয়াঙ্কোর চোখে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে;—এই সময় এই বাহবা বর্ষণ দেখিয়া মিলিতোনার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে জানিবার জন্য এবং তাহার নিকট হৃদয়ের প্রেমাঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য জুয়াঙ্কো মিলিতোনার দিকে একবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

সময়টা ঠিক্ বাছা হয় নাই। মিলিতোনার হাত হইতে হাতপাখাটা পড়িয়া গিয়াছিল। আন্দ্রে তাড়াতাড়ি ব্যগ্রভাবে উহা কুড়াইয়া দিল। প্রেমিকরা এইরূপ ছোটখাটো জিনিসের সাহায্যে স্বকীয় প্রেমের বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করে। যখন পাখাটা কুড়াইয়া মিলিতোনাকে প্রত্যর্পণ করিল, তখন আন্দ্রের মুখে ও মুখভঙ্গীতে একটা অপূর্ব্ব সন্তোষের ভাব লক্ষিত হইল।

তরুণীও মৃদুমধুর হাসি মুখে বিকাশ করিয়া এবং একটু মাথা নোয়াইয়া আন্দ্রেকে ধন্যবাদ জানাইল। এই মৃদুহাসি জুয়াঙ্কোর নজরে পড়িল! জুয়াঙ্কোর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল,—সে ছোরার হাতলটা খুব কসিয়া ধরিল এবং তাহার অসির মুখ নিচুদিকে ছিল—সেই অসির মুখ দিয়া স্নায়বিক আক্ষেপসহকারে বালুরাশির মধ্যে দুই-চারিটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিল।

জুয়াঙ্কোর মোহিনী দৃষ্টির প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বৃষটা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে অগ্রসর হইল; জুয়াঙ্কোও সেই সময় আত্মরক্ষণে বিরত ছিল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই ভয়ঙ্কর রূপে কমিয়া আসিল। কয়েক জন লোক বলিয়া উঠিল:—

"বীরপুরুষ বটে, দেখ একটুও ভয় পাচ্চে না।"

আর করেকজন কোমল-প্রকৃতির লোক বলিয়া উঠিল,—"সাবধান হও, সাবধান হও! প্রাণের জুয়াঙ্কো, হৃদয়ের জুয়াঙ্কো, বৃষটা তোমার উপর এসে পড়ল যে! সাবধান হও।"

আর মিলিতোনা—ষাঁড়ের লড়াই দেখিয়া দেখিয়া তাহার হৃদয় একটু অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই হোক্, জুয়াঙ্কোর নিপুণতা ও পরাক্রমের উপর অসীম বিশ্বাস আছে বলিয়াই হোক্, কিংবা জুয়াঙ্কোর সম্বন্ধে তেমন কোন ঔৎসুক্য না-থাকা বশতই হোক্, মিলিতোনার মুখ বেশ প্রশান্ত ও অবিচলিত ছিল—যেন বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। কেবল তাহার গণ্ডস্থল একটু আরক্তিম হইয়াছিল এবং তাহার ওড়নার উত্থান-পতনে, তাহার বক্ষের দ্রুত-স্পন্দন লক্ষিত হইতেছিল।

দর্শকদিগের চীৎকারে জুয়াঙ্কোর জড়তা বিদূরিত হইল। সে চট্ করিয়া একটু পিছু হটিল এবং তাহার বহির্বাসের লাল ভাঁজগুলা বৃষের চোখের সাম্‌নে নাড়িতে লাগিল।

মিলিতোনা কি বলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য তাহার যেরূপ ঔৎসুক্য ছিল, সেই সঙ্গে ঐ মল্লবীরের অন্তরে যোদ্ধৃসুলভ আত্মাভিমানও যুঝাযুঝি করিতেছিল। এই চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে, চোখের দৃষ্টি একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই, এক সেকেণ্ডের ভুলচুক হইলেই তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে। কি ভয়ানক অবস্থা! জুয়াঙ্কোর মন সন্দিগ্ধ, যাহাকে সে ভালবাসে

সেই রমণীর প্রতি আর একজন আদর-যত্ন দেখাইতেছে; আর সে নিজে এখন সার্কাশের মধ্যস্থলে অবস্থিত, হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি তাহার উপর রহিয়াছে। তাহার বক্ষদেশ হইতে ঐ ভীষণ বৃষের শিং এক্ষণে দুই ইঞ্চি মাত্র দূরে; এবং এই যুদ্ধের নিয়মানুসারে, একটা বিশেষ স্থানে, একটা বিশেষ প্রকারে উহার প্রাণবধ করিতে হইবে। তা না করিতে পারিলে তাহার বিষম অপমান।

রণাঙ্গণে জুয়াঙ্কো আবার স্বকীয় প্রভুত্ব ফিরিয়া পাইল। দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া, বৃষের মাথা নত করাইবার জন্য, অনেকবার তাহার সম্মুখে ছোরার আস্ফালন করিল।

তাহার এক ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, একথা ভুলিয়া গিয়া জুয়াঙ্কো মনে মনে ভাবিতে লাগিল:—না জানি ঐ অদ্ভুত লোকটা মিলিতোনাকে কি বলিয়াছে যাহা শুনিয়া মিলিতোনা তার দিকে তাকাইয়া এমন মধুর হাসি হাসিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অনিচ্ছাক্রমে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল। জুয়াঙ্কো যেই একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে অমনি বৃষটা এই সুযোগে জুয়াঙ্কোকে তাড়া করিল। জুয়াঙ্কো চট্ করিয়া একটু পিছু হটিল, তাহার পর অন্ধভাবে অগ্রসর হইয়া এলোধাবাড়ি রকমে ছোরার আঘাত করিতে লাগিল। ছোরা বৃষের শরীর কয়েক ইঞ্চি ভেদ করিয়াছিল। কিন্তু সুবিধামত স্থানে না লাগিয়া ছোরাটা একটা হাড়ে ঠেকিয়াছিল। প্রচণ্ড পশুটা গাঝাড়া দেওয়ায় ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঠিকুরিয়া পড়িতে লাগিল এবং ছোরাটা দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। জুয়াঙ্কো এখন নিরস্ত্র এবং বৃষটা জীবন-উদ্যমে পূর্ণ। এই আঘাত মারাত্মক না হইয়া বৃষকে বরং আরও রাগাইয়া তুলিল। রক্ষীগণ সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিল, এবং তাহাদের নীল ও সোনালী রং-এর বহির্বাস বৃষের সম্মুখে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

মিলিতোনার মুখ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হইল; বৃদ্ধা, "আহা আহা," "হায় হায়" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এবং গোঙাইয়া গোঙাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

লোকেরা, জুয়াঙ্কোর এই অপ্রত্যাশিত অদক্ষতা লক্ষ্য করিয়া খুব চীৎকার ও কোলাহল করিতে লাগিল—এইরূপ কোলাহল করিতে স্পেনের লোকেরা খুব মজবুৎ। অপমানের কথা, গালাগালি, অভিসম্পাত বর্ষণ হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে সবাই বলিতে লাগিল—"দূর হ', দূর হ'! কুত্তা, চোট্টা, আনাড়ি, কশাই, জল্লাদ! এমন খাসা বৃষ—সব মাটি করে দিলে!

তথাপি জুয়াঙ্কো, এই গালি-বর্ষণের মধ্যে অটলভাবে দাঁড়াইয়া, আপনার ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল। ষাঁড়ের শিং-এর আঘাতে জামার হাতা খুলিয়া যাওয়ায়, বাহুর উপর একটা লম্বা বেগ্নী ক্ষত-রেখা দৃষ্টিগোচর হইল। মুহূর্ত্তের জন্য, জুয়াঙ্কো একটু টলিল, মনে হইল মনের প্রচণ্ড আবেগ-বশে বুঝি বেদম হইয়া পড়িয়া যাইবে; কিন্তু জুয়াঙ্কো শীঘ্রই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল, এবং কি যেন একটা মৎলব আঁটিয়া, ছুটিয়া গিয়া ভূপতিত অসিটা কুড়াইয়া লইল। অসিটা বাঁকিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর পা চাপিয়া সোজা করিয়া লইল। এবং যে স্থানে মিলিতোনা বসিয়াছিল, সেই স্থানের দিকে পীঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

জুয়াঙ্কো একটা ইশারা করিবামাত্র, রক্ষীর দল, তাহাদের লাল কাপড় ষাঁড়ের সম্মুখে নাড়িয়া নাড়িয়া ষাঁড়টাকে জুয়াঙ্কোর সম্মুখে আনিল। এইবার জুয়াঙ্কোর অন্যমনস্ক হইবার আর কোন হেতু না থাকায়, দস্তুরমত নিয়মানুসারে উপর হইতে, নীচু হইতে, পশুটাকে আসির দ্বারা সজোরে আঘাত করিল। আঘাতের বেগে ষাঁড়টা, জুয়াঙ্কোর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল—যেন নতজানু হইয়া বিজয়ীর বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। তার পর, পশুটার সর্ব্বশরীর একবার কাঁপিয়া উঠিল, এবং চার পা আকাশে তুলিয়া ভূতলে গড়াইয়া পড়িল।

আন্দ্রে উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, পার্শ্ব-সহচরীকে বলিল: "জুয়াঙ্কো এইবার খুব প্রতিশোধ নিয়েছে! কি চমৎকার অসির আঘাত! পুরানো ওস্তাদেরাও এমন সুন্দর রকম আঘাত কখনই করতে পারেনি, এবিষয়ে শ্রীমতীর মত কি?"

মিলিতোনা, প্রায় ঠোঁট না খুলিয়া ও মাথা না ফিরাইয়াই খুব তাড়াতাড়ি বলিল:—"আপনাকে অনুনয় কচ্চি, মশায় আমার সঙ্গে একটি কথাও কবেন না" এই কথাগুলি এরূপ আদেশের ভাবে ও সেই সঙ্গে এরূপ অনুনয়ের স্বরে বলা হইয়াছিল যে, আন্দ্রে বেশ বুঝিল, ইহার মধ্যে তরুণীর কোন চাতুরী নাই।

লজ্জাশীলতার দরুণ তরুণী যে এই কথাগুলি বলিয়াছিল তাহা নহে। কেননা আন্দ্রের কথাবার্ত্তায় এমন কিছুই ছিল না যাহাতে লজ্জা পাইতে হয়। মাদ্রিদের এই শ্রমজীবী শ্রেণীর রমণীরা স্বভাবতই আমুদে-লোক, উহার একটুতেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইবে এরূপ মনে হয় না। মিলিতোনার ঐ অল্প কথাগুলির মধ্যে বাস্তবিকই যে একটা বিভীষিকা ছিল—একটা বিপদের আশঙ্কা ছিল, তাহা আন্দ্রে অনুমান করিতে পারে নাই—মিলিতোনাকে লইয়াই যে এই বিপদ তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

আন্দ্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিল:—ইনি কি একজন ছদ্মবেশী রাজকুমারী? আমি যদি এখন চুপ্ করিয়া থাকি তাহা হইলে আমাকে উনি নিতান্ত বোকা বা অরসিক ভাবিতে পারেন। আর যদি না-ছোড়বান্দা হইয়া কথা কহি তাহা হইলে, হয়তো এই তরুণীকে কোন এক অভাবনীয় বিপদে ফেলা হইবে; হয় তো একটা অপ্রীতিকর হাঙ্গামা উপস্থিত হইবে। তবে কি, বুড়ীর ভয়ে এই কথা বলিলেন,—না; কেননা, বুড়ীটা ত আমার প্রদত্ত সমস্ত লাজেঞ্জিসই উদরস্থ করিয়াছে; ঐ ব্যাপারে বুড়ীরও ত একটু যোগ-সাজোস্ ছিল – তরুণী ওর ভয়ে কখনই ভীত হয় নাই। কোন বাপ, কোন ভাই, কোন স্বামী, কোন সন্দিগ্ধচিত্ত প্রেমিক কি এখানে কেউ আছে?" মিলিতোনা যে সকল লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তাহার মধ্যে এ শ্রেণীর কোন লোক থাকা সম্ভব নহে। উহাদের মুখে স্নেহ-মমতার কোন লক্ষণ নাই; মুখ একেবারে ভাবহীন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মিলিতোনার সহিত উহাদের কোন সম্পর্কই নাই।

লড়াইএর শেষ পর্য্যন্ত জুয়াঙ্কো দর্শক-দিগের আসনের দিকে আর দৃষ্টিপাত করে নাই—পর-পর দুই দুইটা প্রচণ্ড বৃষকে

যমসদনে পাঠাইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন দর্শকবৃন্দ ধিকার দিয়াছিল, এখন আবার সকলে উচ্চৈস্বরে জুয়াঙ্কোর স্তুতিবাদ করিতে লাগিল।

আন্দ্রেকে কথা কহিতে নিষেধ করিবার পর আন্দ্রে একটি কথাও আর বলে নাই। এমন কি বৃষযুদ্ধ শেষ হইবার একটু পূর্ব্বেই আসন হইতে উঠিয়া পড়িল।

আন্দ্রে সোপান-ধাপ দিয়া নামিবার সময় একটি বুদ্ধিমান ও চালাকচতুর ছোক্‌রাকে মৃদুস্বরে দুই চারিটা কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

দর্শকবৃন্দ সবাই প্রস্থান করিলে, জনতার মধ্য দিয়া ঐ ছোক্‌রাটি মিলিতোনা ও বৃদ্ধার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। সে দুজনকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া লোক-প্রিয় একটা ষাঁড়ের গান গাইতে গাইতে, গাড়ীর পিছনে কোনপ্রকারে ঝুলিয়া রহিল।

গাড়ী ধূলাজাল উড়াইয়া সশব্দে ছুটিয়া চলিল।

আন্দ্রের সম্মুখ দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। আন্দ্রে মনে মনে করিল, সেই মার্কিসের বাড়ীতে যুগলবন্ধ গানটা গাহিয়াই সে ঐ রূপসীর ঠিকানা জানিয়া লইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধিয়া*

ইংরাজীতে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেক লেখা হইয়াছে, ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণও প্রচুর আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লইয়া ইংরাজীতে এত বই লিখিত হইয়াছে যে, তত বই ভারতবর্ষে কোন একটি প্রাদেশিক ভাষাতে দূরের কথা, সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাতেও আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং ইংরেজের নিকট আমাদের এ-দিককার ঋণ অপরিশোধ্য। কারণ বিদেশী ভাষা শিখিয়া বিদেশের ইতিহাস রচনা করা একেবারে অনায়াস-সাধ্য নহে, বিশেষতঃ যদি সে দেশে ঐতিহাসিক উপাদানের প্রাচুর্য্য না থাকে। বহু ইংরেজ মনীষী ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় যে নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা ভারতবর্ষে ত নিতান্ত সুলভ নহেই, ভারতের বাহিরে অন্য দেশেও একান্ত বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এলফিন্‌ষ্টোন ভারতবর্ষের বড় লাটের পদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় সময়াভাব হইবে বলিয়া। স্যর উইলিয়ম জোন্স কত অসুবিধার মধ্যে কত কর্ম্ম করিয়া সংস্কৃত শিখিয়া ছিলেন তাহা কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবিদিত নাই। পাঠের ব্যাঘাত হয় বলিয়া ম্যাক্‌কলিক উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ১৫বৎসর কাল এদেশে থাকিয়া

---

* Sindhia otherwise called Madhoji Patel By H. G. Keene, C. I. E. M. A.

শিখ জ্ঞানীদিগের সহিত একত্র মিশিয়া শিখ-দিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার এই যুগাধিক কাল-ব্যাপী একাগ্র সাধনার ফল শিখ-ধর্ম্মের ইতিহাস। কানিংহ্যাম শিখজাতির অপক্ষপাত ইতিহাস রচনা করিবার জন্য প্রাণ-পাত করিয়া ছিলেন বলিলেও অন্যায় হইবে না, কারণ ম্যালিসনের মতে 'সম্পূর্ণ সত্য' বলার অপরাধে কানিংহ্যাম ডালহৌসির বিরাগ-ভাজন হন ও ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। আজকাল ছোট ছোট ছেলেদের পাঠ্য পুস্তকেও অশোক-অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে। এই অশোক অনুশাসনের উদ্দেশ্য ও বিষয় আজ একেবারেই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত, যদি পণ্ডিত-প্রবর প্রিন্সেপ ইহার পাঠ-প্রণালী আবিষ্কার না করিতেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে মারাঠা বীর শিবাজীর জীবন-কথা সম্বন্ধে পাঁচখানি ইংরাজী বই প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে দুইখানি ইংরেজের, দুইখানি বাঙ্গালীর, ও মাত্র একখানি একজন মারাঠা কর্ত্তৃক লিখিত। তালিকা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই কথা বলিলেই চলিবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনায় ইংরেজ আমাদের পথ-প্রদর্শক;—রাজনীতির জগতে তাহার সহিত আমাদের যে সম্পর্ক হউক না কেন। বিদ্যার ক্ষেত্রে তাহার সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করা আমাদের চলিবে না।

কিন্তু ইংরেজের নিকট বিদ্যার ঋণ অস্বীকার করা যেমন অন্যায় হইবে, চির-কাল দেশের ইতিহাস-রচনার ভার ইংরেজের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে থাকাও সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অনেক বেশী অন্যায় হইবে। একটা জাতিকে বুঝিতে চাহিলে সহানুভূতির বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু কেবল সহানুভূতির দ্বারা একটি বিদেশী জাতির সামাজিক রীতি-নীতির মর্ম্ম ও প্রকৃতির বিশেষত্ব নির্ণয় করা সহজ-সাধ্য নহে। যাহা আমাদের অস্থি-মজ্জাগত, ইংরেজের হয়ত তাহা সৌখীন গবেষণার বিষয়মাত্র। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনার ভার ভারতবাসীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান কালে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার টমাসও এই কথাটি বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার পথে বাধা-বিঘ্ন অনেক। ইহাতে যে একাগ্র সাধনার প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত কোথায়? যে শিক্ষকেরা বাল্যেই ছাত্রের প্রাণে এই প্রেরণা জাগাইয়া দিবেন, তাঁহারাই বা কোথায়? যে পাঠ্য পুস্তকে তাহাদের মনেও অনুসন্ধিৎসা জাগাইবে তাহাই বা কোথায়? বিদ্যালয়গুলিতে যাহা পড়ানো হয় তাহা ইতিহাস নহে, কানিংহাম যে 'সমগ্র সত্য' প্রচারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সমগ্র সত্য তাহাতে নাই, আছে ভারত-বিজয়ের একতরফা বিবরণ, যাহা কোন আদালতে গৃহীত হইবে না। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে এই শ্রেণীর তথা-কথিত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া যখন আমাদের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন তাহাদিগকে যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে বলা হয়, তাহাতেও ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ ইতিহাস ত সব সময় পাওয়া যায়ই না, নির্ভুল বিবরণও তাহাতে সকল সময়ে থাকে

না। এই জন্য শিক্ষক ও ছাত্রের বিশেষ সাবধানতার সহিত এই সকল বহি পড়ানো ও পড়া উচিত। কারণ নিজেদের অক্ষমতায় আমাদের ধারণা এত বদ্ধমূল এবং ইংরেজের প্রতিভায় আমাদের আস্থা এমন দৃঢ় যে, আমরা ভুলিয়া যাই যে, সকল ইংরেজ গ্রন্থকারই কানিংহাম নহেন। প্রিন্সেপের প্রতিভা, টডের নিষ্ঠা, ম্যাক্‌কলিকের সাধনা তাঁহাদের সকলের নাই। সর্ব্বোপরি কেবল সাধনার বা নিষ্ঠা বা প্রতিভা দ্বারা ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করা চলে না। সুতরাং ইংরেজ গ্রন্থকার লিখিত পাঠ্যপুস্তক বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

গত বৎসর শ্রাবণের ভারতীতে আমি ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথের নব-প্রকাশিত Oxford History of Indiaর কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি দেখাইয়া ছিলাম। এবার সেই প্রণালীতে কীন সাহেবের সিন্ধিয়া-চরিতের সমালোচনা করিব। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ও ব্যয়ে Rulers of India নামে এক গ্রন্থমালা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থমালার সম্পাদক ছিলেন স্যর উইলিয়ম হাণ্টার। হাণ্টার জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত। কতকটা তাঁহার নামের গৌরবে, কতকটা এই গ্রন্থমালার কোন কোন গ্রন্থের স্থায্য খ্যাতিতে এই গ্রন্থমালার সকল গ্রন্থই সাধারণের নিকট প্রামাণিক ইতিহাস বলিয়া পরিচিত। কীন সাহেবের আলোচ্য বহিখানিও এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এখানিও অনেক ছাত্র ও শিক্ষক সিন্ধিয়ার নির্ভুল জীবন-কাহিনী বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ বহিখানি আগাগোড়া ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। অসতর্কতার কুৎসিত চিহ্ন ইহার সর্ব্বাঙ্গ বিকৃত করিয়াছে। যে সকল ভ্রম প্রদর্শনের জন্য প্রমাণ প্রয়োগ ও যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন, সেগুলিকে আপাততঃ পরিত্যাগ করিয়া যে ভ্রম স্কুলের বালকেরও হওয়া উচিত নহে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখানো হইবে।

কীন সাহেবের গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায়ই ভুল আছে—নামের ভুল। শুনিয়াছি পরলোকগত লালবিহারী দে মহাশয় রো সাহেবের ব্যাকরণের প্রথম পৃষ্ঠার ভুল না সংশোধন করিলে তাহা পাঠ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আজ জীবিত থাকিলে তিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করিতেন বলিতে পারি না। কীন সাহেবের গ্রন্থের Sindhia otherwise called Madhoji Patel। এই otherwise called লইয়াই যত গোলমাল। সিন্ধিয়া তাঁহার সমকালীন মহারাষ্ট্রে 'পাটীলবু' বা পাটীল মহাশয় নামে পরিচিত ছিলেন সত্য, কিন্তু সেকালের বা একালের কোন মারাঠাই মাধোজী সিন্ধিয়াকে চিনিবে কি না সন্দেহ। তাঁহার নাম ছিল মহাদজী, 'মাধোজী'ও নয়, 'মাধব'ও নয়, মাধাজীও নয়। কীন সাহেব একবার ভুলিয়াও সিন্ধিয়ার প্রকৃত নামের উল্লেখ করেন নাই। এই নাম-বিভ্রাট কেবল মহাদজীর বেলাতেই শেষ হয় নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষ তুকোজীর নামটি লইয়াও কীন সাহেব একটু গোলমালে পড়িয়াছেন। কীনের গ্রন্থে কোথাও তুকোজী হোলকারের নাম

নাই—সাহেবের কৃপায় তিনি হইয়াছেন 'তাকুজী'। অথচ কীনের পূর্ব্বতন লেখক-দিগের মধ্যে কেহই এই নামটি বিশুদ্ধ ভাবে তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিতে পারেন নাই বলিলেও ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের প্রতি অযথা অবিচার করা হইবে।

পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় যেমন ভুল, সেইরূপ প্রথম অধ্যায়ের পূর্ব্বে প্রদত্ত বংশ-তালিকা-খানিতেও ভুলের অভাব নাই। কীন সাহেবের মতে তাকুজী ? (তুকোজী) মাধোজী বা মধুরাও ? (মহাদজী) এবং জোতিবী এই তিনজন সিন্ধিয়া বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাতা রণোজীর জারজ পুত্র। আজ জোতিবী জীবিত থাকিলে বোধ হয় এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কীন সাহেবকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিতেন। জোতিবী মহাদজীর সহোদর নহেন। তিনি দত্তাজী ও জয়াপ্পার সহোদর। এই তিন সহোদর রণোজীর পরিণীতা পত্নীর গর্ভজাত। কিন্তু কীন সাহেব জ্যোতিবীকে নির্ভয়ে জারজ বলিতেছেন।

বাকী যে দুইটি ভুল প্রদর্শন করিয়াই আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিব, তাহা অজ্ঞতা-প্রসূত নহে, অসতর্কতা-প্রসূত। কীন সাহেব তাঁহার সিন্ধিয়ার ৬৭ ও ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—But before he could derive the advantage he hoyed for from these gratuitous attacks upon his neighbours, he was recalled to Poona by tidings of an event which threatened all his ambitious projects. The party opposed to him had already taken the precaution of removing the late Peshwa's pregnant widow to the security of a mountain fortress, where she was now safely delivered of a boy. This infant was at once proclaimed Peshwa by the ministers at Poona. ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কীন সাহেব নারায়ণ রাওয়ের হত্যার বিবরণ দিয়াছেন। সুতরাং এই বালকটি যে নারায়ণের পুত্র, ইহা তিনি জানিতেন অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিলে গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থের কয়েকটি পাতা উল্‌টাইলেই তাঁহার এই সন্দেহের নিরসন হইতে পারিত। গ্রাণ্ট ডফের বহি দুর্ল্লভ হইলে তিনি যে-কোনো একখানি স্কুল-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের আশ্রয় লইতে পারিতেন। কিন্তু কোন সন্দেহই তাঁহার ছিল না। তাই তিনি তাঁহার গ্রন্থের ১৬৩ পৃষ্ঠায় বিনা দ্বিধায় একান্ত নির্ভয়ে লিখিয়াছেন—Since then Raghuba had been put into confinement; and Madhava Rao II, brother of the murdered Narayan Rao, had been set up as Peshwa, the control of affairs being assumed by the Nana. এইরূপ কীনের কৃপায় দ্বিতীয় মাধব রাও নারায়ণের ভ্রাতা হইলেন। ৬৮ পৃষ্ঠায় যিনি নারায়ণের পুত্র ছিলেন, ১৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি হইলেন নারায়ণের ভ্রাতা! এই বিবরণের ফলে ডারুইন-প্রচারিত ক্রমবিকাশ-বাদ রূপান্তরিত হইবে কিনা তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে

পারেন। কিন্তু এই প্রকারের ভুল কোন বাঙ্গালী ছাত্র কোন য়ুরোপীয় রাজার সম্বন্ধে করিলে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা মিলিত না, ইহা নিশ্চিত।

এইরূপে কীন সাহেবের অনুগ্রহে প্রাতঃ-স্মরণীয়া অহল্যাবাই একস্থানে মলহার রাও হোলকারের পুত্রবধূ এবং স্থানান্তরে তাঁহার পুত্রের পুত্রবধূ হইয়াছেন। এদেশে পিতা পুত্রকে আদর করিয়া পিতৃ-সম্বোধন করিয়া থাকেন, সুতরাং সে হিসাবে মাতাকে পুত্রবধূ বলিয়া ভুল করা বিদেশী গ্রন্থকারের পক্ষে অসঙ্গত নাও হইতে পারে। কীন সাহেব দীর্ঘকাল ভারত-বর্ষে ছিলেন, সুতরাং তিনি বোধ হয় এ ভুলকে ভুল বলিয়াই গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই উক্তির ফলে তাঁহার কোন ইংরেজ পাঠক হয়ত ভারতীয় সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতে পারেন, যাহা ভারতবাসীর নিকট খুব শ্লাঘার বিষয় নাও হইতে পারে! সেইজন্য একটি পাদ-টীকায় মাতা কিরূপে পুত্রবধূ বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিলে কোন গোল থাকিত না।

কীন সাহেবের বহু সিদ্ধান্তের আলোচনা করা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার স্থানাভাব, আর সময়ও খুব প্রচুর নহে। কিরূপ একাগ্রতা ও সত্য-নিষ্ঠার সহিত তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা গুণজ্ঞ পাঠক এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই অনুমান করিতে পারিবেন। দক্ষ পাচক একটি ভাত টিপিয়াই হাঁড়ি-শুদ্ধ ভাতের অবস্থা জানিতে পারে।

অথচ কীন সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস লিখিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং খ্যাতিও প্রচুর অর্জ্জন করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সিন্ধিয়ার জীবন-কাহিনী রচনার কালে তিনি পরিশ্রম বা সতর্কতার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগের ইংরেজ লেখকদিগের যে সত্যনিষ্ঠা দেখা যাইত, এখন তাহা অন্তর্হিত হইতেছে কেন? কীনের এই বহিও কিন্তু বিলাতের ভাল ভাল কাগজে প্রশংসিত হইয়াছে, সুতরাং বিলাতী প্রশংসা-মাত্রেরও মূল্য অনুমেয়!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

ঘরের বাঁধন

বেরিয়ে-পড়া এতই সোজা! বারে বারে তুই যে বলিস্?
কানুর-পিরীত-নেশায়-রঙীন্ অন্ধকারে তুই যে চলিস্!
পায়জোরে তোর ঝম্‌ঝমাঝম্
ছিট্‌কে পড়ে শঙ্কা-সরম,
কাল্-ফণী সে লুটায় ফণা, পায়ের তলায় যখন দলিস্!
আল্‌তা পরায় পথ যে তোরে, গহন বনে যখন চলিস্
—কাঁটা দলিস্!

মাতাল তোমার দেহের দোলায় মূর্চ্ছা হানে বাঘের চোখে !
বাদল-রাতের নিবিড় কাজল গল্‌ছে অলখ্‌ চন্দ্রালোকে !
আকুল তোমার কেশের রাশে
জোনাক-পাঁতি যখন হাসে—
খুনীর ছুরী, বাঁধন-ডুরী শিথিল যে হয় ঘুমের ঝোঁকে !
চাইতে নারে কেউ যে তোমার সাগর-নীল ঐ ডাগর চোখে
—পাগল-চোখে !

বেরিয়ে-পড়া নয় ত' সহজ !—সে কাজ শুধু তোরেই সাজে,
ফাগুন-ফুলের মালা গাঁথে যে-জন আগুন-খেলার মাঝে !
মধুবনের মঞ্জরী সে
ভর্‌ছে নিশাস মন্দবিষে,—
কামনা যার মনের কোণেই গুম্‌রে মরে শতেক লাজে,
বেরিয়ে-পড়া তার কি সাজে নিশীথ-রাতে পথের মাঝে—
স্বপন-মাঝে !

শ্যাম যে আমার নামটি ধরে' ডাক দিল না, হায় অভাগী !
সারা জনম গোঙাই একা—মনে-মনেই শ্যাম-সোহাগী !
কুলকে আমি সাধে ডরাই ?
শক্ত করে' তারেই জড়াই !
বাঁশীর ও-সুর বল্‌ছে না ত'—আমার তরেই সে বিবাগী !
নাম ধরে' ডাক ডাক্‌ল না ত'—এমন কপাল ! হায় অভাগী
ঘর-সোহাগী !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ।

কালো বউ

সংসার অকারণ ঝাঁটা-লাথিটা কোনো-মতে বরদাস্ত করতে না পেরে নেহাৎ ছেলে-মানুষটাই এসে অমল অফিস-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। এইখানেই একদিকে তার জরা-গ্রস্ত কৈশোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদায় নিলে। তারপর যৌবন এসে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌লো। মনের বনে ফাগুন মাস তার বসন্তের গান গেয়ে ফাগে ফাগে রঙ খেলে

সে রাঙা উত্তরীয়ের আঁচলখানি অমলের চোখের উপর দিয়ে উড়িয়ে ধর্‌লে। কিন্তু কুসুমকেতন যে সেবার তারই মর্ম্মের মাঝ-খানে তুলে মারবার জন্যে রক্তবরণ অশোক-মঞ্জরী কুঞ্জ উজাড় ক'রে কুড়িয়ে এনে তীক্ষ্ণ একটী তীর গড়্‌ছিলেন—তা অমল একেবারেই জান্‌তো না।

ছোট-মাসি কমলা সেদিন অমলকে খাবার নেমন্তন্ন ক'রে, অনেক দিব্যি-টিব্যি দিয়ে আস্‌তে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঝুঁটি-ঝোলানো যে বেঁটে-মোটা উড়েটীর কাছে সে খবর সময়-মত পৌঁছে না দিলে—তার ধাঁকিড়ি, ঝাঁকিড়ি, কঁড়কিড়ি ইত্যাদি ঝঙ্কারে অমল কেন, বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দেখ্‌বার দরকার হবে—কাজেই ন'টা বাজতে না বাজতেই অমল চটী চট্‌পটিয়ে নেমে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুক্‌লো।

ঘরের ভিতর পা দিতেই সে হঠাৎ স্তম্ভিতের মত থম্‌কে দাঁড়ালো। অন্ধকারের মধ্যে আচম্‌কা একটা বিজ্‌লী-আলো জ্বলে উঠ্‌লে লোকের চেতনা যেমন হঠাৎ চকিত হয়ে ওঠে, অমলেরও মনটা ঠিক তেম্‌নি ক'রে চম্‌কে উঠ্‌লো। সে দেখ্‌লে, একটী সুন্দরী মেয়ে;—সদ্য স্নান সেরে এসেছিল সে—সুগৌর পিঠের উপর দিয়ে কালো একরাশ ভেজা-ভেজা চুল এলো হ'য়ে লুটিয়ে পড়েছে। লঘু-দীর্ঘ ঘাড়টী বেঁকিয়ে, চাঁপা কুঁড়ির মত আঙুল দুলিয়ে তরুণী বামুন ঠাকুরকে রান্না দেখিয়ে দিচ্ছিল সেখানে। একজন অল্প-বয়সী বালার চোখের কাজলটা, বাহুর নীচে হাতের যে নিটোল বাঁকটী, স্নেহের উপরে দোল-খাওয়া একটা লীলা, সোনার উপরে গোলাপ-ছোপানো রঙ, প্রথম যৌবনে অমল আজ প্রথম দেখ্‌লে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রূপের খুঁটি-নাটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে বুঝি মুগ্ধ হ'য়ে গেল, ভাব্‌লে চমৎকার দেখতে তো এ মেয়েটী!

অমলকে অমন নিজেকে-হারিয়ে-ফেলা-বিস্ময়ে বিহ্বলতায় তার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে তরুণী কালো চওড়া-পেড়ে আঁচলখানা মাথার উপর তুলে দিলে। অমলের চমক ভাঙ্‌লো,—লজ্জিত মুখখানা ফিরিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, অপরিচিতা তরুণীর পানে অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা—ছি,কি অন্যায়!

কিন্তু এখন অমল যাবেই বা কোথায়?—অথচ যাবেই বা কেন? কিছুতেই সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিল না। এ তার বুকের উপর হঠাৎ একটা কেমন আই-ঢাই, কি একটা অস্বস্তি চট্‌ ক'রে জেগে উঠ্‌লো কেন? অমল উপরে উঠ্‌তে গেল, কিন্তু কিসের যেন ব্যথায় হাঁটু-দুখানা পঙ্গু হয়ে গেছে, মনে হ'ল। ভাবতে গেল—এটা কি তার? কিসের ব্যাকুলতা মনের উপর যেন ঠেক্‌লো——একটা কিসের ভারী বোঝা চেপে রয়েছে! ভাব্‌লে মাসির বাড়ী যাই, কিন্তু ঠাকুরকে তো খাওয়ার কথা,—না বলা হয়নি—অম্‌নি আবার মনে পড়ল সেই তরুণী—তার ঘন-কালো চোখদুটী। অমল ঠিক কর্‌লে, তখনি আবার ফিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলে আসে, আজ সে খাবে না—সেই ফাঁকে যদি তাকে আর একবার দেখা যায়! ফিরে গিয়ে সে রান্না-ঘরে ঢুক্‌লো—কিন্তু শূন্য সে ঘর, ফাঁকা—কেবল কতকগুলি কালি-ঝুলে ভরা কালো-কিষ্টি কেষ্টা উড়ের সেই পুরোনো হেসেল-

খানা। ঐখানে এসে সে দাঁড়িয়েছিল,—ঘর-খানাকে ধন্য ক'রে, আলো ক'রে—সে কিন্তু কোথায় গেল? অমল ভাবলে, জিজ্ঞেস করে ঠাকুরকে—কে সে অমন সুন্দরী? কিন্তু সাহস হলো না। খাবার কথা বারণ ক'রে দিয়ে বেরিয়ে—অমল বরাবর রাস্তায় এসে দাঁড়াল। লোকের স্রোত চলেছে! বাড়ীর গায় দোকানের সাম্‌নে সব বিজ্ঞাপনের কাগজ—"ওরিয়েণ্টালের চির-মধুর সাবান," "আর্য্য ফ্যাক্টারীর ষ্টীল ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স," "রায়ব্রাদার্স রবার ষ্ট্যাম্প-ওয়ালা" "/০ এক আনায় এক বোতল কালি" এই সব পড়্‌তে পড়্‌তে সে চলেছে, কিন্তু কিছু মানে বুঝ্‌তে পাচ্ছে না! ট্রামগুলো চলেছে—মোটর গাড়ীর সাম্‌নে পাগড়ী-ওয়ালা সোফার ভিতরে ভুঁড়িওয়ালা বাবু, একটা বড় বাড়ীর গায় প্রকাণ্ড একখানা ছবি—"গোয়ালিনী-মার্কা গাঢ় দুগ্ধ—হস্ত-দ্বারা স্পর্শিত হয় নাই"—অমল হাঁ ক'রে তাকিয়ে সব দেখ্‌ছে, যেন কত বিচিত্র এ জন-যাত্রা, এই লেখা-রঙ।

গাড়ী-জুড়ি-কোলাহল,—এ বুঝি সে আর কখনো দেখেনি, আজই প্রথম। শূন্য-মনে কেবল কার একখানা মুখ অনবরত বিদ্যুতের মতন থেকে থেকে চম্‌কে উঠ্‌ছে; মাথায় এসে কোনো চিন্তাই কিন্তু দুদণ্ড দাঁড়াতে পার্‌ছে না। এম্‌নি ভাবে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একটা পানের দোকানের কাছে গিয়ে সে থম্‌কে দাঁড়ালো। পকেট থেকে একটা পয়সা তুলে ফেলে দিয়ে একটী সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে আবার চল্‌লো। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে মাসির বাড়ীতে গিয়েই শেষে উঠ্‌লো, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

মাসি বল্লেন—"কিরে, এত বেলা ক'রেছিস?"

অমল অন্যমনস্কে উত্তর দিলে—"বেলা হয়েছে?"

"ওমা, বেলা হয়নি? একটা বাজ্‌তে যায়! কোথায় কোথায় ঘুরছিলি?—রোদে দেখ্‌তো মুখখানা একেবারে যে রাঙা হ'য়ে গিয়েছে!"

কোন উত্তর না দিয়ে অমল তক্তাপোষের উপর ধপাস ক'রে বসে পড়্‌লো। মাসি ভাবলে, পিত্তি পড়ে ছেলের কাহিল বোধ কচ্ছে—তাড়াতাড়ি জায়গা ক'রে খেতে দিলে। আজ অমল খেতে বসে তেমন হো-হো করে হাস্‌লে না, বেশী কথাও বল্লে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেরোবার জন্যে উঠ্‌লো। মাসি ব'ল্লেন—"এই রোদ্দুরে যাবি,"—

"হ্যাঁ, কাজ আছে" ব'লে বেরিয়ে বরাবর গোলদীঘিতে এসে একটা গাছ তলায় বসে সন্ধ্যে-অবধি শুধু সেই রান্নাঘরের ছবি-খানিই ভেবে ভেবে মনের পরতে পরতে সেটী অবিনশ্বর ক'রে এঁকে নিলে।

২

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এলে শ্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে তার ঘরখানার ভিতর মেঝেয় পাতা বিছানার উপর শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। ছেলেরা যখন তাকে খেতে যাবার জন্যে ডেকে জাগিয়ে দিলে, অমল তখন স্বপ্ন দেখছিল—সেই তরুণী বেল, চম্পক আর হেনা ফুলে এক-গাছি মালা গেঁথে অমলের গলায় পরিয়ে দিতে এসেছে, অমল মালাছড়াটি কেড়ে নিয়ে তারই গলায় পরিয়ে দিয়ে ফুলের মত সে মুখখানা

তুলে ধরেছে—এমন সময় কে যেন ডাক্‌লে, "অমল, অমল"—অমলের ঘুম ভেঙে গেল। খেয়ে ফিরে এসে অমল তার বিছানার উপর বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—হঠাৎ যদি সে এইখানে এসে পড়্‌তো, তবে দু হাতে তার সুগোল হাতখানা ধরে নিয়ে এসে কাছে বসিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ চুলগুলি তার মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিতাম, কত কথা বল্‌তাম! না না, কিছুই বল্‌তাম না, বোধ হয়,—শুধু তার মুখের পানে চেয়ে চেয়েই সারাটা রাত কাটিয়ে দিতাম।

সে যেন পাগল হয়ে গিয়েছে—সেই একবারের নিমেষের দেখাতেই! ন'টা, দশটা ক'রে বারটা গজল দিয়ে ঘড়ি ঢঙ-ঢঙিয়ে উঠ্‌লো,—অমল তখনও বসে ভাব্‌ছে, আর কি তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না? আর একটী বার! তাকে পাবার আশা কি একেবারেই স্বপ্ন? কেন? যদি আমি তাকে বিয়ে করি! কিন্তু সে আমায় বিয়ে করবে কেন? নিঃসম্বল নিঃস্ব এক মূর্খকে? এই ত আমার ধন-দৌলত—ডবল টিনের ঐ টোল-খাওয়া, ভাঙা-চোরা বাক্সটা, এই সতরঞ্চি আর বিছানার চাদর, এই ওয়াড়-ছাড়া ময়লা বালিসটী—আর সে যে কাপড়-খানা পরেছিল, তা এখনো বিক্রি করলে যে আমার ঐ সম্পত্তি দুবার ক'রে কেনা যায়! তবে? আশা নেই, কিছু আশা নেই! অমলের বুকের ভিতর সত্যই একটা যন্ত্রণা বোধ হল। সে "উঃ" ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। তখনি আবার মনে হলো—বেশত যদি মন দিয়ে লেখা-পড়া শেখা যায়, যদি স্কলারসিপ পেয়ে বিলেত যাই! সেখান থেকে মানুষ হয়ে ফিরে আসি, তা হলে—?

আশা-হতের মনে অনেকখানি আশ্বাস এলো। এবার প্রাণপণে সে শিক্ষার সাধনা কর্‌বে, প্রতিজ্ঞা ক'রে শুয়ে পড়্‌লো,—কিন্তু ঘুম ভালো হলো না। পরদিন থেকে অমল ভয়ানক পড়া আরম্ভ কর্‌লে,—সে আর বেড়াতে বেরোয় না, খেল্‌তে যায় না, কেবল খাতা নিয়ে লেখে আর বই কোলে ক'রে বসে পড়ে। কিন্তু বইএর পাতার উপর থেকে থেকে কার দু'খানি ভুরুর দুটী বাঁকা রেখা কালো হয়ে ফুটে ওঠে, লেখার ফাঁকে অন্যমনস্কে গৌরবর্ণ কার একখানা হাত এঁকে তুলে একগাছি ফুলের মালা আঙুল ক'টীতে এমন ক'রে ধরিয়ে দেয়, যেন কারো গলায় সে সে মালা পরিয়ে দিতে যাচ্ছে!

আর একটী বার তার মুখখানি দেখবার আশায় অমল তারপর আরো কতদিন ন'টার সময় রান্নাঘরে গিয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ বুকে ব্যথা নিয়ে তাকে ফির্‌তে হয়েছে! তরুণী তার অরুণ সেই যুগল-ঠোঁটে ঘুমোনো হাসির আবছায়া জাগিয়ে নিয়ে তো আর রান্না দেখাতে আসেনি! ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে ভিতরের দিকে দিনে দশ বারই হয়তো চেয়ে দেখেছে, কিন্তু হায়রে, বাঁশের বুক বেঁকিয়ে গড়া আলকাতরায় কালো জাফরীর বেড়াটার এমন নিষ্ঠুর শাসন! সে আছে দৃষ্টির সম্মুখে, পাহাড়ের মতন একটা নিরেট বিরাট বাধা রচনা করে উঁচু করে দাঁড়িয়ে। বেড়ার আড়ালে মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের পায়ের ধ্বনি, কুট্‌নো কুট্‌ছে, চুড়ির ঠুনঠুনি,—আঁচলটা সরিয়ে সেরে নিচ্ছে—চাবির ঝন্‌ঝনি—এ সবই স্পষ্ট শোনা যায়,—বেশ বুঝতে পারে—দেখতে তো পায়না কাউকেই! এই রকম উত্তেজনার

মধ্যে অমলের জীবন থেকে আরো তিনটে মাস খুলে গেল। এখন সে ক্লাসের মধ্যে ভাল ছেলে। সেবারে পাশের পড়া তখনই তার খুব ভাল তৈরি হয়ে গেছে। চাওয়া-চাওয়ির লুকোচুরিটা ক্রমাগত ব্যর্থ হয়ে অমলকে সেদিকে এক রকম অমনোযোগীই করে তুললে। সে আর এখন বড় একটা তাকায়-টাকায় না;—নীরবে নিশিদিন তার অজানা প্রিয়তমার উদ্দেশে প্রাণের মৌন-মিনতি মনে মনেই নিবেদন করে, আর নিজের বড় হওয়ার তপস্যায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়।

৩

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন অমল কোথা থেকে তার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল—বই, খাতা, কাঁথা চাদর, গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে, কাউকে কিছু না বলে বাড়ী রওনা হ'ল। সে যখন ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলো, তখন ডাকগাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে সে গাড়ীতে উঠে বস্‌লো—কিন্তু মুখের চেহারাটা তার তখন ভয়াবহ রকম বিষণ্ণ, বুকের ভিতরটা দপদপ কচ্ছে, প্রাণের নীচে থেকে একটা কি দুঃখের কান্না যেন চীৎকার করে বেরিয়ে আসতে চায়!

এম্‌নি ভাবেই সারাটা রাত কাটিয়ে সকালে এসে অমল বাড়ী পৌঁছুলো। আবার সেই সৎমার রক্ত চক্ষুর রূঢ় ভঙ্গী, কলকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলে কথা চিবিয়ে হাত-মুখ নেড়ে তাঁর বাৎসল্যের সম্ভাষণ, যখন-তখন দোষের ছুতো ধরে অনাহূত সে গুরু লাঞ্ছনা, অমলের পক্ষে বাড়ীটা অসহনীয় করে তোলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু অমল এবার নির্ব্বাক, মুখ গুঁজে, সব সহ্য ক'রে যায়। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে অমল চলে এসেছিলি হঠাৎ কেন, তা তুই-ই জানিস্, আর প'ড়তে যাবিনে?" অমল বল্‌লে, "আমি আর পড়্‌বো না।" আর সৎমা তখনি বলে উঠ্‌লেন, "তখনি তো বলেছি আমি, ও করবে পড়া-শোনা! ও ছেলে আমাদের গলায় কাঁটা হয়ে থাক্‌বে, শেষে একদিন বুকে ছুরি মার্‌বে। মার্‌বে, মার্‌বে, মার্‌বে, তুমি দেখো। এখন সেইজন্যে দু'বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি খাইয়ে গায়ের তেল বাড়াও।"

অমল কোন উত্তর না দিয়ে নীচু মুখে তার ঘরখানির ভিতর ঢুকে দরজা দিয়ে বিছানার উপর পড়ে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে,—বুকখানা যদি তার তখনি ফেটে চৌচির হয়ে যেতো তো সে বাঁচ্‌তো, এই যন্ত্রণার হাত থেকে! তার যে কি দুঃখ, কি সে ক্ষত রোজ বেড়ে উঠে জীবনটাকে দুর্ব্বহ ক'রে তুল্‌ছে, তা শুধু সে-ই জানে।

বাড়ী থেকে অমল আর বেরোয় না—কোথ্‌থেকে রবিবাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী একখানা যোগাড় করেছে, কেবল তাই পড়ে, আর খাতা ভরে পদ্য লেখে। সব লেখা-গুলোর ভিতরেই একটা যেন কান্নাকাটি করে বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদ নিয়ে সে দাপাদাপি করছে বলে মনে হয়, সুরটা যেন চোখের জলে ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছে!

যতদিন সৎমা ইচ্ছে ক'রে তাকে খেতে দেয় নি—অমল কিছু না বলে পেটের ক্ষিধের সঙ্গে তার প্রাণের ক্ষিধে মিশিয়ে চেতনা-হীন মনোযোগে বসে সারাদিন শুধু কবিতা কি গল্পের বই পড়েছে; "চোখের বালির" পাতার উপর চোখ ঠিকরে রেখে দীর্ঘদিন আর

বিনিদ্র রাত কাটিয়ে দিয়েছে। পরদিন সৎমা যদি দয়া ক'রে কিছু দিয়েছেন তো অমল খেয়েছে, খাবার চেয়ে নেয়নি কখনো, কিম্বা না খাওয়ার অভিযোগও জানায় নি কাউকে।

কিন্তু সংসার যেমন উল্‌টে পাল্‌টে যায়, মনও তার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেম্‌নি করেই বদলায়। অমলের বাবা মারা গেলেন। অতএব সংসার সৎমা, সৎ ভাই-বোন, সবাইকে নিয়ে এসে চেপে পড়্‌লো তারি ঘাড়ে। অমলের এখন আর কাঁড়ি না গিলে কাঁড়ি যোগাবার কর্ত্তব্য বড় হয়ে উঠ্‌লো। অমল গাঁয়ের কাছেই একটা ইংরিজী ইস্কুলে মাষ্টারি চাকরি নিলে। দু-চার বিঘে জমি-জিরেত যা ছিল তাই দেখে-শুনে কোনোমতে সংসার চালিয়ে চলতে লাগ্‌লো, কিন্তু সৎমার রাস-ভারি সে ঝঙ্কার তবু মোলায়েম হয়ে এলো না। তিনি রোজই বলেন, "আমার ছেলেরওতো বাড়ী-জমির ভাগ আছে, আমাদের জিনিষই আমরা খাচ্ছি—ও কি করছে! আমাদের অমন ছেলে মরে যাওয়া ছিল ভাল।"

অমল সে কথায় কানও দেয় না। এর মধ্যে অমল হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পেলে। আপিস-বাড়ীর কাকাবাবু অমলের দাদা-মশায় লিখেছেন ঃ—

"ভাই অমলচন্দ্র, কল্যাণ হউক। তুমি এখন সংসারে ঢুকেছ, কাজ-কর্ম্ম কচ্ছ। এই বে-থা করবার সময়। তোমার চিঠি পেলে বিস্তারিত সব খবর দেব। ইতি।"

অমল উত্তরে লিখ্‌লে—"ও সব কথা থাক দাদা-মশায়, আপনি আমার প্রণাম নিন্। বিয়ে হয় তো আমি করবোই না। নিবেদন ইতি।"

দিন-দুইএর ভিতরেই আবার জবাব ঘুরে এল। আবার অমলের কল্যাণ চেয়ে দাদা-মশায় লিখ্‌লেন—

"বের কথা হলেই আজকালকার তোমরা ঐ রকম গুমোর-করা জবাব দাও। কিন্তু বিয়েতে যে মনকে নীতি-শৃঙ্খলার ভেতর সংযত, সংহত ক'রে তোলে, তা তো তোমরা বোঝ না। আমি মেয়ে পছন্দ ক'রে সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। মুক্তি মেয়েটী খুব সুশীলা, দেখতেও বেশ—তুমি বোধ হয় আমাদের অনুর বউকে দেখেছ, অনেকটা সেই রকম। আশা করি, আর অন্যমত করবে না। ইতি"

চিঠি পড়ে অমলের মনটা লাফিয়ে উঠলো। একটী যে তীব্র স্মৃতি অমলের অন্তরের ভিতর খোঁচার মত হয়ে অনবরত খচ্ খচ্ করতো, এই চিঠিটায় যেন সেটা হঠাৎ অনেকখানি কমে গেল। সে তখনি লিখ্‌লে—

"আপনি যেমন লিখেছেন, সে যদি ঠিক তেম্‌নি দেখতে হয়, তবে আমি বিয়েতে রাজী আছি।"

কাজেই শুভদিন ঠিক হয়ে গেল। তখন অমলও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাজনা-টাজনা বাজিয়ে অনুর বউএর মতো বউ আন্‌তে চল্‌লো। কিন্তু তবু এই আনন্দের কলরোলের মধ্যে অমলের চিত্ত এক-একবার নুয়ে আসতে লাগ্‌লো—বাজনার সে তালে তার হৃৎপিণ্ড যেন তেমন করে বাজলো না, শানাইএর সে সুরে অমলের প্রাণ গান গেয়ে উঠ্‌লো না। শুভ লগ্নে, শুভ কাজ শেষ হয়ে গেল। "বরণের" পর "সাতপাক" হয়ে গেলে একটী তরুণী গাল-ভরা হাসি হেসে বল্লেন, "বর এইবার শুভ-দৃষ্টি

কর।" অমল নিমেষে চকিত হয়ে উঠে প্রথম শুভ-দৃষ্টি-বিনিময় করলে সেই তরুণীর আঁখি দুটীর সঙ্গে, তারপর মুক্তির মুখের দিকে তাকালে। অমলের মুখের উপর দিয়ে যেন কে কালি-পোরা পিচকিরি মেরে গেল। সে হঠাৎ বিষম রকম দমে গিয়ে উপরের দিকে তোলা দৃষ্টিটা তার নামিয়ে নিলে। এ তো তার কাছ দিয়েও যায় না! কালোর উপর পাউডার জাঁকিয়ে কি অমন যে চম্পক বর্ণ, তা ফলানো যায়? এ যে কালো, ভয়ানক কালো! আর মন্মথেরও মন-ছোঁয়া রুচির চারুতার রঙের গৌরব অনুর বউএর তনুর সঙ্গে এ তরুণীর অঙ্গ গড়নের কোনো তুলনাই চলে না। ভুল হয়েছিল তার না দেখেই বিয়েতে মত দেওয়া। অমল চুরি করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লে। শেষে আচার্য্য অমলের হাতের সঙ্গে এই অচেনা মেয়েটার কালো হাতখানি ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌লেন—"এ বাঁধন অটুট থাক্, অক্ষয় হোক।" অমলও "আমি তোমার সখা হই, তুমি আমার সখী হও, আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার হোক" বলে মুক্তিকেই আপনার ক'রে নিলে। অনুর বউ পরের ঘরের লক্ষ্মী পরেরই ছিল, পরেরই রয়ে গেল, শুধু অমলের হৃদয়ে রইল একটা হায়-হায়!

৪

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে অমল বড়দি—মানে মুক্তির দিদিকে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ বড় দি, কাল যে মেয়েটী আমায় শুভদৃষ্টি করতে বলেছিলেন—তিনি কে?"

ঠিক সেই সময় সেই তরুণী খাবারের থালা হাতে ক'রে ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "কেন, তাঁর উপরও দৃষ্টি পড়েছে না কি অমল বাবু?"

অমল একেবারে থতমত খেয়ে গিয়ে বড়দির উপরকার দৃষ্টিটা তার বেঁকিয়ে এনে এই সুন্দরীর ছবির মতো মুখখানার উপর মায়া-কিরণের মত চঞ্চলভাবে ফেলে অবাক হয়েই রইল। বড়দি বল্লেন, "এ যে মণি, মুক্তির বড়, অবিশ্যি আমার ছোট। আমাদের বড় মাসিমার মেয়ে! মণি যে আপিস-বাড়ীর অনুরূপ বাবুর স্ত্রী। কেন, তুমি ওকে চেন না?"

অমল শুধু বল্লে, "হ্যাঁ, চিনি বোধ হয়, তবে উনি যে অনুরূপ বাবুর স্ত্রী, তা আমি খুব ভাল করেই জানি, আর— "

মণি বল্লেন, "আর কি অমল বাবু?"

"আর আপনি তা হলে হলেন আমার আপনার চেয়ে আপনার।"

কথাটা বলে অমল আর একবার মণিকে তাকিয়ে দেখলে—আজ এইখানেই শেষে অমলের অতি-নিকট সে যে দূর থেকেও দূরে থেকে অমলের দেহ থেকে প্রাণটাকেই বুঝি এক দিন দূর ক'রে দিতে চেয়েছিল।

মণি বল্লেন, "আপনার তার চেয়েও আপনার?"

অমলের বুকের মাঝখানটা এবার দ্রুত স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌লো। "ও কি! এত ক'রে আমার দিকে তাকাবার অধিকার তো কাল আচার্য্যের এজলাসে ছেড়ে এসেছেন, অমলবাবু" বলে মণি মুখটা টিপে, ঠোঁট দুখানা চেপে মুচকি হাস্‌লেন।

অমল জোর ক'রে একটুখানি হেসে উত্তর দিলে,—"কি করি বলুন? চোখ দুটী বড়

অবাধ্য, আমি বারণ কল্লেও শোনে না। ঐ দুটীর পানেই কেবল তাকিয়ে থাকৃতে চায় —কি কালো যে ও দুটী!"

"কেন, এ দুটী কি তার চেয়ে কিছু কম কালো?" বলে মণি মুক্তির মুখখানা উঁচু ক'রে ধরতেই অমল বল্লে, "কালো কম না হ'তে পারে, তবে অত ডাগর তো নয়।"

মুক্তি এবার একটা ঝাঁকি মেরে মণিদির হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালালো। অমল একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বল্লে, "বড়দি, একটা গল্প শুনবে?"

"বল না, সকালটা জমে উঠ্‌বে বেশ।"

অমল বল্‌তে লাগলো। তার ব্যর্থ প্রেমের সবটা গল্প কান্নায় কান্নায় ভরে তুলে একেবারে শেষ করে তরুণীদের শোনালে। তারপর যখন বল্লে, তরুণের জীবনটা মরুভূমির মত নীরস, বিফল, মিছে হয়ে গেল, তার ভবিষ্যতের সব আলো একেবারে কালো অন্ধকারে ভরে গেল সেইদিন – যেদিন ঠাকুরের কাছে খোঁজ নিয়ে সে জান্‌লে যে তাকে সে-দিন রান্না দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যিনি, তিনি আর একজনের, তাঁর সিঁথিতে সিঁদুরের রক্ত রেখা টেনে দেবার অধিকার এ জন্মে আর কারো নেই—সেইদিনই মর্ম্মের মাঝখানে টন্‌টনে ব্যথায় ভরা গভীর ক্ষত নিয়ে সে-বাড়ী ছেড়ে তরুণ চলে গেল—তার এ-জন্মটাই চিরদিনের জন্য নিরর্থক হল।

গল্প শুনে বড়দি বল্লেন, "আচ্ছা!" আর মণিদি গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অমল অশ্রু-ছলছল চোখে তখনো তাকিয়ে দেখ্‌লে, তাঁর পিঠের সুডোল টানা বাঁকটা।

বিকেলে মণিদি অমলের হাতখানি ধরে নিয়ে ড্রইংরুমে বসিয়ে নিজে একখানা কৌচের উপর তাঁর অঙ্গের ভর রেখে বস্‌লেন। অমল বল্‌লে, "সে কি, মণিদি, খবর কি আপনার? এমন ক'রে আমায় টেনে আন্‌লেন কেন?"

দুঃখ-জড়িত একটু হাসি হেসে মণিদি বল্লেন, "মুখখানা দেখাবার জন্য।"

"সে কি, এ বেলা আবার নূতন ক'রে দেখবো?" ব'লে অমলও হেসে ফেল্‌লে, কিন্তু তার চারিদিকে একটা ক্ষোভের কাতরতা দিয়ে যেন সীমা টানা ছিল।

খুবই গম্ভীর হয়ে গিয়ে মণিদি বল্লেন, "আজ অতি কাছাকাছি ধরা দিয়েছি অমলবাবু, যতবার ইচ্ছে করে, আজ চেয়ে দেখুন, কিন্তু এর চেয়ে আর এগোবার আমারও অধিকার নেই, আপনারও নেই, মানুষ হিসেবেও নেই, স্বামীর দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন বলে সে হিসেবেও নেই। আমার বুকের ভিতর আপনার নিরাশ প্রাণের গল্প যে কি ব্যথা পুঞ্জীভূত ক'রে দিয়েছে, তা আপনাকে বলে বোঝাতে পার্ব্ব না। আমিই একটা রূঢ় অভিশাপের মতো আপনার সমস্ত জীবনটাকে এমন ব্যর্থ করে দিলাম!" মণিদির চোখের কোণে এক ফোঁটা জল দেখা গেল।

অমল বল্‌লে, "যাক্ ও কথা।"

"না, সবগুলো কথা শেষ ক'রে বলবো বলেই আপনাকে নিয়ে এসেছি। আমি আজ সত্য কথাই বল্‌ছি—যদি আমি সেদিন কুমারী থাকতাম আর শুন্‌তাম, আমার জন্যে আপনার মানুষ হবার সাধনা, এই একখানা ছাই মুখের উপর এমন প্রাণভরা দৃষ্টি, তা হলে যত বড় আপনি হতে চেয়েছিলেন, তা না হলেও—আপনাকেই আমি বরণ করতাম।"

"করতেন ?" বলে অমল হঠাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো।

মণিদি বল্লেন, "হ্যাঁ, করতাম, কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কেন, মণিদি ? ঐটুকুই যে আমার বাকী জীবনটাকে সোজা ঠিক পথে চলিয়ে নিতে পার্‌তো।"

"কিন্তু আমাকে নিয়ে সুখী হতে পার্তেন না। অমল বাবু, আমি বড় অভিমানিনী। কত রাত্রি মিছে একটা ছোট কথার উপর অশ্রু ঢেলে আমি কাটাই, খুঁটি-নাটি নিয়ে মুখ ভারী করে সারাদিন যায়। সংসার আপনার সুখের হতো না। আজ যাকে পেয়েছেন, সে আমার চেয়ে ঢের বড়, দেখ্‌বেন,—ঐ একটা কালো বুকের আচ্ছাদনে কত বড় একটা হৃদয় লুকিয়ে আছে, কতখানি আত্ম-নিবেদন নিয়ে সে আপনার দুয়ারে লক্ষ্মীটীর মত গিয়ে দাঁড়াবে, নিত্য কল্যাণ কাজে। আজ তাই আপনার কাছে আমার একটা জিনিষ চাইবার আছে—"

অমল মুখ নীচু করেই বল্‌লে, "বলুন।"

"যদি কোন দিন আমাকে ভালবেসে থাকেন, তবে সবটা সেই ভালবাসার দাবী নিয়ে আমি চাইছি। স্বীকার করুন, আমাকে ভুলে যাবেন, মুক্তিকে ভাল বাস্‌বেন।"

"আপনাকে একেবারে ভুলে যাওয়া সে বুঝি পার্‌বো না মণিদি, তবে মুক্তিকে আমি ভাল বাস্‌বো, সরল অকপট ভালবাসাই বাস্‌বো।"

"আমি চিরদিন আপনাকে মনে রাখ্‌বো, আপনার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌বো।"

"তবে আমিও পার্‌বো, এ আঘাত সাম্‌লে নিতে। আজ শ্রদ্ধা-ভরে আপনাকে প্রণাম ক'রে বল্‌ছি, আপনি আমার মণিদি—আর মুক্তি আমার কালো বউ"—ব'লে অমল দুই হাত দিয়ে মণিদির পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিলে।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পুরুষ ও নারী

পুরুষ এতদিন আপনার ইচ্ছামত নারীকে গড়িয়া আসিয়াছেন। তাই তাঁহার স্বভাব ক্রমে সাধারণ মনুষ্যত্ব হইতে স্খলিত ও বঞ্চিত হইয়া একমাত্র স্ত্রীত্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবলমাত্র বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতির কাজগুলি ছাড়া আর কিছুই করিবার অধিকার, যোগ্যতা বা সুবিধা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার মধ্যে সাধারণ মনুষ্যত্বের উপযোগী কোন গুণের চর্চ্চা দেখিলেই পুরুষের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, বুঝিবা তাঁহার নারীত্ব সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল ! তাঁহারা যেরূপভাবে নারীকে গড়িয়া আসিতেছেন, তাহা ছাড়াও তাঁহার অন্যরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুবা নারীর দেহের গঠন যেমন বদলাইতে পারে না, মনের সম্বন্ধেও যদি সেইরূপ নিশ্চিন্ত ভাব থাকিত, তাহা হইলে এরূপ ভয় পাওয়ার কোন কারণ থাকিত না।

বাস্তবিক পুরুষের ভয় পাইবার কারণ,

তাঁহারা এ পর্য্যন্ত নারীকে যে ছাঁচে ঢালিয়া আসিতেছেন, তাহার অধিকাংশই কৃত্রিম। নারী কেবলমাত্র স্ত্রী-জাতীয় জীব নহেন, মনুষ্যও বটে। তাঁহার সেই অংশ সম্পূর্ণ চাপা পড়ায় তাঁহার স্বভাবই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। পুরুষকে যদি এতকাল কেবল পুরুষমাত্র হইয়া স্বামী, পিতা ইত্যাদির কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়াই থাকিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার দশাটা কেমন হইত মনে করিয়া দেখিলে হয়। মনুষ্যত্বের সকল অংশই তাঁহারা একচেটিয়া অধিকার করায় নারী তাঁহার বিশেষ কার্য্যগুলি ভিন্ন কিছু করিতে গেলেই পুরুষের কার্য্য করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেগুলি কাহারও ইজারা-করা নহে, মনুষ্যমাত্রেরই তাহাতে সমান অধিকার। সেই সাধারণ মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিয়াও পুরুষ যখন এ-পর্য্যন্ত পুরুষই আছেন, তখন নারীর সম্বন্ধেও ভয় পাইবার কারণ নাই। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিলেও নারী নারীই থাকিবেন।

এই প্রসঙ্গে উভয়ের শিক্ষা, দীক্ষা, সুবিধা, অধিকারের মধ্যে গুরুতর বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া উভয়েরই যে কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা মনে না আসিয়া যায় না। পুরুষ-নারীর মধ্যে কেবল তাহার চর্চ্চাই হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের একান্ত সাধনা-সত্ত্বেও বুদ্ধি, বিবেচনা, শিক্ষা ইত্যাদি সাধারণ মনুষ্যোচিত সমস্ত গুণগুলিই বাদ পড়ায় সেগুলিও সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

এদিকে নারীর দাবী ও অধিকার হইতে পুরুষ আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া স্বাধীন মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাহাতেও ফল হইয়াছে এই যে, বুদ্ধি-বৃত্তির এত চালনা-সত্ত্বেও পূর্ণ মনুষ্যত্ব-লাভ তাঁহারও ভাগ্যে অল্পই ঘটিয়াছে। কখনও কখনও তিনি নারীকে বন্ধন-জ্ঞানে সংসার হইতে একান্ত মুক্ত হইয়া ধর্ম্মচর্য্যার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও প্রকৃতির একান্ত বিরোধী হওয়ায় সাধারণতঃ তাহা না পারিয়া নিজেদের জন্য একটী স্বতন্ত্র সুবিধাজনক নৈতিক আদর্শ খাড়া করিয়াছেন। তাহাতে নারীর সহিত সম্বন্ধটাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া অন্য নানা বিষয়ে আপনাদের বুদ্ধি-বৃত্তি চালনা করিয়াছেন। ইহাতে হইয়াছে এই যে, তাঁহাদের বুদ্ধি নক্ষত্রলোকের সন্ধানে ব্যাপৃত হইলেও প্রকৃতির একটী প্রধান বৃত্তি, উপযুক্ত ব্যবহারের শিক্ষা না পাইয়া, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের সংস্কার তাঁহাদের এ পর্য্যন্ত বর্ব্বর যুগের অবস্থা হইতে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বাস্তবিক নারীকে অস্বীকার করিতে গিয়া তাঁহাদের বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। Marcus Aurelius এর কথায় তাঁহাদের অবস্থা "Either uneasy without them or imtemperate with them."

নারীকে বাদ দিতে গিয়াই নারী তাঁহার বন্ধনের কারণ হইয়াছে। নতুবা উভয়ে মনুষ্যত্ব লাভের তুল্য সুযোগ পাইলে এবং উভয়ের প্রতি উভয়ের দাবী ও অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত হইলে নারীই তাঁহার প্রকৃত মুক্তি ও মনুষ্যত্ব লাভের সহায় হইতে পারে। নারীই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সংযমন-শক্তি, নারীকে অস্বীকার করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা ও সর্ব্বনাশ হইতে কে তাঁহাকে রক্ষা করিতে

পারে? নারী পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান স্থিতিশক্তি বলিয়াই এত বন্ধন-সত্ত্বেও তিনিই তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। নারীর অবমাননা ঘটিলেই তিনি তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠেন। ইহা প্রকৃতির অমোঘ প্রতিশোধ মাত্র।

বাস্তবিক সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিলে প্রকৃতির ব্যভিচার করিতে গিয়া মানুষের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, সহজেই তাহা চোখে পড়ে। বুদ্ধি, ধন, বংশ-গৌরবে যাঁহারা সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশেরই ভিতরকার খবর সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সমাজ নিছক পুরুষের সমাজ, ইহাতে নারীর কোন স্থানই নাই, (যদি থাকে, তাহাও বিশেষ লোভনীয় নহে); সুতরাং পুরুষ আপনাদের মধ্যে ব্যবহারে কাজ-কর্ম্ম, বুদ্ধি, ভদ্রতা ইত্যাদির পরিমাপ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, নারী-ঘটিত সংস্কারটী তাঁহাদের বিশেষ স্পর্শ করে না, সুতরাং খবর লওয়া তাঁহাদের কাছে অনাবশ্যক। বড় জোর ঐ বিষয়টী তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কৌতুক ও পরিহাসের কারণ মাত্র হইতে পারে, এবং অনেকেই তাহা লইয়া বেশ একটু আমোদও অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা আমোদ বোধ করিলেও প্রকৃতি ভুলিয়া থাকেন নাই। তাই এরূপ লোকের স্থান পুরুষের গড়া সমাজে যত উচ্চেই হউক না কেন, মনুষ্য-পর্য্যায়ে তাঁহাদের স্থান যে কোথায়, তাহা তাঁহারা যে-সকল স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে দিন কাটান, তাহা দেখিয়াই নির্ণীত হইতে পারে। সমাজ কেবল ঐ স্ত্রীলোকগুলি-তাহার ফলে নিজেদেরও সেইখানে আসিয়া কাদা মাখিতে হইয়াছে। দুইজনের জন্য বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করিতে যাওয়ায় এমনই বিড়ম্বনা!

অনেক বলেন, নারী চরিত্র-হীন হইলে যত মন্দ হয়, পুরুষ সেরূপ হয় না। কিন্তু তাহার সামান্য স্খলন হইলেই আর কোন পথ না রাখিয়া তাহাকে পাপ-পঙ্কে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। শিক্ষা, সম্মান দূরে থাকুক, এমন কি সে নারীর জীবিকা-নির্ব্বাহেরও আর কোন উপায় রাখা হয় না। এমন অবস্থায় সে মন্দ না হইয়া আর কি হইতে পারে, কল্পনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু সমাজের শীর্ষস্থানীয় পুরুষেরা শিক্ষা, সম্মান, বংশ-মর্য্যাদার সকল সুযোগ পাইয়াও যে ভিতরের প্রকৃতিতে তাহাদের সমান স্তরে থাকিয়া যান, ইহাই আশ্চর্য্য!

এক-তরফা নৈতিক আদর্শ সৃষ্টি করিতে গিয়া পুরুষ নিজে ত ডুবিয়াছেই, নারীকেও ডুবাইয়াছে। কারণ নারীর সম্বন্ধে শাসন যতই কঠোর হউক না কেন, নারী না হইলে পুরুষের দুষ্প্রবৃত্তির চর্চ্চাও হইতে পারে না। সুতরাং নারীকে তাহার দুষ্প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইতেই হইয়াছে। বাস্তবিক নারীর প্রতি পুরুষের দাবী অদ্ভুত বটে! স্ত্রী-হিসাবে তাহার অকলঙ্ক বিশুদ্ধতাও চাই, আবার তাহাকে নরকে ডুবাইয়া দুষ্প্রবৃত্তির ইন্ধনও চাই! সকল দিকে আপনার স্বার্থ ষোল-আনা বজায় রাখিবার বেশ কৌশল খেলা হইয়াছে!

আগে শুনিতাম, প্রাচীনেরা বলিতেন, নারীর দুষ্প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল, সুতরাং তাহাকেই

শুনিতেছি, পুরুষেরই ঐ সংস্কারটী অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অতটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম খাটিতে পারে না! ফল এরূপ গুরুতর না হইলে কথাগুলি বিশেষ কৌতুকজনক হইতে পারিত বটে। কিন্তু পুরুষের ঐ সংস্কারটীর বাস্তবিকই যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তাহা তাহার কৃত কর্ম্মেরই ফল। কারণ নারীকে অস্বীকার করিয়া তিনি ঐ প্রবৃত্তির সংস্কার, সংযমের অভ্যাস কখনই করেন নাই। যে পুরুষ বুদ্ধি, বিদ্যা ও প্রতিভা-বলে বিজ্ঞান, কাব্য, কলাদির এত উচ্চ শিখরে উঠিতে পারিয়াছেন, তিনি যে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিলে মানুষের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য আপনার শরীর-মনকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখা—তাহাতে অসমর্থ হন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। এ বিষয়ে একান্ত অবহেলার দ্বারা বিকৃত সংস্কারের সৃষ্টি না করিলে বাহিরে এত সৌন্দর্য্য ও আর্টের চর্চ্চা করিয়া তাহার সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র নিজ জীবনে তাহার বিকাশ করিবার চেষ্টায় কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারিতেন না। বাস্তবিক ধর্ম্ম ও নীতির দিকের কথা আপাততঃ না বলিলেও জীবন-যাত্রাতেই যদি আর্টকে অস্বীকার করা যায়, তবে তাহার স্থান আর কোথায় থাকে? এ-বিষয়ে প্রচলিত সাহিত্যের রুচি যে কেমন বিকৃত, তাহা একটু দেখিতে গেলেই ধরা পড়িবে। এখনকার উচ্চশ্রেণীর realistরা নায়িকাকে যেখানে ভাল রংয়ে দেখাইতে চেষ্টা করেন, সেখানে তাহাকে একেবারে কোন সত্য পাপের মধ্যে ফেলিতে সঙ্কুচিত হন। তাহাতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিতে (Aesthetic sense) আঘাত লাগে। কিন্তু নায়কের সম্বন্ধে—তাহাকে যতই মহৎভাবে দেখান, তাহাকে নানারূপ পাপ ও পতনের মধ্যে ফেলিয়া,—তাহা না হইলে যেন তাহার জীবনের পূর্ণতালাভ হইতেই পারিত না,—এইরূপ ভাবে দেখানো হয়। ইহাতে তাহার জীবনটাও যে ঠিক সেই রূপই মলিন হইয়া সৌন্দর্য্যানুভূতিতে আঘাত দিতে পারে, তাহা তাঁহাদের একদেশদর্শী বিকৃত রুচি বুঝিতে দেয় না! কোন কোন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি আপনাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াও মহৎ হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই, পাপপঙ্কে নিমগ্ন হওয়া একটা মহত্ত্ব-লাভের উপায় হইতে পারে না। তাঁহারা তাহা সত্ত্বেও মহৎ হইতে পারিয়াছেন, তাহার জন্য নহে। আর তাঁহাদের মহত্ত্বের মধ্যেও সব-দিক যে সমানভাবে পূর্ণ ও মহৎ ছিল না, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। এমন কি তাঁহারাও অনেক সময়েই পূর্ব্বজীবনের কাদার ছাপ শরীর ও মন হইতে কখনই সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারেন নাই। আর প্রত্যেককে প্রত্যেক বিষয়ে আপনার শরীর-মন দিয়া সব পরীক্ষা করিয়া করিয়া লওয়াই যদি অভিজ্ঞতা ও পূর্ণতা-লাভের একমাত্র পথ হয়, তাহা হইলে ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি কিছুরই কোন আবশ্যকতা থাকে না। মনীষীদের জ্ঞান সঞ্চয় ও লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যই ত এই যে, তাঁহাদের ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে। ভবিষ্যৎ নর-নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রেই তাহা পাইয়া আপনাদের জীবন অনেক অযথা দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে ক্ষয় ও নষ্ট না করিয়া

পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার অধিকতর সুযোগ লাভ করিতে পারে। বাস্তবিক পুরুষ, নারী—সকলের ক্ষেত্রেই জীবনের এক সময়, এক অবস্থা দুইবার আসিতে পারে না। যিনি যত বড় কবি বা সাহিত্য-রসিক ইত্যাদি হউন না কেন, তাঁহার তৃতীয়, চতুর্থ প্রণয় কখনই প্রথম হইতে পারে না। ইহা অঙ্কশাস্ত্রেও যেমন, জীবনেও তেমনি সত্য।

নারীজাতির মনুষ্যত্ব-লাভের কথা হইলেই এ বিষয়গুলি মনে না আসিয়া থাকিতে পারে না। কারণ পুরুষ স্বামী-হিসাবে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দাবী ও অধিকারের যে অবমাননা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে লাভ করা আবশ্যক। এদিকে আবার পুরুষের দুষ্প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইবার জন্যও যাহাদের নরককুণ্ডে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদেরও উদ্ধার হওয়া দরকার। দুইটীই পরস্পর-সাপেক্ষ, একটী ছাড়িয়া অপরটী হইতে পারে না। বাস্তবিক নারীদিগের মনুষ্যত্ব স্বীকৃত হইলেই তাঁহাদের স্বামীর প্রতি সমান দাবী, অধিকার এ বিষয়ে দিতেই হইবে। আবার তাঁহাদের কেবল দুষ্প্রবৃত্তির খোরাক যোগাইবার জন্য ক্রীতদাসী করিয়া রাখাও চলিবে না। অর্থাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলেই মার্কা-মারা না করিয়া মনুষ্যজীবনের উপযুক্তভাবে রুচি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য-অনুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহ ও জীবন-যাপন করিবার সুযোগ, সুবিধা তাঁহাদেরও ঠিক সমানভাবেই দিতে হইবে; এবং এই ব্যাপার লইয়া মনুষ্য-সমাজের স্কন্ধে নারীর অপমানের উপর প্রতিষ্ঠিত বিষম স্বকৃত পাপের বোঝা লইয়া যে বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। নতুবা নারীর শিক্ষা বা স্বাধীনতার কোন অর্থই দেখিতে পাওয়া যায় না।

বঙ্গনারী।

শেরী

সুন্দরী সে নামটি 'শেরী', বেদুইনের মেয়ে
রূপের কমল উঠলো যেন আগুন থেকে নেয়ে।
চাঁদ-কপালে থাক্ দিয়ে ওই উড়ছে কাল চুল,
গোলাপবাগে চরতে এলো, কোকিল করে ভুল।
খলিফাদের ছাউনি চেয়ে চাউনী তাহার দামী,
'জুনো'র ছবি প্রাণ পেয়ে আজ আস্‌লো যেন নামি'।
স্বাধীন সরল দস্যুবালা ফণির মাথায় মণি
ভাগ্য কাহার করবে উজল, যাপছে দিবস গণি'।

যুবক 'ইরাক' দস্যুনেতা উটের পিঠে ঘর,
দিল-দরিয়া দেমাক ভরা, নাইক বুকে ডর।
গভীর রাতে মরুর সাগর একলা সে দেয় পাড়ি,
দৌড়ে তাহার উট্‌পাখীরা লজ্জাতে যায় হারি'।
ভোর বেলাতে উষ্ট্র চেপে চলছে কত লোক,
হঠাৎ তাহার ঠেক্‌লো আজি 'শেরী'র চোখে চোখ।
চম্‌কে যেমন তাহার পানে চাইলে যুবা ফিরে,
জয়-পত্র লট্‌কালে প্রেম আর্‌বী ঘোড়ার শিরে।
জ্যোচ্ছনাতে সেই পথেতে ইরাক ফেরে রোজ,
সেই দুটী চোখ্‌ কোথায় গেল পায়না তাদের খোঁজ,
চক্ষু সেকি ?—একটা গোটা স্নিগ্ধ মরুস্থান,
গোলাপ ফোটে, হরিণ চরে, কপোত করে স্নান !
আন্‌মনা সে বেড়ায় ঘুরে, নাইক কোন কাজ,
শালের খুঁটা সারঙ হ'ল চোখের ঘায়ে আজ।
দিবস নিশি কোন্‌ রাগিণীর অন্বেষণে চলে,
দীপক যে যায় বেহাগ হয়ে নয়ন-জলে গলে'।
কোথায় 'শেরী' কোন্‌ সুদূরে বিরাট মরুর কোণে,
ইরাকের সে প্রণয়-গীতের রেশটি বুঝি শোনে।
মরুর শেরী, আজ দেওয়ানা, জোচ্ছনারি রাতে—
নিদ্রা তাহার আর আসে না ডাগর আঁখি-পাতে।
সান্দ্র মরু চন্দ্রালোকে কালো মেঘের ছায়া,
ঘনায়ে তার বক্ষে আনে অচেনা কোন্‌ মায়া,
ব্যাকুল হয়ে উধাও সেযে মেঘের পিছে ধায়—
উষ্ট্র চেপে গান গেয়ে তার বুকের বঁধু যায়।
পাঁচটি গোটা ইদ্‌ মহরম্‌ আস্‌লো গেল ফিরে,
হঠাৎ দেখা দুই জনাতে 'ইউফ্রেতিসে'র তীরে।
কাটাকাটি চল্‌ছে ভীষণ দুই বেদুইন দলে,
লুটায় কত মুমূর্ষু প্রাণ পাণ্ডু ধরাতলে।
উষ্ট্র চ'ড়ে আহ্লাদেতে আস্‌ছে কে সর্দ্দার
জিৎ যে আজি তাহার দলের অন্য দলের হার।
এনেছে হায় বন্দী ক'রে পাগলী না এক হুরী,
মরু তাহার ঠাঁই নহেক হারেম তাহার পুরী।

কর্‌লে হাজির গৌরবেতে সর্দ্দারেরি কাছে—
সুর্ম্মা-আঁকা সেই সে আঁখি আজ্‌কেও যে আছে!
শত্রু হাতে পড়ার ভয়ে বিষ করেছে পান,
অলস আঁখি জানিয়ে দিলে মিলন অবসান!
শুষ্ক কঠিন 'কারবালা'রি শোকের ভূমে আসি'
পিপাসু হায় বক্ষ অধর রইলো উপবাসী।
ইরাক পিয়ে সেই নয়নের নূতন ঢালা বিষ,
আজও মরুর ঝড়ের মত ফির্‌ছে অহর্নিশ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

(৪)

তিনটে পথতো ঘুরে আসা গেল। পথশ্রমই সার হলো—আসল গম্যস্থানের নিশানা মিলল না।

প্রথমটা সহযোগের পথ! এই পথের পথিকেরা যাঁদের সহযোগী, তাঁরা সত্য সত্যই কিছু আর যোগী নন; নিষ্কামভাবে ভারত-বর্ষীয়দের স্বারাজ্য-সিদ্ধির সাধনা করতেই এই পুণ্যভূমিতে শুভাগমন করেন নি। তাঁদের আসল সাধনা নিজেদের অষ্টৈশ্বর্য্য সিদ্ধি। তাঁদের সহযোগীদেরও এই সাধনারই উত্তর সাধকতা কর্‌তে হবে—জ্ঞাত-সারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক। তাঁরা যদি মনে ঠিক দিয়ে বসে থাকেন যে, দোহারকি (Diarchy) দ্বারা কালক্রমে অধিকারী মশায়ের পদলাভ করবেন, তাহলে তাঁদের সাধের মানব-জন্ম দোহারকি করেই কাটাতে হবে। আমাদের সদা-সপ্রতিভ অধিকারী মশায় এ আসরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা গাইতে এসে বীর হনুমানের নামটা ভুলে বসবেন এবং দায়ে পড়ে "আজ হতে হোলো ভাগ সমান সমান" এই ধূয়া ধরবেন, সে আশা বিন্দুমাত্র নাই। অধিকারী-মশায়কে মহাবীরজির নাম ভুলিয়ে দেওয়ার দাওয়াই যে কিছু নাই, এমন নয়, তবে সেটা, আর যাই হোক, সহযোগিতা নয়। "ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশো জনঃ" শ্লোকটা উদ্ভট হ'লেও কথাটা উদ্ভট নয়। কিন্তু ওটা সত্য, জন বা মানুষের বেলায়,—অমানুষ বা কলের পুতুলের বেলায় নয়। তা নইলে এ বিজ্ঞতাটুকু তাঁরা অনায়াসে লাভ করতে পারতেন—তাঁরা যে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে, "তোমার চরণে আমারি পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি, সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী"

এই কীর্ত্তনের তুক্ক গেয়ে বেড়াচ্ছেন, বরাবর যদি ঠিক সেই ভাবেই চলতেন তাহলে তাঁদের অতি সাধের ডায়ার্কির দিল্লীর লাড্ডু-লাভটাও অদৃষ্টে ঘটত না।

সাবেক কালের কংগ্রেসের লক্ষ্য যদিও ছিল সহযোগিতা, কিন্তু সেটা ছিল প্রতিকূল সহ-যোগিতা। সেকালে কংগ্রেসের সাম্বৎসরিক কোরাস গানটা যদিও আসলে ভিক্ষার গান কিন্তু তার সুরটা ঠিক ব্যুরোক্রেসীর শাসন-চক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনির সঙ্গে মিল করেই রচিত হয়নি। কোরাস গানের পাকা সমজদার ইংরেজ গানটাকে তেমন ভয় করেনি, যেমন করেছিল কোরাসটাকে। সেইজন্য কোরাসটা ভেঙ্গে দেবার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে বিধিমত চেষ্টা করেছিল। কোরাসটা বাঁধা থাকলে সুরটা ও গানটা বদলাতে বেশীদিন লাগে না, ইংরেজ তা বেশ ভালই জানে। সুরটাও ক্রমশঃ দীপক রাগিণীর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই ইংরেজ বুঝলেন, গাইয়েদের রসনাগুলিকে ব্যাপৃত রাখার জন্য এমন একটা জিনিষের সৃষ্টি করা দরকার, যা চিবিয়ে গলাধঃকরণ করে হজম করার যো নাই অথচ বাইরে থেকে চেটে চুটে একটু আধটু রস পাওয়া যেতে পারে। কাজেই বহু গবেষণা খরচ করে এই ডায়ার্কি জিনিষটার সৃষ্টি হলো। কেবল কংগ্রেসের কোরাস গান নয়, স্বদেশী হাঙ্গামার সময়ের "রসগোল্লা"রও বোধ হয় এই—বদান্যতার ব্যাপারে একটু হাত আছে।

যাই হোক সহযোগীরা খোষ-মেজাজে বাহাল তবিয়তে দিল্লীর লাড্ডু চাটতে থাকুন। অসহযোগ-আন্দোলন আর কিছুদিন চললে, আরও কিছু কিছু রসাল জিনিষ তাঁদের অদৃষ্টে আছে—এ কথা নিশ্চয়। কিন্তু তাঁরা যেন স্বপ্নেও মনে না করেন—এ সব তাঁদের বৈধ আন্দোলনের (constitutional agitation) ফল। গাঁটছড়া বাঁধার পর হতে তাঁদের constitutional agitation রীতিমত দাম্পত্য-কলহের সামিলই হয়ে পড়েছে। আবদার রক্ষা না হলে তাঁরা যখন ঘর-সংসার ফেলে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভয় দেখান, ইংরাজ পাকা গৃহিণীর মতো মুখে ভাবনার ভাব দেখালেও মনের মধ্যে মুখ টিপে টিপে হাসেন। বেশ জানেন, পোষ-মানা প্রাণীটি যথাসময়ে সুড়সুড় করে ফিরে এসে অভ্যস্ত বোঝাটি ঘাড় পেতে নেবেন। পাঞ্জাব বিভ্রাটের রেজোলিউসনটি লাটসাহেব নাকোচ করে দেওয়ার পর শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মশায় এইরূপ সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প করেছিলেন। পরে কি হলো সে কথা সকলেই জানেন। এই তো গেল সহযোগের পথের কথা।

দ্বিতীয়টা হলো উৎপাতের পথ। সমস্ত দেশের লোককে হাত পা চোখ বেঁধে টেনে হিঁচড়ে ভয় দেখিয়ে স্বরাজ-ধামে উত্তীর্ণ করে দেওয়া, এই পথের পথিকদের লক্ষ্য! এটা যে স্বাধীনতা লাভের পথ নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয়টা হলো মহাজনের পথ অর্থাৎ যুদ্ধের পথ। কিন্তু এ পথ আমাদের পথ নয়। আমাদের ঢালও নাই খাঁড়াও নাই, সুতরাং সর্দ্দারীর আশাটা পোষণ করা—সখের দুঃখ ডেকে আনা মাত্র। আর যদি কোনও গতিকে ঢাল খাড়া জুটেই যায়, তাহ'লে আমরা ক খ শিখতে না শিখতে যারা

এখন যুদ্ধবিদ্যায় সার্ব্বভৌম পণ্ডিত, তারা আরো এতদূর এগিয়ে যাবে যে, তাদের নাগাল পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে, নিছক দৈব কৃপা ভিন্ন। আর দৈব যদি অত সদয়ই হন, তাহলে যুদ্ধের জন্য ছেলেমানুষী চেষ্টার ছটফটানি ছেড়ে আরামে নিদ্রা দেওয়াই প্রশস্ত। তাতে নিদ্রার সুখ ও স্বাধীনতা লাভের সুখ—দুই সুখই লাভ হবে। তাছাড়া আরো একটা ভাবনার কথা আছে। যাকে পথের সঙ্গী করবে, সে তোমার চিরদিনের ঘরের সঙ্গীও হয়ে উঠবে, এইটেই সাধারণ নিয়ম। End justifies means থিওরিটার বিপদই ঐখানে। যে অন্যায়কে তুমি উপায় বলে বরণ করবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও সে তোমার সঙ্গে-সঙ্গেই লেগে রইবে। এই বরণ করা মানেই ন্যায়ান্যায়ের পার্থক্য বোধের তীব্রতাকে কতকটা ভোঁতা করে ফেলা। যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ হলে সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই আবার যুদ্ধের কায়েমী আয়োজন করে রাখা দরকার হয়ে পড়ে। কেবল আয়োজন মাত্র নয়—আর কে কি করছে তার গুপ্ত সন্ধান রেখে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয়োজন! তার পরে আবার অস্ত্র-শস্ত্রগুলোতে মরচে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে মাঝে মাঝে সেগুলির একটু আধটু ব্যবহারের বন্দোবস্ত করাও দরকার হয়ে পড়ে। রইলো আর সব কাজ শিকেয় তোলা, কেমন করে দেশটা রক্ষে হবে সেই ভাবনাটাই ভূতের মতো পেয়ে বসল! অথচ যা সব থাকলে দেশটা রক্ষা করার যোগ্য হয়ে ওঠে—সে দিকে বিশেষ আর নজর রইল না। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এ ছবিটা একেবারেই অতিরঞ্জিত নয়। অন্যে পরে কা কথা, স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকাও যেরূপ প্রচণ্ড উদ্যমে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুতের কাজে লেগে গেছে, তাতে যুদ্ধ জিনিষটাকে আর কোনও রকমে একটুও প্রশ্রয় দেওয়া মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কারণ বলে মনে করতে পারিনে।

তিনটে পথই তো নাকোচ করে দেওয়া গেল, এখন উপায়! তবে কি চিরদিনই এম্‌নি চলবে?

দীন প্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ ভার;
এই চির পেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার,
মনুষ্য-মর্য্যাদা গর্ব্ব চিরপরিহার!

এ তো হ'তেই পারে। কেন হতে পারে না, জিজ্ঞাসা করলে আমার একমাত্র সোজা উত্তর এই—আমার বিশ্বাস তাই। আমার এই বিশ্বাসের কারণ কি—মূল কোথায়—ভিত্তি কোন্‌খানে? সব জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন, সব অনুমান সিদ্ধান্ত উপপত্তি যার উপরে ভর্‌ করে দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে, অর্থাৎ বিশ্বাসে। আমার বিশ্বাস

ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত-কালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্ম্মধামে। দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতি-পথে বাধা
আচারে-বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।

সমস্ত তিমির
ভেদ করি দেখিতে হইবে ঊর্দ্ধশির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে।
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে
"ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত।"

এত দুঃখ দৈন্য দুর্গতি অপমান অবসাদ লজ্জার মধ্যে সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে কুব্জপৃষ্ঠ নতশিরের অন্তরের মধ্যে এ বিশ্বাস এখনো অটুট আছে—কিসের জোরে?

'তব চরণের আশা ওগো মহারাজ
ছাড়ি নাই। এত যে হীনতা এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা। তোমার বিধান
কেমনে কি ইন্দ্রজাল করে যে নির্ম্মাণ
সঙ্গোপনে সবার নয়ন অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দ্দিষ্টকালে
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে
চির প্রতীক্ষিত চির সম্ভবের বেশে।
আজ তুমি অন্তর্য্যামী এ লজ্জিত দেশে
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে,
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ
আমি ছাড়ি নাই আশা ওগো মহারাজ।

এই যে আশা, এ যদি স্বদেশ-প্রেমিক কবির প্রবল গভীর দেশানুরাগের মিথ্যা আশ্বাস মাত্র হয়? তেমন তো হতে পারে। কিন্তু কবির ভাব-প্রবণ অন্তরই এর একমাত্র সাক্ষী নয়, বাইরেও প্রচুর এবং প্রবল প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাও এই উদার আশা বুকে ক'রে কোন্ সুদূর অতীত হতে যাত্রা ক'রে নানা ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এক মহাপরিণাম এক বিপুল চরিতার্থতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। "অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের এক একটী অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপ মাত্র নহে—ইহারা পরস্পর গ্রথিত—ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে নাই, ইহারা সকলেই রহিয়াছে। ইহারা সন্ধিতেই হউক সংগ্রামেই হউক ঘাত-প্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব্ব বিচিত্র রূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোনও দেশেই এত বড় বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই—এত জাতি, এত শক্তি,এত ধর্ম্ম, কোনও তীর্থস্থানেই একত্র হয় নাই, একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। আর সর্ব্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক—ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে ব্রহ্মকে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্ম্মশালার কঠোর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্ম্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক্—ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে।" আজ সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ দ্বন্দ্ব বিরোধ বিদ্বেষের বিষে জর্জ্জর হয়ে যে পরম শান্তি-সুধার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সেই অমৃত ভারতের তপোবনের উদার বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ভারতবর্ষ আপনার অজ্ঞাতসারে সেই অমৃত-ধারা

আপনার গোপন প্রাণের গভীরতার মধ্যে ফল্গুধারার মতো বহন করে চলেছে। সে ধারা যে আজও শুকায়নি লোপ পায়নি তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। সেই তপোবনের অমৃত বাণীই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবসঙ্গীত-সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তিতে এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে কর্ম্মমঙ্গল-প্রেমময়ী মূর্ত্তিতে আপনাকে অভিব্যক্ত ক'রে তুলেছে। রবীন্দ্র নাথ ও গান্ধীর উদ্ভব অন্ধ নিয়তির আকস্মিক খেলামাত্র নয়। কোটি কোটি মানুষ যেমন আপনাদের ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সুখ-দুঃখের চৌহদ্দির মধ্যে আপনাদের ক্ষণিক খেলা খেলে ঝরে পড়ে, এঁরা সেরূপ ব্যক্তি মাত্র নন। ভারতের সমস্ত অতীত সাধনা শিক্ষা তপস্যা মানুষের সুদূর ভবিষ্যতের আহ্বানে এঁদের মধ্যে মূর্ত্তি ধরে উঠেছে। যে জাতির মধ্যে এমন অলোক-সাধারণ অনুভূতির আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে, সে জাতি বাইরে যতই জীর্ণ অবসন্ন মৃতপ্রায় হোক না কেন, তার গভীর প্রাণের নিভৃত স্তরে এমন এক চির-জীবনের নির্ঝর এখনো বিদ্যমান আছে—যারা শক্তি-দম্ভের তীব্র মদিরার উচ্ছল ফেন-রাশিকে জীবনের লীলা বলে ভুল করে, তাদের মধ্যে সেই অমরত্বের অক্ষয় পাথেয় নাই।

যুগযুগান্তর ধরে এক পরম লক্ষ্য অনুসরণ ক'রে যে বিপুল আয়োজন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে সেতো আর বালিকার উদ্দেশ্যহীন খেলাঘর মাত্র নয়। সুতরাং যুগ-যুগান্তের মহাবিধানকে সার্থক করার জন্য এ জাতিকে আবার জাগতেই হবে।

এ আশা যদি অন্ধ স্বদেশ-প্রেমের ছলনা মাত্র হয়, এ জাতি যদি নবীন প্রাণের গৌরবে আবার মহিমান্বিত হয়ে উঠতে না পাবে, তাহলে আলো-বায়ু-রহিত সঙ্কীর্ণ কারা-প্রাচীর-বদ্ধ জীর্ণ মৃতপ্রায় ত্রিশ কোটি লোকের লাঞ্ছিত অপমানিত ধিক্কৃত জীবনের ঘন সন্নিবেশ হতে যে ভীষণ আধ্যাত্মিক মড়কের বিষের সৃষ্টি হবে, তার প্রভাবে সমস্ত মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন যে সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মানুষ আপনার ক্ষণিক শক্তি-দম্ভের মোহে আপনাকে যতই স্বতন্ত্র মনে করুক না কেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর নাড়ীর যোগ ছাড়িয়ে যাওয়া কারো সাধ্যায়ত্ত নয়। মানব-সভ্যতার এই দারুণ পরিণাম আমি কল্পনাও করতে পারিনে, বিশ্বাস করাতো দূরের কথা।

কিন্তু আশা যতই বলবতী মহতী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হোকনা কেন, সেটাকে বুকে পুষে ঘুমানো আশাটা পূরণ করার প্রকৃষ্ট উপায় নয়। "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।" ঘুমন্ত সিংহেরই যখন এই দুর্দ্দশা ঘুমন্ত শশকের দশা যে কিরূপ হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। ইতিহাসের নির্দ্দেশ ও বিধাতার বিধান যতই সুস্পষ্ট হোকনা কেন, তা আকাশ-কুসুমের ফলের মতো শূন্য হাওয়ায় আপনা আপনি ফলে উঠবেনা। সে সকর্ণ হয়ে উঠবে আমাদের মধ্যেই এবং আমাদের দিয়েই। সুতরাং আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে তুলে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সফলতার সদুপায়টীকে অবলম্বন ক'রে এগোতে হবে।

অনায়াসেই তো সদুপায় কথাটা ব্যবহার ক'রে বস্‌লেম, কিন্তু কোন্ উপায়টা যে সদুপায়

সেইটে ঠিক করাই মুস্কিল। যাহোক একটু চেষ্টা করে দেখা যাক্। উপায়টি যথার্থ সদুপায় কিনা সেটা ঠিক করতে হলে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটাকে ভাল করে বুঝে দেখা দরকার। পূর্ব্বে যেরূপ আভাস দিয়েছি, তাতে এবিষয়ে পাঠকদের কতকটা ধারণা নিশ্চয়ই জন্মেছে, তবুও আর একটু খুলে বলা মন্দ নয়। আমাদের আসল উদ্দেশ্য দু'টী। প্রথম, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বিধাতার যে পরম নির্দ্দেশ বহন করে আসছে তাকে সার্থক করে তোলা —অর্থাৎ অতিপ্রাচীন কাল হতে এ-পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে নানা উপলক্ষে নানা উদ্দেশ্যে নানা ঘটনায় যে বহুবিধ জাতি-ধর্ম্ম সভ্যতার একত্র সমাবেশ হয়েছে তাদের এক গভীর ঐক্য বন্ধনে বেঁধে মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলা। দ্বিতীয়,—ভারতের প্রাচীন তপোবনের যে শিক্ষা দীক্ষা তপস্যা এখনো আমাদের এই দেশব্যাপী বিস্তীর্ণ বালুকা-রাশির তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে যাচ্ছে তাকে ভাগীরথীর উদার ধারার মতো "স্বার্থদৃপ্ত লুব্ধ সভ্যতার" বিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জর মানব-সমাজের উপর বইয়ে দেওয়া। কিন্তু এই দুটী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের মনে প্রাণে চিন্তায় কর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া অত্যাবশ্যক। আমাদের চূড়ান্ত সম্ভাবনাকে আমাদের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজ, কংস-জরাসন্ধ অথবা যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র যাই হোক্না কেন, একথা নিশ্চিত, তাঁর আওতায় আমরা পলে পলে শীর্ণ হয়ে উঠছি। সুতরাং আমাদের তৃতীয় ও আপাততঃ মুখ্য উদ্দেশ্য এই আওতা দূর করা—অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ।

কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ স্বরাজ লাভ করলে চলবে না। আমাদের এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতি-সঙ্গত। আমি পূর্ব্বে বলেছি, উপায়টা ক্ষণিক পথের সঙ্গীমাত্র নয়। তার ছাপ চিরদিনের মতো মনের গায়ে লেগে থাকে। স্বরাজ যদি আমাদের আসল উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিঘ্ন হয়, মানব-জীবনের চরম চরিতার্থতা লাভের প্রতিকূলতা করে, তাহলে আমার নিকট সে স্বরাজের মূল্য কাণাকড়িও নয়। "রাজ্যে'র লোভে 'স্ব'কে খুইয়ে বসার জন্য আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নাই। সুতরাং পথটা একটু ভালরকম যাচাই করে বেছে নিতে হবে।

কোন্‌টী যে পথ সে বিষয়ে পরে বলবো—কোন্‌টা যে পথ নয় সে কথাটা আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া মন্দ নয়। আমাদের যুগযুগান্তের সংস্কার-বশে এই পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে এত রকমের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যে, পুনরুক্তি দোষ স্বীকার করেও এ কাজ অনায়াসে করতে পারা যায়। তবে কোনও পাঠকেরই যে ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না, এ কথা শপথ করেই বলতে পারি; কারণ এবারে যে কথাগুলি বলবো সেগুলি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।

(১) বৈধ আন্দোলন বা Constitutional agitation এর পথ। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেন—

(ক) মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে ইংরাজ জন্মান্তরের সুকৃতি ও জন্ম-কালের শুভগ্রহ স্বরূপ আমাদের কর্ম্মহীন জোড়কর-পুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে।

(খ) শুধু কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে কারো নাই নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নতশির। ইত্যাদি।

(গ) যাঁহারা পিটিশন বা প্রটেষ্ট, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ীর বাঁধা রাস্তাটীতেই ঘনঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে দলের লোক নই।

আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা দেশহিতব্রতীদের নায়কতা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা রাজ-পথের শুষ্ক বালুকায় অশ্রু ও ঘর্ম্ম-সেচন করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(ঘ) কেহ যদি দরখাস্ত কাগজের নৌকা বানাইয়া সাত সমুদ্র পারে সাত রাজার ধন-মাণিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারো কারো কাছে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না।

(ঙ) বাঁধ বাঁধা কঠিন বলিয়া সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা—কনষ্টিটিউসন্থাল অ্যাজিটেশন নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ বটে—কিন্তু সহজ উপায় নহে।

আর বেশী উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। যা তোলা গেল তাতেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন মডারেট মশায়রা যে পথ ছাড়া "নান্ত্যেব নান্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্যথা" মনে করেন, সেটাকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেন।

২। উপদ্রবের পথ :—

(ক) প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া তাহা সঙ্ক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না কাজও নষ্ট হইবে।

(খ) বিধাতার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়—তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্য্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

(গ) অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্ম্ম-সাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি, তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যাইবে। ন্যায়-ধর্ম্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে—কর্ম্মের স্থিরতা থাকে না—তখন বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম ব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট-জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

(ঘ) প্রশস্ত ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা—তাহাই মানুষের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা ; মানবের মনুষ্য-ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস।

যে কটী অংশ তোলা গেল তাতেই থেকে পাঠকেরা উৎপাতের পথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনের ভাব কিরূপ, তা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। যুদ্ধের পথ সম্বন্ধে তিনি স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলেননি—বোধ হয় কিছুমাত্র আবশ্যক মনে করেননি। কারণ, ইংরেজের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের কল্পনা—কল্পনারও নিছক বাজে খরচ। তাছাড়া আমি রবীন্দ্রনাথকে যেরূপ বুঝেছি

—তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই যে তিনি যুদ্ধকেও উৎপাতের সামিল বলেই মনে করেন —যদিও সভ্য সমাজ এই উৎপাৎটার ধোবা-নাপিত এখনো বন্ধ করেননি। কিন্তু যুদ্ধের পথ দিয়ে স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে তিনি স্বতন্ত্র-ভাবে কিছু না বললেও তাঁর মনের ভাব অগোচর থাকেনি। "এই প্রকারে—অত্যন্ত চিত্ত-বিক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে সকল অধীন দেশ, স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর কোনও গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট ভাবিতেই চাহি না।"

স্বরাজ লাভের অপথ ও বিপথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি মত দেখা গেল—সুপথ সম্বন্ধেই বা তিনি কি বলেন, দেখা যাক্।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতের প্রাচীন তপোবনের যে সনাতন ঋষিটী এখনো বসে তপস্যা করছেন তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে অনায়াসে বলে ফেললেন—একমাত্র সুপথ তপস্যা। রবীন্দ্রনাথের গোত্র-প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য ঋষিও বোধ হয় রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে এত অবলীলাক্রমে "তপস্যা" কথাটা উচ্চারণ করতে পারতেন না। অথচ রবীন্দ্রনাথ আজকের পৃথিবীতে নবীনদের-মধ্যে নবীনতম। তাঁর অন্তরের মধ্যে নিত্য নবীনতার যে চিরন্তন নির্ঝর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মানুষের অদৃষ্টে তা কদাচিৎ ঘটে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে এবং তপস্যার ফলকে এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করিয়া দেয়। ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়।"

রবীন্দ্রনাথ যাকে তপস্যা বলেছেন চৌদ্দ বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধী ঠিক সেই পদ্ধতিকেই Soul purification বলে বর্ণনা করেছেন। আর শান্তি ও সংযম অর্থাৎ non-violenceএর ভিতরের তত্ত্বটী রবীন্দ্রনাথ যেমন সুন্দর ও বিশদভাবে বুঝিয়েছেন—তেমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" রবীন্দ্রনাথের শান্তি ও সংযমের কথায় দেশের লোক তাঁর উপর কিরূপ অশান্ত ও অসংযত ব্যবহার করেছিল তা অনেকেই জানেন। সুখের বিষয়, চৌদ্দ বৎসরে মানুষের মনোভাবের অনেক উন্নতি হয়েছে—তারা এখন মহাত্মা গান্ধীর non-violenceএর উপদেশ খুব সাদরেই গ্রহণ করেছে। খুব সম্ভব ধ্যানযোগী রবীন্দ্রনাথের ধ্যানলব্ধ সত্য সাধারণের উপলব্ধি-যোগ্য হওয়ার জন্য কর্ম্মের মধ্যে তার মূর্ত্তি পরিগ্রহের অপেক্ষা ছিল। মহাত্মা গান্ধী সেই অভাব পূরণ করে দেওয়ায় এত সহজে তা লোকের হৃদয় অধিকার করতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ তপস্যাকে একমাত্র পথ বলে নির্দ্দেশ করেই ক্ষান্ত হননি—সেই তপস্যা কি প্রণালী ও পদ্ধতি অবলম্বন করবে সে সম্বন্ধেও সবিস্তারে উপদেশ দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর গোটাকতক উক্তি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

(ক) পদ্ধতি—"তাই বারম্বার বলিয়াছি

ও বারম্বার বলিব শক্রতা বুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া (১) ঐ পরের দিক হইতে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখটাকে ফিরাও (২) আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটীর উপর নামিয়া আসে, তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, (৩) নানা দিগভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্ব্ব প্রকারে বাঁধিয়া ফেল (৪) কর্ম্মক্ষেত্রকে সর্ব্বত্র বিস্তৃত কর—এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত কর যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। (৫) আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখনই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না—আমরা জয়ী হইবই—বাধার উপর উন্মাদের মত নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে—অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম করিয়া কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে, কার্য্যসিদ্ধির সত্য সাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মত সঞ্চিত করিয়া তুলিব—আমাদের উত্তর পুরুষদের শক্তি চালনার সমস্ত পথ একটী একটী করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ঐ যে বন্দীশালার লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে—দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে ইহাকেই অত্যন্ত বড় করিয়া জানিয়ো না। যদি কাণ পাতিয়া শোন, তবে কাণের মহাসঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

টীকা—সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত আমার করা—উদ্দেশ্য, বর্ত্তমান আন্দোলনের অঙ্গগুলির সঙ্গে তার কেমন চমৎকার মিল আছে তাই দেখানো।

(খ) শক্তির কেন্দ্র—"আমার মনে সংশয় মাত্র নাই আমরা বাহির হইতে যত বারম্বার আঘাত পাইয়াছি সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে ইহার নিকট আমাদের প্রার্থনা চলিবে। তখন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব তাহাকে কার্য্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বাণিজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করি, তবে আজ একটা বিঘ্ন, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্য যখন তখন তাড়াতাড়ি দুই-চারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টাউনহল মীটিং-এ দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না।

টীকা—রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান কালের কংগ্রেস অনেকটা পূরণ করেছে মনে হয়।

(গ) স্বদেশী—"আমরা সাধ্যমত বিলাতী পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিব—ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব, এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্ব্বে আমি লিখিয়াছিলাম—

"নিজ হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও হাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা-বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে।"

(ঘ) সরকারী উপাধি—"দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারের দত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল।"

টীকা – কংগ্রেসে উপাধি বর্জ্জনের মন্তব্য গৃহীত হবার বহুপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ কেমন অবহেলায় 'সার' উপাধিটাকে ছেঁড়া চটিজুতার মতো গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, সেটাও স্মরণীয়।

(ঙ) দেশনায়ক—"আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যতশক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে তাহা ঐক্যবদ্ধ—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকান বাজার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সর্ব্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব-আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে উহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা—তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।"

"দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদ-বিবাদ করা যায়—দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই।"

টীকা—রবীন্দ্রনাথের সমাজ-পতির আকাঙ্ক্ষা কেমন ভাবে মহাত্মা-গান্ধীর মধ্যে সফল হয়েছে সে কথা লেখা বাহুল্যমাত্র। সমস্ত দেশ তাঁকে দেশনায়ক বলে স্বভাবতই মেনে নিয়েছে। তবু এম্নি আমাদের দুর্ভাগ্য, যে সব অতিপণ্ডিত কেতাবী ডিমোক্রেশীর বাগ্বিতণ্ডাকে আসল কাজের চেয়ে বড় মনে করেন, তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব ক্ষুণ্ণ কবার জন্য দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ও মাসিক পত্রের বিবিধ প্রসঙ্গে নানাবিধ কলা-কৌশল বিস্তার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। জানি না, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও আপনাদের স্বাধীনতার বড়-সমজদার বলে মনে করেন কিনা।

(চ) অর্থাগম—"সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্প পরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তাছাড়া প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ মনে হয় না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না।

টীকা—কংগ্রেস এই উপায়টির প্রতি মনোযোগ দিলে বিশেষ উপকার হবে মনে হয়।

(ছ) পঞ্চায়েৎ—"ইংরেজের আইন আমাদের সমাজ রক্ষার ভার লইয়াছে।··· পূর্ব্বকালে সমাজ-বিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা অনুসারে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত।

"যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিশম্যান ডাকিতে হয়—সেদিন আর পরিবার রক্ষার চেষ্টা কেন? সেদিন বনবাসই শ্রেয়।"

(জ) কংগ্রেসের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন—"যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে তখন দেশের কর্ম্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ শুধু নির্ব্বাচনের নহে, কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্‌সের কার্য্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।"

টীকা—এতদিন পরে কংগ্রেস এই সত্য উপলব্ধি করেছেন।

* (ঝ) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা—"যে রাজপ্রসাদ আমরা এতদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা যেন আমরা সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের সীমা যেখানে সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তি লাভ ব্যতীত লাভ নাই, এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে এক দেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্ম্মহানি এবং ধর্ম্মহানি হইলে কখনই স্বার্থরক্ষা হয় না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টায় মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।"

(ঞ) মাতৃভাষা—"ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর" ইহাতে আমাদের নানাকাজে যে কিরূপ অসঙ্গতি ঘটিতেছে, প্রতি প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্‌স্ তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ কনফারেন্‌স্ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত অথচ ইহার ভাষা বিদেশী।"

টীকা—ঠিক এই মনোভাব হতেই মহাত্মা-গান্ধী হিন্দীকে নিখিল ভারতের সম্মিলনের ভাষারূপে পরিণত করার জন্য এতটা ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

সার-সঙ্কলন—রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে এত লিখেছেন যে তার মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ অংশগুলি বেছে নিলেও একখানি স্বতন্ত্র বই হয়ে পড়ে। আমি আর একটী মাত্র অংশ উদ্ধৃত করবো—আমাদের কর্ত্তব্যের ধারা তাতে যেমন সুন্দর ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট হয়েছে, এমন আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

"অতএব এদেশের যে ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারা (ব্রিটীশ) ঐশ্বর্য্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন, সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা তো আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে—তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উগ্রবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্ম্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব—কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না—দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যা-শিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব;—

ইহা করিতে গেলে ঘরে, পরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না। সে জন্য অপরাজিত চিত্তে প্রস্তুত হইব—কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে; তাহা সংযমীর দ্বারা যোগীর দ্বারা সাধ্য।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে যে সব অংশ তোলা গেল, তাথেকে কারো বুঝতে বাকী থাকবে না, আজকের এই ভারতব্যাপী আন্দোলনের মর্ম্মগত সত্য ও তার সাধন-পদ্ধতি তাঁর মানস চক্ষের সম্মুখে আবিভূর্ত হয়েছিল। কেবল মাত্র প্রবন্ধে নয় কাব্য নাটক ও উপন্যাসেও এই কথার প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায়শ্চিত্তের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র যেন ভবিষ্য-গান্ধী চরিত্রেরই পূর্ব্বচর। নিখিলেশের চরিত্রে ধর্ম্মবেদনা, স্বাধীনতা-বোধ বিশেষতঃ non-violence এর যে মহত্তম আদর্শ ফুটে উঠেছে,—তা যেন কোনও সুদূর ভবিষ্য যুগের মহাসভ্যতার পৃষ্ঠা হতে উড়ে এসে পড়েছে। আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনের নেতারা ঐ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেশের পরম উপকারে লাগবে। ঋষি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে যে সত্য ভাবরূপে আভিভূর্ত হয়েছিল, মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে তাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। এইরূপই হয়ে থাকে। আর্য্যঋষিরা যে অহিংসা ধর্ম্মকে ভাবরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই শাক্য সিংহের মধ্যে প্রাণের বাস্তবতা লাভ করেছিল। অদ্বৈতাচার্য্যের বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ ই শ্রীচৈতন্যে রূপ ধারণ করেছিল।

একটা কথা উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সহযোগিতা-বর্জ্জনের কথা তেমন করে বলেন নি। একেবারে যে বলেন নি তা নয়। তিনি গবর্ণমেণ্টের দিক হতে মুখ ফেরাবার কথা নানাস্থানেই বলেছেন—ভ্রূকুটি-কুটিল ও ভিক্ষা-করুণ দুইরূপ মুখই। রাগের সহযোগিতা-বর্জ্জন নয়, সত্যকার সহযোগিতা-বর্জ্জনের মূলতত্ত্ব তিনি যেমন উপলব্ধি করেছেন এমন আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। এই দেখুন। "আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়াই লইতে হইবে। যে কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে।" তবে এ কথা অবশ্য খুবই সত্য, 'না'র চেয়ে 'হাঁ'র দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। তাঁর অন্তর-প্রকৃতির গঠনই সেইরূপ। কিন্তু যেখানে 'না' বলা অপরিহার্য্য, সেখানে তাঁর চেয়ে জোরের সঙ্গে যে কেউ বলতে পারেন মনে হয় না। পাঞ্জাব উপদ্রবের সময় সে কথা ভালরূপেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ননকোঅপারেটর। অন্যায় ও অধর্ম্মের সঙ্গে কোনরূপ সংশ্রব রাখাই তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

'মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর! সেথায় যে পদক্ষেপ করে
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে
হোকনা সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই—দেবদ্রোহী বলে
সর্ব্বশক্তি লয়ে মোর!"
"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

এর পর কারো বোধ হয় বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারেনা যে, অন্যায়-কারী গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্রব রাখতে তিনি কাউকে উপদেশ দিতে পারেন না। তবে এই সংশ্রব-বর্জ্জন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে হয়, এই তাঁর মত। ওটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অসঙ্গত ও লজ্জাজনক। তাতে বিদ্বেষের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। বিদ্বেষ Non-violence এর একান্ত বিরোধী। সুতরাং এক্ষেত্রেও মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁর কোনও রূপ প্রকৃত মতদ্বৈধ আছে বলে মনে হয় না। একটী কথা মনে রাখা বিশেষ দরকার। মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জন চিরন্তন 'না' মাত্র নয়। সেটী যে খাঁটী 'হাঁ' বা প্রকৃত সহযোগিতা লাভের সোপান মাত্র মহাত্মা একথা বার বার বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাই বলেন। "আমি বলিতেছি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্র সম্বন্ধ মাত্রেরি মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষাই রাখে না তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ; তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।"

সে যাই হোক পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে উদ্ধৃত অংশগুলি যদি তলিয়ে বুঝে থাকেন, তাহলে সহজেই তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন। সেটী এইঃ—গবর্ণমেণ্ট কি করেন না করেন সেদিকে দৃকপাত মাত্র না করে আমাদের সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের জাতীয় শক্তির কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। আমাদের পক্ষে এইটেই হবে আমাদের আসল গবর্ণমেণ্ট। আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের শক্তি যতই বেড়ে উঠবে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সেই পরিমাণেই হ্রাস হবে। শেষে এমন একটা অবস্থা সুনিশ্চয় আসবে যখন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে হয় গ্রাস করে ফেলবে, নয় দুই পক্ষের মধ্যে একটা সম্মানজনক রফা বন্দোবস্ত হবে।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনেরও যে অবিকল এই লক্ষ্য, আশা করি কোনও অভিজ্ঞ পাঠককে একথা বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না।

আমি লিখছিলেম, বর্ত্তমান অসহযোগ-আন্দোলনের বিষয়, কিন্তু লিখে ফেললেম রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব লাভের কি উপায় নির্দ্দেশ করেছেন সেই সম্বন্ধে। আমার এইরূপ বিসদৃশ আচরণ, অনেক পাঠকের বিস্ময় ও বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি উপযুক্ত কৈফিয়তের জন্য পাঠকদের নিকট ঋণী।

আমার প্রথম কৈফিয়ৎ এই—বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের মূলতত্ত্ব মর্ম্মগত সত্য এবং তার প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল বহুদিন পূর্ব্বে, রবীন্দ্র নাথের কল্যাণে। আমি এবিষয়ে যা কিছু ভেবেছি তা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ধারারই অনুসরণ করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আমার মনকে বর্ত্তমান আন্দোলনকে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ করে রেখেছিল বলেই তা এত সহজে আমার চিত্ত অধিকার করে বসেছে। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু আলোচনা

করতে হলে যে পথটা আমার সব-চেয়ে চেনা সেই পথ দিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

আমার দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ এইঃ—বর্ত্তমান আন্দোলনের ভিতরের কথাটা বুঝতে হলে, রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে যে পরিমাণে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে, খুব অল্প স্থান হতেই সেরূপ পাওয়া সম্ভব। অনেক তথ্য মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা অপেক্ষাও তাঁর আলোচনায় বেশী ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমি মনে করি, বর্ত্তমান আন্দোলনের বিশুদ্ধিতা রক্ষা-কল্পে এ লেখাগুলির উপযোগিতা খুব বেশী।

আমার শেষ কৈফিয়ৎ এই—এরূপ না করে আমার পক্ষে অন্য উপায় নাই। আমি যেখান থেকে যে সত্যই লাভ করিনা কেন, যে মন দিয়ে তাকে আপনার করে নিই, সেই মনের গঠনে যত শক্তি কাজ করেছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রবলতম। মহাত্মা গান্ধীর অলোক-সাধারণ চরিত্র ও ত্যাগ-মাহাত্ম্যের নিকট আমার মাথা যে আপনিই নুইয়ে পড়বে, এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এই বিপুল চরিত্র-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে খুব একটা বড় গোছের ত্যাগ স্বীকার করে ফেলাও আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আমি বল্‌তে বাধ্য যে, মহাত্মা গান্ধী আমার গুরু নন, আমার অন্তরের দেবমন্দির-সংলগ্ন অতিথি-শালায় তিনি পূজ্যতম শ্রেষ্ঠ অতিথি মাত্র। আমার অন্তরের সমস্ত কক্ষগুলি যাঁর চরণ-ধূলি-স্পর্শের গৌরব লাভ করেছে, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তিনিই আমার গুরু। তিনিই আমার কাব্য-প্রীতি, সৌন্দর্য্যানুরাগ, মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা, মানব-প্রীতি, ঈশ্বর-প্রেম—আমার সমস্ত অনুভূতি-সমেত আমার অখণ্ড চেতনাকে, নিবিড় স্পর্শে ধন্য ক'রে, বিপুল পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নাম মাত্রে আজ এই প্রৌঢ় বয়সেও অন্তরের মধ্যে যে পুলক-বেদনার তড়িৎ খেলে যায়, তাকে ভক্তি বল, প্রেম বল, আত্মনিবেদন বল আর যাই বল তা অনির্ব্বচনীয়। মহাত্মা গান্ধী গোখেলকে যে চোখে দেখতেন আমি রবীন্দ্রনাথকে ঠিক সেই চোখেই দেখে থাকি।

আজকের মতো বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে আমি অসহযোগ আন্দোলনের কর্ম্মীদিগকে রবীন্দ্রনাথের একটী ছোটো কবিতা উপহার দিতে চাই। সব সময় মনে রাখতে পারলে তাঁদের ও দেশের বিশেষ উপকারে লাগবে।

"তুমি সর্ব্বাশ্রয়—একি শুধু শূন্য কথা ?
ভয় শুধু তোমাপরে বিশ্বাস-হীনতা
হে রাজন। লোক-ভয় ? কেন লোকভয়
লোকপাল ? চিরদিবসের পরিচয়
কোন্ লোক-সাথে ? রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র ! তুমি যার বিরাজ' অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবন-ময়
তব ক্রোড়,—স্বাধীন সে বন্দীশালে ! মৃত্যুভয়
কি লাগিয়া হে অমৃত ! দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান
এত প্রাণ-দৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব ?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব ?
কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার ?
তুমি নিত্য আছ আমি নিত্য যে তোমার।"

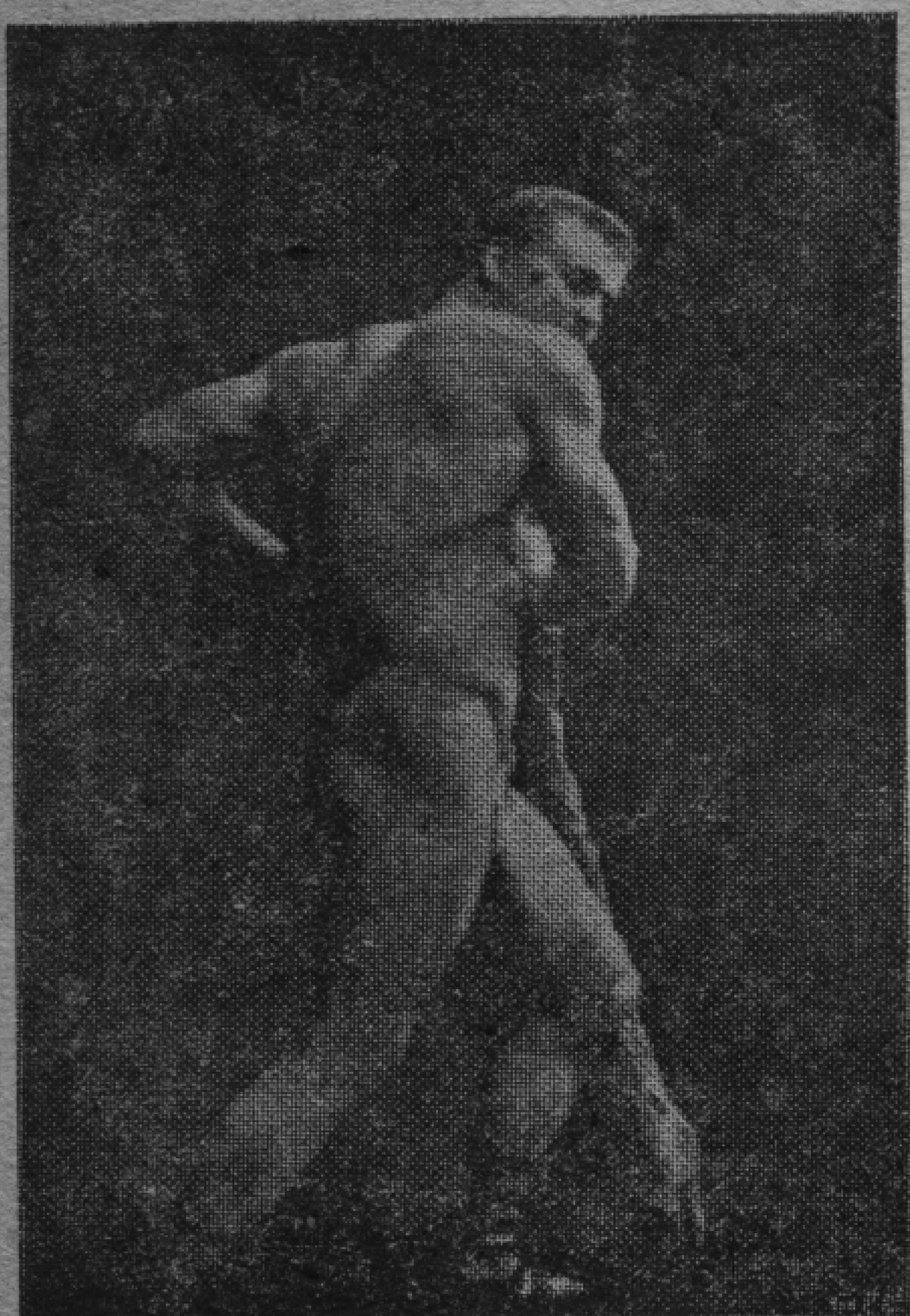
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

ভালো

ঐ ত রবি, ঐ ত শশী, ঐ ত তারার আলো
পাখীর কণ্ঠে ঝরছে জগৎ, এইত কুসুম,
এই ছিল মোর ভালো।
আজ মনে হয় সকল ফাঁকি
ভিড় করে' সেই চেয়ে থাকার মেলা
কতই না দিন সঙ্গে তাদের কাটিয়ে ছিলেম্
সাঁজ-সকালের বেলা
আর না ওরে আর না ওরে
আর বাসিনে তাদের এখন ভালো
সেই পাখী আর ফুলের মালা,
আকাশ ছেয়ে অধীর-করা আলো।
এখন আমি বাসছি ভালো তারেই
যারে, কুড়িয়ে সেদিন পেয়েছিলাম পথে
ঐত সে যে চল্‌ছে বেয়ে আমার মনোরথে।
ওগো পরাণ-চোর
রাত্রিদিনে প্রেমে প্রেমে তুলছ ভরে' জীবন-আয়ু মোর।
যখন তুমি ধরো মোরে,
ওগো প্রিয়, নিবিড় ঘরে আপন বাহু-পাশে
তখন দেখি কূল-হারা সেই শান্ত আকাশে
তারার আলো, চাঁদের আলো, ঐ সে রবির আলো—
কাঁপ্‌ছে থরে থরে; বইছে ধীরে মৃদুল দখিন বায়
সেই ক্ষণে মোর পূর্ণ আঙিনায়
পাখীর গানে ভর্‌ছে জগৎ; বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে
কুসুম-কলি উঠছে ফুটে লতার শাখে শাখে।

শ্রীঅরুণকান্তি বাগচী।

"বাহুতে দাও মা শক্তি"



স্যাণ্ডো

ছেলেবেলায় বাপ-মা পড়াশুনোর জন্যে আমাদের যার-পর-নাই শাসন করেছেন এবং আমাদের ধম্‌কিয়ে ও চম্‌কিয়ে মগজের মধ্যে বারংবার এ সত্যটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে,—লেখাপড়া না শিখ্‌লে মানুষ কখনো 'মানুষ' হয় না।

কিন্তু তাঁরা এ-কথাটা কখনো আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা পান-নি যে, লেখাপড়ার দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করাটাও মানুষের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য।

বাপ-মার এত চেষ্টা-সত্ত্বেও লেখাপড়া কতখানি শিখেছি এবং 'মানুষ'ই বা কতটা হয়েছি, সে কথা হাটের মাঝে জাহির না ক'রে মানে-মানেই চেপে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যদিকে ব্যায়ামাদির ধার না-মাড়িয়ে দৈহিক মনুষ্যত্ব লাভও যে এতটুকু হয়নি, সে কথা ব'লেও মিছে মুখ ব্যথা ক'রে লাভ নেই।

আজ এতদিন পরে বয়স যখন তিরিশের কোঠা পেরিয়েছে এবং শরীরের বাড়ও যখন অনেক দিন আগেই থেমে পড়েছে, তখন প্রতি পদে ঠেকে ঠেকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, আমাদের একূল ওকূল দুকূলই গোল্লার দোরে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে! এত বয়সে ব্যায়াম সুরু ক'রে স্বাস্থ্য লাভ হয়েছে বটে, এবং এই ক্ষীণ দেহের অনুপাতে জোরও হয়ত কিছু কিছু বেড়েছে, কিন্তু ভগবানের সুন্দর দান এমন যে নরদেহ, তা যেমন কুদর্শন ছিল, তেম্‌নিই রয়ে গেল। কারণ, 'পাকা বাঁশ নোয় না'।

সত্য, ভদ্র ও শিক্ষিত বাঙালীর দেহ দেখ্‌লেই চোখ ফেটে জল আসে! বৈকালে কলেজ ষ্ট্রীটে গিয়ে দাঁড়ালে কি শোচনীয় দৃশ্যই আমাদের দৃষ্টিকে আহত করে! ঐ যে সব বাঙালীর সন্তান,—বয়সে যারা যুবক, দেশের যারা ভবিষ্যতের আশা-ভরসা এবং আর্থিক অবস্থাতেও যারা উন্নত,—বিশ্ববিদ্যাযন্ত্রে ক্রমাগত নিষ্পেষিত হয়ে হয়ে তাদের মুখ হয়েছে রক্তহীন পাণ্ডু, চোখ হয়েছে স্বল্পদৃষ্টি, কোটরগত, এবং দেহ হয়েছে জীর্ণ-শীর্ণ, রুগ্ন-ভগ্ন! তারা চলে ফেরে সঙ্কুচিত ভাবে, কথা কয় চিঁ-চিঁ ক'রে, আমোদে যোগ দেয় মমুর্ষু হয়ে।

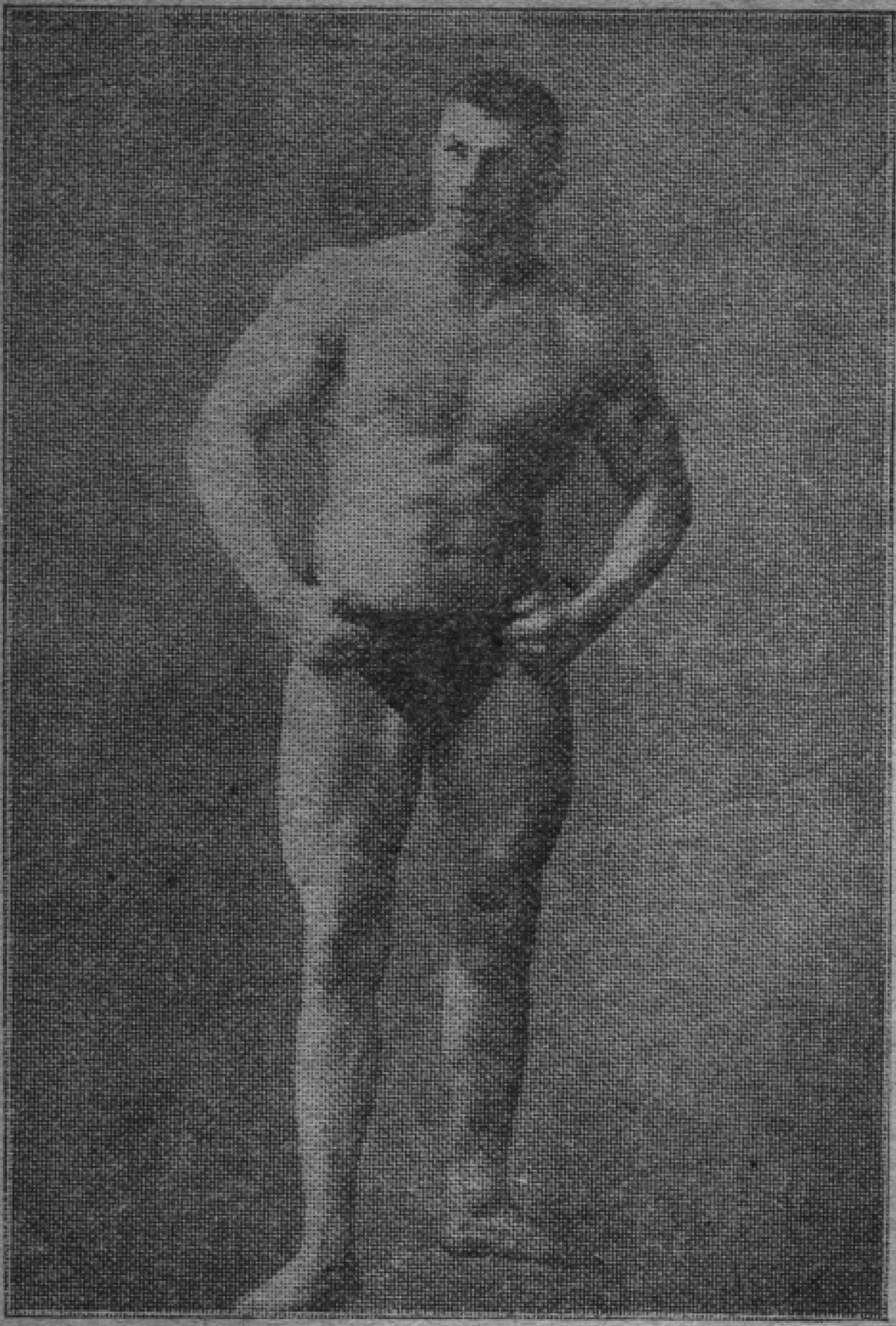


মুলার

এই বয়সেই খাবার তাদের হজম হয় না, এক ঘা খেলে দু ঘা তারা ফিরিয়ে দিতে জানে না এবং কোনরকম রোগের আক্রমণে সহজে তারা বাধাও দিতে পারে না। ভদ্র-ঘরের মেয়েদের অবস্থা ততোধিক ভয়ানক। কারণ মুক্ত বায়ুতে পথে-ঘাটে চলা-ফেরা করার দরুণ ছেলেদের যেটুকু উপকার আর অঙ্গসঞ্চালন হয়, মেয়েরা তাথেকেও বঞ্চিত! এই-সব যুবক-যুবতী আবার যে-সকল ছেলে-মেয়ের বাপ-মা হবেন, তাদের কথাটাও সকলে একবার কল্পনা-নেত্রে ভেবে দেখ্‌বার চেষ্টা করুন! বাংলা দেশে কেন যে এত আধি-ব্যাধি আর অকাল-মৃত্যু, তার কারণ বোঝা কিছুমাত্র শক্ত নয়। আর, এই ভাবে আরো কিছু কাল গেলে, বাংলা দেশ যে জ্যান্ত-মড়ার মুল্লুক হয়ে দাঁড়াবে, তাতেও আর কোনই সন্দেহ নেই। 'স্বরাজে'র জন্যে এত যে বাক্য-বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ, এত যে দলাদলি, দাপাদাপি, কিন্তু সেই সুদুর্ল্লভ স্বরাজ আমাদের হস্তগত হ'লে তা ভোগই-বা করবে কে, আর রক্ষার ভারই-বা নেবে কে? ধরণী যে বীরভোগ্যা!

দৈহিক সৌন্দর্য্যও একটা অবহেলার জিনিষ নয় এবং সুন্দর গঠন যে দৈহিক সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান উপাদান, সে কথাও বলা বাহুল্য। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন জাতির কাছেই এ-বিষয়ে বাঙালী মাথা হেঁট্ করতে বাধ্য। দুঃখের কথা বল্‌ব কি, এদেশে যাঁরা বলচর্চ্চা করেন, তাঁরাও এমন উপযোগী ব্যায়াম করেন না, যাতে দেহের গড়ন দেখ্‌তে সুশ্রী হয়। গড়ের মাঠে ফুটবল খেলার ময়দানে গেলেই দেখ্‌তে পাবেন, ইংরেজ—এমন-কি ফিরিঙ্গী—খেলোয়াড়দের পাশে বাঙালী খেলোয়াড়দের কুশ্রী, শীর্ণ দেহের গঠনহীনতা কতখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে!

দৈহিক গঠনের প্রতি এই বিরাট অবহেলা খালি বাংলাদেশে নয়—সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিরাজ করছে। এখানকার কুস্তিগীর পালোয়ানরা রীতিমত নর-হস্তী হবার জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগে যান যে, দেহের স্বভাব-সুন্দর গঠন পর্য্যন্ত সেই বিপুল মাংস-স্তূপের চাপে থেঁৎলে



হেকেনস্মিথ

ও কাপুরুষ নাম কিনেছে, তার একমাত্র কারণ দৈহিক দুর্ব্বলতা। সাহসের জন্ম বলিষ্ঠ দেহে। ব্যায়াম-চর্চ্চার অভাবে বাঙালী স্বেচ্ছায় দুর্ব্বলতা অর্জ্জন করেছে এবং পথে-ঘাটে তাই সে অবলা নারীর মতই অসহায় ও সঙ্কুচিত। সম্ভ্রান্ত লোকের বংশ বা অর্থ বা বিদ্যার তিন গৌরব একত্রেও তাঁকে রক্ষা করতে পারে না,—একজন মূর্খ, দরিদ্র ও অসভ্য কাবুলিওয়ালা পর্য্যন্ত যখন-তখন তাঁর সর্ব্বাঙ্গে পদাঘাত ক'রে অনায়াসে হাসিমুখে চ'লে যেতে পারে। দেশে ব্যায়ামের কদর থাকৃলে আজ খবরের কাগজে সবুট পদাঘাতে প্লীহা-ফাটার কাহিনী এবং নীরবে অপমান হজম ক'রে পরে খবরের কাগজে নির্লজ্জ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত আমরা নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পেতুম না। আজ পর্য্যন্ত কোন ইংরেজ মার খেয়ে খবরের কাগজে এমন ক'রে নিজের মুখে নিজেই চুণ-কালি মাখায় নি—তার চেয়ে তারা আত্মহত্যাকে সহজ মনে করে। ঢাক পিটিয়ে নিজের কাপুরুষতা নিজেই রটিয়ে দেওয়া, এটা বোধ হয় এই দুর্ভাগ্য বাংলা তথা ভারতবর্ষেই সম্ভব!

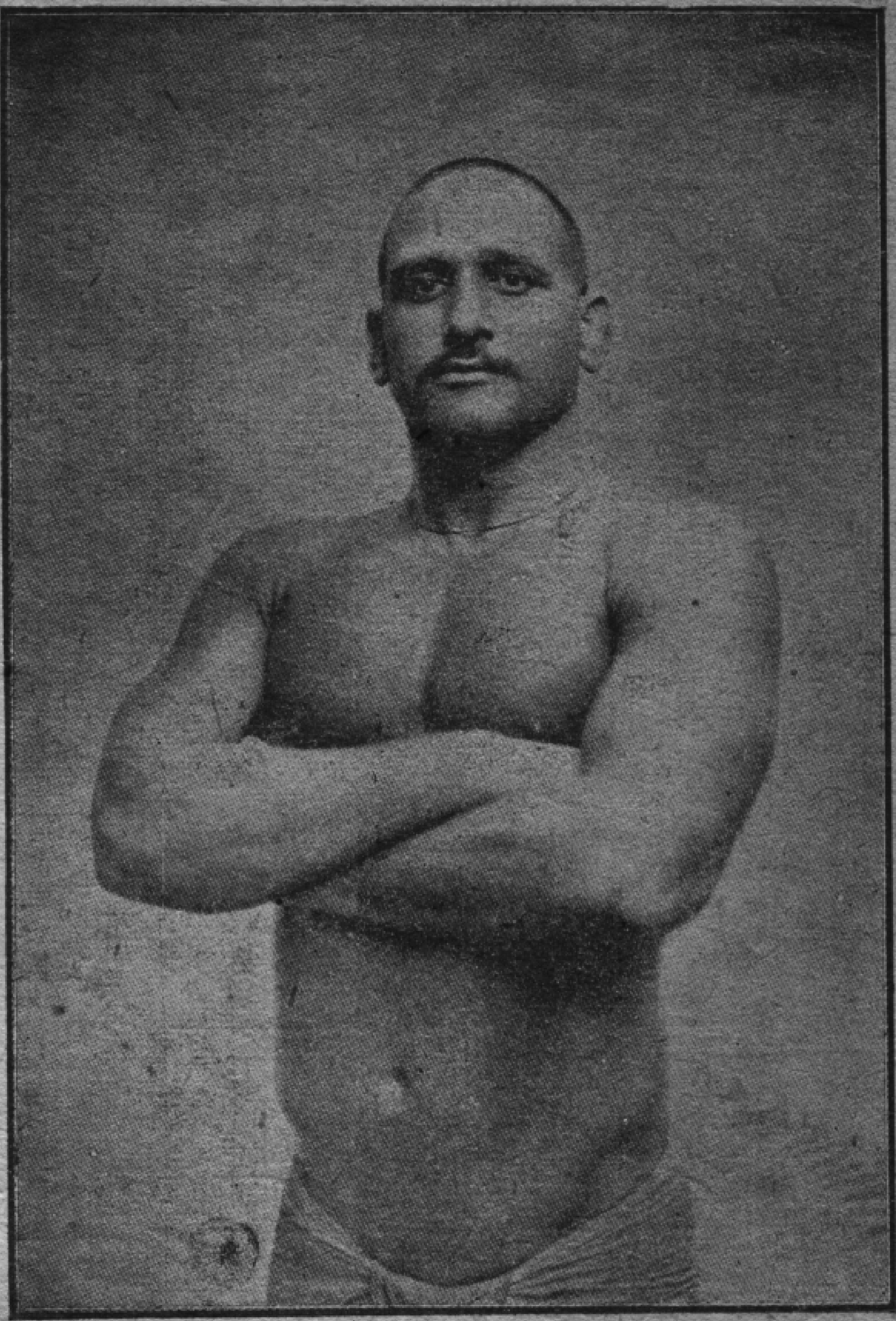
বেঢপ হয়ে যায়! পাশ্চাত্য দেশের তিন শ্রেণীর ব্যায়ামের তিন বিখ্যাত পুরুষ হেকেনস্মিথ, স্যাণ্ডো ও মুলারের কাছে গঠন-সৌন্দর্য্যে টেক্কা দিতে পারে, ভারতে এমন 'ভুঁড়ি'হীন পালোয়ান আছেন কিনা, জানিনা; থাকৃলেও, খুব কমই আছেন। কিন্তু য়ুরোপে-আমেরিকায় অধিকাংশ পালোয়ান বা ব্যায়াম-বীরেরই গঠন পরম-সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ভাস্করের আদর্শ হবার যোগ্য। প্রাচীন গ্রীসে মানুষের দেহ নিখুঁত ছিল, ভাস্কর্য্যও তাই হয়ত অতটা বিকাশলাভ কর্‌তে পেরেছিল। বাংলায় নিখুঁত দেহের অত্যন্ত অভাব, তাই ভাস্কর্য্য-শিল্পেরও বিকাশ নেই। কিন্তু সে কথা এখন থাক্!

বাঙালী যে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভীরু

বাঙালী স্বরাজ পেয়ে নিজের দেশ নিজে রক্ষা কর্‌তে চায়, অথচ তারা নিজেদের প্রাণ, ধন-মান, এমন-কি বসত-বাড়ীখানা পর্য্যন্ত স্বহস্তে রক্ষা কর্‌তে অক্ষম! দেউড়ীতে গিয়ে দেখুন, কিছুকাল আগেও যেখানে বাঙালী লাঠিয়ালরাই পাহারা দিত, আজ সেখানে পশ্চিম থেকে দ্বারবান আনিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে! বাঙালীর জন্মক্ষেত্রে সবল

পুরুষত্বের এতই অভাব! হায় স্বরাজের স্বপন! যার আত্মরক্ষার যোগ্যতা নেই, যে নিজের পায়ে নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে না, দেশরক্ষার অধিকার তার কোথায়? স্বরাজের আন্দোলন করা খুবই ভালো, কিন্তু সেইসঙ্গে আত্মশক্তি বাড়াবার সাধনা করাও কি আমাদের পক্ষে উচিত নয়?

বাংলা দেশে মহাত্মা গান্ধীর 'নন্-ভায়োলেন্সে'র মন্ত্র প্রচার করা বাহুল্য মাত্র। কারণ 'নন্-ভায়োলেন্সে'র লক্ষণ নিয়েই বাঙালী জননীর জঠর থেকে জন্মগ্রহণ করে—তার জাতিগত ধর্ম্মই হচ্ছে 'ভায়োলেন্ট' না হওয়া! তবে মহাত্মা গান্ধীর অনুগ্রহে আমাদের এই চির-নিরীহ অক্ষমতা বা কাপুরুষতা এখন যে একটা সম্মানজনক, মস্ত-বড় নামের আড়ালে লুকিয়ে লজ্জা-নিবারণ করতে পারবে, আমাদের পক্ষে এইটুকুই বোধ হয় সান্ত্বনার কথা—অর্থাৎ যাকে বলে প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা!

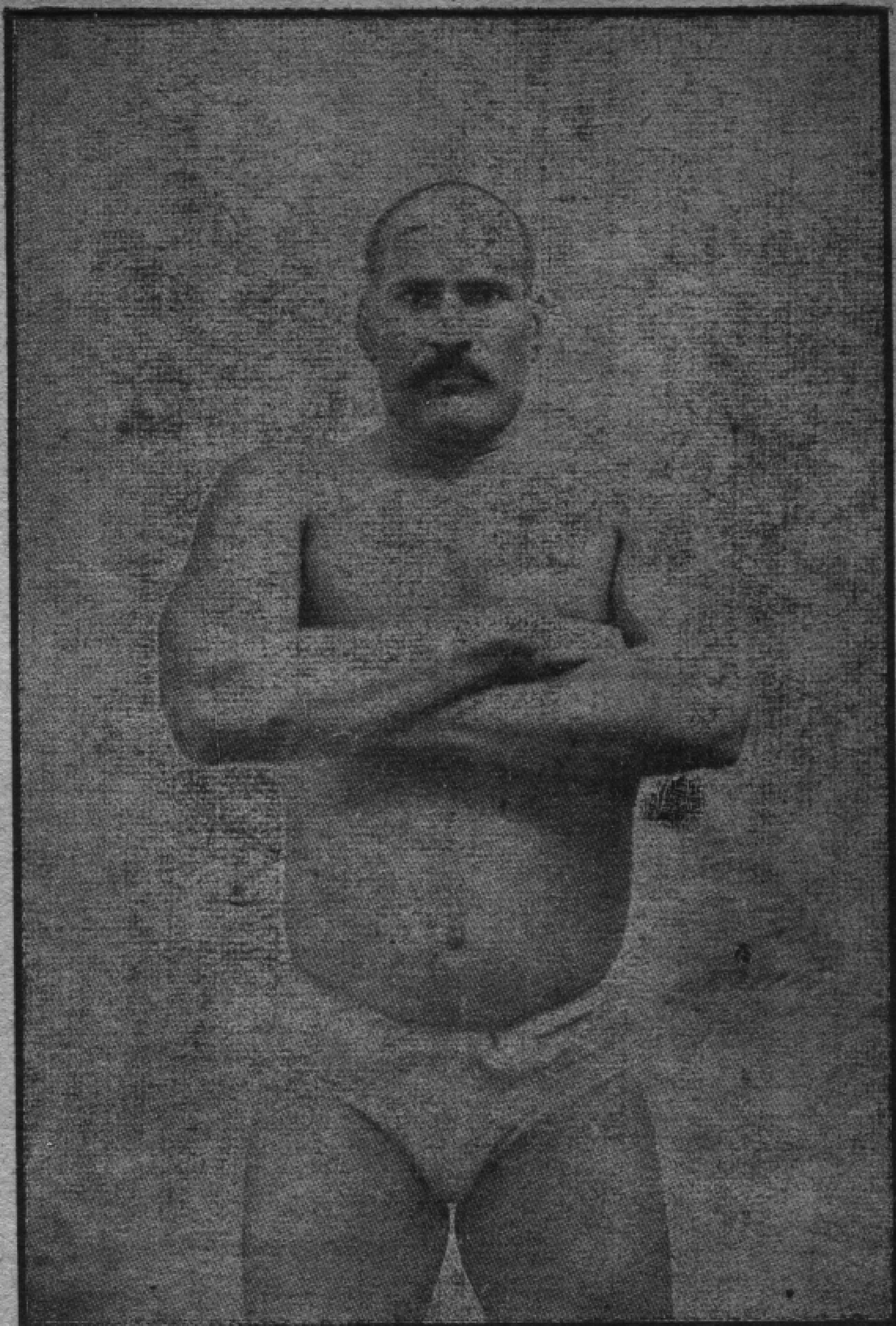


ফত্তা

দেশে আজকাল এমন অনেক অন্ধ ও চিন্তাহীন লেখক দেখা দিয়েছেন, যাঁরা সর্ব্বদাই গলাবাজির কারসাজির দ্বারা বল্‌তে চান যে, 'আমাদের এই দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্যহীনতার একমাত্র কারণ দারিদ্র্য-সমস্যা। যে পেটে খেতে পায় না, সে দেহ-চর্চ্চা করবে কি?' এটা হয় ভ্রম, নয় মিথ্যাকথা। দারিদ্র্য-সমস্যা আমাদের দুর্ব্বলতার গৌণ কারণ মাত্র। দেশে ধনীও আছেন যথেষ্ট এবং অন্নাভাবে হাহাকার করেন না, এ-রকম সম্পন্ন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকও অসংখ্য। দেহ-চর্চ্চায় তাঁরাও অমনোযোগী কেন এবং তাঁদেরও দুর্ব্বলতার হেতু কি? দুর্ল্লভ, সুস্বাদু ও পোষ্টাই আহার্য্যে পরিতৃপ্ত ধনী বাঙালীর চেয়ে তাঁদের নিরামিষভোজী দ্বারবানরা তো বড়লোক নয়, তবে তাদের দেহ মনিবদের চেয়ে অতটা বলবান, পুরুষোচিত ও স্বাস্থ্যসুন্দর হয় কেন? পথের গরিব মুটেদের দেহও ধনী বাঙালীর

চেয়ে সবল হয় কেন? তারাও কি দারিদ্র্য-সমস্যায় কাতর নয়? এরাও কি ভালো খাবার খায়, ভালো কাপড় পরে, ভালো জায়গায় বাস করে? এমন সহজ সত্যও যে আমাদের মনে থাকে না, এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে আশ্চর্য্য! একেই কি বলে সজাগের নাসাগর্জ্জন?

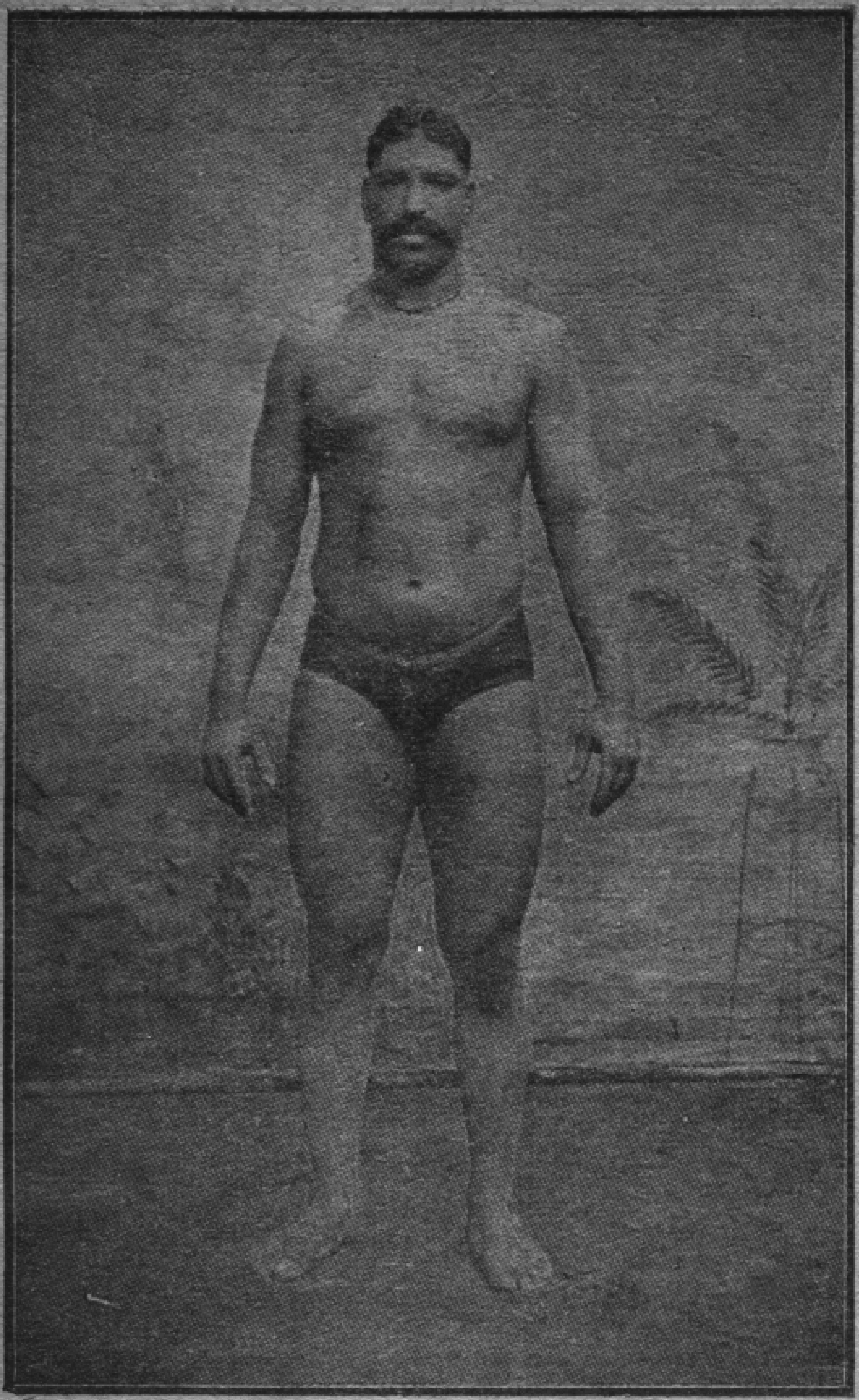
বাপ-মায়েরা ছেলেদের ব্যায়াম-শিক্ষায় উৎসাহিত তো করেন না বটেই, উল্টে কেউ যদি সেদিকে একটুও ঝুঁকে পড়ে অম্‌নি তাঁরা বেঁকে ব'সে ব'লে ওঠেন, "এ-সব উড়ো আপদ কেন রে বাপু? তোরা গুণ্ডা হবি, না লোকের বাড়ীতে দরোয়ানি কর্‌বি? জানিস্, ডাংপিটের মরণ গাছের আগায়?" তাছাড়া অভিভাবকদের মনে আরো-একটা বিশ্বাস আছে যে, এতে নাকি পড়াশুনোর বড়ই ক্ষতি হয়!



গুস্তা সিং

আসলে, ব্যায়াম-চর্চ্চা কর্‌লে ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার যে উন্নতি হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা, সেটা কিন্তু খুব কম বাপ-মা-ই তলিয়ে বোঝেন বা বোঝ্‌বার চেষ্টা করেন। ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে ভালো ছেলের মন বরং আরো ভালো হয়েই ওঠে—কারণ রুগ্ন-ভগ্ন দেহের মধ্যে থাক্‌লে শিক্ষিত ও ধারালো মনও অকেজো ও ভোঁতা হয়ে পড়ে।

দুর্ব্বলতা, কুস্বাস্থ্য ও আধি-ব্যাধির জন্যে আমাদের জাতীয় শক্তি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার একটা হিসাব কি কেউ ক'রে দেখিয়েছেন? ইস্কুল-কলেজে, আপিসে বা অন্য চাকুরিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, গৃহস্থালীতে—এমন-কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে বা মানসিক চিন্তারাজ্যেও এই ক্ষতির ছাপ্ স্পষ্ট পাওয়া পাওয়া যায়। জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই সবল যতটা পরিশ্রম কর্‌তে পারে, দুর্ব্বল তা পারে না—কারণ তার সহ্য-শক্তি কম। এইখানেই দুর্ব্বল নিজেও ঠক্‌ছে এবং পরকেও ঠকাচ্ছে। স্বাস্থ্যহীনতার দরুণ মানুষের পরমায়ু কমে যায় এবং অসুখী মনও যথাশক্তি কাজ কর্‌তে পারে না। মাইকেল, বঙ্কিম,



ইমাম-বক্স

এবং অনেক অসুখ একেবারেই হয় না। ছোট-বড় নানান রোগ প্রায়ই যাঁদের পিছনে লেগে থাকে, তাঁরা অতি-বড় কর্ম্মী হ'লেও প্রায়ই কাজে কামাই না দিয়ে পারেন না। এম্‌নি নানান দিক্ থেকে দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালীর জাতীয় শক্তির অপচয় হয় অত্যন্ত অধিক। এই বিপুল অপচয়ের পরিমাণ, লক্ষ লক্ষ লোকের জন্ম-বেকার হয়ে ব'সে থাকার সমান—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে থেকেও তারা কাজ করতে পার্‌ছে না!

কিছুকাল আগে বিলাতে একটি রাজকীয় তদন্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—তার সভ্য ছিলেন দেশের জন-কয়েক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। বিশেষভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে সমিতির সভ্যরা শেষটা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন:—

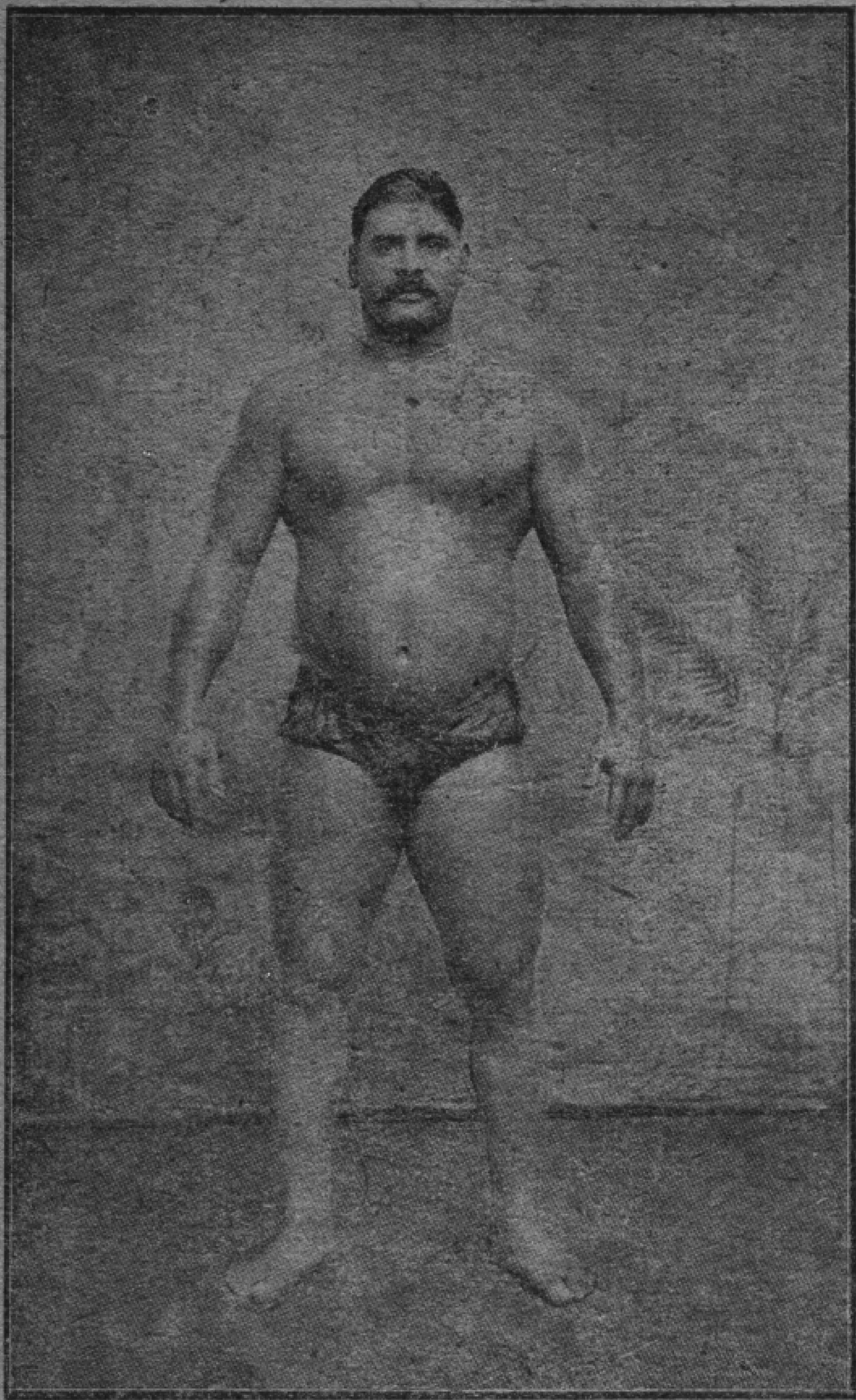
১। মানসিক শিক্ষার মত দেহ-চর্চ্চাকেও সমান দরকারি ব'লে মনে করতে হবে।

২। বিদ্যালয়ে বালকদের মত বালিকা-দেরও দেহ-চর্চ্চার দিকে সমান মন দিতে হবে।

৩। কি সহরে আর কি পাড়াগাঁয়ে—নির্ব্বিচারে সকলকেই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম-শিক্ষা দান করতে হবে।

মানুষ একালেই বিলাসী হয়ে নিজের

দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেক প্রতিভাবানদের কেউ স্বকৃত অত্যাচারের ফলে এবং কেউ বা দেহকে অবহেলা ক'রে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে অকালে ইহলোক ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা দীর্ঘজীবী হ'লে দেশের ও জাতির চিন্তা-ভাণ্ডারকে নিশ্চয়ই আরো কত দিকে সমৃদ্ধ ক'রে যেতে পার্‌তেন। তারপর ব্যায়াম-চর্চ্চায় অসুখ-বিসুখ যে কম হয়, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সবল দেহে রোগজীবাণুরা শীঘ্রই কাবু হয়ে পড়ে



গামা

পায়ে নিজেই কুড়ুল মার্‌ছে। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে এদিকে সে উন্নত না হয়ে বরং অবনতই হয়ে পড়্‌ছে। সেই সাবেক কালেও প্রাচীন গ্রীসের বাসিন্দারা ব্যায়ামের উপযোগিতা যতটা বুঝেছিলেন, একালের সভ্য আমরা তার শতাংশের একাংশ বুঝতে পার্‌লেও বর্ত্তে যেতুম। পাঁচ বৎসর বয়স হ'লেই গ্রীক বালকরা ব্যায়ামে হাতে খড়ি দিত। খালি বালক নয়, বালিকা এবং যুবক-যুবতীরাও সেখানে সাধারণ 'প্যারেডে'র জমিতে সমবেত হয়ে দৈনিক ব্যায়াম-চর্চ্চা কর্‌ত। গ্রীসে এমন সহর প্রায় দেখাই যেত না, যেখানে ব্যায়াম শালাছিল না। এমনকি, গ্রীক সহর চেন্‌বার প্রধান বিশেষত্বই ছিল ব্যায়ামাগার। রোমও যখন উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে, তখন সম্রাট থেকে গরীব প্রজারা পর্য্যন্ত সকলেই নিয়মিত ভাবে কতকটা সময় দেহ-চর্চ্চায় কাটিয়ে দিত।

একালেও য়ুরোপের অধিকাংশ দেশে ও আমেরিকায় ব্যায়াম-চর্চ্চার দিকে মানুষের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। কোন কোন দেশের (যেমন আমেরিকায়) নারীরা ব্যায়ামের দ্বারা এমন ভাবে দেহ-গঠন করেছেন যে, অনেক বাঙালী বাবুই তাঁদের সঙ্গে হাতাহাতি কর্‌লে পাকা ছ'টি মাসের জন্যে নিশ্চিত ঝোল-সাবু খেতে বাধ্য হবেন।

ভারতবর্ষেও অনেক জাতির ভিতরে ব্যায়াম-চর্চ্চা এখনো লোপ পায় নি। বিশেষ ক'রে পঞ্জাবেই দেহ-চর্চ্চার দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যায় এবং সেইজন্যেই ভারতের আর সব দেশের চেয়ে পঞ্জাবই প্রথম শ্রেণীর সৈনিক ও পালোয়ান যোগাতে পারে বেশী।

বাংলা দেশে জনকতক ব্যায়াম-বীর ও পালোয়ান আছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ও প্রসিদ্ধ হয়েছেন স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত, অম্বু গুহ, ক্ষেতু গুহ, শ্রীযুত যতীন্দ্র গুহ (গোবর-বাবু)

ও ভীম ভবানী। গোবরবাবু বিলাতে গিয়ে কয়েক বৎসর আগে সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানকে হারিয়ে নাম কিনেছিলেন। এখন তিনি আমেরিকায়। সংবাদপত্রের খবরে জানা গিয়েছে, গোবরবাবুর হাতে সেখানকারও কয়েকজন নামজাদা পালোয়ানের পতন হয়েছে। বাঙালী যুবকরা যাতে দেহ-চর্চ্চার দ্বারা যথার্থ পুরুষ হয়ে উঠ্‌তে পারে, সেদিকে গোবরবাবুর প্রাণের টান অত্যন্ত অধিক। চেষ্টা কর্‌লে বাঙালীর চেহারা কেমন সুন্দর ও গায়ের জোর কত বেশী হয়, গোবরবাবুর সাক্‌রেদ্‌দের দেখ্‌লেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।



গোবর

কিন্তু যেখানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ শত শত পালোয়ানের জন্ম দিয়েছে, সেখানে এখন বাঙালীর সবে-ধন-নীলমণি হচ্ছেন এই গোবরবাবু। কোটি কোটি পুরুষের জন্মক্ষেত্র বাংলাদেশের পক্ষে এ গৌরব কতটুকু! এযে সিন্ধু-মাঝে বিন্দু নীর! গোলাম, কাল্লু, কিক্কর সিং, সুচেৎ সিং, গামা, ইমামবক্স, হোসেন বক্স ও গুট্টা সিং প্রভৃতির মত শত শত পালোয়ান কি বাংলাদেশে কখনো দেখ্‌তে পাব না? একমাত্র গোবরবাবুকে নিয়ে আমাদের দারিদ্র্যের সবটা যে ঢাকা পড়া অসম্ভব! বাঙালী ভাবের রাজ্যে অনেকবার দিগ্বিজয় করেছে, এবার সে সবল পুরুষত্বের পরিচয় দিয়ে আপনার বিখ্যাত কলঙ্ক মোচন করুক্‌,—খালি জ্ঞান-বিজ্ঞান-রসায়ন-সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও দার্শনিকতায় নয়—সেইসঙ্গে সে দেহে বলী হোক্‌, স্বাস্থ্যে বলী হোক্‌, পুরুষত্বে বলী হোক্‌,—এই আমাদের একান্ত কামনা। বর্ত্তমান যুগে একসঙ্গে আত্মার শক্তি ও দেহের শক্তি, এই দুই শক্তি-সাধনাই কর্‌তে না শিখ্‌লে জীবন-সংগ্রামে আমরা টিঁক্‌তেও পার্‌ব না এবং পরিপূর্ণভাবে বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর্‌তেও পার্‌ব না। রুগ্ন, দুর্ব্বল, অল্পায়ু, ভীরু-কাপুরুষের জীবনের মত ঘৃণ্য ও নগণ্য আর কি আছে?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

১৪

প্রায় তিনমাস পরে সুষমা তাহার শীর্ণ শরীরটাকে কোনমতে খাড়া করিতে পারিলে ডাক্তার আসিয়া পরামর্শ দিলেন, রোগীর একবার পশ্চিমে যাওয়া দরকার; বাহিরের জল-বাতাসে চট্ করিয়া সারিয়া উঠিবেন।

তখন বাড়ীতে কমিটি বসিয়া গেল। কর্তৃপক্ষ সাব্যস্ত করিলেন, লোকজন সঙ্গে দিয়া সুষমাকে তাহা হইলে কাছাকাছি এই দেও-ঘরেই পাঠানো যাক্। অভয়াশঙ্করের যাওয়ার সুবিধা হইবে না; সম্প্রতি বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তদারক একটু ঢিলা পড়িয়াছিল, সেটাকে আবার টাইট্ করিয়া লইতে হইবে; এবং নিখিলের পক্ষে যাওয়াও সম্ভব নয়, কারণ নূতন করিয়া তাহার পড়াশুনার বন্দোবস্ত হইয়াছে; তাছাড়া তাহাকে দূরে পাঠাইয়া অভয়াশঙ্কর একা এখানে গৃহে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। তবে সুষমার সঙ্গে ভুবনেশ্বরীকে যাইতে হইবে, নহিলে সে বেচারী ছেলেমানুষ, তাহাকে দেখিবে কে?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন—নিখিল সঙ্গে গেলে ভাল হয়, বাবা। ওরও শরীর সারতে পারে। তাছাড়া একলাটী নিখিলেরই বা এখানে মন টি কবে কেন?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার কাছে থাকবে নিখিল,—তাছাড়া নিখিলকে পাঠিয়ে আমি একলা থাকতে পারব না ত।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তুমি মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে এসো'খন।

অভয়াশঙ্কর এ কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

দুপুরবেলায় নীচে আবার কথাটা উঠিল। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—নিখিলকে আমি নিয়ে যাব। ওর মন পড়ে থাকবে সেখানে, আর ও ভালো থাকবে? কখনো না।

মানদাঠাকুরাণী বড় একটা ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া গলায় এক-ঘটি জল ঢালিয়া বলিলেন,—বাপ্‌রে, ওকে পাঠিয়ে আমরা এ শূন্যপুরীতে থাকবো কি করে? বলে, ও আমাদের চোখের মণি—

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তোমাদের দিক না দেখে ছেলের দিক্‌টা দেখতে হবে ত।

মানদাঠাকুরাণী বলিলেন,—ছেলে বেশ থাকবে, বেয়ান্, সে জন্যে তুমি ভেবো না। বাপের কাছে আদরটা কি ওর কম! বলে, ওকে তিলেক না দেখে অভয় অস্থির হয়ে ওঠে, হুঁঃ!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—মার জন্যে ছেলে হেদুবে না?

মানদাঠাকুরাণী বলিলেন,—তা হেদুবে না। আমরা রয়েছি—তা ছাড়া ও ভারী সেয়ানা ছেলে বেয়ান, ও সুব্ বোঝে। বাছা মুখে কোন কথাটি বলে না—না হলে ও জানে সবই। দেখেচ ত, এ বৌমার কাছে আজ-কাল মোটে ঘেঁষতে চায় না! হবে কেন? রক্তের টান ত নেই কিছু—!

মানদাঠাকুরাণীর এ ইঙ্গিতের অর্থ ভুবনেশ্বরী সবই বুঝিলেন,—কিন্তু এই নীচ ইতর আভাষ-

ইঙ্গিতগুলা লইয়া কোনরূপ আলোচনা করিতে তাঁহার ঘৃণা হইল, কাজেই তিনি ও-প্রসঙ্গ একেবারে চাপা দিয়া নিঃশব্দে ভোজন সারিয়া লইলেন,—সারিয়া উপরে সুষমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুষমা তখন ঘরে একটা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল, পাশে বসিয়া নিখিল। নিখিলের মুখখানি মলিন,—আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় একান্ত কাতর বিষণ্ণ বলিয়াই মনে হয়। ভুবনেশ্বরী আসিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁরে, মা ত পশ্চিমে যাচ্ছে। মাকে ছেড়ে থাকতে পার্‌বি ত তুই? মার জন্যে মন কেমন করবে না?

নিখিল এ কথায় একেবারে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমি যাব।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—ছি বাবা, এখন লেখাপড়ার সময়। এখন লেখাপড়া করতে হয়। মার অসুখ কি না, তাই মাকে নিয়ে আমি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি। মা বেশ সেরে-টেরে আসবে—আবার তখন মার সঙ্গে থাকবে—কেমন? এখন সেখানে গেলে তোমার লেখাপড়া বন্ধ যাবে যে ধন!

নিখিল অভিমানের সুরে বলিল,—কেন, সেখানে বই নিয়ে গেলে বুঝি পড়া হয় না? মাষ্টারমশাই ত সঙ্গে যেতে চাইছেন।

এ কথার কি জবাব দিবেন ভুবনেশ্বরী তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি নিজের মনে বুঝিতেছেন ত,—ঐটুকু ছেলে, ভারী তার পড়া যে দু'মাস বাহিরে গেলে একেবারে সব রসাতলে যাইবে, বটে! তবু এ ব্যাপারে সমস্ত কদর্য্যতার দিকটা দুই পায়ে মাড়াইয়া ধরিয়া তিনি খুব হাল্‌কা সহজ ভাবেই তাহার সমাধান করিয়া দিতে চাহিলেন।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বাবা যে একলা থাকবে এখানে, তুমি কাছে না থাকলে বাবাকে দেখবে কে?

নিখিল বলিল,—বেশ ত, বেশ ত, সব যাও, আমায় নিয়ে যেয়ো না। আমি এখানে না ঘুমিয়ে রাত্তিরে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে খুব অসুখ করব'খন। দেখো—বেশ করে হাওয়া খাওয়া হবে তোমাদের।

ভুবনেশ্বরী তখন চুপ করিয়া নিখিলকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত চাপড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণটা একেবারে ডাক ছাড়িয়া বিরাট ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কোনমতে সে কান্নার বেগ চাপিয়া একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—ছি দাদা, ও সব কথা বল্‌তে আছে কি! তুমি বড় হয়েছ, বুদ্ধি হয়েছে—এখন এরকম বায়না করে কি? তাহলে মারও অসুখ সারবে না। সেটা কি ভালো হবে? তখন কে আদর করবে, গল্প বলবে? কার কাছে বায়না করবে, মাণিক?

নিখিল আর কোন কথা বলিল না; দিদিমার বুকে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

১৫

নির্দ্দিষ্ট দিনে কয়েকজন দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া ভুবনেশ্বরী ও সুষমা দেওঘর রওনা হইলে ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিখিল চুপিচুপি সুষমার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুইটাকে ফুলাইয়া রাঙা করিয়া তুলিয়া শেষে সেই

বিছানাতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। অভয়াশঙ্কর কি-একটা কাজে ঘরে আসিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন. পরে নিঃশব্দে বাহিরে গিয়া বারান্দার রেলিঙ্ ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—আকাশে একরাশ নক্ষত্র অজস্র জুঁই ফুলের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক-টুক্‌রা কালো মেঘের আড়ালে ত্রয়োদশীর ফুটন্ত চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে; তাহার একটা আলোর আভাষ চারিদিকে আধ-জাগা-গোছ ছড়াইয়া রহিয়াছে। অভয়াশঙ্করের মনে হইল, সমস্ত আকাশটায় যেন এই বিচ্ছেদের করুণ শোকের ছোপ্ লাগিয়াছে—সারা বাহিরটা তাই বেদনার অশ্রু কোনমতে স্তম্ভিত রুদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া আছে! তিনি ভাবিলেন, —তাইত, কাজটা বড় রূঢ় হইয়াছে, বটে! নিখিলকে এখানে এমন করিয়া ধরিয়া রাখা ঠিক হইল না ত! বেচারী সুষমা—বেচারা নিখিল! একটা ক্রূর ঈর্ষার বশে দুই-দুইটা প্রাণীকে এই বিচ্ছেদের কষ্ট দিলাম! ঈর্ষা? ঈর্ষা ছাড়া আর কি! পড়াশুনার কষ্ট প্রভৃতি কথাগুলা—ছল, ছল, শুধু ছল! উহারা কোন দোষ করে নাই ত। তবে—তবে? অভয়াশঙ্করের মনে বিবেক তীব্র একটা কশাঘাত করিল!

ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় নিখিলের পাশে শুইয়া অভয়াশঙ্কর তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন,—তাহার ঘুমন্ত মুখে বারবার চুম্বন করিলেন। নিখিলের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে ডাকিল,—মা।

—বাবা—বলিয়া অভয়াশঙ্কর আবার পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন; ডাকিলেন,—নিখিল।

নিখিল ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—দেওঘরে যাবে নিখিল?

নিখিল সন্দিগ্ধভাবে বাপের মুখের পানে চাহিল,—কোন কথা বলিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এদের জন্যে মন কেমন করছে?

নিখিল বাপের কথায় সহানুভূতির সুর পাইয়া বলিল,—করছে। চোখ তাহার ছল-ছলিয়া উঠিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন, - দেওঘরে যাবে?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, যাইবে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বেশ, যাব, আমরা দুজনেই যাব। এখন এসো দেখি, দুজনে আমরা একসঙ্গে গিয়ে খেয়ে আসি।

নিখিল অভয়াশঙ্করের সঙ্গে খাইতে চলিল। মুখে কিছু দিতে পারিল না—বুকের মধ্যে কি একটা বেদনা ঠেলিয়া উঠিয়া কণ্ঠনালীটাকে চাপিয়া ধরিতেছিল—দুই গ্রাস গিলিয়া, দুইবার ওয়াক্ তুলিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—থাক্, আর খেতে হবে না। শুধু দুধটুকু খেয়ে নাও।

মানদাঠাকুরাণী আসিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—এসো ধন, আমি খাইয়ে দি, এসো। কেমন গল্প বলব'খন। খাও ত দাদা—বলিয়া একগ্রাস মুখে দেওয়াইতে গেলেন, নিখিল সেটা তুলিয়া ফেলিল।

অভয়াশঙ্কর একেই বিরক্ত হইয়াছিলেন—এই যে ছেলেটা একলা ঘরের মধ্যে পড়িয়া

ছিল, খাওয়া-দাওয়া করে নাই, তা এ লোকগুলার সেদিকে হুঁসও নাই! তিনি নিজে তাহাকে খাওয়াইতে না আনিলে নিখিলের খাওয়াই হইত না! সুষমা থাকিলে এগুলায় কোন গোল বাধিত না! হায় রে! ইহারা করিবে ছেলে মানুষ, ছেলের তদ্বির! নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই চব্বিশ ঘণ্টা সকলে মত্ত! ইহার উপর মানদাঠাকুরাণীর এই মন-জোগানো ভাবের আদর দেখিয়া রাগিয়া বলিলেন,—বলচি, ও আর খাবে না, শুধু দুধটুকু থাক্,—না, আবার গিলিয়ে দিতে এল! একটা ধমক দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—যাও, তোমরা ওকে বিরক্ত করো না। ওর যা খুসি থাক্—জোর করে গিলিয়ে দিতে হবে না।

ধমক্ খাইয়া মানদাঠাকুরাণী সরিয়া পড়িলেন, নিখিল দুগ্ধ পান করিয়া পিতার সঙ্গে উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

১৬

দেওঘরে যে বাঙলাখানা লওয়া হইয়াছিল, সেটা নন্দন-পাহাড়ের কাছাকাছি; বেশ ঝর্‌ঝরে বাঙলা; দেখিয়া সুষমা বলিল,—পিশিমা, নিখিল এলে কি চমৎকারই হোত! এই খোলা জায়গায় পাহাড়-টাহাড় দেখে ভারী খুসী হত সে।

ভুবনেশ্বরী কোন কথা বলিলেন না। সুষমা বলিল,—কেমন এক সঙ্গে সকলে বেড়িয়ে বেড়াতুম। এ মিছে আসা হোল, পিশিমা।

তবুও সকালটা বিকালটা গোলমালে বেড়াইয়া এক রকম কাটিয়া যাইত; দুপুর ও সন্ধ্যার পর হইতে সময়টা অত্যন্ত ভারী হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিত। একান্তে নির্জ্জন ঘরে দুইটি রমণী তখন প্রাণের মধ্যকার সমস্ত বেদনা নিঃশেষে নিংড়াইতে বসিত—তাহার তীব্র বিষাক্ত রসে দুইজনের মনই জর্জ্জর অবসন্ন হইয়া পড়িত। দুইজনের চিন্তা একই—নিখিল এখন কি করিতেছে? কাহার কাছে আছে? কে দেখিতেছে? আহা, সে হয়ত মুখখানি চূণ করিয়া খোলা জানালাটির সামনে বসিয়া আছে—জানালার বাহিরে ওধারে অনিবিড় বন স্তম্ভিত হইয়া তাহার শিশুচিত্তের নির্ব্বাক বেদনার সাক্ষ্য লইতেছে! আহা, বেচারা নিখিল! বাছা রে!

সেদিন বৈকালের দিকে নন্দন-পাহাড়ের নীচে দুই-তিনটি তরুণী বাঙালী-নারী ছেলে-মেয়ে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছিল। ছেলে-মেয়েরা চঞ্চল হরিণ-শিশুর মত নাচিয়া নাচিয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল, আর তরুণীরা তৃণশয্যায় বসিয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিল। এই অপরিচিত ছেলেমেয়েদের খেলার লীলা-ভঙ্গে তাহার ক্ষুব্ধ মন কোন্ সুদূর পল্লীগৃহে অমনি একটি লীলা-চঞ্চল অন্তরের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিরস বদনে একান্ত মন্থর পঙ্গুর মত কোন্ নির্জ্জন কোণে সে কাতর হইয়া পড়িয়া আছে! সুষমার মন এক অসহ্য যাতনায় ভরিয়া উঠিল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—চল্ না মা, বস্‌লে কেন! চল, একটু পাহাড়ের উপর বেড়িয়ে আসিগে।

সুষমা বলিল,—আজ আর পারচি না পিসিমা, এইখানেই একটু বসো, রোজই ত পাহাড়ে উঠচি।

ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, এই ছেলেমেয়ে-গুলিকে দেখিয়া সুষমার নিঃসঙ্গ মন মাতৃত্বের ক্ষুব্ধ বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন,—তবে বেশ এইখানেই বসি।

সুষমা বলিল,—ওরা কারা, পিশিমা? ওদের চেনো কি? ঐ দেখো, আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। ভাব করলে হয় না? এখানে ত নেহাৎ একলা রয়েচি, এসে অবধি কারো সঙ্গে ভাব-সাব হল না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তা মন্দ কি!

তখন দুইজনে উঠিয়া তরুণীদের কাছে গিয়া বসিলেন। তিনটি তরুণী; দুইটি সধবা, একটি বিধবা; আলাপ করিয়া জানিলেন,—সধবা তরুণী দুইটি সম্পর্কে জা,—ননদটি বিধবা, বয়স অল্প। কলিকাতায় বাড়ী—দুই ভাই পরিবার লইয়া চেঞ্জে আসিয়াছে। কনিষ্ঠা জা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী,—নিজের ছেলেপিলে হয় নাই, সপত্নীর একটি পুত্র ও একটি কন্যাকে সেই মানুষ করিতেছে। ছেলে-মেয়ে উহাকেই নিজের মা বলিয়া জানে।

সুষমা ছোটটিকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি ভাই?

ছোট জা বলিল,—আমার নাম মণিকা।

ভুবনেশ্বরী সুষমার পরিচয়টুকুও সংক্ষেপে বলিলেন; শুনিয়া বড় জা বেলা বলিল,—ওমা, ছেলেকে রেখে এসেছ! আহা, বেচারীর কত মন কেমনই করছে, না জানি!

ভুবনেশ্বরী পাকা গৃহিণী; তিনি ভিতরকার ব্যাপারগুলাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বলিলেন,—ছেলে বড় হচ্ছে, এখন লেখা-পড়ার সময় ছুটোছুটি করলে লেখা-পড়া-মাটী হবে যে মা।

বেলা বলিল,—তা হোক্। ছেলের শরীর-মন আগে, না, লেখাপড়া আগে? আপনার জামাই ভালো কাজ করেন নি কিন্তু। এই যে আমার দেওর, ঐ ছেলে-মেয়েদুটি তার চোখের তারা বললেও চলে, তা এই মণিকা যখন বাপের বাড়ী-টাড়ী যায়, কখনো তাদের আট্‌কে রাখে না, সঙ্গে পাঠায়। বাপের বাড়ীতে মণিকা অমন একমাস অবধি কাটিয়ে আসে। আমাদের কত মন কেমন করে, বলি, ছেলেটি ত আমার কম ন্যাওটো নয়—তা আমি যদি বলি, অমিয় আমার কাছে থাকুক, ত তাতে আমার দ্যাওর বলে,—না বৌদি, তুমি বোঝোনা, ওর সঙ্গ ছাড়া থাকলে ক্রমে একদিন বুঝে ফেলবে, বুঝি, এ আমার মা নয়, সব ছেলেই মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, আমিই বা থাকি না কেন! আসল গাছের ডালটি নয় যখন, এক গাছের ডাল অন্য গাছে বেঁধে দিয়েচি,তখন তিলেক ছাড়াছাড়ি করা ঠিক নয়, —এক সঙ্গে মিশে বাড়বে কেন! সে ঐ ছেলে-মেয়ের উপর মণিকে অবাধ কর্ত্তৃত্ব দিয়েছে। ব্যবহারে ঠিক পেটের ছেলের মত,আদর-শাসন, যখন যা দরকার, করবে, তাতে কখনো হাত দেয় না। বরাতে এ রকম অবস্থা হলই যখন, তখন মানুষের হাতে গড়া সম্পর্কটাকে বড় করে তুলতে হলে, চারধার থেকে জোগানও তেমনি দেওয়া চাই বৈ কি, নাহলে কোথায় একটু আল্‌গা থেকে সমস্ত বাঁধনটাকেই ঢিলে করে আচম্‌কা একদিন খুলে ফেলতে পারে!

ভুবনেশ্বরী মনে মনে এ কথা খুবই বোঝেন, —কিন্তু অভয়াশঙ্কর যে কেন এ বিষয়ে রাশ-টাকে একটু ঢিলা করেন না, এইটিই তাঁর সব চেয়ে বড় দুঃখ। মেয়ে ত গিয়াছেই—

কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাকে ফিরিয়া পাইবার যখন কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন তাহার যে স্মৃতি, যে চিহ্নটুকু বর্ত্তমান আছে, সেটাকে অটুট খাড়া করিয়া রাখিতে গেলে আশে-পাশে যে কৃত্রিম খুঁটির আগড় বাঁধিয়া দেওয়া দরকার,সেগুলাকে বেশ কায়েমী করিয়া তোলাও যে একান্ত দরকার, নহিলে যেটুকু আছে, সেটুকুকে তেমন খাড়া রাখা যাইবে কেন ?

সুষমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুদূর আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ভাগ্যবতী মণিকার পাশে আপনাকে তাহার এত ক্ষুদ্র মনে হইতে লাগিল, যে ইচ্ছা হইতেছিল, এখান হইতে উঠিয়া ছুটিয়া সে তাহার গৃহের কোণে গিয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু পা দুইটা পাথরের মত ভারী বোধ হইতেছিল,—নাড়া যায় না !

নানা গল্পে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায় হইলে সকলে গৃহে ফিরিল। ফিরিবার সময় ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—আমাদের বাড়ী এসো মা একদিন, বেশী দূরে ত নয়। এই কাছেই—ঐ যে সাহেবদের বাংলাটা আছে, তার ঠিক পাশেই। সামনের ফটকে পাথরে লেখা আছে, মার্টল্ লজ্। সেই বাড়ীতে আমরা থাকি, ছেলেপিলে নিয়ে এসো, মা—নেহাৎ একলা আছি, আমরা।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া সুষমা সেদিন গুম্ হইয়া রহিল। চোখের সামনে তাহার সুদীর্ঘ জীবন-পথটা প্রচণ্ড মরুভূমির মতই ধূ-ধূ করিতে লাগিল ! দুঃখ-ক্লান্তি ঘুচাইতে মাথা গুঁজিবার জন্য কোথাও এতটুকু আশ্রয় নাই,—সুদীর্ঘ পথে এমন একটা শ্যামল বৃক্ষগুল্মও কোথাও দেখা যায় না, যাহার ছায়ায় দুই দণ্ড লুটাইয়া পড়িয়া সে একটু বিশ্রাম করে! প্রাণ-ঝল্‌সানো তপ্ত রৌদ্রে চারিধার অম্‌নি খাঁ খাঁ করিতেছে ! হায়রে, এখানে কোথায় মিলিবে স্নেহ-শীতল স্নিগ্ধ একতিল আশ্রয়-ভূমি !

ভুবনেশ্বরী ডাকিলেন,—সুষু —

—কেন পিশিমা ?

—এখানে থেকে আর কি হবে ! খুব হাওয়া খাচ্ছিস্ ! চল্, বাড়ী যাই। তোকে সেখানে রেখে আমিও বেরিয়ে পড়ি। যা দেখ্‌চি, তোকে দগ্ধে মরতে হবেই,—আমিই তার জন্যে তোর চারিধারে বেড়া আগুন নিজের হাতে জ্বেলে দিয়েছি। তবু জেনে জেনে দিইনি মা, এইটুকু ভরসায় ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইচি। তা বলে, তুই দিবারাত্রি জ্বলবি, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখব, প্রাণটাকে এত কঠিন করে এখনো গড়ে তুলতে পারিনি।

—তুমি কোথায় যাবে, পিশিমা ?

—তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব। আর-জন্মে অনেক পাপ করেছিলুম মা, তাই এ-জন্মে এত যন্ত্রণা ভোগ করছি। একটা মেয়ে—সেটাকে খুইয়ে সব শোক-দুঃখের জড় মেরেই বসেছিলুম ত, আবার কোথা থেকে তোকে ধরে এনে কি এ নতুন শোক-দুঃখ গড়ে তুললুম, বল্ দেখি !

—তুমি চলে যাবে পিশিমা, নিখিলের কথা ভাবচ না ?

—নিখিল ! কে সে আমার, মা ? কাঁটা একটা—দিবারাত্রি খচ্ খচ্ করছে। কাজ নেই মা আর আমার নিখিল-টিখিলকে জড়িয়ে।

নিখিল যার ছেলে, সে তাকে দেখবে'খন। এই ত আমি তাকে দেখতে এসেছিলুম,পারলুম কি দেখতে! ভগবান্ সে অধিকার দেন্‌নি ত মা, আমাকে! তার বাপ বেঁচে থাকুক, শত বর্ষ পরমায়ু নিয়ে, আমার ও পরের ধনে গিঁট বেঁধে দিতে গিয়ে কাজ কি! তবে মাঝ থেকে তোকে যে আগুনে ফেলেচি, এইটিই হয়েছে আমার মস্ত জ্বালা।

—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল, পিশিমা, তোমাকে দেখব-শুনব।

—তা কি হয়, মা! তোর এই বয়স—যৌবনেই যোগিনী হবি কি? সংসারের কোন স্বাদই ত পেলিনে!

—সংসারের কোন স্বাদ আমি পেতেও চাইনে পিশিমা। ভগবানের বোধ হয় তা ইচ্ছেও নয়। নাহলে পিশিমা, ভাবো দেখি, ছেলেবেলা থেকে কি ঘটনা-চক্রেই না পড়ুচি! তা ছাড়া সংসারও আমায় চায় না, পিশিমা—তুমিও ত স্বচক্ষে সব দেখেচ,—আমার জন্যে সংসারে কারো কোথাও এতটুকু আটকাবে না।

ভুবনেশ্বরীর প্রাণটা দুঃখে গলিয়া গেল। করুণ দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—তবু মা, আশা রাখো। এর মধ্যেই নিরাশ হয়ো না। সংসার মস্ত পরীক্ষার জায়গা—ভারী ধৈর্য্য নিয়ে চল্‌তে হয় এখানে—একটুতে অধীর হলে সংসার ছারে-খারে যায়, মা।

—কিন্তু এ কি একটু, পিশিমা?

পিশিমা কোন জবাব না দিয়া সুষমার মুখের পানে চাহিলেন, দেখিলেন, সুষমার দুই চোখে জল অমনি টল্‌টল্ করিতেছে। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—সংসার ছেড়ে আমার সঙ্গে ঘুরতে যাবি, বলছিস—তোর নিখিলের মায়া ছাড়তে পারবি?

মৃদু হাসিয়া সুষমা বলিল,—নিখিল আমার কে পিশিমা? তার উপর আমার কি জোর, কিসের অধিকার আছে যে—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না,—মুখের সে মৃদু হাসিটুকুও অদৃশ্য কিসের আঘাতে মুহূর্ত্তে প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটির মতই দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল—গলার স্বরও কিসের বেদনায় ভারী হইয়া বাধিয়া গেল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—নিখিল তোমার কে, তা তুমি জানো না মা, আমিও জানিনা—তোমার অন্তর্য্যামী যিনি, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—না মা, আমি মিথ্যা কথা বলছিলুম এতক্ষণ। আমার মন এখনো স্বার্থের বিষে ভরে আছে, তাই তোমায় সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারব না। তোমাকে থাকতেই হবে সুষু। আমার নিখিলকে ঐ একরোখা জামাই আর তার বাড়ীর সেই রাক্ষসীগুলোর হাতে রেখে আমি কোথাও নড়তে পারব না। তোমার যত কষ্টই হোক্, তুমি সব সয়ে নিখিলেকে নিয়ে থাকবে,—বল, থাকবে? আমার সব-হারা অন্তরের আশীর্ব্বাদে, চিরদিন তোমার এ দুর্দ্দশা কখনোই থাকবে না সুষু, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। যদি আমি যথার্থ হিঁদুর মেয়ে হই, যদি সতী হই, তাহলে আমি বলচি, আজ যে-পুরীতে তোমায় দু'পায়ে সকলে থেঁৎলে বেড়াচ্ছে, সেই পুরীই আবার একদিন মাথায় তুলে তোমায় সেখান-

কার সিংহাসনে বসাবে, তুমি সে পুরীতে রাজরাজেন্দ্রাণী হয়ে বসবে! এ যদি না হয়, ত তোর পিশির সতীর গর্ভে জন্ম হয়নি, জানিস্ আর জানিস্, তোর পিশি নিজেও অসতী।

উত্তেজনায় ভুবনেশ্বরীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিয়াছিল। সুষমা তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল,—তুমি ক্ষেপেছ পিশিমা, এ-সব কি বলছো! ছি ছি, চুপ কর।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—না মা, আর পারি না। যেদিন অভয়ের ওখানে তোমাকে দেখতে ঢুকেছিলুম, সেইদিন থেকে সব দেখে-শুনে ভিতরে ভিতরে গুমে গুমে জ্বলে ছাই হচ্ছিলুম, আর চুপ করতে পারলুম না। তোর কাছে আমি মস্ত অপরাধ করেছি—কিন্তু তাও জানি, তোর মন বড় উঁচু,—এ পৃথিবীর কাদা-মাটীতে গড়া নয়,—আমার জহুরীর চোখ মা, প্রথম দিন তোমায় দেখেই এ আমি বুঝতে পেরেছিলুম। লীলাকে হারিয়ে আমার প্রথম বড় ভাবনা হয়েছিল, এমন একজনকে এনে তার জায়গায় বসাবো, যাতে আমার সব বজায় থাকে। আমায় তুই চিনতিস্ না—ভাবতিস্, পিশিমা তোকে কত আদর-যত্ন করে—কিন্তু ঐ এক স্বার্থের জন্যেই তোকে এই বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিয়েছিলুম—বুকে রেখেওচি এখনো, রাখবোও। জানতুম, পুরুষ মানুষের বৌ-মরার শোক দু'দিনের। জানতুম, দু'দিন, নয় দশদিন, নয় দশমাস, নয় দু'বছর পরে অভয় আবার বিয়ে করবেই, তখন কোথাকার কে-একটা এসে সব ভাসিয়ে একাকার করে দেবে, তাই তাড়াতাড়ি তোকে তার হাতে অমন করে গছিয়ে দিয়েছিলুম। আমি যথার্থ বল্‌চি মা, যতদিন বাঁচব, তীর্থে তীর্থে যত দেবতার কাছে পরকালের কোন প্রার্থনা জানাবো না—নিজের কোন কামনা নয়, শুধু এই প্রার্থনা করবো, যেন সংসার তোকে চিন্‌তে পারে, চিনে তোর যোগ্য মর্য্যাদা তোকে দেয়—ঐ সংসারে আমার নিখিলকে কোলে নিয়ে তুই রাজরাজেন্দ্রাণী হয়ে বস্‌বি একদিন! তোর পিশিমার এ প্রার্থনা পূর্‌বেই সুষু, সে সতীর গর্ভেই জন্মেছে মা, আর নিজেও সে সতী।

১৭

সুষমার দেওঘরে আসিবার তিন মাস পরে হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা অভয়াশঙ্করের কাছ হইতে এক টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত—নিখিলের অসুখ, সকালে এখনি ফিরিয়া এসো।

ঠাকুর-দেবতার পায়ে প্রাণের অজস্র মিনতি ঢালিয়া সুষমা ও ভুবনেশ্বরী আসিয়া ট্রেনে উঠিল। উদ্বেগে ভুবনেশ্বরীর প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল। বুঝি, অবহেলার মস্ত পাপের ফল এইবার ফলিতে বসিল! ভগবান নিরপরাধীর উপর এ অত্যাচার সহিবেন কেন? সুষমা শুধু কাতর অন্তরে ডাকিতে লাগিল—ঠাকুর, হে ঠাকুর—

সন্ধ্যার পর প্রকাণ্ড বাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ী থামিলে সুষমা সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বিরাট পুরী কি এক দুর্ভাবনায় গুম্ হইয়া রহিয়াছে,—আর তাহার অন্তর ভেদ করিয়া নিঃশব্দতার একটা ভৈরব হুঙ্কার যেন বিশ্রী সাড়া দিতেছিল! ভুবনেশ্বরী ও সুষমা পাগলের মত পুরী প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিতেই সম্মুখে দামু চাকরকে দেখিয়া বলিলেন,—খপর কি রে, দামু?

দামু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—খোকাবাবুর বড্ড অসুখ দিদিমা। কেবল মাকে ডাকছে, মার কাছে যাবে বলে কেবলি কেবলি বায়না ধরছে।

—কি অসুখ, বল্?

—খুব জ্বর। আজ সাতদিন একজ্বরী, দিদিমা। কলকেতা থেকে দু'জন বড় ডাক্তার এসে মাথার শিয়রে বসে আছে। ঘড়ি-ঘড়ি ওষুধ খাওয়াচ্ছে।

ভুবনেশ্বরী ও সুষমা ছুটিয়া নিখিলের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ঘরে লোক গম্ গম্ করিতেছে, আর বিছানার উপর ঐ জীর্ণ পাতের মত ছোট্ট দেহখানি পড়িয়া—কপালে পটী আঁটা, মাথায় রবারের ব্যাগ ধরিয়া অভয়াশঙ্কর পাশে বসিয়া রহিয়াছেন—ঐ ত নিখিল! আহা, বাছারে!

সুষমা কোন বাধা না মানিয়া একেবারে তাহার শিয়রে গিয়া বসিল—অভয়াশঙ্করের হাত হইতে রবারের ব্যাগ কাড়িয়া খুব সহজভাবেই নিজের হাতে লইল। অভয়াশঙ্কর নিঃশব্দে তাহার হাতে ব্যাগ ছাড়িয়া নিতান্ত অপরাধীর মত একটু সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখের পিছনে অশ্রুর একটা স্তূপ জমাট বাধিয়া ঠ্যালা দিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরী জামাতার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বলিলেন,—আছে ত, বাবা?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আজ একটু ভালো আছে। জ্বরটা কমছে।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বাঁচবে?

কাছেই যে ডাক্তার বাবুটি মেজর গ্লাসে ঔষধ ঢালিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,—ভোর নাগাদ জ্বর ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে। ভাবনা নেই—সেরে যাবে বৈকি! তার উপর ওর মাকে এনেছেন ত—মার জন্যেই ভাবনা কি না! সেই ভাবনা থেকেই ত অসুখ।

শুনিয়া ভুবনেশ্বরী এমন এক কঠিন দৃষ্টিতে অভয়াশঙ্করের পানে চাহিলেন, যে সে দৃষ্টির অর্থ অভয়াশঙ্কর মর্ম্মে, মর্ম্মে বুঝিলেন—সে দৃষ্টি জ্বলন্ত চাবুকের মতই তাঁহার হাড়ে গিয়া বিঁধিল।

অনেক রাত্রে অভয়াশঙ্কর বলিলেন—সুষমা, তুমি এসে মুখ-হাত অবধি ধোওনি, যাও, হাত-পা ধুয়ে মুখে কিছু দাও গে, দিয়ে এখানে এসে বসো। ব্যাগটা আমায় দাও ততক্ষণ। বরফটাও ফুরিয়ে গেছে—বলিয়া ব্যাগ লইবার জন্য তিনি হাত বাড়াইলেন। সুষমা সেদিকে একটুও লক্ষ্য করিল না—চকিতের জন্য একবার উঠিয়া জল ফেলিয়া ব্যাগে আবার বরফ পুরিয়া নিখিলের মাথায় সেটা চাপিয়া ধরিয়া বসিল। চোখের অপলক দৃষ্টি নিখিলের মুখের উপর।

ভুবনেশ্বরী নিখিলের কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন,—এসে যা দেখেছিলুম, তার চেয়ে নরম পড়েছে না জ্বরটা?

সুষমা কপালে হাত দিয়া বলিল,—হাঁ।

মানদা ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন,—তুমি উঠে কিছু মুখে দিয়ে এসো বৌমা, আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, আমরা রয়েছি ত!

দুই চোখে তীব্র ঘৃণা ভরিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—সে বরং তুমি ঘুমোওগে বেয়ান, খেয়ে দেয়ে একটু না গড়াতে পেলে তোমার আবার অসুখ হতে পারে!

এ কথার পর মানদা ঠাকুরাণী ঘর হইতে সরিয়া পড়া একটু কঠিন ভাবিয়া প্রথমে

খানিকটা সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে মেঝেয় চুপ করিয়া বসিলেন, এবং আরো কিছুক্ষণ পরে গা গড়াইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ভোরের দিকে—মা—বলিয়া নিখিল চোখ মেলিল। বাহিরে তখন ভোরের পাখী প্রভাতের বন্দনা-গান সবেমাত্র জাগাইয়া তুলিয়াছে। নিখিল চোখ খুলিয়া ডাকিল,—মা।

সুষমা বলিল,—এই যে বাবা, আমি।

—তুমি এসেচ, মা?

—এই যে আমি এয়েচি, বাবা।

নিখিল খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সুষমাকে দেখিল, পরে তাহার একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, তুমি আমার সত্যি মা নও? তোমার পেটে আমি হইনি?

সুষমার বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বাপ্‌রে, এ কি কথা! সুষমা বলিল—ছি বাবা, আমিই ত তোমার মা—আমার পেটেই ত হয়েছ তুমি।

মানদাঠাকুরাণী তখন ভোরের হাওয়ায় ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন,—দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া ঘুম ছাড়াইবার অভিপ্রায়ে খোলা জানলার পানে চাহিয়া আছেন।

নিখিল বলিল—না মা, তুমি মিছে কথা বল্‌ছ। তুমি যদি সত্যি মা, তবে আমায় কেন পশ্চিমে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাওনি? হ্যাঁ, মিছে কথা বল্‌চ। আমি জানি—আমি আর-এক মার পেটে জন্মেছি, আমার ভালো মা, ঐ ছবির মা,—আমি সব জানি।

সুষমা বলিল,—কে বলেচে ও কথা? ছি, বলতে নেই—তুমি আমার এই পেটেই হয়েচ, আমিই তোমার মা—

নিখিল আব্দার তুলিয়া বলিল,—না, তুমি আমার মা নও, সেজ ঠাকুমা বলে,—তুমি সৎমা। আমি বুঝি বোকা, কিছু জানি না?

সুষমা তখন ভর্ৎসনার স্বরে বলিল,—ছি নিখিল, পাপ হয়, মাকে ও কথা বল্‌তে নেই। তোমায় যে বলেচে, সে জানে না, মিছে কথা বলেছে—বলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে সে মানদা ঠাকুরাণীর পানে চাহিল।

অভয়াশঙ্করও সেই মুহূর্ত্তে দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া মানদার পানে চাহিলেন—সে দৃষ্টি মানদাকে নিমেষে একেবারে দগ্ধ করিয়া দিল। মানদা দ্রুত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অভয়াশঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন—পাজী, হতভাগা মাগী—যার খাবে, তারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে! শয়তানী!

সুষমা তাড়াতাড়ি বলিল—ছি ছি, ও কি বলছ গো? চুপ কর। তোমার ঘরে এই রোগা ছেলে,—এখনি গাল দেবে, শাপ-মন্যি দেবে—!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথ*

য়ুরোপ যাত্রার কারণ

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর মাঝে মাঝে ঐ প্রাইজের সর্ত্ত অনুসারে নোবেল-বক্তৃতা দিবার জন্য কবির নিমন্ত্রণ আসিত। পরে য়ুরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও নিমন্ত্রণ-লিপি আসিতে লাগিল। যতদিন য়ুরোপের মহাযুদ্ধের অবসান না হয়, ততদিন এই সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা দুরূহ ছিল। তদনন্তর কেবলই যে এই সকল য়ুরোপীয় ভক্তবৃন্দের কামনা পূর্ণ করার সুযোগ আসিল তাহা নহে, কবিবর সমর-শশ্মানভূমি য়ুরোপে নব-নির্ম্মাণ কার্য্য কেমন চলিতেছে তাহা দেখিবারও সুবিধা পাইলেন।

যাত্রারম্ভ

১৯২০ সালের ১৫ই মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ বোম্বে হইতে Merca জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। সমুদ্রবক্ষে বাসকালে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। ঐ জাহাজে আলোয়ারের রাজা, সার করিমভাই ও শ্রীযুক্ত এস, আর, বোমান্‌জি তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। [আলোয়ারের মহারাজা কবির প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আসিতেন। কবির ঐ সময়ে লিখিত যে পত্রাবলী ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, যে তিনিও মহারাজার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।]

বিলাত

বিলাতে পৌছিলে ১৭ই জুন তারিখে শ্রীযুত এম্, এন্, ব্যানার্জ্জি মহাশয় Y. M. C. A.-গৃহে একটি অভ্যর্থনা-সভার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ উক্ত সভায় জাতীয় পরিচ্ছদে যোগ দিয়াছিলেন, এবং খাঁটি দেশীয় ধরণে জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল। ১৯শে জুন তারিখে তিনি অক্সফোর্ডে যান ও তথায় ভারতীয় ও ইংরাজ ছাত্রবৃন্দের সম্মিলিত সভায় "তপোবনের বাণী" শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভায় মেসোপটেমিয়ার খ্যাতনামা কর্ণেল লরেন্স উপস্থিত ছিলেন। ২রা জুলাই তারিখে Y. M. C. A.—গৃহে রাইট অনারেবল মিঃ ফিশারের সভাপতিত্বে তিনি "ভারতীয় সাধনার একটি কেন্দ্রস্থান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাকালে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যানের মত মানস-তৃপ্তিকর সামগ্রী সত্যই দুর্ল্ভ।

খ্যাতনামা ইংরাজ মনীষি মিঃ ডিকিন্‌সনের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ ২৮শে জুলাই তারিখে কেম্ব্রিজে যান, সেখানে সুপরিচিত বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যাপক পরলোকগত মিঃ এণ্ডার-সন তাঁহার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে ছিলেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের একতাসাধন

---

* ইংরাজী 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ-লিখিত বিবরণের অনুবাদ।

সমিতি'র উদ্যোগে তাঁহার কয়েকখানি নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে জুলাইএর শেষ সপ্তাহটা অতিবাহিত হইয়াছিল।

এইখানে অবস্থান কালেই ক্যাক্সটন-হলে যে সম্বর্দ্ধনা-উৎসব হয়, তাহাতে একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী কবির উদ্দেশে রচিত লরেন্স বিনিয়নের একটি কবিতা পাঠ করেন। রয়টার এবং 'ইংলিশম্যান'-পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা এই অনুষ্ঠানের বিবরণ এদেশে তারযোগে জানাইয়াছিলেন।

ফ্রান্স

৭ই আগষ্ট তারিখে কবিবর ফরাসী দেশে আসিয়া পারিসে একমাস যাপন করেন। এই সময়েই কবিবরের সঙ্গে মসিয়ে বের্গসঁ ও মসিয়ে সিলভ্যাঁ লেভির দেখা-সাক্ষাৎ হয়—এ সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে যথাকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে পুনরায় জর্ম্মাণী ও হল্যাণ্ড হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিল। মার্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রুডল্‌ফ্‌ তাঁহাকে ২৪শে আগষ্ট তারিখের পত্রে একস্থানে লিখিতেছেন—

কয় সপ্তাহ হইল আমি আপনাকে জর্ম্মাণীতে আসিবার নিমন্ত্রণপত্র পাঠাই; বিশেষ করিয়া ইজ্‌ন্যাক নগরীস্থ 'খ্রীষ্টিয়ান সুহৃদ্-সংঘ' নামক সভার ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে আপনাকে আহ্বান করি। ঐ সঙ্গে আমার বন্ধু ডার্মস্ট্যাড্‌ সহরের ডাঃ ফ্রিক্‌কে বলিয়া পাঠাই যে 'সর্ব্বধর্ম্ম-মিলন-সংঘ' স্থাপনের জন্য উক্ত সহরে ৬ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমরা যে সভা করিতেছি, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য আপনাকে যেন আহ্বান করা হয়। আমি পুনরায় আপনাকে আমার সাদর নিমন্ত্রণ জানাইতেছি। আইজন্যাক্‌ সহরে ঐ তারিখে ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতিশীল একদল বন্ধুর সহিত আপনার মিলন হইবে, তাঁহারা আপনার মুখে আপনার ধর্ম্মমত ও দার্শনিক চিন্তা অবগত হইবার জন্য আপনাকে আদরে বরণ করিয়া লইবেন।"

কবিবরের জর্ম্মাণীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ঐ সময়কার রয়টারের সংবাদে যে একটু ইঙ্গিত ছিল, তাহা কতখানি অসঙ্গত তাহা দেখাইবার জন্য জর্ম্মাণী হইতে এই আন্তরিকতাপূর্ণ নিমন্ত্রণ-পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইল। ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এই যে, যখন ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স হইতে জর্ম্মানি যাত্রা করিবার জন্য টিকিট ক্রয় করিতে পাঠাইলেন, তখন সীমান্তদেশের তদানীন্তন বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে টিকিট লইতে হইলে যে অন্ততঃ এক সপ্তাহকালের নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন ইহাই তাঁহাকে জানান হয়, কারণ তৎপূর্ব্বে নাকি কি কি বিষয়ে খবর লওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কবিবরের হল্যাণ্ড পৌছিবার কথা থাকায় তিনি এক সপ্তাহ-কাল অপেক্ষা করিতে পারেন নাই এবং এই মর্ম্মে জার্ম্মাণ-বন্ধুদিগকে তার করিয়া পাঠান। এ দেশের কোন কোনো ন্যাশন্যালিষ্ট সংবাদপত্রে যে মন্তব্য বাহির হয়—যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই এ বিষয়ে প্রতিকূলতা করিয়াছেন—তাহাও সত্য নহে; কারণ চাহিবা-মাত্র বিলাত হইতে তাঁহাকে সকল দেশের পাসপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল।

ওলন্দদেশে

১৮ই ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ হল্যাণ্ডে আসিলেন। সেখানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি জাতীয় অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, উহার জন্য দেশের প্রত্যেক বড় বড় কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া কমিটি ছিল। কবি পৌছিয়াই দেখিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার জন্য একটি প্রোগ্রাম স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে, কেবল আয়োজনের ভিতর-কার অঙ্গগুলি কিরূপ হইবে তাহাই তাঁহার সহিত পরামর্শের জন্য অপূর্ণ রাখা হইয়াছিল। তিনি আম্‌স্টার্‌ডাম সহরে তিনটি বক্তৃতা করেন, তৎপরে লীডেন্, রটারডাম, হেগ, ইউট্রেক্‌ট্ সহরে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা করেন।

রটারডাম সহরে ডাঃ জে, জে, ভ্যান্ ডার লিউব গৃহে কবিবর অতিথি হইয়াছিলেন। ইনি অন্যত্রও কবিবরের সহগামী ছিলেন ও তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে আপনার মনোভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯২১ সালের মার্চ্চ সংখ্যার 'মডার্ণ-রিভিউ' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলে মন্দ হইবে না।

'এই সর্ব্বদর্শী কবি যখন হল্যাণ্ডে আগমন করিলেন তাহার বহু পূর্ব্বেই সেখানকার জনমণ্ডলী তাঁহার ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা সকলেই তাঁহার আগমনে উৎফুল্ল, তাঁহার গুণমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ সকলেই তাঁহার ও তাঁহার রচনার একান্ত পক্ষপাতী। হল্যাণ্ডে, রবীন্দ্রনাথ নবযুগের মুখ্য ব্যক্তিগণের অন্যতম বলিয়া সকলের ধারণা ; ইংরেজিতে ও ডচ্ ভাষায় অনূদিত তাঁহার বহুগ্রন্থের বহু ভাবগ্রাহী পাঠক তথায় বিদ্যমান। এখানে "ঠাকুর-কবির ভাব" বলিতে, জগৎ ও জীবনকে দেখিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী বুঝায়, এবং এই বাক্যের ব্যবহার ক্রমেই বহুপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে।

অতএব কবিবর যখন "থিওসফিক্যাল সোসায়েটি" ও "স্বাধীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে"র আহ্বানে হল্যাণ্ডে আসিলেন তখন চারিদিকে অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলীর দেখা পাইতে লাগিলেন ; যেখানেই যান সেখানেই তাঁহাকে গৃহে আনিয়া লোকে ধন্য। এমন কোনো য়ুরোপ-বাসীর কথা ত' আমার মনে পড়েনা, যিনি ইদানীন্তন কালে হল্যাণ্ডে এই মহাকবির মত সম্মান লাভ করিয়াছেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এ দেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। তাঁহার সহিত যে হৃদয়ের সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহা তাঁহার বক্তৃতায় এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের একটি মোহিনীশক্তিতে আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞানের একটি মাধুরী আছে এবং জীবনযাত্রার একটি সহজ আনন্দময়তা আছে—উহাই আমাদিগকে সমধিক চমৎকৃত করিয়াছে, তাঁহার দর্শনলাভ যেন পুণ্যের মত বোধ হইয়াছে।

যে এক পক্ষকাল এখানে ছিলেন তাহার মধ্যে তিনি আম্‌স্টারডাম, হেগ, রটারডাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে, লীডেন, ইউট্রেক্ট, ও আম্‌স্টারডামের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আম্‌র্স্‌ফুট নগরের দর্শন-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই সভাগৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না, সহস্র সহস্র লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল—

তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক সমাগম হইয়াছিল। ইউট্রেক্‌ট্‌ সহরে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করা হয়,—হল্যাণ্ডের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বাধিক সম্মান করা হইয়াছিল রটারডাম নগরে,—সেখানে কেবল গীর্জ্জার মধ্যে নয়, একেবারে বেদীর উপরে বসিয়া তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। এদেশে এই প্রথম একজন অ-খ্রীষ্টানকে এত বড় সম্মান দেওয়া হইল এবং এই সম্মানের অর্থ এই যে, ধর্ম্মোপ-দেষ্টা হিসাবে কবির প্রতিষ্ঠা এমনি অসা-ম্প্রদায়িক যে, খ্রীষ্টিয় উপাসনা-মন্দিরের বেদিকার উপর দাঁড়াইবার অধিকার তাঁহার আছে।

সেদিনের দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছে তাহারা আর ভুলিবে না। পর্য্যাপ্ত পুষ্পসম্ভারে বেদীটি ভূষিত হইয়াছে, এই পুষ্পচ্ছদের মধ্যেও স্ফুটতর দেহে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তাঁহার বাণী বিঘোষিত করিলেন—তাহার নাম, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন"। অবশেষে যখন অভ্যর্থনা-সমিতির অধ্যক্ষ, আমাদের দেশে আসিয়া এ কয়দিন অবস্থানের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন, এবং কবি কয়েকটি কথায় বিদায় জানাইয়া তাহার উত্তর দিলেন—সেই ক্ষণে সকলের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল—তাঁর কথাগুলি সকলের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল।"

বেলজিয়মে

হল্যাণ্ডে অবস্থানকালে কবিবর বেলজিয়ম হইতে নিমন্ত্রণ পান—যে, অ্যান্টওয়ার্প ও ব্রসেল্‌স্‌ নগরে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইবে। শেষোক্ত নগরে 'প্যালে-গু-জাষ্টিস'-গৃহে তিনি বক্তৃতা করেন।

বেলজিয়ম হইতে পুনশ্চ প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া, ১৯২০ সালের ২ শে অক্টোবর তারিখে কবিবর 'রটারডাম' নামক জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন।

আমেরিকা

আমেরিকায় কয়েকটি প্রধান প্রধান নির্দ্দিষ্ট স্থানে বক্তৃতা করিয়া ফ্রেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

আবার বিলাত

বিলাতে পঁহুছিয়া Y. M. C. A.-ছাত্রাবাসের "সেক্‌স্‌পীয়ার কুটীরে" কবিবর দুইটি নিবন্ধ পাঠ করেন—একটি, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন", তাহাতে মিঃ নেভিন্‌সন্‌ সভাপতি ছিলেন; অপরটি, "বাঙ্গালার বাউল", সভাপতি হইয়াছিলেন সার ফান্সিস্‌ ইয়ংহস্‌ব্যাণ্ড।

আবার ফ্রান্স

১৬ই এপ্রিল তারিখে কবিবর আকাশযানে ফ্রান্স যাত্রা করেন। প্যারিসে আসিয়া Autor du Monde-এ বাসা লইলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে "ফরাসী দেশের প্রাচ্যজন-সম্মিলন" সভার উদ্যোগে Musee guimetতে "ভারতের লোকধর্ম্ম" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। ২৪শে এপ্রেল তারিখে উক্ত সভা "অন্তরঙ্গ সমাজ"-গৃহে কবির সম্মানার্থ একটি ভোজের অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আহারাদির পর ফরাসীদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মসিয়ে কোপ্রঁ্যা ফরাসী ভাষায়



ডাৰ্ম্‌ষ্টাটে "ঠাকুর-সপ্তাহ"-সপ্তাহব্যাপী সম্বর্দ্ধনা ('প্রবাসী'র সৌজন্যে)

"ডাকঘর" আবৃত্তি করেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সহিত ফরাসী দেশের পণ্ডিতাচার্য্য-গণের আলাপ-আলোচনা হয়; তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে "ভারতে জন-প্রীতি" বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। ২৮শে এপ্রিল তিনি 'সিল্‌ভেঁ লেভি কর্ত্তৃক আহুত হইয়া ষ্ট্রাস্‌বার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যান। "মর্ডার্ণ রিভিউ" পত্রে সেই বক্তৃতার সংবাদ (তপোবনের বাণী) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সুইজারল্যাণ্ডে

৩০শে এপ্রিল কবিবর জেনেভা নগরীতে পৌঁছিলেন। ৪ঠা মে 'লে'থেনী' গৃহে "জোঁ জ্যাক্‌স্‌ রুসো ইনষ্টিটিউটে"র আকিঞ্চনে আপনার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া শুনান। ইহার পর তিনি সমগ্র সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন। ১০ই মে বেসেল-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন; ঐদিন সন্ধ্যায় অধ্যাপকেরা মিলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। ১১ই তারিখে জ্যুরিক সহরের 'ওয়াল্‌ডার হাউস ডল্‌ডার' গৃহে 'সাহিত্য-সভার' উদ্যোগে একটি বক্তৃতা করেন। ১২ই তারিখে স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'আউলা'তে 'কবির ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ইটালী যাত্রা স্থগিত

এখান হইতে তাঁহার ইটালি যাইবার কথা ছিল। সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার সকল আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু অবিলম্বে সুইডেনে যাইবার জন্য 'সুইডিশ একাডেমি' হইতে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ তার আসিতে লাগিল। কাজেই, ইতালী যাত্রা তখন আর হইয়া উঠিল না।

জর্ম্মাণীতে

১৩ই মে জার্ম্মেণীতে পৌঁছিয়া কবিবর এক দিন কাউণ্ট কেসারলিং-এর গৃহে বাস করেন। ১৫ই তারিখে তিনি হাম্‌বার্গে যান। ১৭ই তারিখে প্রিন্সেস্ বিস্‌মার্কের নিমন্ত্রণে Fridrichruhe-সহরে Bismark Castle-এ বেড়াইতে যান। সেখানে অধ্যাপক Meyer-Benfeyর গৃহে স্বরচিত গ্রন্থাবলী হইতে কোনো কোনো স্থান পাঠ করেন। ২০শে তারিখে হামবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আউলা'তে, Hamburges Kunstgesselschaft-এর উদ্যোগে 'তপোবনের বাণী' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

ডেনমার্কে

১৯২১ সালের ২১শে মে রবীন্দ্রনাথ কোপেন-হেগেনে আসেন। রেলষ্টেশনে আনন্দোন্মত্ত জনতার উচ্ছ্বাস এত অধিক হইয়াছিল, যে কবিবর অনেক কষ্টে ট্রেন হইতে নামিতে পারিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যে জন-সমাগম হইয়াছিল, সেরূপ আর কোথাও হয় নাই।

কবিকে কাঁধে করিয়া তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়—তাঁহার বসন-প্রান্ত চুম্বন করিবার জন্য অসম্ভব হুড়াহুড়ি হইয়াছিল। ভিড়ে কবির সমভিব্যাহারী মিঃ বোমানজী তাঁহার টুপি হারাইয়া ফেলেন, এবং কবিবরেব পুত্র ভিড়ের মধ্যে এতদূর হটিয়া গিয়াছিলেন যে পিতার সহিত আসিয়া জুটিতে তাঁহার বেশ কিছুক্ষণ লাগিয়াছিল। জনসংঘের এই উচ্ছ্বাস ষ্টেশন হইতে কবিবরের বাসস্থান পর্য্যন্ত সারাপথ সমান মাত্রায় চলিয়াছিল।

মশাল-আলোকের শোভাযাত্রা

২২শে মে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-সম্মিলনীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-শেষে একটি যেমন-জাঁকালো-তেমনি-সুন্দর উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ছাত্র ও যুবজনেরা কবিকে তাঁহার বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার সময় একটি মশালধারীর মিছিল বাহির করে—ও-দেশে এইরূপ মিছিল বড় সুন্দর হয়—প্রত্যেক ছাত্রের হাতে একটি করিয়া প্রজ্জ্বলিত মশাল! কবি বাসায় ফিরিলে পরও জনতার হ্রাস হয় নাই, জনমণ্ডলী তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী রাজপথসমূহে ও সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে তাহাদের উল্লাস জ্ঞাপন করিতে ছাড়িল না। তাহাদের ইচ্ছানুসারে কবিকে কয়েকবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া দু'চারিটি কথা বলিতে হইয়াছিল। ডেনমার্কের অধিবাসিবৃন্দ সম্মিলিত কণ্ঠে "ভারতের জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, কবি তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষার প্রতিদানে বাংলায় "ডেনমার্কের জয়" বলিয়া উঠেন।

সুইডেন

২৪শে মে কবিবর ষ্টক্‌হল্‌মে পৌঁছিলেন। ষ্টেশনে সুইডিশ একাডেমির সেক্রেটারী ও সুবিখ্যাত কবি ডাঃ কার্লফিল্ড্, কাউণ্টেস উইলিয়ামোভিজ, কাউণ্টেস ট্রোল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশনে জনতা খুব হইয়াছিল এবং যতদিন তিনি ঐ দেশে ছিলেন, তাঁহার বাসার চারি পাশে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জনতার বিরাম ছিল না—তিনি যখন বাহির হন বা ভিতরে যান, তখন একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইবে।

২৫শে মে নগরীর প্রেস-অ্যাসোসিয়েসন সেখানকার 'কন্‌সার্ট হলে' বক্তৃতার জন্য এক সভার আয়োজন করেন। এই কন্‌সার্ট-হল ষ্টক্‌হল্‌ম সহরের সর্ব্বাপেক্ষা বড় হল, দুই



বার্লিনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('প্রবাসী'র সৌজন্যে)

হইতে তিন হাজার লোক এখানে বসিতে পারে। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়। যতগুলি লোক বক্তৃতা শুনিতে আসে তাহাদের এক চতুর্থাংশ মাত্র টিকিট পায়, বাকী লোকেরা অতিশয় কলরব করিতে থাকে; তাহাদের দুঃখের কথা কবির কর্ণগোচর হইলে তিনি পরদিন আর একটী বক্তৃতা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাহারা কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হয়। নগরে অবস্থান কালে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তন্মধ্যে নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত বিখ্যাত সেল্‌মা লোগেন্‌লেফ্, জাতিসংঘের পূর্ব্বতন প্রেসিডেন্ট্ ব্রান্‌টিং, স্বেন হেডিন, ও 'আপ্‌সালা'র আর্কবিশপের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ২৬শে মে তারিখে নরওয়ে-রাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে।

নোবেল-বক্তৃতা

২ শে মে তারিখে 'সুইডিশ একাডেমি'-গৃহে কবিবর তাঁহার নোবেল-বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতাদান নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার একটি সর্ত্ত। ১৯১৩ সালের পর ইতিপূর্ব্বে তাঁহার য়ুরোপে আসা আর ঘটে নাই বলিয়া ঐ সর্ত্ত রক্ষা করার সুযোগ এত দিনে আসিল। 'সুইডিশ্ একাডেমী'তে তাঁহার এই বক্তৃতার কথা লইয়া এ দেশে যে গুজব উঠিয়াছিল, যে তিনি এ বৎসরও নোবেল-প্রাইজ পাইবেন, তাহা ভিত্তিহীন।

ঐ দিবস নোবেল-কমিটির উদ্যোগে 'একাডেমী'তে তাঁহার সম্মানের জন্য একটী ভোজ দেওয়া হয়। আপ্‌সালার প্রধান পুরোহিত (আর্ক বিশপ) ঐ উৎসবের নায়করূপে ভোজনান্তে যে বক্তৃতা করেন, তাহার শেষে এই কয়টি সারগর্ভ কথা ছিলঃ—"নোবেল প্রাইজ তাঁহারই জন্য—যিনি একাধারে ঋষি ও কলাবিদ্। এ পর্য্যন্ত যতগুলি পুরস্কার দেওয়া

হইয়াছে তাহার মধ্যে ঠাকুরের পুরস্কারই সার্থক হইয়াছে।"

যতদিন কবিবর ষ্টক্‌হল্‌মে ছিলেন, স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সম্মুখ-পৃষ্ঠা তাঁহার কার্য্যকলাপের বর্ণনায় পূর্ণ থাকিত—প্রত্যহ তাঁহার অভ্যর্থনাকালীন আলোকচিত্র অথবা বক্তৃতাকালীন অবয়বভঙ্গির পেন্সিলচিত্র বাহির হইত—স্তম্ভের পর স্তম্ভ তাঁহার সংবাদেই ভরিয়া যাইত। তাঁহার সহিযুক্ত একখানি পত্র ছাপিতে পাইলে, তাঁহার স্কুলে অর্থ দান করিবে, Svsenka Tageblatt নামক একটি প্রধান দৈনিকের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রস্তাব আসিয়াছিল। শহর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কবিবর এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কেবল সৌজন্যবশতঃ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ২৮শে মে, যেদিন তিনি উক্ত সহর ছাড়িয়া যান সেইদিনই Svsenka Tageblatt-পত্রিকায় কবিবরের এই পত্রখানি বাহির হইল; তাহার শিরোনামা চার কলমব্যাপী, এবং তাহার সঙ্গে কবিবরের একখানি অতি অভিনব চিত্র, চিত্রের নিম্নে কবির স্বহস্ত-লিখিত নামটি মুদ্রিত হইয়াছে।—

"এই পশ্চিম দেশে আমার সম্মানের জন্য যেরূপ উল্লাস দেখিতেছি, তাহাতে অবাক্ হইয়া ভাবি, ইহার অর্থ কি? শুনিয়াছি আমি নাকি মানবজাতির বন্ধু বলিয়া আমার এই সম্মান। আশা করি তাই যেন সত্য হয়, যে—আমার লেখার মধ্যে সর্ব্বত্র মানব-প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা সকল গণ্ডী ছাড়াইয়া সকল জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। যদি তাই সত্য হয় তবে আমার লেখার মধ্যে এই যে সব চেয়ে বড় সুরটি—ইহাই যেন আমার জীবনেরও মূলমন্ত্র হয়। সেদিন হ্যামবার্গের হোটেলে আমার ঘরে একাকী বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে দুইটি ব্রীড়াময়ী মধুরহাসিনী জর্ম্মান্ বালিকা আমার জন্য একটী গোলাপ-গুচ্ছ উপহার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাদের মধ্যে একটী মেয়ে ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলিল, "ভারতকে আমি ভালবাসি।" আমি বলিলাম, "কেন তুমি ভারতকে ভালবাস?" বালিকা উত্তর করিল "আপনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন বলিয়া।" এত বড় প্রশংসা গ্রহণ করিবার মত আত্মপ্রসাদ আমার নাই। তবে আমার বিশ্বাস ইহার অর্থ এই যে, আমার কাছে ঐরূপ তাহারা আশা করে, এবং এজন্য ইহা প্রশংসা না হইয়া আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইল। অথবা, হয়ত তাহারা এই বলিতে চাহিয়াছিল যে, আমার দেশ ভগবানকে ভালবাসে সেইজন্য তাহারা আমার দেশকে ভালবাসে। এরূপ প্রত্যাশার অর্থও বেশ বোঝা যায়। সকল জাতি আপন আপন দেশকে ভালবাসে, কাজেই পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে। জগৎ এখন এমন দেশ চায় যেখানে লোকে ভগবানকেই ভালবাসে, নিজের দেশকে নয়; সেই দেশই সকল দেশের সকল মানবের ভক্তি অর্জ্জন করিবে। নিজের প্রতি বা স্বজাতির প্রতি ভালবাসার একমাত্র ফল স্বার্থের সংঘর্ষ; ভগবানে প্রীতিই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা। সকল সমস্যার মীমাংসা ইহার মধ্যে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

২৮ শে মে তারিখে পুরোহিতরাজের নিমন্ত্রণে কবিবর কাউণ্টেস্ ওয়ালামোভিজের



বার্লিনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('প্রবাসী'র সৌজন্যে)

সঙ্গে আপ্‌সালায় যান। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বহু গুণানুবাদ সহকারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করে, কবিবরও তাহার যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ সুইডেনে থাকিতে তাঁহার 'ডাকঘর' নাটকখানি Volksbingen থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। কবিকে সান্ধ্য অভিনয়ে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অনিবার্য্য কারণে তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অভিনয় আরম্ভ হয়। তাঁহার গমনাগমনের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিয়া-

ছিলেন, এবং যাহাতে জর্ম্মানিতে প্রত্যাগমন সহজ হয় তাহার জন্য তাঁহার ব্যবহারের জন্য দুইখানা হাইড্রোপ্লেন নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ষ্টকহল্‌ম ত্যাগ করিবার দিন সন্ধ্যাকালে যখন কবি ব্রিটিশ কন্‌সালের সঙ্গে দেখা করিলেন, তখন কন্‌সাল মহাশয় বলেন যে, মণ্টেগু সাহেব তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, কবির যখন যাহা প্রয়োজন তাহা যেন ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার ব্যাপার দেখিয়া কন্‌সাল্‌ মহাশয় একটু লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলেন "আপনার জন্য আমি আর কি করিতে পারিতাম ?"

আবার জর্ম্মানীতে

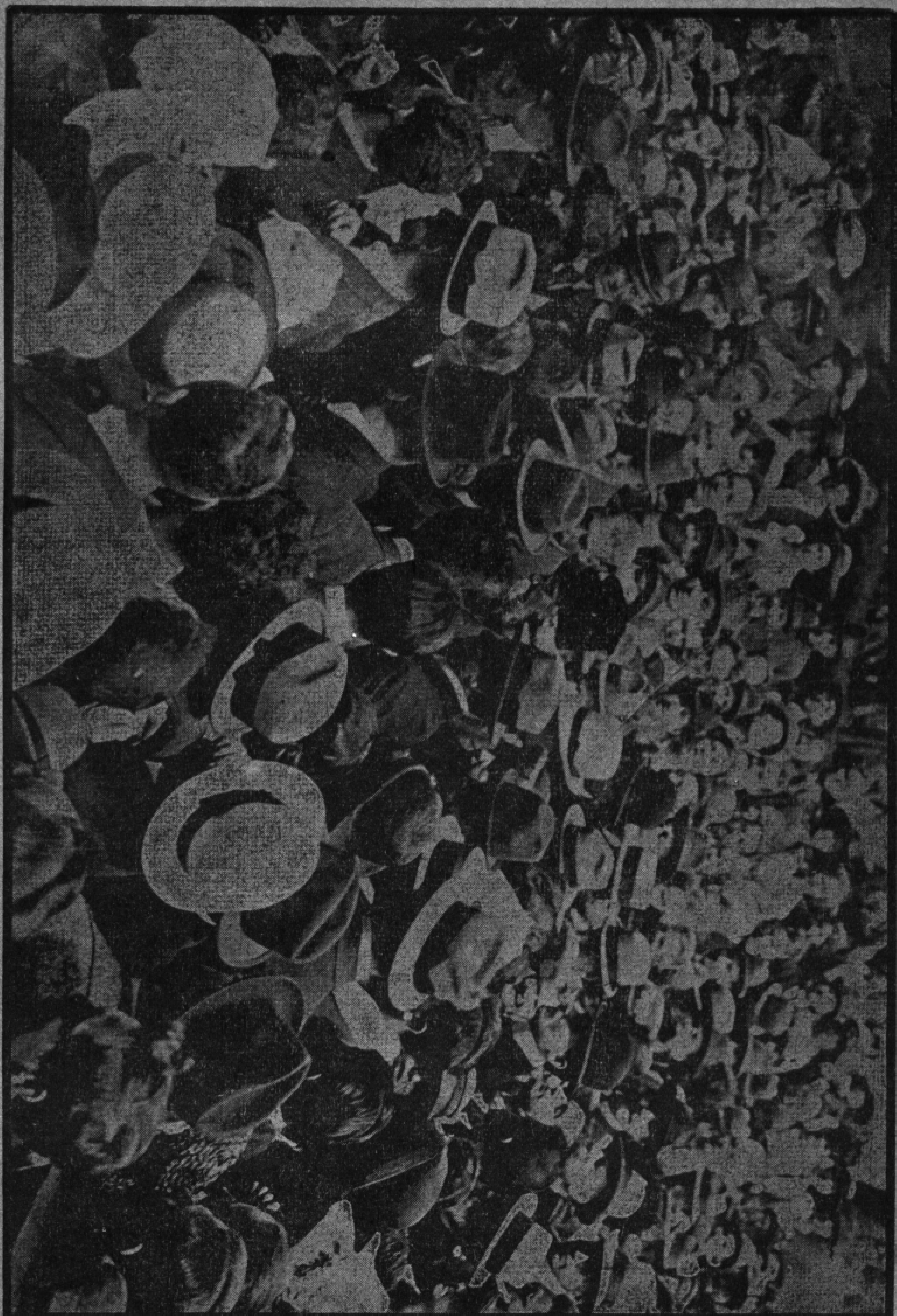
২৮শে মে তারিখের বৈকালে রবীন্দ্রনাথ বার্লিন যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। পরদিন বার্লিনে পৌঁছিয়া কিছু দিন তিনি জর্ম্মানীর শ্রমশিল্পব্যবসায়ীদের অগ্রগণ্য হিউগো ষ্টিন্‌সের অতিথি হইয়াছিলেন—ইনি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য দক্ষিণ জর্ম্মানী হইতে চলিয়া আসেন।

বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

২রা জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টরের আহ্বানে কবিবর বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে যান। বাহিরে এত অধিক জনতা হইয়াছিল যে কবি প্রায় তিন কোয়াটার কাল বিশ্ববিদ্যালয় গৃহের প্রবেশ-দ্বারে পৌঁছিতে পারেন নাই। কবির প্রতি জনগণের এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের বিবরণ বিলাতী পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল; আমাদের দেশেও দেশী ও ইংরাজী সংবাদপত্রে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

একখানি কাগজে সংবাদটি এমন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, যেন কবির কোনো কোনো মতের বিরুদ্ধেই জনমণ্ডলী এইরূপ উপায়ে তাহাদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিল। 'মডার্ণ রিভিউ'-পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় ব্যাপারটির তথ্যনিরূপণ-চেষ্টায় সব দোষ রয়টারের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে। বস্তুতঃ রয়টার ঠিক সংবাদই দিয়াছিলেন, অবশ্য সংবাদটি বড় সংক্ষিপ্ত ছিল। রয়টার এই মর্ম্মে তার পাঠাইয়াছিলেন যে, বার্লিনে বক্তৃতা কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মহোৎসাহে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই ব্যাপারে কবির প্রতি যে অসম্মান করা হইয়াছে, এই ইঙ্গিতের জন্য 'টাইম্‌স্‌'-পত্রের বার্লিনবাসী সংবাদদাতাই দায়ী; এবং 'টাইম্‌সে'র সংবাদই এখানকার ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, এবং তাহার উপর একটি দেশী পত্রে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। ঐই সম্বর্দ্ধনাকাণ্ডের যথার্থ সংবাদ বিলাতের 'ডেলিনিউস্‌' পত্রের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা দিয়াছিলেন এবং তাহা কয়েকখানি দেশীয়পত্রে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ব্বেকার ধারণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। আমরা নিম্নে 'ডেলিনিউস্‌' ও অন্যান্য বিলাতী সংবাদপত্রের রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

অদ্য বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে সার রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের বক্তৃতাকালে মহাপুরুষ-পূজার মত উন্মত্ত আচরণ লক্ষিত হইয়াছিল। স্থান সংগ্রহের জন্য এত ঠেলাঠেলি হইয়াছিল যে অনেকগুলি ছাত্রী ভিড়ের মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং কেহ কেহ পদদলিত হইয়াছে।



বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('প্রবাসী'র সৌজন্যে)

ঠাকুরকে সংবর্দ্ধনা করার ঘটায় এত অসংযম প্রকাশ পায় যে, বিখ্যাত ঈশতত্ত্ববিদ্ হার্ণাক সভাপতির আসনে বসিয়া সভাকে শান্ত রাখিতে পারেন নাই; বক্তৃতাটি পরদিন আবার দেওয়া হইবে বলিয়াও শত শত ছাত্রকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই—ইহারা প্রবেশ করিতে না পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। শেষে পুলিশ ডাকিয়া তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়

ঠাকুর ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন,—বক্তৃতার বিষয় ছিল, "বাঙ্ময় ব্রহ্ম"।—*Daily News* (*London*)

* * *

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে গতকল্য বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতাকালে জনগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। জনগণ বক্তৃতাগৃহে ভাঙ্গিয়া পড়ে, কতগুলি স্ত্রীলোক পদদলিত হয়; গোলযোগটা খুব বেশী হইয়া দাঁড়ায় কবির আগমনের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে। তাঁহাকে পুলিসের রক্ষণাধীনে ভিতরে আনা হয়—বহু উত্তেজনাকারীকে পুলিস তাড়াইয়া দেয়।

কবির বক্তৃতার নাম ছিল—"ভারতের তপোবন ও ভারতের আত্মা", কিন্তু গোলযোগে বক্তৃতা এতবার বন্ধ করিতে হয় যে কবিবর আগামী কল্য পুনরায় ঐ বক্তৃতা করিবেন বলিয়াছেন।

Central News Telegram (In "Glasgow Evening News.")

বার্লিন ও প্রেগ সহরের সচিত্র সংবাদপত্র গুলিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাহিরে কিরূপ জনতা হইয়াছিল তাহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। বক্তৃতাগৃহের বাহিরে রাজপথে প্রায় পনর হাজার লোক দাঁড়াইয়াছিল। য়ুরোপীয় সংবাদপত্র সমূহে যে সকল ফোটো-গ্রাফ বাহির হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে জনসংঘ কেবলমাত্র কবির কথা শুনিবার জন্য এত অধীর হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দিন ডাঃ বেকার Deutsche Gesselsshaft—গৃহে, তাঁহার সম্মানার্থ একটি ভোজ দেন, ঐ ভোজে নিম্নলিখিত পদস্থ ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

১। বেকার, শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী। ইনি পূর্ব্বে আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।

২। সিমন্‌স্, অধুনা অবসর-প্রাপ্ত বিদেশ-সচিব।

৩। ভন হার্ণাক, জাতীয় পুস্তকাগারের সাধারণ ডাইরেক্টর। ইনি ঈশতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন।

৪। ব্যবহার-শাস্ত্রের অধ্যাপক সেকেল্; ইনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর।

৫। ট্রোয়েল্‌শ্, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক (বার্লিন)।

৬। অটো, ঈশতত্ত্বের অধ্যাপক (মার্‌বার্গ)

৭। সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক লিউডার্‌স্। ইনি প্রুসীয় সর্ব্ববিদ্যাপরিষদের দর্শনশাখার সম্পাদক।

৮। মিলকান, জাতীয় পুস্তকাগারের সাধারণ অধ্যক্ষ।

৯। ভন শিলিংস্, ইনি অপেরা-রচয়িতা ও জাতীয় অপেরা-মন্দিরের পরিচালক।

১০। রিক্‌টার, শিক্ষাসংসদের মন্ত্রী। ইনি পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

১১। ব্রান্‌স্, শিক্ষাসংসদের মন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-অধ্যাপক।

১২। ইয়াএক্, অধ্যাপক ও রাজনীতি-বিদ্।

২৩। ভন গ্লাসেলাফ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষার প্রাইভেট ডোজেণ্ট।

৩রা জুন শ্রীযুক্ত নোবেল (পুত্র) তাঁহাকে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করেন; নিমন্ত্রিতবর্গের মধ্যে সুইডেনের রাজদূত উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিশ্রুতি

অনুসারে পুনরায় বক্তৃতা করেন—এবারে আর লিখিয়া নহে, সদ্য-সদ্য। ইহা নাকি বড় সুন্দর হইয়াছিল। ঐ দিনই বার্লিনের ভারতীয় সমাজ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন, জর্ম্মাণীর পুনর্গঠন-সচিব শ্রীযুক্ত হার রাথেনানের সহিত তিনি আহারে বসেন।

পরদিন, ৪ঠা জুন, বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয় কবিবরের কণ্ঠস্বর তাম্র ফলকের মধ্যে ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও গানের কণ্ঠস্বর, ছবি ও হাতের সহি, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভূতল-গৃহে রক্ষিত হইবে। ঐ দিন শার্লটেনবার্গে আপনার কাব্য হইতে পাঠ করিয়া শুনান, পরে মিউনিক যাত্রা করেন।

মিউনিক

৫ই জুন কবিবর মিউনিকে আসিয়া ৭ই জুন বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে 'তপোবনের বাণী' শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করেন। এইখানে তাঁহার গ্রন্থবিক্রয় ও বক্তৃতালব্ধ অর্থ হইতে দশহাজার মার্ক শহরের অনাহার-পীড়িত বালকবালিকার দুঃখমোচনকল্পে দান করেন। ৮ই জুন কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির বৈঠকে তিনি নিজ গ্রন্থ হইতে পাঠ আবৃত্তি করেন। এই বৈঠকে টমাস্ ম্যান, বিয়র্ণসন্ (পুত্র) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ডার্ম্‌স্টাডে 'ঠাকুর-সপ্তাহ'

এই সময়ে জার্ম্মাণীর চারিদিক হইতে ক্রমাগত নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় কবিবর সেগুলি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ জন্য স্থির হইল যে, তিনি ডাম্‌ষ্টাড্ শহরে এক সপ্তাহ কাল থাকিবেন, ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার কথা শুনিতে চান, তাঁহারা তথায় আসিয়া সাধ মিটাইতে পারিবেন। এইরূপে যাহা এখন 'ঠাকুর-সপ্তাহ' নামে পরিচিত তাহার সূত্রপাত হয়—জর্ম্মাণীভ্রমণকালে এই ব্যাপারটি সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কবিবর ৯ই তারিখে এই সহরে পৌঁছিয়া গ্র্যাণ্ড-ডিউক-অব-হেসের গৃহে অতিথি হইলেন।

দর্শকগণের ভিড় অতিরিক্ত হয়, এজন্য যাহাতে সকলেই কবির সহিত কথা কহিতে পান তজ্জন্য এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই একটি দিন-তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। সপ্তাহ ধরিয়া সারা জার্ম্মাণী হইতে বহুলোক আসিতে লাগিল। প্রত্যহ প্রাতে ৯ ঘটিকায় ও বিকালে ৪ ঘটিকায় বাগানে মুক্তাকাশতলে সভা বসিতে লাগিল; যে যাহা জিজ্ঞাসা করে, কবিবর ছোট ছোট বক্তৃতার মত করিয়া তাহার উত্তর দেন, কাউণ্ট কেসারলিং তাহা অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে থাকেন। কবির এই সকল কথাবার্ত্তার বিবরণ প্রত্যহ প্রকাশিত হইয়া দেশময় প্রচারিত হইতে লাগিল। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে এই সকল বক্তৃতা কাউণ্ট কেসারলিঙের "জ্ঞান-শিক্ষাশ্রম" সম্পর্কিত—এবং ইহার যে তার-বার্ত্তা ২০শে মে তারিখের "Brooklyn Eagle and Philadelphia Public Ledger"—পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—

শিক্ষক রূপে ঠাকুর-কবি

ভারতীয় কবি জার্ম্মাণ 'জ্ঞান শিক্ষাশ্রমে'র শিক্ষাসমিতিতে যোগ দিয়াছেন।

ডারমষ্টাড্, ২১শে মে।—জর্ম্মাণ দার্শনিক কাউণ্ট কেসারলিঙ্ ডারমষ্টাডে যে জ্ঞান-

শিক্ষাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানকার শিক্ষাদাতা দার্শনিকের পদে বৃত হইয়াছেন। শত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীসের সত্যযুগে প্লেটো ও অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিতেরা যেরূপ "একাডেমী"তে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন তাহারই আদর্শে এই আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর-কবির পূর্ব্ব হইতেই কাউণ্ট কেসারলিঙের সহিত পত্র-ব্যবহার ছিল, এবং তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে হতগর্ব্ব জর্ম্মাণীই নূতন চিন্তাধারার উপযুক্ত ভূমি। কবিবর সম্প্রতি কেসারলিঙের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ শেষ করিয়াছেন এবং জুন মাসে ফিরিয়া আসিয়া 'একাডেমী'র কার্য্যে যোগ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ও কেসারলিঙ নানা দিগ্দেশাগত জ্ঞান-পিপাসুগণের হৃদয়ে, সঙ্গ ও সাক্ষাৎ আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞান সঞ্চারিত করিবেন। রাজ্যচ্যুত গ্রাণ্ড-ডিউক-অব্-হেস্ ইঁহাদের একজন প্রধান শিষ্য, ইনিই অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত সার্ব্বজনিক সভাগৃহে তাঁহার গ্রন্থ হইতে পাঠ আবৃত্তি হইয়াছিল। ১১ই জুন তিনি 'পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন' বিষয়ক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতায় পূর্ব্ব-রাজপরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

১২ই জুন বিখ্যাত "বন-মেলা" উৎসব সম্পন্ন হয়। লোকসংখ্যা চারি হাজারের ঊর্দ্ধ হইয়াছিল। এই উৎসব একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সম্পন্ন হয়, পূর্ব্ব হইতে কোনো বন্দোবস্ত ছিল না, কোনো বিধি ব্যবস্থা করা হয় নাই। সমবেত জনমণ্ডলী হঠাৎ গান আরম্ভ করিল, সে গানে প্রত্যেকে যোগদান করিল। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ চলিল। যে প্রতিবেশের মধ্যে উৎসবটি সমাধা হইল তাহা বড়ই সুসমঞ্জস হইয়াছিল। কবি নাকি বলিয়াছিলেন যে, য়ুরোপে এই দিনটিই তাঁহার সবচেয়ে মধুর লাগিয়াছে। উৎসবশেষে কবি দুঃস্থ শিশুগণের সাহায্যকল্পে দশহাজার মার্ক দান করার কথা জ্ঞাপন করিলেন।

ষষ্টিতম জন্মতিথি

এ বৎসর য়ুরোপে থাকিতেই কবির ষষ্টিতম জন্মদিন সমাগত হইল। জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ এই উপলক্ষে তাঁহাকে গ্রন্থরাজি উপহার দিবার মানস করিলেন, তদুপলক্ষে তাঁহারা জনসাধারণকে জ্ঞাপনার্থ যে পত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহা 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গেটের বাসস্থান উইমার-নগরীতে জার্ম্মাণ ন্যাশনাল থিয়েটারে গান ও তাঁহার গ্রন্থাবলী লইতে আবৃত্তির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কবি যখন সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্ণ-নগরে, তখন তাঁহার জন্মদিন আসিল। জার্ম্মাণীর সকলস্থান হইতে রাশি রাশি অভিনন্দন-পত্র আসিতে লাগিল। একখানি পত্রে সংবাদ আসিল, জর্ম্মাণজাতি কবিকে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে এক হাজার গ্রন্থ দান করিয়াছে।

ফ্র্যাঙ্ক্ফর্ট্

১০ই জুন তারিখে রবীন্দ্রনাথ ফ্র্যাঙ্ক্ফর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার "বাঙ্গালার বাউল" শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিতে যান। রেক্টর মহাশয় কবিকে সভাস্থ করিবার কালে বলেন :—

"আপনার মহিমান্বিত নামের খ্যাতি আমি বহুপূর্ব্বে শুনিয়াছি, আজ আপনাকে দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। আজ আপনকার সঙ্গলাভ করিয়া ও আপনাকে চাক্ষুষ করিয়া আরও ভাল করিয়া বুঝিতেছি, আপনার ধ্যানধারণা কত উচ্চ, আপনার অন্তরের সাধুভাব কত পবিত্র, আপানার দৃষ্টি কত সুদুরপ্রসারী। আমরা যখন ভিতরের দিক দিয়া নবজীবনলাভের কঠোর ও দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তখন আপনি আপনার মহাপ্রাণসুলভ অনুচিকীর্ষার বশে জর্ম্মাণীতে আমাদের নিকটে আসিয়াছেন। আপনার অভিপ্রায়, উপদেশ দানে আমাদের সাহায্য করা—আপনি চান, আপনার হৃদয়ের মধ্যে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চিত রহিয়াছে, আমরা তাহার অংশ গ্রহণ করি। আমাদের নিজেদের শক্তি ও কর্ম্ম-সামর্থ্যের উপর দৃঢ়বিশ্বাস আছে; এ প্রত্যয় আমাদের আছে যে,যে-জাতি পরিশ্রম করে তাহার বিনাশ নাই, তথাপি আপনার এই আন্তরিক মানব-প্রীতির পরিচয়ে ধন্যবাদ জানাইতেছি; আপনি যে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ফ্র্যাঙ্কফর্টে আসিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আপনাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বাগত-সম্ভাষণ করিতেছি।"

বক্তৃতা-শেষে রেক্‌টর মহোদয় অনেকগুলি গ্রন্থ শান্তিনিকেতনকে দান করেন।

স্থানীয় শ্রমিক সম্প্রদায় তাঁহাকে লিখিয়া জানায় যে এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবিধা তাহারা পায় নাই। এজন্য তাঁহাকে একদিন তাহাদের মধ্যে গিয়া তাহাদেরই একজনের মত করিয়া মিশিতে হইয়াছিল। ১৪ই জুন তারিখে তিনি "শ্রমজীবি-গৃহে" বক্তৃতা করেন।

অষ্ট্রিয়া

কবি যখন ডার্‌ম্‌ষ্টাডে ছিলেন তখনই অষ্ট্রিয়া ও জেকো-শ্লোভাকিয়া হইতে সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে ভিয়েনা হইতে একটি প্রতিনিধিদল তাঁহাকে অষ্ট্রিয়ায় লইবার জন্য দেখা করিতে আসে ও অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করে; কবি তাহা অস্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, কাজেই তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ সহকারে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহারা বড় বেশী পীড়াপিড়ি করায় অবশেষে তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হন,এবং তাঁহাদের সঙ্গেই অষ্ট্রিয়ায় গমন করেন।

তিনি ১৬ই তারিখে ভিয়েনায় পৌঁছিয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে "তপোবনের বাণী"—বক্তৃতাটি পাঠ করেন। অষ্ট্রিয়ার নব রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটিশ-রাজদূত ঐ বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন কবিকে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে আনন্দ করা হয়।

১৭ই তারিখে অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক মন্ত্রিসভা-গৃহে কবির সম্মানার্থ একটি ভোজ দেন। এটি হইয়াছিল একটি পুরা সরকারী অনুষ্ঠান। সকল বৈদেশিক রাজদূত এ দিন উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যাকালে "কন্‌সার্ট-হলে" নিজের রচনা পাঠ করিয়া শুনাইয়া, গবর্ণমেণ্ট-দত্ত স্পেশাল সেলুন গাড়ীতে তিনি জেকো-স্লোভাকিয়া যাত্রা করিলেন। জেক্-রাজদূত গবর্ণমেণ্ট ও জনগণের পক্ষ হইতে ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহার

যাত্রার সকল আয়োজন করিয়াছিলেন। জেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ সংস্কৃত-ভাষার অধ্যাপক লেস্‌নী, জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক উইন্‌টারনিজ এবং বৈদেশিক-মন্ত্রি সভার একজন ব্যবস্থাপক এই যাত্রা পথে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

জেকো স্লোভিকা

১৮ই জুন প্রেগ্ সহরে পৌঁছিয়া জেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার অবস্থানের সকল বন্দোবস্ত তরুণ সাধারণ-তন্ত্র গবর্ণমেণ্ট করিয়া দেন। ১৯শে তারিখে ছাত্র-সম্মিলনীর উদ্যোগে "কন্‌সার্ট-হলে" তিনি স্বরচিত গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করেন। কবির শ্রোতৃসংখ্যা এখানে যত অধিক হইয়াছিল এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। ঐ গৃহের শ্রবণশালা অতি বৃহৎ ছিল, তাহার মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন-মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐদিন সন্ধ্যাকালে অধ্যাপক লেজ্‌নীর গৃহে অতিথিসেবার আয়োজন হইয়াছিল।

প্রেগ্ সহরে একটি স্বতন্ত্র জর্ম্মান বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে, ২০শে তারিখের অপরাহ্ণ-বেলায় কবিবর তথায় বহু লোকের সমক্ষে বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অধ্যাপক উইন্‌টার-নিজের গৃহে কবির সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ হয়। তাঁহাব প্রত্যাগমনের জন্য নবীন গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট দুইখানি আকাশযানের ব্যবস্থা করেন, তার মধ্যে একখানিতে বোমান্‌জী প্যারিস যাত্রা করেন, কিন্তু আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় তাঁহাকে ষ্ট্রাস্‌বার্গে নামিয়া পড়িতে হয়; কাজেই কবিকেও ট্রেনে করিয়া ষ্ট্রাস্‌বার্গ অভিমুখে রওনা হইতে হইল—সেখানে তিনি ২২শে জুন তারিখে আসিয়া পৌছিলেন। ২৩শে তারিখে ষ্ট্রাস্‌বার্গে রবীন্দ্রনাথের সম্মানার্থ একটি হিন্দু উৎসব হয়, তাহাতে কবির সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা হয়, এবং অনেক গানও হইয়াছিল। এই উপলক্ষেই কবির রচিত বিখ্যাত 'জনগণ-মনঅধিনায়ক'-গানটির সিল্‌ভেঁ লেভি-কৃত ফরাসী অনুবাদ গীত হইয়াছিল।

২৪শে জুন রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে পৌছিলেন, এবং ১লা জুলাই ভারতের পথে মারসাইয়ে যাত্রা করিলেন।

ইতালী, স্পেন, পোর্ত্তুগাল প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে কত অনুরোধ, কত আহ্বান আসিতে লাগিল। বড় বড় মনীষিরা য়ুরোপব্যাপী পুনর্গঠনকার্য্যে তাঁহার উপদেশ ও সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতজন তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন, য়ুরোপ মহাদেশের যে কোন কেন্দ্র-স্থানে তাঁহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার আদেশ ও প্রেরণা মতে কাজ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তখন কি একটা আকর্ষণে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিতে ব্যাকুল হইয়াছেন, য়ুরোপে থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না। আমরা কি এরূপ মনে করিতে পারি না, যে তাঁহার ফিরিয়া আসাটা বিধাতারই ইচ্ছা, কারণ এক্ষণে তাঁহার নিজের দেশে দেশবাসীদিগের উপকারের জন্য তাঁহার উপস্থিতির বড়ই প্রয়োজন।

শ্রীমধুব্রত।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ধ্রুবের বন-গমন

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে অঙ্কিত

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৮ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্রিটিশ-শাসনের এক যুগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে হেষ্টিংস ও চৈৎসিংহ এই দুইজনের মধ্যে এই শোচনীয় ঘটনার জন্য কে দোষী, তাহা স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে—চৈৎসিংহের কিরূপ অধিকার ছিল? এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে ঐতিহাসিক এই ব্যাপারে কখনই ন্যায়বিচার করিতে পারিবেন না। হেষ্টিংসের মিত্র ও শত্রু উভয় পক্ষই চৈৎসিংহের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছেন। পার্লামেণ্ট মহাসভায় হেষ্টিংসের বিচার-কালে বার্ক বলিয়াছিলেন এবং বহু পরিশ্রম করিয়া বিবিধ উপায়ে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, চৈৎসিংহ স্বাধীন নৃপতি ছিলেন; এবং ইংরেজসরকারে বাৎসরিক ২৩ লক্ষ টাকা কর দান ব্যতীত তিনি সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন ছিলেন। মিল ঐতিহাসিক কি না, তাই বার্কের ন্যায় অতটা ওকালতি করিতে পারেন নাই। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে চৈৎসিংহ নৃপতি ছিলেন। Select Committeeর রিপোর্টে চৈৎসিংহকে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রাজা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হেষ্টিংস পার্লিয়ামেণ্টে কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন যে, রাজা চৈৎসিংহ কেবলমাত্র একজন "জমীদার" ছিলেন।

এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য—চৈৎসিংহ কি সত্যই স্বাধীন নৃপতি ছিলেন? ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ইহা নিশ্চয় বলিতে হইবে যে, তিনি যাহা-কিছু হউন স্বাধীন ভূপতি কখনও ছিলেন না। বারাণসী প্রদেশে স্বাধীনতা জিনিসটা একটু বেশী প্রাচীন বলিয়া ইতিহাস প্রমাণ দেয়। চৈৎ-

সিংহের ছয় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই পুণ্য বারাণসী-ধাম স্বাধীনতা হারাইয়া যবন-করতল-গত হইয়াছিল।

মিলের ইতিহাসের টীকাকার উইলসন্ সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, বারাণসী খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই স্বাধীনতা হারাইয়াছিল (মিলের ইতিহাস, উইলসন্ কৃত সংস্করণ, পৃঃ ৩৬২)। এ বিষয়ে হেষ্টিংসের চরিতাখ্যায়ক ফরেষ্ট সাহেবও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত অন্য অনেক বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত অনেকটা নির্ভুল। ফরেষ্ট সাহেবের মতে রাজা চৈৎসিংহ পূর্ব্বে নবাব সুজা-উদ্দৌলার এবং পরে ইংরেজের অধীন ছিলেন। আর একটু ভাবিয়া দেখিলে এই বিষয়ে বিশেষ মতভেদের সম্ভাবনাই থাকে না। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, "রাজা" চৈৎসিংহ প্রথমে অযোধ্যার নবাব-উজীরকে এবং পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিয়মিত বার্ষিক কর দিতেন; এবং ইহাও স্থির যে, "রাজা" চৈৎসিংহের রাজধানী বারাণসীধাম ১৭৭৫ সালে অযোধ্যার নবাব-উজীরের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লাভ করেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চৈৎসিংহ কখনও স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজের পদানত হয় নাই। তখনও অনেক স্বাধীন নৃপতি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রে পেশোয়া-গণ, মহীশূরে হায়দর আলি এবং অন্যান্য প্রদেশে বিবিধ নরপতিবর্গ স্বীয় প্রাধান্য তখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। রাজা চৈৎসিংহ নামে "রাজা" আখ্যা ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। কোনও স্বাধীন নৃপতি অন্য কোনও রাজ-সরকারে বার্ষিক রাজস্ব প্রেরণ করেন না, বা পাট্টা সনদ গ্রহণ করিয়া নিয়মিত কর-দানের অঙ্গীকার-যুক্ত কবুলতি প্রদান করেন না। ১৭৭৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক রাজা চৈৎসিংহকে প্রদত্ত পাট্টা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে রাজা চৈৎসিংহ কোম্পানীর অধীনে সামন্তরাজের অধিকার ভোগ করিতেছিলেন।

এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের মতে কেবল একটী প্রশ্ন ঐতিহাসিকের নিকট উত্তরের অপেক্ষা করে। চৈৎসিংহ কি বার্ষিক রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কোন কর কোম্পানীকে দিতে বাধ্য ছিলেন? উইলসন্ সাহেবও এই কথা বলিয়াছেন, যে দিক্ দিয়া এই ঘটনার যুক্তিযুক্ত মত বিচার করিতে হইবে—কোম্পানী অতিরিক্ত কোন রাজস্ব বা কর চাহিলে রাজা চৈৎসিংহ কি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন?

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক্ষণে অতীব সহজ। ফরেষ্ট সাহেব তাঁহার State Papers গ্রন্থে যে সকল সনদ, পাট্টা, কবুলনামা ও কবুলতি ছাপিয়াছেন এবং অন্যান্য দলিল যাহা পরে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, রাজা চৈৎসিংহ তাঁহার নির্দ্ধারিত বার্ষিক রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু দিতে বাধ্য ছিলেন না।

প্রথম দলিল যাহা আমরা এই বিষয়ে পাই তাহা ফরেষ্ট সাহেবের State papers

গ্রন্থের প্রথম ভাগে ৫৬ পৃষ্ঠায় ছাপা আছে। সেটী নবাব সুজাউদ্দৌলা কর্ত্তৃক রাজা চৈৎসিংহকে প্রদত্ত কবুলনামা। এই কবুলনামা হেষ্টিংসের সম্মুখে স্বাক্ষরিত হয় এবং হেষ্টিংস স্বয়ং উহাতে সাক্ষীরূপে সহি করেন। তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে যে, কবুলতিতে নির্দ্ধারিত জমার অতিরিক্ত ভবিষ্যতে কখনও কিছু চাহিবে না।

এই দলিলটীর সম্পাদনে একটু গূঢ় ইতিহাস আছে এবং হেষ্টিংসের তাৎকালিক একটী পত্র পড়িলে তাঁহার সত্য কি অভিপ্রায় তাহাও উপলব্ধি করা যায়। হেষ্টিংস ১৭৭৩ সালে নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত কাশীতে সাক্ষাৎ করেন। তথায় বারাণসী-রাজ সম্বন্ধে দুইজনের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হয় এবং হেষ্টিংসের অনুরোধেই নবাব রাজা চৈৎ সিংহের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত সমর্থন করেন। হেষ্টিংস্ Select Committee-কে ১৭৭৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে যে বিস্তৃত রিপোর্ট দেন, তাহাতে সকল কথা লিখিত আছে। হেষ্টিংস্ লিখিয়াছেন—"আমার সম্মুখেই কবুলনামা স্বাক্ষরিত হয় এবং আমি তাহাতে সাক্ষীরূপে সহি করি। উজীর তাঁহার পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত মোটেই বলবৎ মনে করেন না এবং তিনি বার বার আমার অনুমতি চাহিতেছিলেন যাহাতে তিনি রাজার নিকট হইতে লতিফ্‌গড় এবং বিদ্‌গিগড় দুর্গদ্বয় কাড়িয়া লইতে পারেন এবং রাজস্ব ব্যতীত রাজার নিকট হইতে আর ১০ লক্ষ টাকা আদায় করিতে পারেন। আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তিনি অত্যন্ত অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন। উজীর

তর্ক করিলেন যে, এলাহাবাদের সন্ধির সর্ত্ত কেবল রাজা বলবন্ত সিংহের সম্বন্ধে খাটে, তাঁহার উত্তরাধিকারীর পক্ষে উহা আর চলে না। আমি স্বীকার করিতেছি যে, সন্ধির ভাষায় এই কথার বেশী বলা চলে না, কিন্তু আমি মনে করিতে পারি না যে রাজা কিম্বা লর্ড ক্লাইভ এই মনে করিয়া ঐ সন্ধি করিয়াছিলেন। কোম্পানী কিম্বা এই গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অন্য রকম বুঝিয়াছিল, এবং উজীরও রাজা চৈৎসিংহের জমিদারী পাইবার সময় তাঁহার কার্য্যের দ্বারা এই বিষয়ে সকল সংশয় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাজার উত্তরাধিকার এবং সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনও কোম্পানীর আশ্রয় ব্যতীত আর নিরাপদ নহে এবং ন্যায়, ধর্ম্ম, বিষয়-বুদ্ধি সকল দিক্ হইতেই তাঁহাকে আমাদের আশ্রয় দান করা একান্ত কর্ত্তব্য।"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—যে, হেষ্টিংস্ রাজা বলবন্ত সিংহের সকল অধিকার যাহাতে রাজা চৈৎসিংহ ভোগ করিতে পান, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। পূর্ব্বোক্ত রিপোর্ট সত্যই প্রমাণ করে যে, হেষ্টিংসের মতে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট চৈৎসিংহের সকল দাবী ও অধিকার যাহাতে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং তাহার অণুমাত্র অন্যথা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মতে অমার্জ্জনীয়। সেইজন্য কবুলতিতে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত ছিল—"ভবিষ্যতে কখনও রাজস্বের অতিরিক্ত কর চাওয়া হইবে না।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নবাবের সহিত রাজার না-হয় এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহাতে কোম্পানীর পূর্ব অধিকার[illegible]

কেন ব্যতিক্রম হইবে? তাহার উত্তর এই যে, কোম্পানীর বারাণসী-রাজের উপর অধিকার নবাব-উজীরের অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, কারণ সন্ধির দ্বারা নবাবের অধিকারই কোম্পানী লাভ করিয়াছিল। তাহার বেশী কিছু দাবী করিতে হইলে সেরূপ সর্ত্ত স্পষ্ট লেখা থাকা চাই। রাজা চৈৎসিংহের অবস্থা নবাবের অধীনে যাহা ছিল, তাহার নূতন প্রভু কোম্পানীর অধীনেও তাহাই থাকিবে। এ বিষয়ে বৃথা তর্ক না করিয়া কাশীরাজের বিদ্রোহের পর কোম্পানী কর্ত্তৃক ১৭৮১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে প্রচারিত ইস্তাহার পাঠ করিলে পাঠকমাত্রেই নিঃসংশয় হইতে পারিবেন। উহা State Papers গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ৭৯৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। তাহাতে কোম্পানীর পক্ষে স্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছিল, যে "রাজা তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রভু নবাবের অধীনে যে সকল অধিকার ভোগ করিতেছিলেন তাহা কোম্পানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে গবর্ণর-জেনারেলের দ্বারা তাঁহার যথাযথ বজায় ছিল।"

কোম্পানী যে বার্ষিক রাজস্বের অতিরিক্ত কিছু রাজা চৈৎসিংহের নিকট হইতে দাবী করিতে পারিতেন না, তাহা ১৭৭৫ সালের ৩রা মার্চের কৌন্সিল মিটিংএর রিপোর্টে আরও স্পষ্টভাবে হেষ্টিংস্ ও বারওয়েল সাহেবদের মন্তব্যে লিখিত আছে। ফ্রান্সিস্‌ও সেইরূপ মন্তব্য আরও তীব্র ভাষায় লিখিয়াছিলেন। বারাণসী নবাবের নিকট হইতে কোম্পানীর হস্তগত হওয়ার পরেই ১৭৭৫ সালে ১২ই জুন কলিকাতার বোর্ডের সভা হয়। সেই সভায় রাজা চৈৎসিংহের সম্বন্ধে হেষ্টিংসের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, যতদিন রাজা চৈৎসিংহ বার্ষিক রাজস্ব নিয়মিতভাবে দিবেন, তাঁহার উপর কখনও কোন কারণে কোম্পানী আর কোন দাবী করিবেন না; এবং কেহ তাঁহার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা কোন প্রকারে তাঁহার রাজত্বে শান্তির ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না।" কেহ যদি State Papers গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে ৪০২ পৃষ্ঠা দেখেন তাহা হইলে একটা বড় বিস্ময়কর জিনিস দেখিবেন। হেষ্টিংস্ কেবল চৈৎসিংহের সুবিধা করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে তাঁহার ভবিষ্যতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য রাজা চৈৎসিংহের অধিকার অর্থে কি বুঝায় তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন। রাজার "অধিকার" অর্থে—"A complete and un-controlled authority under the acknowledged sovereignty of the Hon'ble Company in the Government of the country dependent on him in the collection of the revenues, and in the administration of justice"—"কোম্পানীর প্রাধান্য স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার অধীনস্থ ভূখণ্ডে রাজস্ব-সংগ্রহ এবং বিচার-কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ এবং অক্ষুণ্ণ অধিকার।"

কোম্পানী রাজাকে যে সনদ দিয়াছিলেন তাহাতে বার্ষিক ২৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ ব্যতীত আর কোন কথা ছিল না। রাজা যে কবুলতি সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিয়মিত করদানের প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন এবং [illegible]

ছিলেন, "নির্দ্ধারিত করদান ব্যতীত আমার উপর কোন দাবী থাকিবে না, সেই মর্ম্মে আমি এই কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম।"

হেষ্টিংসের চরিতাখ্যায়ক উইল্সন্ এবং ফরেষ্ট সাহেব ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, চৈৎসিংহের নিকট বার্ষিক রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কর ন্যায়তঃ আদায় করিবার অধিকার কোম্পানীর ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ উইল্সন্ ও ফরেষ্ট সাহেব উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

রাজা চৈৎসিংহের কবুলতির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া ফরেষ্ট সাহেব তাহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন। কবুলতিতে রাজা চৈৎসিংহ অঙ্গীকার করিয়াছেন—"আমার দেশের শান্তি এবং মঙ্গলের জন্য যাহা-কিছু আবশ্যক তাহা আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিব।" ইহা হইতে ফরেষ্ট সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "দেশের শান্তি এবং মঙ্গলের জন্যই চৈৎসিংহের নিকট অর্থ ও সৈন্য কোম্পানী চাহিয়াছিলেন এবং তাহা দিতে অস্বীকার করায় চৈৎসিংহের অঙ্গীকার-ভঙ্গের গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহাকে শাস্তি দেওয়াই বিধেয়" ফরেষ্ট সাহেব বেশ চতুরভাবে কবুলতির এই সর্ত্ত হেষ্টিংসের স্বপক্ষে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কবুলতি তিনি নিজেই তাঁহার State Papers গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ৫১৫ পৃষ্ঠায় ছাপিয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়। কারণ, উপরিউক্ত কয়েক ছত্রের পরেই কবুলতিতে আছে, রাজা চৈৎসিংহ অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি জনগণের উন্নতির জন্য, কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য এবং রাজস্ব-বৃদ্ধির জন্য বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিবেন। এ কথায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাজা চৈৎসিংহ দেশ-অর্থে বারাণসী প্রদেশই বুঝিয়াছিলেন; ফরেষ্ট যে 'দেশ' অর্থে সমগ্র ভারতবর্ষ ধরিয়াছেন, তাহা তাঁহার কপোল-কল্পিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রিয়ার উদ্দেশে

(৫)

তোমার সেই প্রথম চিঠির পর তিন সপ্তাহ কোন চিঠিই পেলুম না। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার আশা করবার অধিকার আমার কোথায়? তুমি আমায় লিখবেই বা কেন? তোমার কাছে পথিক বই আমি ত আর কিছু নই! তোমার কাছে আর কিছু হবার যদি ইচ্ছে থাকতো তবে সেটা পরীক্ষা করে দেখলেই চলতো। বিদায়ের রাতে যদি তোমার কাছে সব কথাই বলতুম—আচ্ছা, যদি বা বলতুম—তা হলে দুজনের কি উপকারই হ'তো! তুমি কেমন করে আমায় গ্রহণ করতে তা বুঝতেই পারছি না। কিন্তু তবুও তুমি যে আমার অভাব বোধ করছো একথাটা জানতে আমার ভারি সাধ যায়। কোন্

মেয়ে আমার জন্যে ভাবছে এ জ্ঞানটা এই নিঃসঙ্গ নিরালা জীবনে বড় প্রীতিপদ—মনে বলের সঞ্চার করে।

কি লিখলুম পড়ে দেখছি। যা লিখেছি তা মোটেই পুরুষোচিত হয়নি। এই যে নিজের উপর করুণা এটি সৈনিকের সব চেয়ে বড় শত্রু। সহ্য করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে ভোলা—নিজের দেহ, নিজের দুঃখ-বেদনা, নিজের যা-কিছুর দাম না দেওয়া—এই জীবন-মৃত্যুর খেলা—যে আদর্শের জন্যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছি এইটিই সব চেয়ে বড় করে দেখা।

প্রতি সৈনিকের জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে আর সহ্য করতে পারে না! দেহে সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হতে পারে, কিন্তু সে বুঝতে পারে যে সেই দিনটা ক্রমেই এগিয়ে আস্‌ছে যেদিন সে মনে ও দেহে একেবারে ভেঙে পড়বে। অনেক-দিন অপেক্ষার পর হয়ত সেদিন এল না, কিন্তু ভেঙে পড়বার দিন যে এগিয়ে আসছে এই নিঃসংশয়তায় সে একেবারে ভয়ে অভিভূত হয়ে যায়। ছোটখাট ব্যাপারের মধ্যে তার এই দুর্ব্বলতা ও ভয় আত্মপ্রকাশ করে। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা এতদিন তাকে বিশ্বাস করে এসেছেন, কিন্তু এই সময় থেকে তাকে চৌকি দিতে থাকেন, তার সাহসকে সন্দেহ করেন।

আমাদের দলে এমন একজন ছিল। সুদক্ষ নিশানাদার টেলিগ্রাফার প্রভৃতির দল থেকে দুঃসাহসীদের নিয়ে একটা দল তৈরী হ'ল। তাদের কাজ হচ্ছে এগিয়ে এগিয়ে চলা—পর্য্যবেক্ষণ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে গোলন্দাজদের নিশানা দেওয়া। যেমন করেই হোক সব রকম বিপদের মুখে গোলন্দাজদলের সঙ্গে তাদের সংস্রব রাখতেই হবে। খবর পাঠাবার তার যদি নষ্ট হয়, গোলাবর্ষণ যতই ভীষণ হোক, লাইনস্‌ম্যানকে গিয়ে তা সেরে আসতে হবে। আমি যার কথা বল্‌ছি সে লাইনস্‌ম্যান। যুদ্ধের প্রথমেই সে যোগ দিয়েছিল—সাহসের জন্যে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রায় দু'বছর ধরে গোলাবর্ষণ সহ্য করে তার স্নায়ুর জোর যেন কমে গেল। প্রথমে আমরা তা বিশ্বাসই করিনি—শীগ্‌গীরই কিন্তু তা সকলের চোখে পড়লো। তার দৃষ্টি এলো-মেলো হয়ে এল—যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাতে না পালাতে হয় তার জন্যে সে যেন বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলো। গোলাবর্ষণের মধ্যে শ্রান্ত ঘোড়ার মত সে কেঁপে কেঁপে উঠতো। অবশ্য তাকে ছুটি দেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের দলে অনেকে মারা পড়েছে, কাজেই তাকে ছাড়তে পারলুম না। এই অবস্থায় কোনরকম দয়া দেখানো উচিত নয়। তার ফলে এ ভয়টা সংক্রামক হয়ে উঠতে পারে। সৈনিকের কাছে তার কর্ত্তব্যটুকুই শুধু আশা করা হয়, তার দিক থেকে কোন ওজর, আপত্তি গ্রাহ্য করা হয় না, এবং যখনই সে অকৃতকার্য্য হয় তখন সবাই তাকে চৌকি দেয়। এ বেচারী একদিন বীর ছিল, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দেখতে লাগলো যে ক্রমেই সে কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কয়েকজন তার এই অবস্থার কথা জানতে পেরেছি এই ভাবনাটা তার কাল হয়ে উঠলো। অন্তরে তার সাহসের

অন্ত ছিল না, কারণ শেষ পর্য্যন্ত সে হাল ছাড়ে নি।

আমরা যেখানে ছিলুম সেখানে জার্ম্মাণ-গোলা সারা দিনরাত আমাদের ব্যস্ত করে তুলেছিল। যে-কোন মুহূর্ত্তে ভেঙে পড়তে পারে এমন একটা বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের নীচে আমরা আড্ডা নিয়েছিলুম। এর মধ্যেই শত্রুরা বেশ অব্যর্থ লক্ষ্যে এর উপর কয়েকটা গোলা চালিয়েছে। হঠাৎ সে লোকটা জামা খুলতে লাগলো—তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—সে অমন করছে কেন? কিন্তু তাতে সে কান দিল না। পোষাক খুলে যেখানে খুব গোলা বৃষ্টি হচ্ছে সেইখানে সে ছুটে চলে গেল। একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল সে!

এই জন্যেই নিজের উপর করুণার সময় সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তোমার কথা আর বেশী করে ভাববো না। এমন করে কাজে মন দিতে হবে যেন তোমায় আমি কখনও দেখিনি। আমায়—

কিন্তু এযে প্রকাণ্ড মূর্খামি! স্মৃতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাব কি করে? তোমায় যখন ভুলতে পারবো না, তোমার স্মৃতিটি—আমার কাজে লাগাবো। কে যেন বলেছেন বোধ হয় Epiclilus, যে প্রতি বোঝার দুটো আংটা আছে—একটা দিয়ে তাকে সহজে বহন করা যায়, অপরটা দিয়ে যায় না। জ্ঞানীরা সেই আংটার খবর জানেন যা দিয়ে বোঝা বহন করা সহজ। এই উপায়ে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কাজে লাগাবো। যুদ্ধের শেষে যদি বাঁচি, তোমায় আমি খুঁজে

লক্ষ্য হবে। এখন কিন্তু তোমার সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখা আমায় বন্ধ করতে হবে। আমরা দুজনেই এমন একটা কাজে হাত দিয়েছি যা উভয়ের পক্ষেই সমান ভাবে নিঃসঙ্গ এবং এমন পল্‌কা যে, স্বার্থপরতার সামান্য আঁচেই তা নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

সপ্তাহখানেক আগে অদ্ভুত ঘটনাচক্রে একখানা বই পেয়েছি, তাতে আমার সঙ্কল্পটা আরও দৃঢ় হয়েছে। আমাদের পদাতিকদল যাতে এগিয়ে যাবার পথে বাধা না পায়, সেই জন্যে শত্রুদের তারের বেড়া কাটবার প্রয়োজন হয়। ম্যাপের বাঁকা লাইন দেখে, কোন্‌দিক থেকে বাস্তবিকই সত্যি তারটা দেখা যাবে, তা বলা ভারি কঠিন। শ্র্যাপনেল দিয়ে তার কেটে আর বন্দুকের গুলিতে খুঁটী উপড়ে দেওয়া অবশ্য সহজ, কিন্তু যার হাতে এ কাজের ভার থাকে তাকে সকল দিক বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। উচ্চ-কর্ম্মচারীদের মধ্যে একদিন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, এ দুঃসাহসিক কাজের ভার নেবে কে? ট্রেঞ্চের ধারে ধারে ঘুরে আর অজানা দেশে বেরিয়ে পড়ে এমন একটা জায়গায় আঘাত করতে হবে, যাতে আমাদের কাজের সুবিধা হয়ে যায়। ম্যাপ ত আর সব সময় ঠিক আঁকা হয় না, তাই নিজেদের একবার ভাল করে দেখার প্রয়োজন হয়।

আমার একটা উঁচু জায়গা জানা ছিল। সেখান থেকে আমার অভিপ্রেত জায়গাটা দেখতে পাওয়া যায়। সেটা একটা কামানের গর্ত্ত, এখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

বলা শক্ত। একটা সঙ্কীর্ণ নালা দিয়ে সেখানে পৌঁছান যায়, কিন্তু একটু নাড়াচাড়া করলে শত্রুর দৃষ্টিপথে পড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা, কারণ তারা সব সময় বন্দুক নিয়ে ওৎ পেতে আছে। তাদের একজন এই নালার পথটা খুব আয়ত্ত করে তুলেছিল—আমাদের দলের লোকেরা তার নাম দিয়েছিল "বাচ্ছা বিলি"। যাতে সে লোকটা আমাকে গুলি করবার সুবিধা না পায়, তাই সকালে কুয়াশা কাটবার আগেই মাটিতে প্রায় শুয়ে শুয়ে সেইখানে পৌঁছলুম। সঙ্গে ছিল একজন টেলিফোন-ওয়ালা। ঠিক করলুম সারাদিন সেখানে থেকে, কাজ সেরে রাত্রে আড্ডায় ফিরবো।

সেখানে গিয়ে দেখি চারদিকে বীভৎস ব্যাপার। বুঝলুম এখানে খুব ভয়ানক একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রবেশ-পথে রাশিকৃত মৃত জার্ম্মান পড়ে আছে, যেন তারা বার হবার মুখেই—আমাদের লোক তাদের আক্রমণ করে মেরে ফেলেছে! হাত দিয়ে কেউ চোখ ঢেকে কেউ মুখ ঢেকে এমন অসহায় ভাবে পড়ে আছে, যে দেখলে মায়া হয়। এই গর্ত্তটার সম্বন্ধে আমি ভুল ধারণা করেছিলুম, কারণ ধুলো বালি ধ্বংস-স্তূপে এটা এত ভর্ত্তি হয়ে আছে যে ভিতরে যাওয়া অসম্ভব। পাশে একটা dugout ছিল—তার নীচে নামবার সিঁড়িও পেলুম। হেলানো কাঠের আবরণে আত্মগোপন করে সেখানে গেলুম, কিন্তু এতে করেও শত্রুর দৃষ্টিপথ অতিক্রম করেছি বলে মনে হলো না, তাই গর্ত্তের ভিতর ঢুকে চারদিক দেখতে লাগলুম।

সিঁড়ির নীচে সরু তারের মাচানওয়ালা একটা ঘর। ডান দিকে একটা সুড়ঙ্গ—সেটা এমন ভেঙে গেছে যে, পার হতে হলে হাতে পায়ে ভর দিয়ে কষ্টে যাওয়া যায়। এসব জায়গায় বাইরে যাবার দ্বিতীয় পথ জানা দরকার, কারণ একটা বোমা এসে গর্ত্তের মুখে পড়লেই তা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই জানুর উপর ভর দিয়ে সুড়ঙ্গের অপর মুখটা কোন্ দিকে তা দেখতে বেরলুম। কাজটা মোটেই সুখকর বোধ হ'ল না, কারণ উপর থেকেময়লা পড়ে পড়ে এখানকার অনেকগুলি পুরাণো বাসিন্দাকে বেশ করে চাপা দিয়েছে, কাজেই আমাদের গুঁড়ি মেরে যাওয়াটা চড়াই-উৎরাই পার হওয়ার মত মনে হল। কুড়িগজ আন্দাজ গিয়ে দেখি আবার একটা কামরা। মৃতদেহ, ধ্বংসস্তূপ আর ভিজে মাটির হাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। মাথার উপরে অনেক দূরে আলোর আভাস পাওয়া গেল। কাছে বিজলী-বাতির ব্যাটারী ছিল, তার আলোতে যা দেখলুম তাতে চমক লেগে গেল।

মাচার ধারে একটা মস্ত জার্ম্মান বসে আছে। প্রায় তিন সপ্তাহ হলো সে মারা গেছে, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন জীবন্ত। মাটিতে একখানি বই পড়েছিল, তারই হাত থেকে খসে পড়েছে। সেটা কুড়িয়ে নিলুম। অদ্ভুত! তার মলাট আবার খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া—বইয়ের নাম The Research Magnificient. H. G. Wells-এর লেখা। পাতা উল্টে দেখতে লাগলুম। জার্ম্মান ভাষায় মন্তব্য লেখা একটা চিহ্নিত অংশ প্রথমেই আমার চোখে পড়লো। অংশটা হচ্ছে—"আমাদের সবায়েরই মতো জীবনকে সে

এক ভাবে নেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু অন্য সবায়ের যেমন হয়, জীবন তাকে অন্য পথে নিয়ে গেল। জীবনে তার অনেক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল………" সেইখানেই পেন্সিলের দাগ শেষ হয়েছে। আমি এই দার্শনিকের দিকে চাইলুম—আজ সবায়ের অজ্ঞাতে মাটির নীচে মরে পড়ে রয়েছে সে। দাড়ি বড় বড় হয়েছে, চোখ দুটো ভিতরে বসে গেছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, আর মাথাটা হাবার মাথার মত ঘাড়ের উপর নড় নড় করছে। তার রগের উপর একটা আঘাতের চিহ্ন, সেখানে একটা বোমার আঘাত লেগেছিল। মনে হল যেন শুনতে পাচ্ছি, তার মাথার ভিতর সেই কথা গুলো বাজছে—"জীবনে তার অনেক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। সবায়ের ভাগ্যে যা ঘটে তারও তাই ঘটলো—জীবন তাকে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অপ্রত্যাশিত পথে নিয়ে গেল।" দৈহিক যন্ত্রণায় যেন আমি কাতর হয়ে উঠলুম—শুধু যে তার জন্যে তা নয়—এ পৃথিবীর সবায়ের জন্যেই। এর পরে আলকাতরার মত কালো সুড়ঙ্গের চড়াই-উৎরাই ঠেলে যাওয়া ভয়ানক বীভৎস বলে মনে হল।

প্রবেশপথের সর্ব্বোচ্চ ধাপে বসে আমি বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলুম। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর যে বই প্রকাশিত হয়েছে, এই জার্ম্মান সেই বই কেমন করে পেলে তাই ভাবছিলুম। পরে সব বুঝতে পারলুম। অন্য অনেক অংশ দাগ দেওয়া ছিল দাগের পাশে পাশে, পেন্সিলে লেখা মন্তব্য—কিছু ইংরেজিতে, কিছু জার্ম্মানে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হাতের লেখা। চিহ্নিত অংশগুলি পড়তে লাগলুম—প্রায় সব অংশগুলি ভয় এবং ভয় জয় করা সম্বন্ধে। "ভয় জয় করাই হচ্ছে মহৎ জীবনের ভিত্তি।" এ-লাইনটা বেশ করে দাগ দেওয়া ছিল।

আবার, "বাল্যকালে মনে করতুম যে ভয়কে চিরকালের মত জয় করবো। তা কিন্তু হয় না। আমি সব সময়েই দেখেছি যে প্রতিবারেই নতুন করে ভয়কে দমন করতে হয়।" ইংরেজ ভদ্রলোকটীর মন্তব্য তার জাতের উপযুক্ত—"ঠিক তাই। কিন্তু সে কথা স্বীকার না করাই উচিত।" বইয়ের মালিক এই ইংরেজকে মেরে জার্ম্মান ভদ্রলোক তাঁর যা টীকা লিখেছেন, তা সে পাতা ভরে পরের পাত পর্য্যন্ত গেছে। জার্ম্মান-ভাষায় আমার দখল বড় বেশী নয়, কাজেই তাঁর মন্তব্য বুঝতে পারলুম না।

এইটি শেষ নির্ব্বাচিত উক্তি। জার্ম্মান ভদ্রলোক এবার চুপ করে গিয়েছেন, কিন্তু ইংরেজের মন্তব্য লিখে রাখবার মতো। উক্তিটা হচ্ছে—"ছেলেবেলা থেকেই ভয়কে Benham-এর একটা সুগভীর লজ্জার বিষয় বলে ধারণা ছিল এবং এই ভয়ের হাত থেকে মুক্তির জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতো। তার মনে হ'ত, যে ভয় পায় সে সম্ভ্রান্ত হতে পারে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে বুঝতে পারলে যে, ভয় পায় সকলেই, কিন্তু প্রকৃত সম্ভ্রান্ত সেই, যে ভয়কে জয় করে এবং অগ্রাহ্য করে, একেবারে মন থেকে ছেঁটে ফেলে দেয় না।" ইংরেজের মন্তব্য হচ্ছে—"বেড়ে বলেছ, এইবার পথে এস ত খুড়ো!"

কুয়াসা এখনও পরিষ্কার হয়নি—পরিষ্কার হবার কোন চিহ্নই দেখছি না, কাজেই এই

অজানার দেশে এই শীতের সকালে আমি Benham নামে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের জীবনে মহৎভাবে বাঁচবার সমস্যাটার সম্যক্ আলোচনায় মন দিলুম।

নিজের মনের খানিকটা বুঝতে পেরে কখনও কি তুমি ভাবতে বসেছ—'কি অদ্ভূত আমি—আমি কি সত্যিই এমন'—এ-কথা কি কখনও তোমার মনে হয়েছে? অপরে যেমন করে তোমারি সম্বন্ধে ভাবে, নির্ম্মম হয়ে তুমি নিজের সম্বন্ধে একবার তেমন করে ভাবতে বসো। বই পড়তে পড়তে আমার ঠিক ঐ রকম ভাব এসেছিল।

খুব কম করে বল্লেও আমার মনে হয় এই Benham-টি একটি আস্ত আত্মম্ভরী লোক (prig), তার মুখের একটা ছবি আমার মনে জাগছে। সাদা মুখ—কপাল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—মস্তিষ্কের পরিমাণ বেশী এবং দেহ সেই অনুপাতে ছোট। খুব কম বয়েসেই সে আবিষ্কার করলে যে তার ভিতরে কোথায় একটা গোলমাল আছে এবং ঠিক করলে জগতে সুসঙ্গতির অভাবই তার কারণ। সে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করলে যে নিজেকে ঠিক করতে হলে জগৎকে ঠিক করাই তার একমাত্র উপায়। অবশ্য জগৎ আদৌ সোজা ভাবে চলতে চাইলে না—সে কোনকালেই তা চায় না। চিরকালই সে তার যীশু খ্রীষ্টদের ক্রুশে বিঁধে মারে। এই Benham সত্যিই স্বপ্ন দেখলে যে সে দ্বিতীয় যীশু হতে পারে—এক রকমের দেব-মানব—যে প্রেমের চেয়ে বুদ্ধিশক্তিতে জাতিকে মহান্ করে তুলতে পারে। তার বিপদ ছিল যে, তার নিজের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য সিদ্ধান্তগুলোতে সে মহানও ছিল না, দেবতাও ছিল না। কোন জিনিষ সম্বন্ধে সে একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারতো না। সে ছিল ভীরু; সাহসের চেষ্টা সে করতো কিন্তু মরার দিন পর্য্যন্ত সে ভয়কে জয় করতে পারলে না। ছেলেদের উপর তার কোন সহানুভূতি ছিল না, অথচ শূন্যদৃষ্টিতে নিজেদের ছেলেবেলার কথা নিয়ে সে কেবলই বক্‌বক্ করেছে।

মেয়েদের নিজেকে ভালবাসতে সে বাধ্য করতো, কিন্তু মনে মনে ভালবাসবার উপর তার ছিল খুব বেশী লোভ; যে ভালবাসা সে লাভ করেছে তা ধরে রাখবার মত ধৈর্য্যের ছিল তার অভাব। রাশি রাশি লোককে বাঁচাবার জন্যে তার মন আকুল হয়ে উঠতো, কিন্তু হাতের গোড়ায় প্রতিবেশীকে বাঁচাবার তার কোন চেষ্টাই ছিল না। সব অবস্থায় এবং সব সময়ে সে তার সৎ ইচ্ছাগুলোকে বস্তু থেকে তফাৎ করে কেবলমাত্র ধারণার উপর বাজে-খরচ করে ফেলতো। সে সারা-জীবন ধরে নিজেকে শিক্ষা দিচ্ছিল বড় রকমের আত্ম-বিসর্জ্জনের জন্যে, অথচ সেটা কাজে করবার মত তার মনের জোর ছিল না। ছোট ছোট দয়ার কাজ ছেড়ে সে মহাদেশের দুঃখ নিয়ে নিজের জীবনটাকে তিক্ত করে তুলেছিল। নিজেকে এই বিশ্বের রাজা করাই ছিল তার স্বপ্ন। এই স্বপ্নের সফলতার চেষ্টায় সে মানুষের মধুর স্নেহ-প্রেমকে দূরে সরিয়ে দিলে। মনে দেউলে হয়ে সে মরে গেল। দাঙ্গাকারীদের উপর সৈন্যদের গুলি চালান নিবারণ করবার জন্যে নিতান্ত অদ্ভুত ও অক্ষম-ভাবে চাকরের গামছা নাড়তে নাড়তেই সে মরে গেল। মেঘে-বোনা পতাকা উড়িয়ে

কল্পনার রথে নিজেকে সময়ের মধ্য দিয়ে ছুটে যাবার স্বপ্ন সে দেখতো। বাস্তবিক দেখতে গেলে সে যা করছিল, তা হচ্ছে, ইন্দ্রের দিকে সে একটা চাকরের গামছা উড়াচ্ছিল তাঁর বজ্রনিক্ষেপ নিবারণ করবার জন্য! ইন্দ্র যখন তার আদেশ অমান্য করলেন, তখন তার বিরক্তির আর সীমা রইল না।

আমি এই অদ্ভুত Benham-কে নিয়ে খুব মজা করছি, অথচ অতীত-জীবনে তার থেকে আমি বিশেষ ভিন্ন রকমের ছিলুম না। যদি তাই ধর, তা হলে এখনও আমার মধ্যে Benham-ত্ব খানিকটা আছে। তোমাকে ভালবাসি, এই কথাটা বলবার জন্যে তোমায় চিঠি লিখছি, যা তুমি কোনকালেই পড়তে পাবে না; তোমায় মুখ ফুটে বলবার আমার সাহস নেই। সে যেমন নিজেকে বোঝাত, আমি তেমনি নিজেকে বোঝাচ্ছি যে, তোমার কাছে হৃদয় খুলে না দেখানই ন্যায় ও সুন্দর। পুরোপুরিভাবে মানুষের যা করা উচিত আমি তা করিনি, অথচ Jack Holt তার স্ত্রীকে লাভ, করবার সময় তা সহজে করেছে। আমি বেশ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করছি, কিন্তু জানো আমার নিজের মতলব সম্বন্ধে আমি খুব নিশ্চিন্ত নই। তুমি ত দেখেছ সব জিনিষকে দশদিক থেকে দেখবার আমার শক্তি আছে। সাধারণ লোকে যেখানে কাজ করে, সেখানে আমি শুধুই বিচার করি; এটা আমার দুর্ব্বলতা! জীবন আমায় পাশ কাটিয়ে চলে গেছে—না—চলে যায়নি, তবে যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত পাশ কাটিয়ে গেছে বটে।

কি বিচিত্র জীবন আমায় পাশ কাটিয়ে চলে গেছে! এখন মরণের সাম্‌নে সব সময়ে বেঁচে আছি কিনা তাই বুঝছি এতদিন জীবনের ধরা-ছোঁয়া পাইনি কেন! আমার স্বপ্নগুলো বাস্তবের সংস্পর্শে এসে পাছে কলঙ্কিত হয়, তাই ভারি ভয় পেতুম। Oxford ছাড়বার পরেই পার্লামেণ্টে যাবার চেষ্টা করলুম। আমার বিশ্বাস ছিল বছর দশের মধ্যে দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করে দেবে। দলের ভিতরে এসে দেখলুম রাজ-নীতির অন্তরালে পরস্পরের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির তাণ্ডব চলেছে। শুধু যখন ভোটের দরকার হয়, তখনই কেবল রাজনীতিজ্ঞেরা জাতির জন্যে ভাবতে বসেন। এর প্রতিবাদস্বরূপ আমি পার্লামেণ্টের আসন ছেড়ে কিছুকাল গরিবদের বস্তি মধ্যে বাস করলুম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলুম, দারিদ্র্য নিরাপদে বাস করছে এবং পরোপকার ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব নোংরা এবং অশ্রদ্ধেয়। আত্ম-সন্তোষের উপর হাড়ে চটে আমি রুশিয়ায় চলে গেলুম—সেখানে যে নব-বিদ্রোহ জেগে উঠ্‌ছিল তাতে যোগ দিবার জন্যে। আবার নিজেকে মোহমুক্ত করলুম —দেখলুম আমার সহানুভূতির কোন দরকার নেই সেখানে। দেখে অবাক হলুম, যুবারা সব নিজের নিজের চোখ উপড়ে ফেলে বলে বেড়াচ্ছে যে, রুষ-সম্রাট তাদের চোখ কাণা করে দিয়েছে, এবং অত্যাচার-প্রপীড়িত বলে দেশের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করছে। পৃথিবীতে এমন লোকের অভাব নেই, যারা নিজেদের বিকলাঙ্গ করে কুৎসিত করবার জন্যেই জন্মায় এবং পরের ঘাড়ে সে দোষ চাপাতে আদৌ দ্বিধাবোধ করে না।

আমি ত বলেছি, জীবন চলে যাচ্ছিল; আর ভবিষ্যৎ-যুগের মঙ্গল-সাধনার অতি আগ্রহে আমি প্রাত্যহিক জীবনের সহজ সুন্দর মাধুর্য্যকে অবহেলা করছিলুম।

তারপরই এই যুদ্ধ বাধলো। যে মিথ্যা ভদ্রতার আবরণে আমরা নিজেদের ঢেকে-ছিলুম, তা ছিঁড়ে ফেলে কর্ত্তব্যের বর্ম্মে আমাদের সজ্জিত করলুম। কেমন করে ভালভাবে বাঁচাতে হয় তা জানতুম না। ভগবান একটা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে মরবার সুযোগ দিলেন। জীবন নিয়ে আমাদের এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখে তাঁর শ্রান্তি এসেছিল, তাই নরকের শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে সবই কত সত্য হয়ে উঠেছে! ঘৃণার অবিশ্বাসের সমস্ত ভুত আমাদের মন থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে—মানুষের চোখে যেন আত্মার অনির্ব্বাণ জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়েছে। যেখানে পাপকে দেখবো সেখানেই তাকে আঘাত করবার মত প্রাচীন ঋষিদের আদিম শক্তিটা যেন আমরা পুনরায় অর্জ্জন করেছি। আকাশ যখন ঢেকে যায় তখন আর সন্দেহ করি না যে, মেঘের ওপারে স্বর্গ ভেসে চলেছে।

"আমাদের সকলেরই মত জীবনকে সে একভাবে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সবায়ের ভাগ্যে যেমন হয়, জীবন তাকে একেবারে ভিন্ন পথে নিয়ে গেল—জীবনে তার অনেক উদ্দেশ্য ছিল…" এই অজানার দেশে যখন লুকিয়ে ছিলুম তখন এই সব কথাই ভাবছিলুম। জার্ম্মাণ ভদ্রলোকটিও মরবার আগে এই সব কথা ভেবে গেছেন এবং তাঁরও আগে এই-সব ভেবেছেন এই বইয়ের মালিক সেই ইংরেজ ভদ্রলোকটি। মহৎ কাজ করবার জন্যে তাঁরা দুজনেই প্রস্তুত ছিলেন—চেষ্টাও করেছিলেন তাঁরা—অথচ তাঁরা ছিলেন পরস্পরের শত্রু। যুদ্ধের আগে এই ভাব-বৈষম্য নিয়ে ভারি গোলে পড়তুম—এই দুটোর সমন্বয়ের নানা ব্যর্থ চেষ্টা করতুম। মনের মধ্যে একটা মহৎ করুণা লাভ করেছি, ত্যাগের কথা ভাবতে গিয়ে ছোটখাট মতলবের কথা আমি এখন ভুলে যাই। আমার বড় সাধ হচ্ছিল যে জার্ম্মানটি—যদি আমার মনের সব কথা জানতে পারতো!

কুয়াশা এখনও কাটে নি; খাবার সময়ও হয়ে এসেছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে সেই ভয়াবহ ঘরের ভিতর আবার গেলুম এবং তার পাশে খাবারের কিছু অংশ রেখে দিলুম। মনে হ'ল এতেই সে সব বুঝতে পারবে। মৃত্যুর স্পর্শে আমাদের সমস্ত বৈরতা লুপ্ত হয়েছে। বন্ধুর মত আমরা খাবার ভাগ করে খেয়েছি!

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

বর্ষারাত্রে

শাওন গগন ঘেরা সিন্দুর মেঘে
পশ্চিম হতে বায়ু বহে ঘন বেগে।
ঝম্ ঝম্ চলে বারি গলি জলধরে
ছুটায়ে গিরির বুকে শত নির্ঝরে।

কলকল রবে ধেয়ে ছুটে চলে জল
সবুজে ভরায়ে তোলে মরুতৃণ দল।
বসন্ত জেগে ওঠে তৃণ-পল্লবে
ঝরে পড়ে নীপ-রেণু ঘন সৌরভে।

আঁধার গগন হ'তে নামি শিরশিরে
গুরু গুরু রবে মেঘ নির্ঘোষি ফিরে।
শ্রাবণ রজনী বুকে সঘন আঁধারে
স্বপনের আনাগোনা চলে অভিসারে।

বাহি কত জনপদ, কত দূরপথ
গিরি-দরি-প্রান্তর চড়ি মেঘ-রথ
ছুটায়ে তড়িৎ-কশা, স্বপনের হাতে
হাত ধরাধরি করি এলে এই রাতে?

হেথা কোথা অতীতের ছায়াময় ঘর!
এযে অবারিত মাঠ গিরি-প্রান্তর!
ঠেলি যুগ-যবনিকা দাঁড়াইলে আসি,
ঘন মেঘে খেলে মুগ্ধ তড়িতের হাসি।

চেতনে ও অচেতনে ওগো একি ভেদ,
মিশে গেছে কোন্‌খানে যুগবাহী ছেদ!
সেই সব—সেই সব—সেই দুইজন,
মাঝখানে মহাকাল হ'য়ে অচেতন!

শ্রীনিরুপমা দেবী

মরণ-বাঁচনের কথা

২

বাংলার গ্রাম

পৌষের (১৩২৭) "ভারতীতে" আমরা বাঙালী জাতির ধ্বংস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে লোকের দৃষ্টি এদিকে কতকটা পড়িয়াছে দেখিতেছি। যেরূপ দ্রুতগতিতে ও নিশ্চিতরূপে আমরা ধ্বংসের দিকে যাইতেছি—সরকারী রিপোর্ট হইতেই তাহার হিসাব দিতেছি :—

(ক) বাংলার কতকগুলি জেলার জন্ম-মৃত্যুর হার—

জেলার নাম	জন্মের হার (হাজার-করা)	মৃত্যুর হার (হাজার-করা)
বর্দ্ধমান	২১'২	৫০'৫
বীরভূম	২৩'৭	৬২'৩
মেদিনীপুর	২৪'২	৪০'১
কলিকাতা	১৮'৫	৪২'২
নদীয়া	২৫'৬	৪৩'০
মুরসিদাবাদ	২৮'৯	৪৭'৩
রাজসাহী	৩২'৮	৪১'৫
দিনাজপুর	৩১'৬	৪৩ ৭
পাটনা	২৫'৭	৩৬'১

মালদহ	৩০.৫	৩৯.০
চট্টগ্রাম	৩০.১	৪১.৪
দার্জ্জিলিং	৩০.০	৪৮.৪

সমগ্র বাংলার ও বিলাতের জন্ম-মৃত্যু-হারের তুলনা করিলে ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট শুনা যাইবে—

(১৯১৯)

	জন্মের হার (হাজার-করা)	মৃতুর হার (হাজার-করা)
বাংলা দেশ	২৭.৫	৩৬.২
বিলাত	১৯.০	১৪.৩

এখন একবার দেখা যাক্ ম্যালেরিয়া ও কলেরা এই দুই যমের দূত কিরূপ ভাবে বাংলা দেশের লোক ধ্বংস করিতেছে ঃ—

বৎসর	কলেরা	ম্যালেরিয়া
১৯১৭	৪৫০২১	৮৮২৭৬৮
১৯১৮	৮২৩৭৯	১৩৫৭৯০৬
১৯১৯	১২৪৯৪৯	১২২৯২৫৭

বাংলা দেশের নেতারা স্বরাজ-স্বপ্নেই বিভোর, কিন্তু আর কিছুদিন এরূপ চলিলে বোধ হয় চিত্রগুপ্তের খাসমহলে স্বরাজের পার্লামেণ্ট বসাইতে হইবে।

যে মুষ্টিমেয় ধনী ও শিক্ষিত লোকেরা সহরে বাস করেন, তাঁহারা এই ভরাবহ ব্যাপারটা ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছেন কিনা সন্দেহ। কারণ বাংলা দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক গ্রামে বাস করে, আর ধ্বংসের লীলা প্রধানতঃ বাংলার গ্রামেই চলিতেছে। কিন্তু ধড় ও মাথার যোগ-সূত্র ছিন্ন হইলে শরীরের যে অবস্থা হয়, বাংলার সমাজ-দেহের আজ সেই অবস্থা। যে অজ্ঞ ও গরিব লোকেরা গ্রামে বাস করে, সহরবাসী ধনী ও শিক্ষিতের সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ নাই। তারা মরিল কি বাঁচিল, খাইল কি না খাইল, এ কথা চিন্তা করিবার ক্ষমতা বা সময় সহর-বাসীর নাই। তাই একদিকে শিক্ষিত সহর-বাসী বিশ্বপ্রেম, স্বরাজ, নিখিল মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি বড় বড় কথা আওড়াইতেছে; —অন্যদিকে অনাহার-ক্লিষ্ট অর্দ্ধ-উলঙ্গ গ্রাম-বাসী দিনান্তে একমুঠা ভাতের যোগাড় করিতে না পারিয়া, স্ত্রী-পুত্রকন্যার শীর্ণ মলিন মুখের দিকে চাহিয়া, মানব জন্মকে ধিক্কার দিতেছে। যে জমিদারের প্রজারা দুর্ভিক্ষে পতঙ্গের মত মরিতেছে, তিনিই হয়ত মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া বিদুষক-সভায় রাজনীতির কূট তর্কে, ইংরেজী বক্তৃতার তুবড়ী-বাজীতে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিতেছেন। হতভাগ্য পরাধীন বাংলাদেশ ছাড়া এমন অস্বাভাবিক দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথায়ও দেখা যায় না।

এক শতাব্দী পূর্ব্বেও বাংলার গ্রাম স্বাস্থ্য ও সম্পদে পূর্ণ ছিল। খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিলনা। দুইবেলা পেট ভরিয়া দুমুঠা খাইয়া, অতিথি-অভ্যাগতকে প্রসন্ন মনে লোক সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিত। পাড়ায় পাড়ায় নিমন্ত্রণ মহোৎসব প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। গ্রামের অন্নপূর্ণারা সেই যজ্ঞে সকলকে রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাওয়াইয়া জীবনকে সার্থক মনে করিতেন। দোল-দুর্গোৎসব, বারমাসে তের পার্ব্বণ অনেক ভাগ্যবানের গৃহেই হইত। আর গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া তাহাতে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া যোগ দিত। যাত্রা, হাফ-আখরাই, পাঁচালী গ্রাম্য জীবনের বড় কম স্থান অধিকার করিত না। একাধারে সাহিত্য-রস, ও ধর্ম্মোপদেশ বিতরণ করিয়া সরল গ্রামবাসীর

মনের ক্ষুধা মিটাইতে ইহারাই চেষ্টা করিত। পুরাণ-পাঠ, কথকতা প্রভৃতিও এই সকল কাজে অনেক সাহায্য করিত। এদিকে জীবিকার জন্যও কমলার কৃপায় বাংলার লোককে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইত না। বাংলার কৃষক মাটী চষিয়া বসুন্ধরার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইত না। কামার, কুমার, কাঁসারী, ছুতার, তাঁতি, জোলা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পীরা গ্রামের লোকের প্রয়োজনের জিনিষ যোগাইয়া সুখে জীবন যাপন করিত। বণিক ও মহাজনেরা রেলপথে ও জলপথে বাংলার বাণিজ্য-বহর বহিয়া ঐশ্বর্য্যের আমদানী করিত। ধনধান্যপূর্ণ উৎসব-মুখরিত বাংলা-দেশে আধি-ব্যাধির প্রকোপও বিশেষ কিছু ছিলনা। প্রায় সকল গ্রামেই ৭০।৮০ বৎসর বয়সের সবলকায় বুড়ার দেখা পাওয়া যাইত। ডাক পড়িলে লাঠি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইতে পারে, এরূপ জোয়ান ছোকরা ৪০।৫০ জন সকল গ্রামই যোগাইতে পারিত। বঙ্কিমবাবু যে লাঠির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন সে বিন্দু-মাত্রও কল্পনা নয়। এই বাঙালীই লাঠি হাতে করিয়া পর্ত্তুগীজ ও দিনেমার দস্যুদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। ক্লাইবের ঐতিহাসিক লাল পল্টনের দল ইহারাই গঠন করিয়াছিল। বেশী অতীতের কথার দরকার নাই। একশত বৎসর পূর্ব্বেও তখনকার বড়লাট বাংলার বল ও স্বাস্থ্যের প্রশংসা করিয়া ছিলেন।

একশত বৎসরের মধ্যে এই সব ভোজ-বাজীর ন্যায় কোথায় মিলাইয়া গেল! কোথায় আজ বাঙালীর সে সম্পদ, বল, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, ঐশ্বর্য্য? দুর্ভিক্ষ আজ বাংলা দেশে মৌরসী-পাট্টা লইয়াছে। প্রতি বৎসরেই বাংলার কোন না কোন অঞ্চলে অনাহার-ক্লিষ্টের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। আজ খুলনায়, কাল বাঁকুড়ায়, পরশুদিন ব্রহ্মণবেড়িয়া, নোয়া-খালিতে। বাঙালী গৃহস্থ আর তেমন হাসি-সহৃদয়তার সঙ্গে অতিথির অভ্যর্থনা করিতে পারে না। সে ব্রত-উৎসব, পাল-পার্ব্বণ, খেলা-ধুলা, যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি আর নাই। বাংলার গ্রাম আজ ঘোর নিরানন্দে আচ্ছন্ন। বিজয়া দশমীতে তেমন কোলাকুলি আর হয় না। স্বাস্থ্য আজ বাংলার গ্রাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সকলেরই মুখে ব্যাধির রেখা অঙ্কিত। দশখানা গ্রাম খুঁজিলেও একটা সবল লোক পাওয়া কঠিন। আর দীর্ঘজীবী বৃদ্ধের দল ত লোপ পাইয়াছে। ৪০ বৎসরের জরাক্লিষ্ট যুবকেরাই আজ বৃদ্ধ বলিয়া গণ্য। কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় গ্রাম প্রায় লোকশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদেরও অবস্থা কঙ্কালসার প্রেতমূর্ত্তির মত। দৃঢ়-মুষ্টিতে লাঙ্গল ধরিতে পারে, দু-মণ বস্তা মাথায় বহিয়া অক্লেশে পথ চলিতে পারে, এমন লোক বাংলার পল্লীতে বিরল। যেখানেই যাও দেখিবে, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে, খাল-বিল-ডোবায় পূর্ণ, গ্রামের চেহারা পরিত্যক্ত শ্মশানের মত। নদী-নালা শুষ্কপ্রায়, সেকালের দীর্ঘ পুষ্করিণী সব ভরাট হইয়া গিয়াছে। জলাভাবে বাংলার গ্রামবাসী একপ্রকার কাদা গুলিয়া খাইতেছে। যে-সব প্রাচীন প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল সেগুলির চিহ্ন ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। বাংলার বিদূষক-সভার সদস্যেরা কলিকাতায় বা দার্জ্জিলিংএ বসিয়া, যে সব Village Improvement Scheme বা গ্রামের উন্নতির মতলব ফাঁদিতে-

ছেন, সেগুলা কাহাদের জন্য হইতেছে—তাহা বুঝা দুষ্কর। বোধ হয় নিষ্কর্ম্মা শিক্ষিত সহর-বাসীদের সময় কাটাইবার এও একটা উপায়।

গ্রাম্যশিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতিরা অতি দ্রুত-গতিতে লোপ পাইতেছে। সেকালে বাংলার বস্ত্র-শিল্প পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। অগণ্য তাঁতি ও জোলা ইহার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিত। কেবল তাহাই নয়—ইহাদের যথেষ্ট লক্ষ্মী-শ্রীও ছিল। আজ বস্ত্র-শিল্পের লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই সব তাঁতি-জোলার দল অন্নাভাবে কেহবা লাঙ্গল ধরিয়াছে—কেহবা চাকুরীজীবী হইয়াছে। গ্রামের কামার-কুমার, কাঁসারী, ছুতার প্রভৃতি শিল্পী-জাতিদেরও সেই অবস্থা। তাহাদেরও অনেককেই লাঙ্গল ধরিতে হইয়াছে। এদিকে ধোপা, নাপিত, ভুঁইমালী, বেহারা, হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি গ্রাম্য শ্রমজীবীদের ধ্বংস দ্রুত বেগে হইতেছে। দশখানা গ্রাম খুঁজিলেও ধোপা বা নাপিত পাওয়া কঠিন। তাহাদের মধ্যে বিবাহের উপযুক্ত কন্যা পাওয়া এত কঠিন, যে প্রায়ই ৫০।৬০ বৎসরের বুড়োর সঙ্গে ৪।৫ বৎসরের বালিকার বিবাহ দিতে হয়। অনেক স্থলেই এই সব বালিকাকে অনেক মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। যে টাকার যোগাড় করিতে পারে না—তাহার বিবাহই হয় না। এই সব কারণে প্রায়ই এই সকল শ্রমজীবী জাতির বংশ নির্ম্মূল হইতেছে। ফলে বাঙালী মজুর বা শ্রমিক অনেক গ্রামেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উড়িয়া বা হিন্দুস্থানী শ্রমিকেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। উড়িয়া বেহারা, উড়িয়া ধোপা, হিন্দুস্থানী মাঝীমাল্লা অনেক গ্রামেই আজকাল দৃষ্টিগোচর হয়। সহরে বিদেশী চাকর, চাকরাণী, সুপকার প্রভৃতির কথা এত সুপরিচিত যে, সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সহরের নিকটবর্ত্তী কল-কারখানা প্রভৃতিতেও বাঙালী শ্রমিকের দর্শন পাওয়া দুর্ল্লভ। এই সকলের নানা কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু প্রধান কারণ যে বাঙালীর স্বাস্থ্য-নাশ,—তাহার দেহের ক্রম-বিবর্দ্ধমান অপটুতা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল ব্যাপার কি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয় না যে, বাঙালীজাতি—বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুজাতি মরিতে বসিয়াছে?

বাংলার গ্রাম—বাঙালীর জাতির ধ্বংসের কারণ কি, তাহার বহু আলোচনা হইতেছে। আমরাও আজ দশ বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। সকলেরই প্রায় ঝোঁক দেখিতেছি কলেরা ও ম্যালেরিয়ার ঘাড়ে দোষ চাপানো। আবার কেহ কেহ বা বাংলার পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যতত্ত্বের অজ্ঞতা—তাহার সামাজিক কুসংস্কার প্রভৃতিকেই প্রধান কারণ বলিয়া মনে করেন। এ সকল কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইতে পারে। কিন্তু এই অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি লইয়াও ত বাঙালী-জাতি বহু সহস্র বৎসর বাঁচিয়া ছিল। আজ এগুলা হঠাৎ এমন মারাত্মক হইয়া উঠিল কেন? তাই মনে হয় এগুলা আনুসঙ্গিক কারণ হইতে পারে, কিন্তু প্রধান কারণ নয়।

বিজাতীয় শিক্ষায় মস্‌গুল, আধা-ফিরিঙ্গি বাবুর দল যাহাই বলুন না কেন, সত্য এই যে—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল সংঘর্ষই ইহার মূল কারণ। ইহার প্রবল ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া আমাদের জাতীয় জীবন-তরী আজ

টলমল করিতেছে। এই রক্তপিপাসু সভ্যতার তিন মুখ। এক মুখে এ আমাদের বহুকালের পরীক্ষিত আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাপন-প্রণালীকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে। আর এক মুখে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম ও সংস্কারকে নাড়া দিয়া, সমাজের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত শিথিল করিয়া তুলিয়াছে। আর উহার মাঝখানে যে রক্তদন্ত, ধূম্রলোচন মুখটা আছে, সেইটা আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। কি করিয়া এই ত্রিশিরা দৈত্য আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করে, তাহা আজ ইতিহাসের কথা; আমাদের পুনরুক্তি করিবার দরকার নাই। শুধু এই বলিলেই হইবে যে, আমাদের গ্রাম্য শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দেশব্যাপী দারিদ্র্য এই বণিক-সভ্যতার আক্রমণেই হইয়াছে। দেশব্যাপী ঘোর দারিদ্র্য ও অনাহারই, স্বাস্থ্যনাশ ও ম্যালেরিয়ার কারণ নয় কি? যাহারা খাইতে পারে না—তাহারা রোগ-প্রতিরোধ করিবে কি করিয়া? বাংলা দেশ ত চিরকালই নদী-নালা-বেষ্টিত নিম্নভূমি ছিল। তবে সেকালের বাঙালী নৌ-বহর সাজাইয়া প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিত কি করিয়া; আর বনের হাতী ধরিয়া তাহাকে অবলীলাক্রমে পোষ মানাইতই বা কোন্ উপায়ে? আমরা ত মরিতে বসিয়াছি। কিন্তু জানিয়া-শুনিয়া বিমাতার দেওয়া বিষ হাতে তুলিয়া খাইব কি? ডাইনী বুড়ীর ছেলে-ভুলানো ছড়া শুনিয়া রক্ষা-কবচটা যদি তাহার হাতে সঁপিয়া দিই, তবে স্বয়ং বিধাতাও আমাদের বাঁচাইতে পারিবেন না।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

যমের বাড়ীর কথা

(Dynamics of Psychology)

১

যে রকম সময় পড়িয়াছে তাহাতে যমের বাড়ী সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই।

এ সম্বন্ধে পুঁথি বেশী পাওয়া যায় না। বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, প্রভৃতি নরক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আর্ত্তনাদের ভাগই বেশী। 'চন্দ্রশেখরে'ও তাই। দীনবন্ধুর 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' নামক গল্পে রহস্যের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু অতি সামান্য। নচিকেতা যমের বাড়ী গিয়া উপনিষদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অতিশয় আধ্যাত্মিক। ফলে, অনেকেরই অনুমান, যে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। এবং যমের portfolio কেবল নরক লইয়া। মিল্টনবর্ণিত Geography-ও অনেকটা সেই রকম। অতএব এ বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের দরকার।

যদি বিশ্বের 'পরিবর্ত্তন' রূপ নিয়তি মানিতে

হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, যমালয়ের সংগঠনও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীতে পরিবর্ত্তন ঘটে, সৌরজগতে ঘটে, অথচ যমালয়ে ঘটে না, এ কথা ন্যায়সঙ্গত নহে—কারণ—Uniformity of law—একটা অকাট্য জিনিষ। যদি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগতে পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে ইন্দ্রিয়াতীত জগতেও নিশ্চয় ঘটিবে—নচেৎ দর্শনশাস্ত্রের Parallelism নামক সূত্র ব্যর্থ হইয়া যায়।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ মানেন না, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে যমালয় "Psychologically" মানিয়া থাকেন। আমরা প্রথমতঃ যমালয়কে Imagination এর মধ্যে ধরিয়া লইব—অর্থাৎ কল্পনা করিয়া আমরা যমালয় সৃষ্টি করি, সেই কল্পনা অবশেষে ভয়ের কারণ হইয়া পড়ে। যেমন, শিশু অন্ধকার দেখিয়া "জুজুর" ভয় পায়।

যদি তাহাই ধরিয়া লওয়া যায়—তাহা হইলেও সকলে স্বীকার করিবেন যে, এহেন ভীতিপূর্ণ স্থান মানবের কল্পনা-ক্ষেত্রে বদ্ধ জলের মত দাঁড়াইয়া যাওয়া স্বাস্থ্যকর নহে। যদি এই সন্দর্ভের কোনো মূল্য না থাকে, অন্ততঃ এই Insanitary condition অর্থাৎ মনের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাটুকু ঘুচাইয়া দেওয়া ইহার অভিপ্রায়। বোধ হয় একটু চেষ্টা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে পৃথিবী হইতে যমালয় শ্রেষ্ঠস্থান। হয়ত সেই "Unexplored bourne whence no traveller returns" (অনাবিষ্কৃত দেশ, যেথান হইতে কোন পথিকই ফিরিয়া আসে না), এই যুগের শিক্ষিত লোকের খুব বাঞ্ছনীয় বসতি স্থান, এবং সময় পাইলে অচিরাৎ emigrate করা উচিত—অন্ততঃ পরিদর্শনের জন্য। বাস্তবিক আমরা যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি, জায়গাটা এখন খুব মনোরম, কোন নরক-যন্ত্রণা নাই, Sanitation perfect. বিরাট রাষ্ট্রতন্ত্র—যমরাজ তাহার নিত্য-স্বরূপ President এবং সকল জাতিরই সমান অধিকার—perfect community—সুতরাং কেহই শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে চাহে না। ইহার আর একটা প্রমাণ যে পৃথিবীতে এখন জন্ম হইতে মৃত্যুর চেষ্টা বেশী। যমালয় পৃথিবী হইতে আরামের স্থান না হইলে অনেকে ফিরিয়া আসিত। পূর্ব্বে প্রত্যেক Decadeএ (দশ বৎসরের মধ্যে) শতকরা ৫ জন additional লোক সখ্ করিয়া পৃথিবীতে আসিতেন, কিন্তু এখন আসিতে নারাজ। নিশ্চয় সেখানে কোন attraction (আকর্ষণ) আছে। যাদের ভালবাসি ও ভক্তি করি, এমন লোকও সেখানে অনেকে গিয়া জমা হইয়াছেন বোধ হয়, এবং তাঁহাদের পুণ্য-বলে যমালয়ের যে একটা Reform আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। "As above, so below"—কি বলেন? কল্পনা যদি করিতে হয়, তবে scientifically করাই ভাল। "Innocently to amuse the imagination in this dream of life is wisdom"—

Goldsmith.

২

প্রথমে দর্শনশাস্ত্রের ভাগটা সংক্ষেপে সারিয়া বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করা যাউক। যে আজন্ম 'মরণ' নামক অবস্থার দিকে টান

তাহার নাম যম। যমের চেহারা কি রকম, তাহার বর্ণনার আপাততঃ আবশ্যক নাই। যম যে টানে, তাহার প্রমাণ কি? উত্তর— নিজেই আমরা অনুভব করি। বার্দ্ধক্য নামক জীবনক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেই তাহা উদারভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কি যেন টানিতেছে। কি ধরিয়া টানে? উত্তর — স্নায়ু-যন্ত্র। প্রমাণ কণ্ঠশ্বাস। যমের আকর্ষণের বিপরীত দিকে একটা আকর্ষণ আছে নিশ্চয়। মনে করুন সেটা পৃথিবীর দিকে—'বাহ্য' আকর্ষণ। যমের টান্ মনে করুন 'আভ্যন্তরিক' আকর্ষণ। কিংবা বলিলে চলে, একটা ইহ-লোকের আকর্ষণ, আর একটা পরলোকের। টানাটানির মধ্যে "ইহ" এবং "পর" কেন? এইখানে দর্শন-শাস্ত্রের advice gratis। অর্থাৎ উভয় টানাটানির মধ্যে যে ভাবগ্রাহী জীব কেন্দ্রস্থ হইয়া তাহা অনুভব করেন তাঁহার নাম আত্মা। যেখানে সে ভাব গৃহীত হয় তাহাকে আমরা বলি 'মন'। এবং টানাটানি itself 'প্রাণ'। 'আমি যমালয়ে চলিলাম', কিংবা "পরলোকে চলিলাম" এই ভাব বেশীভাগ মানুষের মধ্যে আছে। সকলেই যে বসিয়া বসিয়া কল্পনা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। 'প্রাণ রাখিতে গিয়া প্রাণান্ত' না হইলে এ ভাবের উদয় হয় না।

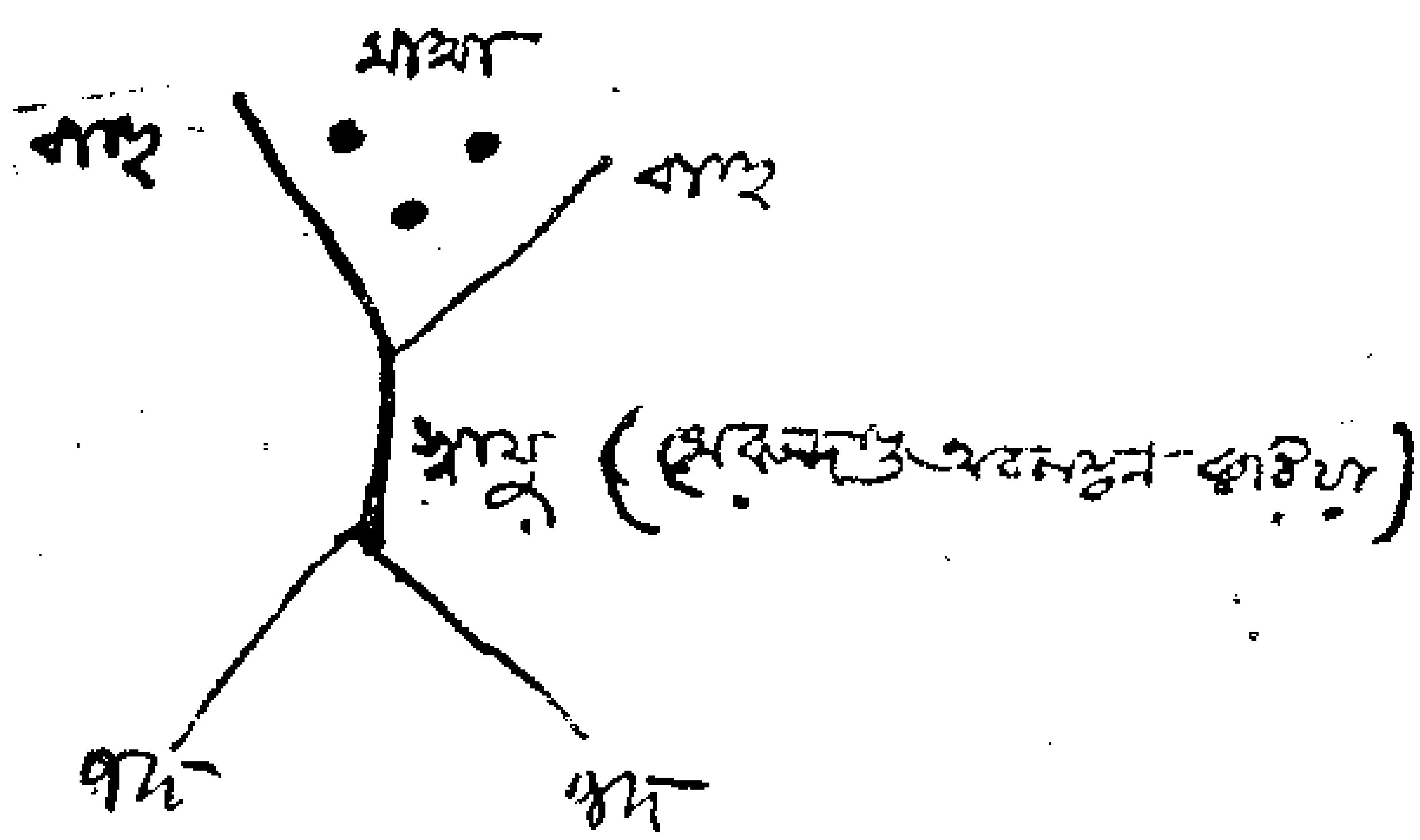
দর্শনশাস্ত্রের কল্পনা এই—টানাটানিতে দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। তার পর আত্মা —অর্থাৎ ভাবগ্রাহী জীব একটা সূক্ষ্মদেহ লইয়া যমালয়ের দিকে আকৃষ্ট হন। সে সূক্ষ্মশরীরও ক্রমে যমালয়ে বিলীন হয়। থাকে মাত্র 'অহং' ভাব। সেই 'অহং' ভাবকে আবার পঞ্চভূতে চাপিয়া ধরে, যমালয় হইতে পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনে। অর্থাৎ পুনর্ব্বার জন্ম হয়। এই সব গতির পথ দেবযান, পিতৃযান, ইত্যাদি। ইহার তথ্য অত্যন্ত গভীর, এবং যোগবলে নাকি জ্ঞাত হওয়া যায়। একদিন হয়ত বিজ্ঞান-সম্মত হইয়া পড়িবে। কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমাদের সে সব কথা আলোচনা করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়িবে। কেবল 'গতি' সম্বন্ধে কিছু বলিলেই চলিবে।

য—আ—পৃ

মনে করুন 'য' = যম। আ = আত্মা। পৃ = পৃথিবী, কিংবা আমার দেহ। 'য'র আকর্ষণে 'পৃ' অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ শিথিল হইয়া পড়িলে 'আ' = আত্মা দ্রুতবেগে যমের বাড়ী চলিয়া যাইবে(অর্থাৎ Psychologically মনে করিবে "আমি চলিলাম') ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু পূর্ব্ব-কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইলেও "পৃব"দিকে আকর্ষণ যে একেবারে নষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না; শিথিল হয় মাত্র। এই জন্য বলা যায় যে, ইহলোকের মায়া রীতিমত শ্রাদ্ধ না হইলে এড়ানো যায় না। দশজন বন্ধু-বান্ধবও মায়া-রজ্জু দ্বারা আত্মাকে টানিতে থাকে। কিন্তু ফলে সে সময় যমের টান এত প্রবল যে পঞ্চভূত পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দেয়। তখন আত্মা নববধূর ন্যায় অশ্রুপরায়ণা হইয়া শ্বশুরালয়ের মতো একটা স্থানে কিংবা কেন্দ্রে গিয়া বসিয়া পড়ে। তাহাকেই আমরা মনে করি যমালয়। আবার সেখানে কিছু-দিন তিষ্ঠিয়া যখন ছেলে-পুলে হবার সম্ভাবনা হয়, তখন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে। তখন পঞ্চভূতের টান প্রবল হয়। এই রকম ঘড়ির 'পেণ্ডুলমের' মত প্রত্যেক আত্মা চিরকাল

দুলিতে থাকে। যদি পিত্রালয়ে আর না আসে তবে সে "মুক্তাত্মা" হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটী দেবাখ্যাত নরবর্গের মধ্যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সসে দেখা গিয়াছে, যে মাত্র বত্রিশ কোটী বর্ত্তমান। ইহাতে বুঝিতে হইবে, বাকি এক কোটী মুক্তাত্মা। এ সকল অমর আত্মা শ্বশুরালয়ে সুখে দিন যাপন করিতেছে নিশ্চয়, নচেৎ দুলিতে থাকিত, 'প্রাণ' সম্পন্ন হইয়া পড়িত, এবং তাহার সঙ্গে ভাবগ্রাহী 'মন'ও তাহাকে অবগুণ্ঠনের মত ঘিরিয়া ইহলোকে লইয়া আসিত।

আরও অনেক কথা আছে, তাহার মধ্যে মোটামুটি দুই-একটা বলিলে চলিবে। টানা-টানি কেন? ভাবগ্রাহী কবি বলেন যে ইহা একটা বিরাট ছন্দে মনোহর নৃত্যের ব্যাপার! নৃত্যের উৎপত্তি কোথায়? উত্তর—আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা হইতে। পরমাত্মা কোন্ দিকে আকর্ষণ করেন? উত্তর—উভয় দিকে। তাঁহার আকর্ষণের ফলে জীবাত্মাবর্গ জন্ম ও মরণ রূপ বাহুযুগল তুলিয়া নৃত্যশীল! যখন জন্ম হয়, তখন আনন্দ হইতে নিরানন্দে আসিয়া কাঁদে, ও যখন মৃত্যু হয় তখনও আনন্দ হইতে নিরানন্দে গিয়া কাঁদে। তবে মধ্যস্থল, অর্থাৎ নৃত্যের অভিনয় আনন্দময়।



৩

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে এই গতি অদ্ভুত। অতএব ইহাকে আমরা Dynamics of Psycholgy বলিয়াছি। একবার দেখা যাউক যে এই নৃত্যের external evidence কি।

মানুষ যদি নাচিয়া বেড়ায় তবে অনেকটা এই রকম দেখায়, সকল জীবেরই স্নায়ু-যন্ত্র এক রকম; অন্ততঃ spinal chordএর বেলা। এবং এই spinal chord যে নাচিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিম্বা আত্মা যে নাচিবার জন্য ক্রমবিবর্ত্তনের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা psychologically বেশ বুঝা যায়।

Rationalistic অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের view ভাবিয়া দেখুন।

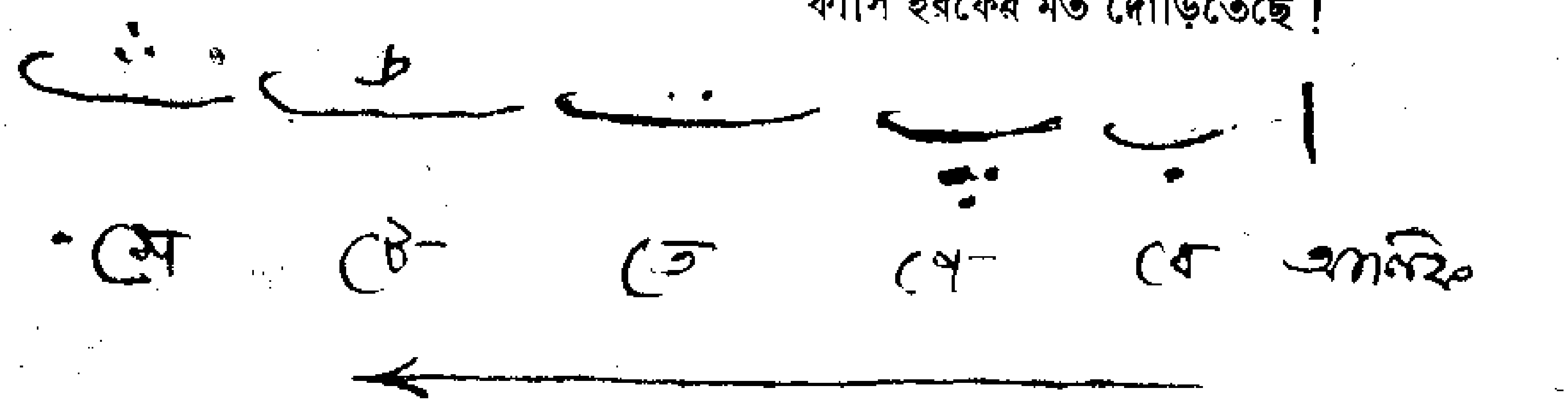
প্রথমতঃ, পঞ্চভূত অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা আত্মা আক্রান্ত হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। অত্যন্ত বিরক্তি-জনক বোধ হয়, এমন কি, ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হয়। মায়ার আবরণ হইতে মুক্তিলাভ করা আত্মার স্বভাব। এই মুক্তিলাভের জন্য জীবের হঠাৎ মেরুদণ্ড বাহির হইয়া পড়ে এবং সেই মেরুদণ্ড অবলম্বন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করে। সৌরজগতের Binary stars এবং গ্রহ-উপগ্রহ সমূহ, এবং পৃথিবীক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ, পশু-পক্ষী এবং বৈরাগ্যযুক্ত নিরীহ মানব সকলেই এই আপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত মেরুদণ্ডের সাহায্যে গা-ঝাড়া দিয়া থাকেন। কিন্তু আত্মার ইহাতে মুক্তি হয় না। ফলে কি হয়?

৪

বংশবৃদ্ধি।

বিজ্ঞান ইহাকে 'হিষ্টলজি' বলেন। অর্থাৎ একই আত্মা হইতে পঞ্চভূতের সাহায্যে বহু আত্মা বীজ-স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে। যেমন স্বরবর্ণ হইতে ক, খ, গ, ঘ,—প্রভৃতির বিস্তার—এবং তাহা হইতে ভাষা,—এবং ভাষা হইতে অনর্গল বক্তৃতা—এবং সাহিত্য। জিনিষ একই—পরমাত্মা—কিন্তু পরমাত্মাকে পঞ্চভূতে বেষ্টন করিলে তিনি 'বিক্ষেপনী' (?) নামক শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেন। ইহাতে স্পন্দন উপস্থিত হইয়া একই পরমাত্মা বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদের Psychology—আমরা 'পাড়াগেঁয়ে' কথায় প্রকাশ করিলাম মাত্র। এই পাঞ্চভৌতিক জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইবার জন্য শুনা যায় যে জীবাত্মা, রেচক, পূরক, কুম্ভক প্রভৃতি নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু যতদিন এই মুক্তিতত্ত্ব Rationalistic ভাবে যোগীপুরুষের মনে উদয় না হয়, ততদিন সকলিই পণ্ডশ্রম। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, এই মুক্তি-চেষ্টা ও যমের আকর্ষণ একই। চিত্রের বামভাগের "য"র আকর্ষণ ইহা আমরা অ"রে বুঝিতে পারি। যাহারা না বুঝিয়াছে, এক সময় বুঝিতে পারিবে। দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসাদ্বেষ-মূলক গালাগালি, অনর্থক চীৎকার ও বক্তৃতা দ্বারা মানব-জগৎ অবিশ্রান্তভাবে সকলকে এই যমালয়ের আকর্ষণ বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত! অনেকে বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়।

ইহার মধ্যে যদিও Dynamics সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান, সেটা কিন্তু আনন্দময় নহে। যেন দক্ষিণ হইতে বামদিকে জীবাত্মাবর্গ সংগ্রামরত হইয়া, মারামারি কাটাকাটি করিয়া, ফার্সি হরফের মত দৌড়িতেছে!



ইত্যাদি। কিন্তু দ্বৈতবাদীগণ দেখাইলেন যে নিরানন্দের মধ্যে আনন্দ আছে। কলহের মধ্যে সঙ্গীত আছে। সাহিত্যের মধ্যে কাব্য আছে। দৌড়ধাপের মধ্যে ছন্দ আছে। কীট-পতঙ্গ ও সৌরজগৎ যখন তাহাদের মেরুদণ্ডে ঘুরে, মৎস্য যখন মেরুদণ্ডের সাহায্যে জলে সাঁতার দিয়া ডিম পাড়ে, মশামাছি যখন আমাদের দংশন করিতে আসে, বানর যখন দন্তবিকাশ করিয়া আমাদিগকে সম্ভাষণ করে, এবং মানব যখন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বাহু তুলিয়া নাচে, তখন বুঝিতে হইবে যে দেবভাষার মত কতকগুলি অক্ষর আবার বাম হইতে দক্ষিণে আসিয়া ফার্সি হরফের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে রত হয়। জীবাত্মা পরমাত্মার ভাব প্রাপ্ত হয়।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, দর্শন-শাস্ত্র যাহা ব্যক্ত করেন তাহা বিজ্ঞানসম্মত। যদি মানববংশ ক্রম-বিকাশের

শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া থাকে, তবে নৃত্য গীত সাহিত্য, বক্তৃতা ও অভিনয় প্রভৃতি দেখিয়া বোধ হয় যে ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্যই বাহু তুলিয়া সংকীর্ত্তন। সার্কাসে দেখা গিয়াছে যে পশুগণকে হাত তুলিয়া খাড়া করিয়া দিলে তাহারা খুসি হয়। শিশু হামাগুড়ির অবস্থা পার হইতে হাঁটিতে শিখিলে, দশজনকে ডাকিয়া নৃত্যের ভাব প্রকাশ করে। সমস্ত দিন আপিসে কাজ করিয়া, সন্ধ্যার সময় দশজনকে ডাকিতে ইচ্ছা করে। শৃগালেরা যখন মাঠে একত্র হইয়া তাহাদের মনের কথা বলে, হয়ত কুক্কুরবর্গ তাহাদের প্রতিবাদ করে। মানবের মধ্যেও বাদ প্রতিবাদ করিয়া আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়। ঝাড়া দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া মনের কথা বলিয়া ফেলিলে, psychologically জোলাপের কাজ হয়। ক্রমে বাহু তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলে আনন্দের ভাব জাগ্রত হয়। এই ভাব (Hedonistic), ইচ্ছাশক্তিকে (will) জগতের দিকে টানে। তাহাতে সৃষ্টি রক্ষা হয়। নিরানন্দের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হয়। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর দিকে হেলিয়া পড়ে না। যমালয়ের দিকে যে Rationalistic আকর্ষণ (necessity) সেটা Hedonistic আকর্ষণকে counterbalance করে, এই জন্য ইহাকে আমরা "যম" (সংযম) বলিয়া থাকি। যমের function নিবৃত্তিমূলক।

কিন্তু অদ্বৈতবাদই হউক এবং দ্বৈতবাদই হউক, মুক্তিলাভের চেষ্টা থাকুক কিম্বা নাই থাকুক, সকল আত্মাকেই যে যমালয়ে যাইতে হইবে এটা আমরা বিলক্ষণ জানি। ইহার মূলে যে বিশেষ কোন departmental secret আছে তাহা নয়। ইহার কারণাবলী অতিশয় সোজা, ও বিজ্ঞান-সম্মত।

১। Every action has re-action। অর্থাৎ সকলে মিলিয়া কখনো অনন্তকাল বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে পারে না। ক্রমে ব্যাধি জন্মায়, ও তাহা হইতে বৈরাগ্য উদ্ভূত হয়।

২। যাহারা নৃত্যের উপযোগী নহে, এ রকম দর্শকবৃন্দ, সংকীর্ত্তনের দলে মিশিয়া গাধার মত চীৎকার আরম্ভ করে, কিংবা ভল্লুকের ন্যায় আক্রমণ করে, ইহাতে আনন্দবিহ্বল অধিকারী মহাশয়েরা সশিষ্য রঙ্গস্থল হইতে যমালয়ের দিকে পলায়ন-পরায়ণ হন। এমন কি রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি হইয়া পড়ে।

৩। Economical laws অনুসারে উভয় পক্ষের খাদ্য নির্দ্দিষ্ট। আনন্দ অনন্ত হইতে পারে, খাদ্য অনন্ত নহে, সুতরাং ধরার আনন্দ সসীম।

যেটুকু আভাস দেওয়া গেল, তাহাতে বোধ হইবে যে যমালয়ে যাইবার গতি (Dynamics) আমরা Introspection দ্বারা খানিকটা বুঝিয়া লইতে পারি। হঠাৎ মারা যাই, কিংবা লজ্জা-দুঃখে আত্মহত্যা করি, কিংবা সম্মুখ-সমরে পড়িয়া বীরবাহু বীর-চূড়ামণির মতো যখন স্বর্গ-পুরী চলিয়া যাই, এমন একটা স্থান আছে, যে তথায় বৈতরণী নদী পার হইতে হইবে।

এই স্থলে বিজ্ঞানের সঙ্গে একটু মতভেদ হইতে পারে। কোন বৈজ্ঞানিক বলিবেন যে, বহির্জগৎ হইতে আমার Perception

ক্রমশঃ যতগুলি Concept সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে যমালয় আছে কি? আমাদের মতে, যে stream of consciousnessএর মধ্যে concept-গুলি বর্ত্তমান তাহাই বৈতরণী নদী। তার ওপারে যমালয়। কিন্তু যমালয়ের stream of consciousness ব্যক্তিগত নয়। যদি পৃথিবী সত্য হয়, তবে তাহার counterpart যমালয়ও থাকিবে। সেটা নরকশালাই হউক, কিংবা "ঐ দেখা যায় আনন্দধাম"ই হউক, তাহার ব্যবহারিক না হউক, প্রাতিভাসিক অস্তিত্ব থাকা খুব সম্ভব। তবে ইহার প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় আমরা পুরাণো স্মৃতিগুলি সাবধানে জড়ো করি। এবং যেমন সুদক্ষা গৃহিণী হাঁড়ি, কলসী, ঝাঁটা, মালমশলা প্রভৃতি জড়ো করিয়া স্বামীর সহিত বিদেশে চলিয়া যান, সেই রকম হয়ত আমরা সংস্কারগুলি লইয়া যাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এই বৈতরণী পারের ব্যাপার যদি বাস্তবিকভাবে বিশ্বাস না করেন তবে কাল্পনিকভাবেই ধরুন, এবং দেখুন যে যমালয় বাস্তবিক যন্ত্রণাময় স্থান কি না।

৫

যাঁহারা মনোময় জগতে প্রজ্ঞার সাহায্য লইয়া যমালয় পরিদর্শন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে "Visitor's pass" নামক অনুজ্ঞাপত্রের বিধান আছে। যাঁহারা Psychology তে তেত্রিশ 'পার্সেন্ট' মার্ক (বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়) রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দরখাস্ত করিলেই 'পাশ' প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে মৃত্যু লইয়া 'নাড়াচাড়া' করেন, (যেমন—ডাক্তার, উকীল ডেপুটি প্রভৃতি) তাঁহাদের পক্ষেও Free pass। বৈতরণীর খেয়াঘাটে পঁহুছিলে, মাঝি জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার কোন title আছে?' তখন বলিতে হয় যে আমি 'রায় বাহাদুর"—কিংবা "রায় সাহেব" কিংবা 'মহামহোপাধ্যায়' ইত্যাদি, এবং সেই সঙ্গে যদি B.A, M.A, প্রভৃতি যুক্ত থাকে, তবে এমন কি একটা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াও পার হওয়া যায়, মাশুল (Ferry Toll) লাগেনা। এই সুবন্দোবস্ত ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 'বৈতরণী ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ড মিটিংএ' Majority of Votes দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই ডিষ্ট্রীক্‌ট্‌-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গ্রহদেবতা 'শনি'। কিন্তু পাছে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়া কাহারও মাথা উড়িয়া যায়, সেই জন্য প্রত্যেক মিটিংএ তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন। তবে যদি কোনো অনাথ আতুর আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া বলে, 'হুজুর! আর এ ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, মুক্ত করিয়া দিন', তবে তিনি করুণা-পরবশ হইয়া সেই জীবের দিকে তাকাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা উড়িয়া বৈতরণীর জলে পড়ে, এবং সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পায়। কারণ, মাথা না থাকিলে "বদ্ধ," "মুক্ত" এ-সব ভাব আসে না।

বৈতরণী পার হইয়া, খানিকটা 'চড়া' ভাঙ্গিয়া গেলে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখা যায়, তাহার মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—

INQUIRY OFFICE

(Head Assistant

B. C. Chatterji 1920)

অর্থাৎ সেই 'ইনকোয়ারী' আপিসের

অধুনাতন বড় বাবু বি, সি, চাটুর্য্যে। চাটুর্য্যে মহাশয় পূর্ব্বে 'থিয়সফিকাল্ সোসাইটির' Branch Inspector ছিলেন, এবং নিজগুণে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরের Manager এর মতো নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতেছেন।

তাঁহাকে দূর হইতে 'যমরাজ' মনে করিয়া আমরা দক্ষিণ বাহু দ্বারা, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটা salute করিলাম। সেই দাস্যভাব দেখিয়াই হউক, কিংবা বাহুর সুচারু automatic action দেখিয়াই হউক, তিনি খুব খুসি হইয়া বলিলেন, 'আস্‌তে আজ্ঞা হউক'।

আমরা পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া দেওয়াতে—তিনি নম্রভাবে বলিলেন—'এখানে ঘুস্ চলেনা'।

আমরা। কতদিন এ Reforms জারি হইয়াছে?

বড়বাবু। এখানে কোনো জিনিষের মূল্য নাই, অতএব টাকার দরকার হয় না। যাহার যা সংস্কারজাত অভাব, তাহা Elementals (পঞ্চভূত) পূরণ করিয়া দেয়।

আমরা। এটা কি Astral world?

বড়বাবু। একটা অংশ। আপনি বিশ্বাস করেন?

আমরা। নিশ্চয়, নচেৎ আসিতাম না।

বড়বাবু। আপনি ডেপুটি?

আমরা। হাঁ, ইনি আমার বন্ধু ভূতনাথ বাবু। Public Prosecutor, M.A. B.L.

ভূতনাথ বাবু। আমাদের বিশ্বাস Evidenceএর উপর সংস্থাপিত। একপক্ষের সাক্ষী যমালয় বিশ্বাস করে না, অপর পক্ষের সাক্ষী করে। যাহারা করে, তারা খুব reliable witness। প্রজ্ঞাবলে আমরা টের পাইয়াছি।

আমরা। এখানে Politics এর গোলমাল নাই ত?

বড়বাবু। মোটেই না। যেখানে Economics নাই, সেখানে Politics এর দরকার কি? এখানকার Policy যে, বিষয়ের আকর্ষণে জীব যাহাতে আবার সংসারে না যায় তাহার চেষ্টা করা।

আমরা। অনেকটা Non-co-operation?

বড় বাবু। যাই বলুন—পথটা নিবৃত্তির।

ভূতনাথ বাবু। Successful হইয়াছেন কি?

বড়বাবু। প্রায় Five per cent রাজি হইয়াছে, বাকি সব দুর্দ্দম্য ভাব ও রসের জন্য সংসারে যাইতে চায়। আপনারা বিশেষ কোন কাজে আসিয়াছেন?

ভূতনাথ। প্রথমতঃ যমালয় দেখা, দ্বিতীয়তঃ আমার একজন Rival Pleader সম্প্রতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার স্ত্রী অনেক করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

বড়বাবু। আর আপনি?

আমি। আমার একটি শিশু-সন্তান ছেলেবেলা সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে।

বড়বাবু টেলিফোন দ্বারা "গুপ্ত" সাহেবকে আহ্বান করিলেন। চিত্রগুপ্তকে আপনারা সকলেই জানেন—অতিশয় পুরাতন অমর আত্মা। তিনি অবিলম্বে একখানা Studebaker কারে আরূঢ় হইয়া উপস্থিত।

তাঁহার করস্পর্শ অতি কোমল। এত polite gentleman আমরা কখন দেখি নাই। রাস্তায় ভূতনাথ বাবু বলিলেন—প্রথমে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা যাউক।

মিষ্টার গুপ্ত। তিনি বোধ হয় এখন pleader's chamber-এ চা-পান করিতেছেন।

চেম্বারে প্রবেশ করিয়া বড় বড় আল্‌মারি দেখা গেল। 'অপটু-ডেট্' যত রিপোর্ট ও জর্নাল সকলই বর্ত্তমান।

ভূতনাথ বাবু। এ-সব আপনারা কোথায় পান?

গুপ্ত (হাস্য করতঃ)। নরলোকের যত ideas যমালয় হইতে সঞ্চারিত হয়, এবং সেগুলি Wireless Telegraphy-র সাহায্যে সকলের মাথায় প্রবেশ করে।

আমি। আমাদের স্বাধীন Judgment কি একেবারে নাই?

গুপ্ত। যাহা নিয়তি, তাহার বিরুদ্ধে গেলে আপীল আদালতে রায় বাহাল থাকে না।

ভূতনাথ বাবু। উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব?

গুপ্ত। এক পক্ষের argument যমালয় হইতে সঞ্চারিত হয়, ও অন্য পক্ষের সওয়াল জবাব empirical। উভয় পক্ষের কাটাকাটি হইয়া যাহা থাকে, তাহা আদালতে মাথায় বসিয়া গেলে, যমালয়-প্রেরিত suggestion Brain Complex-এর দ্বার হইতে বাহির হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। ফলে, মাথার মধ্যে 'তোলপাড়' শেষ হইলে 'রায়' নামক মন্তব্য বাহির হয়।

৬

ভূতনাথবাবু তাঁহার বন্ধু বিপিনচন্দ্র কর M. A. B. L.-কে দেখিয়া পরম-প্রীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক পায়চারি করিতেছিলেন। তিনি গঙ্গারাম ডেপুটি। তাঁহার সঙ্গে আমার মেদিনীপুরে আলাপ হয়। তিনি নরলোকে কর্ণে কম শুনিত, কিন্তু আমি আহ্বান করাতেই তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

বরং বিপিনবাবুকে একটু বধির বলিয়া বোধ হইল। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম ক্ষীণকায় গঙ্গারাম ডিপুটি এখন স্থূলকায়, এবং স্থূলকায় বিপিনবাবু এখন ক্ষীণকায়।

এ-বিষয় Remark করাতে বিপিনবাবু বলিলেন, ইহার মধ্যে একটু গোলযোগ। বৈতরণী নদীর ধারে আমরা একত্রে বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ শনির দৃষ্টিবশতঃ উভয়ের মাথা উড়িয়া গিয়াছিল। পরে ছানি তজবিজ্ দ্বারা শনির কৃপায় আমার মাথা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার মাথা দাদার স্কন্ধে এবং দাদার মাথা আমার স্কন্ধে লাগিয়া গিয়াছে। তখন একটু 'টিপ্‌সি' থাকাতে এটুকু 'মার্ক' করিয়া দেখি নাই।

আমি। কি দুর্ভাগ্য!

ভূতনাথ। এতে কিছু অসুবিধা হয় নাই ত?

বিপিন। খানিকটা হইয়াছে বৈ কি! আমি কানে কম শুনি, এবং মেজাজটা ডেপুটির মত। উনি কানে বিলক্ষণ শুনেন, এবং মেজাজ্‌টা উকীলের মত। যখন তর্ক-বিতর্ক হয়, তখন ইচ্ছা হয় দাদার কান টানিয়া আমার স্কন্ধে বসাইয়া দিই।

আমি। এখানে operation করিবার কোন বড় ডাক্তার নাই?

বিপিন। যত ভূতপূর্ব্ব surgeon, সকলে এখানে। কিন্তু এখানকার আইন বড় কড়া। স্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন স্বামীর মাথায় 'অপারেশন' একেবারে মানা। তাই আমরা অপেক্ষা করিয়া আছি।

ভূতনাথ। এ-খবর তাঁকে দেব।

বিপিন। তবে আপনারা for good আসেন নাই?

ভূতনাথ। কবে আসিব, সে খবরটা এখানে পাওয়া যায় না?

গঙ্গারাম। মিষ্টার গুপ্ত বড় Taciturn। এই যমালয় সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চালাইতেছেন, অথচ ইহার আভ্যন্তরিক Science af administration এ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

বিপিন। আজকাল্ মক্কেল ফীস্ কত দেয়?

ভূতনাথ। শতকরা পঞ্চাশ কমিয়া গিয়াছে। মামলা মোকদ্দমা ও ফীস্ উভয়ই।

বিপিন। সেটা আমরা যমালয়ে এ-কয় মাসের লোকের আমদানি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। আমার ছেলে-পুলে কষ্টে পড়িয়া নাই ত?

ইহা বলিয়া বিপিনবাবু মাথা হস্তে চাপিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

আমরা। ব্যাপার কি?

বিপিন। এখানে রুল নং ১, যে পার্থিব মায়া-সম্বন্ধে কথা কহিলেই মস্তকে বৃশ্চিকদংশন করে।

ভূতনাথ। এইটুকু মানবের স্বাধীনতার

গঙ্গারাম। রুল ১০ অনুসারে protest করিয়া আপনি নরলোকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারেন।

আমি। তবে আপনি নিজে ফিরিয়া আসেন না কেন?

গঙ্গারাম। ক্ষুদ্র শিশু হইয়া ফিরিয়া গেলে স্ত্রী সনাক্ত করিতে পারিবে না। Most miserable situation! সুতরাং অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা আসিলে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ফিরিতে হয়।

আমি। এমন কোন লোক এখানে নাই, যার স্ত্রীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং উভয়ে আবার জন্মগ্রহণ করিবার পরামর্শ করিতেছেন?

বিপিনবাবু। মিষ্টার লাহিড়ী একজন সেই রকম লোক। তাঁর বাসায় গেলে অনেক সংবাদ জানা যাইবে। তিনি সম্প্রতি Mesopotamia Commisariat-এ চাকুরি করিতে গিয়া গোলাগুলিতে মারা পড়িয়াছিলেন।

৭

যমালয়ের এ-তল্লাটে যত বাড়ী দেখা গেল তাহার মধ্যে মিষ্টার লাহিড়ীর বাংলা অতি সুদৃশ্য ও আরামের। সম্মুখে সোনালি টবে নানাবিধ জিরানিয়ম ও ফুলের চারা, সাতটা জলের কল, ইলেক্ট্রিক্ ফ্যান্ ও আলো, কেতাবে-ভরা আল্‌মারি, স্নিগ্ধ মলয়-বায়ুর সঞ্চার বাটীর চতুর্দ্দিকে। সম্মুখের রাস্তা দক্ষিণে হেলিয়া বিরাট শুভ্র পন্নগের মতো সুনীল গগনপ্রান্তে মিশিয়া গিয়াছে। তার দুইধারে ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোষ্ট ও মধ্যে

একটা অতি সুন্দর রক্তবর্ণ পথ কোথায় গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন সন্ধ্যার অবসান! বহুদূরে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছিল। বোধ হইল যেন সেই পথ চন্দ্রলোকে গিয়াছে।

বিপিনবাবু বুঝাইয়া দিলেন যে দক্ষিণ-দিকের পথ দেবযান ও বামদিকের পিতৃযান। "প্রাতঃকালে দেখিতে পাইবে যে অনেক নর-নারী হাতে পিণ্ডের সরা লইয়া এই বাম পথে চলিয়া যাইতেছে।"

আমি। কোথায়?

গঙ্গারাম। চন্দ্রলোকে। সেখানে পিণ্ড-প্রয়াসী পিতৃলোক বসতি করেন।

আমি। কিন্তু চন্দ্র-লোকে রাস্তা কি বরাবর মিশিয়া গিয়াছে?

বিপিন। মাঝে একটা 'গ্যাপ' আছে, সেটা ইরোপ্লেনে পার হইতে হয়।

আমি। যদি কেহ পড়িয়া যায়?

গঙ্গারাম। বৈতরণী নদীর মধ্যে পড়িবে। আপনি যমালয়ের বিজ্ঞানটুকু সহজে বুঝিতে পারিবেন না। এখানে centre of gravity অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ বিপরীত দিকে। চন্দ্রলোক গিরিশ্রেণী, হ্রদ ও কমলবনে পরিপূর্ণ। পদ্মযোনি সেখানে প্রফুল্লাননে বসিয়া সৃষ্টি করিতেছেন!

ভূতনাথ। যে সব জাতির পিণ্ড দেওয়ার custom নাই?

বিপিন। এবার যে Nationality form হইতেছে, তাহাতে পিণ্ড দেওয়ার প্রথা উঠিয়া যাইবে। কেবল শ্রদ্ধাপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা সকলে পরস্পরের পিণ্ড দিলে চলিবে। প্রজাপতি প্রথম যুগে এক মুখে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ক্রমশঃ কলিযুগে চতুর্ম্মুখে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চারি বিষয় খোলসা বুঝাইয়া দিতেছেন। সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় Special Pass প্রাপ্ত না হইলে সেখানে যাওয়া অসম্ভব। মিষ্টার লাহিড়ী সম্মুখ-সমরে পড়িয়া যমালয়ে আসাতে, তিনি পাশ পাইয়াছিলেন।

মিষ্টার লাহিড়ী চমৎকার লোক! প্রত্যেক ঘণ্টায় একবার করিয়া Orange pekoe পান করেন। Introduced হইয়া আমরা উপবেশন করিলাম। তিনি আনন্দ সহকারে আমাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

টেবিলের উপর অপক্ক খর্জ্জুরের গুচ্ছ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কি আপনার বাগানের?"

লাহিড়ী। এখানে একটা কল্পবৃক্ষ, কিংবা কল্পনাবৃক্ষ আছে। যাঁহার যেমন সংস্কার, তিনি সেই অনুসারে বাঞ্ছিত ফলফুল নিমেষের মধ্যে প্রাপ্ত হন। আমি মেসপটেমিয়াতে খর্জ্জুর খাইতাম বলিয়া একগুচ্ছ প্রত্যহ পাড়িয়া রাখি।

আমি। সেই রকম সুমিষ্ট?

লাহিড়ী। সে সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ আছে। আপনি গোটাকতক কলা খাইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

গোটা কতক মর্ত্তমান্ কলা খাইয়া আমার বোধ হইল যে তাহাদের taste ঠিক কলিকাতার মত নহে।

ভূতনাথ। কিন্তু আপনার তুলনার standard কি?

লাহিড়ী। ঐটুকুই crucial point।

perception ঠিক থাকে, স্মৃতিও থাকে, কিন্তু পৃথিবীর রস হইতে এখানকার রস অধিকতর মধুর কি না তাহা জানিবার যো নাই।

বিপিন। তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমি যদি সস্ত্রীক এখানে মরণের পর আসি, তবে এ সম্বন্ধে তাঁর মত ও আমার মত ঠিক এক কিনা তাহা জানা যাইতে পারে।

আমি লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলাম, 'আপনার সহিত আমার অনেক মনের কথা আছে।'

'মনের কথা' শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সুন্দর মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'প্রত্যেক জীবের মনের কথা নিজস্ব। সেটা অন্তরের। হয় ত আমার মনের কথার সহিত আপনার মনের কথা মিলিবে না।'

৮

আমি বলিলাম, 'আপনি একটু চা খান।' চা পান হইলে আমি আবার বলিলাম, 'ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ কথা বলিতে কেহ যমালয়ে আসে না। জগতে যাহা দেখি শুনি তাহার বর্ণনা সকলের পক্ষেই এক রকম। কিন্তু মনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলে, 'এ সম্বন্ধে আমার curiosity বড় উত্তেজিত হইয়াছে।'

লাহিড়ী। আপনি জিজ্ঞাসা করুন।

আমি। প্রথমে গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে নরক বলিয়া কোন স্থান বিশেষ আছে?

লাহিড়ী। এখন আর নাই। এখানে হিংসা-দ্বেষ নাই, সেই জন্য নরক ক্রমে obsolete হইয়া গিয়াছে।

আমি। তবে আপনি আর মর্ত্ত্যধামে ফিরিতে চাহেন না?

লাহিড়ী। আমার ফিরিবার ইচ্ছা খুব।

আমি। সস্ত্রীক?

লাহিড়ী। নিশ্চয়।

আমি। কেন?

লাহিড়ী। বোধ হয় সমগ্র জগতের সঙ্গে আমাদের কি একটা সম্বন্ধ আছে। সকলের সঙ্গে একত্র না হইলে প্রাণে ও মনে সুখ নাই। আমরা 'একাকী', এ কথা কখনো মনে করিতে পারি না। কোটী তারার মধ্যে একটা তারা খসিয়া গেলে যেমন সৌর জগতের বেদনা হয়, জগতেরও বোধ হয় আমাদের অভাবে সেই রকম হয়। আমিও তাদের না দেখিয়া থাকিতে পারি না। ইহার প্রমাণ 'স্মৃতি'। সকলই আমার ছিল, তাহা মনে পড়ে। কোথায় ছিল, এখন তাহারা কতদুর, তাহাদের স্নেহ-যত্ন করিবার কত লোক আছে, তাহারা কি করিয়া হাসে, কাঁদে, ভাল বাসে, রোগে-শোকে-দুঃখে পড়িয়া কাতর ভাবে চাহে, যমালয় হইতে তাহা জানিতে পারি না। এখানে আমাদের সকল সুখই আছে, কিন্তু সে সুখ অলীক। জগতের দুঃখ-নিবৃত্তির ব্রতই সুখ।

আমি। শুনিয়াছি, এখান হইতে মুক্তাত্মা স্বর্গে যায়।

লাহিড়ী। যাইতে পারে। কিন্তু স্বর্গেও সুখ নাই, কেননা ঈশ্বরের লীলাস্থল জগৎ। সেখানেই যত মুক্তাত্মা আবার ধাবিত হয়। স্বর্গের Palace of Art এর মধ্যে বসিয়া থাকে না।

আমি। তবে কি জগৎ মায়া নহে?

লাহিড়ী। এই মায়া আছে বলিয়াই আমরা ঈশ্বরে বদ্ধ। ঈশ্বর জগৎময়, মায়াময়।

আমি। তবে পাপ কেন?

লাহিড়ী। পাপের মধ্যে পুণ্য ফুটানো, দুঃখের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার, মিথ্যার মধ্যে সত্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপন, আমার বোধ এই experiment-এর নাম লীলা। সেইটুকু মাঝে মাঝে মনে করাইয়া দিবার জন্য যমালয়।

আমি। তবে আপনি আবার সস্ত্রীক ফিরিয়া দলে মিশিতে ব্যাকুল?

লাহিড়ী। ভয়ানক। আপনি যদি যমালয়ে আসিয়া সুখভোগ করিতে চাহেন, তবে অল্পদিনেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন, অথচ সংসারে সুখভোগ করিতে গিয়া দল ছাড়িয়া দিলেও, সেখানেই যমালয়ের দুঃখ। ফলে আত্মত্যাগের দুঃখটা খুব অভ্যস্ত হইয়া গেলে সুখ। যেমন প্রাণপণে তিনক্রোশ হাঁটিলে ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

আমি। এখানে আপনার সামাজিক দুঃখ কি?

লাহিড়ী। এখানে সকলেই স্বার্থপর, কেননা অভাব নাই ও অভাব-জনিত দুঃখ নাই। কিন্তু স্বার্থপর বলিয়াই ঘোর দুঃখ। এ স্বার্থ ঘুচাইবার জন্য জগৎ। যখন এখানে নরক-যন্ত্রণা ছিল, তখন স্বর্গ-লোক নরকস্থ জীবের বেদনা দেখিয়া কাঁদিত। সে দুঃখ নিবারণের কোনই উপায় ছিল না। এই inhuman practice ক্রমে উঠাইয়া দিবার জন্যই আবার জগতের মায়ার মাত্রা বাড়ানো হইয়াছে। জিনিষের দর বাড়িয়াছে, মানবাত্মার দর কমিয়াছে। ক্রমে সকলে একত্র হইয়া মানবাত্মার দর বাড়াইয়া দিবে, জিনিষের দর কমাইবে। এই যুগের সেই মহাযুদ্ধ।

আমি নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিলাম, এমন সময় একটি শিশু বাহু তুলিয়া অন্য কতকগুলি শিশুর সহিত নৃত্য করিতে করিতে লাহিড়ী-মহাশয়ের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়া কোলে লইলাম। এ যে আমাদেরই স্নেহের খোকা।

লাহিড়ী-মহাশয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোর বাবাকে চিন্‌তে পাচ্ছিস্?'

খোকা চিনিতে পারিল না, কিন্তু বুকে ঘুমাইয়া পড়িল।

লাহিড়ী। ঐটুকুই আসল চেনা। ইন্দ্রিয়-স্মৃতি না থাকিলেও প্রাণ আসিয়া প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায়। সকলে আমার স্ত্রীর নিকট আসিয়া আনন্দে খেলা করে। তার ছেলেপুলে নাই। ইহারাই তার জগতের সন্তানবৃন্দ।

আমি ধীরে ধীরে আসিয়া লাহিড়ী ও তাহার স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'কালই পৃথিবীতে ফিরিয়া চলুন। সেখানকার দারুণ দুঃখ ভাল, এমন মরুপ্রদেশের স্বর্গও ভাল না।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শিক্ষার মিলন

একথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করচে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখচি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি যে-মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐই আমাদের পেয়ে বসেচে; সুযোগ এপর্য্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েচে? নিশ্চয়ই সে কোনো একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনি আমার বশে চল্‌বে একথা মনে করা ভুল। বস্তুত ড্রাইভারের মূর্ত্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চল্‌বে না বিদ্যাটা দখল করা চাই তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে কর, এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে? অন্য ছেলেটি ভাল মানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরো-পুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্দ্ধস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার সখ দিনরাত এমনি তাকে পেয়ে বস্‌ল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁসই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে-রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলে দেখ্‌লে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়াগাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্চে, তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং,—তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বল্‌লে, আমার আর কিছুতে দরকার নেই।

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে-মানুষ খাটো করেচে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই

একটা মর্য্যাদা আছে সেইটুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্চে পরীক্ষায় পাশ করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সেদিকে তার বাঁধা নিয়মে একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি নিজেকেই ফাঁকি দিয়েচে; অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেচে, শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেচে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েচে। বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে। সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর পথ হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে, যে, তাদের ভাগ্যে, হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে-বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেচে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কম্‌বে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু একথা যদি বল, শুধুত বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সয়তানীও আছে, তাহলে বলতে হবে ঐ সয়তানীর যোগেই ওদের মরণ। কেননা সয়তানী সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড় গৌরবের পদ দখল করে বসেচে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেচে বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্ত্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেচে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য কর্ত্তে পারে তাহলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্ত্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্র তন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল জগতে যা-কিছু ঘটচে এসমস্তই একটা অদ্ভুত জাদু-শক্তির জোরে; অতএব তারও যদি জাদু-শক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগে সে কর্ত্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা সুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্চে মান্‌ব না, মানাব। অতএব যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেচে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েচে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই

বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেচে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সঙ্কট তরে' যাচ্চে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাহিরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরচে, তারা আর কর্তৃত্ব পেলনা।

পূর্ব্বদেশে আমরা যে-সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকচি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্চি শীতলা দেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেচি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শুনেচি নাকি, মন্ত্রগুণে পাল্‌কে-পাল্‌ ভেড়া মেরে ফেলা যায়; সে কি সত্য?" ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, "নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।" য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ একথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্চে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এই জন্যে এই নিয়মের পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেচি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মান্‌তে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না, তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না,—তখন সে বাইরের দিকে কর্ত্তাকে খুঁজে বেড়ায়, এই জন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠক্‌চে, পুলিসের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্য্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্চে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিম দেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েচে কখন্‌ থেকে? অর্থাৎ কখন্‌ থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেচে যে রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিষ নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেচে। যখন থেকে তারা জেনেচে সেই নিয়মই সত্য যে-নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘকাল রাজার গোলামী করে এসেচে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখান-

কার অধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকেই মেনেচে নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনি আর এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্ত সমুদ্র সাঁৎরিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের মরুডাঙায় আধ-মরা করে পৌঁছিয়ে দিলে। এর কারণ, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাহিরে নয়, যে-আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, "সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল একখানা চালাও বাঁচাতে পারলিনে কেন?" তারা বল্‌লে, "কপাল!" আমি বল্‌লেম, "কপাল নয়রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস্‌নে কেন?" তারা তখনি বল্‌লে "আজ্ঞে, কর্ত্তার ইচ্ছে হলেই হয়।" যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জলদান করবার ভার কোনো একটি কর্ত্তার। সুতরাং যে-করে হোক্ এরা একটা কর্ত্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর সকল অভাবই থাকে কিন্তু কোনোকালেই কর্ত্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেচেন, যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অর্থের বিধান তিনি যা করেচেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বতকালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্চে অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েচেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্ব্বল হয়ে থাকৃতে হত; কেবলি এ-ভয়ে ও-ভয়ে সে-ভয়ে পেয়াদার ঘুস জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েচে যে-দলিল সে হচ্চে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল,—তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্চে যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেচেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েচেন:—"বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চল্‌বে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম, একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম আরেক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম; এই দুয়ের যোগে তুমি বড় হও,—জয় হোক্ তোমার,—এ রাজ্য তোমারই হোক্—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।" এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেচে, অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্ত্তাভজা, পলিটিকেল বিভাগেও কর্ত্তাভজা হওয়া ছাড়া তাদের আর গতি নেই। বিধাতা

স্বয়ং যেখানে কর্তৃত্ব দাবী করেন না সেখানেও যারা কর্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আম্‌দানী হবে, কেবল ছোট্ট ঐ "স্ব" টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েচে তার বাসাটা পূর্ব্বেই হোক্ আর পশ্চিমেই হোক্ তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধি-ভৌতিক মহলে। দৈত্য বলচি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্য্য নক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাঠিম ঘুরিয়ে বেড়ায় সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্য্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই যথাতথ বিধির বিদ্যা, এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিল্‌বে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুল্‌লে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুস্কিলের কথা। কেন না পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের, আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি বলা যেত মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তাহলে সেকথা বোঝা যেত কেননা সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা; কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বল্‌লে তর্কের সীমানাগত জিনিষকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম ইস্কুলমাষ্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বল্‌বে "আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা।" কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে ত পবিত্রতার বিচার নেই। ইংরেজের ছাত্র বল্‌বে, "আধিভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করাতে হয়।" এ জবাবটা একেবারেই ভাল নয়, কারণ যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয়, চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হয়, নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকে না সুতরাং কর্ত্তা না হলে তাদের চলেই না। আর একটী কথা, এই ভুল যখন সত্যের সহায়তা কর্ত্তে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। "মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিষ্কার করে," না বলে' যেই বলা হয় "অপবিত্র করে" তখনই সত্য নির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা, কোনো জিনিষ অপরিষ্কার করে কি না করে সেটা প্রমাণ-সাপেক্ষ। সেস্থলে হিন্দুর ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া, হিন্দুর কুয়োর জল, মুসলমানের কুয়োর জল, হিন্দু পাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমান পাড়ার স্বাস্থ্য যথানিয়মে ও যথেষ্ট, পরিমাণে তুলনা করে' পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের; অতএব বাইরে

থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম, তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি, সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে' উভয়ের কুয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহ্যবস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্যেই এ সমস্যাকে সাধারণের বাইরে নির্ব্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ-সারার পক্ষেও ভাল রাস্তা? একদিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আর এক দিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো এটা কি কোন উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি আর চালক যে তার দিকে অসত্য এই দুইয়ের সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এই রকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্য্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি ও ঘরটা অপবিত্র তা হলে যে বিদ্যা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে-বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোট করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। একথা অনেকে বল্‌বেন, পশ্চিম দেশ যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম্ম পরে মৃগয়া করত তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাইনি, বস্ত্র জোগাইনি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এপারে ওপারে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত আমরা কি তখন স্বরাজশাসনবিধি আবিষ্কার করিনি! নিশ্চয় করেচি কিন্তু কারণটা কি? আর ত কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল, আমরা তার চেয়ে বেশী শিখেছিলেম। পশুচর্ম্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুন্‌তে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্য চালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে আজ সিংহাসনে চড়িয়ে দিয়েচে সে ত কোনো দৈব নয় সে ঐ বিদ্যা। অতএব আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কম্‌বে না, ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পার্‌লে তবেই ওদের সাম্‌লানো যাবে। একথার একমাত্র অর্থ আমাদের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা-সমস্যা। অতএব শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্চে।

এই পর্য্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সাম্‌নে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়; "সব মান্‌লেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েচ?" না, পাইনি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেচি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্য্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বল্‌চিনে—ইংরাজিতে বল্‌তে হলে হয়ত বল্‌তেম, titanic wealth। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্য্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সাম্‌নে বসে

থাকৃতেম আর মনে মনে বল্‌তেম, লক্ষ্মী হলেন এক আর কুবের হল আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্চে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে; কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্চে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলি লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে, তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরীর মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর যে লোকে বাইরে বসে আছে তার যে কত পীড়া এইখানে তার আর একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজ্‌রার জান্‌লায় বসে ছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরী মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারো হাতে ছিল মাদল, কারো হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল, সে-কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দূন চৌদূন চড়তে লাগ্‌ল। রাত এগারটা হয়, দুপুর বাজে, ওরা থাম্‌তেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সঙ্গত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকৃত তাহলে সময়ও থাকৃত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে, শান্তি নেই; উত্তেজনা আছে, পরিতৃপ্তি নেই। সেই তাল-মাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল, ভরপূর মজা হচ্চে। আমি ছিলেম তাণ্ডবের বাইরে, আমিই বুঝেছিলেম গানহীন তালের দৌরাত্ম্য বড় অসহ্য।

তেম্‌নি করেই আটলান্টিকের ওপারে ইঁট পাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেচে—"তালের খচমচর অন্ত নেই কিন্তু সুর কোথায়?" আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, এ বাণীতে ত সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটি-কুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্যের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলচে, ততঃ কিম্‌!

এ কথা বারবার বলেচি আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে। আমি এই বলি,—অন্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপূর থাকে তবে তার সাধনায় সুর তাল রসের সংযম রক্ষা করে—বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতা সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন

জাপানের যে-রূপ সেখানে দেখেছি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েচে। কেননা অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা, কর্ম্মখেলা তার বাসা আস্‌বার, তার শিষ্টাচার ধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে, সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেচে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিষটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয় বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেছি। সেখানে ভোজ-পুরী মাল্লার দল আড্ডা করেচে; তাদের যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেচে সুন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগ্‌ল।

পূর্ব্বে যা বলেছি তার থেকে একথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলিনে, রেলোয়ে টেলিগ্রাফ কল-কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে প্রকাশ হয় তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায় পরকে তাড়ায়; সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ, বস্তুকে নয়, আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে, সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না, সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্য-নিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যেদিকে চায় সেইদিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে, যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড় লাভ আছে। চা বাগানের ম্যানেজার কুলিদের পরে যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তাহলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের ত পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে আয় নেই ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্ব নিয়মের দলে, সেইজন্যে সেটা চা বাগানেও খাটে। কিন্তু যদি এমন ধারণা হয় যে ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয় তাহলে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে। কলকে ত আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারিনে; তাহলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে-আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? একরোখে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করতে করতে পশ্চিম দেশে এই আত্মাকে

কেবলি সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্ব্বলতায় কাৎ হয়ে পড়েচি, আর ওরাই কি এক-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্চে ?

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এম্‌নিতর চা-বাগানের ম্যানেজারীর সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েচে। ভালোমানুষ লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেন না ভালোমানুষ লোকের নিয়ম-বোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয় ঠিক সেইখানেই আগে ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে, তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক্, রক্ষা-মন্ত্রের তাবিজ হোক্, উকীলের দালাল হোক্, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক্! কিন্তু এই নেহাৎ ভালোমানুষেরও একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপরকার, সেখানে দাঁড়িয়ে সে বল্‌তে পারে, "সাত জন্মে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান আমার পরে এই দয়া করো।" অথচ এই অনবচ্ছিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজার-সম্প্রদায় নিখুঁৎ করে' উপকার করতে জানে; জানে তাদের কুলির বস্‌তি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচি-ছাঁটা সোজা লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়াইখানা, ডাক্তারখানা হাটবাজারের যে-ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্ম্মানুষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পারে কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউ না মনে করেন আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলচি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড় করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেচে। কেননা স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুল্‌লে, অন্তরতম যে-আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠা বাড়ী ওঠে। এদিকে সমাজ ব্যাপারে, শিক্ষা বল, আরোগ্য বল, জীবিকার সুযোগ সাধন বল, নানা প্রকার হিতকর্ম্মেও মানুষের ষোলো আনা জিত হয়। কেন না পূর্ব্বেই বলেচি বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিষটা সত্য। সেই জন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় ফললাভের দিকে তাদের লোভের অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে, মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ ত একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্চে রিপু। রিপুর কর্ম্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধনলাভ করে, বললাভ করে, সুবিধা সুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্ব্বল করে।

একা মানুষ ভয়ঙ্কর নিরর্থক; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে-এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোট বড় সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়র সাহেব নীলরঙের মোমজামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন; তাকে ছবি বলিনে; কেননা সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির মহলের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন, প্ল্যান হল নির্ম্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভে ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, তবে মানব সমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড়গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক্, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই, কেননা, কুবেরের পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিম দেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে একথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েচে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জ্জীব করেচে, য়ুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েচে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেচে। কেননা আচারই হোক্ আর ব্যবহারই হোক্ তারা ত তত্ত্ব নয় তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কা'কে বলে? যিশু বলেচেন, আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে-ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে-ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

পশ্চিম সভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেচে পূর্ব্বেই তার নিন্দা করেচি। কিন্তু নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্ব-স্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েচে। ঋষি বলেচেন, মাগৃধঃ, লোভ কোরো না। "কেন করব না?" যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। "নাইবা মিল্‌ল, আমি ভোগ করতে চাই।" ভোগ কোরোনা, একথা ত বলা হচ্চে না। "ভুঞ্জীথাঃ" ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। "তাহলে সত্যটা কি?" সত্য হচ্চে এই, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" সংসারে যা-কিছু চলচে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা কিছু চলচে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর কিছুই না থাকত, তাহলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড় সাধনা হত। তা'হলে লোভই

মানুষকে সব চেয়ে বড় চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েচেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা, আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাতমাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্য্যপুরীতে বসে এই সাধনার উল্টো পথে চলা দেখে এলেম। সেখানে "যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্চে, আর "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" সেইটেই ডলারের ঘনধূলায় আচ্ছন্ন। এই জন্যেই সেখানে, ভুঞ্জীথাঃ, এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য, ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তাছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে। সেইজন্যে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তেহয়; "আরো" "আরো" হাঁকতে হাঁকতে হাঁপাতে হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার ঘোড়-দৌড় করাতে করাতে ঘূর্ণি লাগে, ভুলেই যেতে হয় অর্থ্য যা কিছু পাই আনন্দ পাচ্চিনে।

তাহলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েচেন। তাঁরা বলেন চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যা গণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় একথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কা দিয়ে বল্‌বে, "ততঃ কিম্।" তার দৌড়ও থাম্‌বে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিল্‌বে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল-পড়া যেমনি একটি আকর্ষণ-তত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুসি হয়ে বলে ওঠে, বাস্, হয়েচে।

এইত গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপ প্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেচেন—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্ব্বভূতকে আপনারই মত দেখেন এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত, আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রী-বুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মান্‌লে না, সে অকুণ্ঠিত চিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেচে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম্ গিলিয়েচে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েচে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েচে এর চেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠ্‌বেন—"ঐ

কথাটাই ত আমরা বার্‌বার্ বলে আস্‌চি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক্-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এতবড় হাঁ করেচে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চল্‌তে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়,আমরা আধ্যাত্মিক, ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই। একদিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেচেন,

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

"বিষয়ের সেবা ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়।" এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না, তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠ্‌তে হয়। তাই উপনিষৎ বলেচেন, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে,"—অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃতলাভ হবে। শুক্রাচার্য্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্য-পাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্চে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েচে। এইটে হচ্চে সাধনার সব নীচেকার ভিত,—কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামী করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতে আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি করে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েচে যে উপরপানে মাথা তোলবার ফুরসৎ তার নেই বল্লেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপরতলা যখন উঠ্‌বে তখনই, হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত, তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেচেন, না জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য-বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া,—এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিম মহা-দেশ বাহ্যবিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করচে, সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে' সেইখানে লাগাচ্চে ঘা, এই হচ্চে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর পূর্ব্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেচে সেই হচ্চে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব পূর্ব্ব পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষদ দিয়ে গেছেন—বলেচেন,

বিদ্যাং চাবিদ্যাংচ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্য মিদংসর্ব্বং—এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেচেন তখন পূর্ব্ব পশ্চিমকে মিল্‌তে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্ব্ব দেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জ্জীব; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্বসম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে-কথাটা একবার আভাসে বলেচি সেইটে আরেকবার স্পষ্ট বলা ভাল। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্ব্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌ হচ্চে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক-করা বলে প্রচার করে। পূর্ব্বে আমি বলেচি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তাহলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্বক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাক্‌লে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার শত ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উটল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবী প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে; সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে, আর তাদের মনে রাখতে হবে এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয় নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মত জেনেচে, ন ততো বিজিগুপ্‌সতে, তারাই প্রকাশ পেয়েচে এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি মানুষের দল পর্ব্বতসমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েচে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তাহলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মত কেবলি হানাহানি করেচে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েচে তারা কোন্‌ কালে লোপ পেয়েচে। আর যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েচে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেচে, এত রথ ছুটেচে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল, অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেচে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল ত ভালই, নইলে সে

দুর্য্যোগ। সেই মহা দুর্য্যোগ আজ ঘটেচে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগল, এক করবার আন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেচে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভারটা "আরে, আরে, হাঁ, হাঁ," করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েচে, কিছুতে নাগাল পাচ্চে না। অথচ একদল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বল্‌লে," সাবাস্, একেই ত বলে উন্নতি।" এদিকে, আমরা পূর্ব্বদেশের ভালোমানুষ, যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি, ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সাম্‌লে উঠতে পারচিনে। কেননা যারা কাছেও আসে তফাতেও থাকে তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তাহলে পদে পদে ঠকাঠক্ ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয় অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক্, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয়, যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্চে অথচ মিল্‌চ না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডীর বাইরে তারা এক হতে শেখেনি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই, সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা ধরে, দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে, রাজাকে ভোলে দারোগাকে কিছুতে ভুল্‌তে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠ্‌ল সত্যের জোরে, কিন্তু ন্যাশনালিজ্‌ম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডীদেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারিদিক থেকে নরবলির জোগান চল্‌তে লাগ্‌ল। যতদিন বিদেশী বলি জুট্‌ত ততদিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগ্‌তে আরম্ভ হল,— "একেই কি বলে ইষ্টদেবতা? এযে ঘর পর কিছুই বিচার করে না।" এ যখন একদিন পূর্ব্বদেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল, এবং "ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায়, ধরি ধরি চিবায় সমস্ত"—তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবচে, এর পূজো আমাদের বংশে সইবে না! যুদ্ধ যখন পুরোদমে চল্‌ছিল তখন সকলেই ভাবছিল যুদ্ধ মিট্‌লেই অকল্যাণ মিট্‌বে। যখন মিট্‌ল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেচে সন্ধিপত্রের মুখস পরে। কিস্কিন্ধাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড ল্যাজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁৎকে উঠেছিল আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই ল্যাজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহশিক্ত কাগজ জড়ানো চলেচে, বোঝা যাচ্চে ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারো ঘরের চাল আর বাকী থাক্‌বে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বল্‌চেন, যে, যে-দুর্ব্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশনা-

লিজ্‌ম্, দেশের সর্ব্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্‌টোদিকে, অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েচে এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এতবড় সত্যের উপর যখন কোনো একটা মাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় এ'কে ধূলো করে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে তখন ঐ রিপুটাকে এর মাঝখানে আন্‌লে শকুনির মত কপট দ্যূতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্ত্তমান যুগের সাধনার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডী-দেবতার যারা পূজারী তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চ্চা করাকে কর্ত্তব্য মনে করে। জর্ম্মণি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেচে। পশ্চিমের কোন বড় নেশন্ এ কাজ করেনি? আসল কথা, জর্ম্মণি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেচে সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষা-বিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইন্‌ক্যুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্য-দেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম্ অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়ে-ছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কি? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে' প্রতিদিন অসত্য পীরের সিন্নি মানা।

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সর্ব্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু, যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচার পদ্ধতি এর প্রতিকূল তা' আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে' তুল্‌বে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে একথা না ভোলায় যে, একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্চে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুন্‌তে পাচ্চি সমুদ্রের ওপারে মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করচে, "আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্ম্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?" তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌছক্, যে, "মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কশ্‌শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

আমরা শুন্‌তে পাচ্চি সমুদ্রের ওপারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বল্‌চে "শান্তি চাই।" এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেচেন, "শান্তং শিবম-দ্বৈতং।" অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে

আছে, সেই জন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয়, যে, অতীত যুগের যে-আবর্জ্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্র দেবতার হুকুম এসে পৌচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগ্‌তে সুরু করেচে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জ্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চ্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সর্ব্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুল্‌তে হবে এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়-লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি,সহজে মিট্‌তেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য কর্‌তে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চল্‌বে না, তার অতিথি শালা চাই, যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে, সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে শিক্ষার যতকিছু সরকারী ব্যবস্থা আছে তার পনেরো আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি, আতিথ্য করে না বলে' লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়, সেই জন্যেই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে আমি ভিখারী আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই। কে বলে নেই? আমি ত শুনেচি পশ্চিমদেশ বারম্বার জিজ্ঞাসা কর্‌চে, "ভারতের বাণী কই?" তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে এত সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মত শোনাচ্চে। তাইত দেখি আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্সমূলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্য্য সভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের বাদ্যের কড়ি-মধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে সে যখন প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিমরাগেই তার সপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্বভূভাগের সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি কিন্তু তার সাধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্ত্তে সে বিশ্বের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি কর্‌তে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ কর্‌তে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্য নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্ম্মের মধ্যে

প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব, নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই :—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্কলন

নামের খেলা

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখ্‌তে শুরু করে।

বহু যত্নে খাতায় সোণালী কালীর কিনারা টেনে তারি গায়ে লতা এঁকে মাঝখানে লাল কালী দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখ্‌ত। আর খুব সমারোহে মলাটের ওপর লিখ্‌ত, শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগ্‌ল। কোথাও ছাপা হ'ল না।

মনে মনে সে স্থির ক'রলে, যখন হাতে টাকা জমবে তখন নিজে কাগজ বের ক'রব।

বাপের মৃত্যুর পর গুরুজনেরা বার বার ব'ললে, "একটা কোনো কাজের চেষ্টা কর, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।"

সে একটুখানি হাসলে আর লিখ্‌তে লাগ্‌ল। একটি দু'টি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা ক'রেছিল। হ'ল না।

আন্দোলন হ'ল একটি পাঠকের মনে। সে হ'চ্ছে, তার ছোট ভাগনেটি।

নতুন ক খ শিখে সে যে বই হাতে পায় চেঁচিয়ে পড়ে।

এক দিন একখানা বই নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মামার কাছে ছুটে এল। ব'ললে, "দেখ দেখ, মামা, এ যে তোমারি নাম।"

মামা একটুখানি হাসলে আর আদর ক'রে খোকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাক্স খুলে আর একখানি বই বের ক'রে ব'ললে, "আচ্ছা, এটা পড় দেখি।"

ভাগনে একটি অক্ষর বানান ক'রে ক'রে মামার নাম প'ড়ল।

বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরল, সেটাতেও প'ড়ে দেখে মামার নাম!

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখ্‌লে, তখন সে আর অল্পে সন্তুষ্ট হ'তে চাইল না। দুই হাত ফাঁক ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলে, "তোমার নাম আরো অনেক অনেক অনেক বইয়ে আছে? একশোটা, চব্বিশটা, সাতটা বইয়ে?"

মামা চোখ টিপে ব'ললে, "ক্রমে দেখতে পাবি!"

ভাগ্‌নে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ীর বুড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে, ছত্রপতি শিবাজী তার নায়ক।

বন্ধুরা ব'ললে, "এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চ'লবে!"

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটার-বিলাসী বন্ধু থিয়েটার-ওয়ালাদের কাছে অভিমত আন্‌তে গেছে। তাই সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাগ্‌নেরও ছুটি। আজ সকাল

থেকে সে এক খেলা বের ক'রেছে, অন্যমনস্ক হ'য়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগ্‌নে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোট কোনোটা বড়।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালী লাগিয়ে তা'তে নিজের নাম ছাপাচ্চে মামাকে আশ্চর্য্য ক'রে দিতে হবে।

আশ্চর্য্য ক'রে দিলে। মামা এক সময়ে ব'সবার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারী ব্যস্ত।

"কি কানাই, কি ক'রচিস্?"

ভাগ্‌নে খুব আগ্রহ ক'রেই দেখালে সে কি ক'রচে কেবল তিনটি মাত্র বই নয়, অন্ততঃ পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম।

এ কি কাণ্ড! পড়া-শুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা! আর এ কি রকম খেলা!

কানাইয়ের বহু দুঃখে জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দম্‌কায় দম্‌কায় কেঁদে ওঠে, কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না।

বুড়ি ঝি ছুটে এসে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি হ'য়েছে বাবা?"

কানাই ব'ললে, "আমার নাম!"

মা এসে ব'ললে, "কি রে কানাই, কি হ'য়েছে?"

কানাই রুদ্ধকণ্ঠে ব'ললে, "আমার নাম!"

ঝি লুকিয়ে তার হাতে আস্ত একটা ক্ষীরপুলি এনে দিলে, মাটীতে ফেলে দিয়ে সে ব'ললে, "আমার নাম!"

মা এসে ব'ললে, "কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়ীটা।"

কানাই রেলগাড়ী ফেলে ব'ললে, "আমার নাম!"

থিয়েটার থেকে বন্ধু এল।

মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি হ'ল?"

বন্ধু ব'ললে, "ওরা রাজী হ'ল না।"

অনেক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মামা ব'ললে, "আমার সর্ব্বস্ব যায় সেও ভাল, আমি নিজে থিয়েটার খুল্‌ব।"

বন্ধু ব'ললে, "আজ ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবে না?"

ও ব'ললে, "না, আমার জ্বরভাব।"

বিকেলে মা এসে ব'ললে, "খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।"

ও ব'ললে, "ক্ষিদে নেই!"

সন্ধ্যের সময় স্ত্রী এসে ব'ললে, "তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না?"

ও ব'ললে, "মাথা ধ'রেচে।"

ভাগ্‌নে এসে ব'ললে, "আমার নাম ফিরিয়ে দাও!"

মামা ঠাস্ করে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মোসলেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৮।

নতুন পুতুল

১

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরী করত; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্যে।

বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেচে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে-পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়েনা, কিছু রং দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয় পুতুল-গুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বল্‌লে, "লোকটা সাহস দেখিয়েচে।"

প্রবীণের দল বল্‌লে, "এ'কে বলে সাহস? এ ত স্পর্দ্ধা।"

কিন্তু নতুন কালের নতুন দাবী। একালের রাজকন্যারা বলে, "আমাদের এই পুতুল চাই।"

সাবেককালের অনুচররা বলে, "আরে ছিঃ।"

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মত ওপারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির পুতুল-হাটের সর্দ্দার।

২

বুড়োর মন ভাঙ্‌ল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বল্‌লে, "তুমি আমার বাড়িতে এস।"

জামাই বল্‌লে, "খাও দাও, আরাম কর, আর সব্‌জির ক্ষেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখ।"

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকন্নার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকা বোঝাই করে সহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেচে সে কথা বুড়ো বোঝে না, তেমনই সে বোঝে না যে তার নাৎনীর বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় বসে বুড়ো ক্ষেত আগ্‌লায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢলে পড়ে সেখানে নাৎনী গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে, বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্য্যন্ত খুসি হয়ে ওঠে। সে বলে, "কি দাদা, কি চাই?"

নাৎনী বলে, "আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেল্‌ব।"

বুড়ো বলে, "আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন?"

নাৎনী বলে, "তোমার চেয়ে ভাল পুতুল কে গড়ে, শুনি?"

বুড়ো বলে, "কেন, কিষণলাল!"

নাৎনী বলে, "ইস্! কিষণলালের সাধ্যি!"

দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েচে। বারেবারে একই কথা।

তারপরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মাল-মসলা বের করে—চোখে মস্ত গোল চশ্‌মাটা আঁটে।

নাৎনীকে বলে, "কিন্তু দাদী, ভুট্টা যে কাকে খেয়ে যাবে!"

নাৎনী বলে, "দাদা, আমি কাক তাড়াব।"

বেলা বয়ে যায়; দূরে ইঁদারা থেকে বলদে জল টানে তার শব্দ আসে; নাৎনী কাক তাড়ায়; বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

৩

বুড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড় কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়তে বসেচে, হুঁস হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আস্‌চে।

কাছে এসে যখন সে ডাক দিলে তখন চশ্‌মাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ ছেলের মত তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বল্‌লে, "দুধ দোয়া পড়ে থাক্, আর তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও! অত বড় মেয়ে, ওর কি পুতুল খেলার বয়স!"

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল, "সুভদ্রা খেল্‌বে কেন? এ পুতুল রাজবাড়ীতে বেচ্‌ব। আমার দাদীর যেদিন বর আস্‌বে, সেদিন ত ওর গলায় মোহরের মালা পরাতে হবে আমি তাই টাকা জমাতে চাই।

মেয়ে বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, "রাজবাড়িতে এ পুতুল কিন্‌বে কে?"

বুড়োর মাথা হেট হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল।

সুভদ্রা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "দাদার পুতুল রাজ-বাড়িতে কেমন না কেনে দেখ্‌ব!"

৪

দুদিন পরে সুভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বল্‌লে, "এই নাও আমার দাদার পুতুলের দাম।"

মা বললে, "কোথায় পেলি?"

মেয়ে বল্‌লে, "রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেচি।"

বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "দাদী, তবু ত তোর দাদা এখন চোখে ভাল দেখে না. তার হাত কেঁপে যায়!"

মা খুসি হয়ে বল্‌লে, "এমন ষোলোটা মোহর হলেই ত সুভদ্রার গলার হার হবে।"

বুড়ো বল্‌লে, "তার আর ভাবনা কি?"

সুভদ্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "দাদাভাই, আমার বরের জন্যে ত ভাবনা নেই।"

বুড়ো হাস্‌তে লাগ্‌ল, আর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে ফেল্‌লে।

৫

বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর সুভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইঁদারায় বলদে ক্যাঁ-কোঁ করে জল টানে।

একে একে ষোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

মা বল্‌লে, "এখন বর এলেই হয়।"

সুভদ্রা বুড়োর কানে কানে বল্‌লে, "দাদাভাই, বর ঠিক আছে।"

দাদা বল্‌লে, "বল্‌ ত দাদী, কোথায় পেলি বর।"

সুভদ্রা বল্‌লে, "যেদিন রাজপুরীতে গেলুম, দ্বারী বল্‌লে কি চাও? আমি বল্‌লেম, রাজকন্যাদের কাছে পুতুল বেচ্‌তে চাই। সে বল্‌লে, এ পুতুল এখনকার দিনে চল্‌বে না,—ব'লে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার কান্না দেখে বল্‌লে, দাও ত, ঐ পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে দি, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর, দাদা, তাহলে আমি তার গলায় মালা দিই।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, "সে আছে কোথায়?"

নাৎনী বল্‌লে, "ঐ যে বাইরে পিয়াল গাছের তলায়।"

বর এল ঘরের মধ্যে, বুড়ো বল্‌লে, "এ যে কিষণ-লাল।"

কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আমি কিষণলাল।"

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বল্‌লে, "ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।"

নাৎনী বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বল্‌লে, "দাদা, তোমাকে সুদ্ধ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৮

অদৃশ্য আলোক

সেতারের তার অঙ্গুলি তাড়নে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। দেখা যায় তার কাঁপিতেছে; সেই কম্পনে বায়ুরাশিতে অদৃশ্য ঢেউ উৎপন্ন হয় এবং তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয়ে সুর উপলব্ধি হয়। এইরূপে ত্রিবিধ উপকরণে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে—প্রথমতঃ শব্দের উৎস কম্পিত তার, দ্বিতীয়ত: পরিবাহক বায়ু এবং তৃতীয়তঃ শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।

সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিয়া থাকে। এইরূপে বায়ুস্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০০ বার হইলে অসহ্য উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও খাট করিলে সুর আর শুনিতে পাই না। তার তখনও কম্পিত হয়, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সেই অতি উচ্চ সুর উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রবণ করিবার উপরের দিকে যেরূপ এক

সীমা আছে নীচের দিকেও সেইরূপ। স্থূল তার কিম্বা ইস্পাত আঘাত করিলে অতি ধীর স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যায় না। কম্পন-সংখ্যা ১০ হইতে ৩০,০০০ পর্য্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয় অর্থাৎ আমাদের শ্রবণ-শক্তি একাদশ সপ্তকের মধ্যে আবদ্ধ। কর্ণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক স্বর আমাদের নিকট অশব্দ।

বায়ুরাশির কম্পনে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশ-স্পন্দনে সেইরূপ আলো উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু একাদশ সপ্তক স্বর শুনিতে পাই। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আরও অধিক, আকাশের অগণিত সুরের মধ্যে এক সপ্তক সুর মাত্র দেখিতে পাই। আকাশ-স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে চারি শত লক্ষ কোটি বার হইলে চক্ষু তাহা রক্তিম আলো বলিয়া উপলব্ধি করে, কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলে বেগুনী রং দেখিতে পাই। পীত, সবুজ ও নীলালোক এই এক সপ্তকের অন্তর্ভুত। কম্পন-সংখ্যা চারি শত লক্ষ কোটির উদ্ধে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হয় এবং দৃশ্য অদৃশ্যে মিলাইয়া যায়।

আকাশ-স্পন্দনেই আলোর উৎপত্তি, তাহা দৃশ্যই হউক অথবা অদৃশ্যই হউক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদৃশ্য রশ্মি কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, আর এই রশ্মি যে আলো তাহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ের পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জার্ম্মাণ অধ্যাপক হার্টজ সর্ব্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে আকাশে উর্ম্মি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তবে তাহার ঢেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য আলো রশ্মির সম্মুখে একখানি ধাতু-ফলক ধরিলে পশ্চাতে ছায়া পড়ে, কিন্তু বৃহদাকার আকাশের ঢেউগুলি ঘুরিয়া বাধার পশ্চাতে পৌঁছিয়া থাকে। জলের বৃহৎ উর্ম্মির সম্মুখে উপলখণ্ড ধরিলেও এইরূপ হইতে দেখা যায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিতে হইলে অদৃশ্য আলোর উর্ম্মির আকার ক্ষুদ্র করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে আকাশোর্ম্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কলে একটী ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তাড়িতোর্ম্মি উৎপন্ন হয়। লণ্ঠনের সম্মুখে একটী খোলা নল, তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলো বাহির হয়। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয় ত অন্য জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ্ উত্তেজিত হইয়া থাকে।

অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ আবশ্যক। আমাদের চক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ু-নির্ম্মিত একখানি পর্দ্দা আছে, তাহার উপর আলো পতিত হইলে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আলোড়িত করে এবং সেই আলোড়ন আমরা আলো বলিয়া অনুভব করি। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা ঐরূপ। দুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরের সহিত স্পর্শ করিয়া আছে। সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎ-স্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপ হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেইরূপ কাঁটা নাড়িয়া সাড়া দেয়।

আলোক ও প্রকৃতি

এখন দেখা যাউক দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিধ অথবা বিভিন্ন। দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি এই যে—

(১) ইহা সরল রেখায় ধাবিত হয়।

(২) ধাতু-নির্ম্মিত দর্পণে পতিত হইলে আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে। রশ্মি প্রতিফলিত হইবারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

(৩) আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্ত্তিত হয়। ফটোগ্রাফের প্লেটে যে ছবি পড়ে, তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। প্লেটের উপর ডেভেলপারে ছবি ফুটিয়া উঠে।

(৪) সব আলোকের রং এক নহে, কোন আলো লাল, কোনটা পীত, কোনটা সবুজ এবং কোনটা নীল। বিভিন্ন পদার্থ নানা রং-এর পক্ষে স্বচ্ছ কিম্বা অস্বচ্ছ।

(৫) আলো বায়ু হইতে অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থের উপর পতিত হইয়া বক্রীভূত হয়। আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্টত দেখা যায়। কাচ-বর্ত্তুলের ভিতর দিয়া আলো অক্ষীণভাবে দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(৬) আলোর ঢেউয়ে সচরাচর কোন শৃঙ্খলা নাই, উহা সর্ব্বমুখী অর্থাৎ কখনও উর্দ্ধাধ, কখনও বা দক্ষিণে-বামে স্পন্দিত হয়। স্ফটিকতজাতীয় পদার্থ দ্বারা আলোক-রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে। তখন স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়। একমুখী আলোর বিশেষ ধর্ম্ম পরে বলিব।

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই রূপ সে সম্বন্ধে পরীক্ষা বর্ণনা করিব।

প্রথমতঃ অদৃশ্য আলোক যে সোজা পথে চলে, তাহার প্রমাণ এই যে, বিদ্যুতোর্ম্মি বাহির হইবার জন্য লণ্ঠনে যে নল আছে সেই নলের সম্মুখে সোজা লাইনে কৃত্রিম চক্ষু ধরিলে কাঁটা নড়িয়া উঠে। চক্ষুটীকে এক পাশে ধরিলে কোন উত্তেজনা-চিহ্ন দেখা যায় না।

দর্পণে যেরূপ দৃশ্য আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে এবং সেই প্রত্যাবর্ত্তন যে নিয়মাধীন, অদৃশ্য আলোও সেইরূপে এবং সেই নিয়মে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দৃশ্য আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অদৃশ্য আলোক দ্বারাও যে আণবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আলোর বিবিধ বর্ণ

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দৃশ্য আলোক নানা বর্ণের; অনুভূতি শক্তি দ্বারা বর্ণের বিভিন্নতা সচরাচর ধরিতে পারি। কিন্তু বর্ণের বিভিন্নতা কেহ কেহ ধরিতে পারেন না। তাঁহারা বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ। বর্ণের বিভিন্নতা অন্য উপায়ে ধরা যাইতে পারে, সে বিষয়ে পরে বলিব। এখানে বলা আবশ্যক যে, মানুষের দৃষ্টি-সীমার ক্রম-বিকাশ হইতেছে। বহু পূর্ব্বপুরুষদের বর্ণজ্ঞান সঙ্কীর্ণ ছিল, তাহা অন্ততঃ একদিকে প্রসারিত হইয়াছে। আর অন্যদিকেও হয় ত কোন দিন প্রসারিত হইবে। তাহা হইলে এখন যাহা অদৃশ্য তাহা দৃশ্যের মধ্যে আসিবে।

সে যাহা হউক, অদৃশ্য আলোর রং সম্বন্ধে কয়েকটী অদ্ভুত পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জানালার কাচের কোন বিশেষ রং নাই, সূর্য্যের আলো উহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সুতরাং দৃশ্য আলোকের পক্ষে কাচ স্বচ্ছ; জলও স্বচ্ছ। কিন্তু ইট-পাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাতরা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ। দৃশ্য আলোকের কথা বলিলাম; অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ আলো সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গেলাস সম্মুখে ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম! তদপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে! ইট-পাটকেল যাহা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে করিতাম, তাহা অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আলকাতরা? ইহা জানালার কাঁচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ! কোথায় এক অদ্ভুত দেশের কথা পড়িয়াছিলাম, সে দেশে মৎস্য জলাশয় হইতে ডাঙ্গায় ছিপ ফেলিয়া মানুষ শিকার করে। অদৃশ্য আলোকের দেশ হয় ত সেইরূপই অদ্ভুত হইবে।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দৃশ্য আলোকেও এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, তাহাতে অত্যন্ত বলিয়া বিস্মিত হই না। সম্মুখের সাদা কাগজের উপর দুইটী বিভিন্ন আলো-রেখা পতিত হইয়াছে, একটী লাল আর একটী সবুজ। মাঝখানে জানালার কাচ ধরিলে উভয় আলোই অবাধে যায়। এবার মাঝখানে লাল কাচ ধরিলাম, লাল আলো অবাধে যাইতেছে, কিন্তু সবুজ আলো বন্ধ হইল। সবুজ কাচ ধরিলে সবুজ আলো বাধা পাইবে না, কিন্তু লাল আলো বন্ধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, (১) সব আলো এক বর্ণের নহে; (২) কোন পদার্থ এক আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু অন্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ। যদি বর্ণজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলেও একইপদার্থের ভিতর দিয়া এক

আলো যাইতেছে এবং অন্ত আলো যাইতে পারিতেছে না দেখিয়া নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতাম যে দুইটী আলো বিভিন্ন বর্ণের। আলকাতরা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্য বর্ণের তাহা প্রমাণিত হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ইন্দ্রধনু অপেক্ষাও কল্পনাতীত অনেক নূতন বর্ণের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম। তাহাতেও কি আমাদের বর্ণের তৃষা মিটিত?

মৃত্তিকা-বর্ত্তুল ও কাচ বর্ত্তুল

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আলো এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুর উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। ত্রিকোণ কাচ কিংবা ত্রিকোণ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য আলো যে একই নিয়মের অধীন তাহা প্রমাণ করা যায়। কাচ-বর্ত্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে প্রেরণ করা যায়। তবে এজন্য বহুমূল্য কাচ-বর্ত্তুল নিষ্প্রয়োজন, ইট-পাটকেল দিয়াও এইরূপ বর্ত্তুল নির্ম্মিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে যে ইষ্টক-নির্ম্মিত গোল স্তম্ভ আছে তাহা দিয়া অদৃশ্য আলো দূরে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। দৃশ্য আলো সংহত করিবার পক্ষে হীরকখণ্ডের অদ্ভুত ক্ষমতা। বস্তু-বিশেষের আলো সংহত করিবার ক্ষমতা যেরূপ অধিক তাহার আলো বিকীরণ করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে বহুল হইয়া থাকে। এই কারণেই হীরকের এত মূল্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চীনা বাসনের অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার ক্ষমতা হীরক অপেক্ষাও অনেকগুণ অধিক। সুতরাং যদি কোন দিন আমাদের দৃষ্টি-শক্তি প্রসারিত হইয়া রক্তিম বর্ণের সীমা পার হয়, তবে হীরক তুচ্ছ হইবে এবং চীনা বাসনের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িবে। প্রথমবার বিলাত যাইবার সময় অভ্যস্ত কুসংস্কার-হেতু চীনা বাসন স্পর্শ করিতে ঘৃণা হইত। বিলাতে সম্ভ্রান্ত ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম যে, দেওয়ালে বহুবিধ চীনা বাসন সাজান রহিয়াছে। ইহার কি মূল্য, যে এত যত্ন? প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি যে ইংরেজ ব্যবসাদার। অদৃশ্য আলো দৃশ্য হইলে চীনা বাসন অমূল্য হইয়া যাইবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে। সে দিন সৌখীন রমণীগণ হীরকমালা প্রত্যাখান করিয়া পেয়ালা-পিরিচের মালা সগর্ব্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।

সর্ব্বমুখী এবং একমুখী আলো

প্রদীপের অথবা সূর্য্যের আলো সর্ব্বমুখী অর্থাৎ তাহার স্পন্দন একবার উর্দ্ধাধ, অন্যবার দক্ষিণে-বামে হইয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপের টুর্ম্মালিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে আলো একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুর্ম্মালিন সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া যায়, কিন্তু একখানি অন্য-খানির সম্মুখে আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

অদৃশ্য আলোকও এইরূপে একমুখী করা যাইতে পারে। তাহা বুঝাইতে হইলে নীতি-কথার বক ও শৃগালের গল্প স্মরণ করা আবশ্যক। বক শৃগালকে নিমন্ত্রণ করিয়া পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিল। লম্বা বোতলে পানীয় দ্রব্য রক্ষিত ছিল। বক লম্বা ঠোঁট দিয়া অনায়াসে পান করিল; শৃগাল কেবলমাত্র সুরুনী লেহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরের দিন শৃগাল ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিল। পানীয় দ্রব্য থালাতে দেওয়া হইয়াছিল। বক ঠোঁট কাৎ করিয়াও কোন প্রকারে শোষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বোতল ও থালার দ্বারা যেরূপ লম্বা ঠোঁট এবং চেপ্টা মুখের বিভিন্নতা বাহির হয়, সেইরূপে একমুখী আলোকে পার্থক্য ধরা যাইতে পারে, তাহা লম্বা কিংবা চেপ্টা, উর্দ্ধাধ অথবা এ-পাশ ও-পাশ।

বক-কচ্ছপ সংবাদ

মনে কর দুই দল জন্তু মাঠে চরিতেছে—লম্বা জানোয়ার বক ও চেপ্টা জীব কচ্ছপ। সর্ব্বমুখী তদৃশ্য আলোকও এইরূপ দুই প্রকারের স্পন্দন-সঞ্জাত। সম্মুখে লোহার গরাদে খাড়াভাবে ধরিলে

সহজেই দুই প্রকার জীবদিগকে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। জন্তুদিগকে তাড়া করিলে লম্বা বক সহজেই বাধা পার হইয়া যাইবে, কিন্তু চেপ্টা কচ্ছপ গরাদের এ-পাশে পড়িয়া থাকিবে। প্রথম বাধা পার হইবার পর বকবৃন্দের সম্মুখে যদি দ্বিতীয় গরাদে সমান্তরাল-ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও বক তাহা দিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদেখানাকে যদি আড় ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বক আটকাইয়া থাকিবে। এইরূপে একটা গরাদে অদৃশ্য আলোর সম্মুখে ধরিলে আলো একমুখী হইবে, দ্বিতীয় গরাদে সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো উহার ভিতর দিয়াও যাইবে—তখন দ্বিতীয় গরাদেটা আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদেটা আড়ভাবে ধরিলে আলো যাইতে পারিবে না, তখন গরাদেটা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। যদি আলো একমুখী হয়, তাহা হইলে কোন কোন বস্তু একভাবে ধরিলে অস্বচ্ছ হইবে, কিন্তু ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারিবে।

পুস্তকের পাতাগুলি গরাদের মত সজ্জিত। বিলাতে রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনে বক্তৃতা করিবার সময় টেবিলের উপর একখানা রেলের টাইম-টেব্‌ল্ অর্থাৎ ব্র্যাড্‌শ ছিল তাহাতে ১০ হাজার ট্রেনের সময়, রেল-ভাড়া এবং অন্যান্য বিষয় ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। উহা এরূপ জটিল যে, কাহারও সাধ্য নাই ইহা হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির করিতে পারে। আমি পুস্তকের তমসাচ্ছন্নতা কিছু না মনে করিয়া পরীক্ষার সময় দেখাইয়াছিলাম যে, বইখানাকে এক-রূপ করিয়া ধরিলে ইহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে না; কিন্তু ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া ধরিলে পুস্তকখানা একেবারে স্বচ্ছ হইয়া যায়। পরীক্ষা দেখাইবামাত্র হাসির রোল হলে প্রতিধ্বনি হইল। প্রথম প্রথম রহস্য বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম। লর্ড রেলী আসিয়া বলিলেন যে ব্র্যাড্‌শর ভিতর দিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ আলোক দেখিতে পায় নাই। কি করিয়া ধরিলে আলো দেখিতে পাওয়া যায় ইহা শিখাইলে জগৎবাসী আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে। আমার বৈজ্ঞানিক লেখা পড়িয়া কেহ, কেহ স্তম্ভিত হইবেন, দন্তস্ফুট অথবা চক্ষুস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না। তাহা হইলে বইখানাকে ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া ধরিলেই সব তথ্য একেবারে বিশদ হইবে।

আলো একমুখী করিবার অন্য এক উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদিও এলো-মেলোভাবে আকাশ-স্পন্দন রমণীর কেশগুচ্ছে প্রবেশ করে, তথাপি বাহির হইবার সময় একেবারে শৃঙ্খলিত হইয়া যায়। বিলাতের নরসুন্দরদের দোকান হইতে বহু জাতির কেশগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ফরাসী মহিলার নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। এ বিষয়ে জার্ম্মান মহিলার স্বর্ণাভ কুন্তল অনেকাংশে হীন। পারিসে যখন এই পরীক্ষা দেখাই, তখন সমবেত ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলী এই নূতন তত্ত্ব দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈরী জাতির উপর তাহাদের প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে তাহাদের কোন সন্দেহই রহিল না। বলা বাহুল্য, বার্লিনে এই পরীক্ষা প্রদর্শনে বিরত হইয়া-ছিলাম।

যে সব পরীক্ষা বর্ণনা করিলাম, তাহা হইতে দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা প্রমাণিত হইল।

তার-হীন সংবাদ

অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালার লেপ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম মেকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-উর্ম্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটী রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল। ১৯০৭ সালে মার্কণী তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেন্ট গ্রহণ করেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত

অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতি সাধনে কৃতিত্ব দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পূর্ব্বে দূরদেশে কেবল তারের সাহায্যে সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনা তারে সর্ব্বত্র সংবাদ পৌঁছিয়া থাকে।

কেবল তাহাই নহে। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশ-তরঙ্গ সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে। সেই স্বর সকলে শুনিতে পায় না, শুনিতে হইলে কর্ণ আকাশের সুরের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়। এইরূপে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অহোরাত্র কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কাণ পাতিয়া তবে একবার শোন। "কোথা হইতে খবর পাঠাইতেছ?" উত্তর —"সমুদ্র হইতে, তিন শত হাত নীচে ডুবিয়া আছি। টর্পিডো দিয়া তিনখানা রণতরী ডুবাইয়াছি আর দুইখানার প্রতীক্ষায় আছি।" আবার এ কি? একেবারে লক্ষ লক্ষ কামানের গর্জ্জন শোনা যাইতেছে, অগ্ন্যুৎপাতে যেন মেদিনী বিদীর্ণ হইল। পরে জানিলাম মহাসাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়াছে, কল্য হইতে পৃথিবীর ইতিহাস অন্য রকম হইবে। এই ভীষণ নিনাদের মধ্যেও মনুষ্যকণ্ঠের কত মর্ম্মবেদনাধ্বনি, কত মিনতি, কত জিজ্ঞাসা ও কত রকমের উত্তর শোনা যাইতেছে। ইহার মধ্যে কে এক জন অবুঝের মত বার বার একই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে,—"কোথায় তুমি—কোথায় তুমি?" কোন উত্তর আসিল না—সে আর এই পৃথিবীতে নাই।

এইরূপে দূরদূরান্ত বাহিয়া আকাশের সুর ধ্বনিত হইতেছে। মনে কর কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলি বৈদ্যুতিক অর্গ্যানের এক দিক হইতে অন্য দিকের বিবিধ ষ্টপ আঘাত করিতেছে। বাম দিকের ষ্টপে আঘাত করাতে এক সেকেণ্ডে একটী স্পন্দন হইল। অমনি শূন্যমার্গে বিদ্যুতোর্ম্মি ধাবিত হইল। কি প্রকাণ্ড সেই সহস্র ক্রোশব্যাপী ঢেউ! উহা অনায়াসে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবী দশবার প্রদক্ষিণ করিল! ইহার পর দ্বিতীয় ষ্টপে আঘাত পড়িল এবং প্রতি সেকেণ্ডে আকাশ দশবার স্পন্দিত হইল। এইরূপে আকাশের সুর উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতরে উঠিবে, স্পন্দন-সংখ্যা এক হইতে দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি গুণ বৃদ্ধি পাইবে। আকাশ-সাগরে নিমজ্জমান রহিয়া আমরা অগণিত উর্ম্মি দ্বারা আহত হইব, কিন্তু ইহার মধ্যেও কোন ইন্দ্রিয় জাগরিত হইবে না। আকাশ-স্পন্দন আরও উর্দ্ধে উঠুক তখন কিয়ৎকালের জন্য তাপ অনুভূত হইবে। তাহার পর চক্ষু উত্তেজিত হইয়া রক্তিম, পীতাদি আলোক দেখিতে পাইবে। এই সব দৃশ্য এক সপ্তক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সুর আরও উচ্চে উঠিলে দৃশ্যশক্তি পুনরায় পরাস্ত হইবে, অনুভূতি-শক্তি আর জাগিবে না। ক্ষণিক আলোকের পরই অভেদ্য অন্ধকার।

তবে ত আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা! কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক-শলাকা লইয়া পাথার লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রি, তবে কি সম্বল তোমার?

সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস, যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া গঠিত হইতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, কেবল মাঝে দুই একটী ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এবং এক দিন বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

মোস্‌লেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৮।

বেদুঈন

এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আম্‌রাই প্রজা আম্‌রা রাজা।
আমাদের গ্লানি হিংসা যে করে আমাদের হাতে পাবেই সাজা।
তাঁবু আমাদের পশ্চিমে-পূবে কালো ক'রে আছে সফেদ বালি,
শাদা হাতে যেন উল্কির দাগ—পোড়া হাঁড়ি আর চুলার কালি!
কোমরে-বাঁধা সে ভারী তলোয়ার আধা-সিধা আর আধেক বাঁকা,
হাতে জল তোলা দড়ির মতন দীঘল বর্শা রক্ত-মাখা!
বেকর-জোসম-মা'দের গোষ্ঠী—জানে তারা খুবই মোদের কিরা,
শত্রু-নিপাত না ক'রে আমরা ভিজাই না চুল, খুলি না গিরা।
হেজাজ্-বংশে ভেজাবে না মুখ ঘোলা কাদা-মাখা 'দেদা'র জলে,
আমাদের উট দুধে-ভরা-বাঁট চরে না শুক্‌না কাঁটার দলে।
এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আম্‌রাই প্রজা আম্‌রা রাজা!
আমাদের সাথে বাদ সাধে যেই, আমাদের হাতে পাবেই সাজা।

ভোরের তারাটী ওঠে নি যখনো—পাহাড়ের তলে শিকলে-বাঁধা,
হাওয়ারা সবাই ঘুম থেকে জেগে সবে ফের সুরু ক'রেছে কাঁদা।
বুড়ারা ঘুমায়, জোয়ানেরা জেগে খিম্‌খিম্-দানা খাওয়ায় উটে,
পরে, পেয়ালায় ঘোড়ারি দুধের শরাব সদ্য ফেনায়ে উঠে।
ভোরের পেয়ালা কাণা-ভোর ভরি' হাতে-হাতে দেয় হাসিনা-সাকী,
চোক্ জ্ব'লে ওঠে, আকাশেরো কোণে জ্ব'লে ওঠে লাল পূবের চাকী!
মস্‌লা-বাটা সে পাথরের মত চক্‌চকে-তেলা ঘোড়ার পিঠে
মালেক, কায়েস্, আমি—তিন জন লাফাইয়া ঠুকি পায়ের গিঁঠে।
ছোট-ক'রে-ছাটা চুলগুলি তার, গলাটী যেন সে তালের কোঁড়া,
পালক-লাগানো তীরের মতন ছুটে' যায় মোর আরব ঘোড়া।
সাম্‌নে বালুতে দড়ি বুনে' দেয় ঝির্-ঝির্ ধীর ভোরের হাওয়া,
পিছনে কিছু না—সব মুছে যায়, ধুলা-কুয়াশায় যায় না চাওয়া!
ডাহিনে মিলায় মোগেমীর-গিরি, সিতাব্-কাতান্-তবির্-চূড়া,
'কানাবেল্'-বনে দাঁড়ায় সাথীরা, ধুয়ে লয় মুখে বালির গুঁড়া।
আমার ঘোড়া সে ছোটে পুরা দম—টগ্‌বগ্ সেই আওয়াজ বা কি!
বন্ বন্ বেগে উড়ে যায়, যেন ছেলেদের হাতে ঘুরণ্-চাকী!

মাজেল্-পাহাড় ওই দেখা যায়, হোথা কেহ নাই, কেহই নাই!
ওইখানে ছিল তব্‌রেজ-দলে দুধে-ধোয়া এক চমরী-গাই!
দড়ি-দড়া-খুঁটি উপাড়ি' তুলিয়া চ'লে গেছে কোন্ ভোরের রাতে,
রুটি সেঁকিবার পাথরের টালি ফেলে গেছে শুধু তাঁবুর খাতে!

নীল শিরা যেন ডেরার নিশানা লেগে আছে ওষ্ঠ বালির গায়,
থমামের পাতা ঝ'রে গেছে সব, মুড়া তাল গাছ—হায় রে হায় !
ওগো সুন্দরী সোখাম্-কুমারী—নবারা ! আমার নয়ন-তারা !
কোন্ বালিয়াড়ী-গিরির আড়ালে সব জ্বির বাগে হইলে হারা ?
উটের দোলনে দুলে' দুলে' কেঁদে হুমড়িয়া ভেঙে বালির ঢেউ,
কোন্ দূর কালো রাত্রির দেশে চ'লে গেছ তুমি জানে না কেউ !
নিঝুম মরুর কোথা সাড়া নেই, শব্দ মিলায় পায়ের তলে—
তোমারি গোঙানি-ফোঁপানির তালে ঘুন্টি বাজে সে উটের গলে !
বুঝি বা সে-দিন আকাশের জিন্ তুলেছিল নীল তাঁবুর সারি,
পর্দ্দার ফাঁকে হাত-ছানি দেয় দশ আঙুলের ঝিলিক্ মারি' !
হঠাৎ তাদের তলা থেকে যেন আগুনের ধোঁয়া এগিয়ে আসে,
মাথার উপরে মেঘ-শকুনেরা ডানা মেলে যেন হাওয়ায় ভাসে !
মুখখানি গুঁজে' প'ড়েছিলে গিয়ে কোন্ সে কঠিন পাহাড়-পায়—
কত কি যে লেখা ভীষণ আঁখরে রাজাদের নাম তাহার গা'য় !
সেইখানে বুঝি ফুরিয়েছে সব শত্রুর হাত এড়া'তে গিয়ে—
চ'লে গেলে তুমি রাত্রির দেশে ঐ আকাশের কিনারা দিয়ে !

দূরে দেখা যায় ওই যে দেয়াল, মিনার উঠেছে কুয়াসা ফুঁড়ে'—
খাপ-খোলা যেন খাড়া তলোয়ার—আলোটী ঝলিছে তাহার চূড়ে !—
হিন্দার বেটা অমৃরু হোথায় পেতেছে শহর গোলামখানা,
ওইখান থেকে—বাচ্ছা বাঁদীর—আমাদের' পরে দেয় সে হানা !
মাটির বুরুজ, পাথরের টালি, দুয়ারে শিকল, লোহার বেড়া—
ফাটকে-আটক বাস করে হোথা হাজার হাজার মানুষ-ভেড়া।
ঘরে ঘরে করে দুষমনী ওরা, পিঠে মারে ছুরী পিছন থেকে,
বুকে বল্লম বেঁধেনি কখনো—লড়াই-এর কথা কাগজে লেখে !
কমজাত্ যত—রক্ত রেখেছে ঠাণ্ডা দেহের পিপের ভ'রে—
এক শরা তার করেনি খরচ, বুড়ো হ'য়ে যায় শুকিয়ে ম'রে !
রং-বেরঙের সাজ করে ওরা, শাদা চোখে হয় সুর্মা টানা,
মজ্‌লিসে ব'সে মিঠে মদ খায়, পিঠে ঠেস দিয়ে তাকিয়াখানা !
রেশম পশম মুক্তার মালা ঘরে ব'সে ওরা সওদা করে,
খুনের বদলে সোনার টাকায় ভোলায় ইমন্-সওদাগরে !
ভোর হ'তে সাঁঝ, সাঁঝ হ'তে-ভোর ভন্ ভন্ করে মাছির পারা !
দিল্-তোল্‌পাড় জান্-আন্‌চান্ খুনের সোয়াদ পায় নি তাঁরা !
বান্দামহলে সর্দ্দারী করে হিন্দার বেটা অমৃরু-রাজা—
আমাদের পায়ে জিঞ্জির দেবে !—শির-দাঁড়া দেখি বেজায় তাজা !

একবার পাই !—দাঁতে টুঁটি কেটে খান্‌খানা তার ফেলাই ফেড়ে,
হাড়-মাস করি পাখীর খোরাক, মুণ্ডুটা ফেলি বালিতে গেড়ে !

খুনে জ্ব'লে ওঠে বাজের আগুন, সাপটিয়া ধরি ঝড়ের ঝুঁটি,—
আস্‌মান-জোড়া পেয়ালায় মোরা রৌদ্র-শরাব দুপুরে লুটি।
বালির পাথার-কিনারায় ওঠে ঢেউ সে মোদের তাঁবুর সারি,
পলকে মিলায়, কোথা ভেসে যায়—দেখেছে এমন দুনিয়াদারী !
মাটির বাঁধনে বাঁধে না মোদের,পথহারা মরু-পান্থ মোরা—
বালির মালিক !—বুনিয়াদ কোথা ? কোনো খানে নেই স্মৃতির ডোরা।
ঘর-বাঁধা আর মন-বাঁধা আর জান্‌-বাঁধা-রাখা কাহারো কাছে !—
ধিক্ ধিক্ ওরে হিন্দার বেটা ! মোর হাতে তোর মৃত্যু আছে।
শম্‌শের ? সে ত' মেয়েদের হাতে পাক-দেওয়া ফিতা রেশ্‌মী দড়ি !
ঝক্‌ঝকে-মুখ বল্লম ? সে ত' ছেলেদের হাতে খেলার ছড়ি !
মরণের ভয় নেই আমাদের, মুর্দার তরে কে শোক করে ?
বড় ঘৃণা হয়—মরদ কেহই ম'রে উঠে' ল'ড়ে ফের না মরে।
'নুর' কাজ নেই, 'নার' চাই মোরা—জীবনের সার উত্তেজনা,
ফুঁসে-ওঠা শুধু জ্বল্‌-জ্বল্‌-চোখ—এক দম খাড়া সাপের ফণা।
একটী নিমেষে শেষ ক'রে দেওয়া, বোমার মতন কলিজা-ফাটা।
এক চীৎকারে দম ছুটে' যাক্ ! এক লাফে শেষ রাস্তা-হাঁটা !
চুপ ক'রে থাকা মাটি পানে চেয়ে, একঘেয়ে বাঁচা দিনের দিন—
'আয়লা'র মাঠে সোঁতার মতন শুষে' যায়, শেষে থাকে না চিন্।
বুজ্‌দেল্ যত কম্‌বক্তেরা !—চোরের মতন বাঁচিবি কি রে !
এই হাতে আয় গর্দ্দান নিই, এই ছোরা আয় বসাই শিরে !
বান্দার দল ! গর্ব্ব কিসের ? আমাদের চেয়ে তোরা না বড় !
বুকের রক্ত মাথায় ওঠে না, শিরাও ফোলে না—কাঁদনে দড় !
পাঁজরে বিঁধিলে বর্শার ফলা—ভেঙ্গে যায় যবে হাড়ের পাশে,
দাঁতে ঠোঁট চেপে রক্ত গড়ায়, তবুও মোদের কান্না আসে।
জোয়ান যে জন শত্রু জিনিয়া বেঁধে নাহি আনে দু'দশ বাঁদী,
রমণী তাহার ধিক্কার দেয়, তাঁবুর দরজা রাখে সে বাঁধি'।
হারিয়া যে জন পলাইয়া আসে লুঠের বর্ব্বরা ফেলিয়া দিয়া—
সন্তানে তার আছাড়িয়া মারে, স্তন মুখ হ'তে কাড়িয়া নিয়া !
চোখের ভিতরে কুটার মতন শত্রুর বিষ ঢুকেতে পোষে,
আপনার হাত ছুরিতে কাটিয়া খুন দেখে লয় অধীর রোষে।
রাত্রে যখন পুরুষেরা ফিরে' মদের পেয়ালা ভরিয়া তোলে,
বীরের জবান শুনিয়া তাদের মাতালের মত দেহটী দোলে।

দুনিয়ার সেরা আওরাত এরা—রূপসী মোদের, কন্যা, মাতা—
এদের কণ্ঠে শিকলি পরা'বে ? অমৃক, তোমার কয়টা মাথা ?

ওই দেখা যায়, চলিয়াছে কারা ওগারা-বনের পথটী ধ'রে,
উটের বহর দুলে' দুলে' চলে বালির উপরে ছায়াটী ক'রে,
নামাল জমির পাড় বেয়ে চলে, কখনো আড়াল, কখনো নীচু—
মালেক, কায়েস্ ওই যে হোথায়—আরও তিন জন নিয়েছে পিছু ।
এই ত' আগুন-খেলিবার বেলা, খুনের ওক্ত বাতাসে বাজে,
চরাচরময় তলোয়ার যেন আকাশে ঘুরায়ে কে ওই ভাঁজে !
খুনে-রোদ্দুর দু'চোখে আমার ঠিকরিয়া হানে আলোর ধাঁধাঁ,
ঠেলা দেয় বুকে আগল ভাঙ্গিতে, পাগল রক্ত মানে না বাধা ।
ঝিম্ ঝিম্ করে আকাশ-কিনারে অলখ্-সেতার আগুন-গানে—
মায়াবী-মরুর ইব্লিশ ওই আর না কাহারো শাসন মানে ।
দিকে দিকে নাচে তা-থেই তা-থেই,বালু-দেহ ধরি,'দু'বাহু তুলি,'
এক পায়ে শুধু আঙুলে দাঁড়া'য়ে শিস্ দেয় দেখ ডাহিনে দুলি' ।
তখনি আবার লুটাইয়া পড়ে, কিছু খন রহি' পারিল না যে ।
সারাটা আকাশ একখানা যেন ঝাঁঝরের মত ঝিমিকি বাজে !

'হুর্ হুর্-হু-উ—' ডাকে দূরে ওই সাথীরা আমায় বর্শা তুলি,'
রক্তে আমার তুফান তুলেছে, বক্ষ আমার উঠিছে ফুলি' !
আগুনের কণা দু'দিকে ছিটায়ে বাতাস ফুঁড়িয়া ছুটেছে ঘোড়া,
মাথার উপরে চাকা ঘুরে' যায়, বোঁও বোঁও করে কাণের গোড়া ।
ওরা আসে ওই !—ওই যে হোথায় দাঁড়াইল নামি' বালুর' পরে,
মেয়েরা র'য়েছে উটের উপরে পর্দায়-ঘেরা হাওদা-ঘরে ।
'হিরা'য় চলেছে ? নোমানের প্রজা ? গিয়েছিল কোথা বাঁদীর হাটে—
রূপ-জহরতে বোঝাই নিয়েছে, সোণা,বেশী আর নেই ক' গাঁটে ।
চট্পট্ সেরে নাও এই বেলা—আকাশে দেখি যে আঁধির ঘটা !
—হয়রান্ করে আরে বদ্জাত্ ! ছিঁড়ে ফেলে দিই মুণ্ড ক'টা !
কেয়াবাত্ ! আরে সাব্বাস্ ভাই !—লড়াই ? বাহবা ! এই ত' চাই !
খুন্-পিচ্‌কিরী চোখে মুখে দাও ! জান্ দাও, জান্ নাও রে ভাই !
ধাঁ-ধাঁ চারিদিক, ঝাঁ-ঝাঁ ঝিমি-ঝিমি আওয়াজ যেন সে আলোর বাজে,
চিঁহি-হিঁ হিঁ-হিঁ হিঁ—চীৎকার, আর হুঙ্কার ঘন তাহারি মাঝে !
আরে এই বার, বাস্ ! বল্লম ঢুকে গেছে কেটে মাথার খুলি—
কাঠের হাতল শিহরিয়া ওঠে, শিড়্ শিড়্ করে আঙুলগুলি !
ফাঁক হ'য়ে গেল মাথার খিলান্, চক্ষু-কোটর রক্তে ভরে,
মুঠা-মুঠা যেন নার্গিস্ ফুল ফুটি-ফুটি হ'য়ে দু'ধারে ঝরে !

পর্দ্দার ফ'াকে একখানা মুখ পলকে বাড়া'য়ে লুকা'ল ফের,
চোখে জল তার, হাসি মুখ তবু !—এমন তামাসা দেখেছি ঢের !
ছঁ াৎ ক'রে তবু খুনের আগুন নিবে' গেল যেন নিমেষ তরে,
চোখ-জ্বালা-করা লাল কুয়াসায় ফিকে জাফ্‌রান-রংটী ধরে !
বাহবা ! অম্‌নি মেরেছে পাঁজরে দুষমন্ ওই জোরসে ছুরী !
ভেঙ্গে গেল সে ত কাঁটার মতন, লাথি খেয়ে নিজে পড়িল ঘুরি' ।
ঝুঁটি ধ'রে তার মাথাটী নামা'য়ে লইল মালেক একটী ঘা'য়ে,
ধড়্‌ফড়্ করে ধড়টা শুধুই, ঠোকাঠুকি করে দুইটা পায়ে !

সব শেষ ! আর একটা মরদ খাড়া নেই, সব ভিমি গেছে ।
নাও দেখে নাও, জেবে ও থলিতে, ছালার ভিতরে কি সব আছে ।
মদের মোশক, চামড়ার শিশি, ডোর-কাটা ওই ঘাঘ্‌রিগুলা !—
ওরে আর নয় ! আঁধির পাহাড় দেখা যায়—ওই উড়েছে ধূলা !
সব পয়মাল—লোকসান ভাই ! দিন যে নিবায় দুপুর-রাতে—
লক্ষ ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে আসে কারা ওই চাবুক হাতে !
শুধু ওরি হাতে নিস্তার নেই, জিন্-সর্দ্দার পাগ্‌লা ও যে,
ওর সাড়া পেয়ে আস্‌মানে ওই দিনের মালিকও আড়াল খোঁজে !
থাক্ প'ড়ে থাক্ উটের বোঝাই, সারি সারি ওই গোলাব-দানি,
পেয়ালা ভরিতে ঘাঘ্‌রি ঘোরাতে বড় মজ্‌বুত—খুব সে জানি !
তবু ফেলে চল্—দেখ্ না দখিনে ডাকাতের দল গ'র্জ্জে আসে !
দাপটে তাদের আলোর ফোয়ারা কালো হ'য়ে যায় ধোঁয়ার রাশে !
ছেড়ে দাও ঘোড়া, রাশ ফেলে দাও, ছুটে যাক্ ওর যেথায় খুশী !
আরে বেল্লিক ! কি হবে এখন হাওয়ার উপরে বৃথার রুষি' ?
কথা না বলিতে ছুট্ দিল দেখ, জানোয়ার নয়—এরা যে পরী !
বাতাসেরও আগে আগাইয়া যায় বিপদের পানে পিছন করি' ।
গলাটী বাড়ানো, সিধা, একরোখা, রক্ত চক্ষু ঠেলিয়া ওঠে—
চার পায়ে বাজে একটী আওয়াজ, যেন সে মাটীতে ঠেকে না মোটে !
এইবার এল ! দমকি' দমকি' বালির ধাক্কা ধমক মারে !
একখানি কালো কাফনে ঢাকিল দুনিয়ার মুখ অন্ধকারে !
বাপ্ ! একি জ্বলে ! চোখে মুখে লাগে বালির কণা যে আগুন-দানা !
তারি মাঝে তবু ছোটে দিশাহারা, বাহাদুর দেখ মানে না মানা !
কোন্ পথে যায় কিছু বুঝি না যে, যায় শুধু এই সাড়াটী আছে !
আর সবাকার হাল কি যে হ'ল !—কত দূরে তারা রহিল পাছে !
আঁধির জোয়ার থেমে গিয়ে শেষে একাকার হ'ল রাত্রি দিবা—
আপশের কান্না ছাপায়ে এখন থির হ'য়ে দেখ রয়েছে কিবা !

থেমে যায় কেন হঠাৎ এখানে? দম হারাল কি—লুটাবে ভুঁয়ে?
ঘাড়-বুক এ যে ফেনায় ভ'রেছে! এখনি সটান্ পড়ে বা শুয়ে!
জিতা রও বেটা! মেরি জান্ ওহো! বুক রাখ্ তুই আমার বুকে,
আর কোথা নয়, এক পাও নয়! নহিলে আবার পড়িবি ধুঁকে'!
ঘোর কেটে যায়, আঁধিও ফুরায়, এইবার বুঝি ফর্সা হয়!
সর্-সর্ ক'রে পাতার উপরে বাতাস যেন না হোথায় বয়?
শুক্‌নো ডালের খড়্ খড়্ আর পাখীর পাখার শব্দ ও যে!
—ওরে শয়তান! সারা ময়দান ছুটেছিলি বটে ইহারি খোঁজে!
ওই দেখা যায় ওশারের সারি, খেজুরের বন ওই যে হোথা,
এ যে দেখি সেই ওগারা-বাগান—এমন ছায়াটী নেই যে কোথা!
কালো পশমের বোর্‌কা ছিঁড়িয়া দেখা দিল মোর সব্‌জা হুরী,
নাকে-মুখে মোর পিয়ালা পিয়ায়, পুরাণো সে গান হাওয়ায় পুরি'!
আয়, দুইজনে মুখ দেই জলে, পান করি ওই পিয়াস-পানি,
ঝর্ণা-ঝরা ও 'দারাত্-জুলে'র খুব চিনি নীল আয়নাখানি!
এইখানে এলে ঘুম্ ঘুম্ করে, দেহখানা যেন এলিয়ে যায়!
আগেকার কথা সব মনে পড়ে, কে যেন কোথায় লুকিয়ে চায়!
না না, মনে হয় এখনি ছুটিয়া ফের বুকে কা'রো বসাই ছুরি,
ছায়া-শরবৎ লাগে না যে মিঠা, গন্ধটুকুন্ গিয়েছে চুরি।
সেই মুখ, আর সেই চোক, আর চাউনি সে তার ভুল্‌ব না যে—
বাচ্ছার পানে হরিণীর মত ফিরে-ফিরে চাওয়া পথের মাঝে!
এই বনে ঠিক ওই খানটীতে জলের কিনারে প্রথম দেখা,
[illegible]াণ হ'য়ে কেড়ে নিয়ে শেষে কত দূর ছুটে গেছিনু একা!
বুক ছিঁড়ে ফের কেড়ে নিয়ে গেল দুষ্‌মন্—তা'র তালাস করি,
এই ছোরা তার ছাতিতে বসাব! শান্ দিই দশ বছর ধরি'!
বুড়া হই—তবু মরিবার আগে একবার যদি ভাগ্যে জুটে,
সারাটা জোয়ান-বয়স আমার ছুরীর মুঠাতে আসিবে ছুটে'!
অনেক দেখেছি, অনেক খেলেছি আওরাত্ নিয়ে দিলের খেলা—
বর্শার চেয়ে ভর্সা-হারাণো চোট্ পেয়েছিনু তাহারি বেলা!
তারি মুখখানি মনে ক'রে আমি গান বেঁধেছিনু দিওয়ানা হ'য়ে,
তেমন ব্যথা যে পাইনি কোথাও! ছুরি-ছোরা? সে-ত গেছেই স'য়ে!
বড় ঘুম পায়, সেই গান গেয়ে ঘুমাই খানিক ঠাণ্ডা ঘাসে,
'দারাত্-জুলে'র নামে গাঁথা সেই সুরটী পরাণ ছাইয়া আসে!

গান।

ঠোঁটের কুঁড়ি সিরিঙ্গা-ফুল, চোখের দু'কোণ রাঙা,
দড়ির মতন মিহিন্ মাজা, হাসি ডালিম-ভাঙা!

রংটী যে তার খেজুর-মেতি চাইতে চমৎকার,
তাঁবুর-ডেরায়-আগুন-দেওয়া রূপের জলুস্ তার।
চম্‌কে ফিরে চাইলে পরে
রাতের আলো দিনেই ঝরে!
মুখের হাওয়ায় সুবাস হারায় ইরাক্-দেশের গুল্!
চুমার সোয়াদ—হায় রে, সে যে তুহার জলের তুল!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত্ জুল্-জুল্!

উটপাখী তার ডিম-জোড়া কি লুকিয়েছে ওই বুকে?
নাচ্‌তে গেলে গলার মালা দুই দিকে যায় ঠুকে
কাঁধ বেয়ে সে খেজুর-কাঁদি—মেহেদী-রং চুল
কোমর-বাঁধন পেরিয়ে যে যায় পিয়াসে আকুল।
ধ'রলে কাঁকাল মুখ সে ফেরায়,
বাপের চেয়ে ভাইকে ডরায়,
কইতে কথা থম্‌কে থামে বোল্-বলা বুল্-বুল্,
গলার আওয়াজ ঠিক যেন সে তোমারি কুল্-কুল্!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত্-জুল্ জুল্!

গাল দু'খানি টুক্‌টুকে হয় যখন শরাব পিয়ে,
বড় নরম নজর যখন আধেক বুঁজে গিয়ে,—
খসুরু তখন খেয়াল হারায়, দব্ দবিয়ে রগ্
নেশার আগুন ভেক্‌কি লাগায়, দিল্ করে ডগ্-মগ্!
সবার মাঝে লাফিয়ে প'ড়ে
ছিনিয়ে নে' যাই ঘোড়ায় চ'ড়ে,
পিঠে যখন বর্শা হানে—বুকে জড়াই ফুল!
তুহার পানেও চাই নে ফিরে'—এম্‌নি সে হয় ভুল!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত্ জুল্ জুল্!

ঘুম ভেঙে যায়, ওকি ও হোথায়—আঁধারে কে দেয় মশাল জ্বালি'!
রূপালি জলের ঝাপ্‌টায় ধুয়ে সাজায় আকাশে তারার ডালি!
রাত হ'য়ে গেছে, হাওয়ারা আবার থেকে থেকে সব ঘুমিয়ে পড়ে,
ধূ ধূ চারিধার! শাদায়-কালোয় ঢেউ তুলে' যেন বাতাসে নড়ে!
কালি-ঝুল-ভরা খেজুরের ডাল, পিছনে সোনার মদের বাটী,
নীল শামিয়ানা উপরে দুলিছে, নীচে বালি-মোড়া দরাজ পাটী।
পরীস্তর রাণী ঘুম থেকে উঠে' খোলা পেশোয়াজ্ পরে না আর,
আস্‌মান্-গাঙে সিধা ঝাঁপ দেয়, দেখ মা কেমন হ'তেছে পার!

স্বপনের মত শরাবের নেশা বিলাইছে দেখ আলোর সাকী !
সারা দুনিয়াটা গুলজার করে, বুঁদ হ'য়ে যায় বনের পাখী ।
এত আলো, তবু চোখে বেশী লাগে ছায়াটী—কেমন প'ড়েছে ঘাসে !
এত ঘন আর এত কালো, সে যে দোসরের মত র'য়েছে পাশে !
দূরে মাঝে মাঝে ঢালু বালুচর চক্-চক্ করে জলের মত,
পিপাসায় ভুলে ঘুরে উড়ে যায় ডানা ঝেড়ে ওই পাখীরা কত !
এত রাতে আর কাজ নেই মিছে কত দূর সেই তাঁবুতে ফিরে,'
ঘোড়া হুঁশিয়ার, কাণ খাড়া রেখে চরিবে হেথায় আমারে ঘিরে' ।

রাতের চেরাগ্ নিবে গেলে হ'বে এই ময়দানে আরেক খেলা,
হুতাশী হাওয়ায় সওয়ার হ'য়ে ছুটিবে কাহারা নিশীথ বেলা ।
ম'রে গিয়ে তবু গোরের আঁধারে ঘুম নাহি যায়, বেড়ায় রুখে—
দীঘল বর্শা আকাশে হানিয়া রক্ত ছুটায় তারার মুখে !
হুস্ হাস্ ক'রে কালো কালো ছায়া পলক্ ফেলিতে নিরুদ্দেশ !
জীবনে যাহারা বাঁচিতে জানেনি, মরাও তাদের হয়নি শেষ ।
সাঁচ্চা জবান, জোয়ানের বাহু, বল্লম আর ঘোড়ার রাশ,
দুষমন্-লোহু, দোস্তি-শরাব আর খুলে-রাখা থলির ফাঁস,—
এই সব নিয়ে খোশ্নাম যার রটেনি কখনো আপন দলে,
বুজ্দেল আর কমজোরী হ'য়ে লুটিল না কিছু আকাশ-তলে,
হাল দেখ তার—হাওয়ায় ছায়ায় হায় হায় করে, ঘুম যে নাই !
মরদ না হ'য়ে মুর্দ্দা হ'য়ে সে সারা ময়দান ঘুরিবে তাই ।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ।
মোসলেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৮ ।

প্রত্যাবর্ত্তন

নবম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে অরুণের পরীক্ষার ফল বাহির হইল। কাগজে দেখা গেল, সে পনেরো টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। গ্রামের পাঠ এইখানে তাহার শেষ হইল। এইবার তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। পাশের খবর শুনিয়া হিমু প্রথমে খুব খুসী হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিল—তুলসী-তলার মাটী খুঁড়িয়া তিন-মাস-পূর্ব্বে-পোঁতা পয়সাটি উদ্ধার করিয়া বাতাসা আনাইয়া হরির লুট দিল, তারপর অরুণের বিদেশ-যাত্রার কথা শুনিয়া মুখ ভার করিয়া কথা বন্ধ করিল, আড়ি দিল, পরে "ভাব" স্মরণ করিয়া ভাব করিতেও বিলম্ব হইল না। অনুনয় করিয়া সে কহিল, "কি-ই হবে খালি খালি অত পড়ে! তুমি এই

থানে পাঠশালাটাও কিছু করো না বাবু। যেতে হবে না তোমায় কোথাও।"

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "পুরুষ মানুষ মূর্খ হয়ে থাকব ? লেখা-পড়া না শিখ্‌লে খাবই বা কি,—তাও ত চাই।"

হিমু এবার কল-ঝঙ্কারে কহিল, "বেশ ত বিদ্যে তোমার। লেখাপড়া শেখনি বই কি! অত ত গাদা গাদা শিখেচ। মুখ্যু হলেই হোল কি না! না বাবু, তোমাদের এ জঙ্গুলে দেশে আমি কক্ষনো একলা থাক্‌তে পার্‌ব না—তা তোমায় কিন্তু পষ্টই বলে দিচ্চি।"

অরুণ হাসিল, কোন উত্তর দিল না। হিমু যে এতদিন সহরের নিন্দা করিয়া এই "জঙ্গুলে" দেশেরই স্তুতি গাহিয়া আসিয়াছে! এখানকার মেয়েদের স্বাধীনতার অর্থাৎ যথেচ্ছাচার-ভ্রমণের সুযোগের সুখ্যাতি করিয়াছে! সে সব অতীত কথা স্মরণ করাইয়া অরুণ কিন্তু এতটুকু কলহের সৃষ্টি করিল না। অরুণের অভাব-বোধ বালিকাকে কতখানি অসহায় করিয়া তুলিতেছে, এইটুকু বুঝিয়াই সে তাহার বেদনার মধ্যেও একটু বিমল আনন্দ অনুভব করিল। তাহার জন্য ভাবিবার, তাহার অভাব অনুভব করিবারও তবে এ সংসারে কেহ কোথাও রহিল!

হিমুর স্পষ্ট কথা সত্ত্বেও অরুণকে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। তাহার পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইলে আলোক-নাথকে অব্যাহতি দিয়া সে তাঁহার সাহায্য-গ্রহণ ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে না বলিয়া জানাইয়াছিল। সর্ব্বস্ব যে ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহার আর এ মুষ্টি ভিক্ষার প্রয়োজন কি! বাহিরে রাজধানীর বক্ষে সে কাজ জুটাইয়া লইবে। যেমন করিয়া তাহার ন্যায় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারও সেইরূপ হইবে। কাজ কি আর পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা!

যাত্রা-কালে সে মুক্তাঠাকুরাণী ও মালতীকে প্রণাম করিলে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে পত্র দিতে অনুরোধ করিলেন। মালতী দেবী তাহাকে ছুটির সময় এখানে আসিবার কথা বলিলে, অরুণের দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল। মুখে সম্মতি জানাইতে না পারিয়া সে তাই মাথা হেলাইয়াই স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। হিমু তাহাকে মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "এসো অরুণদা। ছুটি হলেই কিন্তু এসো তুমি, একদিনও সেখানে দেরী করতে পাবে না, তা কিন্তু বলে দিচ্চি। পাশ হয়েছেন বলে বাবুর আর কথা শোনাই হোল না, বল্লুম, যেয়ো না—তা হোল না—!" অরুণ হিমুর মাতার উদ্দেশে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিল, "আস্‌ব বই কি হিমু। মাকে বলো,—তাঁদের কাছ ছেড়ে ছুটি কাটাবার জায়গাও ত আমার নেই আর কোথাও—।"

আজ প্রথম হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সে তাহার অন্তরের প্রবল দৈন্য বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে যে কত দীন—সে কথা জগতের কাছে প্রকাশ করিতেও সে অসমর্থ। মানুষের ক্ষত যেখানে গভীর, স্বভাবতঃই সে সেখানে সতর্ক। আপনার অজ্ঞাত জীবন-রহস্যের গভীর বেদনা তাই বুকের ক্ষতের মতই সে গোপনে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। সমবেদনার "আহা"টুকু

সহিবার শক্তিও যেন তাহার কুলাইত না। সেখানে হিমুরও প্রবেশাধিকার ছিল না। অরুণের বাহিরের সদানন্দ ভাব দেখিয়া সকলেই প্রতারিত হইয়া মনে করিত, বুঝি অতীত জীবনের ন্যায় তাহার চিন্তাকেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। হিমু তাহার অশ্রুবদ্ধ গাঢ়স্বরে ব্যথিত হইল। তাছাড়া নিজের চোখের জল সাম্‌লাইতেই সে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অরুণের কথার মর্ম্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাই সেবিষয়ে কোন তর্কও সে তুলিল না। দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া মালতী দেবীও বারবার আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, যদি উপায় থাকিত! হা ভগবান, এমন জিনিষ, এমন লোভের ধন হাতে পাইয়াও হারাইতে হয়! সমাজ ত ইন্দ্রনাথের দেওয়া ব্রাহ্মণের অধিকার তাহার কাড়িয়া লয় নাই। শুধু গোত্র পদবীর দাবী? সংসারে সেই কি সব! একমাত্র মেয়ের মুখ চাহিয়া এই গোত্রের দাবী তিনিও কি ছাড়িতে পারিবেন না? মালতী দেবীর মাতৃ-স্নেহ কহিল, এখনি তিনি তাহা ছাড়িতে পারেন। কিন্তু হিন্দু কন্যার সংস্কার কহিল, সে হয় না! তা যদি সম্ভব হইত তবে অরুণ কেন—যে কোন জাতি হইতেই উপযুক্ত পাত্র বাছিয়া লইলে হয়ত অর্থাভাবে তাঁহার সুন্দরী মেয়ের বিবাহের ভাবনা ভাবিতে হইত না। সমাজের বিরুদ্ধে একটু যুদ্ধ-ঘোষণার শক্তি তাঁহার ন্যায় অনাথার কি সম্ভব? না, তাই উচিত? অপ্রাপ্য ভাল জিনিষটিতে লোভ করিতে গেলে চলিবে কেন?

দশম পরিচ্ছেদ

জনারণ্য মহানগরীর মাঝখানে পড়িয়া অরুণ প্রথমটা যেন দিশাহারা হইল। এত বড় সহর, এত গাড়ী-ঘোড়া, মোটর-ট্রাম—এ-সব তাহার কল্পনারও অতীত, অভাবনীয় ব্যাপার! এই অট্টালিকা-সমুদ্রের মধ্যে বাসস্থান খুঁজিয়া লওয়া তাহার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে কেমন করিয়া যে সম্ভব হইতে পারে, সে যেন তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না। তাহার স্কুলের সহপাঠী ইন্দুভূষণের সাহায্যেই সে এখানে অভিজ্ঞতা-লাভের ভরসা রাখিয়াছিল। কার্য্যকালে দেখা গেল, ব্যাপারটা যত কঠিন মনে হইয়াছিল—আসলে সেরূপ নয়। বরং পল্লীগ্রাম অপেক্ষা এ সকল বিষয়ে এখানে সুবিধাই বেশী। কেবল প্রকাণ্ড অসুবিধা একটা ছিল, সেটা পয়সার। এখানে সুবিধায় সবই মেলে তবে বড় বেশী মূল্য দিতে হয়! ভরসার মধ্যে ত তাহার জলপানির পনেরোটি মাত্র টাকা! ইহার উপর নির্ভর করিয়াই সে এই ব্যয়-বহুল উচ্চ শিক্ষালাভের আশায় দেশ ছাড়িয়া অজানিত স্থলে আসিয়াছে। লোকে হয়ত তাহার এই দেশ ছাড়ার কথা শুনিলে হাসিবে! কিন্তু যে দেশে হিমু বাস করে,—যেখানকার পথের ধূলা ইন্দ্রনাথের পদ-স্পর্শে পবিত্র হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রতি ভালবাসা যে অরুণের প্রতি শোণিত-বিন্দুর সহিত মিশাইয়া রহিয়াছে! তিনি যদি তাহার জননী জন্মভূমি নাও হন, তবু যে অরুণের জীবন-মরুর শান্তি-নিকেতন,—তাহার প্রার্থনার

কাম্য ভূমি,—সে কথা ত সে অস্বীকার করিতে পারিবে না। উৎসাহহীন ভবিষ্যতের পানে চাহিয়াও তাই সে আনন্দোজ্জ্বল অতীতকেই স্মরণ করিতে থাকে।

ব্যাপার সেই চির-পুরাতন। উচ্চ শিক্ষার আশায় পূর্ব্ববর্ত্তী দরিদ্র সন্তানেরাও সকল দুঃখ সহিয়া যে ভাবে দিন কাটাইয়া গিয়াছে, অরুণের জন্য ভাগ্য তাহার কিছু ব্যতিক্রম করে নাই। তবু ইহাতেও বুঝি বিশেষত্ব বা নূতনত্ব কিছু ছিল। যাহারা জীবন-যুদ্ধে জয়-লাভের আশায় বিদেশে আসিয়াছে, তাহারা দেশ, আত্মীয়-স্বজন, গৃহ, ভূমি কিছু না কিছু ফেলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অরুণের পিছনে তাকাইবারও কিছু নাই!

কলিকাতার একটি ছাত্রাবাসের অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের একতলার একখানি ঘরে সে তাহার নূতন জীবন প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাতে বৈচিত্র্য ছিল না, আনন্দ ছিল না। তবু সে তাহার ধ্রুব লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য পূরা মাত্রায় পালন করিতে প্রস্তুত হইল। সময় সময় মনে হইত, পরীক্ষা-সাগর পার হইয়া সে তাহার জীবন-তরণীখানি কোন অনির্দ্দেশ উপকূলে ভিড়াইবে। আবার ভাবিতে বসিলে ভাবনার কূলও পাওয়া যাইত না। তাই এ অনির্দ্দেশের ভাবনাকে সে বিভিন্ন চিন্তায় ডুবাইয়া রাখিত। ঘরখানি একতলায়—বায়ু ও আলোর অভাব সেখানে অনুমিত হইত প্রচুর। স্যাঁৎ-সেঁতে মেঝে। তবু ইহার ভাড়া কম। একটি মাত্র "সিট্" বলিয়া নির্জ্জনতাপ্রিয় অরুণ এই ঘরখানিই পছন্দ করিয়াছিল। পুরাতন তক্তাপোষের উপর সে তাহার কম্বল ও চাদরখানি বিছাইয়া পরিচ্ছন্ন শয্যাটি বিছাইয়া অনেক সময় তাহার উপর চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, আর বর্ত্তমানের ভাবনা ভাবিত।

আজও সে সেই কথাই ভাবিতেছিল। ঘরের ভাড়া, খাবার খরচ, কলেজের বেতন জমা দিয়া কেমন করিয়া যে সে তাহার প্রয়োজনীয় বইগুলির জোগাড় করিবে, তাহাই সে ভাবিতেছিল! আসিবার সময় মুক্তাঠাকুরাণী তাহাকে বই কিনিবার জন্য কুড়িটি টাকা দিয়াছিলেন। তাহাতে কতটুকু অভাবই বা মিটিবে? তবু স্নেহময়ীর স্নেহের দানটি সে নিতান্ত অনিচ্ছায় কুণ্ঠিত হস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সত্যই সে তাহার বড় অভাব! আর এও যে তাহার প্রতি অযাচিত করুণা, ইহার কোনটাই ত এমন অবস্থায় তাহার ত্যাজ্য নহে!

তখন ভরসার মধ্যে ইন্দ্রনাথের দেওয়া তাহার পৈতার সময়ের মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী আর তাহার জন্ম রহস্যের শেষ নিদর্শন একখানি স্বর্ণ পদক। এ ছাড়া নিজের বলিতে এমন কিছুই ছিল না, যাহা বিক্রয় করিয়া উপস্থিত অভাবের কথঞ্চিৎ দায়ও সে মিটাইতে পারে! হীরকাঙ্গুরীর মূল্য সে জানে না, হয়ত বেচিতে গিয়া ঠকিয়া আসিবে। অথবা চোরাই মাল বলিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িবে—দুইটাই ঘটা সম্ভব! এখানকার অবস্থা-ব্যবস্থা কিছুই ত তাহার জানা নাই। অরুণ দেখিয়াছে, প্রাইভেট টিউসনী করিয়া অনেক ছেলেই নিজের বাসা-খরচ চালাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার জন্যও সুপারিশ চাই। কে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া গৃহ-শিক্ষকের পদ দিবে! তাহার পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু

কেহই নাই। ইন্দুভূষণ নিজেই একজন উমেদার,—তাহার নিকট সাহায্য পাইবারই বা আশা কোথায়? তাই কেমন করিয়া সে তাহার দারুণ অভাবের বোঝা সে কোথায় নামাইবে বিষণ্ণ চিত্তে তাহাই ভাবিতেছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পল্লী-সমাজ সংস্কার *

রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না রেখে পল্লী-সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া এখন সঙ্গত, আমি এমন কথা বলেছিলুম, বলে' কোনো কোনো বন্ধু কৈফিয়ত তলব করেছেন। এই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

যেখানে আমাদের জীবনী-শক্তির মূল একেবারে অসাড় হ'য়ে আছে, সেখানে শক্তি সঞ্চার করতে হবে। এই হ'ল সকল চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের লোকের চিত্ত উদ্বুদ্ধ করা চাই; তা' না হ'লে শক্তির সঞ্চার হবে কেমন ক'রে? পল্লী-সমাজ যাদের নিয়ে গড়তে হবে তাদের চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলাই হচ্চে প্রধান কাজ; পল্লীকে সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে শ্রীমণ্ডিত যদি করতে চাই তবে এই কাজে মন দিতে হবে।

এ-কাজটা হচ্চে সৃজনের কাজ। সৃষ্টি হচ্চে Positive অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশ এর ধর্ম্ম। এইজন্য সৃষ্টির কাজে সব জিনিষকে গ্রহণ করতে হয়।

কোনো প্রকার উত্তেজনা যদি মনকে অধিকার করে' বসে তবে সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটেই; কেন না মানুষের চিত্ত তখন জীবনের গভীর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাইরের কোনো আশ্রয়কে অবলম্বন করতে চায়। এমন অবস্থায় কোনো সমস্যাই তলিয়ে দেখবার অন্তর্দৃষ্টি আর থাকে না। ভাসা-ভাসা যা' কিছু দেখ্‌তে পায়, তারই উপর তখন নির্ভর; আশু ফল পাবার লোভে পথ ও পাথেয় খোঁজা তখন তার সব চেয়ে জরুরী কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে। সে কল্পনা করে যে যদি কোনো বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, যদি বাইরের কোনো ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তা হলেই সমস্ত জাতির কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু কল্যাণ ত বাইরের জিনিষ নয়। অতএব কেবলমাত্র বাইরের আয়োজনে কল্যাণ নাই। চাই অন্তর্দৃষ্টি; চাই জাতীয়-জীবনে প্রবুদ্ধ চৈতন্য। আজ আমাদের এমন দুর্দ্দশা কেন,—তার প্রধান কারণ ইংরেজের শাসন ও বিদেশীয় বণিকদের অর্থ-শোষণ নয়। আমরা সত্যকে হারিয়ে সমস্ত জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছি—আর যে-দিন থেকে এ জাতি লক্ষ্যহারা হ'ল তখনই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, কাজের দোহাই দিয়ে অপকাজ, সমস্ত সমাজের

* [২৭শে আগষ্ট, রবিবার কর্ম্মি-সঙ্ঘের বৈঠকে পঠিত]

স্তরে স্তরে এত আবর্জ্জনা স্তূপাকার করে' জমিয়ে গেল যে জাতীয় জীবন আজ তার পথ খুঁজে পাচ্চে না। আমাদের মন সংকীর্ণ, বুদ্ধি অসাড় ও শক্তি ক্ষীণ হয়ে উঠেছে কেন আপনারা এ-বিষয়ে চিন্তা করুন। আজ আমরা শক্তির উৎস খুঁজ্‌তে গিয়ে হাতড়ে মর্‌ছি; আজ আমরা কাঙ্গাল,—পৃথিবীর অস্পৃশ্য জাতি! এ-দৈন্য-দশা ঘট্‌ল কেন? আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরটা দুর্ব্বল, নির্জীব ও আত্ম-অবিশ্বাসী হয়ে আছে ব'লে নয় কি?

বাইরের দৈন্য আমাদের অন্তরের দৈন্যকেই প্রকাশ করে। যে পরিমাণে আমরা অন্তরের দারিদ্র্য ঘুচাতে পারব সেই পরিমাণেই আমাদের অভীষ্ট পথ মুক্ত হবে। যাকে আমরা সভ্যতা বলি তা' কোনো জাতির বিশেষ প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র—অতএব সেই প্রকাশ যদি কুশ্রী হয় তবে এ-কথা মান্‌তেই হবে যে, জাতীয়-জীবনের অন্দর-মহলে কোথাও নিশ্চয়ই শ্রী-হীন ব্যবস্থা রয়ে গেছে। শুনেছি জাপানীদের ঘর-দুয়ার খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; গ্রামগুলি দেখ্‌তে সুন্দর। আর রাস্তা-ঘাট ঘর-বাড়ীর পারিপাট্য আছে। এর কারণ সুধু এই নয় যে, জাপানীদের ঘরে টাকাকড়ি আছে; জাপানীরা স্বভাবতই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাদের জীবনের অন্দর মহলে সৌন্দর্য্যের ভাব বর্ত্তমান আছে বলেই এদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রায় ব্যবস্থায় পারিপাট্যের ত্রুটী নেই। জর্ম্মানির জাতীয় জীবন সাধনা করেছিল militarism—তাই তার সকল ব্যবস্থা এরই শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

আজ আমরা স্বরাজ চাই। কার কাছ থেকে চাই? দেবার মালিক কে? যদি বলি স্বরাজ বাইরের একটা দান-সামগ্রী, আমরা সেই দান পাবার জন্যে হাত পেতেছি, তা'হলে আমার মতে সে স্বরাজে কোনো প্রয়োজন নেই। স্বরাজ কেউ দিতেও পারে না, নিতেও পারে না। আমরা জাতীয়-জীবনে যে-সাধনা করব, জীর্ণ-ভিতের উপর যে-আদর্শে পাকা গাঁথনি তুল্‌ব, তাই হবে আমাদের স্বরাজ।

আমাদের নিজেদের হাতে গড়ে তুলতে হবে বলেই পল্লী-সংস্কারের কাজকে আমি সৃজনের কাজ বলে মনে করি। কোন্ আদর্শে গড়ব, তার উপলব্ধি হবে অন্তরে ও সেই উপলব্ধি রূপ ধরে বিকশিত হয়ে উঠবে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে।

অতএব আমাদের চিন্তা ও ভাব কোনো উত্তেজনার দুরন্ত ঝঞ্ঝাবাতে যদি তার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। এই জন্যই আমি বলেছিলাম যাঁরা পাকা ভিত্তি গাঁথ্‌বার কাজে মন দিতে চান্, যাঁদের কাজ কিছু গড়ে-তোলা, রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ না রাখাই কল্যাণকর। আয়র্ল্যাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে কবি এই বলেছেন:—

"Our excited controversies, our playing at militarism, have tended to bring men's thoughts from central depths to surfaces. Life is drawn to its frontiers away from its spiritual base, and behind the surface we have little to fall back on."

ভাবার্থ :—"রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে তর্কবিতর্কের উত্তেজনা, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে লড়বার এই আস্ফালন, এতে মানুষের চিত্তকে গভীর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাইরের দিকে নিয়ে আসে। জীবন আধ্যাত্মিক মূল থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লে বাইরের আশ্রয়ের উপর নির্ভর করা চলে না।"

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে :—রাজনৈতিক অন্দোলনের গতি এমন আকার ধারণ করে যে, তাতে কেবলই উত্তাপের সৃষ্টি হতে থাকে। কাগজে-কলমে বিধিব্যবস্থায় যাই জাহির করি না কেন, দাবী-দাওয়া নিয়ে ক্রোধের উৎপত্তি হবেই। একবার ক্রোধের উত্তেজনা আমাদের মনকে অধিকার করলে আমরা একেবারে দৃষ্টিহারা হয়ে পড়ব। তখন জাতীয় জীবনের সমস্যার সত্যমূর্ত্তি চোখের আড়ালে পড়ে যাবে; মনে হবে কোনো উপায়ে ক্ষুধিত, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, শক্তিহীন, অশিক্ষিত দেশ-বাসীর ঘাড়ের উপর পড়ে' তাদের জাগাবার চেষ্টা করাই সব চেয়ে বড় কাজ।

কিন্তু মুক্তির সাধনা এমন করে' হয় না। সৃষ্টির কাজে ত মেকী মাল চলে না, সে মালের আধিভৌতিক গুণ থাকলেও না। আমরা পল্লী-সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে কি দেখ্‌ছি? দেখ্‌ছি নানা রোগে পল্লীর পনর আনাই রুগ্ন; তাই সংক্রামক ব্যাধি একবার লাগ্‌লে আর রক্ষা নাই। কত ভিটে উচ্ছন্ন গেছে ও যাচ্চে। বন-জঙ্গল, পানাপুকুরে গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট করচে, কিন্তু সে কথা জেনেও কোনো প্রতীকার করা যাচ্চে না। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কৃষকেরা ধান চাল কলাই যা' জন্মায় সহরের ব্যাপারী ও গ্রামের মহাজনের হাতে তা' তুলে দিতে হয় দেনার দায়ে। তারপর ঐ ধানচালই কৃষককে মাড়োয়ারীর গোলা থেকে বেশী দাম দিয়ে কিনে খেতে হয়! এ-ছাড়া আরো কত উৎপাত উপদ্রব আছে তার সীমা নেই। পুরোহিত থেকে পুলিস সকলেই পল্লীবাসীর শত্রু, এ-কথা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন?

তাই আমাদের প্রথম কাজ, আত্মস্থ হয়ে এই দুরূহ সমস্যার সত্য-মীমাংসার পথ আবিষ্কার করা। দেশের পনর আনা লোক যারা পল্লী-সমাজে বাস করে, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, আর যে-অনুপ্রেরণা নিয়ে জাতীয়-জীবনের উদ্বোধন করা চাই, তাদের চিত্তে সে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। এই হ'ল ভিত্তি। এখানে দৃষ্টি না দিলে পথ খুঁজতে খুঁজতেই আমরা পৃথিবী থেকে লোপ পাব। ক্রোধাবিষ্ট হ'লে আমরা সত্যদৃষ্টি হারাব এইজন্যই আমি মনে করি, পল্লী-সংস্কারের কাজে যাঁরা ব্রতী হবেন তাঁদের পলিটিক্যাল্ রেষারেষির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা শ্রেয়।

তৃতীয় কারণ :—রাজ-শক্তির সহিত সংঘর্ষণে একদিকে কাজ ব্যর্থ হয়, আর এক-দিকে অশিক্ষিত জন-সাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। সেবারে লর্ড কার্জ্জনের শাসনের ধাক্কা খেয়ে যখন আমাদের মন একটু সতেজ হয়ে উঠেছিল, তখনও আমরা গ্রামের দিকে ছুটেছিলুম। জীর্ণ পল্লীগুল'কে নতুন করে' গড়ব এ উদ্দেশ্যটা খুব স্পষ্ট ছিল না—ছিল দেশের কথা সকলকে জানাব এই সংকল্প। রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তর্গত নানা সভা-

সমিতির তক্‌মা পরে' আমরা এ-কাজে নেমেছিলুম। তার পর সিয়াইডির উপদ্রব সুরু হ'ল; যাঁরা নেতা হ'য়ে দেশকে উত্তেজিত করলেন তাঁরা ত মিণ্টো-মর্লি-রিফর্ম পেয়ে খুসি, আর সমস্ত দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত বয়ে গেল তরুণ বাঙ্গালীর উপর দিয়ে। যাঁরা তখন প্রাণ বিসর্জ্জন করলেন বা নির্ব্বাসিত হলেন, তাঁদের সেই দৃষ্টান্তে-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নির্জীব প্রাণে কিছু জীবনী-শক্তির সঞ্চার হ'ল বটে, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা হ'তে বঞ্চিত দেশবাসী মনে করল, রাজার সঙ্গে লড়তে গিয়ে "ছেলে বাবুরা" হার মেনেছে। অতএব পুলিসের দারোগাবাবুকে সে আরো ভয় ক'রে চলে; তার পর "ছেলে-বাবু"দের পরিচালিত জাতীয়-বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হ'তে বিলম্ব হ'ল না।

তাই আমার মনে হয়, এবার পল্লী-সংস্কারের কাজে যাঁরা হাতে দিয়েছেন তাঁরা কোনো পলিটিক্যাল্ সভা-সমিতির তক্‌মা বুকে না পরে' খাঁটি জিনিস গড়ে তুল্‌বার দিকে মন দিন্। চরকা-প্রচলন করতে গিয়ে দেখেছি অনেকে চরকা ঘরে তুল্‌তে ভয় পায়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, "চরকা হচ্চে স্বরাজের প্রতিমূর্ত্তি।" আমি চরকার সঙ্গে অসহযোগিতা বা জালানওলাবাগের দুর্ঘটনা বা খিলাফত এমন কি স্বরাজেরও নাম জড়াতে চাইনে। যথেষ্ট সূতা দেশে তৈরি হয় না অথচ এই গরীব দেশে অধিকাংশ গৃহস্থ যদি সূতা কাটে তবে অনেক সূতা পাওয়া যাবে। বড় বড় মিল চালাবার টাকা হয় ত আমাদের নেই; তা' ছাড়া যদি উচ্চ শিল্প (cottage industry) স্থাপন করে' আমাদের প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারি তাহ'লে যথার্থ কল্যাণ হয়। চরকার সূতা দিয়ে বোনা কাপড় একটু মোটা হবে—তা হোক্, দেশের লোকের পক্ষে তাতে ক্ষতি নেই। তাই আমরা প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে চরকা চালাবার ব্যবস্থা করে' দেব; তাঁতিদের ডেকে তাঁত বসাব; বাইরে থেকে যা'তে কাপড় কিন্‌তে না হয় এমন আয়োজন করব। তারপর, তুলার চাষ হ'তে পারে এমন জমি নির্ব্বাচন করে' ভাল বীজ আনিয়ে দেখ্‌। প্রত্যেক পল্লী খাওয়া-পরার জন্য সম্পূর্ণভাবে আর কারো উপর নির্ভর করবে না এই আদর্শ মনে রেখে আমরা পল্লীর আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করব।

চতুর্থ কারণ ঃ—যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক তাঁরা পল্লী-সংস্কারের কাজে কোনো পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পারেননি। ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে ছেলের দল বেরিয়ে এসে যখন কাজ চাইল, কর্ত্তা বল্‌লেন "village organisation" করতে হবে। উত্তম প্রস্তাব,—ছেলের দল রাজি হ'ল। তারপর কংগ্রেস-কমিটি থেকে পল্লী-সংস্কার করবার যে কার্য্য-সূচী পাওয়া গেল, তা'তে চরকা চালাও, কংগ্রেসের সভ্য-তালিকা ভুক্ত কর, তিলক-স্বরাজ্য ফণ্ডে টাকা আন ইত্যাদি আদেশ (mandate) ছিল। যে-আদর্শে গ্রামগুল'কে গড়ে তুল্‌তে হবে সে-সম্বন্ধে কারো মুখে কিছু শোনা গেল না। শোনা যাবেই বা কি করে? যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনের রথী, তাঁরা অনেকেই সহরের হাওয়ায় মানুষ। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে দেশের যে-টুকু স্থান ছিল তা' হচ্চে ইংরেজী পুঁথিতে আর প্রফেসারের দেওয়া নোটে।

গ্রামবাসিদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই, তাই তাঁরা পল্লী-সমস্যারও কোনো মীমাংসা দিতে পারেন না।

তাই বল্‌ছিলুম যাঁরা এ-কাজে নেমেছেন তাঁদের প্রথম কাজ, নিজেদের প্রস্তুত করা, আর দ্বিতীয় কাজ সমস্যার সত্য-মীমাংসার পথ আবিষ্কার করা। সেইজন্য চাই বুদ্ধির উদ্বোধন। বাঁধি-বুলি কপ্‌চিয়ে হৈ-চৈ ক'রে স্বদেশ-প্রীতির আতিশয্যে আমাদের শক্তি অপব্যয় করলে দেশকে গড়ে-তোলা দূরে থাক্, আমরা অনিষ্ট করব। এই অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালী-যুবকেরা উত্তেজনার তাপে অথবা উচ্ছ্বাসের আবেগে এমন সব কাজ করেছেন, যা' থেকে জাতীয়-জীবনের ভাণ্ডে কিছু সঞ্চয় ত হয়নিই, বরং বর্ত্তমান আন্দোলনকে ছোট করা হয়েছে। ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দেশের কাজ করতে উপদেশ দিলেন গান্ধীজি। দলকে দল ছেলে বেরিয়ে এল—কিছুদিন তারা ফন্দবস্ ম্যান্‌সনে ভীড় করল। তারপর মিটিংএ স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করা ছাড়া আর তাদের অন্য কাজ ছিল না। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে চাষাভুষোদের সকল অবস্থা তদন্ত করবার প্রস্তাব নিয়ে আমি অনেকের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম; তাঁরা প্রস্তাবটাতে আশু ফলের সম্ভাবনা না দেখে সে-কথা কানে তুললেন না। কিন্তু এঁদের মধ্যেই একদল ছাত্র দ্বারভাঙা বিল্ডিংএর সাম্‌নে শুয়ে পড়ে পরীক্ষার্থিদের যাবার পথ রোধ করে' মনে করলেন দেশের একটা কাজ হ'ল। তারপর বাঙ্গলা খবরের কাগজে যখন এঁদের প্রশংসা ছাপান হ'ল, তখন এঁদের উৎসাহ একেবারে ছাপিয়ে উঠল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে দাস-মনোবৃত্তি (slave mentality জন্মায়, ছাত্রদের মুখে এই বুলি শোনা গেল।

আসল কথা বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ বলেই তাকে এমন কোনো স্রোতে ভাসিয়ে দিলে চলবে না যার টান সে সাম্‌লাতে পারে না। একটুখানি রসের আমেজ পেলেই হ'ল—সে তখন প্রশ্ন করে না, নির্ব্বিবাদে সব মেনে নিতে চায়। মেনে-নেওয়ার প্রবৃত্তির প্রাধান্য আছে ব'লে তার বুদ্ধি-বিচারের দিকটা পরিণতি লাভ করতে পারেনি। এই চালাতে পারবার শক্তি লাভ করতে পারব এমন সাধনায় আমাদের প্রবৃত্ত হ'তে হবে।

আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা থেকে দূরে থেকে পল্লীসংস্কারের কাজে মন দেবার পক্ষপাতী বলে' আপনারা মনে করবেন না, আমার মন এই আন্দোলনে সায় দিচ্চে না। আজ সমস্ত দেশ-জোড়া এই জাগরণ কার মনকে না উদ্বুদ্ধ করেছে? কিন্তু একে ব্যর্থ না করি শক্তির অপচয় ঘটিয়ে। স্বাধীনতার জন্য মানুষের যখন আকাঙ্ক্ষা জাগে, যখন অন্তর-দেবতা ডাক দিয়ে বলেন "আমি মুক্ত; যতক্ষণ তুমি মুক্ত না হও ততক্ষণ আমার মুক্তি নেই," তখন মানুষের জীবনে যে পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ঘটায়, আজ তার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে' মনকে আশান্বিত করেছে। যাকে বলে Material movement, অর্থাৎ জাতীয়-জীবনের প্রকাশকে বাধামুক্ত করবার জন্য যে গতি, তার একটা নিজস্ব ধারা আছে। বাঙ্গলা-দেশে সাহিত্যের রসাল কুঞ্জে তার প্রথম প্রকাশ—সেই আনন্দমঠের গানে "বন্দে মাতরং;" তারপর নানা পথ দিয়ে নানাভাবে এই মন্ত্রটি কাজ করেছে, আমাদের চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে।

আমাদের অলক্ষ্যে অগোচরে ঐ গানেরই সুর বেজেছে, তারপর যে-দিন ঘোরতর অপমানের ব্যথা বুকে বাজ্‌ল, তখন আমাদের কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ পেল সেই শক্তি যা' এতদিন গোপনে কাজ করছিল। আজ আবার এক সুযোগ এসেছে—এবার দেশের জন-সাধারণের হৃদয়ে সাড়া পাওয়া গেছে; অতএব এবার আমাদের সংযত হ'য়ে, বুদ্ধি ও মনকে জাগ্রত রেখে কর্ম্মে ব্রতী হ'তে হবে। বাইরের উত্তেজনা আমাদের চিত্তকে স্থির হ'তে দেয় না;—যথার্থ অনুপ্রেরণার পথে বাধা ঘটায়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্গ-রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা *

অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদেষু

হে কবীন্দ্র! সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে বিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন করিয়া, আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—স্বদেশী সাহিত্যের সর্ব্বায়তন এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে আজ অভিনন্দন করিতেছে।

পরিষৎ নানা প্রকারে আপনার নিকট ঋণী। পরিষদের শৈশবে আপনি অজস্র স্নেহদানে ইহাকে পোষণ করিয়াছিলেন—পরিষদের কৈশোরে আপনি সহায় হইয়া, ইহার শ্রী ও সম্পদ্ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন—আজ পরিষদের যৌবনে আপনি ইহার অকৃত্রিম 'সুহৃৎ সখা'। যখনই অমিত্র-নীরদের ঘন-ঘটায় পরিষদের পক্ষে 'পন্থ বিজন অতিঘোর' হইয়াছে, তখনই শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া, আপনি ইহাকে ঋতমার্গে পরিচালন করিয়াছেন। সেই জন্য আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে বঙ্গের সাহিত্যিকগণের মুখস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দন করিয়া বিশ্ব-পিতার নিকট আপনার শতায়ুঃ কামনা করিয়াছিল।

যাঁহার অর্চ্চনার জন্য সাহিত্যের এই পুণ্য-পীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হে বরেণ্য! আপনি সেই বাণীর বরপুত্র। যুগ-যুগান্তের সাধনার ফলে দেবী সারদা আপনার চিত্ত-সরোজে তাঁহার রক্তচরণ চিহ্নিত করিয়াছেন। সেই জন্য সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই আপনি বিজয়ী; সেই জন্য আপনি সাহিত্যের যে বিভাগ যখন স্পর্শ করিয়াছেন, স্পর্শমণির করস্পর্শে সেই বিভাগই স্বর্ণময় হইয়াছে। বীণাপাণির সপ্তস্বরার শততন্ত্রীতে যে বিশ্ব-

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৯ ভাদ্র ১৩২৮।

সংগীত নিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে, হে মহাকবি! আপনার হৃদয়-বীণায় তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

মানব অমৃতের পুত্র—অতএব কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সে চিরদিন অমৃতত্বের প্রয়াসী। প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ তপোবনে যে অমৃতের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, সেই পুণ্যপীযুষ পান ভিন্ন কোন মতে তাহার অদম্য ব্রহ্মতৃষার নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া জীবনের ছায়াময় অপরাহ্নে মহর্ষি-সন্তান আপনি কুলোচিত ব্রত গ্রহণ করিয়া, জগৎকে সেই অমৃতবারি মুক্তহস্তে পরিবেষণ করিতেছেন।

বিদ্যাপক্ষিণীর দুই পক্ষ—দর্শন ও বিজ্ঞান। এই পক্ষদ্বয়ে নির্ভর করিয়া, সে প্রজ্ঞানের পর-ব্যোমে নির্ভয়ে বিহরণ করে। পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান আহরণ করুক, পূর্ব্ব পশ্চিমকে দর্শন বিতরণ করুক। এই আদান প্রদানের পূর্ণতায় যে বিদ্যার প্রপূর্ত্তি হইবে, সেই বিদ্যার দ্বারাই "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" সেই জন্য আপনি "বিশ্ব-ভারতীর" প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচ্য প্রতীচ্যকে রাখিবন্ধনে সংযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

হে রবীন্দ্র! আপনি সাহিত্যাকাশের দীপ্ত ভাস্কর—জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। যিনি 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ,' পরম জ্যোতিঃ যাঁহার উর্জ্জিত বিভূতি আপনাতে দেদীপ্যমান—সেই সত্য শিব সুন্দর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। ওঁ।

গুণমুগ্ধ
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রবি-প্রশস্তি

রঞ্জিত করি পশ্চিমতট দীপ্ত প্রতিভাজালে
সূর্য্য আজিকে উদিল পূর্ব্ব উদয়গিরির ভালে;
পুণ্য পরশ লভি' আজি তার জাগ্ ও-রে
তোরা জাগ্—
বিশ্ব-সবিতা সেই রবি-করে দে রে দে যজ্ঞভাগ!
সহস্রদল বাণীর কমল মুদিত মানস-সরে
দিক্‌দিগন্ত মুগ্ধ করিয়া ফুটিল যাহার বরে,
অমৃতগন্ধ আনন্দরূপে দান করি' যে বা লোকে
নবজীবনের দীপ্তি আনিল মৃত্যু-আহত চোখে
তাহারি মুক্ত মিলনাঙ্গনে জাগ্ ও-রে
তোরা জাগ্—
বিশ্ববিজয়ী সেই রবি-করে দে রে দে যজ্ঞভাগ।

খণ্ডিত নয় এ মহাযজ্ঞ, অনন্ত অক্ষুরণ,—
এই বিশ্বের লোকে লোকে আজ আলোক-
নিমন্ত্রণ;
শক্তির মোহ মিথ্যার মায়া সবলে করিয়া দূর
ভুবনধন্যা জীবনবন্যা বহে আজি ভরপূর;
আয় রে পূর্ব্ব আয় পশ্চিম, আয় তোরা সবে
আয় বিশ্বভারতী-মন্দির-তলে মিলন-মধুরচ্ছায়।
যা কিছু যাহার কলঙ্ককালি, যাহা 'অচলায়তন,'
সত্য-আলোকে ধুয়ে নে রে লভি' সে দীপ্ত
বরিষণ।
মর্ম্মপুটের মণির মুকুর উচ্চে তুলিয়া ধর্—
সবার উর্দ্ধে জ্বলুক্ সে আজি শাশ্বত ভাস্বর।

জগৎ-সভায় রবি তুমি আজ নহ শুধু আর কবি,
অমৃত-প্রতিভা ভাণ্ডার-ভরা তুমি আলো-
করা রবি ;
তোমারি প্রভায় উজল সপ্ত সাগর, সাগর-পার,
পূর্ব্বোত্তর দক্ষিণদিশি উজ্জ্বল চারিধার ;
কুরুক্ষেত্র-কালরাত্রির তমসার অবসানে
তোমারি কিরণ দূর পশ্চিমে নব জাগরণ হানে !
বিশ্ব-সভার মহা-রাজসূয়ে তুমি পুরুষোত্তম,
কর্ম্মের রথী ধর্ম্ম-সারথী জ্ঞানে মানে অনুপম ;
শিশুপাল ছাড়া তোমারে সকলে বরিষ্ঠ সম্মানে
অর্পিছে আজি প্রাণের ভক্তি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদানে।

লহ ওগো লহ আজি এ অর্ঘ্য উদ্ধ আকাশপথে
যেথা তব মহাবিজয় যাত্রা শুভ্র আলোকরথে ;
চন্দ্র যেথায় অতন্দ্র চোখে সাজায় বরণডালা,
কাতারে কাতারে শোভিছে লক্ষ নক্ষত্রের মালা,
জ্যোৎস্না বিছায় অঞ্চলবাস ছায়া-পথখানি পরে,
মেঘেরা মিলিয়া চরণের তলে শঙ্খধ্বনি করে,
সঙ্গীতে মাতি গ্রহেরা ফিরিছে অনুগ্রহের লাগি';
নাচে ছয় ঋতু মোহন নৃত্যে চির দিনরাত জাগি,

জানি না সেথায় পঁহুছিবে কি না এ ক্ষীণ
কণ্ঠস্বর—
জানি শুধু দীন যাত্রী-জনের তুমি চিরনির্ভর।
কেন দীন বলি ? আমারি কণ্ঠে স্বাগত
জানায় মাতা,
সাত কোটি নিজ সন্তান সাথে উন্নত যার মাথা,
যাহার যশের কীর্ত্তি আজিকে ঘোষিছে জগৎময়,
ভিক্ষুক যে-বা শিক্ষক হয়ে ভুবন করিল জয়—
সে যে সেই রাণী বঙ্গবাণীরই বুক-আলো-
করা ধন,
বিশ্বভুবন নন্দিত-করা বন্দিত নন্দন।
সেই বাণী আজি আমারি কণ্ঠে পাঠায়
তাহার বাণী,
অক্ষম হোক্, তবু তোমা তরে গাঁথা এ
মাল্যখানি ;—
পর' আজি গলে—দেখুক বিশ্বসাহিত্য-পরিষৎ,
বঙ্গবাণীরই কোলে দোলে আজ ভুবন-
ভবিষ্যৎ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

নমস্কার

নমস্কার ! করি নমস্কার !
কবিতা-কমল-কুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে যার ;—
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,—
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী বহে তরঙ্গিতে,—
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত্য হ'ল স্ফূর্ত্তি-পারাবার,—
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !
ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে—
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যুহারা তানে ;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান ;
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার
নমস্কার ! করি নমস্কার !
চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,—
দুর্ল্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার

বেণু-বীণা জিনি মিঠা বাণী যার ধ্বনি সুষমার
চিত্ত-প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার
নমস্কার ! করি নমস্কার !

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার-নিশি,
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত নিষেক-শূন্য নৈষ্কর্ম্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি ভারতের বৈজয়ন্ত-হার
নমস্কার ! করি নমস্কার !

রুদ্ধকণ্ঠ পঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী-অমরাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজরোষ উপরাজে দিল সে ধিকার
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য-ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য
কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা !"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নহত পারা—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র,—ত্যাথে নিজ রক্তের
ফোয়ারা—
শিহরি কবন্ধ মাগে যার আগে শান্তিবারি ধারা—
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য বিদেশে যে রাজারও অধিক
মুখরিত যার গানে সপ্তসিন্ধু আর দশদিক,—
বিশ্বকবিচ্ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,—
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব
জগৎপ্রিয়,—
নিত্য-তারুণ্যের টীকা ভালে যার চিত্ত-চমৎকার
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার
নিশীথে মশাল জ্বেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার
দ্বন্দ্ব ভুলি' 'হূন্' 'গল' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

নয়নে শান্তির কান্তি হাস্যে যার স্বর্গের মন্দার
পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার ;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য সহচর
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্ত্তি স্বদেশ-
আত্মার"
বারম্বার তারে নমস্কার !

চারি মহাদেশ যার ভক্ত,—করে ভক্তি নিবেদন ;
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার
নমস্কার ! নমস্কার ! বারম্বার তারে নমস্কার !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গান

উঠলো ভরে সারা গগন যার সুরে গো যার গানে
তার তরে আজ গান খুঁজে পাই কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে !
অবাক্ দেখি এ মোর হৃদয়,
ভাষাও সে যে হলো নিদয়,
হতাশ হয়ে চাইতে গিয়ে চাই যে কেবল তার পানে—
উঠলো ভরে সারা গগন যার সুরে গো যার গানে।
তোমার ছাড়া গান কি আছে !
গাইব কি আর তোমার কাছে !
তোমার সুরে যাই যে ভেসে, মন উতলা সেই টানে—
তোমার তরে গান খুঁজে পাই কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে।
বিশ্বহৃদয় জয় করেছ জগৎজয়ী হে কবি !
পূর্ণ হলো শূন্য জীবন সে গৌরবে গৌরবী।
জগৎ জুড়ে তাই তো শুনি
তোমার গুণের গান যে গুণী !
সেই সুরে আজ সুর মিলিয়ে গাইতে হবে মন মানে
নইলে কোথায় সুর খুঁজে পাই, কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজপুত্তুর

১

রাজপুত্তুর চলেচে, নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাতরাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে-কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই শেষও নেই।

সহরে গ্রামে আর সকলে হাট বাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।

কেন যায়?

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খাল বিলের জল খাল বিলের মধ্যেই শান্ত।

কিন্তু গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপুত্তুরকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে কে? তেপান্তর মাঠ দেখে' সে ফেরে না, সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যায়।

মানুষ বারেবারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারেবারে নতুন করে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, আমরা সেই রাজপুত্তুর।

তেপান্তর মাঠ যদিবা ফুরোয় সাম্‌নে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপুরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে।

পৃথিবীতে আর সকলে টাকা খুঁজচে, নাম খুঁজচে, আরাম খুঁজচে; আর যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েচে। তুফান উঠ্‌ল, নৌকো মিল্‌লনা, তবু সে পথ খুঁজচে।

এইটেই হচ্চে মানুষের সব গোড়াকার রূপকথা, আর সব শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেচে, দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জ্জয়, আর ছোট মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করচে বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।

বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোট ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।

২

সাম্‌নে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মত। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু যেম্‌নি মাটিতে পা পড়া অম্‌নি এ কি হল? এ কোন্ জাদুকরের জাদু?

এ যে সহর। ট্র্যাম চলেচে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশিওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেচে।

আর রাজপুত্তুরের এ কি বেশ? এ কি চাল? গায়ে বোতাম-খোলা-জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসা খরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায় ?

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপা ফুলের মত রঙ নয়, হাসিতে তার মাণিক খসেনা। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নব বর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারি সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরীব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে। সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেচে মরে, এখন মেয়ে এসেচে খুড়োর বাড়িতে।

পাত্রের সন্ধান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতি নাৎনীর সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাব-রাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বল্‌লেন, মেয়ের কপাল ভাল।

এমন সময় গায়ে-হলুদের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসার সেই ছেলেটিকে।

খবর এল তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিলনা, ছিল, কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানৎ করে বল্লেন "এ ছেলেকে কে বাঁচায় !"

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকীল প্রবীণ সব সাক্ষী দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুল্‌লে। সে বড় আশ্চর্য্য !

সেই দিন ইষ্ট দেবতার কাছে জোড়া পাঁটা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজ্‌ল। সকলেই খুসি হল, বল্‌লে কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম্ম এখনো জেগে আছেন।

৩

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু দীর্ঘপথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গিহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুন্‌তে হল, হাঁউমাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। মানুষকে খাবার জন্যে চারিদিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থাম্‌ল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেম্‌নি ছোঁয়ানো অম্‌নি এ কি কাণ্ড! সহর গেল মিলিয়ে, স্বপন গেল ভেঙে।

মুহূর্ত্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর। তার কপালে অসীমকালের রাজটীকা। দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুল্‌বে।

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায় সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চল্‌ল। তার সাম্‌নের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জ্জন করচে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ,—সে রাজপুত্তুর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ষা-মঙ্গল

(গান)

মেঘের কোলে-কোলে যায় রে চ'লে বকের পাঁতি।
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি-গাঁথি।
সুদূরের বীণার স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগ্‌লামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি।
ওদের ঘুম ছুটেচে ভয় টুটেচে একেবারে
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের,—পিছন পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা
সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাইরে মানা;
ওরা দিনের শেষে দেখেচে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি।

১৭ই ভাদ্র ১৩২৮।

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে
সেই আগুনের কালোরূপ যে
আমার চোখের পরে নাচে।
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখ
তালবনের ঐ গাছে গাছে।
বাদল হাওয়া পাগল হল
সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায়
মাঠ হতে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্বন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ
আমার গানের পাখার পাছে॥

১৫ই ভাদ্র ১৩২৮

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি'
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
আজি সঘন শর্ব্বরী মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝরি' ঝরিছে জলধারা,
তমালবন মর্ম্মরি' পবন চলে হাঁকি।
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
যে-কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি
জানিনা কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী।
রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাব বাটে,
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে!
কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি,
কে তুমি মম অঙ্গনে, দাঁড়ালে একাকী॥

১৩ই ভাদ্র ১৩২৮

ওগো আমার শ্রাবণ-মেঘের খেয়াতরীর মাঝি!
অশ্রুভরা পূরব-হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়
বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।

ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে,
মনে ভাবি তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারি-গানে
সেই আঁখি তার মনে আনে
আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।

১০ই ভাদ্র ১৩২৮

বাদল-মেঘে মাদল বাজে
গুরু গুরু গগন মাঝে।
তারি গভীর রোলে
আমার হৃদয় দোলে
আপন সুরে আপনি ভোলে।
কোথায় ছিল গহন প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে,—
আজি সজল বায়ে
শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে
গানে গানে।

১০ই ভাদ্র ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিলিতোনা

৩

আন্দ্রে সেই ছোক্‌রাটাকে যে কাজের ভার দিয়াছিল সেই কাজ হাসিল হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আন্দ্রে একটা গলিতে অপেক্ষা করিতেছিল।

কুণ্ডলী-পাকানো চুরুটের নীলবর্ণ ধূমরাশি সম্মুখে উদ্‌গীরণ করিতে করিতে, আন্দ্রে নিজের মনকে একবার যাচাই করিয়া লইল; বুঝিল যে, প্রকৃত প্রেমের আকর্ষণ না থাকিলেও, সেই রূপসীর চিন্তায় তাহার মন একবারে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; রূপসীর রূপে যতটা মুগ্ধ না হোক, জুয়াঙ্কোর সেই বিপদের পর, তরুণীর সেই কথা গুলিতে আন্দ্রের মনে একটা অপূর্ব্ব রহস্যের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে—এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য যুবক-সুলভ তাহার একটা অদম্য কৌতূহল হইয়াছে। ডন্ কুইক্‌শোট না হইলেও, বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবকেরা নারীদিগকে অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য সততই উন্মুখ হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও আন্দ্রের মনে ঐরূপ একটা ক্ষাত্রভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল।

ফেলিসিয়ানা এমন সুশিক্ষিতা রমণী, এই সব ব্যাপারের মধ্যে সে এখন কোথায়? তাহাকে লইয়া আন্দ্রে একটু মুস্কিলে পড়িয়াছে। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এখনও তাহার বিবাহ হইতে ছয় মাস বিলম্ব আছে। ততদিনে বোধ হয় তাহার এই ক্ষুদ্র প্রেমলীলার অভিনয় সাঙ্গ হইবে—সব চুকিয়া-বুকিয়া যাইবে। তাছাড়া এই রকম ধরণের গুপ্ত প্রেম লুকাইয়া রাখা খুবই সহজ। ফেলিসিয়ানা আর এই তরুণী—উহারা ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন অবস্থার লোক—উহাদের মধ্যে কখনই দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে না। ইহাই আমার বাল্য-সুলভ শেষ চপলতা বা বাতুলতা। কোনও মোহিনী রূপসীকে ভালবাসিলে লোকে বলে, উহা বাতুলতা; আর, একটা কদাকার চটা মেজাজের রমণীকে বিবাহ করিলে লোকে বলে—উহা সুবুদ্ধির কাজ। তার পর বিবাহ করিয়া তুমি ঋষিমুনির মত, সন্ন্যাসীর মত, বৈরাগীর মত, নিস্পৃহভাবে নির্লিপ্তভাবে জীবন যাপন কর না কেন, তাহাতে কি আসিয়া যায়।

এই সব কথা মাথার মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া লইয়া, আন্দ্রে একটা সুখের স্বপ্নে গা ঢালিয়া দিল। ফেলিসিয়ানার প্ররোচনায় আন্দ্রেকে বাহ্য ভদ্রতার ধরণ ধারণ অবলম্বন করিতে হইত, সুরুচিসূচক আমোদ-প্রমোদে অনুরাগ দেখাইতে হইত। কিন্তু এ সমস্ত আন্দ্রের নিকট একটা বিষম বোঝা বলিয়া অনুভূত হইত। অথচ প্রতিবাদ করিতেও তাহার সাহসে কুলাইত না। কতকগুলা ইংরাজী অভ্যাস ও ধরণ-ধারণ অনুসারে তাহাকে চলিতে হইত। চা খাওয়া, পিয়ানো বাজানো, হল্‌দে দস্তানা পরা, সাদা 'কলার'-পরা, নাচের ভঙ্গিতে পা-ফেলা, মুখ বার্ণিস

করা, নূতন ফ্যাশানের কাপড় সম্বন্ধে কথোপ-কথন করা—এই সমস্তই তাহার করিতে হইত। অথচ এই সমস্ত বাঁধা-বাঁধি ধরণ ধারণ ও আমোদ-প্রমোদের উপর আন্দ্রের একটা স্বভাবসিদ্ধ বিতৃষ্ণা ছিল। আত্ম-সম্বরণের যতই চেষ্টা করুক না, আন্দ্রের ধমণীতে প্রবাহিত স্পেনীয় শোণিত, উত্তর-য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে এক একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিত।

সার্কাসের সেই তরুণীর ভালবাসা পাইয়াছে মনে করিয়া আন্দ্রে মনে মনে নানাপ্রকার সুখের কল্পনা করিতে লাগিল। সে যেন কল্পনায় দেখিল, তরুণী নিজ-গৃহের একটি ছোট্ট কামরায় জাঁকালো পোষাক ছাড়িয়া, একখানা আটপৌরে কাপড় পরিয়া মিষ্টান্ন কমলালেবু, ফলের মোরব্বা প্রভৃতি আহার করিতেছিল; একটা পত্‌লা কাগজে কতকটা তামাকের কুটা ভরিয়া সেই কাগজ সুন্দররূপে গুটাইয়া সিগারেট তৈয়ার করিয়া তাহাকে যেন অর্পণ করিল। তাহার পর সেই তরুণী দেয়ালে আট্‌কানো গিতার যন্ত্র দেয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া যেন তাহার হাতে দিল। এবং হাতে একজোড়া কাঠের কর্‌তাল বাঁধিয়া, বেশ চটুলতার সহিত, হাবভাব প্রকাশ করিয়া পুরাতন স্পেনীয় ধরণে নৃত্য করিতে লাগিল—সেই নৃত্যে আরব-দেশ-সুলভ একটু অবসাদের ভাব মিশ্রিত—এবং নাচিতে নাচিতে, মধ্যে মধ্যে থাপছাড়া রকমে এক-একটুকরা মর্ম্মস্পর্শী গজলের তান ছাড়িতে লাগিল।

আন্দ্রে যখন এইরূপ সুখ-স্বপ্নে ভোর হইয়া, কল্পিত কর্‌তালের তালে তালে তুড়ি দিতেছিল, তখন সূর্য্য দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করিয়া অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ভোজনের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কারণ আজকাল মাদ্রিড-নগরে অবস্থাপন্ন লোকেরা প্যারিস্‌ কিংবা লণ্ডনের সময় অনুসারে আহার করিতে বসে। আন্দ্রের দূত এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। এতক্ষণে তাহার আসা উচিত ছিল। বিলম্ব দেখিয়া আন্দ্রে বিস্মিত হইল এবং তাহার মৎলব একটু ওলট-পালট হইয়া গেল। তাহার দূতকে আবার কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? এমন একটা সুখের উত্তম গোড়াতেই ভণ্ডুল হইয়া গেল। একবার খেই হারাইলে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল—তাহার পথের কোন নিদর্শন নাই, চিহ্ন নাই। লোকটার নাম পর্য্যন্ত জানা নাই। দৈবাৎ যদি তাহার দেখা পাওয়া যায়, এখন কি শুধু এই ভরসায় থাকিতে হইবে?

আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল, "হয়ত, পথে তাহার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করা যাক।"

আসল কথা;—যখন সার্কাস হইতে মিলিতোনাকে লইয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল, আন্দ্রের দূত সেই অদ্ভুত ধরণের ছোক্‌রাটা গাড়ীর পিছনের স্প্রিং ধরিয়া কোন রকমে ঝুলিয়া ছিল, পাঠকের বোধহয় স্মরণ আছে। এ-গলি সে-গলি পার হইয়া গাড়ী যখন একটা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল, কোচম্যান জানিতে পারিল গাড়ীর পিছনে একটা লোক ঝুলিয়া আছে, জানিতে পারিয়াই তাহার মুখের উপর শপাৎ করিয়া এক ঘা চাবুক কসাইয়া দিল।

ছোক্‌রাটা চাবুক খাইয়া কাঁদিতে

লাগিল—তাহার পর চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, তখন গাড়ীটা একেবারে রাস্তার শেষে গিয়া পড়িয়াছে; গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ কমিয়া আসিয়াছে। ছোক্‌রার নাম পেরিকো। পেরিকো সকল স্পেনীয় যুবকেরই মত খুব দৌড়াইতে পারে। তাহার দৌত্য-কার্য্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে খুব ছুটিয়া চলিল; ঠিক্ সিধা গেলে গাড়ীকে নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু একটা বাঁক ফেরায় ক্ষণেকের জন্য গাড়ীটা তার দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়িল—সে আবার যখন সেই বাঁকটায় ফিরিল, তখন গাড়ীটা অন্তর্হিত হইয়াছে। পেরিকো অলি-গলি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল;—যদি কোন দরজার সম্মুখে গাড়ীটা আসিয়া দাঁড়ায় এই আশায়। কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইল। কেবল দেখিল একটা খালী গাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে—এবং একটা চাবুকের আস্ফালন শব্দ করিয়া অন্য আরোহী লইবার জন্য চলিয়া গেল।

আন্দ্রে যাহা বলিয়াছিল যদিও তাহা পেরিকো করিতে পারে নাই, তথাপি সে এমন সব রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেখানে তাহার সেই পরিচিত দুই আরোহীর গাড়ী হইতে নামিবার সম্ভাবনা আছে। দক্ষিণ য়ুরোপের ছেলেগুলা স্বভাবতই একটু ইঁচড়ে-পাকা হইয়া থাকে। মনে করিল, অমন সুন্দরীর নিশ্চয়ই কোন হৃদয়-বল্লভ আছে। স্বীয় গৃহের জান্‌লা হইতে কোন না কোন সুন্দরী আপন প্রিয়তমকে দেখিবার জন্য বোধ হয় নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত হইবে।—আর, এই মাড্রিড্ নগরে বৃষ-যুদ্ধের দিন,—একটা সাধারণ আমোদ-আহ্লাদের দিন, বেড়াইবার দিন, সকলেই বাড়ীর বাহির হইবে। এই অনুমানটা যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা নহে। বস্তুত, অনেকগুলি সুন্দরী জান্‌লা হইতে মুখ বাড়াইয়া মৃদুমৃদু হাসিতেছিল। কিন্তু পেরিকো যাহাকে খুঁজিতেছিল তাহাকে দেখিতে পাইল না। শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পেরিকো রাস্তার ধারের ফোয়ারার জলে চোখ্ ধুইয়া, যেখানে আন্দ্রের অপেক্ষা করিবার কথা, সেই দিকে চলিল। আন্দ্রেকে ঠিক্ ঠিকনাটা বলিতে না পারিলেও, ৩।৪ টা রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তায় তাহারা নামিয়াছে,—ইহা নিশ্চয় করিয়া সে বলিতে পারিবে মনে করিল।

আর কয়েক মিনিট সেখানে থাকিলে, পেরিকো দেখিতে পাইত, আর একটা গাড়ী বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া—বেশভূষায় ভূষিত, 'ম্যাণ্টো' জোব্বার কাপড়ে চোখ্ ঢাকা—একটি লোক গাড়ী হইতে লঘুভাবে লাফাইয়া পড়িল—এবং গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। লাফাইয়া পড়িবার সময় গাত্রবস্ত্র একটু সরিয়া যাওয়ায় দেখা গেল ভিতরে কতকগুলা চুম্‌কি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে এবং তার এক পায়ের রেশ্‌মি লম্বা মোজায় রক্তের দাগ লাগিয়াছে।

অবশ্য তোমরা বুঝিয়াছ, এ জুয়াঙ্কো ভিন্ন আর কেহ নয়। কিন্তু জুয়াঙ্কোর সহিত মিলিতোনার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, পেরিকো তাহা জানিত না। সুতরাং জুয়াঙ্কোকে ঐখানে নামিতে দেখিয়া সে মিলিতোনার আবাস-গৃহের কোন নিদর্শন পাইল না। তাছাড়া, এমন হইতে পারে, জুয়াঙ্কো নিজ গৃহেই প্রবেশ করিল। ইহাই অধিক সম্ভবপর। সেই ভীষণ বৃষ-যুদ্ধের

পর, জুয়াঙ্কোর নিশ্চয়ই একটা বিশ্রামের দরকার, এবং ক্ষত স্থানে পটি বাঁধাও আবশ্যক হইয়াছে। কেন না, ষাঁড়ের শিঙের আঘাত অত্যন্ত বিষাত্মক এবং উহার ক্ষত সারিতে বিলম্ব হয়।

একটা সূচাগ্র চতুষ্কোণ স্মৃতি-স্তম্ভের নিকট অপেক্ষা করিয়া থাকিতে আন্দ্রে পেরিকোকে বলিয়াছিল। এক্ষণে পেরিকো সেই সংকেত-স্থানের অভিমুখে চলিল। আবার একটা বাধা। আন্দ্রে একা ছিলনা। ফেলিসিয়ানা তাহার একটি সখীর সহিত, বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল। ফেলিসিয়ানা তাহার গাড়ী হইতে দেখিল, তাহার ভাবী পতি একটু উদ্বেগের সহিত অধীর হইয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে; তখনি সে গাড়ী হইতে নামিয়া, সখীর সহিত, আন্দ্রের নিকটে আসিল। ফেলিসিয়ানা আন্দ্রেকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কোন কবিতার গজল রচনা করবার জন্যে এই গাছের তলায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ? কেননা, যারা কবিত্ব-রসের ভাবুক নয় তারা এই সময়ে আহার করিতে বসে, এই তাদের ভোজনের সময়।" অভিনব প্রেমলীলার আরম্ভেই ধরা পড়ায়, আন্দ্রের মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল এবং নারী-মনোরঞ্জন-সুলভ কতকগুলা সচরাচর ধরণের ফাঁকা কথা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিল। আন্দ্রের ওষ্ঠাধরে মৃদু মধুর হাসি লাগিয়া থাকিলেও, ভিতরে ভিতরে আন্দ্রে রুষ্ট হইয়াছিল। এদিকে পেরিকো কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া উঁহাদের চারিদিকে ঘুরপাক দিতে লাগিল। বয়স খুব অল্প হইলেও, পেরিকোর এ জ্ঞান ছিল যে, ফরাসী ধরণে এমন সুন্দররূপে সজ্জিত একজন তরুণীর সম্মুখে শিল্পজীবী-শ্রেণীর কোন রমণীর ঠিকানা কোন যুবককে বলা ঠিক্ নহে।

শুধু সে বিস্মিত হইল, এমন সুন্দরী মহিলাদের সহিত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি না একজন আলখাল্লাধারী নিম্নশ্রেণী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

—ও ছোক্‌রাটা কি চায়? ও তোমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে—যেন ওর বড় বড় কালো চোখ দুটা দিয়ে তোমাকে গিলে খাবে।

আন্দ্রে উত্তর করিল:—

আমি কখন্ আমার এই নিবে-যাওয়া চুরোটের শেষ-টুক্‌রাটা ফেলে দেব,—ও ছোক্‌রাটা তারই অপেক্ষায় আছে। এই কথা বলিয়া চুরোটের টুক্‌রাটা আন্দ্রে তার নিকট নিক্ষেপ করিল—আর সেই সঙ্গে একটু ইসারা করিল—যাহার অর্থ:—আমি যখন একা থাক্‌ব, তখন এখানে আবার ফিরে আস্‌বি।

ছোক্‌রাটা চলিয়া গেল। যাইবার সময় পকেট হইতে চকমকির বাকস্ বাহির করিয়া, চুরুটে আগুন ধরাইল। এবং পাকা চুরুট-খোরের মত বেদম চুরুট ফুঁকিতে লাগিল।

আন্দ্রের কষ্ট এইখানেই শেষ হইল না। ফেলিসিয়ানা দস্তানা-আঁটা হাতে আপন কপালে আঘাত করিয়া স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় বলিলেন:—"কি সর্ব্বনাশ! আমাদের সেই যুগলবন্ধ গানটা নিয়ে এমন ব্যাপৃত ছিলুম যে, তোমাকে বল্‌তে আমি ভুলে গিয়েছিলুম, বাবা আমাদের ওখানে আজ রাত্রে তোমাকে

খেতে বলেছেন। আজ সকালে তোমাকে লিখ্‌বেন মনে করেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁকে বল্লুম, আজ অপরাহ্ণে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, আমি মুখে বল্‌ব, লেখ্‌বার দরকার নেই।" নখের মত একটা ক্ষুদ্র হাত-ঘড়িতে সময় দেখিয়া বলিলেন :—"এমনিই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে পড়, আমার বন্ধুকে ওঁর বাড়ীতে পৌছে দিয়ে, আমরা দুজনে এক সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে ফিরে আস্‌ব।"

একজন সুশিক্ষিতা তরুণী, এক যুবককে তাঁর গাড়ীতে উঠাইয়া লইলেন—ইহা দেখিয়া যদি কেহ বিস্মিত হন, তাহা হইলে আর একটি লোকের দিকে আমরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, তিনি আর বিস্মিত হইবেন না। গাড়ীর সম্মুখস্থ আসনে একজন ইংরেজ গভর্ণেস বসিয়া ছিলেন—খোঁটার মত খট্‌খটে, কাঁকড়ার মত লাল, গায়ে ফিতা-বাঁধা লম্বা আঁটসাট্‌ আঙ্গিয়া। উহার চেহারা দেখিলে ফুল-ধনু, ধনু ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়।

আর পিছাইবার উপায় নাই। ফেলিসিয়ানা ও তাঁর সখীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া, আন্দ্রে গাড়ীর সম্মুখ-আসনে, গভর্ণেসের পাশে গিয়া বসিলেন।

পেরিকোর আনীত সংবাদ শুনিতে পাইলেন না বলিয়া তিনি রাগে গর্‌গর্‌ করিতেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, পেরিকো সমস্ত সন্ধান লইয়া আসিয়াছিল। আবার কবে যে তাঁর প্রাণের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, মিলিতোনার ওখানে গিয়া গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ করিতে পারিবেন—তার আর স্থিরতা নাই। সে সুখের দিন অনির্দ্দেশ্যরূপে পিছাইয়া গেল।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে যে-ভোজনের নিমন্ত্রণে আন্দ্রে যাইতেছেন সেই ভোজন-ব্যাপারের বর্ণনা শুনিতে তোমাদের বোধ হয় তেমন ঔৎসুক্য হইবে না তার চেয়ে বরং, মিলিতোনা কি করিতেছে তারই সন্ধান করা যাক্‌—এ-বিষয়ে পেরিকোর অপেক্ষা বোধ হয় আমরা বেশী সফল-প্রযত্ন হইব।

বস্তুতঃ আন্দ্রের গুপ্তচর যে রাস্তাটা আঁচিয়াছিল, মিলিতোনা সেই রাস্তাতেই বাস করে। মিলিতোনার বাড়ীটা অদ্ভুত-রকমে নির্ম্মিত। সম্মুখের জানালাগুলা সব অসমান। বাড়ীর সম্মুখের প্রাচীর সমস্তই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এবং স্বীয় ভারে দমিয়া গিয়াছে, বসিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ীগুলা উহাকে যদি ঠেসিয়া না রাখিত তাহা হইলে অচিরাৎ ধরাশায়ী হইত সন্দেহ নাই। বাড়ীর উপরের ভাগটার অবস্থা কতকটা ভাল এবং প্রাচীন গোলাপী রং-এর কিছু নিদর্শন এখনো বর্ত্তমান আছে—ঠিক যেন বাড়ীটা স্বকীয় দুরবস্থায় লজ্জিত হইয়া একটু লাল হইয়া উঠিয়াছে। টালির ছাদের একটু নীচে একটা ছোট গবাক্ষ; তার চারি পাশে সম্প্রতি আধ-খাঁচ্‌রা রকমে চূণকাম করা হইয়াছে। ডাইনের এক খাঁজে একটা 'বটের' পাখীর মূর্ত্তি—বামদিকে লাল ও হল্‌দে কাচের মুক্তায় বিভূষিত একটি ছোট্ট খোপের মধ্যে একটা ঝিঁঝি পোকার মূর্ত্তি। কেননা আরবদের অনুকরণে, স্পেনের লোকেরা, এক-ঘেয়ে সুরে, ও সম-বিভক্ত তালে বটের পাখী ও ঝিঁঝি পোকার উদ্দেশে রচিত গান গায়িতে ভালবাসে। একটা ফোঁপরা মাটির কুঁজা একটা রসি দিয়া উপর হইতে ঝোলানো

রহিয়াছে—কুঁজার গায়ে মুক্তার ন্যায় বিন্দু বিন্দু বাষ্প-ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কুঁজার জল সন্ধ্যার বাতাসে ঠাণ্ডা হইতেছে, এবং দুইটা নিম্নস্থ পাত্রের উপর টপ্‌টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই গবাক্ষটা মিলিতোনার কাম্‌রার গবাক্ষ। এই নীড়ে যে একটি তরুণ বিহঙ্গ বাস্ করে, নীচের রাস্তা হইতে কোন দর্শকের তাহা বুঝিতে বোধ হয় তিলার্দ্ধ বিলম্ব হয় না। রূপ ও যৌবন নির্জীব জড় পদার্থের উপরেও একটা আধিপত্য বিস্তার করে, তাহাদের উপর আপনা হইতেই যেন একটা শিলমোহরের ছাপ পড়িয়া যায়।

একটা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যদি তোমরা ভয় না পাও, তাহলে আমার সঙ্গে এসো। মিলিতোনা এখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন, এসো আমরা তাঁর অনুসরণ করি। সিঁড়ির ধাপগুলা খুব থট্‌থটে শক্ত, সিঁড়ির গরাদে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। মিলিতোনা কুরঙ্গিনীর মত লঘু-গতিতে লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়ির ধাপগুলা লঙ্ঘন করিতেছে; এইবার মিলিতোনা উপরিতন ধাপের মুক্ত আলোকে আসিয়া পড়িয়াছে। তখনো বৃদ্ধা আল্‌দঙ্গা প্রথম ধাপগুলার অন্ধকারের মধ্যেই আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। একটা দেবদারু কাঠের দরজা—দরজার সম্মুখে একটা দড়ি ফেলা আছে, তরুণী দড়ির আগাটা উঠাইয়া লইল এবং চাবি লইয়া দরজাটা খুলিল।

এমন দীন-ধরণের কাম্‌রা দেখিয়া কোন চোর প্রলোভিত হইতে পারে না এবং উহা বন্ধ-সন্ধ করিয়া বেশী সাবধান হইবারও কোন আবশ্যকতা নাই। মিলিতোনা যখন বাহিরে যাইত, তখন ঘরটা খোলাই থাকিত, ঘরের ভিতর আসিলে তখন খুব যত্নে ঘরটা বন্ধ করিত। তবে কি না, এই ক্ষুদ্র কোটরটিতে একটি বহুমূল্য রত্ন নিহিত—চোরের চোখে উহা রত্ন না হউক, প্রেমিকের চোখে রত্ন বটে।

ঘরের দেওয়াল কাগজে মোড়া নয়, কিংবা রং-করা নয়—শুধু সাদাসিধে রকমে চূণ-করা। একটা আয়না আছে—কিন্তু তাহার উপর সুন্দরীর কমনীয় মূর্ত্তির অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত হয়। একজন সিদ্ধ-পুরুষের ক্ষুদ্র একটি মূর্ত্তি, তার সঙ্গে কৃত্রিম পুষ্পভূষিত দুইটা ফুলের টব; একটা দেবদারু কাঠের টেবিল, দুইটা কেদারা; একটা ছোট পালঙ্ক, তার উপর একটা মস্‌লিনের তোষক পাতা—এইগুলি ঘরের একমাত্র আস্‌বাব। তা ছাড়া কাচের উপর আঁকা মেরি-মাতার ছবি, ঋষিমুনির ছবি রহিয়াছে; এবং একটা খঞ্জনী, গীতার (এক প্রকার সেতার) যন্ত্র হইতে ঝুলিতেছে।

মিলিতোনার কাম্‌রাটি এইরূপ ভাবে সজ্জিত। যাহা জীবনযাত্রার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এই প্রকার জিনিস ছাড়া উহার ভিতর আর কোনও জিনিস না থাকিলেও উহার মধ্যে দুঃখ-দুর্দ্দশা-সুলভ একটা নীরস কঠোর ভাব লক্ষিত হয় না। একটা আনন্দের রশ্মিছটায় সমস্ত কাম্‌রাটি যেন আলোকিত। লাল ইটের মেজে বেশ নয়ন-রঞ্জন, ঘরের ধব্‌ধবে কোণগুলায় চাম্‌চিকার কালো ছায়া পড়ে না। চাঁদোয়া-ছাদের কড়ি-বর্গার ভিতরে কোন মাকড়সা জাল বিস্তার করে নাই।

চারি দেওয়ালে ঘেরা এই কাম্‌রাটির ভিতর

সবই বেশ নয়নানন্দকর, হাস্যময় ও উজ্জ্বল। ইংলণ্ডে, আস্‌বাবের এই অপ্রাচুর্য্য নগ্নতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু স্পেন-দেশের লোকের চোখে ইহাই আয়েষের পরাকাষ্ঠা। বৃদ্ধা এতক্ষণে হাঁস্‌ফাঁস করিয়া কোনপ্রকারে সিঁড়ির শেষে আসিয়া পৌঁছিল। তারপর মিলিতোনার এই রমণীয় কোটরটিতে প্রবেশ করিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িল। দেহভারে চৌকিটা মড়মড় করিয়া উঠিল—মনে হইল ভাঙ্গিয়া পড়ে বুঝি।

"দেখ মিলিতোনা, ঐ জলের কুজোটা নামাও দিকি, আমি একটু জল খাবো, আমার যেন দম আট্‌কে যাচ্চে, সেই ষাঁড়ের-লড়ায়ের জায়গার ধুলোয় আর সেই পুদিনার লজিঞ্জিস্‌ খেয়ে আমার গলা যেন পুড়ে যাচ্চে।"

তরুণী সহাস্যমুখে, বৃদ্ধার ঠোঁটের উপর জলপাত্রটা নোয়াইয়া ধরিয়া উত্তর করিল :—

—অত মুঠো মুঠো লজিঞ্জিস্‌ না খেলেই ভাল হ'ত।

আল্‌দঞ্জা তিন চার ঢোঁক জল পান করিল তাহার পর হাতের উল্‌টা পিঠ্‌টা দিয়া মুখ মুছিয়া দ্রুত-তালে হাত-পাখা নাড়িয়া বাতাস খাইতে লাগিল। তারপর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল :—

"লজিঞ্জিসের কথায় মনে পড়ে গেল, জুয়াঙ্কো আমাদের দিকে কি ভয়ঙ্কর ভাবে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল! আমি নিশ্চয় করে বলছি সেই সুশ্রী ভদ্রলোকটি তোর সঙ্গে কথা কচ্ছিল বলে, জুয়াঙ্কোর হাত ফস্‌কে গিয়েছিল, তাই ষাঁড়টাকে মারতে পারেনি। জুয়াঙ্কোর বাঘের মত সন্দিগ্ধ মন, যদি সে ভদ্রলোকটিকে আবার দেখ্‌তে পেত, তাহলে তাকে কিছু শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ত না। সে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারত কিনা সন্দেহ।"

—আশা করি, জুয়াঙ্কো কারও উপর ও-রকম দারুণ অত্যাচার করবে না। আমি সেই যুবা পুরুষটিকে খুব অনুনয় করে বলেছিলুম—আমার সঙ্গে যেন আর একটি কথাও না বলেন। তখন থেকে আমাকে তিনি কোন কথাই বলেননি। আমি ভয় পেয়েছি বুঝ্‌তে পেরে আমার উপর তাঁর দয়া হয়েছিল। কিন্তু জুয়াঙ্কোর এই ভীষণ ভালবাসার কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার!

বৃদ্ধা উত্তর করিল :—

"এ ত তোরই দোষ! তুই এত রূপসী হলি কেন?"

এই দুই রমণীর মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় লোহার আঘাতের মত দরজায় একটা জোরাল ঘা পড়িল। কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। মানুষ-ভোর উচ্চে, স্পেন দেশের প্রথা অনুসারে একটা উঁকি দিয়া দেখিবার গরাদে-দেওয়া রন্ধ্র-গবাক্ষ আছে, বৃদ্ধা উঠিয়া তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে গেল। সেই রন্ধ্র দিয়া জুয়াঙ্কোকে দেখিতে পাইল। তাহার রৌদ্র-দগ্ধ মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা আল্‌দঞ্জা দরজার কপাট খুলিয়া দিল, জুয়াঙ্কো প্রবেশ করিল। সার্কাস-রঙ্গভূমিতে তাহার চিত্ত যে প্রচণ্ড আবেগে আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনো যেন তাহার মুখে প্রকাশ পাইতেছে। একটা দারুণ রোষ তাহার হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়াছে স্পষ্টই বুঝা যাইতে

জুয়াঙ্কো স্বভাবত অভিমানী লোক। প্রথম পরাভবে দর্শকেরা ধিক্কার দিয়াছিল, তাহার পর আবার জয়ী হইলে তাহারা বাহবা দেয়—কিন্তু এই শেষের সাধুবাদে পূর্ব্বদত্ত ধিক্কারের অপমান জুয়াঙ্কোর হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই। সে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিল।

বিশেষত সেই যুবাপুরুষ মিলিতোনার সহিত কথা কহিতেছে দেখিয়া তাহার রোষ চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল, এবং রঙ্গাঙ্গন হইতে বাহির হইয়া কখন সেই যুবককে পাক্‌ড়াও করিবে তজ্জন্য সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। এখন তাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? নিশ্চয়ই সে মিলিতোনার অনুসরণ করিয়াছে—তাহার সহিত আবার কথা কহিয়াছে।

এই কথা মনে হইবামাত্র, ছোড়ার সন্ধানে তাহার হস্ত যন্ত্রবৎ একবার কটিবন্ধটা হাত্‌ড়াইয়া দেখিল। জুয়াঙ্কো ঘরে প্রবেশ করিয়া দুইটা চৌকীর একটা চৌকীতে বসিল। মিলিতোনা জান্‌লায় ঠেস্‌ দিয়া, একটা ঝরিয়া-যাওয়া লাল জবার বীজ-কোষ কাটিয়া লইতেছিল; বৃদ্ধা আপন মুখের উপর পাখার বাতাস দিতেছিল। এই তিন জনের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজমান। প্রথম বৃদ্ধাই এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সে বলিল :—

"তোমার হাতের ব্যাথাটা কি সর্ব্বদাই থাকে?" মিলিতোনার প্রতি একটা সুগভীর কটাক্ষ নিঃক্ষেপ করিয়া জুয়াঙ্কো উত্তর করিল : —

—"না"।

তখনি কথাবার্ত্তাটা থামিয়া না যায় এই উদ্দেশে বৃদ্ধা আবার বলিল :—

—"ঐ জায়গাটায় নুনজলের পটি বাঁধ্‌লে ভাল হয়।"

কিন্তু জুয়াঙ্কো কোন উত্তর করিল না। একটি মাত্র চিন্তা যাহা তাহার মনকে দখল করিয়া বসিয়াছিল তাহার দ্বারা চালিত হইয়া জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে বলিল :—"বৃষযুদ্ধের রঙ্গভূমিতে তোমার পাশে যে যুবকটি বসেছিল সে কে?"

—"তার সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ; আমার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় নেই।

—"কিন্তু তুমি কি চাও তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে?

—এ অনুমানটা বেশ ভদ্র রকমের অনুমান দেখ্‌ছি। ভাল, আলাপ পরিচয়টা কখন হবে বল দিকি?

—আলাপ পরিচয় হবে কি,—আগেই ত হয়ে গেছে।

বার্ণিস্‌-করা বুট-পরা, সাদা দস্তানা-পরা, শোভন কোর্ত্তা-পরা সেই লোকটাকে আমি খুন করব।"

—জুয়াঙ্কো তুমি যে পাগলের মত কথা বলচ। আমার সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত হয়ে কারও উপর সন্দেহ করবার অধিকার কি আমি তোমাকে দিয়েছি? তুমি বলে থাক, তুমি আমাকে ভালবাসো; সে কি আমার দোষ? আর তুমি আমাকে সুন্দরী বলে মনে কর বলেই আমি কি তোমাকে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে পূজো করতে বস্‌ব?"

বৃদ্ধা বলিল :—"সে কথা সত্যি; এর

ভিতর ত কোন জোর-জবর্দ্দস্তি নেই ; কিন্তু তবু আমি বলি, তোমাদের যোড়াটি দিব্যি মানাবে। ঠিক যেন মাধবীলতা তমাল গাছকে জড়িয়ে থাকবে। তোমরা দুজনে হাতধরাধরি করে যখন নৃত্য করবে, তখন তা দেখতে স্বর্গের অপ্সরারাও নীচে নেমে আসবে।

—"হাবভাব দেখিয়ে তোমার মন ভোলাতে আমি কি কখন চেষ্টা করেছি জুয়াঙ্কো ? অপাঙ্গ কটাক্ষ করে' মুচকি হাসি হেসে, মোহন অঙ্গভঙ্গি করে তোমার মন আকর্ষণ করতে কখনো কি চেষ্টা করেছি ?"

গভীর কণ্ঠস্বরে জুয়াঙ্কো উত্তর করিল :—

—"না"।

—আমি কখনো তোমার কাছে কোন অঙ্গীকারে বদ্ধ হই নি—তোমাকে কোন রকম আশাও দিই নি। আমি তোমাকে বরাবরই বলে আসছি, "আমাকে ভুলে যাও"। তবে কেন তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ ; কেন অকারণে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে আমাকে বিরক্ত করচ ? আমাকে তোমার ভাল লেগেছে বলে আমি কারও পানে তাকাতে পারব না—আর তাকালেই একজনের মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে—এ কেমন কথা ? "তুমি-কি চাও, একটা গভীর বিজনতা আমার চারিদিক্ ঘিরে থাকে ? "লুলে" নামে একটি ভাল ছোগ্‌রা যে আমাকে আমোদ দিত, আমাকে হাসাত, তুমি তাঁকে খোঁড়া করে দিলে ; তোমার বন্ধু "জিনে" আমার হাত একটু ছুঁয়েছিল বলে তুমি মেরে তার হাড় ভেঙ্গে দিলে। এতে কি মনে কর তোমার কোন সুবিধা হবে ? আজ আবার সার্কাসে তুমি কি বাড়াবাড়িই করলে ;—আমার উপর নজর রাখতে গিয়ে ষাঁড়টা তোমার কাছে এসে পড়ল—তুমি ভাল করে তাকে আঘাত করতেই পারলে না।"

—"কিন্তু আমি যে মিলিতোনা তোমাকে ভালবাসি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি ; তোমা ছাড়া আমি যে জগতে আর কাউকে দেখি না। যখন তুমি আর একজনের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলে, তখন ষাঁড়ের সিঙের দারুণ আঘাত পেয়েও আমি তোমা থেকে চোখ্ ফেরাতে পারি নি। একথা সত্যি আমার নরম প্রকৃতি নয় ; কেননা, আমি হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে আমার সারা যৌবনটা কাটিয়েছি। প্রতি দিনই আমি প্রাণী হত্যা করি কিংবা নিজে হত হবার মত সঙ্কটাবস্থায় আপনাকে স্থাপন করে থাকি। রমণীর মতো সেই সব সুকুমার ক্ষীণকায় যুবক যারা সমস্ত দিন কেশ কুঞ্চিত করে, সংবাদ পত্র পাঠ করে সময় কাটায়, তাদের মতো মিষ্টি নরম ভাব আমার নেই। তুমি যদি আমার না হও, অন্ততঃ তুমি আর কারও হতে পাবে না।"—একটু থামিয়া এবং টেবিলে সজোরে একটা ঘা মারিয়া জুয়াঙ্কো এইরূপ উত্তর করিল। তাহার পর, চট্ করিয়া উঠিয়া এই কথা-গুলি গুন্‌গুন্ করিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল,—"আমি তাকে পাকড়াও করবই করব আর তার চোখে তিন ইঞ্চি গভীর ছোরা না বসিয়ে ছাড়ব না।"

এখন আবার আন্দ্রের নিকট ফিরিয়া যাওয়া যাক্। আন্দ্রে পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া সেই যুগলবন্ধ গানের অন্তর্গত তার অংশটা

বেসুরো গাহিতেছে। তাহাতে ফেলিসিয়ানা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। অমন সৌখীন সান্ধ্য-সম্মিলন—কিন্তু আন্দ্রের কিছুই ভাল লাগিতেছে না—সবই তাঁর নিকট বিরক্তিকর ঠেকিতেছে। আন্দ্রে মনে মনে মার্কিসকে বারম্বার জাহান্নামে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, একথা বলা বাহুল্য।

তরুণী মিলিতোনার সেই অনিন্দ্য সুন্দর পাশের মুখ, তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি তাহার আরবী ধরণের নেত্র-যুগল, তাহার জংলী ধরণের মাধুর্য্যশ্রী, তাহার চিত্রশোভন পরিচ্ছদ—এইসব মনে করিয়া, মার্কীসের সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ সভায় সমবেত সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া বেশভূষায় ভূষিতা প্রৌঢ়াদের সঙ্গ আন্দ্রের আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। তাহার বাগ্‌দত্তা ভাবী পত্নীও তাহার চোখে নিতান্ত কুৎসিত বলিয়া মনে হইল। মিলিতোনার প্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া আন্দ্রে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য আন্দ্রে যে রাস্তা দিয়া চলিতেছিল, সেই রাস্তায় কে-যেন পিছন হইতে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল। সে আর কেহ নহে—সে পেরিকো। সে সম্প্রতি যে-নূতন আবিষ্কার করিয়াছে, বক্‌শিসের আশায় আন্দ্রেকে সেই সংবাদ দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি আসিয়াছে। ছোক্‌রাটা বলিল :—

"কর্ত্তা, "পোডার" রাস্তার ডান্ দিকের তিনটে বাড়ীর পরে তার বাড়ী। জল ঠাণ্ডা করবার জন্য একটা জলের কুঁজো হাতে করে জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌লুম।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান্ধিজী

দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালী! কি লিখিস্ হিজিবিজি?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী!' 'গান্ধিজী!'
বাতায়নে ত্যাখ্ কিসের কিরণ!—নব জ্যোতিষ্ক জাগে!
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ,—কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে!
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নর-নারী!
কৃষাণের বেশে কে ও কৃশ-তনু,—কৃশাণু পুণ্য ছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি!

কৌঁসুলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি
কার মৃদুবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী !
ক্রোর টাকা কার ভিক্ষা-ঝুলিতে,—অপরূপ অবদান,—
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান !
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁঝি
কেরে ও খর্ব্ব সর্ব্বপূজ্য ?—'গান্ধিজী !' 'গান্ধিজী !'

* *

মহাজীবনের ছন্দে যে জন ভরিল কুলিরও হিয়া,
ধনী-নির্ধনে এক ক'রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া ;
আচরণ যার কোটি কবিতার নির্ঝর মনোরম,
কর্ম্মে যে মহাকাব্য মূর্ত্ত, চরিতে যে অনুপম ;
দেশ-ভাই যার গরীব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি,
'গড়া' যে পরে গো ফেরে খালি পায় শোয় কম্বল পাড়ি,
তপস্যা যার দেশাত্মবোধ ছোটোরও ছোটোর সাথে,
দিন-মজুরের খোরাকে যে খুসী তিন আনা পয়সাতে,
স্বেচ্ছায় নিয়ে দৈন্য যে, কাছে টানিল গরীব লোকে,—
ভালো যে বাসিল লক্ষ কবির ঘন অনুভূতি-যোগে,
অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,
আসন যাহার বুদ্ধের কোলে টলষ্টয়ের পাশে,
দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্য্যাদা,
চিত্তের বলে লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা,
বীর-বৈষ্ণব—বিষ্ণু তেজেতে উজল যে জন ভিজি,
ওই সেই লোক ভারত-পুলক ওই সেই গান্ধিজী !

* * *

কাফ্রির ভিটা আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া নগরীতে,
বারে বারে ক্লেশ সহিল যে ধীর স্বদেশবাসীর প্রীতে,
উপনিবেশের অপহুজুরের না মানি' জিজিয়া-কর,
মুদি-মাকালিরে আত্মার বলে শিখাল যে নির্ভর,
বারণ যাদের ওঠা ফুটপাথে তাদেরি স্বজাতি হ'য়ে
ফুটপাথে হাঁটা পণ যে করিল গোরার চাবুক স'য়ে,
মার খেয়ে পথে মূর্চ্ছা গিয়েছে পণ যে ছাড়েনি তবু,
বারে বারে যারে জরিমানা ক'রে হার মেনে গোরা প্রভু—

বদ্ ক'রে বদ্ আইন চরমে রেহাই পেয়েছে তবে !
ধীরতায় বীর সেরা পৃথিবীর, নাই জোড়া নাই ভবে !
প্লেগের প্লাবনে কুলি-পল্লীতে নিল যে সেবা-ব্রত,
বুয়ার-লড়াইয়ে জুলুর যুদ্ধে জখমী বহিল কত,
কৌঁসুলি-কুলি-মুদি-মহাজনে পল্‌টন গ'ড়ে নিয়ে
উপনিবেশীর কথা-বিশ্বাসে খাটিল যে প্রাণ দিয়ে,
কাজের বেলায় ইংরেজ যারে মেনেছিল কাজী ব'লে
কাজ ফুরাইলে পাজী হ'ল হায় বর্ণ-বাধার গোলে !
কথা রাখিল না যবে হীনমনা কথার কাপ্তেনেরা,
কায়েম রাখিল বকেয়া যুগের জিজিয়া—ক্ষোভের ডেরা,
তখন যে জন কুলির ধাতুতে বৈষ্ণবী সেনা সৃজি,
ধৈর্য্য-বীর্য্যে মোহিল জগৎ এই সেই গান্ধিজী !

* * * *

সাগরের পারে স্বদেশের মান রাখিল যে প্রাণপণে,
গোরা-চোষা দেশে নিগ্রহ সহি' নিগ্রো-কুলের সনে,
বিদেশে স্বদেশী বটের চারায় রোপিয়া যে নিজ হাতে
বিশ্বাস-বারি সেচনে বাঁচাল বাওবাব-আওতাতে,
ভারত-প্রজারে চোরের মতন থানায় থানায় গিয়ে,
নাম লেখাইতে হবে শুনে, হায়, আঙুলের টিপ্ দিয়ে,
যে বিধি অবিধি তারে নির্ম্মূল করিবারে বিধি ঠেলে
দেশ-আত্মায় অপমান হ'তে বাঁচাতে যে গেল জেলে,
গেল চ'লে জেলে জ্বালাইয়া রেখে পুণ্য-জ্যোতির জ্বালা
ভস্ম-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মালা !
ধায় দেশী কুলি দেশী কুঠিয়াল না শোনে কাহারো মানা,
দেখিতে দেখিতে উঠিল ভরিয়া যত ছিল জেলখানা,
মর্দ্দে-মেয়েতে চলিল কয়েদে দলে দলে অগণন,
স্বেচ্ছায় ধনী হ'ল দেউলিয়া,—তবু ছাড়িল না পণ !
ক্ষুধিত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে,—
ইঙ্গিতে যায় কষ্টের কারা বরণ করেছে ধেয়ে,
দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সাঁতারে দুঃখ-নদী,
বুকে আঁকড়িয়া সদ্য-লব্ধ মর্য্যাদা-সম্বোধি !

তামিল-যুবক মরিয়া অমর যে পরশ-মণি ছুঁয়ে
চির-পদানত মাথা তোলে যার মন্ত্র-গর্ভ ফুঁয়ে,
পুলকে পোলক্ মিতালি করিল যার চারিত্র্য-গুণে,
ভারতে বিলাতে আগুন জ্বলিল যার সে দীপক শুনে ;
বাঁধিল যাহারে প্রীতি-বন্ধনে বিদেশীরও রাখী-সূতা
ভেট যারে দিল প্রেমী অ্যানড্রূজ্ অযাচিত বন্ধুতা।
আপনার জন বলি' যারে জানে ট্রান্স্ভাল হ'তে ফিজি,—
জীর্ণ খাঁচার গরুড় মহান্!—এই সেই গান্ধিজী !

* * * * *

এশিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,—
কুলিতে জাগায়ে মহামানবতা নর-নারায়ণ সেবা,—
ধৈর্য্যে ও প্রেমে শিখাল যে সবে কায়-মনে হ'তে খাঁটি,
সত্য পালিতে খেল যে সরল পাঠান চেলার লাঠি,
বিশ্বধাতার বহে যে পতাকা উজল জিনিয়া হেম,
"সত্য" যাহার এক পিঠে লেখা আর পিঠে "জীবে প্রেম,"
সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হ'য়েছে যে খাঁটি সোনা,
দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা,
অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি,
শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি',
অর্জ্জন যার ব্রহ্মচর্য্য, তপের বৃদ্ধি কাজে,
উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধির মাঝে,
মেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোষে অশুচি না মানে কিছু ;
চাকরের সেবা না লয় কিছুতে,—নরে সে যে করা নীচু,
ক্ষুদ্রে মহতে যে দেখেছে মরি আত্মার চির জ্যোতি
দাস হ'তে, দাস রাখিতে যে মানে চিত্তের অধোগতি,
প্রেমময় কোষে বসে যে দেশের শক্তি-বীজের বীজী
অন্তরে বৈকুণ্ঠ যাহার এই সেই গান্ধিজী !

* * * * * *

দর্পীতাপন ভারত-পাবন এই সে বেণের ছেলে,
শুচি-মহিমায় দ্বিজকুলে ম্লান করিল যে অবহেলে,—
কুণ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,
সাঁজা নিতে নয় কুণ্ঠিত কর্ত্তব্যের আবাহনে,

নীলকর আর চা-কর-চক্রে কুলির কান্না শুনি,
ফেরে কামরূপে চম্পারণ্যে অশ্রু-মুকুতা চুনি'।
কায়রা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মর্ম্মিতা,
নিজে ঝুঁকি নিয়া খাজনা রুখিয়া রায়তের চির-মিতা ;
রাজা-গিরি নয় কেবলি হুকুম কেবলি ডিক্রিজারি,
হাল-গোরু ক্রোক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি,
এ যে অনাচার এর ঠাঁই আর নাই নাই ভূভারতে,
রাজায় প্রজায় একথা প্রথম বুঝাল যে বিধিমতে,
সাতশত গাঁয়ে বাজায়ে অমোঘ সত্যাগ্রহ-ভেরী,
প্রজার নালিশ বোঝাতে রাজারে হ'ল নাক যার দেরী,
অভয়-ব্রতের ব্রতী যে, সকল শঙ্কা যে জন হরে,
বিশ্বপ্রেমের পঞ্চপ্রদীপে কুলির আরতি করে ;
আদর্শ যার সুধন্বা আর প্রহ্লাদ মহীয়ান্,
পিতারও হুকুমে করে নাই যারা আত্মার অপমান,
পূজনীয়া যার বৈষ্ণবী মীরা চিতোরের বীণাপাণি,—
রাজারও হুকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি যে রাজরাণী ;
জপমালে যার সারা দুনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল্,
গ্রীসের শহীদ্ সক্রেটিস্ আর ইহুদীর দানিয়েল্,
যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ক্ষয়,
তার আগমনী গাও কবি আজ গাও গান্ধির জয়।

* * * * * * *

এশিয়ার হক্, হারুণের স্মৃতি, ইস্লাম্ সম্মান,—
মর্ম্ম-বীণায় তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
দরাজ বুকেতে সারা এসিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি
সব হিন্দুর হ'য়ে যে, খোলসা খেলাফতে দিল সহি,
চিত্ত-বলের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া
সত্যাগ্রহ-ছন্দে বাঁধিল ঝড়েরে ছন্দ-ছাড়া,
প্রীতির রাখী যে বেঁধে দিল দুহুঁ হিন্দু-মুসলমানে,
পঞ্চনদের জালিয়াঁর জ্বালা সদা জাগে যার প্রাণে,
ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার

বিধাতার দেওয়া ধর্ম্ম্য-রোষের তলোয়ার যার হাতে
সোনা হ'য়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ণ-সম্পাতে ;
ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আম্‌লা-তন্ত্র সহ
অভয়-মন্ত্র দিয়ে দেশে দেশে ফিরিছে যে অহরহ ;
মহাবাণী যার শকতি-আধার অনুদার কভু নহে
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝে যে কহে,—
"স্বরাজ-প্রয়াসী জাগো দেশ-বাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম করিব তপে ।
যা' কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো সুখের খনি,
আপনার কাজ আপনি যে করে,—পেয়েছে স্বরাজ গণি ;
স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ স্বকরে নিজের বসন বোনা,
স্বরাজ স্বদেশী শিল্প-পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
স্বরাজ আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ স্ব-রীতে চলা,
স্বরাজ যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের দু'পায়ে দলা ;
স্বরাজ স্বয়ং ভুল ক'রে তারে শোধরানো নিজ হাতে,
স্বরাজ প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার দুনিয়াতে ।
সেই অধিকারে ন্যায় যারা হাত প্রেষ্টিজ্-অজুহাতে
স্বরাজ সে নৈযুজ্য তেমন আম্‌লা-তন্ত্র সাথে ।
হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ স্বপ্রকাশের পথে,
স্বরাজ সে নিজ বিচার নিজেরি স্বদেশী পঞ্চায়তে,
চারিত্র্য-বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা
কর-গত তার সারা দুনিয়ার সব দৌলৎ-শালা,
হাতেরি নাগালে আছে এর চাবী আয়াস যে করে লভে
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল কোরো না ।" কহে যে সবে
আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধির গাহ জয় ।

** ** ** **

হেস না হেস না হ্রস্বদৃষ্টি, হেস না বিজ্ঞ হাসি,
মূর্ত্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসের বিষ-নিশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়
বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিদ্রূপে কভু নয় ।

ব্যাঙ্গমা! তোর ব্যঙ্গ এবং বঙ্গ-বাখান রাখ্,
গুঞ্জনে শোন্ ভরি' ভরি' ওঠে ভারতের মৌচাক,
ভীমরুলও হ'ল মৌমাছি আজ যার পুণ্যের বলে
তার কথা কিছু জানিস্ তো বল্, মন দোলে কুতূহলে,
জানিস্ তো বল্ মোহনদাসেরে মহাত্মন্ গণি'
কি ফিকির আঁটে সুরা-রাক্ষসী পুতনা বোতল্-স্তনী,
বোতল কাড়িয়া মাতালের, গেল কোন্ তেলি কারাগারে,
কোন্ লাট ঢাকে আশোকের লাট মদের ইস্তাহারে!
জানিস্ তো বল্ কি যে হ'ল ফল আব্কারী-যুদ্ধের,
মঘ-জাতকের অভিনয় সুরু হ'ল কি মগধে ফের!
ওরে মূঢ় তুই আজ্‌কে কেবল ফিরিস্‌নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর যুঝে,
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।
পারিস্ যদি তো শুচি হ'য়ে নে রে স্নান ক'রে ওই জলে,
চিনে নে চিনে নে মহান্ আত্মা মহাত্মা কারে বলে।
এতখানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিস্ কোনোদিন?
—দেশ জুড়ে যার আত্মীয়-প্রিয়—তবু বিশ্বাস-হীন?
দূরবীণ ক'সে বিজ্ঞেরা ঘোষে, "সূর্য্যের বুকে পিঠে
আছে মসী-লেখা!" আলোর তাহে কি হয় কমি এক ছিটে?
সেই মসী নিয়ে হাস্যে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি
রশ্মির ঋণ বাড়ায়ে শশীর ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি।
কুটিরে কুটিরে মহাজীবনের জ্বেলেছে যে হোমশিখা
দিনমজুরের জনে জনে সঁপি মর্য্যাদা-শুচি টীকা।
পৌঁছে দেছে যে পৌরুষ নব চাষীদের ঘরে ঘরে,
যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে।
যার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে রে তিরিশ কোটির মন,
দেশের খতেনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন,
আত্মবিলোপী কর্ম্মী-সঙ্ঘ যার বাণী শিরে ধরি'
নীরবে করিছে ব্রতের পালন দুঃসহ দুখ বরি',
ছাত্রের ত্যাগে স্বার্থের ত্যাগে পুলকিয়া বহে হাওয়া,
রাজ-ভৃত্যের বৃত্তির ত্যাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,

বারে মাঝে পেয়ে কাজিয়া থামায়ে হিন্দু ও মোসলেম,
'আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,
মহম্মদের ধর্ম্ম্য-শৌর্য্য যাহার জীবন মাঝে
বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি স্ফুরিছে নবীন সাজে ;
সারাটা জীবন খ্রীষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাঁধে,
বিক্ষত পদে কণ্টক পথে 'সত্য' ব্রত যে সাধে ;
যার কল্যাণে কুড়েমি পালায় প্রণমিয়া চরকারে
ভরে ভারতের পল্লী-নগরী কবীরের 'কাল্‌চারে ;'
যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্‌মহলের খিল্,
পুরা হ'য়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল,
তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী ! গৌড়বঙ্গময়
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয় ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

আঁধি

১৮

বেলা তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরীর জোর-তাগিদে সুষমা স্নান সারিয়া ভিজা চুলগুলাকে পিঠের উপর মেলিয়া দিয়া নিখিলের শিয়রে আসিয়া বসিল। নিখিলের জ্বর তখন ছাড়িয়া গিয়াছে, বিছানায় শুইয়া দিদিমার হাত হইতে আঙুর লইয়া একটা-দুইটা করিয়া সে মুখে দিতেছিল। সুষমা শিয়রে বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। নিখিল সুষমার পানে চাহিয়া বলিল,--একটা গল্প বল না মা।

নিখিলের শীর্ণ গালে হাত বুলাইয়া সুষমা সস্নেহে বলিল,—কি গল্প বল্‌ব, বল ?

—সেই শঙ্খমালার গল্পটা, মা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তাহলে তুমি মার কাছে থাকো দাদা, আমি স্নান করে আসি,—কেমন ?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল বলিল,—হ্যাঁ।

অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিয়া বলিলেন,—একবার টেম্পারেচরটা দেখলে হয় না ? ডাক্তারকে স্নান করতে পাঠালুম, সারা রাত জেগেছে—আর তাও ত একটা রাত নয়, ক'দিনই চলছে। বেচারী নেয়ে কিছু খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিক্। নিখিল দিব্যি কথা কচ্ছে ত! ও ভালই আছে বোধ হয় ? বলিয়া তিনি নিখিলের কপালে হাত রাখিলেন। নিখিল বাপের মুখের দিকে চাহিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কেমন আছ,বাবা ? ভাল আছ এখন—না ?

নিখিল বলিল,—হ্যাঁ।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আর অসুখ করবে না ! এবার সেরে উঠবে—সেরে উঠলে রেলে চড়ে কত দূর-দেশে বেড়াতে যাব'খন, কেমন ?

নিখিল বলিল,—মার সঙ্গে যাব আমি, বাবা।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আচ্ছা।

সুষমা থার্মোমিটর ঝাড়িয়া অভয়াশঙ্করের হাতে দিলে ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—এখন ভালই আছে, বাবা। আর কেন ওকে কাটি-মাটি নিয়ে জ্বালাতন করছ ?

অভয়াশঙ্কর থার্মোমিটরে দেখিলেন,—টেম্পারেচর ৯৭ ডিগ্রী। তিনি বলিলেন,—কি ইচ্ছে কচ্ছে এখন, বল দেখি ?

নিখিল বলিল,—মার কাছে গল্প শুনব, বাবা।

নিখিলের স্বর একটু যেন কুণ্ঠিত—ব্যাকুল নিবেদনে ভরা।

অভয়াশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিলেন না, মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া নিখিলের পানে চাহিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তুমি যাও না বাবা, স্নান-টান করে নাওগে। তোমারো ত আর এক-রাত্তিরের ধকল্ যাচ্ছে না। যাও বাবা, এখানে সুষু রইল, আর তোমায় কোন ঝঞ্চাট পোহাতে হবে না। তুমি পুরুষ মানুষ, এ-সব কি তোমার কাজ ! নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলের ভার তুমি ওর হাতে দিতে পারো। ছেলেও, দেখো, এবার সেরে উঠবে'খন,। আর কোন ভয় নেই, আমি বল্‌চি।

অভয়াশঙ্কর কোন কথা বলিলেন না—নিখিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি তাহলে নাইতে যাই, বাবা ? এদের কাছে তুমি থাকো—কেমন ! গল্প শোনো।

নিখিল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—হ্যাঁ।

অভয়াশঙ্কর চলিয়া গেলেন। ছেলে আরাম হইয়া উঠিয়াছে, আর বোধ হয় জ্বর আসিবে না—ইহা ভাবিয়া মনটা হাল্‌কা হইলেও একটা চিন্তা বেদনার বোঝা লইয়া ক্রমাগত ধাক্কা দিতে লাগিল। এই ছেলেকে তিনি প্রাণের অজস্র আদর আর স্নেহ দিয়াও ভুলাইতে পারেন নাই, আর আজ সুষমাকে দেখিবামাত্র তাহার শরীরে-মনে সর্ব্বত্র কি এ হাসির জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল !

ইহাতে দুঃখ কি ! বেদনাই বা কেন ! নিখিলকে আরামে রাখিবার জন্যই ত সুষমাকে গৃহে আনা ! তবে ? ছেলেকে সে ভালো রাখিবে, বুকে পূরিয়া রাখিবে—তাহার অত-বড় বেদনাটা মাথা ঝাড়া দিয়া আর না দাঁড়াইতে পারে !

ছেলের আরামের জন্য এই যে আর-একজনকে আনিয়া হৃদয়ের আসনে বসাইয়াছেন, বাপের ইহাতে কতখানি ত্যাগ, কতখানি দরদ—তবু সেই বাপকে সুষমার জন্যই না ছেলে উপেক্ষা করিতেছে ! এই অত্যন্ত হীন ক্ষুদ্র চিন্তাটা উদয় হইবামাত্র অভয়াশঙ্করের সমস্ত মন একান্ত কুণ্ঠিতভাবে ছি-ছি করিয়া উঠিল। অতি-বড় দাতার আসনে বসিয়া যে এতখানি দান করিতে পারে, সে এই ছোট্ট দান-টুকুর জন্যও কুণ্ঠিত হয় ! অভয়াশঙ্কর জোর করিয়া এ চিন্তাটাকে দুই পায়ে

াপিয়া মাড়াইয়া দিয়া স্নান করিতে গেলেন।

স্নানান্তে নিখিলকে আবার দেখিতে আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন,—নিখিলের পাশে সুষমাও আড় হইয়া শুইয়া তাহাকে গল্প বলিতেছে—নিখিলের সমস্ত প্রাণ সে গল্পে কেমন সাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সুষমার গল্পের রস প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছে,—সুষমার ভিজা চুলের রাশি বালিশের উপর এলানো! তাহার মুখে-চোখে আনন্দের কি সে দীপ্তি! সহজ সরল কথায় বার্ত্তায় নিখিলকে সে এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে নিখিলের সমস্ত অবয়বে রোগের পাণ্ডুরতা মুছিয়া একটা স্বচ্ছ হাসির লহর খেলিয়া যাইতেছে—তখন তাঁহার প্রাণটা মুহূর্ত্তের জন্য অসহ্য কি এক ভাবের উত্তেজনায় থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ভুবনেশ্বরী তখন অন্যত্র ছিলেন। অভয়াশঙ্করকে দেখিয়া সুষমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—তুমি একটু জিরোওগে,—নিখিল এখন ভালই আছে। আমি ত রয়েছি,—ও বেশ গল্প শুনছে!

অভয়াশঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিলেন, এই পর-মেয়েটির কাছে তাঁহার মাতৃ-হীন পুত্র কি চমৎকার পোষ মানিয়াছে! এতটুকু অস্থিরতা নাই,—কি সহজ প্রফুল্ল ভাব তাহার! আহা, যে ছেলের সুখের জন্য, আরামের জন্য তিনি ব্যাকুল, সেই ছেলেকে সুষমাই ত এমন আনন্দ দিতে পারিয়াছে! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে চিন্তা সমস্ত মনটাকে দংশনের জ্বালায় জর্জ্জরিত করিতেছিল, সে চিন্তার গলা টিপিয়া তিনি মন হইতে দূর করিয়া দিলেন, মনকে বলিলেন,—না, সুষমার কাছে ইহার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা চাইই,—সুষমাকে আর উপেক্ষা করা হইবে না, উপেক্ষা করা চলিবে না!

১৭

দশ-বারো দিন পরে নিখিল পথ্য পাইলে ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—আমায় এবার তোরা ছুটী দে, মা। আমার কাজ সাঙ্গ হয়েছে। এবার অভয়কে দেখে আমার দুশ্চিন্তাও কেটে গেছে—তোর আর ভয় নেই, সুষু।

শেষের কথাগুলার দিকে মনের কিছুমাত্র ঝোঁক দেয় নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া সুষমা বলিল,—তুমি কোথায় যাবে, পিশিমা?

ভুবনেশ্বরী কহিলেন,—বলেচি ত তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব। আমার আর সংসারে থাকা সাজে না মা, থাকা উচিতও নয়।

সুষমা এবার আসিয়া অবধি একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতেছিল, সেটা—তাহার প্রতি অভয়াশঙ্করের অতিরিক্ত মনোযোগ, যত্ন! তাহার খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্ব লওয়া, তাহার বিরুদ্ধে মানদার দলের ভিতর হইতে কোনরূপ অভিযোগ উঠিলে গভীর তাচ্ছিল্যে সেগুলাকে উপেক্ষা করা, নিখিলকে তাহারই সঙ্গ দেওয়া—এ-সবগুলায় অভয়াশঙ্করের কি সুগভীর মনোযোগ!

তবু বয়স ত তাহার তরুণ, এই আদর-যত্নের মধ্যে স্বামীর ভালবাসার চেয়ে কৃতজ্ঞতার ভাগটাই যেন বেশী,—এটুকু সে স্পষ্টই বুঝিল। বুঝিয়া সে নিজের মনকে ঠিক করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল! সে যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আসিয়াছে—অভিনয় করিবার জন্য তাহাকে যে পালাটুকু লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই-টুকুই সে বলিয়া যাইবে! যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী

টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারি মধ্যে সে তাহারি শেখানো-মত অভিনয়টুকু সারিয়া যাইবে,—নিজের মনটাকে সে অভিনয়ে মিশাইতে গেলে চলিবে না। আনন্দে মন ভরিয়া উঠিলেও যদি তখন করুণ রসের ভূমিকা অভিনয়ের পালা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে মুখে-চোখে করুণ ভাব ফুটাইতেই হইবে, তেমনি আবার মনটা বেদনায় ভাঙ্গিয়া ছেঁচিয়া গলিয়া গেলেও কৌতুক রসের পালা আসিয়া পড়িলে সেই ভাঙ্গা-ছেঁচা মনটাকেই জোড়া-তাড়ার খাড়া করিয়া তাহাতে হাসির ফুল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে! হায়রে, এ-জন্মটা এমনি কলের পুতুলের মতই তাহাকে সারা জীবন শুধু অভিনয় করিয়াই যাইতে হইবে!

ভুবনেশ্বরী বাহিরটাই দেখিতে ছিলেন, মনের ভিতরকার অলি-গলির অত তত্ত্ব রাখেন নাই, কাজেই সেদিক্কার কিছুই তিনি জানিতেন না। তাই অভয়াশঙ্করের ব্যবহার দেখিয়া ব্যাপারটা তিনি ভাল বলিয়াই বুঝিলেন। সুষমাও ভিতরকার কথা ভাঙ্গিল না– সে মেয়ে মানুষ, স্বামীর ভালবাসা কি বস্তু, আর যত্নটাই যে কি,—এ-দুইটা জিনিসে প্রভেদ কোথায়, সে তাহা খুবই বোঝে। ভুবনেশ্বরী যে সে-সবের কোন সন্ধান পান্ নাই, ইহা দেখিয়া সে আরাম পাইল। আহা, বেচারী! এটুকু জানিয়াই তিনি শেষের কয়টা দিন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিন্। দুঃখ যা-কিছু, তা' তাহারই থাকুক! নিজের মনটাকে ভাঙ্গিয়া থেঁতো করিয়া বেদনা যতটুকু পাইবার, তাহা পাইয়াও যদি নিখিলকে সে সুখে রাখিতে পারে, নিখিলকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে, তবেই তাহার জীবন সার্থক হইবে! ইহার বেশী কিছু এ-জন্মে সে চাহেও না ত!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন—কি বলিস্ তুই? অভয়কে কাল রাত্রে আমি বলেচি, তার অমত নেই। তুইও অমত করিস্ নে মা, আর আমার পায়ে শেকল এঁটে রাখিস্ নে! ভালোয়-ভালোয় বেরিয়ে পড়ি—এর পরে আবার কোন্দিন কি ঘটবে, কে জানে! আমি কানেও কিছু শুনতে চাইনে, চোখেও কিছু দেখ্তে আস্‌ব না।

সুষমা বলিল—না পিশিমা, তুমি তাই যাও। সত্যিই ত, আমরা নিজেরা যদি পরে কোনোদিন দুঃখই পাই, তাবলে তার মধ্যে তোমায় আর জড়িয়ে আনি কেন! তুমি পরকালের কাজ করগে।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বেঁচে থাকো, সুখী হও, সবাইকে সুখে রাখো মা। মা-কালীর কাছে এই প্রার্থনা করি, তোমার যেমন বড় মন, এমনি বড় সুখেই সুখী হও তুমি! তবে মধ্যে মধ্যে খোঁজটা খবরটা দিও—নিয়ম করে খপর চাচ্ছি না, তার বড় দোষ,—তবে ন'মাসে ছ'মাসে খপরটা পেলেই চলবে।

সুষমা বলিল—তাই হবে, পিশিমা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন—নিখিলের সম্বন্ধে তোমায় কোন কথা বলবার নেই—তবে এইটুকু বলে যাই মা, অভয়ের মেজাজ বড় ভালো নয়। তোমার দামও সে বোঝেনি। বুঝ্বে বলে মনেও হয় না। যদি কোন দিন বোঝে, তাহলে তার নিজেরই মঙ্গল হবে তাতে—ও সেই দাম বোঝেনি বলেই বল্‌চি, যদি নিখিলকে নিয়ে কোন দিন ওর দুর্ব্বাক্য

এমন হয়ে ওঠে যে তোমার পক্ষে তা সওয়া অসম্ভব, তবু আমায় মনে করে তা সহ্য করো। এইটুকু জেনে রাখিস্ সুষু, যতদিন তুই, ততদিনই নিখিল। তুই যদি কোনদিন নিখিলকে ত্যাগ করিস্ ত জানিস্ সেদিন তার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! তুই ছাড়া তাকে কেউ রাখতে পারবে না।

সুষমা বলিল—তুমি থামো, পিশিমা। এ-সব কি বক্‌তে বস্‌লে, বলো দেখি। আমার কি হয়েচে যে তাকে আমি ছেড়ে যাব! আর যাবই বা কোথায়, পিশিমা? সে ঠাঁইও কি ছাই আছে! বলিয়া সুষমা হাসিয়া উঠিল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন—বলেচি ত মা—ধৈর্য্যের বাড়া গুণ আর নেই। যত বড় কষ্টই পাও, সহ্য করো। সহ্য করাই মনুষ্যত্ব। যে সহ্য করে, ভগবান তার মুখ চাবেনই একদিন,—দুঃখ তার কাটবেই। অধৈর্য্যে সর্ব্বনাশ। সংসারে অধীর হলে চলে না। যে অধীর, সে কোনদিন সুখী হতে পারে না।

শেষের কথাগুলা সুষমার কানেও গেল না। সে ভাবিয়াছিল, কত-বড় আশা লইয়া সে এ-ঘরে ঘর করিতে আসিয়াছিল! এই নিখিল তাহার হইবে, এই নিখিলকে সে সম্পূর্ণ আয়ত্তে-অধিকারে পাইবে, ইহাকে সে নিজের মনের মতই মানুষ করিয়া তুলিবে। ছেলে-বেলায় পুতুল লইয়া খেলিতে বসিয়া তাহাকে যেমন যেমন-খুসী নাড়িয়া চাড়িয়া শোয়াইয়া বসাইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া আরাম পাইয়াছে—সে বিষয়ে কেহ কোনদিন একটা কথাও বলিতে আসে নাই—তেমনি ভাবেই নিখিলকে লইয়া আজ মানুষ করিবে—কেহ সে ব্যাপারে হাত দিতে আসিবে না, বাধা দিবে না! কিন্তু হায়, এ কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! সে অন্ধের মত ভবিষ্যৎটাকে হাৎড়াইয়া দেখিতে লাগিল—অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার! এখনকার এই যে এই আলোর স্ফুরণ—এ ত বিদ্যুতের ক্ষণিক রেখা রে, শুধু!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে আকাশের দিকে চাহিল। ধৈর্য্য—ধৈর্য্য তাহাকে ধরিতেই হইবে! মস্ত বড় কর্ত্তব্যের ভার সে হাতে লইয়াছে, যেমন করিয়া হোক্, সে কর্ত্তব্য তাহাকে পালন করিতেই হইবে! নিজের গোপন বেদনায় বুক যদি ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, তবু সে তাহাকে ভাঙ্গিতে দিবে না!

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

৫

কুক্ষণে রবীন্দ্রনাথের পনেরো বৎসর পূর্ব্বের লেখা দিয়ে বর্ত্তমান আন্দোলনটীকে সমর্থন করতে গিয়েছিলেম। জবাবদিহির আর অন্ত নাই। ঘরে পরে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হওয়ার যো হ'য়েছে। প্রথম প্রশ্ন এই:—এতদিনে রবীন্দ্রনাথের মতের যে কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি তার প্রমাণ কি? প্রশ্ন খুবই সমীচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিবর্ত্তনই জীবনের ধর্ম্ম। বিশেষতঃ

রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ প্রাণ-মনোময়ী প্রতিভার পরিণতি শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থগিত হয় না। সাধারণ লোকের মতো বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে মনের সমস্ত পরিণতি সমাধা ক'রে বাকী জীবনটা মিউজিয়মের জীবের মতো তাঁরা কাটান না।

কিন্তু জীবনের পরিণতি প্রাণধর্ম্ম অনুসারেই হয়ে থাকে। পরিবর্ত্তন মূল প্রকৃতিরই অনুসরণ করে। সে তো বাহির হ'তে আসবাব সংগ্রহ ক'রে জীবনটাকে সাজিয়ে তোলা মাত্র নয়। ভিতরের ব্যক্তিটীই বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আপনাকে ক্রমশঃ ফুটিয়ে তোলে। আমি রবীন্দ্রনাথের যে মতগুলি তুলেছি, অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন, সেগুলি তাঁর মূল প্রকৃতির—তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অনুগত। তাদের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু আমূল পরিবর্ত্তন একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া ওগুলি লেখার পর থেকে এ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু লেখেন নি বা বলেন নি, যা-থেকে এরূপ পরিবর্ত্তন অনুমান করা সঙ্গত হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—না হয় স্বীকার করা গেল যে, বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলতত্ত্ব ও মোটামুটি পদ্ধতিটি বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাতেই প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু আজ যখন সমস্ত দেশ তাঁর ধ্যানলব্ধ সত্যটীকে কাজে পরিণত করার জন্য প্রাণপণ সাধনা আরম্ভ করেছে তখন তিনি নীরব কেন? এর কৈফিয়ৎটা যে আমার দেয় নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই দেয়, সে কথা লেখাই বাহুল্য। কিন্তু ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রেমের ক্ষেত্রে কতকটা সাযুজ্যলাভ স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই কেউ যদি গুরুর কাজের জন্য ভক্ত শিষ্যের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ দাবী করেন, তবে তাঁকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। সুতরাং আমাকেও একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। সেটী এই—যাঁদের সঙ্গে সত্যের মুখোমুখী পরিচয় হয়, তৃতীয় ব্যক্তির মারফতে ঘটে না, তাঁদের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের চোখে একটা জটিল সমস্যার মতই ঠেকে। তাঁদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্যটী তাঁদের সমস্ত চেতনার ক্ষেত্রটীকে এমনি অধিকার ক'রে বসে, যে অন্যান্য অনেক গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়ও তাঁদের নিকট কতকটা অবাস্তব হয়ে ওঠে। কায়মনোবাক্যে সেই সত্যটীকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলাই তাঁদের পক্ষে একমাত্র ব্রত মনে হয়। আমরা সকলেই সহযোগিতা-বর্জ্জন ব্যাপারটার আলোচনা নিতান্ত অমায়িক ভাবেই করে থাকি, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর চেতনায় ও জিনিষটী যে কি মূর্ত্তিতে প্রকট হয়েছে সেটা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বমানবের জ্ঞানের মিলনের সত্যটীও রবীন্দ্রনাথের চেতনায় ঠিক সেইরূপ ভাবেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' জেগেছে। এরূপ অবস্থায় অন্যান্য বিষয়ে কতকটা ঔদাসীন্য মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারেই ঘটে থাকে।

কথাটা মিথ্যা নয় এবং প্রশ্নকর্ত্তারাও নিরস্ত হয়েছেন, কিন্তু আমার নিজের মনে যে সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করেছি একথা ঠিক অকপট চিত্তে বলতে পারিনে। কৈফিয়ৎটার মধ্যে একটা বড়গোছের ফাঁক আছে এবং সেটা আর যারই দৃষ্টি এড়াক্ না

কেন, গুরুদেবের আমোঘ দৃষ্টির সম্মুখে যে আত্মগোপন করতে পারবে না সেকথা নিশ্চয়। সমস্ত ভারতবর্ষের চিত্ত-সমুদ্র এমন ভাবে আলোড়িত কখনো হয়নি এবার যেমন হয়েছে। এ মন্থনে বিষও উঠতে পারে, সুধাও উঠতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর উপদিষ্ট পথে বা লক্ষ্যে যদি কোনও ভুল বা ত্রুটি থাকে, সমস্ত জাতির পক্ষে তার ফল যে কিরূপ সাংঘাতিক হয়ে উঠছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নিখিল ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কেহ নাই যিনি সেই ভুল বা ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারবেন বা দেখিয়ে দিলে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তা শুন্‌তে প্রস্তুত হবে। আর মহাত্মা গান্ধীর উপদিষ্ট লক্ষ্য ও পথ যদি মোটের উপর ভুল-প্রমাদ-শূন্য হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ও অনুমোদন আন্দোলনটাকে কি পর্য্যন্ত যে বল দান করবে, সে কথা লেখার অপেক্ষা রাখে না। যারা "বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করিছে" তাদের সমস্ত দ্বিধা দূর হবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিপুল মঙ্গল-যজ্ঞে সকলেরই ডাক পড়েছে এবং সকলের জন্যই যোগ্য কর্ম্মক্ষেত্র প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আসন যদি আর বেশাদিন খালি প'ড়ে থাকে, তাহলে যজ্ঞের অঙ্গহানি হওয়া সুনিশ্চিত। আন্দোলনটীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত দেশকে প্রেমের রূপে ধর্ম্মের রূপে আত্মার রূপে বলী ক'রে তোলা। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষেই প্রেম ও ধর্ম্মের শক্তি কাহিনীমাত্র, মুখে তারা যতই non-violence প্রচার করুক। ধর্ম্মের বল প্রেমের বল বিশ্বজয়ী এ কথা মুখে বললেও তারা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারে না। আমাদের কামান বন্দুক নাই বলেই আমাদিগকে এই পথ অগত্যা অবলম্বন করতে হচ্ছে---তাদের সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়েই এই কথাটা ফুটে বেরুচ্ছে। এই দুর্ব্বলতাটুকুকে সম্বল ক'রে যারা সঙ্কটের দুর্গম পথে যাত্রা করেছে তারা বল পাবে কোথা হ'তে? জয়ী হবে কিসের জোরে? সুতরাং প্রেমের ধর্ম্মের সত্যের মৃত্যুঞ্জয়-শক্তির প্রতি সমস্ত দেশের একনিষ্ঠ বিশ্বাস জাগিয়ে তোলাই এ আন্দোলনের সব্‌ চেয়ে বড় কাজ। এই সব্‌ চেয়ে বড় কাজের আসন শূন্য পথ চেয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের আগমনের জন্য।

আরো একটা গুরুতর কথা আছে। পঞ্জাবের লোমহর্ষণ কাণ্ডের পর সমস্ত দেশ যখন আতঙ্কে জড়ীভূত হয়ে পড়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই বীর্য্য-দৃপ্ত অকুণ্ঠিত কণ্ঠে তার পুরুষজনোচিত প্রতিবাদ ক'রে দেশের সেই হতবুদ্ধি ভয়-স্তব্ধতা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ যতই গৌরব-দীপ্ত হোক্ না কেন, তা কথা মাত্র এবং কোনও কথাতেই পঞ্জাবী কাণ্ডের যথার্থ শেষ হতে পারে না। একটা প্রকাণ্ড 'ততঃ কিম্?' পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ভাবের পথের সাধক; সুতরাং এই ততঃ কিম্-এর উত্তর তাঁর নিকট হতে কেউ প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু আজ মহাত্মা গান্ধী ভারত-বর্ষের বুকের ভিতর হতে যে কর্ম্মরূপী উত্তর অভিব্যক্ত ক'রে তুলছেন, তার উপর যদি ভাব-সাধকের ভাবের অরুণ-রেখা-পাত না

হয়, তাহলে যে ছন্দে পঞ্জাব-অত্যাচারের প্রতিবাদ উদ্গীরিত হয়ে উঠেছিল অকস্মাৎ সেই ছন্দ ভঙ্গ হওয়ার দারুণ পীড়ায় সমস্ত দেশের চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠবে। *

যাই হোক এ একটা অবান্তর কথা অর্থাৎ প্রবন্ধের বিষয়-সম্পর্কে, লেখক-সম্পর্কে মোটেই নয়, তাহলে পাঠকদের সময়ের প্রতি এ জুলুমটা করতেম না। এখন আসল বিষয়টার অনুসরণ করা যাক।

ইংরেজ এত-বড় বিপুল দেশটাকে হস্তামলক ক'রে রেখেচে, এ একটা প্রকাণ্ড এবং কঠোর সত্য। দল বেঁধে চরকার মহিমা কীর্ত্তন করলে এবং গোটা-কতক লোক খদ্দর পরলেই এত-বড় সত্যটা মিথ্যা হয়ে যাবেনা। এই ব্যাপারের পিছনে কাজ করছে ইংরেজের ক্ষমতা এবং আমাদের অক্ষমতা। সুতরাং তাদের প্রভুত্বটাকে কায়েমী করার জন্য দরকার, এই দুটো জিনিষকেই বাড়িয়ে তোলা। তাদের সমস্ত পলিশির শেষ লক্ষ্যই তাই। ইংরাজের ক্ষমতা নির্ভর করছে প্রধানতঃ তাদের বাহুবল ও বুদ্ধিবলের উপর। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বাহুবল মানে ঢাল খাঁড়া ধনুর্ব্বাণ বা বন্দুক কামান মাত্র নয়। রেল টেলিগ্রাফ এরোপ্লেন কলকারখানা সমস্তই বাহুবলের সামিল। অর্থনীতি শাস্ত্রের নিয়ম গুলিকেও এর মধ্যে ফেললে বোধ হয় বিশেষ ভুল হবে না। জড়শক্তির বিচিত্র লীলা মানুষের বুদ্ধির নিকট যতই ধরা পড়েছে বাহুবলের এলাকা ততই বেড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ ব্যাপারে মানুষের ব্যক্তিগত সাহস বীর্য্য এবং সংখ্যাধিক্যের প্রভাব সেই অনুপাতেই কমছে। ফলে দেখা যাচ্ছে বাহুবল ক্রমেই বুদ্ধিবলে পরিণত হয়ে উঠছে।

ইংরাজের বুদ্ধিবলটাকে ডিপ্লোমেসী নামে উল্লেখ করলেই ও-জিনিষটার যথার্থ পরিচয় দেওয়া হবে। ইংরাজ রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই ও-জিনিষটার বহুদিন হতে অনুশীলন ও সেবা করে এসেছে এবং ওতে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। আমাদের মত নগণ্য জাতির তো কথাই নাই, পৃথিবীর বড় বড় দুর্দ্ধর্ষ জাতিগুলোকেও অবহেলে দাবার বোড়ের মতো চেলে সে কিস্তিমাৎ করে আসছে। বিগত জর্ম্মণ যুদ্ধে আমেরিকা যে কি করে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে যুদ্ধের গতিটা একেবারে বদলে দিলে, সে কথা সকলেই জানেন। ডিপ্লোমেসী জিনিষটা হচ্ছে পরের ও নিজের শক্তি ও দুর্ব্বলতার কেন্দ্রগুলিকে সম্যকরূপে জেনে সেই জ্ঞানটাকে কাজে লাগানো। আমাদের শক্তি ও দুর্ব্বলতার কেন্দ্রগুলি ইংরাজের নখদর্পণে বিরাজ করছে। আমাদের চেয়ে এ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান এত বেশী যে তুলনাই হয় না। তারা ভারতবর্ষের জমিটাকে যেমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে Exploit করছে, আমাদের শক্তি ও দুর্ব্বলতার ক্ষেত্রগুলিও আমাদের চরিত্রকেও ঠিক সেই ভাবেই Exploit করছে।

এই ডবল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ইংরাজ যে প্রকাণ্ড আধিপত্যের ইমারত খাড়া

* ইঙ্গিতজ্ঞেরা যাই মনে করুন, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে যে দুচারটে কথা বলেছেন, তা থেকে এ অনুমান করা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বতন মতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে অথবা বর্ত্তমান আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি নাই।

করে তুলেছে তার দিকে নজর পড়লে আমাদের কোনও কিছু ভরসা করার জোর-টুকু পর্য্যন্তও একেবারে উড়ে যায়, মনটা দারুণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবস্থাটা দাঁড়ায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরু-পাণ্ডবের সজ্জিত সেনার মধ্যে অবস্থিত অর্জ্জুনের মতো—যে মানসিক অবস্থাটাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্লৈব্য বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মানুষের আত্ম-মর্য্যাদাবোধ নিজের কাছেও ক্লৈব্যটা একবার করতে রাজী নয়। কাজেই সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য বড় বড় ভাব ও কথার আমদানি করতে হয়—অনেক সময়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই। কুলক্ষয়ের দোষ; মিত্র-দ্রোহের বা অধর্ম্ম ও রাজ্যলাভের হেয়তা ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের যে সকল কথা অর্জ্জুনের মুখ হতে অজস্র ফুটতে লাগল, সেগুলি যদি তাঁর পক্ষে সত্য হতো, তা'হলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অত-বড় আয়োজনটাই সম্ভবপর হতো না। এই আকস্মিক মৈত্রীভাবের উচ্ছ্বাসটা মিথ্যা বলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহ সকরুণ মৃদুব্যঙ্গের সহিত বললেন—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতা॥

আজ যখন কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আমাদের আহ্বান করছে, আমাদের অনেকেরই অর্জ্জুনের মতো দশা উপস্থিত হয়েছে। যতদিন আমাদের বড় বড় নেতারা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বীর-রসাত্মক ভীমার্জ্জুনের পালা অভিনয় করতেন, ততদিন সে সব বড় বড় উদার ভাব তাঁদের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে সাহস করতো না, আজ সেইগুলির দোহাই দিয়েই তাঁরা আমাদের মনের মধ্যে দ্বিধা এবং নিষ্ঠার মধ্যে দুর্ব্বলতা সঞ্চারের চেষ্টা করছেন। কোনও ভক্ত চূড়ামণি ইংরাজের অধীনতা-পাশের মধ্যে জগৎ-বিধাতার মঙ্গলময় অঙ্গুলির নির্দ্দেশ দেখে আপনাদের অফিস-আদালতের অভ্যস্ত কাজের মধ্যে আত্মপ্রসাদ-লাভের ব্যবস্থা করছেন। এই সকল ভক্ত-জীবনদের নিকট আমার একটী মাত্র সানুনয় প্রশ্ন আছে—তাঁরা পাঞ্জাব উৎপীড়নের মধ্যে ভগবানের কোন অঙ্গুলির নির্দ্দেশ, দেখেছেন? অঙ্গুষ্ঠ না তর্জ্জনীর? কেউবা প্রতিমাপূজা, জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন, পতিত জাতির দুরবস্থা, পূর্ব্বরাগমূলক বিবাহের অসদ্ভাব, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি যত প্রকার বাস্তবিক বা কাল্পনিক সামাজিক কুপ্রথা আছে বা আছে বলে মনে করেন তার একটা লম্বা ফিরিস্তী বের করে বলেন—"তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঃ—আগে এই সব সামাজিক কুপ্রথা দূর কর, তার পর রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতার কথা মুখে এনো।" যেন পৃথিবীর যে সব দেশ স্বাধীনতা-অর্জ্জন করেছে বা ভোগ করছে তারা সকলেই বদরিকাশ্রমের নবসংস্করণ এবং সেখানকার মানুষেরা সকলেই ঈশা মুসা দায়ুদ নবীর অবতার। যেন ক্যাপিট্যালিসমের জীবন্ত রায়টার প্রচণ্ড থাবাটা জাতিভেদের উপবাস-কৃশ বুড়ো সিংহটার গলিত নখর শিথিল কবলের চেয়ে কিছুমাত্র কম ভয়ানক এবং lynch pawটা যেন সুসভ্যতম জাতির সহৃদয়তাপূর্ণ পরিহাস মাত্র। আবার সব চেয়ে রহস্যের বিষয় এই—আমাদের সামাজিক কুপ্রথার এই লম্বা ফর্দ্দটা তখনি বেরোয় যখনি সমাজসংস্কার ছাড়া অন্য কোনও কাজ সুরু

করার আয়োজন হয়। এ ছাড়া এ সকল বিষয়ের জন্য যে কারো বিন্দুমাত্র সত্যিকার মাথা ব্যথা আছে, মাসিক পত্রের দু-চারটে দম্ভস্ফীত প্রবন্ধ ছাড়া, কোনও প্রেমধৈর্য্য নিষ্ঠাপূর্ণ শুভ অনুষ্ঠানের মধ্যে তার বড় পরিচয় পাওয়া যায় না। কেউবা কোট করে বসেন, যতদিন দেশের তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে একজনও নিরক্ষর থাকবে, ততদিন রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্য তাঁরা এক পাও নড়বেন না—মানুষের সহজ সদ্‌বুদ্ধির চেয়ে কেতাবী বাঁধি গতের উপর তাঁদের এমনি অগাধ বিশ্বাস। এই সব "তোতা-কাহিনী"র নায়কদের নিজেদের প্রতি নজর পড়লে কেতাবী বিদ্যার উপর এমন অগাধ শ্রদ্ধা টিঁকে থাকে কিসের জোরে, সেইটে বুঝতে আমার বিষম ধাঁধা লাগে। কিবা চরিত্রের দৃঢ়তা! কিবা বুদ্ধির সতেজ স্বাধীনতা! কিবা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা! কিবা সত্য-প্রিয়তা! কিবা সার্ব্বজনীন সহানুভূতি! কিবা কঠিন ত্যাগ-স্বীকার!

কারো কারো সূক্ষ্ম বেদনা-বোধ রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতা-লাভের সকল প্রকার প্রকোপের মধ্যেই বিদেশী বিদ্বেষের আঘ্রাণ পেয়ে একেবারে শিউরে ওঠেন। তাঁদের ভাবখানা দেখে মনে হয় যেন দেশবাসীদের নিজেদের মধ্যে দ্বেষ হিংসা বিরোধের লেশ-মাত্র নাই, সকলেই পঞ্চপাণ্ডবের মতো ভ্রাতৃপ্রেম-পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কেবল বিদেশী কৌরবদের প্রতি বিদ্বেষ-বশতই তাঁদের দেবচরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হচ্ছে—যেন প্রকাণ্ড একজালা প্রেমের দুধে (Milk of human kindness) এক বিন্দু বিদেশী বিদ্বেষের চোণা পড়ে সমস্ত দুধটা নষ্ট হওয়ার যো হয়েছে। যে জগদ্দল পাথরটা সমস্ত দেশের বুকের উপর চেপে বসে শ্বাসরোধের উপক্রম করেছে—সেটাকে যথাসম্ভব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলার চেষ্টামাত্র দেখে বাল্মীকির মতো তাঁদের মুখ দিয়ে সকরুণ অনুষ্টুপ ছন্দে উদ্দীপিত হচ্ছে, "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বম গম শাশ্বতী সমা—আহা কর কি, কর কি! পাথরটার গায়ে যে বাজবে।" আশা করি পাঠকেরা এ থেকে অনুমান করবেন না, আমি কোনও রূপ বিদ্বেষের সমর্থন করি। সেরূপ করলে মাসের পর মাস পরিশ্রম স্বীকার করে এই প্রবন্ধটী লেখার কোনই তাৎপর্য্য থাকত না।

কেউ কেউবা আপনাদের মনের কল্পময়ী কল্পনার সঙ্গে তুলনায় কংগ্রেসের আরব্ধ কাজগুলিকে সংকীর্ণ ও ছোট দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করছেন; ভুলে যাচ্ছেন—

মনোভাব

যতক্ষণ মনে থাকে দেখায় বৃহৎ
কার্য্যকালে ছোট হয়ে আসে।
বহুবাষ্প গলে গিয়ে একবিন্দু জল।

কিন্তু হায়! এক বিন্দু হলেও উহা জল,—যাতে মর্ত্ত্যজনের তৃষ্ণা নিবারিত হয় কিন্তু বাষ্পময়ী মূর্ত্তির উপর রংএর বৈচিত্র্যের লীলা যতই মধুর হোক না কেন, পৃথিবীর পক্ষে তা বন্ধ্যা।

পশ্চিম খণ্ডে "ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং—ধূমকেতুমিব কিমপি করালং" মহাযুদ্ধরূপী যে কল্কি অবতারের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর ললাট-দেশ হতে League of Nations নামে যে মহাপুরুষের উদ্ভব

হয়েছে ; রবীন্দ্রনাথ League of Robbers ও League of steam-rollers বলে যাঁর সম্বর্দ্ধনা করেছেন, অনেকে তাঁকেই ভূভার-হরণার্থ বিষ্ণুর একাদশ অবতার মনে করে, পশ্চিম-মুখো হয়ে তাঁরি শুভাগমনের প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। তিনি এসে আমাদের হাতের পায়ের মাথার বুকের শিকল মোচন করবেন, এই তাঁদের বিশ্বাস। হায়রে পর-নির্ভরপরতা! রঙ্গভূমির নটের মতো ক্ষণে ক্ষণে বেশ বদ্‌লে কত বিভিন্ন মূর্ত্তিতেই তুমি আসরে অবতীর্ণ হও। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন তুমি আমাদের সেই চিরকেলে চেনা সারথি যিনি গাড়ীর পিছন দিকে ঘোড়াটাকে জুড়ে মনু-পরাশরের আশ্রমের দিকে ফিরে যাওয়ার অসাধ্য চেষ্টাতেই দুর্ল্লভ মানব-জন্মের অনেকটা অংশই বৃথায় কাটিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক এঁদের নিকট আমার একটী মাত্র সানুনয় নিবেদন আছে—কল্কি অবতারের আসল কাজটাই এখনো বাকী আছে—ম্লেচ্ছ নিবহ নিধন ব্যাপারটা এখনো চোকেনি এবং এই League of Nationsএর আবির্ভাব তারি পাকা পোতা রকম বন্দোবস্তের জন্য। আর সংসারটা মিনার্ভা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ নয় যে পট উত্তোলন করবা-মাত্রই স্বর্গ ও সত্যযুগের সশরীরে আবির্ভাব ঘটে থাকে।

অনেকে আবার বিজ্ঞানের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে একেবারে ঠিক করে বসেছেন, নাঃ, আর কিছুতেই কিছু হবে না, ঐ বিজ্ঞানের ওষুধেই রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠে ওদের সঙ্গে লড়তে পারবে। দানবীয় অস্ত্র প্রতিহত করতে দানবীয় অস্ত্রেরই প্রয়োজন। (দানবীয় শব্দটী রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত অর্থে ব্যবহার করেছি সে কথা বলাই বাহুল্য।) সুতরাং আর সব কাজ ছেড়ে দেশ জুড়ে লেবরেটরী স্থাপনের কাজে লেগে থাক।

দিব্যাস্ত্রের তুলনায় দানবীয় অস্ত্রগুলি হাতে বহরে খুব প্রমাণ-সই দেখে তাদের শক্তি সম্বন্ধে খুব একটা উঁচু ধারণা জন্মানোটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও এটা ভুল এবং খুব বড় বড় শাস্ত্রীরাও এ ভুল করলে ভুলটা অশাস্ত্রীয় ভুলই হবে। কারণ,কোনো শাস্ত্রেই লেখে না যে শেষ পর্য্যন্ত দানবীয় অস্ত্র জয়লাভ করেছিল। সকল অস্ত্রের যিনি দন্ত চূর্ণ করেছেন, সেই ইন্দ্রের হাতের—দম্ভোলি, তিনি গড়ে উঠেছিলেন দধীচি মুনির আত্ম-বিসর্জ্জনে। আত্মোসৎ-সর্গ ই দিব্যাস্ত্রের রাজা।

এ হতে কেউ যেন মনে না করে বসেন আমি বিজ্ঞান-শিক্ষার তিলমাত্র বিরোধী। ভগবান যখন এত-বড় বহির্জগৎটা রচনা করেছেন, তখন নয়ন মেলে এর সৌন্দর্য্যটাও দেখতে হবে এবং মন মেলে এর গঠন-কৌশল ও শক্তির লীলাও বুঝে নিতে হবে।

মুক্তি মানে নিখিলের সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগের নিবিড় উপলব্ধি। অন্য কথায় একেই ভূমালাভ বলে। বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ প্রেম ও বিশুদ্ধ কর্ম্ম ভূমা-লাভের এই তিন পথ। এই তিন পথ পরস্পর নিরপেক্ষ কি না জানিনে। খুব সম্ভব নয়। কারণ মানুষ গঠিত হয়েছে জ্ঞান প্রেম ও কর্ত্তৃত্ব শক্তি এই তিনের সম্মিলনে। সে যাই হোক জ্ঞান একটা শক্তি। যখন

কেবল মাত্র জানার জন্য জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তখন এই শক্তিটা কাজ করে মনের বন্ধন-মোচনে। কিন্তু যখন কোনও বিশেষ ফল-লাভের লোভে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তখন সেই শক্তিটা ব্যয় হয় সেই ফল-লাভের কাজে। সুতরাং মনের বন্ধন মোচন হয় না, ভূমা বা মুক্তি লাভ ঘটে না। যখন এই উদ্দিষ্ট ফলটা লোকহিত হয়, তখন জ্ঞানের দিক দিয়ে যে যতটা হয়, মৈত্রী ভাবনা দ্বারা তার কতকটা পূরণ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই শক্তিটা পরপীড়ন পরদ্রোহ বা বিলাস-বাসনা চরিতার্থতার কাজে লাগে; তখন মতিটা তিন দিক দিয়েই হয়ে থাকে—মানুষ একেবারে মূলে হাবাত হয়ে যায়। প্রাচীনেরা এই সত্যটা বেশ ভাল করেই বুঝেছিলেন। অথর্ব্ব বেদে বেদ মন্ত্র—অভিচার ঐশ্বর্য্য-লাভাদি কার্য্যে নিয়োজিত হয়েছে বলে উক্ত বেদ বেদ সমাজে এক ঘরে হয়ে রয়েছে। তন্ত্রের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অনেকগুলি তন্ত্রে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা আছে। তা সত্ত্বেও তন্ত্র শাস্ত্র জ্ঞানী সমাজে হেয় হয়ে আছে—মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি ব্যাপারের জন্য শোনা যায় তপোবলকে ব্রহ্ম উপলব্ধি ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করলে তপস্বীদের তপঃক্ষয় হতো। তপঃক্ষয় মানে কোনও ধনক্ষয় নয়—ভূমা-লাভের শক্তির অপচয়। জীবের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ুক্ষয়ে যে ক্ষতি, আত্মার পক্ষে তপঃক্ষয়ে ঠিক সেই ক্ষতি। বিজ্ঞানকে একান্ত ভাবে হীন উদ্দেশ্য সাধনের কাজে নিয়োজিত করার ফলে যুরোপের বুকের ভিতর যে ব্যর্থতার আর্ত্তনাদ জাগছে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম চেতনাকে তা অতি-মাত্রায় ব্যথিত করেছে। জাপানও ঐ অবস্থার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে। আমরাই বা এমন কি পুণ্য করেছি যে আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল লাভ হবে? সুতরাং যাঁরা ইংরাজকে পরাভব বা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা দেশকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথেই আহ্বান করছেন। হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিজ্ঞানের ভূত-পন্থা তন্ত্রোক্ত পিশাচ পন্থার চেয়ে কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ নয়।

এখনো কেউ বলতে পারেন, হলোই না হয়, ওটা পিশাচ-পন্থা, আমরা ঐ পন্থাই অবলম্বন করবো, ওই পথে রাষ্ট্রীয় স্বরাজ-লাভ যদি নিশ্চিত হয়। চিরবন্দীর মুক্তির লোভ বড় প্রবল, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বড়ই দুর্নিবার। না হয় ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে দিন কতক ধামাচাপা দিয়েই রাখা গেল। কিন্তু ও পথে ফল-লাভের আশা যে বিন্দুমাত্র নাই। আমাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চা যতদিন নির্ব্বিষভাবে চলবে, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় তপস্বীরা যতদিন বিশুদ্ধ জ্ঞান-রাজ্যের সীমানা-বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকবেন ততদিন কোনও গোল হবে না। বরঞ্চ ইংরাজ কতকটা সহায়তাই করবে। কিন্তু যেদিন বিষ দাঁত গজাবার সন্দেহ মাত্র হবে সেই দিনই up-to-date বিংশ শতাব্দীর প্রণালীতে সেই বিষ দাঁতের কিরূপ Surgical operation হবে, সে কথা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়

ইংরাজকে অর্দ্ধচন্দ্র-প্রদানের এত দিন যে সব ব্যবস্থার চেষ্টা হয়ে এসেছে, সেগুলি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হয় নি, যদি শুধু এই মাত্র তার আপত্তি হতো তাহলেও না হয় মনে করতে পারা যেতো যে বিজ্ঞান-ভক্ত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সুরু মাত্র দেখে খুসী হয়ে আর কোনও আপত্তি না করে, আপনার ঘাড়টাকেই কেবল অর্দ্ধচন্দ্র-গ্রহণের যোগ্যও করতে থাকবে। কিন্তু সেরূপ মনে করার যে কোনও রূপ যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে তা বোধ হয় না। আর যদিই বা ইংরাজের চোখে ধূলা দিয়ে দৈবগতিকে গোটা কতক বিষাক্ত গ্যাস ও শতঘ্নী অস্ত্র প্রস্তুত করে নিতে পারি তাতেই বা কাজ এমনি কে এগোবে? একটা রীতিমত সংঘর্ষ ভিন্ন তো কাজ হাসিল হবে না। বর্ত্তমান কালের এরূপ একটা সংঘর্ষের আয়োজন যে কিরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার, গত জর্ম্মণ যুদ্ধের কল্যাণে তা কারো আর জানতে বাকী নাই। সেরূপ বিরাট আয়োজন যে বজ্রধরের সহস্র চক্ষুর তলায় বসে কোনও রকমেই হতে পারে, সে কথা কল্পনা করাও যায় না। সে ফাঁড়াও যদি দৈব-গতিকে কাটে তার পরে আস্‌বে সংঘর্ষের মরণালিঙ্গন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে একটা বড়গোছের যুদ্ধদেবতাকে তৃপ্ত করতে গেলে কত লক্ষ নরবলি ও অন্যান্য বলির প্রয়োজন হয় সে কথা লেখাই বাহুল্য। বর্ত্তমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সব বিজ্ঞান-ভক্তদের একটী প্রধান আপত্তি, এতে কাল্‌চার Culture নষ্ট হবে। চরকার একঘেয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দে কাল্চারের পাতাবাহারের গাছের উপর কোনওরূপ বিষের প্রতিক্রিয়া হয় কি না সে কথা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বা শব্দব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক প্রমথ মুখোপাধ্যায় মশায়ই বলতে পারেন। কিন্তু বন্দুক কামানের বারুদের ধোঁয়ায় যে বড় বড় ফলবান বৃক্ষও শুকিয়ে ওঠে একথা সকলেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যদি ওকালতী চাকরী ক্লব কলেজ বজায় রেখে পান চিবোতে চিবোতে স্বরাজ-লাভ সম্ভব না হয় তাহলে বর্ত্তমান আন্দোলনটাই প্রশস্ততর। যদি নরবলি দিতেই হয় তাহলে বর্ব্বরভাবে যুদ্ধ-দেবতার কাছে না দিয়ে ভদ্রভাবে বিচার দেবতার কাছে দিলে বলিও লাগ্‌বে কম, এর কাজটাও হবে পাকা-পোক্ত রকমের। আর একটা ভাব্‌বার কথা আছে। বিজ্ঞান-দেবতাকে মানুষের মগজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সময় বড় কম লাগবে না। ততদিন রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য কোনও চেষ্টা না করে পাঞ্জাবী অত্যাচার বা ততোধিক অত্যাচারগুলিকে নীরবে যদি হজম করতে থাকি, তাহলে বিজ্ঞানের জ্ঞানটা চলন-সই-মতো লাভ করার পূর্ব্বেই জাতির আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানটা এতটা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে যে যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টি সংকার করাটাই তখন তার সম্বন্ধে একমাত্র কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। আর ইত্যবসরে ম্যালেরিয়া, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও মুক্তি-প্রদানের emancipation কাজটি কতকটা এগিয়ে দেবে, সেটাও ভোলার কথা নয়।

আসল কথা, বিজ্ঞানের দ্বারা কোনও জাতি জয়লাভ করে না—জয়লাভ করে চরিত্রের দৃঢ়তায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, একাগ্র অধ্যবসায়ে, কষ্ট-সহিষ্ণুতায়, ত্যাগ-স্বীকারে

গ্রীকেরা ও ফিনিসিয়েরা রোমকের চেয়ে বিজ্ঞানে অনেক উন্নত ছিল, কিন্তু জয়টা হলো রোমকের। আবার বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও রোমকেরা ভাণ্ডাল গথ প্রভৃতি জাতিদের প্রবল আক্রমণের স্রোতের মুখে আত্মরক্ষা করতে পারলে না। কারণ তখন তারা কেটো সিসিরো ব্রুটস সিনসিনিটাসের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ দৃঢ় চরিত্রের উন্নত আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। ইংলণ্ডের অধিবাসীদের চেয়ে আমেরিকার উপনিবেশিকেরা শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে নিশ্চয়ই অনেক হীন ছিল, তা সত্ত্বেও তারাই যে জয়লাভ করল তার একমাত্র কারণ তারা Pilgrim Fathers অর্থাৎ ধর্ম্ম যাত্রীদের বংশধর। যে কাজ একমাত্র চরিত্রের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই সাধ্য তা বিজ্ঞানের দ্বারা সেরে নেওয়ার আশা করাই মূঢ়তা।

অসহযোগের আধ্যাত্মিক ভিত্তি :—

ইংরাজ যে একটা বিপুল শক্তির দ্বারা তাদের এই প্রকাণ্ড আধিপত্যকে ধারণ করে রেখেছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং সেটাকে কিছু মাত্র ঠাঁই-নাড়া করতে হলেও আমাদের পক্ষে দরকার আর-একটা বিপুলতর শক্তির। যিনি যাই বলুন এই শক্তির সন্ধানটাই এখন আমাদের সব-চেয়ে বড় কাজ। বাংলার অতি সুকুমার "স্পর্শ-ক্লেশ-সকাতর শিরীষ-পেলব কাল্‌চার "(culture) এ কথাটার মধ্যেও বিদ্বেষের গন্ধ পাবেন এমন আশঙ্কা হয়। সুতরাং অত্যন্ত সোজাসুজি খোলাখুলি ভাবেই সত্য কথাটা জানিয়ে দেওয়া উচিত মনে করচি। ইংরাজের সঙ্গে আমাদের যেরূপ অস্বাভাবিক সম্বন্ধ তাতে যিনি বলেন বিদ্বেষ নাই, তিনি হয় জড়, নয় মিথ্যাবাদী, নয় আত্মপ্রতারিত। এই দেশ-জোড়া বিদ্বেষের বিষে জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সমস্ত দেশটাই মৃত্যুমুখে যেতে বসেছে। সুতরাং বিষয়টাকে মেনে নিয়েই তাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ডাকসাইটে সাপের বিষের ওঝা এসে বললেন—"বলো, নাই" অমনি রোগীও বললেন "নাই," বিষ-ঝাড়ার জন্য যদি এই চিকিৎসাই অবলম্বিত হয়, তাহলে যথা-সময়ে বিষের ক্রিয়ায় রোগী যে ঢলে পড়বে, সে কথা নিশ্চিত। এই বিষ ঝাড়ার একমাত্র উপায় এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধটাকে দূর করে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করা। অসহযোগ আন্দোলন এই কাজই করতে চাচ্ছে। ইংরাজ বিপুল বোঝার মতো সমস্ত দেশটায় ঠিক মাথার উপর বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে বসে আছে। ফলে দেশের মাথাটা ক্রমেই মাটীর দিকে ঝুঁকে পড়ছে—মাটীসাৎ হওয়ার আর বড় বেশী বিলম্বও নাই। অসহযোগ ইংরাজ-রূপী বোঝাটাকে একেবারে সমুদ্র-পারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়না—তাকে বন্ধুভাবে পাশে বসাতে চায়। এই মাথায় থেকে নামিয়ে পাশে বসানোর চেষ্টাকে ইংরাজ ও তাঁর পরাসক্তেরা যতই বিদ্বেষ-সূচক মনে করুন না কেন, সনাতন ধর্ম্মের দৃষ্টিতে উহাই একমাত্র মঙ্গলের সেতু—উভয় পক্ষেরই। ইংরাজ যদি বিদেশী বিজেতা না হয়ে আমাদের পরম প্রেম-পাত্রী প্রেয়সীও হতেন এবং দৈব-শাপে তাঁকে মাথায় বোয়ে দুর্গম সংসার-পথে চলাটাই আমাদের ললাট

লিপি হতো তাহলেও প্রেমের অমৃতরস বিদ্বেষের বিষরসে পরিণত হয়ে উঠতে বড় বেশী দিন লাগতো না এবং ঐ শাপ মোচন করার কঠোর তপস্যাটাই প্রেমকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায় হোতো।

সে যাই হোক্, কথাটা হচ্ছিল শক্তি-সন্ধানের। মানুষ শক্তি-দম্ভে "আমার শক্তি, আমার শক্তি" বলে যতই আস্ফালন করুক্ না কেন, শক্তিটা কারো একচেটিয়া মহল নয়। সকল শক্তিই সেই পরম শক্তি স্বরূপের। তাকে কালীই বল, হরিই বল বা আর যাই বল তাতে কিছুই যায় আসে না। সংসারে যেখানে যত-কিছু শক্তি সে ঐ একই ঐশী শক্তি। এই এক শক্তি পাত্র-ভেদে জড় শক্তি, প্রাণ শক্তি, বুদ্ধি শক্তি, প্রেম শক্তি বা অধ্যাত্ম শক্তিরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেদিন মানুষের মধ্যে অধ্যাত্ম শক্তির আবির্ভাব হলো জগতের পক্ষে সে একটা স্মরণীয় দিন। সেদিন জলে স্থলে আকাশে সর্ব্ব-চরাচরে সর্ব্বত্র একটা আনন্দ কোলাহল পড়ে গেল। সে দিন মানুষের প্রতি ঘোষণা প্রচারিত হলো—"বৎস! তোমার জয় হোক! সকল শক্তির উপরই তোমার অধিকার রইল কিন্তু তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আধ্যাত্মিক শক্তির অনুগত করেই সব শক্তিগুলিকে চালনা করো। মানুষের সঙ্গে মানুষের আপন সম্বন্ধ—সত্য সম্বন্ধ—আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। সুতরাং মানুষের প্রতি আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেমের শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির প্রয়োগ করোনা।" এই ঘোষণা যে হয়েছিল তার সাক্ষী বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, কবীর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং আরো অনেক মহাপুরুষ। তাঁরা স্বকর্ণে শুনেছেন এবং আজও শুনছেন।

"দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে,
সেই তো বধিরতম শুনেও শোনেনা
সে বাণী।"

এই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশের অবমাননাই মনুষ্য সমাজের সব চেয়ে বড় বিপদ—সব চেয়ে বড় অমঙ্গল এবং সকল অমঙ্গলের নিদান। রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, সমাজতন্ত্র, পরিবার তন্ত্র, এমন কি ধর্ম্মতন্ত্রেও আধ্যাত্মিক শক্তির কাজ বুদ্ধিশক্তি বা জড় শক্তির দ্বারা সারবার চেষ্টার দরুণই মনুষ্য সমাজ জটিলতার আবর্ত্তে পাক খেয়ে খেয়ে মরছে—কিছুতেই অগ্রসর হতে পারছেনা—অন্তত আশানুরূপ নয়। অথচ এই ঘুর্ণিপাকের গতিকেই অগ্রসর হওয়া মনে করে মানুষ দম্ভে স্ফীত হয়ে উঠছে। বিপুল-কায় জটিল গঠন spinning mills এর স্থলে অতি সরল চরকাকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করলে তাতে মানুষের ইষ্ট হবে কি অনিষ্ট হবে তা ঠিক জানিনে—লব্ধ শক্তির অব্যবহারের ঋণ তাকে সুদ-সমেত শোধ করতে হবে কিনা সে কথাও ঠিক বলতে পারিনে। কিন্তু এ কথা জোর করে বলতে পারি, আধ্যাত্মিক শক্তির অব্যবহারের জন্য মানুষ মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবী হতে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমেই জীবত্বে ও জড়ত্বে পরিণত হচ্ছে। এই অধোগতিই মানুষের সব-চেয়ে বড় অমঙ্গল—সব-চেয়ে বড় বিপদ। জড়ত্ব প্রাপ্তিই মানুষের পক্ষে যথার্থ মৃত্যু—পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ধরণীর ঋণ শোধ মাত্র।

সুতরাং যে খোকা হাঁটতে শিখেছে সে যাতে অভ্যাসের জড়ত্ব বশতঃ আর

মাটীতে হামাগুড়ি দিয়ে না বেড়ায়—সেই ব্যবস্থা করাই আজ মানুষের সব চেয়ে বড় কাজ রেডিয়মের গুপ্ত গুণাবলীর আবিষ্ক্রিয়া বা League of Nations গঠন করা নয়।

অতএব এ কথা নিশ্চিত যে স্বরাজ-লাভের উদ্দেশ্যে ইংরাজের প্রতি আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। কর্ত্তব্য নয় কথাটার আসল মানে "করবো না, কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্যক্রমে এই আসল মানেটা অনেক বাজে কথার আড়ালে চাপা পড়ে যায়। কর্ত্তব্যের সঙ্গে কাজের এই বিচ্ছেদ সংসারের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

আমার এই লেখাগুলি কোনও প্র্যাকটি-ক্যাল অর্থাৎ কাজের লোক পড়েন কিনা জানিনে। যদি আমার লেখার সে সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরা ধৈর্য্যরক্ষা করে এসে থাকলেও আর যে পারবেন না, সে কথা একরূপ নিশ্চিত।

তাঁরা বলবেন, "এ-সব বিশুদ্ধ ভাব সম্ভোগের কথা কাব্যেই শোভা পায়, ধুলো-মাটির পৃথিবীতে এর কোনও স্থান নাই। আধ্যাত্মিক শক্তি সাত রাজার ধন মালিক হতে পারে, তাই বলে ঠোকাঠুকি লাগলে লোহার উপর সে যে জয়ী হবে, তার প্রমাণ কি? আধ্যাত্মিক শক্তি যে জড় শক্তি ও বুদ্ধি শক্তির চেয়ে বেশী বলবান এ কথা বিশ্বাস করচো কিসের জোরে?" যখন হাতে-আঙ্গুলে সেরে মণে মেপে ছোট বড় ঠিক করা মানুষের সনাতন অভ্যাস, তখন জড় শক্তির তুলনায় আধ্যাত্মিক শক্তিকে হীনবল মনে করলে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। যাই হোক একবার ভাল করে দেখা যাক।

সমস্যাটির মীমাংসার পূর্ব্বে আমি গোটা-কতক গোড়ার বিশ্বাসের কথা বলা উচিত মনে করি।

(১) আমি বিশ্বাস করি, ভগবান আছেন এবং তিনি প্রেমস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, সত্যস্বরূপ এবং শক্তিস্বরূপ।

(২) আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বের সংস্থান ধর্ম্ম সংস্থান (Moral order), সুতরাং প্রেম ন্যায় ও সত্যের জয় সুনিশ্চয়।

(৩) আমি বিশ্বাস করি, কোনও মানুষই একেবারে ধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জ্জিত ভগবান পরিত্যক্ত নয়। কারো ধর্ম্মজ্ঞান কিছু প্রস্ফুট, কারো বা কিছু প্রচ্ছন্ন।

এই কয়টী মূল বিশ্বাসের উপর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। সে কথা পরে আলোচনা করবো।

এই মূল বিশ্বাসগুলি যে সত্য বলে মানে তার কাছে এ প্রশ্নের অর্থই থাকে না—জড়শক্তি প্রবল না অধ্যাত্মশক্তি প্রবল? বাহুবল বড় না ধর্ম্মবল বড়? প্রশ্নটা প্রকৃত প্রস্তাবে দাঁড়ায়—সমস্তটা বড় না অংশবিশেষ বড়? কারণ সবশুদ্ধ সমস্ত বিশ্বকে যা ধারণ করে আছে, তাই ধর্ম্ম। কিন্তু মানুষের প্রমাণ-প্রমেয়ের জ্ঞানটা এমনি টনটনে হয়ে উঠেছে—যে মূল বিশ্বাসগুলিকেও—Logic দিয়ে যাচাই করে না নিলে তার তৃপ্তি হয় না এবং দিব্বি ভালো মানুষ লোকও থামকা বলে বসে—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। প্রমাণাভাবৎ।" কিন্তু তিনি নিজে এত বড় স্বয়ং-সিদ্ধ হয়ে উঠলেন কিসের জোরে, লজিক সেই ঝঞ্ঝাটে

প্রশ্নটা তোলা অনাবশ্যক মনে করেন। যাহোক লজিকের নেশাটা মানুষ যখন এতটা অভ্যাস করে ফেলেছে—তখন তাকে একেবারে বঞ্চিত করাটা কিছু নয়—বেচারা ছটফট করে মরবে। সুতরাং দেখা যাক।

মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি যে অন্য সব শক্তির চেয়ে বেশী বলবান তার প্রথম প্রমাণ—মানুষের মধ্যে ঐ শক্তির যে আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয়েছে এই ব্যাপারটা। দ্বিতীয় প্রমাণ মানুষের সমাজের অস্তিত্ব। তৃতীয় প্রমাণ বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রচার ও প্রমাণ। আগামী বারে এই প্রমাণ ও নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

পারুল চাঁপা

সাতটি ভায়ের সব্‌সে ছোট, একটি চাঁপা ফুল—
উঠলো জেগে ভোর না হতে, ডাক দিলে পারুল;
দেখ্‌ছিল সে স্বপ্ন তখন—একটি শাদা জুঁই,
ছোট্টো কচি বলচে তাকে আয়না কাছে তুই;
"পারুল দিদি, পারুল দিদি, এমন সময় ডাকো?"
"রাজার বাড়ী দুগ্‌গা পূজো তাও কি জানিস্‌নাকো?
চল্‌না পাবি রাণীর হাতে দেবীর পায়ে ঠাঁই!"
"পুণ্যি অত চাইনে দিদি, ভক্তি অত নাই!"

"এমন কথা বলতে আছে?"—পারুল গেল চলে,
ফিরল যখন রক্তগগন স্বর্ণ পড়ে গোলে,
আপন নীড়ে চল্‌ছে পাখী বইচে বাতাস ধীরে,
কাঁপ্‌চে আলো আঁধার যত ঘনিয়ে আসে ঘিরে,
রাজ-বাগানে ফুলের মালি ফিরছে সাজি হাতে,
দেখিয়ে তারে পারুল দিদি কয় কি ইসারাতে;
"রাজবাড়ীতে চাইনে যেতে, আঙুল-নাড়া রাখো,
বড়দা গেছে সকাল বেলা মেজ্‌দাদাকে ডাকো।"

"তারিফ্‌ করে রাজকুমারী বাঁধ্‌বে বড় খোঁপা
মোতির মালা জড়িয়ে তোরে রাখবে কেমন তোফা!

ভাগ্যিতে নেই !" বলে পারুল দৌড় দিল রাগে,
দুদিন গেলেই আবার হাজির রাত পোহাবার আগে,
বাজচে তখন বিয়ের বাড়ী নবৎখানায় বাঁশী,
জল সইতে যাচ্চে কারা সঙ্গেতে দাস-দাসী,
পারুল বলে, "ও ভাই চাঁপা, ওদের বাড়ী যাবি—
বাসর-ঘরে রং-তামাসা দেখতে অনেক পাবি !

শুয়ে রূপোর ফুলদানিতে শুনবি পেতে কাণ
হাসির কত ফিনিক ছোটে তরুণ গলার গান,
দেখবি কেমন বিয়ের কনে একটি পলকেই
নিলে চিনে এতদিনের অচেনা বর সেই !
বুকখানি তার কাঁপচে ভয়ে আনন্দে থর্ থর্,
ভাবছে বসে কেমন কোরে আপন হ'ল পর।
থামিয়ে কথা বল্লে চাঁপা—"ব্যাখ্খানাটা রাখো,
বড়দা গেছে মেজ্দা গেছে সেজ্দাদাকে ডাকো।"

দুপুর বেলা গাটা তখন করছে মাটি মাটি,
বিছিয়ে নিয়ে সবুজ রংএর পাতার শীতলপাটি,
তন্দ্রা-আতুর চোখে চাঁপা দেখতেছিল চেয়ে
গাছের তলায় করছে খেলা পাড়ার ছেলে-মেয়ে,
কেউ পরেছে সোনার হেঁসো কেউ বা নীলাম্বরী,
খড়্কে ডুরে কেউ পরেছে কারুর খোঁপায় জরি,
এমন সময় পারুল এসে বল্লে—"চাঁপা শোন্,
ঠেলিস্‌নিকো দিদির কথা, লক্ষ্মী-সোনা-ধন্ !

দশ-আনিদের ছোট ছেলের ফুলশয্যে আজ্
ডাক্ পড়েছে রং-বেরঙের ফুল কে কোথায় সাজ,
শ্বেত চামেলি সই কামিনী বেলার বড় বোন,
শিউলি পিসি গোলাপ মাসি গেছে এতক্ষণ,
খপর শুনে তোরেও আমি ডাক্‌তে এলুম তাই,
ভায়ের ভাল খুঁজে মরা বোনের স্বভাবটাই।"

"চাইনে দিদি তোমার ভালো, আমার কথা রাখো—
থাকতে বড় যায় কি ছোট ? ন-দাদাকে ডাকো।"

"অডিকলম ল্যাবেণ্ডার আতর গোলাপজল,
ফুলের পাখায় আলোর মালায় হাসিতে বিচঞ্চল,
ঘুমের-প্রবেশ-নিষেধ ঘরে নতুন বউ আর বর
প্রথম পরিচয়ের আজি পেয়েছে অবসর,
বউ-দিদিরা পাতচে আড়ি দাঁড়িয়ে দরজায়—
বর কি কোরে বউএর গালে প্রথম চুমো খায় !
সব তামাসা দেখতে পাবি ঘরের ভিতর বসে !"
চাঁপার মন সে তেম্‌নি নারাজ, পারুল জ্বলে রোষে।

পরদিনেতে রাখাল ছেলে ফিরতেছে গান গেয়ে,
ত্রয়োদশীর চাঁদটি আছে তাহার পানে চেয়ে,
এক হাতে তার খড়ের আঁটি আর এক হাতে বাঁশী,
টুপ্‌ করে তার পোড়লো চাঁপা পায়ের কাছে আসি,
ফুলটিকে সে কুড়িয়ে নিয়ে রাখলো কানে গুঁজে,
ঘরে ফিরেই সব-প্রথমে বউটিরে তার খুঁজে,
সাজিয়ে দিল মুখটি তুলে পরিয়ে কালো-চুলে
চাঁদের আলোয় কুড়িয়ে-পাওয়া একটি চাঁপা ফুলে !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা

কলির কালনিমে।—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র-কুমার রায় প্রণীত। কলিকাতা, মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য সাতসিকা; এখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস'—বাঙলার পল্লী-জীবনের কাহিনী। একান্নবর্ত্তী বাঙালী পরিবারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'উড়নচণ্ডী' শ্যালক শ্যামসুন্দরের ধূর্ত্তামি ও ইতরামি কি করিয়া বিপ্লব ঘটাইতেছিল, তাহারই কাহিনী অবলম্বন করিয়া উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। প্লটটিতে জান্ তেমন নাই, ব্যাপারটাও কেমন একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামসুন্দর গেঁয়ো বদমায়েস—এই চরিত্রটিই শুধু ফুটিয়াছে। তা ছাড়া পল্লীর হাট-বাজার, পথ-ঘাট, অন্তঃপুর এই কয়টির ছবি বেশ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পল্লীচিত্র হিসাবে 'কলির কালনিমে' ফুটিয়াছে ভালো, তবে উপন্যাস

হিসাবে বহিখানি যে খুব উৎরাইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই খুবই ভালো হইয়াছে।

বিশ্ব-সংহিতা। বা খৃঃ বিংশ শতাব্দীর মানব-সমাজ-বিধি। প্রণেতা ও প্রকাশক, শ্রীযুক্ত রামবৃন্দ দেব। বরিশাল, সারদা যন্ত্রে শ্রীপ্রমদাকান্ত ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বিবাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়া মানব জাতি কিরূপে এক মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শাখা-সমিতির অধীনে থাকিয়া সামাজিক সর্ব্ববিষয়ে নূতন-গঠিত বিধিসমূহ মানিয়া বিরাট মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহারই আভাব এই পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

নানা চিন্তা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তি-নিকেতন। বীরভূম শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি প্রবন্ধ-পুস্তক; সাধনা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বিদ্যা ও জ্ঞান, সাধনের সত্য, আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত, সভাপতির অভিভাষণ, উপসর্গের অর্থবিচার এবং দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব—এই সাতটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। মনস্বী লেখকের চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্য ভারত-বিশ্রুত—প্রবন্ধগুলিতে সেই চিন্তাশীলতা পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ গবেষণার পরিচয় পূর্ণভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। সাধনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—প্রবন্ধে লেখক সবিস্তারে ঐতিহাসিক ধারা-পরম্পরায় এই দ্বিবিধ সাধনার যে সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়—আলোচনার ভাষা যেমন সহজ তেমনি মধুর, ভঙ্গীও তেমনি সরল এবং যুক্তি-তর্কের সমাবেশও ইহাতে তেমনি প্রচুর সুশৃঙ্খল ও মনোজ্ঞ; দার্শনিকতায় তাহা তেমনি মণ্ডিত। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন—"ফাল্‌তো মায়া-কান্না মায়া-ভক্তি, মায়া-চাতুরী ছাড়ো। সাহসে ভর করিয়া এপক্ষ এবং ওপক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হও; সেই বিবাদী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্যদ্বারা অসত্যকে জয় কর—অনুরাগ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় কর—মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গলকে জয় কর—এইরূপ কর যে তোমার তাহাতে মঙ্গল হইবে—পৃথিবীর তাহাতে মঙ্গল হইবে।" বিদ্যা এবং জ্ঞান প্রবন্ধে লেখকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত হইয়াছে—তাঁহার মতে সার সত্যের নাগাল পাওয়ার প্রধান উপায় চিত্তশুদ্ধি। গায়ত্রীধ্যান চিত্তশুদ্ধির পরম সহায়। পাণ্ডিত্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া মনকে বালকের ন্যায় নির্ম্মল করিতে হইবে, তবেই সে নির্ম্মল চিত্তে প্রকৃত সত্যের ছায়া পড়িবে। সাধনের সত্য—দার্শনিক প্রবন্ধ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনায় যে সত্য লেখক নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অবিসম্বাদীভাবে পাঠকের চিত্ত অধিকার করিবে। আর্য্য এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংঘাত প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। সভাপতির অভিভাষণে—বাঙ্গালার সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব—প্রবন্ধে স্বদেশের কার্য্যে বঙ্গীয় যুবকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের যে উপায় লেখক বলিয়া দিয়াছেন, তাহা লেখকের স্বদেশানুরাগের জ্বলন্ত চিত্র, আজি-কালিকার দিনে বিশেষ করিয়া সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রবীণ বিজ্ঞ লেখকের অসাধারণ মনীষা পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যে সব পাঠক উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে চিন্তাশীল প্রবন্ধের অভাব বলিয়া অনুযোগ করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে প্রভূত জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।